বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা

বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা

কমল চৌধুরী

রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

অধ্যাপক মনতাসুর মামুন
প্রীতিভাজনেষু—

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—কলকাতা
বাংলা আকাডেমী—ঢাকা
প্যাপিরাস
বিনয় ঘোষ
অধ্যাপক মনতাসুর মামুন
অধ্যাপক স্বপন বসু
অধ্যাপক অলোক রায়
অধ্যাপক রতনলাল চক্রবর্তী
অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী
অমর দত্ত

ভূমিকা

... দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থ বর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয়গান করিব না।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—একথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, প্রায় ১৫০ বছর আগে। দেশ তখন ছিল বিদেশী শাসনে। সমাজের রূপান্তর ঘটছিল বিদেশী স্বার্থে। সে রূপান্তরের মধ্যে নিহিত ছিল শুভ-অশুভ দুই-ই। এক শ্রেণির হিন্দু বাঙালি, শাসকের—নীলকর শোষকের অনুগত হয়ে বিত্ত সঞ্চয় করে আভিজাত্যের তকমা লাগিয়ে সমাজ-প্রভু হয়ে ওঠে। জমিজমা কিনে গ্রাম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জমিদারে পরিণত হয়। বিত্তের গদিতে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজা, রায়বাহাদুর খেতাবে বিভূষিত হতে থাকে। বঙ্কিমের বিশ্লেষণে সেই নগণ্য সংখ্যক বাঙালির দিকে তাকিয়ে বাঙালির ভাগ্যের পরিবর্তন নির্দেশ করা কঠিন। বেশিরভাগ বাঙালি সহায় সম্পদ হারিয়ে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছিল। জমিদারের অনুগ্রহে পানীয় জলের পুষ্করিণী, সড়ক, পাঠশালা, এসব ছড়িয়ে পড়তে থাকে! —যা ছিল শোষণের একটা কৌশলমাত্র। এরকম দয়াশীল জমিদাররা ইংরেজ শাসনের ভিতকে পাকাপোক্ত করছিল—দরিদ্র গ্রামবাসীকে বাস্তুচ্যুত করেছিল, দারিদ্র্যের শেষবিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছিল! রাজা-মহারাজা-জমিদার-ভূস্বামী-মধ্যস্বত্বভোগীর দল-দেশীয় দালাল শ্রেণি ছিল সমাজের এক প্রান্তে, অপরপ্রান্তে বাস্তুচ্যুত নিরন্ন মানুষের স্রোত। কালের আবর্তে সেই চালচিত্র বদলে গেছে আমূল।

রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের চেহারাও বদলে যেতে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান আমলে উৎপাদিত শস্যের অংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হত। নগদ মুদ্রার প্রচলন ছিল না। শস্য বিশেষে রাজস্বের অংশ নির্ধারিত হত। তোগলক বংশের রাজত্বকালে আরবীয় প্রথার অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। শেরশাহ ক্ষমতা দখলের পর, সময় ও সমাজের উপযোগী রাজস্ব আদায়ের প্রচলনের উদ্যোগ নিলেও তিনি

সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি, আকস্মিক মৃত্যুর কারণে। তারপর রাজা তোডরমল উৎপাদিত শস্যের পরিবর্তে নগদ মুদ্রার প্রথা প্রচলন করেন। উৎপাদিত ফসলের যে অংশ রাজার প্রাপ্য, তা দিতে হবে নগদ মুদ্রায়। দশবছর স্থিরীকৃত রাজস্বের কোন পরিবর্তন হত না। বাংলায় ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে এই প্রথার প্রবর্তন ঘটেছিল। মুসলমান আমলেই নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত হতেন এক শ্রেণির কর্মচারী। তাদের বলা হত জমিদার। জমি অর্থাৎ জমিন। দার অর্থাৎ রক্ষাকারী বা ভৃত্য। এরা কেবল রাজস্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। নিজস্ব এলাকার শান্তিরক্ষা, রসদ সরবরাহ ও অন্যান্য সরকারি কাজকর্মও করতে হোত। তার জন্য কোন বেতনের ব্যবস্থা ছিল না। বাদশাহের নির্দিষ্ট কর দেওয়ার পর বাডতি অংশ জমিদারই স্বয়ং গ্রহণ করত। ক্রমশ পদটি বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। সাধারণ লোকের ধারণা হল জমিদাররাই জমির মালিক। কৃষকদের জমিতে কোন স্বত্ব নেই। এই জমিদাররা ছিল ঠিকাদারের মত। এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চালু ছিল। কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িষার দেওয়ানি লাভ করে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে তারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চার বছর ধরে। তারপর সুশৃঙ্খলভাবে কর আদায় এবং ভবিষ্যৎ কর নির্ধারণের জন্য প্রতিটি জেলার সুপারভাইজার বা সিভিলিয়ান নিযুক্ত করে। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা বদলাতে থাকে। এর মধ্যে ঘটে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তারপর প্রথমে পাঁচশালা ও পরে দশশালা ব্যবস্থা (১৭৯০ খ্রিঃ) হয়। এই দশশালাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা (১৭৯৩ খ্রিঃ)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার বা ঠিকাদারদের ওপর যেসব ধারা বলবৎ হয়েছিল তা মেনে চলার মানসিকতা তাদের ছিল না। প্রজাদের ওপর নিষ্পেষণ মাত্রাহীন হয়ে ওঠে এবং কখনও কখনও গুরুতর অশান্তির কারণ হতে থাকে। সূর্যাস্তের আইন, হপ্তমের আইন, পঞ্চমের আইন (১৮১২) প্রজাদের একেবারে নিঃস্ব করে দেয়। নানাস্থানে প্রজা অশান্তি ঘটায়, সরকারি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অবশেষে ১৮৮৫ সালে “বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন” চালু হয়। জমিদারের কূটকৌশলে এবং শাসনকর্তাদের তৈল মর্দনকারী এই জমিদার সমাজের অপকর্মের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রজা নিষ্পেষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন “নীলদর্পণ”। তারপর অজস্র বাংলা উপন্যাস, গল্প কাহিনি এবং সংবাদ ও সাময়িকপত্রে জমিদার বা ভূস্বামীদের মানববিদ্বেষী ভয়ঙ্কর অত্যাচারের ঘটনাবলী আমরা জানতে পারি।

> পূর্বকালে যাহারা রাজা নামে আখ্যাত ছিলেন, মুসলমান সাম্রাজ্যের শেষ যোগে তাহারাই জমিদার আখ্যাপ্রাপ্ত হন, অদ্যাপি এই উপাধিই তাহাদের পরিচায়ক হইতেছে। এই জমিদারদিগকে পূর্বে প্রজারা পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, দেবতার ন্যায় পূজা করিত, যমের ন্যায় ভয় করিত। জমিদারের মাটি পোড়াইয়া খায় বলিয়া জমিদারের সুখে তাহারা উল্লসিত হইত। জমিদারের দুঃখে তাহারা মর্মপীড়িত হইত। জমিদার ভিন্ন আর তাহারা অন্য কাহাকে জানিত না—মানিত না। জমিদারই তাহাদের সমাজনেতা ছিল, আদালত

ফৌজদারি ছিল, সর্বেসর্বা হর্তাকর্তা প্রভু ছিল। কি সামাজিক বাদ বিসম্বাদ, কি স্বত্বঘটিত মামলা, মোকদ্দমা, কি চুরি ডাকাতি, কি মারামারি, কাটাকাটি সকল বিষয়েই তাহারা জমিদারের শাসন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিত, জমিদারের বিচারে সন্তুষ্ট থাকিত। জমিদাররাও আবার প্রজাদিগকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতেন, প্রজাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, বিপদে বিপদ জ্ঞান করিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় আর্থিক সাহায্য করিয়া, জলাভাবে পুষ্করিণী খনন করিয়া প্রজার প্রীতি আকর্ষণ করিতেন, স্বার্থের বশীভূত হইয়া স্বীয় উদর পূর্তির জন্য প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতেন না, অথবা করভারে তাহাদিগকে প্রপীড়িত করিতেন না। তখন উভয়ের মধ্যে স্বর্গীয় ভাব ছিল। **এখন আর জমিদার প্রজার সে নৈকট্য সম্বন্ধ নাই, সে প্রীতির ভাব নাই। জমিদার প্রজা এখন দাকাটারী সম্বন্ধ পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। জমিদার প্রজার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেন, প্রজাও জমিদারকে বিষ নয়নে চাহিয়া দেখেন। সুবিধা পাইলে কেহ কাহাকে ছাড়েন না—একে অন্যের শোণিতে তর্পন করেন।... জমিদার প্রজার মধ্যে ভয়ানক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি।" —বর্তমান গ্রন্থ পৃ. ৫৮৮**

"...অধিকাংশ জমিদারগণই প্রজার উপর নিপীড়ণ করেন ও তাহাদের সর্বস্ব শোষণ করিয়া লন। ... যদি প্রজার খাজানা দিতে বিলম্ব হইল, তবে পেয়াদা নিযুক্ত করা হয়। পেয়াদা হতভাগ্য প্রজাকে কাছারির বাটিতে ধরিয়া আনিয়া যারপরনাই অপমান করে। তাহাদের রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখে, প্রহার করিতে কখন কখনও জুতাস্ত পর্যন্ত করিয়া থাকে।.. নানাপ্রকার অত্যাচারে কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। অনেকে সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য স্থানে উঠিয়া যায়।" —বর্তমান গ্রন্থ পৃ. ৫৩৫

"...যখন আমরা প্রজারূপী প্রকৃত ভূম্যধিকারীকে ভূম্যধিকারী বলিয়া মনুষ্যোচিত সম্মান দানে অগ্রসর হই না; এবং যাহাদের অনুগ্রহে অহোরাত্র অন্নবস্ত্রে প্রতিপালিত হইতেছি, তাহাদের আর্তনাদে কর্ণপাত করিয়া, পরন্তু কুটুম্ব, সহচর, অনুচর বেতনভুগী সামান্য দারোয়ান পর্যন্ত যাহারই একটু অত্যাচারের স্পৃহা আছে, অথবা নীচ জনোচিত স্বার্থ সাধনে অত্যাচারে সবিশেষ অনুরাগ আছে, তাহাকেও অক্লেশে এবং সহজচিত্তে প্রকৃতি পালিত মাঠের কৃষকের অঙ্গে তাহার লালাসিক্ত তীব্রদন্ত বসাইতে দেই, তখনই, বুঝিয়াছি যে আমরা শুধু নামমাত্র ভূম্যধিকারী। ভূমিসম্ভূত অর্থ এবং অর্থসম্ভূত সুখটুকুর জন্যই আমরা লালায়িত, প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সুখ দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিরহিত। আমরা এই নিমিত্ত ভূম্যধিকার-সম্পৃক্ত মহামহিমান্বিত পুরুষদিগকেও যারপরনাই কাতর কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, এখনও সাবধান হউন, সতর্ক হউন, দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও তাহার ন্যায্য স্বত্ব ও ন্যায়সুলভ সুখশান্তিতে অক্ষত ও অক্ষুন্ন রাখিতে দিউন।" পৃ. ৫৮৩

"নয়শত নিরানব্বই জনের" দুর্গতি শতক পেরিয়ে অব্যাহত থেকে যায়, যাবতীয় আবেদন নিবেদন এবং সুপুরামর্শ অগ্রাহ্য করে। দেশের নিগৃহীত, অবহেলিত প্রকৃত ভূস্বামীরা জমিহারা হয়ে সমাজে জড়পদার্থে পরিণত হয়। সেই দুর্বিষহ জীবনধারার

দীর্ঘশ্বাসে জমিদার, সেরেস্তার, মুহুরি, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ সব আজ কবরে শায়িত। এখনও দুই বাংলার নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে জমিদারদের বিলাসবহুল প্রাসাদের অবশিষ্ট চিহ্ন।

"নীলবিদ্রোহ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থখানি সম্পাদনাকালে জমিদারি ব্যবস্থা এবং বাংলার নীলচাষ সম্পর্কে এমন বহু বিবরণ সংগ্রহ করি, যা একখানি গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভব নয়। বাংলার ভূমি ব্যবস্থাকে নিয়ে বিদেশী শাসক যে অবৈধ কার্যকলাপ চালিয়েছিল বছরের পর বছর, নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বারবার আইন প্রণয়ন করেছে, যা দরিদ্র কৃষিজীবীকে আরও বিপন্ন ও অসহায় করে তুলেছিল। আর এই কার্যে বিদেশী শাসকের সহযোগী ছিল দেশীয় জমিদারগোষ্ঠী-ভূস্বামীরা। বর্তমান সংকলনের বিভিন্ন রচনায় আছে তারই তথ্যপূর্ণ বিবরণ।

পলাশির যুদ্ধ, কোম্পানির দেওয়ানি লাভ, গোটা বাংলা জুড়ে ছলে বলে কৌশলে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার বাঙালির প্রচলিত জীবনস্রোতকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, সে সম্পর্কে তৎকালীন বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও চিন্তাবিদের আলোচনা সংকলিত হয়েছে সংকলনের সূচনায়। সমাজজীবন সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনাগুলি থেকে সেকালের বাঙালি জীবনের কথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

কমল চৌধুরী

২৩৩ বিবেকানন্দ সরণি
(কলুপুকুর) বারাসাত
২৪ পরগণা (উত্তর)
কলকাতা-৭০০ ১২৪
দূরভাষ ঃ ৯৩৩৯৫০৫৫৮৩

সূচি

বঙ্গদেশে জমিদারি ব্যবস্থার উদ্ভব ঈশ্বরের আশীর্বাদ নয়। এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হিন্দু, পাঠান, মোগল শাসন ব্যবস্থাকে ম্লান করে বিদেশী ইংরেজ শাসকরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলকে সুরক্ষিত রাখতে যে শোষণযন্ত্র তৈরি করে, সেক্ষেত্রে জমিদাররা গ্রহণ করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শাসক ইংরেজরা জমিদাররূপী যে দানব সৃষ্টি করে, স্বদেশবাসী স্বজাতির ওপর তাদের কোন মমত্ব ছিল না। ইংরেজ সহযোগিতায় পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষদের তারা ভিখারিতে পরিণত করছিল। রাস্তার ধারে গাছ লাগিয়ে, রাস্তা নির্মাণ ও পুকুর কাটিয়ে তথাকথিত গণমঙ্গলের যে উদ্যোগ তারা নিয়েছিল, তার অন্তরালে ছিল তাদের শোষণের নৃশংস মানসিকতা। হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে যে জমিদার গোষ্ঠীর সৃষ্টি, তাদের নিষ্ঠুরতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার অন্যতম হল দুর্ভিক্ষ। যা বার বার সহস্র সহস্র মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল। এই বিদেশী বণিক যখন এদেশে প্রভু হয়ে বসল, তখন তারা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক স্বার্থে পরিচালিত করে। যেজন্যে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল জমিদারশ্রেণির মত এক দালাল গোষ্ঠীর। জনস্বার্থবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখাই ছিল তাদের কর্তব্য। বাংলার সেই অতীত ইতিহাসে নতুন আলোকপাত ও পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

সমাজজীবন

প্যারীচাঁদ মিত্র

১৮১৪-১৮৮৩

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা

আর্য রাজ্য

আর্যেরা উত্তর পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে আসিয়া বাস করিলেন। বিন্ধ্যাচল ও হিমালয় পর্বতের মধ্যবর্তী দেশ আর্যাবর্ত বলিয়া বিখ্যাত হইল। ক্রমশ দেশ, গ্রাম, ও নগরে বিভক্ত হইল ও রাজ্য রক্ষার্থে গ্রাম ও দেশ অধিকার নিযুক্ত হইল। রাজা কতিপয় মন্ত্রী লইয়া প্রত্যেক গ্রামের ও রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতে লাগিলেন। যেরূপ রাজ্য বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, সেইরূপ কৃষি ও বাণিজ্য সর্বস্থানে প্রকাশিত হইল। রাস্তাঘাট নির্মিত হইল ও শকট, নৌকা ও জাহাজের দ্বারা এক স্থানের বিক্রয় দ্রব্যাদি অন্য স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোক পার্থিব কার্যে কালযাপন করিত। যে সকল আর্য সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন, তাহারাই জ্ঞান প্রকাশক হইলেন; তাহারা কেবল ঈশ্বর ও আত্ম চিন্তা করিতেন। সকলের গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। তাহারা পরিবার লইয়া প্রতিদিন তিন বার সংস্কৃত ভাষায় উপাসনা করিতেন। এই সকল উপাসনা একত্রিত হইয়া ঋগ্বেদ নামে বিখ্যাত হয়। অনন্তর যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ বিরচিত হয়। বেদ ছন্দস্ মন্ত্র অথবা সংহিতা ব্রাহ্মণ্যে ও সূত্রে বেদাঙ্গতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণের শেষাংশকে আরণ্যক বলে, কারণ তাহা অরণ্যে পঠিত হইত। যাহা বেদের শেষাংশ তাহাকে উপনিষদ বলে, কারণ আচার্যের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে হইত। যদিও বেদে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সংস্থাপিত, কিন্তু উপনিষদে ঈশ্বর ও আত্মা যে অশেষ যত্নপূর্বক চিন্তিত এ নিদিধ্যাসিত হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের উপদেশ এই—একই ঈশ্বর, তাঁহাকে জান, তাঁহারি উপাসনা কর। আত্মার অমরত্ব লক্ষণ সংস্থাপিত; কিন্তু জীবের পুনর্জন্ম জন্মান্তরে কিছুই উল্লেখ নাই। পূর্বে জাতি ছিল না—পুরোহিত ছিল না—প্রকাশ্য উপাসনার স্থান ছিল না—মন্দির ছিল না—প্রতিমা ছিল না। গৃহস্থ স্বয়ং পরিবারকে লইয়া উপাসনা করিতেন। যে সকল স্তোত্র উপাসনাকালে পঠিত হইত, তাহা হয়তো পূর্বে রচিত হইত অথবা তৎকালে বিনাচিন্তনে সঙ্গীত হইত। যদি কোন বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের ও পরিবারদের সকলের মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের বৃদ্ধি হয়, সে বন্ধন একত্র ঈশ্বর উপাসনা করা, তখন সকলের আত্মা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে থাকে। অসভ্য দেশে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমতুল্য জ্ঞান করে না—হয় তো কিঙ্করী নয় তো গৃহ বস্তুর স্বরূপ বোধ করে এবং আজ্ঞানুবর্তিনী না হইলে প্রহারিত অথবা দূরীকৃত হয়। আর্যেরা স্ত্রীকে সমতুল্য অর্ধশরীর ও অর্ধজীবন জ্ঞান করিতেন। স্ত্রী ভিন্ন ঈশ্বর উপাসনা, ধর্ম কার্য ও পারলৌকিক ধনসঞ্চয় উত্তমরূপে হইত না। ঋগ্বেদের এক শ্লোকে লেখে, স্ত্রীই পুরুষের গৃহ—স্ত্রীই পুরুষের বাটী। মনুও বলেন স্ত্রী গৃহ উজ্জ্বল করেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ

পূর্বে স্ত্রীলোকেরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। উহাদিগের উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা পতি গ্রহণ করিতেন না। তাহারা বেদ পড়িতেন ও পড়াইতেন, জ্ঞানানুশীলনার্থে তাহারা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতেন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে যে, মিনা ও বৈতরণী নামে দুই জন ব্রহ্মবাদিনী নারী ছিলেন। হরিবংশে লেখে যে বরুণার এক তপঃশালিনী কন্যা ছিল। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, মহাত্মা আসুরি আত্মজ্ঞানার্থে কপিলের শিষ্য হইয়া শাবরীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী তাহার সহধর্মিণী ছিলেন। প্রিয় শিষ্য পঞ্চশিখ ঐ কপিলার নিকট ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মিথিলাধিপতি জনক ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনার্থে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। গার্গী নাম্নী এক তত্ত্বজ্ঞা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অনেক তর্ক-বিতর্ক করেন। মহাভারতে লেখে যে সলভা নামে একটি স্ত্রীলোক দর্শনশাস্ত্র ভালো জানিতেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনীরা জ্ঞানানুশীলন ত্যাগ করিয়া ধ্যানাবৃত হইতেন। ধ্যানকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের চরমাবস্থা। রঘুবংশে এক ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে। 'এই সুতীক্ষ্ণনামা শান্তচরিত্র আর এক তপস্বী ইন্ধন প্রজ্বলিত হুতাশন চতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী ও সূর্যাভিমুখী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন।' আরণ্যকাণ্ডে লেখে 'চীরধারিণী জটিলা তাপসী শবরী' রাম দর্শনে অগ্নিতে প্রবেশ করত 'আপন বিদ্যুতের' ন্যায় দেহ প্রভায় চর্তুদিক উজ্জ্বল করিয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে স্থানে সেই সুকৃতাত্মা মুনিগণ বাস করিতেছিলেন, তিনি সেই পুণ্য স্থানে গমন করিলেন।

যদিও ব্রহ্মবাদিনীরা ঈশ্বর ও আত্মজ্ঞানানুশীলনে মগ্ন থাকিতেন, তথাচ সদ্যোবধূরা পতিগ্রহণ করিয়াও উক্ত জ্ঞানে বিখ্যাত হইয়াছিল। অত্রিবংশীয় দুই নারী ঋগ্বেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা করেন। উত্তর রামচরিতেও লেখে যে অত্রিমুণির বনিতা আত্রেয়ী পথে আসিতেছিলেন, একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? মুনিপত্নী বলিলেন, আমি বাল্মীকির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা বাস করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী অতি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীর নিকট তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ পান। ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদে প্রকাশিত আছে।

সদ্যোবধূরা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেন, তাহাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয়, পারলৌকিক উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রকার শিক্ষিত কতিপয় আধ্যাত্মিক সদ্যোবধূর সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

---

১ [illegible] যাহা উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

উচ্চ সদ্যোবধূ

দেবহূতি

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দম মুনির স্ত্রী দেবহূতি স্বামীর বনে গমন সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, 'আপনি প্রব্রজ্যার্থে গমন করিতেছেন। আমি কাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিব? আমার জ্ঞানোপদেশ নিমিত্তে কাহাকেও রাখিতে আজ্ঞা হউক।'

পরে দেবহূতির গর্ভে কপিলের জন্ম হয়। কপিল তপোবল দ্বারা 'নিরহংকার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিশূন্য ও অব্যাভিচারিণী ভক্তির দ্বারা' ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন। দেবহূতি পুত্রের নিকট আসিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করেন। কপিল বলেন, 'আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগ পুরুষের নিঃশ্রেয়সের কারণ, কেননা তাহাতেই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উপরতি হয়। চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন ও পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলে তাহার মুক্তি হয়। কপিলের উপদেশ জ্ঞানপ্রদ। তৃতীয় স্কন্ধে এই উপদেশ বাহুল্য রূপে লিখিত আছে।

শান্তা

শান্তার বিবাহ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত হয়। অন্তরউচ্চতা ও সৌন্দর্যে তিনি অতুল্য ছিলেন।

কেশনী

কেশনী সাগরকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও সত্যানুরাগে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

সতী

সতী শৈশবকালাবধি যোগাভ্যাস ও তপস্যা করিতেন। পতিনিন্দা শুনিয়া যোগবলে আপন দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অনসূয়া

অত্রিমুনির বনিতা অনসূয়া অনেক শাস্ত্র জানিতেন ও অন্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সীতার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তাহা আরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত আছে।

কৌশল্যা

কৌশল্যা দশরথের দ্বারা রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত। 'সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্মাচরণে ভার্যার ন্যায়, সৎপরামর্শ দানে ভগিনীর ন্যায়, ভোজনকালে জননীর ন্যায়, ব্যবহার করিয়া থাকেন।'

সীতা

সীতা কেবল শরীর ধারণ করিতেন—তিনি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ছিলেন। তাহার আধ্যাত্মিক চিন্তা পিতৃ আলয়ে হইয়াছিল। তিনি কহেন, 'সংযতচিত্ত মুনিগণ যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাও আমি কৌমার কালে পিতৃভবনে এক সাধুশীল ভিক্ষুকের

মুখে শ্রবণ করিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা কহেন পতিই নারীদিগের দেবতা, যে নারী ছায়ার ন্যায় সর্বদা ভর্তার অনুসরণ করে, সে ইহ ও পরলোকে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া সুখে সময় যাপন করে। আমি বিবাহ কালে স্বামীর করে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং তাহার হিতের নিমিত্তে অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।' বনবাসকালে রামচন্দ্র সীতাকে গৃহে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতা বলিলেন, তোমা ছাড়া হইলে আমি স্বর্গ ছাড়া হইব। দণ্ডকারণ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে কে না চমৎকৃত হইবে? যে সকল জীব সমাহিত ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তাহারা তাড়িত ও অপমানিত হইলেও অন্তর শীতলতা হইতে চ্যুত হন না। ব্রহ্মবাদিনীদিগের ব্রহ্মই লক্ষ্য ব্রহ্মলাভের জন্য তপোবলের দ্বারা তমস জীবনকে নির্বাণ করাই সাধনা ছিল। সদ্যোবধূগণ পতি গ্রহণ পূর্বক আপন শুদ্ধপ্রেম পতিকে অর্পণ করিয়া পরলোকে উন্নতি সাধন করিতেন।

সীতা অসতী হইয়াছেন, এই জনরব যখন ঘোষণা হইতে লাগিল, তখন রামচন্দ্র আপন রাজ্যের কুশলার্থে সীতার সহিত আর সহবাস না করিতে পারিয়া তাহাকে বনবাস দিলেন। এই মর্মবেদনা পাইয়াও সীতার ভাব রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

সাবিত্রী

সাবিত্রীর আধ্যাত্মিক ভাব অল্প ছিল না। সত্যবানকে বনে দেখিয়া মনেতে বরণ করিলেন, তিনি এক বৎসরের মধ্যে মরিবেন এই সংবাদ নারদ মুখে শুনিয়া ও পিতা মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও তাহাকে বিবাহ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। যখন শ্বশুরগৃহে গমন করিলেন, তখন তাহার দুরবস্থা দেখিয়া আপন অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্বক, শ্বশুর ও শাশুড়ির ন্যায় বল্কল ধারণ করিলেন। এই সকল কার্যেতে দেদীপ্যমান হয় যে, যাহারা আত্মজ্ঞ হয়েন, তাহারা নশ্বর বস্তু ও ভাব হইতে অতীত—তাহারা মনন্ময়ী অবস্থায় উপরতিতে পূর্ণ হয়েন।

দময়ন্তী

দময়ন্তীও পতিপরায়ণা ছিলেন। সকল কামনা পতিতে পর্যবসান করত পতিতে মগ্ন হইয়া আত্ম লাভ সাধন করিতেন।

পতি সঙ্গেই হউক আর পতি বিয়োগেই হউক, সাকার কিংবা নিরাকার পতি অবলম্বনে পূর্বকালীন অঙ্গনারী আত্মার উদ্দীপন করিতেন। দময়ন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছিলেন,--অরণ্যে পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা—অর্ধবস্ত্র পরিধানা, তথাচ নিমেষমাত্র পতিকে বিস্মরণ না করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে পর্যটন পূর্বক পুনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।

শকুন্তলা

শকুন্তলার উচ্চ শিক্ষা হইয়াছিল। তাহার পালক পিতা কহেন—'কন্যা ঋণ স্বরূপ--উৎকৃষ্ট দুর্মূল্য রত্ন—পিতারই গচ্ছিদ্ধন।' রাজা দুষ্মন্ত কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর শকুন্তলার এক পুত্র জন্মে। তিনি ঐ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া বলেন—রাজন্! আমি তোমার ভার্যা ও এই

বালকটি তোমার পুত্র। রাজা তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, রাজন্! ভার্যাকে অবহেলা করিও না—ভার্যা ধর্ম কার্যে পিতার স্বরূপ—আর্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম স্থান স্বরূপ—আর সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম। অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না।

গান্ধারী

গান্ধারী আপনার স্বামীর অন্ধতা জন্য আপন চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে আপনার স্বামীর নিকট পুত্রদিগের অধর্ম আচরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ধর্মের জয়—অধর্মের কখনই জয় হয় না।'

কুন্তী

কুন্তীর মনের ভাব কীরূপ ছিল, তাহা তাহার উপদেশেতে প্রতীয়মান। দ্রৌপদী যখন বনে গমন করেন, তখন তিনি তাহাকে বলেন—'দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না। তুমি স্ত্রীধর্মাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাধ্বী ও সদাচারবতী তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে; অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তোমাকে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই। হে অনঘে! কৌরবেরা পরম ভাগ্যবান, যেহেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎসে! আমি সর্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর।'

উদ্যোগ পর্বে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'লোকে সৎস্বভাব দ্বারা যেরূপ মান্য হইতে পারে, ধন বা বিদ্যার দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না।'

বীরের কন্যাই বীর-ভাব প্রকাশ করেন। কুন্তী বলিলেন—'হে কেশব! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয় কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তোমরা এই সময়ে বিপরীতাচরণ কর, তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব; সময়ক্রমে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়।' তাহার আধ্যাত্মিক ভাব এই উপদেশে প্রকাশ হইতেছে—'আমি পুত্রগণের নির্বাসন, প্রব্রজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্যোধন আমাকে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দশ বৎসর অপমান করিতেছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, পরে পুণ্য ফল সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি; পশ্চাৎ সুখ সম্ভোগ করিব; তাহার সন্দেহ নাই।'

দ্রৌপদী

দ্রৌপদী শৈশবাবস্থায় পিতার ক্রোড় হইতে আচার্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাহার শিক্ষা বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ বর্ণন—'অনন্তর দ্রুপদ রাজা আলেখ্য রচনা ও শিল্পকার্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্ন পূর্বক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্রোণ সন্নিধানে অস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে দ্রুপদ মহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয় কার্য সমাধান করিবার নিমিত্তে দ্রুপদ রাজাকে অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে বিবাহ

করিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া অনেক কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন—অভ্যাগত অতিথি এবং দাস দাসীদিগের ভোজন ও পরিচ্ছদ বিষয়ে তত্ত্ব করিতেন। গোশালা ও মেষশালা আপনি দেখিতেন। কোষ তাঁহার অধীনে ছিল ও আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য তিনি নির্বাহ করিতেন। যে সকল কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অতি বিনীত ও শান্তভাবে করিতেন। তিনি কহিতেন যে, জীবন নিষ্কাম না হইলে মুক্তি পায় না। যখন তিনি বনে ছিলেন তখন তাহার সত্যভামার সহিত পতি বশকরণ বিষয়ক কথোপকথন হয়। তিনি কহেন, 'আমি কাম ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্যা করিয়া থাকি! অভিমান পরিহারপূর্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্তন করি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জন, পাক, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিযা থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্য শূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে সতত বাস করিয়া অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগ পূর্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্তৃগণের সেবা করিয়া এক মুহূর্ত অসুখী থাকি না। স্বামী কোনো আত্মীয়ের নিমিত্তে প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগপূর্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।'

সুভদ্রা

সুভদ্রা অর্জুনকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু সমরে প্রাণত্যাগ করিলে তিনি যে বিলাপ করেন, তাহাতে তাহার পারলৌকিক উচ্চভাব প্রকাশ হয়। 'সংশিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার চারিবর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাহারা সত্য সংবিভাগ করেন, যাহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাহারা সতত যজ্ঞানুষ্ঠান, ধর্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাহাদিগের নিকট বিমুখ হন না, যাহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট বিপন্ন ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য রক্ষা করেন, যাহারা সর্বদা মাতা পিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যাহারা গত-মৎসর হইয়া সর্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমার সেই গতি হউক।

রুক্মিণী

ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। 'হে নরশ্রেষ্ঠ! কুল শীল রূপ বিদ্যা বয়ঃ ধন সম্পত্তি ও প্রভাব দ্বারা উপমা রহিত এবং নরলোকের যে মনোভিরাম যে তুমি, তোমাকে কেন কুলবতী গুণদ্বারা বুদ্ধিমতী কন্যা বিবাহবাসরে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ না করে? অতএব আমাতে দোষের শঙ্কা কি? হে বিভো! সেই হেতু আমি তোমাকে নিশ্চয় পতিত্বে বরণ করিযাছি এবং আমায় তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি, অতএব তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নী স্বীকার কর। হে অম্বুজাক্ষ! তুমি

বীর, আমি তোমার বস্তু; চেদিরাজ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, শীঘ্র আসিয়া তাহা কর। আমি যদি পূর্বজন্মে পূতকর্ম বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বা পর্বণাদি দান বা তীর্থ পর্যটনাদি বা নিয়ম ব্রতাদি কিংবা দেব বিপ্র গুরু অর্চনাদি দ্বারা নিয়ত ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন, দমঘোষ পুত্র প্রভৃতি অন্য ব্যক্তি না করুক। হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন, অতএব তুমি গোপনে বিদর্ভে আগমন পূর্বক সেনাগণে পরিবৃত হইয়া চেদিরাজ ও মগধ রাজের বল সমুদয় নির্মন্থন কর; হঠাৎ বীর্যস্বরূপ শুল্ক দ্বারা ব্রাহ্ম বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ কর। যদি বল তুমি অন্তঃপুরমধ্যচারিণী, অতএব তোমার বন্ধুগণকে নিহত না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব? তাহার উত্তর বলি। বিবাহ পূর্বদিনে মহতী কুলদেব যাত্রা হইয়া থাকে, যে যাত্রায় নববধূকে পুরীর বাহিরে অম্বিকার মন্দিরে গমন করিতে হয়, অতএব অম্বিকার মন্দির হইতে আমাকে হরণ করা অতি সুকর।'

পতিব্রতা ধর্ম

অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা চিন্তা প্রভৃতি বিখ্যাত পতিব্রতা। পতিব্রতা ধর্ম স্ত্রীলোকদিগের এত আদরণীয় যে নীচ জাতীয়া নারীরা এ ধর্ম অভ্যাস করে। ফুল্লরা খুল্লনা প্রভৃতি নারীরা পতিপরায়ণা ছিলেন, ঈশ্বরেতেই আত্মা অর্পণ করিলে জীবন নানা শুদ্ধভাবে পূর্ণ হয়। কেহ নিরাকার ব্রহ্ম কেহ সাকার ব্রহ্ম অবলম্বন করে। কিন্তু নিরাকার হউক অথবা সাকার হউক, অন্তরে অভ্যাসের বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে থাকে। যে সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহাদিগের অনেক কার্য স্বভাব বশত বা সংস্কারাধীন হইতে পারে, অথবা এমন হইতে পারে যে সাকার উপাসনা নিরাকার ভাবের সোপান।

অহল্যাবাই

অহল্যাবাই মহারাষ্ট্র দেশে মালহর রায়ের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের বিয়োগ হইল, ও কন্যার স্বামীর কাল হওয়াতে তিনি সহমরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যাবাই কন্যাকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার কথা শুনিলেন না। মাতা তখন শান্ত হইয়া কন্যার সহমরণ বসিয়া দেখিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে অহল্যাবাই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া রাজকার্য করিতেন। প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করণান্তর গ্রন্থাদি পাঠ শুনিতেন, পরে ব্রত নিয়মাদি সাঙ্গ করিয়া দান করিতেন। মৎস্য মাংস খাইতেন না। আহারের পরে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া কেবল গলায় এক ছড়া হীরকের চিক দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন। বেলা ২টা অবধি ৬টা পর্যন্ত রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রজাদিগের প্রাণ ও বিষয় রক্ষা করা ও তাহাদিগের নিকট হইতে অল্প কর লওয়ায় তাহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী ছিলেন; এজন্য তাহাদিগের সকলের কথা আপন কর্ণে শুনিয়া হুকুম দিতেন। ৬টার পর তিনি আত্মোন্নতিতে নিযুক্ত থাকিতেন। পুরাণ শ্রবণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বলিতেন ঈশ্বরের নিকট আমার সর্ব কার্যের জবাব দিতে হইবে, এজন্য তাহার অভিপ্রায়ের কিছু যেন অন্যথা করা না হয়।

তিনি সত্যকে আদর করিতেন ও তোষামোদকে ঘৃণা করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাহার প্রশংসা করিয়া এক পুস্তক লিখিয়া তাহাকে প্রদান করিলে, তিনি ঐ পুস্তক নর্মদা নদীতে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন ঈশ্বরপরায়ণা নারী ছিলেন, তেমনি তাহার বিষয়কার্যে পরিষ্কার বুদ্ধি ছিল। তিনি উত্তম উত্তম কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজকার্য ৩০ বৎসর নিরুদ্বেগে নির্বাহিত হইয়াছিল—কাহার সহিত বিবাদ কলহ ও যুদ্ধ হয় নাই। অহল্যাবাই অনেক মন্দির ধর্মশালা দুর্গ কূপ ও রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার দয়া কেবল মানব জাতিতে ছিল না। পশু পক্ষীদের প্রতি তাহার বিশেষ কৃপা ছিল। পশু পক্ষী ও মৎস্যের আরামের জন্য তিনি অনেক যত্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সংযুক্তা

সংযুক্তা রাজপুত্রবংশীয় জয়চাঁদ রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি পৃথুরাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথু হস্তিনার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন ও অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন মুসলমানেরা দিল্লি আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, পৃথুপত্নী স্বামীকে বলিলেন—'উত্তমরূপে মরিলে চির জীবন লাভ হয়। আপনার বিষয় চিন্তা করিও না—অমরত্ব চিন্তা কর। তুমি শত্রুর মস্তক ছেদন কর। পরকালে আমি অর্ধ অঙ্গ হইব।' পৃথু যুদ্ধে গমন করিলেন। যুদ্ধের ধ্বনি শুনিয়া তাহার নারী বলিলেন, পতিকে আর আমি এখানে দেখিতে পাইব না—তাহাকে স্বর্গে দেখিব। এই বলিয়া আপনি অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন।

ক্ষত্রিয় নারীদিগের বীরভাব

ক্ষত্রিয় নারীরা বীরভাবে অনুরাগিনী ছিলেন। স্পার্টা দেশে মাতা পুত্রকে যুদ্ধে গমনকালীন বলিতেন, দেখিও পুত্র! রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিও না। হয় তো জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিও, নতুবা তোমার মস্তক যেন চর্মোপরি আনীত হয়। রাজপুত্র যদুবংশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বংশীয় অঙ্গনারা বীরভাব প্রকাশ করিতেন। উদয়পুরের রানার কন্যা স্বামীকে যুদ্ধে পলায়ন করিয়া আসিতে দেখিয়া দ্বার রক্ষককে বলিলেন, দ্বার বন্ধ কর ও স্বামীকে বলিলেন আপনার কর্তব্য এই ছিল, হয় যুদ্ধে জয়ী হওয়া, নয় যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করা—পলায়ন করা কাপুরুষের কার্য; বুন্দি রানি যুদ্ধে আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

দ্রোণপর্বে ভীম অর্জুনকে এই বলিয়াছিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় কামিনীরা যে কার্য সাধনের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করেন, এক্ষণে সেই কার্য সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের অন্যপ্রকার শিক্ষা

কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্বশী নাটকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকেরা ভূর্জপত্রে লিখিতেন। তাহাদিগের শিক্ষা নানা বিষয়ে হইত। ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতী, পাটীগণিত ও লীলাবতী গ্রন্থ লেখেন। মণ্ডন-মিশ্রের স্ত্রী তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, কারণ যখন মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্যের বিতণ্ডা হয়, তখন তিনি মধ্যস্থ হয়েন। বিদ্যতমা কালিদাসের স্ত্রী ছিলেন, তিনিও বিদ্যাবতী ছিলেন। মিহিরের স্ত্রী খনা জ্যোতিষ বিদ্যা ও

তাহার বচনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। মীরাবাই চিতোরের রানি বড়ো কবি ছিলেন। তিনি জয়দেবের ন্যায় মিষ্ট কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজার স্ত্রী পদ্মাবতী, চৌষট্টি শিল্প ও চতুর্দশ বিদ্যা জানিতেন।

মালাবারে চারি জন সহোদরা স্ত্রীলোক বিখ্যাত হন। তাহাদিগের মধ্যে আভির সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি নীতি কাব্য ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক লেখেন। ঐ সকল পুস্তক পাঠশালাতে পাঠ্য পুস্তক হইয়াছিল। তিনি ভূগোল, চিকিৎসা, কিমিয়া ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার অন্যান্য ভগিনীরা নীতি ও অন্যান্য বিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কাশীতে হট্টি বিদ্যালঙ্কার নামে একজন বিখ্যাত স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি স্মৃতি ও ন্যায়জ্ঞ ছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূদিগের যেরূপ শিক্ষা হইত, তাহা উল্লিখিত হইল। ঈশ্বর তাহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য;—ব্রহ্মানন্দের জন্য তাহাদিগের ধ্যান, জপ ও সর্বপ্রকার অন্তর অভ্যাস হইত। আয়, ব্যয়, শান্তিরক্ষা, পাক করা, আতিথ্য-করণ ইত্যাদি গৃহকার্য যাহা দ্রৌপদী সত্যভামাকে বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করিয়াছিলেন, সদ্যোবধূরা সেই সমস্ত গৃহকার্য বিশেষরূপে জানিতেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণিস্থ স্ত্রীলোকেরাও নানাপ্রকার বিদ্যা শিখিতেন। দশকুমারে লেখে যে স্ত্রীলোকেরা বিদেশীয় ভাষা, চিত্রকলা, নৃত্য-বিদ্যা, সঙ্গীত, নাট্যশালায় অভিনয়করণ, আয় ব্যয় বিষয়ক, তর্কবিদ্যা, গণনা বাক্য-বিন্যাস, পুষ্পবিদ্যা, সৌগন্ধ ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণ, জীবিকা নির্বাহক—অর্থকরী বিদ্যা ইত্যাদি শিখিতেন। কাব্য গ্রন্থতে চিত্রশালা, নৃত্যশালা ও সঙ্গীতশালার উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্জুন বিরাটের কন্যাদিগকে নৃত্য ও সঙ্গীত শিখাইয়া ছিলেন। নৃত্য, গান ও সমাজে গমন জন্য স্ত্রীলোকেরা মিষ্টরূপে আলাপ করিতে পারিতেন। বিষ্ণু পুরাণে লেখে যে, অঙ্গনাগনের কথা সুমধুর ও সঙ্গীত স্বরূপ।

কালেতে স্ত্রীলোকদিগের উপনয়ন ও বেদ অধ্যয়ন বিলুপ্ত হইল। পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তক হইল। কালেতে স্ত্রীলোকদিগের নিরাকার ব্রহ্ম লোপ হইলেও ব্রহ্মধ্যান, অনন্ত ও বিস্তীর্ণরূপে না হইয়া পরিমিত ও সাকার ব্রহ্মোতে চিত্ত অর্পিত হইল। তথাচ স্ত্রীলোকদিগের আত্মার অমরত্ব ও পরলোক ব্রহ্মানন্দ ভোগ, এ বিশ্বাস দৃঢ় রূপে হৃদয়ে বদ্ধ থাকিল। এই কারণ বশত তাহাদিগের অন্তরে যে নির্মল স্রোত বহিতে ছিল, তাহা বহিতে লাগিল। উপনিষদের জ্ঞান-সুধা, পুরাণের ভক্তি-সুধার সহিত মিলিত হইয়া ভক্তির প্রবলতায় আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃতি হইতে অতীত হয় নাই, সুতরাং ভক্তির প্রাবল্য ও আত্মার অনন্ত জ্ঞানের খর্বতা হইয়াছিল।

স্ত্রীলোকদিগের সম্মান

এদেশে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে একভাবে ছিল। বেদেতে, মনুতে ও পুরাণে স্ত্রীলোকদিগের সম্মানের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মনু বলেন স্ত্রীলোক যথার্থ পবিত্র। স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী সমান। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমানা। স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই শুদ্ধ। যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান, সেখানে দেবতারা তুষ্ট। যে স্থানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত, সেখানে সকল ধর্মের ভ্রষ্টতা।

বিবাহিতা স্ত্রীলোক পিতা কর্তৃক, ভ্রাতা কর্তৃক, স্বামী কর্তৃক ও দেবর, ভাসুর কর্তৃক, সম্মানিত ও পূজিত হওয়া কর্তব্য। স্ত্রীলোক 'ভবতি ও প্রিয় ভগ্নি বা মাতা' বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্রে পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অগ্রে যাইতে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির আপন কিঙ্করীকে 'ভদ্রে' বলিয়া ডাকিতেন। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক নিষেধিত না হইলে, কথোপকথন করিতে পারিত। কিন্তু স্বামী বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী অন্যের বাটীতে উৎসব ও যেখানে বহুলোকের সমাগম, সেই সকল স্থানে না যাইয়া আপন গৃহে থাকিয়া ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজারা স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ভরত, রামচন্দ্রের নিকট বনে গমন করিলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান পূর্বক ব্যবহার করিয়া থাক তো?' যখন যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাজ্যেতে দুঃখিনী অঙ্গনারা তো উত্তমরূপে রক্ষিত হয় ও রাজবাটীতে স্ত্রীলোকেরা তো সম্মানপূর্বক গৃহীত হয়?' স্ত্রীলোক, রক্ষক-বিহীনা হইলে রাজা দ্বারা রক্ষিত হইতেন। মনু কহেন 'কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী।' ভীষ্ম কহেন—মাতা ইহ ও পরলোকের মঙ্গলকারিণী। পীড়িত ও দুঃখিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই। স্ত্রী পরম ঔষধি; আধ্যাত্মিকতা অর্জনে স্ত্রী অপেক্ষা সহযোগিনী নাই। মনু ও রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক আপন শুদ্ধ মতিতেই রক্ষিত হয়, বদ্ধ থাকিলে রক্ষিত হয় না, কথাসরিৎসাগরে এক গল্পে লেখে যে, যখন এক বর কন্যা বিবাহ করিয়া আসিলেন, কন্যা কহিলেন—দ্বার উদঘাটন কর, বন্ধুবান্ধবের সমাগম হউক। স্ত্রীলোক অন্তর বলেতেই রক্ষিত হয়। বন্ধনের আবশ্যক নাই। ডাক্তার উইলসন আমাদিগের ভাষা ও শাস্ত্র উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দুজাতীয় মহিলাগণ যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, এরূপ আর কোনো প্রাচীন জাতিতে হয় নাই। স্ত্রীলোক সকল নাটকে কবিতাতে উৎকৃষ্ট ও উচ্চরূপে বর্ণিত। তাহারা পুরুষদিগের নিয়ামক ও পুরুষেরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিত।

পুনর্বিবাহ, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য

ঋগ্বেদের সময় সহমরণ ছিল না। যিনি বিধবা হইতেন, তিনি স্বামীর মৃতদেহের সহিত কিয়ৎকালের জন্য স্থাপিত হইয়া উঠিয়া আসিতেন। পরে তিনি অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। ঋষিরা বিধবা বিবাহ করিতেন। অনন্তর বিধবার পুনর্বিবাহ, পতিপরায়ণা নারীদিগের বিষতুল্য জ্ঞান হইতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিলেন বৈবাহিক বন্ধন কেবল ঐহিক বন্ধন নহে—ইহা ঐহিক ও পারলৌকিক বন্ধন। পতি সাকার হউক বা নিরাকার হউক, সেই পতির সহিত মিলিত হইয়া, লোকান্তরে দুই জনে উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অতএব এই বিশুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া পশুবৎ ভাব গ্রহণ পূর্বক, পশুবৎ হইয়া অধোগতি প্রাপ্তির কি আবশ্যক? বৈবাহিক বন্ধনে স্ত্রী ও স্বামী, পরস্পরের অর্ধেক শরীর, অর্ধেক জীবন, অর্ধেক হৃদয়। এইরূপ চিন্তা সতীর হৃদয়ে মন্থিত হইলে, সহমরণের প্রথা প্রচলিত হইল। বিধবার এই বাসনা যে, স্বর্গে স্বামীর সহিত বাস করাই শ্রেষ্ঠ কল্প ও তাহার সহযোগে, তাহার পিতৃ ও মাতৃকুল পবিত্র করা, উচ্চ কার্য। বিধবারা শারীরিক ও মানসিক ভাব পরিত্যাগপূর্বক, আত্মবলে বলীয়ান হইয়া, আত্মার চক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের মাহাত্ম্য দৃষ্টি করত—চিতারূঢ় হইয়া, দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

পট্টবস্ত্রপরিধানা—কপালে সিন্দুর, হস্তে বটশাখা, রসনা ধ্বনি করিতেছে—'হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্—এ জগৎ মিথ্যা—আমার পতিই আমার সর্বস্ব—যে রাজ্যে তিনি আছেন, আমি সেই রাজ্যে যাই। সত্যং সত্যং সত্যং।' এই ধ্যান ও এই গভীর ভাব প্রকাশে, সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন হইত ও দগ্ধ হইবার অগ্রে নারীর আপন আত্মা ইচ্ছাবলে, শরীর ও মন হইতে বিভিন্ন হইত।

কিয়ৎকাল পরে মনু এই বিধি দিলেন যে, বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য উত্তম কল্প, কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, সহিষ্ণুতা অভ্যাসিত হইতে হইতে আত্মার উন্নতি সাধন হয়। যদবধি পতি ছিল, তদবধি পতির সহিত এক মন, এক প্রাণ, এক শরীর হইয়া থাকাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে পতির প্রীতার্থে, ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করিলে নিরাকার পতিকে হৃদয়ে আনয়ন করা হয় ও অভ্যাস নিষ্কাম ভাবে পরিচালিত হইলে আত্মার বল ও শক্তির বৃদ্ধি অনিবার্য।

বিবাহ

পূর্বে স্ত্রীলোকেরা পতিমর্যাদা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইলে বিবাহ করিতেন না। শাস্ত্রে লেখে 'কন্যা যত দিন পতিমর্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম শাসনে অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।' যে সকল সদ্যোবধূর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা যৌবনাবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবক ও যুবতী পরস্পর সন্দর্শন করিয়া ও পরস্পরের স্বভাব, চরিত্র গুণ ইত্যাদি জানিয়া, পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে বিবাহ করিতেন। রামচন্দ্রের বনবাসকালীন অযোধ্যা সর্বপ্রকারে নিরানন্দে মগ্ন ছিল। বাল্মীকি লেখেন, যে সকল উদ্যানে যুবক ও যুবতী আমোদার্থে ও পরস্পর সন্দর্শনার্থে গমন করিতেন, তাহা এক্ষণে শূন্য রহিল।

ক্ষত্রিয়েরা বীরত্ব সম্মানার্থে কন্যাকে স্বয়ম্বরা করিয়া বিশেষ বিশেষ পণ করিতেন। রামধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন। অর্জুন, লক্ষ্যভেদ করত দ্রৌপদী লাভ করেন। স্বয়ম্বর সভায় কন্যা, ধাত্রির নিকট সকলের পরিচয় পাইয়া ও রূপ দেখিয়া, যাহার প্রতি মনন করিতেন, তাহার গলায় বরমাল্য দান করিতেন।

রঘুবংশে ৬ষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর, ও নৈষধের ২১ সর্গে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বিবরণ লিখিত আছে।

পূর্বে কন্যা, স্বয়ম্বরা না হইয়াও ইচ্ছামতো পাত্রে পাণি প্রদান করিতেন, যথা—সাবিত্রী, দেবযানি, রুক্মিণী, শুভদ্রা ইত্যাদি। দশকুমারে লেখে যে, কন্যা সুশিক্ষিত হইয়া আপন স্বেচ্ছাক্রমে বর গ্রহণ করিতেন।

বিবাহ অষ্ট প্রকার ছিল।

১। ব্রাহ্ম—সুপাত্রে কন্যা দান।

২। দৈব—পুরোহিতকে কন্যা দান।

৩। ঋষি—দুইটা গোরু পাইয়া কন্যা দান।

৪। প্রজাপত্য—সম্মান পূর্বক্ কন্যা দান। পিতা এই আশীর্বাদ করিতেন—বর কন্যা তোমরা দুই জনে মিলিত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম করিবে।

৫। আসুর—ধন পাইয়া কন্যা দান।

৬। গান্ধর্ব—বর ও কন্যার স্বেচ্ছামতে বিবাহ।

৭। রাক্ষস—কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ।

৮। পৈশাচ—কন্যা নিদ্রিত, উন্মত্ত অথবা ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে, তাহার সহিত বিবাহ।

প্রথম ছয় ব্রাহ্মণদিগের, শেষ চারি ক্ষত্রিয়দিগের, ও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রকার বিবাহ অন্যান্য শ্রেণির জন্য বিহিত হইয়াছিল।

উচ্চ জাতিস্থ লোকেরা নিম্ন জাতিকে বিবাহ করিতে পারিত। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিত।

ব্রাহ্মণের কন্যা, নীচ জাতিকে বিবাহ করিলে তাহাকে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। তিনি স্বামীর সহিত সকল বৈদিক কার্য নির্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী ভার্যা হইলে, তিনি সকল বৈদিক কার্যে গৃহীত হইতেন না। ব্রাহ্মণের নানা বর্ণীয় স্ত্রী থাকিলে, উপাসনা প্রভৃতি তাহাদিগের বর্ণানুসারে হইত। যদি কোনো স্ত্রী, উচ্চ জাতীয় ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইত আর নীচ জাতীয় লোকের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বাটীতে রুদ্ধ থাকিতে হইত। এই নিয়ম কতদূর প্রবল ছিল, তাহা বলা কঠিন, কারণ অসবর্ণ বিবাহ পূর্বে প্রচলিত ছিল।

উত্তম স্ত্রীর লক্ষণ, মনু বলেন—জ্ঞান, ধর্ম, পবিত্রতা, মৃদুবাক্য, ও নানা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা। এবম্প্রকার অঙ্গনা, রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল হয়েন। মনু ও ভীষ্ম বলেন যে, নীচ জাতিতে উত্তম স্ত্রীলোক থাকিলে, তিনিও উচ্চ জাতি দ্বারা গ্রহণীয়। বিবাহে কন্যার সম্মতির আবশ্যক হইত। বিবাহকালীন, বর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাকে কে দিতেছেন—প্রেম অথবা আপন ইচ্ছা? উত্তর প্রেম দাতা, প্রেম গৃহীতা। তাহার পর, বর বলিতেন—তোমার চিত্ত আমার চিত্ত হউক। বিবাহের এক নিয়ম এই যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি শুদ্ধাচার অনুষ্ঠান পূর্বক বৈবাহিক শপথ রক্ষা করিবেক। রণে, যদ্যপি রাজা শত্রুর কন্যাকে জয় লাভ করিযা আনিতেন, তথাপি তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। পূর্বে কোনো কোনো বিদুষী এই পণ করিতেন, যাহারা তাহাদিগকে পাণ্ডিত্যে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাদিগের গলায় তাহারা বরমাল্য অর্পন করিবেন। এ কারণ স্ত্রী-লাভ করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হইত। ক্রমে বিদ্যার অনুশীলন এতদূর হইয়াছিল যে, কোনো কোনো রানি পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিতেন। কর্ণাটের রানি এইরূপ বিদ্যার চর্চা করিতেন ও কাশ্মীরের রানি সামদেবকে কথাসরিৎসাগর লিখিতে আদেশ করেন। এক বিবাহ শ্রেয়ঃকল্প ও বহুবিবাহ করা শ্রেয়ঃকল্প নহে। রামায়ণ ও মহাভারতে লেখে, এক পত্নী গ্রহণই উৎকৃষ্ট প্রথা ও উচ্চগতি প্রদ—স্ত্রীর নামই ধর্মপত্নী, কারণ স্ত্রীর সহিত ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনে পুরুষ নিযুক্ত থাকিবে। এক পত্নী হইলে, পুরুষ তাহাকে আপন হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া তাহার সহিত বন্ধন ক্রমশ দৃঢ়ীভূত করিবেক। অবশেষে, স্মৃতিকারকের এই ধার্য কবিলেন যে, স্ত্রী সুরাপায়ী, অধার্মিক, মন্দকারিণী, অপ্রিয়া, বন্ধ্যা, চিররোগী অথবা অপব্যয়ী হইলে, অন্য স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু যদি প্রথম স্ত্রী, ধার্মিকা ও পীডিতা হয়েন, তবে তাহার অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় বিবাহ হইত।

স্ত্রীলোকের বাহিরে গমন

ঋগ্বেদে প্রকাশ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা সালঙ্কৃতা হইয়া উৎসব ও বিদ্যানুরঞ্জন সভাতে গমন করিতেন। মহাবীর চরিতে লিখিত আছে যে, ঋষি কন্যা ও পত্নী সকল, পিতা ও স্বামীর সহিত ভোজে ও যজ্ঞে গমন করিতেন। প্রকাশ্য স্থানে মঞ্চোপরি স্ত্রীলোক বসিয়া মল্লযুদ্ধ ও বাণ শিক্ষা ইত্যাদি দেখিতেন। কি মৃগয়ায়, কি যুদ্ধস্থানে, কি শব-সৎকারে, কি যজ্ঞস্থানে, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা পাণ্ডবদিগের শিবিরে ছিলেন। দ্রৌপদীর বিবাহ বিবেচনার্থে, দ্রুপদের সভায় কুন্তি উপস্থিত থাকিয়া আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজসূয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞে ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময়ে নারীরা উপস্থিত ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ছিল ও যুবতীরা সভার মধ্যে ইতস্তত বেড়াইয়া ছিলেন।

রানিদিগের রাজ্য গ্রহণ

প্রকাশ্য সভাতে, রানি রাজার বামদিকে সিংহাসনে বসিতেন। রাজপুত্র না থাকিলে রাজকন্যা সিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন। প্রেমদেবী নামে একজন রাজবংশীয় নারী দিল্লির সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নেপালে, তিন জন অঙ্গনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজকার্য করেন। তাহাদিগের মধ্যে রাজেন্দ্রলক্ষ্মী অতি উচ্চ ছিলেন। সিংহলেও কয়েকজন রানি রাজকার্য করিয়াছিলেন, এবং মহারাষ্ট্রে অহল্যাবাই রাজকার্য করেন। তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে।

পুরাণে, স্ত্রীরাজ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। হিখখোফ নামে একজন চীন ভ্রমণকারী এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি কহেন—যেখান হইতে গঙ্গা ও যমুনা নামিতেছে, তাহার নিকট স্ত্রীরাজ্য, ঐ রাজ্য স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত হইত। মালদ্বীপ, একজন রানির দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল।

পরিচ্ছদ ও গমনাগমন

এখনকার রাজস্থানের নারীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ বৈদিক সময়ে অঙ্গনাদিগের ছিল। ঘাগরা, কাঞ্চুলি ও চাদর। চাদরে মস্তক অবধি ঢাকা থাকিত। সীতা যখন রাবণ কর্তৃক হৃত হন, তখন তাহার মস্তকের আবরণ, চিহ্ন রাখিবার জন্য ভূমিতে ফেলিয়া দেন। যখন জয়দ্রথ, দ্রৌপদীকে হরণ করেন, তখন তিনি তাহার ঘাগরা ধরিয়া ছিলেন। মনু বলেন—স্ত্রীলোক বাহিরে গমন করিতে গেলে, শরীরের উপরের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া যাইবেক না। ঋগ্বেদে এক সূত্রেতে প্রকাশ হইতেছে যে, অঙ্গনাগণের মস্তকের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত। মহারাষ্ট্র, কাশী প্রভৃতি দেশে অঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ পূর্ববৎ আছে। পূর্বে কেবল এক শাড়ি পরা প্রথা ছিল না।

পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা রথে, অশ্বে ও গজে আরোহন করিতেন। অশ্বে আরোহন করা, বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে।

মাঘ কাব্যে লেখে যে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিয়মিত রাজারা আপন আপন অশ্বরূঢ়া মহিষী সঙ্গে লইয়া আসিয়া ছিলেন।

কল্কিপুরাণে লেখে, স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধ করিতেন।

বৌদ্ধমত

বেদের অনুশীলনকালীন পুরোহিতের সৃষ্টি হইল। ক্রমে পুরোহিতরা আপন আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত গুরুর স্বরূপ; কিন্তু—

'গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভা গুরবো দেবী শিষ্যসন্তাপহারকাঃ।।

অনেক গুরু আছেন যাহারা শিষ্যের চিত্ত অপহরণ করেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণ করিবার জন্য গুরু দুর্লভ।

সকল ধর্মশিক্ষক নিষ্কাম রূপে শিক্ষা দেন না অথবা সকল ধর্মশিক্ষকও শিষ্যের সন্তাপ হরণ করিতে পারেন না; কিন্তু অনেকেই আপন ক্ষমতাতে উন্মত্ত হয়েন। সেইরূপ বৈদিক পুরোহিত প্রতাপান্বিত হওয়ায় সাধারণ সমাজের ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন। বিশ্বামিত্র ও জনক বেদের দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি, তিনি বেদের লেখকদিগকে ভাঁড়, বঞ্চক ও ভূত বলিলেন ও ব্রাহ্মণেরাও অন্ত্যজ রূপে বর্ণিত হইলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ মতের সৃষ্টি হইল। বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগকে মাংসাশী, মদ্যপায়ী ও জাতি অনুরাগী দেখিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত অহিংসা পরম ধর্ম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক—যাহা আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, তাহা তাহাদিগের হৃদয়ে শীঘ্র সংলগ্ন হইল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকেরা বলিল যে, জীবনের উদ্দেশ্য নির্বাণ—যোগ ও ধ্যান ইহার পথ। এই উপদেশ শুনিয়া বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইল। ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইল। বৌদ্ধ ধর্ম, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন হইতে গৃহীত। সাংখ্যদিগের ন্যায় বৌদ্ধেরা প্রথমে নিরীশ্বর ছিলেন, পরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিলেন। ক্রমশ তাহারা আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের উদ্দেশ্য একই। যাহাকে হিন্দুরা জীবন্মুক্তি বলেন তাহাকেই বৌদ্ধেরা নির্বাণ কহেন। এই অবস্থাতেই ভবনদী পার—এই অবস্থাতেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও অন্তর জ্ঞান পূর্ণ—এই অবস্থাতেই স্থূল শরীর বিগত ও সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন। পূর্বে ভারতভূমি ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূর দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়াছিল; এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা দেখিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ হিংসা ও দ্বেষ শূন্য, এবং অনেকেই ঐ ধর্ম মতাবলম্বী হইলেন। মহাপ্রজাপতি অশোক রাজার কন্যা, ও অনেক স্ত্রীলোক এই ধর্মের অনুগামিনী হইলেন। তাহারা প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় পুরুষের সহিত বিচার করিতেন। যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজা ছিলেন, তখন স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত বাহিরে যাইতেন।

মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যদেব এই কথা লেখে—'নাগরীয় লোকেরা আপন আপন বনিতা সঙ্গে লইয়া, আমোদার্থে বাহিরে আইসে না কেন?' বৌদ্ধ নীতি গ্রন্থে লিখিত আছে—উত্তম স্ত্রী, মাতা, ভগিনী ও সখী স্বরূপ। লঙ্কা দ্বীপ হইতে, বৌদ্ধ নারীরা বিবাহার্থে ভারতবর্ষে জাহাজে আসিতেন।

রানিদিগের গৃহ

যে প্রকার গৃহে রানিরা থাকিতেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়।

'কোনো স্থানে শুক ও ময়ূরগণ ক্রীড়া করিতেছে, কোনো স্থানে বক ও হংসগণ শব্দ করিতেছে, কোনো স্থান নানাপ্রকার লতা দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে, কোনো স্থান চম্পক

ও অশোক প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, কোনো স্থান বা নানা বর্ণরঞ্জিত চিত্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। কোনো স্থান বা উৎকৃষ্ট গজদন্ত রজত ও সুবর্ণময় বেদি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, কোনো স্থানে বা সতত বিরাজমান পুষ্পফল পরিশোভিত বৃক্ষ সকল ও মনোহর সরোবর সকল শোভা পাইতেছে, কোনো স্থান বা পরমোৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত রজত ও স্বর্ণময় আসনে এবং উত্তম উত্তম উপাদেয় অন্ন পানীয়ে সুশোভিত হইয়াছে।'

দায়াদি

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে দায়াদি নিয়মাবলি হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, তাহাদিগের সম্পত্তি বিভাগের অংশ বড়ো অল্প হয় নাই। অবিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। তুল্যানুতুল্য মাতৃধনের বিভাগ হইবে। বিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। মাতা, স্বামীর বিষয় তাহার পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। এইরূপ কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী, মাতা, পিতামহীদিগের মধ্যে দায়াদি সম্পত্তি বিভক্ত হইত।

স্ত্রীলোকের বিশেষ সম্পত্তি স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইত। স্ত্রীলোকের ধন কেহ হরণ করিলে, ঘৃণাস্পদ হইত। যিনি স্ত্রীলোকের দ্রব্য অপহরণ অথবা তাহার প্রাণ নাশ করিতেন, তাহার প্রাণদণ্ড হইত। অবিবাহিতা স্ত্রী অথবা বিবাহিতা স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি কেহ দোষারোপ করিলে দণ্ডনীয় হইত। স্ত্রীলোকের রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় হইত।

চৈতন্য

চৈতন্যের অনেক স্ত্রীশিষ্য ছিল। স্ত্রীপুরুষেরা এক বাটীতে থাকিয়া তাহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। চৈতন্যের শিক্ষা—ভক্তিভাবক, স্ত্রীলোকেরা ঐ শিক্ষা পাওয়াতে অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের মাতা উচ্চ স্ত্রীলোক ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে তাহার এইরূপ বর্ণন আছে।

'জগন্নাথের ব্রাহ্মণী তেঁহ, মহা পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ, যেন জগন্মাতা।।
রন্ধনে নিপুণা তা সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্র সম স্নেহ করে সন্ন্যাসী ভোজনে।।'

উপসংহার

আর্য জাতীয় মহিলাগণের পূর্ব বৃত্তান্ত পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাহাদিগের শিক্ষা, আচার ও ব্যবহার আধ্যাত্মিক—যাহা কিছু শিখিতেন ও করিতেন তাহা ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতেন—ইহা পৌত্তলিক অথবা অপৌত্তলিক ভাবে হইতে পারে কিন্তু অন্তর অভ্যাসের ফললাভ অবশ্যই হইত। এইরূপ অভ্যাস বহুকালাবধি হওয়াতে স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ে নিষ্কাম ধর্মানুষ্ঠান করা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই জন্য সহমরণ, ব্রহ্মচর্য, ব্রত, নিয়মাদি ও পতিপরায়ণত্ব অনুষ্ঠিত হইত। নিষ্কামভাবই আত্মার প্রকৃত বল।

'ঋগ্বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যদ্দ্বারা অবিনাশী পরমব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ

বিদ্যা।' গার্গীর এই উপদেশ 'যেনহাং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং'—যাহার দ্বারা অমৃত তত্ত্ব না পাইব, তাহা লইয়া কী করিব? উক্ত বেদ প্রেরণা ও উপদেশ হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে যেন মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, বাহ্য আড়ম্বরীয় বা অনুকরণীয় শিক্ষা তাহাদিগের চিত্তে বিতৃষ্ণারূপ প্রবেশ করে ও অনাদরপূর্বক গৃহীত হয়। যে উপদেশ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলজনক না হয়, যে উপদেশে ও অভ্যাসে আত্মার শান্তপ্রকৃতি উদ্দীপন করে না—সে উপদেশ ও অভ্যাস হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে স্থায়ী হয় না। যেরূপ স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ও অন্তর যেরূপ আধ্যাত্মিক সলিলে ধৌত হইতেছে, সেইরূপ উপদেশ না পাইলে কখনই গৃহীত হইবেক না।

বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর পরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য। ঈশ্বর পরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্য এদেশের মহিলাগণ পূর্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে? ও সর্বত্যাগী হইয়া, ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্য জাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বর পরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্বদা স্মরণ করা। তাহাদিগের ন্যায় সম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর, ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও। বিষয়ানন্দ, বাসনানন্দ ত্যাগপূর্বক ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। ধ্যানাৎ পরতরং নহি—ধ্যানের অপেক্ষা কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। ধ্যানই অন্তর যোগ। ধ্যানেতে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, ও মালিন্যের বিনাশ, আত্মার উদ্দীপন ও ঈশ্বরের সহিত সংযোগ।

ভব-ভাবনা ভেবনা, ভৌতিক ভাবনা,
ভাব ভাব ভাবাতীত, যিনি নাশেন ভাবনা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮২০—১৮৯১

পুরাতন লোকাচার

অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা দান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়, দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলন করিয়াছেন।

ইহাতে এপর্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধিকৌশলে এমত কঠিনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্তপুরুষ পর্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।

ইহাতে যদি কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিরকাল বাল্যবিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতি অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালাচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয়প্রযুক্ত ক্ষয় পায়, ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র

হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমাদিগকে এ দূরবস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভ দিনই বা কত কালের পর উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধহয়, কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভ দিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদ্যপি সর্বদাই লিখন পঠন ও পর্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিরাকরণের কোন সদুপায়-স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত মৃত্তিকা খনন করিলে কত দিন বারি বিনির্গত না হইয়া রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সঙ্ঘর্ষণ করিলে কতক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পারে? এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কত দিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

আমরা অন্তঃকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বাল্যবিবাহের বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্বজীবেরই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিবন্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেতর রক্ষণাবেক্ষণপূর্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তিনিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যজাতীয়েরা এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।

জগৎসৃষ্টির কত কাল পরে মনুষ্য জাতির এই বিবাহসম্বন্ধের নিয়ম চলিত আত্মপরবিবেক হইয়াছে, যদ্যপি তদ্ববিশেষ নির্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এই মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে; বর্তমান বিবাহ-নিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতামাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্তবিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালের কন্যার ভাবি সুখ দুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারে

দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতর চরিত্রপরিচয়ের কথা দূরে থাকুক; একবার অনোন্য নয়ন-সঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতা মাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এইজন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধনে অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।

অপ্রমত্ত শরীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগ্বর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীত-শৈশবে জায়া-পতি-সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভাবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যযুক্ত সংসার যাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এইপ্রকার বিড়ম্বনা সঙ্ঘটন হইয়া তাকে।

অস্মদেশীয়েরা ভূমণ্ডলমধ্যস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু ক্ষীণ দুর্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতামাতা সবল ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সবল হইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না, যেমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য বীজ রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকাল বপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসঙ্গতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবন্ত বীরপুরুষের অসম্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই

ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্বকালে প্রায় সর্বজাতিমধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব আসুর রাক্ষস পৈশাচ, এই বিবাহচতুষ্টয় অধিকতম প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল, এবং সেই সমুদায়প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জ্ঞাত আছি, তদ্দেশে অদ্যাপি প্রায় সর্বজাতিমধ্যে বরকন্যার অধিক বয়সে বিবাহকর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোন অসঙ্গতি না থাকাতে তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ, পশ্চিদেশীয়েরা যখন অন্যবিধ জীবিকার উপায় না পায়, তখনি রাজকীয় সৈন্যশ্রেণীতে ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকের দৌবারিকতাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্যভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এইজন্যই রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমারদিগের অপেক্ষাও ভীরু এবং দুর্বলস্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগের মধ্যেও এতদ্দেশের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব পাশ্চাত্য লোকের সহিত আমাদিগের ও উৎকলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতাদৃশ গুরুতর ইতরবিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বাল্যপরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষণের কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তদ্দেশীয়েরাই দুর্বল ও সাহসবিহীন হয়, এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, তদ্দেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অস্মদ্দেশীয় বালকবালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশবকালে যেরূপ স্ব স্ব প্রসূতির অনুগত থাকে, পিতা বা অন্য গুরুজনের নিকট তাদৃশ অনুগত হয় না। শিশুগণের নিকটে সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ অনুকূলরূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রীসমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষসমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী বা সন্তুষ্ট হয় না। অতএব স্তন্যপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃ-মুখ-চন্দ্রমণ্ডল হইতে সরল উপদেশসুধা স্বাদ করিতে পায়, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুযাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের হৃদয়ে জননীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকতাশক্তি থাকাতেই ইউরোপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভ্যলক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অস্মদ্দেশ হইতে বাল্যবিবাহের

নিয়ম দূরীভূত না হইবে, তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটিবে না। আমরা অবগত আছি, কোন কোন ভদ্রসন্তানেরা স্ব স্ব কন্যাসন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অন্তগত হইয়া যায়। পরে গৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেশন ও অন্যান্য পরিচর্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী কটাহ দর্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। ফলতঃ সেই কন্যাদিগের পিতামাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহনিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতামাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষা দান বিষয়ে যেরূপ উদ্‌যোগ করিবেন, তদ্রূপ বাল্যবিবাহপ্রথার উচ্ছেদ করণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাল্যকালে বিবাহ করিলে আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমতঃ বিবাহঘটিত আমোদপ্রমোদ ও কেলিকৌতুকে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দশ ভুবন শূন্যময় প্রতীত হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসৎ কর্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়, তাহাতেও নিতান্ত পরাঙ্মুখতা না হইয়া, বরং বারবার প্রবৃত্তি জন্মিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বাস্তবিক সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও কতকগুলি আপোগণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা দুষ্ক্রিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আর ঐরূপ দুরবস্থাকালে পরম প্রীতির পাত্র পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয়। তখন কাজে কাজেই পিতৃসত্ত্বে তাঁহার অধীন, কখন বা সহোদরদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখন বা আত্মীয়বর্গের ভারস্বরূপ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে পদে অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় করিতে হয়। অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূহে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?

যদ্যপি কোন ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্মদ্দেশে বাল্যপরিণয়প্রথা না থাকিলে বালক বালিকাদিগের দুষ্কর্মাসক্ত হইয়ার সম্ভাবনা, একথায় আমরা একান্ত ঔদাস্য করিতে পারি না; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাল্যকালবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুষ্ক্রিয়াপ্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদাসৎ কর্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিচার জন্মে এবং বিবেশশক্তির প্রাখর্য বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে অসদিচ্ছার উদয় হইবার অবসর কোথায়? অতএব অপক্ষপাতী হইয়া বিবেচনা করিলে এতাদৃশ পূর্বপক্ষই উপস্থিত হইতে পারে না।

কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যু ঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি, তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মনুষ্যের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয়, তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতামাতাদিগের তন্নিমিত্ত আশঙ্কার লাঘবও হইতে পারে। যেহেতু অস্মদ্দেশে বিধবা-বেদনের বিধি দৃঢ়তররূপে প্রতিবিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃখ সহন করিতে হয়, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিম্বা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডুষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেনা না। অতএব যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্যবিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে বিবেচনা কর, তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারা নির্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গ বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবনে যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ কত শত হতভাগা কুমারী উপবাসশর্বরীতে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষামোদরী শুষ্কতালু ম্লানমুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ অভাগিনীগণেরও এমত সংস্কারে দৃঢ়তা জন্মে যে, যদি প্রাণবায়ুর প্রয়াণ হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দুমাত্র গলাধঃকরণ করিতে চায় না। অতএব যে সময়ে লালন-পালন শরীর সংস্কারাদি দ্বারা পিতামাতার সন্তানদিগকে পরিরক্ষণ করা উচিত, তৎকালে পরিণয়দ্বারা পরগৃহে বিসর্জন দিয়া এতাদৃশ অসীম দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায্য কর্ম। আর ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতিবিগর্হিত পাপ কার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়-বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্য পরিণয়রূপ দুর্ণয় অস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান্ হউন।

অক্ষয়কুমার দত্ত

১৮২০—১৮৮৬

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা

ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে, যে বাঙ্গালা দেশের উর্বরা ভূমিই অত্রত্য লোকের প্রধান উপজীবিকা। আমরা অরণ্যবাসি অসভ্য লোকদিগের ন্যায় মৃগয়া-মাত্রোপজীবী নহি, ইংরাজদিগের ন্যায় শিল্প-প্রধানও নহি, দেশ দেশান্তর গমনপূর্বক বাহুল্যরূপে বাণিজ্য নির্বাহ করাও আমাদের বৃত্তি নহে। আমরা যেমন নিরুপদ্রব স্বভাব, সেইরূপ জগদীশ্বর আমারদিগকে বহু শস্যশালিনী সুবিস্তৃত ভূমি প্রদান করিয়াছেন। আমরা অশেষ অত্যাচারে পীড়িত হইলেও কেবল তদীয় প্রসাদাৎ অদ্যাপি সজীব রহিয়াছি। ভূমিই আমারদের মূলধন, এবং কৃষকেরাই আমারদের প্রতিপালক। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! যাহারা এমন হিতৈষী, সংসারের এমন সুখ-সঞ্চার তাহারদের দারুণ দুর্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হয় না। তাহারা ভুবন প্রতিপালক হইয়াও আপনারদের উদরান্ন আহরণে সমর্থ হয় না, এক দিবসও নিরুদ্বেগে সুখে যাপন করিতে পারে না। ইহার কারণ অতি ভয়ানক, এবং তাহার অনুসন্ধান করাও যন্ত্রণাজনক। মনুষ্যের বিষপূরিত চিত্ত,—তাঁহার দুনির্বার লোভ রিপুই তাহাদের পরিতাপ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। মনুষ্য যখন লোভ রিপুর বশীভূত হয়েন, তখন পর পীড়াপ্রদান বিষয়ে অরণ্যবাসি হিংস্র জন্তুও তাঁহার নিকট পরাভব মানে। "যে রক্ষক সেই ভক্ষক" এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গালার ভূস্বামীদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের যথাসর্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন। তাহারদের দারিদ্র্যদশা, শীর্ণ শরীর, ম্লান বদন, অতি মলিন চীর বসন, কিছুতেই তাঁহার পাষাণময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না, কিছুতেই তাঁহার কঠোর নেত্রের বারি-বিন্দু বিনির্গত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ন্যায্য রাজস্ব-ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ি রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমণী, পার্বনী, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিষ্পীড়ন করিতে থাকেন। অনেকানেক ভূস্বামি অনাদায়ি ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি স্বরূপে গ্রহণ করেন।[১] প্রতি শতে পঁচিশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি। ইহার অপেক্ষা অনর্থমূলক ব্যাপার আর কি আছে? ইহাতে তাহারদের সর্বনাশের সূত্র সঞ্চার করা,—তাহারদিগকে যাতনাযন্ত্রে পেষণ করা হয়। ভূস্বামির ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত্য, দেবোৎসব বা প্রকারন্তর পুণ্য-ক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত; তাহারদিগকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ

ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা মাঙ্গন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তিনি মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করেন,—ভিক্ষুক নাম গ্রহণ করিয়া দস্যু-বৃত্তি সাধন করেন।[২] যে বৎসর দুই তিনবার এইরূপ ভিক্ষা না হয়, সে বৎসরই নয়। রাজস্ব সঙ্কলনের ন্যায় ইহাও নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সংগৃহীত হয়, এবং তৎপরিশোধে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি জন্মিলেও প্রজাদিগকে অতিশয় অনুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হয়। ভূস্বামি যে উপলক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তাহা নিতান্ত অমূলক হইলেও হইতে পারে,[৩] কিন্তু প্রজাদিগকে তাহা দিতেই হইবে,—তাহারদিগকে সে গুরুতর দুর্বহ ভার প্রাণপণেও বহন করিতে হইবে।

এইরূপ প্রজাদেরও গৃহে কোন কর্ম উপস্থিত হইলে ভূস্বামির খরতর দৃষ্টি তদুপরি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। তাহারা যদি মানস করে, সানন্দ হৃদয়ে প্রিয় পুত্রের বিবাহ দিবে; প্রীতমনে মাতৃ বা পিতৃ কৃত্য সমাধা করিবে; দেব গৃহ, ইষ্টকা গৃহ, দেবোৎসব বা অন্য কোন মঙ্গল কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, তবে ভূস্বামিকে তাহার শুল্কদান না করিলে নিস্তার নাই। ভূস্বামির গোমস্তা গৃহ আক্রমণ করিলে তাহাকে বিদায় না করিয়া কর্মারম্ভ করে কাহার সাধ্য? তাহাকে বিশিষ্টরূপে পরিতুষ্ট না করিলে যজমান ক্রিয়ারম্ভের অনুমতি করিতে পারে না,—পুরোহিতেরও সঙ্কল্প করিতে সাহস হয় না। এইরূপ গ্রামস্থ সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া কোন দেবোৎসবের[৪] উপক্রম করিলেও ভূস্বামির ভাগ সর্বাগ্রে উপস্থিত করিতে হয়।

এইপ্রকার ক্রমাগত নিষ্পীড়িত হইয়া কোন্ ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাতে দান করিতে পারে? ভূস্বামির পুনঃ পুনঃ শোষণের পর দীন দুঃখী প্রজাদের আর কি অবশিষ্ট থাকে, যে তদ্দারা তাহার লোভকুণ্ডে অনবরতই আহুতি প্রদান করিবেক? অতএব তাহারদিগকে ঋণজালে জড়িত হইতে হয়, এবং এ প্রকারও ঘটে যে, যৎকালে কেহ নিতান্ত অপার্যমানে ভূস্বামির দুরন্ত দূত হস্তে বিত্ত সমর্পণ করিতেছে, তৎকালেই উত্তমর্ণের নিষ্ঠুর বাক্য স্মরণ কবিয়া তাহার অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইতেছে।

কেবল ধর্মের কর গ্রহণ করিয়া ভূস্বামী নিরস্ত নহেন; কুকর্মের উপর কর স্থাপন করিয়া ধনোপায়ের প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা 'বাজে আদায়ের' প্রধান অঙ্গ। এ শব্দের কি বিষম তাৎপর্য! কত চুরি, কত কলহ, কত ভ্রূণ হত্যাই বা ইহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে! এই সমুদায় কার্যের সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম সন্ধান পাইলেও তাহার সুশিক্ষিত দূতেরা তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া দারুণ দুর্ব্যবহার সহকারে প্রভু সমীপে উপস্থিত করে। রাজ্যশাসন করা তাহার উদ্দেশ্য নহে, স্বাধিকারে দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয় এমনও তাহার মানস নহে, কেবল ধন তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। যে কোন প্রকারে হউক, লোভানলে আহুতি দান করিতে পারিলেই তিনি কৃতকৃত্য হয়েন. এবং তাহা হইলেই দোষির সকল দোষ খণ্ডন হয়। কত শত ব্যক্তি তাহার বা তাহার কোন কর্মচারির সন্নিধানে মধ্যে মধ্যে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিয়া নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে থাকে। তিনি এ প্রকার লোককে ভূমি অপেক্ষায়ও উপকারি বোধ করেন! তাহার দূষিত চিত্ত কখন কখন তাহারদিগকে উপায়-ক্ষম পুত্র বলিয়াও স্বীকার করিতে পারে।

পাঠকবর্গ এতাবম্মাত্র পাঠ করিয়াই ভূস্বামির চরিতাখ্যান ও প্রজাদিগের দুঃখ বর্ণনার শেষ হইল মনে করিবেন না, তাহারদের রোদনের আরও বিস্তর কারণ রহিয়াছে। যাহারা স্বকীয় বুদ্ধিবলে এতপ্রকার নিষ্পীড়নের উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারদের পক্ষে দেশাধিপতিদিগের বহু-বুদ্ধি-নিষ্পন্ন কৌশল সকলের অনুকরণ না করা কখনও সম্ভাবিত নহে। অতএব অনেকানেক ভূস্বামি স্বেচ্ছানুসারে স্বাধিকার মধ্যে পথের শুল্ক,[৫] দ্রব্যের কর এবং বাণিজ্যের একচেটেও স্থাপন করিয়াছেন। সংপ্রতি এক ভূস্বামির বিষয় শ্রবণ করা গেল, তাহাকে সমধিক শুল্কদান না করিলে কোন ব্যক্তি লবণ বিক্রয় করিতে পারে না, এবং তাহার অধিকারস্থ জনপদে বাজার ভিন্ন অন্য স্থানে দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই, কেন না তাহা হইলে তাহার দুর্নিবার লোভ রিপুর যথেষ্ট উপভোগ লাভ সম্ভব হয় না[৬]। হায়! কোন কোন দেশীয় প্রজাদের নিজ শরীরও স্বায়ত্ত নহে, তাহারা গলদ্ ঘর্ম কলেবরে সমস্ত দিবস ভূস্বামির কর্ম করিলে উচিত বেতনের চতুর্থাংশও প্রাপ্ত হয় না। যে দিবস তাহারা ভূস্বামির কার্যে নিযুক্ত হয়, সে দিবস অতি অশুভ জ্ঞান করে; তদীয় সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে তাহারদের মুণ্ডে যেন বজ্রাঘাত হয়। প্রজারা ধন্য! তাহারদের সহিষ্ণুতাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। তাহারা চিরজীবন দাবদাহে দগ্ধ হইবে জানিতেছে, তথাপি দেশ ত্যাগ করে না! তাহারা যদি স্বকীয় ভূস্বামিদিগের ন্যায় নির্মায়িক ও স্নেহশূন্য হইত—মাতৃতুল্য জন্মভূমির মায়া এককালে পরিত্যাগ করিত, তবে এত দিনে বঙ্গভূমি শ্মশান-ভূমি সদৃশ শূন্য হইয়া যাইত। মাতর্বঙ্গ-ভূমি! কেবল তোমারি অপার ঔদার্য গুণে তাহারা জীবিতমান আছে,—কৃষি বল কুল অদ্যাপি নির্মূল হয় নাই।

এখন এক অধিকারের অনেক অংশি হইলে তত্রত্য প্রজাদের পক্ষে কি ভয়ানক ব্যাপার হয়, তাহা পাঠকবর্গ মনে মনে বিবেচনা করুন; তাহা বাক্যের বচনীয় নহে; তাহারদিগকে অবশ্যই প্রতিজনকে এইরূপ ভিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। ইহা যথার্থ বটে, যে সমুদায় ভূস্বামির সমান স্বভাব নহে, কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে দশজনের মধ্যে একজনকেও শান্ত দেখা যায় না। যে সকল ভূস্বামী আপনার অধিকারে অবস্থিতি করেন না, তাঁহারদের প্রজাদিগকেও কেহ যেন সুখবোধ না করেন। তাহারদিগকে ভূস্বামির ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গ ও রক্তাক্ত লোচন দৃষ্টি করিতে না হউক, কিন্তু তাঁহার নিয়োজিত ব্যাঘ্র-সম নিষ্ঠুর স্বভাব কর্মচারিদিগের কঠোর হস্তে সর্বদাই পতিত হইতে হয়। তাহারদের কর্ণকুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়। তাহারদের বিজাতীয় নাম ধারণ করিয়া বিজাতীয় যাতনা প্রদান করেন। তাহারদের ন্যায্য রাজস্ব ও স্বীয় প্রভুর বহুবিধ ভিক্ষা আহরণ করাতেই প্রজাদিগের ক্লেশের একশেষ হইয়া ওঠে। পরন্তু যে সকল অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক নির্দয় ব্যক্তি নিজ প্রভুর সর্বস্ব হরণে প্রস্তুত, তাহারা আপনার অধীন, যোত্রহীন, সহায়-বিহীন প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন না করিয়া কি কখন ক্ষান্ত থাকিতে পারে? বিশেষতঃ তাহারা অবশ্য কোন অসুর কুলেরই নিকট এই নরক-সাধন উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যে কর্মস্থলে চৌর্য করিলে,—দস্যুবৃত্তি সাধন করিলে—কাহারও বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেও অধর্ম নাই! যাহারা এমন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা সকলের সর্বনাশ করিয়াও মহা আড়ম্বরে ব্যয় ব্যসনপূর্বক আমোদ প্রমোদ ও নাম সুখ্যাতি বিস্তার

করিতে পারিলে তাহাতে কেন বিমুখ হইবে? অতএব নায়েব আর গোমস্তা নিতান্ত নির্মায়িক হইয়া প্রজার উপর নানা প্রকার উপদ্রব করে। ভূস্বামির নিরূপিত ভাগ আহরণের পূর্বেই আপন আপন ভাগ গ্রহণ করে, এবং সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম ছল পাইলেই প্রজার ধন হরণ করিতে থাকে। বনচর ব্যাঘ্র বরাহ তাহারদের অপেক্ষায় কত অনিষ্ট করিতে পারে? ফলতঃ তাহারদের নিজ উদর পূর্ণ হইলেও প্রজার নিস্তার নাই। কোন দস্যু স্বদলস্থ সমস্ত লোককে হৃত বস্তুর অংশ না দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারে? অতএব তাহারা আপনার সম্প্রদায়ি লোকের ধনতৃষ্ণাকে চরিতার্থ ও দীর্ঘোদর সদর আমলাদিগের সন্নিধানে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তোপযোগি যৎকিঞ্চিৎ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত নির্ধন নিরাশ্রয় প্রজাদিগকে যে প্রকার ঘোরতর যাতনা দেয়, তাহা স্মরণ করিলে পাষাণময় চিত্তও দ্রব হইয়া যায়। বন্ধন, প্রহার, কারা-রোধ, অনশন ইত্যাদি দুঃসহ দুশ্চিন্ত্য যন্ত্রণার আলোচনায় আর ধৈর্য্য রাখা অসাধ্য। এ সমুদায় লোক-সংহারক কাণ্ড দুর্দান্ত ভূস্বামিদের অসম্মত নহে। কত কত ভূম্যধিকারি রাজস্ব বৃদ্ধি ও অন্য অন্য যাবতীয় নিষ্পীড়ন প্রস্তাবে প্রজাদিগকে অসম্মত দেখিলে তাহারদিগকে প্রহার করে, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দেয়, স্বনিয়োজিত দস্যুদল দ্বারা সর্বস্ব হরণ করায়, এবং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে কখন কখন তাহারদের গৃহদাহ করিয়াও সর্বস্ব নাশের উপক্রম করে। নিরশ্রু নেত্রে এ সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার বর্ণনা করা কি মনুষ্যের সাধ্য? এ সমুদায় চিন্তা করিলে চিত্ত অবসন্ন হয়, অঙ্গ অবশ হয়! এ সকল শ্রবণ করিয়া যাহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল না হয়, সে অবশ্য পাষাণবৎ জড়পিণ্ড হইবে, সন্দেহ নাই! হে পাঠক বর্গ! তাহারদের অন্তর্দাহ নিবারণের কোন ঔষধ থাকে তবে চেষ্টা করো। কোন্ ব্যক্তি এমন হত-চেতন আছে, যে এ সমস্ত দারুণ দুঃখের বিষয় পাঠ করিয়া তৎপ্রতিকারার্থে চীৎকার না করিবেক? "মূক মনুষ্যও বাক্যাভাবে অজস্র অশ্রু নিদ্রাব করিতে থাকিবে!"

এ পর্যন্ত যাবৎ বিলাপ করা গেল, কেবল ভূস্বামী এবং তাহার প্রধান প্রধান অনুচরেরাই তাহার উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লোকেও প্রজাদিগকে ক্লেশ দিতে ক্রটি করে না। পল্লীগ্রামে যাহার যৎপরিমাণে সম্পত্তি ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তিনি লোকের উপর অত্যাচার করিয়া স্বকীয় ক্ষমতা প্রদর্শনার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন। সমস্ত লোক আমার আয়ত্ত ও বশীভূত থাকুক, ইহাই সকলের নিতান্ত বাসনা। গৃহস্বামী অবধি ভূস্বামী পর্যন্ত সমুদয় ব্যক্তিরই এই নিগূঢ় বাঞ্ছা। ভূস্বামীর সংসার-সংক্রান্ত কোন ক্ষুদ্র কর্মেও যিনি নিযুক্ত থাকেন, তাহার প্রভাবের আর পরিসীমা থাকে না; বাজার সরকারও রাজার তুল্য প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ করে। গ্রামের মধ্যে যিনি অন্যান্য অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ ধনবান, তাহার অভিলাষ যে আর আর সকলেই তাহার দ্বারস্থ থাকে,—সকলেই তাহার দাস হইয়া সেবা করে। তাহার মনস্কামনা কতকপূর্ণ হয়ত বটে, যাহার সহিত তাঁহার সম্পর্কমাত্র নাই, তাহারও উপর তিনি কর্তৃত্ব করেন—তাহারও দণ্ড নিষ্কৃতির কর্তা হয়েন। হা! যে দুর্ভাগা মনুষ্য এককালে ক্ষুদ্র প্রজা থাকিয়া অপেক্ষাকৃত ধনাঢ্যদিগের অশেষ উপদ্রব সহ্য করিয়াছে, সেও দৈবাৎ সান্ন হইলে যাবতীয় যোত্রহীন লোকের উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ করে।

যদি তিনি আপনগ্রামের ইজারাদার হয়েন, তবে আর কাহারও নিস্তার থাকে না। তাহার অতি প্রভূত লোভরূপ হুতাশন শিখা ভূস্বামীর অপেক্ষায় দীর্ঘ হওয়াই সম্ভাবিত। তিনি সেই লোভাগ্নির উপভোগ আহরণার্থে ভূস্বামী সংস্থাপিত নানাপ্রকার নিষ্পীড়ন প্রণালীর কোন ভাগই পরিত্যাগ করেন না, বরঞ্চ সর্বপ্রযত্নে তাহার বৃদ্ধিরই চেষ্টা পায়েন। বিশেষতঃ প্রজারা ভূস্বামীর চিরন্তন ধন; তাহারা এককালে উচ্ছিন্ন না যায় ও অধিকারে পরিত্যাগ না করে, তাহার এমত বাসনা অবশ্যই থাকিতে পারে। কিন্তু ইজারার নিরূপিত সময় অতীত হইলেই ইজারাদারের স্বত্ব লোপ হয়, সুতরাং প্রজাদের প্রতি তাহার স্নেহ সঞ্চারের সম্ভাবনা কি? নিঃশেষে ধন শোষণ করিতে পারিলেই তাহার মঙ্গল। বিশেষতঃ ভূস্বামী তাহার নিকট যাদৃশ নিষ্কর্ষণ করিয়া কর গ্রহণ করেন, তাহাতে তাহার লাভভাবের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তিনি স্বীয়লাভ প্রত্যাশায় উপায়ান্তর চেষ্টা করেন, বিবিধ প্রকার কুটিল কৌশল কল্পনা করিতে থাকেন। প্রজার সর্বনাশই সেই সকল বিষম যন্ত্রণার একমাত্র তাৎপর্য! তাহারা ভূস্বামীকে যত রাজস্ব প্রদান করিত, ইজারাদারকে তদপেক্ষায় চতুর্থাংশ অধিক দিতে হইবেক।[৭]

কল্য যে ভূম্যধিকারির লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব ছিল, অদ্য তাহাতে আর পঞ্চবিংশতি সহস্র যুক্ত হইল। অতএব ইজারার নাম শুনিলে প্রজাদের হৃৎকম্প না হইবে কেন?

এক্ষণে যাহারদিগকে উপর্যুপরি জমিদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজরাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহারা যে কি প্রকারে প্রাণধারণ করে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। তাহারদের দারুণ দুর্দশা বাক্যপথের অতীত!

দুঃখের আর অন্ত নাই, প্রজাপীড়নের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার এক অঙ্গের নাম ফৌজদারি উপদ্রব।-- এ নাম শ্রবণমাত্র কোন্ ব্যক্তি না কম্পিত—কলেবর হয়? পঞ্চমবর্ষীয় বালকও থানা ও দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃক্রোড়ে গিয়া নিলীন হয়! তদবধি কেমন প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিয়া যায়, যে চিরজীবনই তাহারদিগকে ভূত প্রেত শ্মশানাদির ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হয়। পথ মধ্যে কোন প্রচণ্ডমূর্তি ফৌজদারি লোকের সহিত সহসা সাক্ষাৎ হওয়া কত ভয়েরই বিষয়। ফলতঃ পল্লীগ্রামস্থ ইতর লোকদিগের পক্ষে এ সংস্কার অমূলক নহে, দারোগা ও তৎসংক্রান্ত কর্মচারিদিগের প্রসিদ্ধ দুর্ব্যবহার স্মরণ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে। চৌর্য দস্যুবৃত্তি, তদনুরূপ কোন ব্যাপারের অনুসন্ধান পাইলে তিনি স্বসম্প্রদায় সমভিব্যাহারে গ্রাম মধ্যে সমাগমপূর্বক অশেষ প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন। যিনি এমন মনে করেন, যে কেবল শান্তি রক্ষা ও কলহ নিবারণ তাহার উদ্দেশ্য, তিনি তাহার মনোগত বিষপূরিত নিগূঢ় অভিপ্রায় কিছুই অবগত নহেন। কেবল লোভের উপভোগ আহরণ করাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। প্রজারা তাহার নৃশংস স্বভাবের কার্য পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়াছে; অতএব যেমন মৃগগণ মাংসাদ হিংস্র জন্তুর ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করে, সেইরূপ তাহারা তাহার সহিত সাক্ষাৎকার শঙ্কায় নানাস্থানে অপ্রকাশিত হইয়া থাকে। সেদিন তাহারদের সমস্ত কর্মক্ষতি ও উপজীবিকার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু তাহার ভীষণ দৃষ্টি হইতে সকলের পরিত্রাণ পাইবার বিষয় কি? যাহারা কোন প্রকারে অপসরণের উপায় না পায়, তাহারদিগেরই বিষম সঙ্কট;

প্রথমে ক্লেশ, অবশেষে ধন ক্ষয়। দারোগার দীর্ঘোদর পূরণার্থে কিছু কিছু অন্নদান না করিলে তাহারদিগের কোনক্রমেই নিষ্কৃতি নাই। তিনি এইরূপ, যত পারেন, সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে দস্যু বা সন্ধিচৌর যে গৃহস্থের সর্বনাশ করিয়াছে, তাহার উপর সর্বপ্রযত্নে আক্রমণ করেন, এবং তাহার যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহারও কিঞ্চিৎ ভাগ গ্রহণপূর্বক প্রীত মনে প্রস্থান করেন। তাহার অধিকারে নরহত্যা হইলে তাহার পরাক্রম চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়। গ্রামস্থ লোকে ফৌজদারির প্রকাণ্ড কাণ্ডভয়ে সে বিষয় জ্ঞাপ্য রাখিবার যত যত্ন করে, তাহার লোভ রিপু তত প্রবল হইয়া তাহার চরিতার্থতা সাধনের চেষ্টাও তদনুরূপ বৃদ্ধি হয়! এই তাহার উদ্দেশ্য এবং ইহাই তাহার কার্য!

এইরূপে পল্লীগ্রামস্থ প্রজারা সকলের সমবেত চেষ্টায় দিন দিন দৈন্য-দশা প্রাপ্ত হইতেছে—দশের ষড়যন্ত্রে শ্বাসাগত প্রাণ হইয়াছে। তাহাদের এই মুমূর্ষু অবস্থায় যদিও কেহ কেহ ভিষগ্ বেশে আগমনপূর্বক ঔষধ প্রদান করে, কিন্তু সে অতি ভয়ঙ্কর ঔষধ; তাহাদের রসায়ন চিকিৎসায় যদ্যপি আপাতত রোগের প্রকোপ দমন হয়, কিন্তু তদীয় বিষজ্বালায় শরীর ও মন চিরজীবন জ্বালাতন হইতে থাকে, এবং সেই ভেষজ বিষেই অবশেষ শেষ দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। এইসমস্ত মহাজন সংজ্ঞক বিষদ বৈদ্যের হস্তে পতিত হইলে নিষ্কৃতির পথ এককালে রুদ্ধ হয়। মহাজন মূলধনের অর্ধ বা তদনুরূপ সমধিক বৃদ্ধি লাভ ব্যতীত ঋণদান স্বীকার করেন না, কারণ তদ্ভিন্ন তাহার অর্থপিপাসা সম্যক্ চরিতার্থ হয় না[৮], অতএব দুখি প্রজাদিগকে উপায়ান্তর বিরহবশতঃ সুতরাং তাহাই অঙ্গীকার করিতে হয়। মূলধনের বৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের বিনাশের কারণ হয়।

যিনি এই সমস্ত চিত্ত-বিদারণ ব্যাপার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন, তাহার আর প্রজাদের দারুণ দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসার অপেক্ষা নাই। অনেকে কহেন, তাহারা এত নির্বীর্য, স্ফূর্তি-হীন, ভীরু-স্বভাব কেন? হায়! যে অনাথ কৃষাণেরা অহরহ নিষ্পীড়িত, তর্জিত, মানভ্রষ্ট ও শরীরে আহত হয়; যাহারা ধন প্রভুত্ব বিশিষ্ট সকল লোকেরই অত্যাচার ভয়ে সর্বদাই শঙ্কিত, যাহারা ক্ষুদ্রাশয় দয়াশূন্য বার্ধুষিষেরও দাস এবং কি জানি কোন্ পথে উগ্র-মূর্তি মহাজনের সহিত সাক্ষাৎকার হয় এই আশঙ্কায় সদাই অস্থির, তাহারদিগের কি কখনো বীর্য ও সাহসের সম্ভাবনা আছে? সেই অধীন দীন ব্যক্তিরা মনোমধ্যে কেবল অত্যাচার, ধনক্ষয় ও অনাহারেরই আলোচনা করে—রজনীতে নায়েব, দারোগা, গোমস্তা, নালিশ, দণ্ড এই সকল স্বপ্ন দেখে! সর্ব-সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রাও তাহারদের উদ্বেগ দূরীকরণে সমর্থ নহে!—তখনও তাহারদের অপার চিন্তার্ণব নিস্তরঙ্গ হয় না। তাহাদের অনাহারে প্রাণবিয়োগও অসম্ভব নহে। তাহারা যে মনোরম আশাকে অবলম্বন করিয়া সম্বৎসর অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে,— দাবানলে কলেবর দগ্ধ করে, তাহাও সার্থক হয় না। যতকাল তদীয় ক্ষেত্রে সতেজ শ্যাম বর্ণ শস্য বৃক্ষ সকল বর্ধিত হইতেছিল, তাবৎ তাহার শোভাবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তাহাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইত! ততদিন তাহারা 'আমার ক্ষেত্র', 'আমার শস্য' বলিয়া অতি অপূর্ব সন্তোষ সম্ভোগ করিত! কিন্তু গৃহে আনিবামাত্র সে সমস্ত আর তাহারদের নহে। তৎকাল পর্যন্ত যত রাজস্ব অনাদায়ি থাকে, তন্নিমিত্ত ভূস্বামির দূরন্ত দূতেরা অবিলম্বেই তদুপরি আক্রমণ করে, এবং

তদনন্তর প্রচণ্ড মূর্তি উত্তমর্ণ আগমন করিয়া সমুদায় শস্য নিঃশেষে গ্রহণ করেন [১]। তখন তাহারা সম্বৎসরের আশায় নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিতান্ত নিঃস্ব ও নিরন্ন হয়। এইরূপ হৃতসর্বস্ব হইয়াও কোন কোন প্রদেশীয় অক্ষুব্ধ প্রজারা পুনর্বার অন্ন আহরণে উদ্যোগী হয়। তাহাদের কি কঠোর প্রাণ!—কি অসাধারণ ধৈর্য্য!—কি অভাবণীয় সহিষ্ণুতা শক্তি! তাহারা পূর্বকৃত ক্লেশের সমুদায় ফল পরহস্তে সমর্পণ করিয়া স্বোদর পূরণার্থে পুনর্বার ভূমি কর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। সমস্ত উৎকৃষ্ট শস্য পরার্থে পরিত্যাগ করিয়া আপনারদের নিমিত্ত চিনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র শস্য বপন করে, এবং পরে তাহাই ভোজনপূর্বক কোনক্রমে প্রাণধারণ করিয়া থাকে। অন্য প্রদেশীয় প্রজারা তদনুরূপ উপায়ভাবে উত্তমর্ণ সন্নিধানে ধান্যরূপ ঋণ গ্রহণ করে,—গলদেশে অমোঘ মৃত্যু পাশ বন্ধ করে! হায়! যাহারা যাবতীয় লোকের ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করে,—যাহারদের পুষ্টিকারক, বলধায়ক, শ্রমোপযোগী দ্রব্য ভক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহারা সুপ্রতুলরূপে কিম্বা সামান্য রূপেও জঠরানল নির্বাণ করিতে পায় না!

তাহারদের কায়িক ক্লেশ ও তদীয় ফলের পরস্পর বিপর্যয় বিবেচনা করিলে অধৈর্য হইতে হয়। তাহারা এইরূপে দুঃসহ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া কি প্রকারে জীবিতবান্ থাকে! পরমেশ্বর তাহারদিগকে লোকাতীত তিতিক্ষা শক্তি প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই।— উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হৃদয় মধ্যে প্রবেশিত হইলেও সেই দুর্জয় তিতিক্ষাকে পরাভব করিতে পারে না! ভিন্ন দেশীয় লোকে কি এ-প্রকার ভাবিতে পারে না, যে তাহারা বুঝি অনশন ব্রত পালন করিয়াও প্রণয়াস্পদ ভূমি পদে জীবন সমর্পণ করিতে পারে? মস্তকোপরি অজস্র বারি বর্ষণ হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপও করে না,—ভূমি হইতে ক্ষণমাত্র নেত্র উৎক্ষেপ ও হস্ত উত্তোলন করে না। যখন প্রচণ্ড রৌদ্র প্রভাবে পাষাণ বিদীর্ণ ও অরণ্য দগ্ধ হয়, তখনও তাহারদের বিশ্রাম নাই! ইহা কি সামান্য খেদের বিষয়, যে তাহারা হৃদয়ের শোণিত-সেচন করিয়া যে ক্ষেত্র কর্ষণ করে, তাহারদের পূর্বপুরুষেরাও যাহাতে শরীর নিপাত করিয়া গিযাছে, তাহার ফললাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়! অতি দূরবর্তী বিদেশীয় লোকেরাও তাহারদের শ্রম-সাধিত শস্য ভোজন করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, ও তাহারদের স্বহস্তোৎপাদিত কার্পাস-নির্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া অঙ্গশোভিত করিতেছে, কিন্তু তাহারা সামান্যরূপ অন্নাচ্ছাদনও প্রাপ্ত হয় না। তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া বহুকষ্টে যৎসামান্য শস্য ভক্ষণ ও ঘন মলিন চীর পরিধান করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে। অনাহারী ও নগ্নপ্রায় থাকাতেও যদি তাহারদের দুঃখের পর্যাপ্তি হইত, তথাপি অপেক্ষাকৃত অনেক মঙ্গল বিবেচনা করিতাম! তাহার উপর আবার ভূস্বামী প্রভৃতির বন্ধন প্রহারাদি অসহ্য অত্যাচার স্মরণ করিলে এককালে হত-চেতন হইতে হয়। আর ধৈর্যাবলম্বন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, অতএব এবার এই স্থানেই সমাপ্তি। কিন্তু এখনো অনাথ প্রজাদের দুঃখ বর্ণনার অনেক অবশিষ্ট থাকিল; তদীয় ক্লেশ আলোচনায় চিত্ত অনাকুল রাখিতে পারিলে বারান্তরে তাহার বিবরণ করা যাইবেক।

২

গত বৈশাখ মাসে আমরা এক গুরুতর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি, পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া অবশ্যই অশ্রুজল বিসর্জন করিয়াছেন—সে দুঃসহ দুঃখ রাশির বৃত্তান্ত অবগত হইলে পাষাণময় চিত্তেও কারুণ্য রসের সঞ্চার হয়! সরাজক রাজ্যে এ প্রকার লোক সংহারক ব্যাপার সমুদায়ের ঘটনা হওয়া অতিশয় আশ্চর্যের বিষয়। যে দেশে রাজা ও রাজ-নিয়ম আছে, এবং যে স্থানের প্রজারা বহু বেতন-ভুক্ উত্তমোত্তম রাজ-কর্মচারি নিয়োগের উপযোগী যথেষ্ট কর প্রদান করে, সে দেশ যে এ মত অশাসিত থাকে, এবং তত্রত্য লোকের ধন, মান, প্রাণাদি কিছুই যে স্বায়ত্ত নহে, ইহাতে তথাকার রাজ-কার্যেরই ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পাঠকবর্গ যেন এমন মনে না করেন, যে আমারদের রাজপুরুষদিগের সমুদায় কার্যই এইরূপ বিশৃঙ্খল। যে বিষয়ে তাহারদিগের স্বার্থ আছে, তাহাতে যত্ন, পরিশ্রম, ও উৎসাহের কিছুমাত্র অল্পতা দেখা যায় না—বোধ হয় তাহারা আত্মলাভার্থে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া অতি দুষ্কর কর্মও সম্পন্ন করিতে পারেন। স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহারদের মনের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, এবং অঙ্গসকল দ্বিগুণ বল ধারণ করে। রাজস্ব সংগ্রহার্থে কি অপূর্ব কৌশল, কি পরিপাটি নিয়ম, কি অদ্ভুত নৈপুণ্যই প্রকাশ করিয়াছেন! প্রজারা নিঃস্ব ও নিরন্ন হউক, তথাপি তাহারদিগকে নিরূপিত রাজস্ব দিতেই হইবে, ভূস্বামীর সর্বস্বান্ত হউক, তথাপি তিনি ত্রি মাসের পর কপর্দক মাত্র রাজস্ব ও অনাদায়ী রাখিতে পারেন না। অনাবৃষ্টি হইয়া সমুদায় শস্য শুরু হউক, জল প্লাবন হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন যাউক, রাজস্ব দানে প্রথম হইয়া প্রজারা পলায়ন করুক, তথাপি নির্দিষ্ট দিবসে সূর্যাস্তের প্রাক্‌কালে তাহাকে সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষে পরিশোধ করিতেই হইবে। যদি কোন অবিচক্ষণ অদূরদর্শী ভূস্বামী কর্মবিশেষে সংগৃহীত রাজস্ব ব্যয় করিয়া ফেলেন, তবে তাহার ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠার আর সীমা থাকে না। রাজস্ব প্রদানের দিবস যত নিকট হয়, ততই তাহার অন্তর্দাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তিনি দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইয়া নানাপ্রকার অপমান স্বীকার করিয়াও ঋণ গ্রহণার্থে ব্যস্ত হয়েন। দীপ্তশিরা পুরুষের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক ধনার্থ দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন,—স্বীয় পত্নীর গাত্রাভরণ সকল উন্মোচন করিয়াও তৎসমুদায় বন্ধক দিবার নিমিত্তে আকুল হয়েন। তখন তাহাকে কি বিরস ও ব্যাকুল চিত্তই বোধ হয়!—তাহার অন্তর্জালার লক্ষ্মণ মুখশ্রীতে কি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়! এই প্রকার দুঃসহ দুঃখরূপ দাবদাহে দগ্ধ হইয়া অনেক ভূস্বামিকে, যে প্রকারে হউক, যথাকালে সমুদায় রাজস্ব উপস্থিত করিতেই হয়। কাহারও পক্ষে সেই কাল কালস্বরূপ হইতে পারে।—সেই নির্দিষ্ট কালে দিনপতির অস্তগমন সহকারে তাহার সৌভাগ্যরূপ বিভাকরও জন্মের মতো অস্ত হইতে পারে! অতএব এই বিষয়ে রাজপুরুষদিগের অতীব প্রভুত্ব ও অসাধারণ কৌশল প্রকাশ পাইতেছে।

এইরূপ রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য সাধন বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্ন, নৈপুণ্য ও বিক্রম প্রকাশেব কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না, কিন্তু প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সমস্ত বিষয়েই তাহার সম্যক্ বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিরীক্ষণ

করিলে সমুদায় বাঙ্গলা দেশ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়; যেখানে কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই,—যেখানে নৃশংসস্বভাব হিংস্র জীবসকল নিরুপদ্রব নির্বিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণনাশার্থেই সর্বদা সচেষ্ট আছে। প্রজাদের ধন সম্পত্তিতে রাজার কিছু স্বভাব-সিদ্ধ স্বত্ব নাই; তিনি তাহারদের ধন মান প্রাণাদি রক্ষা করিবেন বলিয়াই কর গ্রহণ করেন। কিন্তু আমারদের রাজপুরুষেরা যদর্থে কর গ্রহণ করেন, তৎসাধন বিষয়ে তাঁহারা যেমন মনোযোগী, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের বিষম দুরবস্থাই তাহার সাথী রহিয়াছে।

তাহারদের দারুণ দুরবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা গিয়াছে; কিন্তু তাহার অন্ত কোথায়? তাহাদের দুঃখ সাগরের সীমা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছে। সে বিষয়ে যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই পরাধীন দীন প্রজাদিগের যন্ত্রণার আধিক্য প্রতীত হয়,—ততই তাহারদের দারিদ্র্য দশা দর্শন করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভূস্বামী যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ছল করিয়া প্রজা নিষ্পীড়ন করেন, তাহার গণনা করা দুষ্কর। তাঁহারা স্বাধিকারস্থ সমুদায় প্রজার সমুদায় বস্তুই আত্মবস্তু জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কাহার অবিদিত আছে, যে প্রজাদিগের ফলমূল বৃক্ষ পর্যন্ত ভূ-স্বামির সর্বগ্রাসক লোভের নিকট রক্ষা পায় না? কোন নিরাশ্রয় দুঃখিপ্রজা কোন ফল-বৃক্ষ রোপণপূর্বক যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাকে রক্ষিত ও বর্ধিত করিয়াছে, এবং বহু বৎসরের পর তাহার শাখাসকল ফলভারে অবনত দেখিয়া মনে মনে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে, ইতিমধ্যে যদি তাহার উপর ভূমধ্যিকারির ক্রূর দৃষ্টি পতিত হয়, তবে আর তাহা রক্ষা করে কাহার সাধ্য? যখন সে অনাথ ব্যক্তি তাহার নিদারুণ অনুমতি শ্রবণ করিলেক, তখনই নিশ্চয় জানিলেক, ভস্মেতে ঘৃতাহুতির ন্যায় আমার এত বৎসরের পরিশ্রম অদ্য বিফল হইল। কি বিষম নৈরাশ্য! কি অসহ্য যন্ত্রণা![১০]

বাঙ্গলাদেশের অনেক ভূস্বামিরই এই প্রকার উপদ্রব এবং অনেক প্রজারই এই প্রকার যাতনা। সংপ্রতি কৃষ্ণনগর জেলার কোন ভূস্বামী ও তাহারদের কর্মচারিদিগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়া গেল। তাহারা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহারদিগের শরীরও আপনার অধিকারভুক্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহারদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাহারদের এই প্রকার অখণ্ড্য অনুমতি আছে, যে বিনামূল্যে বিনা বেতনে তাহারদিগকে গোপেরা দুগ্ধ দান করিবেক, মৎসোপজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর করিবেক, যান-বাহকে বহন করিবেক, চর্মকারে চর্মপাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারদিগের সেবা করিবেক।[১১] ক্রীতদাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না। সেও স্বীয় কার্যের বেতন স্বরূপ অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হয়। আর ইহারা স্বীয় অধিকারস্থ ব্যবসায়ীদিগের নিকট যাবতীয় বস্তু ক্রয় করেন, তাহারও উচিত মূল্য দান করেন না। ইহারা যে পণ্যে দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহার নাম 'সরকারী মূল্য' সে মূল্য ইহারদের ইচ্ছাধীন,—সে মূল্য সাধারণরূপে প্রচলিত হইলে বাণিজ্য ব্যবসায় উচ্ছিন্ন হইত। হায়! এই প্রকার ভূস্বামি ও তাহার অনুচরেরা প্রজাদিগের উপর অন্যান্য নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহারদিগের উপজীবিকারও হন্তা হয়েন। দূরদেশীয়

মনুষ্যেরা ইহারদের আচরণ শ্রবণ করিলে সহসা বোধ করিতে পারেন, প্রজাকুল সমূলে উন্মূলন করাই ইহারদের উদ্দেশ্য।

এইরূপ দুর্দান্ত ভূস্বামীরা দুনির্বার ধন-তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিবার আর এক প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। অনেকানেক স্থানে প্রজায় প্রজায় বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, তাহারদিগকে ভূস্বামি সমীপে অভিযোগ করিতে হয়। কিন্তু তিনি বিচারক নাম গ্রহণ করিয়া সর্বতোভাবে অবিচার করেন,—ধর্মাবতার নাম ধারণ করিয়া সম্পূর্ণরূপ অধর্মাচরণেই প্রবৃত্ত থাকেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করা দূরে থাকুক, উৎকোচের তারতম্যানুসারে তাহার বিচার ক্রিয়ার তারতম্য হয়, এবং যে ব্যক্তি তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিতুষ্ট করিতে পারে, তাহারই নিশ্চিত জয়, ও তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। পাঠকবর্গ যেন এমন মনে না করেন, যে বাদী প্রতিবাদীরা আপন ইচ্ছায়, তাহার নিকট বিচার প্রার্থনা করে। তাহার বিশিষ্টরূপ তাহার চরিত্র আলোচনা করিয়াছে, ও পুনঃ পুনঃ তাহার প্রদীপ্ত কোপানলে পতিত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছে। কোন্ ব্যক্তি আপনা হইতে ব্যাঘ্র-মুখে প্রবেশ করিতে চাহে? কিন্তু তাহারদের কি অন্যথা করিয়া পার পাইবার উপায় আছে?

ভূস্বামির অভিপ্রায় অবহেলন করিয়া অন্যত্র অভিযোগ করিতে গেলে তিনি নানা কৌশলে তাহারদিগকে ক্লেশ প্রদান করেন। যদি কেহ কোন রাজ-বিচারালয়ে কাহারো নামে অভিযোগ করিতে যায়, তবে ভূস্বামী তাহাদের উভয়ের মধ্যস্থ্য স্বীকারচ্ছলে তাহাকে নিবারণ করেন, এবং স্বয়ং বিচারের ভার গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন।[১২] যথার্থ বিবেচনা হউক বা না হউক, আপনার লোভানলে আহুতি দান করিতে পারিলেই তিনি চরিতার্থ হয়েন! তাহার এইরূপ অন্যায় বিচারে কত কত মহাজন ব্যবসায়বিহীন হইয়া এককালে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। তিনি দুঃখী প্রজাদিগের অতিশয় অবিহিত ধন দণ্ড করেন। তাহারা একেবারে সমুদায় প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া কিংদংশ পরিশোধ করে, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে তন্নিমিত্ত ঋণপত্র লিখিয়া দিয়া আপাততঃ নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু সেই ঋণ স্বরূপ হলাহলই তাহারদের সর্বনাশের হেতু হইয়া উঠে। শ্রুত হইয়াছে, এ প্রকারেও অনেকানেক প্রজা ঋণ পাশে বদ্ধ হইয়া বিপদসাগরে মগ্ন হয়।

প্রভুর এইরূপ অন্যায় আচরণ দেখিয়া ভৃত্যেরা তাঁহার অনুগামী হইতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যদি কোন প্রজা নিষ্ঠুর স্বভাব কর্মচারীদিগের নিদারুণ অনুমতি পালনে কিছুমাত্র ত্রুটি করে, তবে আর তাহার নিস্তার নাই। তাঁহার কঠিন শাস্তি সঙ্কল্প করিয়া দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং কোন যৎসামান্য বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া গুরুতর দণ্ডবিধান করেন। যদি সে ব্যক্তি তাঁহারদের পদানত হয়, অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভূস্বামী সন্নিধানে গিয়া ক্রন্দনও করে, তথাপি দণ্ডের লাঘব হয় না। সে আশ্রয়হীন অনাথ ব্যক্তিকে সেই দুর্বহ ভারও দুঃসহ ক্লেশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

এখনও এক অশেষ অনিষ্টকর বিষয়ের বিবরণ করা হয় নাই। ভূস্বামিরা যে কতপ্রকার কৌশল করিয়া লোকের ধন হরণ করেন, তাহা নির্বাচন করা দুষ্কর। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ও দেবতার দেবোত্তর গ্রহণ করা কোন কোন ভূস্বামির সঙ্কল্প হইয়াছে। আমারদিগের

সর্বশোষক গবর্নমেন্টকে যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারা তাহা অপহৃত করিয়া আত্মসাৎ করেন। কত কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে প্রতীকারার্থে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের অন্ন-হন্তা ভূস্বামীদিগের কঠোর হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হয় না। তাহারা রোদন করিলে তিনি বধিরবৎ ব্যবহার করেন; বোধ হয়, যেন আপনাকে স্বাধিকারস্থ সমস্ত প্রজার সমস্ত বস্তুর অদ্বিতীয় স্বত্বাধিকারী জ্ঞান করিয়া তাহা অধিকার করিবার নিমিত্ত সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। কখন দেখ, তিনি লোভাক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভূমি পরিমাণপূর্বক নানা কৌশলে রাজস্বের বাহুল্য করিতেছেন, [১৩] কখন কোন প্রজার নিরূপিত কর পরিবর্তন করিয়া যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিতেছেন, কখন বা সাতিশয় ধন-তৃষ্ণা-পরবশ হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এক প্রজার ভূমি গ্রহণপূর্বক অধিকতর করে, অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন।[১৪] আহা! মধ্যে মধ্যে এ প্রকারও ঘটে, যে কোন দুঃখীপ্রজা ভূস্বামীর নিকট একখণ্ড সকর ভূমি বা কোন অপকৃষ্ট উদ্যান গ্রহণ করিয়া যত্ন ও শ্রম সহকারে তাহার পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে, এবং আগামী বর্ষে তাহার সেই সমুদয় পরিশ্রমের যথেষ্ট ফললাভ সম্ভাবনায় মনে মনে পরম পুলকিত রহিয়াছে, ইতিমধ্যে অন্য এক ব্যক্তি আগমন করিয়া কহিলেক "আমি তোমার ভূমি অধিকার করিতে চলিলাম, ভূস্বামির নিকট সমধিক কর প্রদানে স্বীকার পাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা শ্রবণমাত্রে সেই প্রজার মুণ্ডে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হয়; তাহার আশারূপ রমণীয় বৃক্ষ সমূলে উন্মূলিত হয়।

প্রজারা এইপ্রকার যন্ত্রণা নিরন্তর ভোগ করিতেছে, তথাপি তাহার প্রতিকার চেষ্টায় সমর্থ হয় না,—চিরদিন অন্তর্দাহে দশা হইতেছে, তথাপি অন্তরের ব্যথা ব্যক্ত করিতে পারে না! কেহ কেহ কহেন, তাহারা বিচারালয়ে ভূস্বামির নামে অভিযোগ না করে কেন? হায়! তাহারদের কি সে সামর্থ্য আছে? তাঁহার নামে অভিযোগের বার্তা শ্রবণ করিলেও তাহারদের হৃতকম্প উপস্থিত হয়, তাঁহার প্রভুত্ব ও পরাক্রমের বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাদের যৎ সামান্য শক্তি ধর্তব্যই বোধ হয় না। সংসারের যেরূপ স্বরূপও মানব প্রকৃতির যে প্রকার বিকৃতি হইয়াছে, তাহাতে ধনবলই প্রধান বল, এবং ধনরূপ সহায়ই প্রধান সহায়। প্রজারা আপনারদের অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কোথায় বা সাথী পাইবে? তাহারদের এপ্রকার প্রচুর ধনই বা কোথায়, যে তদ্দারা বিচারালয়ের কর্মচারিদিগকে আয়ত্ত বশীভূত করিয়া রাখিবে?

অতএব তাহারা রাজদ্বারেও তাহাকে পরাভব করিতে পারে না, লাভ হইতে তাহার কোপানলে পতিত হইয়া তাহারদের উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হয়। খড়ি নদীর তীরবর্তী গ্রাম বিশেষের কতকগুলি ইতরলোক ভূস্বামীর অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ধন-প্রাণ রক্ষার্থে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। এক দিবস তাহারা সবিশেষ মনঃসংযোগপূর্বক নিজ নিজ ক্ষেত্র কর্ষণে নিযুক্ত ছিল, ইত্যবসরে ভূস্বামীর শত শত দুরন্ত দূত যুগপৎ আগমনপূর্বক তাহারদের সমস্ত গরু হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই দস্যু ক্রিয়াতে তাহার মনস্কামনা সম্যকরূপে সিদ্ধ হইল; কারণ সেই অতি দীন পরাধীন প্রজাগণ যখন এইরূপে হৃতসর্বস্ব হইল, তখন

চতুর্দিক শূন্য দেখিয়া নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া তাহার পদানত হইল, এবং তাহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া মনের অগ্নি মনেতেই জাপ্য করিয়া রাখিল! সেই দুঃসহ দুঃখ দাবানল তাহারদিগের হৃদয়কে দিবানিশ দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু স্ফুটিবার উপায় নাই। তাহারা অবধারিত জানিয়াছে, সে প্রজ্বলিত হুতাশন নির্বাণ হইবার নহে তাহাতেই তাহারদের প্রাণ বিয়োগ হইবেক!

এ প্রকার ঘটনা সর্বদাই ঘটে; আমারদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ হৃদয় বিদীর্ণকারী কত ব্যাপারের উদয় হইতেছে! কিয়ৎ বৎসর হইল, সুপ্রসিদ্ধ পলাশিগ্রাম সন্নিহিত মাঙ্গনপাড়া নিবাসী এক ব্যক্তি নানামতে নিগৃহীত হইয়া এবং তৎপার্শ্ববর্তী প্রজাদিগের দারুণ দুর্দশাদৃষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া ভূস্বামীর অত্যাচার নিবারণার্থে যত্ন পাইতেছিলেন, এবং অপরাপর প্রজাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতেছিলেন। তাহাতে ভূস্বামীর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, এবং তিনি তাহার প্রতিফল প্রদানার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। সে প্রতিফল স্মরণ করিলে শরীর লোমাঞ্চ হয়, কলেবর কম্পমান হয়, হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়! তাহার প্রেরিত দস্যুদল ঐ ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ ও সর্বস্ব হরণ করে, তাহার পরিবারস্থ স্ত্রীদিগের প্রতি অহিতাচরণ করে এবং তাহার কোন স্নেহ পাত্রকে আনয়নপূর্বক ভূস্বামীর গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখে।[১৫]

সে বৎসর নবদ্বীপ অঞ্চলে ঢোলমারি, চাপড়া, কাপাসডেঙ্গা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের কতগুলি এতদ্দেশীয় খ্রিস্টান আপনারদিগকে রাজ-ধর্মাক্রান্ত ভাবিয়া ভূস্বামীর অন্যায় অনুমতি সকল প্রতিপালনে অস্বীকার গিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার ভূস্বামীরা ধর্মবিশেষের অনুরোধ রাখেন না, এবং সামান্য সাহেবদিগকেও ভয় করেন না, অতএব উল্লিখিত ভূম্যধিকারী তাহারদিগকে অন্যান্য ইতর প্রজার সহিত অবিশেষ জানিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তিপ্রদান করেন।[১৬] তাহারদিগের সহায় স্বরূপ মিশনারীরা এ বিষয় অবশ্যই অবগত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু কোনপ্রকার প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং সেই সকল খ্রীষ্টান প্রজা তদবধি নত-মুণ্ড হইয়া তাহার পদানত হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ অত্যাচার করা দুঃশীল দুরাশয় ভূস্বামীদিগের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে। যেরূপ নরহন্তা দস্যুরা অবলীলাক্রমে অম্লানবদনে মনুষ্যের মুণ্ডে দণ্ডাঘাত করে, সেইরূপ তাহারাও নিতান্ত নির্দয় ও ধর্মাধর্ম-বিবেচনা-শূন্য হইয়া লোকদিগকে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করেন। তাহারদের এইপ্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, যে আমার আজ্ঞা অখণ্ডনীয়[১৭] ও আমিই সকলের মরণ জীবনের কর্তা।

তাহারা আপনারদিগের প্রবল প্রতাপ ও দুর্জয় পরাক্রম রক্ষণার্থে এবং প্রজাদিগকে দাসবৎ-মৃত্যুবৎ [১৮] করিয়া রাখিবার নিমিত্তে ভূরি ভূরি ষাষ্ঠীক[১৯] নিযুক্ত রাখেন;-- কোন কোন ভূস্বামি প্রকৃত দস্যুদিগকেই পোষণ করেন। অনেকে তাহারদিগকে নিয়মিত বেতন প্রদান করেন না, তাহারদিগের প্রতিপালনার্থে নিজ ধনাগারেরও ধনময় হয় না, দীন দুঃখী প্রজাদিগকেই সে ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। [২০] এই সকল দুরাচার দস্যু দ্বারা লোকের অনিষ্ট না হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে: তাহারা অধিকারে নিয়া প্রজার উপর প্রভুত্ব প্রদর্শনপূর্বক অবশ্যই নানাপ্রকার উপদ্রব করে। বিশেষত যখন ভূস্বামীদিগের পরস্পর

বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, সেই সময়েই তাহারদের বিশিষ্ট রূপ কার্য করিবার সময়। এই সকল বিষয় বিসম্বাদ ও ঘোরতর দণ্ডাদণ্ডি প্রজাদিগের অতিশয় অশুভদায়ক। তদুপলক্ষে তাহাদের ধন প্রাণের উপরেও আঘাত হয়।

ক্রমে ক্রমে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ যে কারণে এদেশ কেবল কতকগুলি দুর্দান্ত দুর্জন ও শ্রীহীন পরাধীন অকিঞ্চন মাত্রের নিবাস ভূমি হইয়াছে, যে কারণে বাঙ্গলা দেশীয় ধনাঢ্য লোকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া প্রায় রহিত হইয়াছে, এবং যে কারণে সদা শঙ্কিত অস্থির চিত্ত দরিদ্র প্রজাদের উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা কি বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়? সে প্রভূত দুঃখরাশি বাক্য পথের অতীত। কিন্তু আর কতকগুলি বিদেশীয় দুর্জন এদেশীয় সহিষ্ণুতাশীল মনুষ্যদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করে, তাহার প্রসঙ্গ না করিলে উচিত কর্মের অন্যথা করা হয়। এই নির্দয় ব্যক্তিদিগের নাম নীলকর; ইহারদিগের ভয়ঙ্কর উপদ্রবের বিবরণ ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে।

৩

পূর্বে আমরা এই পত্রিকার দুই সংখ্যায় ভূস্বামীদিগের অত্যাচারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া অবশেষ একপ্রকার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যে ভবিষ্যতে কতকগুলি বিদেশীয় মনুষ্যের উপদ্রবের বিষয় বিবরণ করিব। তদনুসারে এক্ষণে দুর্বৃত্ত নীলকরদিগের ব্যবহারের বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। ভূস্বামিদিগেরই বিষম অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন ও ব্যাকুলিত-চিত্ত হইতে হয়, কিন্তু এক্ষণে চতুর্দিক হইতে এই কথাই শ্রুত হওয়া যাইতেছে, যে নীলকরদিগের অত্যাচার তদপেক্ষায় ভয়ানক; তাহারদের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তবিক, যেমন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দুই ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্র দৃষ্টি করিলে সহসা তাহারদের পরিমাণ নিরূপণ ও পরস্পর তারতম্য নিশ্চয় করা যায় না, কারণ তাহারদের উভয়কেই অসীমপ্রায় বোধ হয়, সেইরূপ ভূস্বামী ও নীলকরদিগের অশেষ প্রকার উপদ্রবের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া পরস্পর তারতম্য করা দুষ্কর, কারণ উভয়েরই অত্যাচারজনিত দুঃসহ দুঃখ রাশির সীমা দৃষ্টি পথের বহির্ভূত ও বাক্যপথের অতীত। নীলকরদিগের কার্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে কেবল প্রজাপীড়ন করিয়া স্বকার্য উদ্ধার করাই তাহারদের সঙ্কল্প। দেখ, প্রজারা আপনার অধিকারস্থ না হইলে তাহারদের উপর সম্পূর্ণরূপ বলপ্রকাশ ও স্বেচ্ছানুরূপ অত্যাচার করা সম্ভাবিত হয় না, অতএব তাহারা স্বীয় স্বীয় কুঠির সন্নিহিত গ্রাম সকল ইজারা লইয়া থাকেন, এবং তদ্দারা তাহারদিগকে স্বকীয় লোভ খর্পরে পাতিত করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। বিবেচনা করিলে, তাহারা এই কৌশল দ্বারা ভূস্বামীদিগের সদৃশ প্রবল প্রতাপ ও প্রভূত পরাক্রম প্রাপ্ত হয়েন, এবং বাস্তবিকও আপনারদিগকে স্বাধিকারের সম্রাট স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রজাপীড়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করেন। অতএব পূর্ব পূর্ব পত্রিকায় দুঃশীল ভূস্বামীদিগের যাবতীয় দুষ্ক্রিয়ার বিষয় বর্ণনা করা গিয়াছে, তাহার সমুদয়ই ইহারদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। এক্ষণে তাহার প্রসঙ্গ না করিয়া নীলকরেরা স্বীয় ব্যবসায় মাত্র সম্পাদনার্থে যে সকল উপদ্রব করেন, তাহারই বৃত্তান্ত প্রকাশ করা যাইতেছে।

নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে কেবল প্রজাপীড়নেই বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। তাহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিমমূল্য দিয়া তাহারদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনারা ভূমিকর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সরল-স্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশা ভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উভয়ের অন্তভূত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজানাশের দুই অমোঘ উপায়! নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহারদিগকে বলদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীলবীজ বপনার্থে তাহারদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প অনুচিত মূল্য ধার্য করেন। নীলকরসাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবু অনুগ্রহ ভাবিয়া দাদন স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবানাদি উপলক্ষ্যে তাহারও কোন না অর্ধাংশ কর্তন যায়? একারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সম্বৎসর পরিবার প্রতিপালন করিয়া কালযাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে লাভভাব দূরে থাকুক, তাহারদিগকে দুশ্ছেদ্য ঋণ-জালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোনক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ কৃষিকার্যই তাহারদের উপজীব্য, ভূমিই তাহারদের একমাত্র সম্পত্তি এবং তাহারই উপর তাহারদের সমুদায় আশা ভরসা নির্ভর করে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাধীন এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে? কিন্তু তাহারদের কি উপায়ান্তর আছে? প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল-পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন-দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য? তাহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সভার মনের বেদনা নিবেদন করুক, বা অতীব কাতর হইয়া আর্তনাদ নিঃসারণ পুরঃসর তাহারদের পদানত হউক, কিছুতেই তাহারদের চিত্তভূমি কারুণ্যরসে আর্দ্র হয় না,—কিছুতেই তাহারদের অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না। তাহারা এরূপ ব্যবহার করিয়াও আপনারদিগকে নির্দয় জ্ঞান করেন না; বরঞ্চ কোন প্রজার নেত্রদ্বয়ে অশ্রুজল বিগলিত হইতে দেখিলে এইরূপ হেতু নির্দেশপূর্বক কয়িা থাকেন যে, "তোর ১০ বিঘা ভূমি আছে তাহার ৫ বিঘা ভূমি কি নিমিত্তে না দিবি? ৫ টা গরু আছে, নীলের কর্মে তাহারই বা দুইটা কেননা নিযুক্ত করিবি?" দীন দুঃখী প্রজারা এ প্রকার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিলে আর কি করিতে পারে? তাহারদিগকে স্বীয় ভূমিতে অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়,—প্রত্যক্ষ দেখিয়াও আপনার জ্ঞাতসারে স্বহস্তে গরল পান করিতে হয়! এই ভূমির নাম খাতাই জমি,—খাতাই জমির প্রসঙ্গমাত্রে প্রজাদের শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়া ওঠে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে নীলকরেরা স্বেচ্ছানুসারে প্রজাদিগের উত্তমোত্তম উর্বরা ভূমি দেখিয়া তাহাতে চিহ্ন দিয়া যান; ইহাতে কখন কখন এ প্রকারও ঘটে যে কোন কৃষক শস্য বপণার্থে কোন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র সুচারুরূপে কর্ষনপূর্বক অতি পরিপাটি রূপে পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, ইতোমধ্যে নির্দয় নীলকরের প্রেরিত নিদারুণ লোকেরা তাহার

অজ্ঞাতসারে তথায় উপস্থিত হইয়া নীলের বীজ বপন করিয়া যায়,—তাহার আশাবৃক্ষ সমূহে নির্মূল করিয়া প্রস্থান করে। যদি নীলকর সাহেব কোন কৃষকের অনভিমতে তাহার ভূমি চিহ্নিত করিয়া যান, আর সেই দীন-দশাপন্ন কৃষাণ তদীয় মায়া পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া আমিন তাগাদাগির প্রভৃতি ক্ষুত্র আমলাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রদানদ্বারা সন্তুষ্ট রাখিয়া সেই ভূমিতে তিল ধান্যাদি শস্য বপন করে এবং তাহা সাহেবের শ্রুতি গোচর হয়, তবে তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া সেই শস্যপূর্ণ ভূমিতে পুনর্বার হল চালনা করিয়া নীলের বীজ বপন করেন,--তখন সেই কৃষাণের বোধ হয়, যেন ঐ হলযন্ত্র তাহার হৃদয় ক্ষেত্রেই চালিত হইল।

দুর্ভাগ্য কৃষকদিগকে এইরূপে পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হইয়া সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও সাহেবের নীল প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। যৎকালে তাহারা নীল কর্তন করিয়া কুঠিতে উপস্থিত করে, সে কাল তাহারদের বিষম বিপত্তির কাল। হিংস্র জন্তুবৎ নৃশংসস্বভাব আমলারা দাদন প্রদানকালে কৃষাণদিগের নিকট ধন গ্রহণ করে, তৎপরেও মধ্যে মধ্যে নানা উপলক্ষ্য করিয়া তাহারদের অর্থাপহরণ করে. এবং অবশেষে নীল পরিমাপের সময়েও তাহারদিগকে যৎপরোনাস্তি, নিষ্পীড়ন করে। পরিমাণে ন্যূন করিব বলিয়া তাহারদিগকে ভয় প্রদর্শন করে,—২৫ মন পরিমাণোপযোগী নীল দেখিয়া পাঁচ মন মাত্র লিখিতে চাহে। তখন প্রজারা সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল ও ভয়ে কম্পমান হয়, এবং নিতান্ত অপার্যমানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামি লইয়া তাহারদের পদে সমর্পণ করে। তাহারা প্রণামি প্রাপ্ত হইলে নীল পরিমাণে প্রবৃত্ত হয়েন; তাহাতেও সাহেবের পক্ষাবলম্বন ও আত্মলাভ সঙ্কল্প করিয়া তাহাদের মুণ্ডে দণ্ডাঘাত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। একে নীলকর সাহেব তাহারদিগকে উচিত মূল্যের অর্ধমাত্রও প্রদানে স্বীকৃত হন না, তাহাতে আবাব আমলারা তাহারদের উপর ছলেবলে কৌশলে নানা প্রকার অত্যাচার করে। ইহাতে শত শত ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে নীলকর সাহেবদের সন্নিধানে নীলের দাদন গ্রহণ করিয়া ক্রমে এ প্রকার ঋণগ্রস্থ হইতে থাকে, যে তাহারদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতিও তৎ পরিশোধে সমর্থ হয় না। ক্লেশ, উৎকণ্ঠা, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, অনশন, ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তাহারদের নিস্তার নাই, তাহারদিগের ঋণপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে।

ভূমি কর্ষণপূর্বক নীল প্রস্তুত করা নীলকরের দ্বিতীয় কার্য। তিনি যেমন প্রথম কার্য সম্পাদনার্থে প্রজাদিগকে যথার্থ মূল্যদানে অস্বীকার পান, সেইরূপ দ্বিতীয় কার্য সাধনার্থে তাহারদিগকে সমুচিত বেতনে বঞ্চিত করেন। তিনি এই পরিবর্তনীয় নিয়ম নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন, যে কাহাকেও উচিত বেতন প্রদান করিবেন না, সুতরাং তাহারা পার্যমাণে কোন ক্রমেই তাহার কর্ম স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু তাহারা কি করিবে? নীলকর সাহেবের প্রবল প্রতাপ, ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও করালমূর্তি স্মরণ করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়। যখন কোন কোন স্থলে ভূস্বামিরাও তাহার নিকট পরাভব মানেন, তখন অধীন দীন কৃষকেরা কোথায় আছে? তাহার সুশিক্ষিত দুরন্ত দূতেরা বলপ্রকাশপূর্বক তাহারদিগকে গৃহীত করিয়া নীলের কার্যে নিযুক্ত করে। কেবল

কৃষাণেরাই যে নীলকর ও তাহার অনুচরদিগের বল ও ক্রোধ প্রকাশের স্থল এমত নহে; যাহারা গাড়ি নৌকা বা মস্তকে করিয়া নীল-পত্র বহন করে, ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য করে, তাহারদিগেরও প্রতি এই প্রকার ব্যবহার। কৃষকদিগের ন্যায় তাহারাও সমুচিত বেতন প্রাপ্ত হয় না, এবং তন্নিমিত্তে নীলকরের কার্যে কোনমতেই আসিতে চাহে না। কিন্তু তাহারা মনে মনে অসম্মত হইলে কি হইবে? সাহেবের অনিবার্য অনুমতি অবশ্যই অবশ্য পালন করিতে হয়—স্বাভিমত সমুদায় কর্মক্ষতি করিয়াও তাহার কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। হায়! যাহারা কেবল দণ্ডভয়ে আপনার অনভিমত কার্যে এইরূপ নিয়োজিত থাকে, গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্র ও বর্ষা ঋতুর অজস্র বারিবর্ষণ সহ্য করে, তাহারদিগের কি বিজাতীয় যন্ত্রণা! তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া হল চালনা করুক, হস্ত দ্বারা নীলভূমির তৃণ উৎপাটন করুক, নীলপত্র ছেদন করুক, তৎপূর্ণ নৌকাই বা বাহন করুক, তাহারদের অন্তঃকরণ কদাপি সে স্থানেও সে কার্যে নিবিষ্ট থাকে না। যখন কৃষকেরা নীলকরের নীলক্ষেত্র কর্ষণ করে, তখন তাহারা আপনার ভূমি ও আপনার শস্য স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়!— স্বসন্তানবৎ স্নেহাস্পদ শস্য বৃক্ষগুলি স্বচক্ষে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়! যে সময়ে তাহারদের স্বীয় ভূমি কর্ষণপূর্বক সম্বৎসরের অন্নসংস্থান করা আবশ্যক, যে সময়ে তাহারা স্বকীয় কার্য সমাধান করিতেই স্বাবকাশ পায় না সেই সময় তাহারদিগকে অযথোচিত বেতন স্বীকারপূর্বক অন্যের কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ক্ষয় করিতে হয়।

নীলকরের নীল-ঘটিত কার্য করিয়া প্রজাদিগকে যেরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। কিন্তু তিনি ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অন্যান্য নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে থাকেন। নীলক্ষেত্রে লোকের গো সকল চারণ করে বলিয়া তাহারদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন; গৃহস্থের নিকট স্বেচ্ছানুযায়ী ধনপ্রাপ্ত না হইলে মোচন করিয়া দেন না। কিন্তু কেবল নীলকর সাহেবের নিকট দণ্ড দিয়া লোকের নিস্তার নাই। তাহার কর্মচারিরা স্বকীয় লোভের চরিতার্থতা সাধনের এমন উপায় প্রাপ্ত হইলে কেন পরিত্যাগ করিবেন? তাহারা তদুপলক্ষে তাহারদের নিকট নানাপ্রকারে ধনগ্রহণ করেন। না দিলে, তাহারা ছলে বলে কৌশলে তাহারদের গোগুলি আনয়ন করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখেন; সুতরাং দীন দুঃখী প্রজাদিগকে তাহারদের লোভানলে অবশ্যই আহুতি প্রদান করিতে হয়। কোন কোন স্থানের এই প্রকার বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়, যে যাহারদিগের যতগুলি গরু আছে, তাহারা তাহার সংখ্যানুসারে নির্দিষ্ট বার্ষিক প্রদান করিয়া থাকে। নীলকরের কর্মচারিদিগের চরিত্রের বিষয় কি বলিব? তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। তাহারা ভদ্রলোক বলিয়া বিখ্যাত বটেন, কিন্তু ব্যবহারানুসারে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে হইলে তাহারদিগকে এ আখ্যা প্রদান করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যৎকিঞ্চিৎ অঙ্ক শিক্ষামাত্র তাহারদের বিদ্যার সীমা; তাহারা বিদ্যারসের স্বাদ গ্রহণও করেন না, নীতিশাস্ত্রেও শিক্ষিত হয়েন না। বিদ্যা ও ধর্মবিহীন লোকের যে প্রকার আচরণ হওয়া সম্ভব, তাহা কাহার অগোচর আছে? তাহারদের মুখশ্রীতে কেবল লোভ ও নির্দয়তার নিদর্শনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়; জ্ঞান ও ধর্মের চিহ্নমাত্রও দৃষ্টি করা যায় না। তাহারদের সন্তানরাও প্রায় তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়,

তাহারদিগেরই ন্যায় বিদ্যাশিক্ষা করে, এবং তাহারদের নিকট শিক্ষা লিখিয়া ক্রমে ক্রমে নীলকুঠীর কোন একটা সামান্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া পিতা পিতৃব্যাদির ন্যায় অহিতাচার আরম্ভ করে। এইরূপে পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে দুর্বৃত্ত লোকদিগের এক এক সম্প্রদায় প্রস্তুত হইয়া লোকোপদ্রবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। নীলকুঠী সম্পর্কীয় অনেক লোকেরই এই প্রকার স্বভাব।

নীলকর ও তাঁহার কর্মচারিরা পদে পদে প্রজাদিগের উপর যে প্রকার অত্যাচার করেন, তা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। তাহার দুর্জয় লোভ রিপুর উপভোগ যদি এতাবন্মাত্রেও পর্যাপ্ত হইত, তথাপি অনেক লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা পাইত। কিন্তু তাহার ধন লালসা অজস্র উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া এ প্রকার প্রবল হইয়া ওঠে, যে তিনি অন্যের ধন হরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। সচ্চরিত্র ভদ্র ইংরাজেরা নীলকর ব্যবসায় অবলম্বন করেন না। প্রায় যত নির্দয় অভদ্র লোকেই এ বৃত্তি গ্রহণ করে। কোন কোন নিষ্ঠুর নীলকরের এ প্রকার কুচরিত্র শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যে তাহারা এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তির ভূমিতে সতেজ সুচারু নীলবৃক্ষ দৃষ্টি করিলে ক্ষনমাত্র আর লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না; অবিলম্বে লোক প্রেরণ করিয়া তাহা ছেদন করিয়া আনেন। কৃষ্ণনগর জেলার কত কত ব্যক্তি তত্রস্থ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে পুনঃ পুনঃ ক্ষতি স্বীকার করিয়া এবং অবশেষ নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া তাহারদিগকে আপন আপন কুঠী ও তদীয় উপকরণ সমুদায় বিক্রয় করিয়াছেন। ফলতঃ সাহেবদিগেরও তাহাই মনস্কামনা তাহা সিদ্ধ হইলেই তাহারা চরিতার্থ হয়েন। তাহারা আপনাদিগকে স্বীয় অধিকারের একাধিপতি জ্ঞান করেন, এবং কোন ব্যক্তির উপর কোন বিষয়ে অনুমতি করিলে সে যদি তৎপ্রতিপালনে কিছুমাত্র ত্রুটি করে, তবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ছলেবলে কৌশলে তাহার নিগ্রহ করিবার চেষ্টা পায়েন; শুনিতে পাই, কোন কোন নীলকর আপনার গণাক্রান্ত দস্যুদল দ্বারা তাহার গৃহ পর্যন্ত আক্রমণ করান।[২১]

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, অন্যের কথা থাকুক, মহাপরাক্রান্ত দুর্দান্ত ভূস্বামীরাও তাহারদিগের নিকট পরাভব মানেন, মধ্যে মধ্যে ভূস্বামীদিগের সহিত নীলকরদিগের ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে হত আহত হইয়া অনেকানেক লোক নষ্ট হয় ও ক্লেশ পায়।[২২] শ্রুত হওয়া গিয়াছে, কোন কোন নীলকর সাহেব গৃহদাহ করিয়া ভূস্বামি বিশেষের প্রজাদিগের সর্বস্বান্ত করিয়াছেন। যদিও বহুতর বিবাদ বিসম্বাদের সংবাদ বিচারপতিদিগের কর্ণগোচর হয় না, তথাপি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্বোক্ত কলহ ও দণ্ডাদণ্ডি সমাধানার্থে দুঃশীল ভূস্বামীদিগের ন্যায় নিদারুণ নীলকরেরাও যাষ্টিক লোক নিযুক্ত করিয়া রাখেন। দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজারা তাহারদিগকে কালান্তক যম স্বরূপ জ্ঞান করে! তাহারা স্বেচ্ছাচারিবৎ ব্যবহার করিয়া লোকের উপর অত্যাচারই করে! তাহারা চৌর্য ও দস্যুবৃত্তি করে, ও সুযোগ পাইলেই পথিকদিগকেও আক্রমণ করিয়া তাহারদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করে। তাহারা সম্রাটস্বরূপ নীলকরের লোক, সুতরাং তাহারদিগকে নিবারিত করে কাহার সাধ্য? এইরূপে প্রজারা নীলকর ও তদীয় অনুচরদিগের দ্বারা নিষ্পীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়া দুঃখরূপ দুঃসহ দাবদাহে

চিরকাল দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে তাহারদের এ দুঃখ প্রতিকারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা কাহাকে এ মর্মবেদনা জ্ঞান করিবেক? কাহার নিকটেই বা ক্রন্দন করিবেক? কে বা তাহারদের দীনদশা ও অশ্রুপূর্ণ নেত্র দেখিয়া দয়া প্রকাশ করিবেক? এদেশীয় প্রধান রাজপুরুষেরা মফঃস্বলের শান্তিরক্ষক কর্মকর্তাদিগকে স্বজাতীয় লোকের নামে অভিযোগ শ্রবণ করিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন? তাহারদের এই আজ্ঞা বলবৎ আছে, যে যদি কেহ ইংরাজের নামে অভিযোগ করিতে চাহে, সুপ্রিম কোর্টে আসিয়া করুক। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এমত অযৌক্তিক নিন্দনীয় নিয়ম আর কোথাও নাই। যে দীন-দরিদ্র প্রজারা আপনারদের উদরান্ন আহরণের নিমিত্তে সর্বদা ব্যাকুল, তাহারদের সকল কর্মক্ষতি করিয়া পরিবারের অনাহার মৃত্যু স্বীকার—সমস্ত পাথেয় ব্যয় সম্পাদন পূর্বক অভিযোগার্থে কলিকাতায় আগমন করা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? এ নিমিত্ত তাহারা নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া নিরাশ হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি পূর্বকার নিয়ম পরিবর্তন পূর্বক মফঃস্বলে ফৌজদারি বিচারালয় সমুদায়ে ইংরাজদিগেরও দোষাদোষ বিচার হইবার কল্পনা হইতেছিল; কিন্তু তাহা এখনে স্থগিত হইল; স্থগিত কি, রহিত বলিলেও বলা যায়। ইংলন্ডস্থ রাজপুরুষেরা কতিপয় অবশ্যপোষ্য স্বজাতীয় ব্যক্তির অভিমান রক্ষার অনুরোধ বশত অত্রত্য কোটি কোটি দরিদ্রের দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইলেন না।

এ দেশীয় লোকের মফঃস্বলস্থ মাজিস্ট্রেটদিগের নিকটে নীলকরদিগের নামে অভিযোগ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু তাহাদের এ দেশীয় লোকের নামে অভিযোগ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। ইহাতে বিচারস্থলেও নীলকরদিগেরই প্রভুত্ব ও পরাক্রমপ্রকাশ পায়। তাহারা আপনারা নির্ভয়ে থাকিয়া এদেশীয় লোককে অনায়াসে অভিভূত করিতে পারে। জজ মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি ইউরোপীয় বিচারক ও নীলকরদিগের সর্বদা পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটনা, একত্র ভ্রমণ ও মৃগয়ার গমন, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণাদি দ্বারা পরস্পর আনুগত্য ও প্রণয়বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাতে লোক বোধ করে, যে নীলকর সাহেব ভোজনকালে মাজিস্ট্রেট বা জজ সাহেবের কর্ণ সন্নিধানে মৃদুস্বরে দুটি কথা জল্পনা করিয়া যেরূপ ফললাভ করিতে পারেন, এদেশীয় ভূস্বামিরাও আপনার যথার্থ পথ রক্ষার্থে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াও তদ্রূপ পারেন না। অতএব ভীরু স্বভাব প্রজারা নীলকরদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত বোধ করিয়া তাহারদিগকে অত্যন্ত ভয় করে, তাহারদের সহিত বিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয়, ও তাহারদের অত্যাচার জনিত দুঃসহ-দুঃখানলে অবিরত দগ্ধ হইয়াও তৎপ্রতিকার চেষ্টায় পরাম্মুখ থাকে।

ক্রমে ক্রমে এই পত্রিকার তিন সংখ্যায় প্রজাদিগের দুরবস্থার বিষয় বিবরণ করা গেল। এই বিষম দুঃখদায়ক বিষয় বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার নহে। যেমন পৃথিবীর মধ্যে যতদূর খনন করা যায়, ততই প্রগাঢ়তর অগ্নি-প্রভাব অনুভূত হয়, সেইরূপ এদেশীয় প্রজাদিগের দুর্দশার বিষয় যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই তাহারদের ভূরি ভূরি যন্ত্রণার কারণ প্রকাশ পাইতে থাকে। কি প্রকারে যে তাহারদের এই অতি প্রভূত দুঃসহ দুঃখ নিরাকৃত হইবে, তাহা এক্ষণে অনুমেয়ও নহে। ভূস্বামীর অত্যাচার, নীলকরের অত্যাচার রাজকর্মচারির অত্যাচারের ও রাজার অশাসন ও অবিচার। যাহারা এই সমুদায় অনভিভবনীয় অত্যাচার

ক্রমাগত সহ্য করিতেছে, তাহারদের আর কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? তাহারা ধন বিষয়ে দরিদ্র, জ্ঞান বিষয়ে দরিদ্র; ধর্ম বিষয়ে দরিদ্র এবং বল ও বীর্য বিষয়েও দরিদ্র হইয়াছে। তাহারদের এই দারুণ দুরবস্থা নিরাকরণেরই বা উপায় কি? আমারদিগের দেশীয় লোকের পরস্পর ঐক্য নাই, এবং জনসমাজের অধস্তন শ্রেণির সহিত উপরিতন শ্রেণির মিলন নাই। যাহারদের স্বদেশের দুরবস্থা মোচনের ইচ্ছা আছে, তাহারদের তদুপযোগী সামর্থ্য নাই, যাহারদের সামর্থ্য আছে, তাহারদের ইচ্ছা নাই। কোন পর্বতোপরি আরোহণ করিতে গেলে যতদূর উত্থিত হওয়া যায়, ততই গ্রীষ্ম হ্রাস ও শীতাধিক্য বোধ হয়। সেইরূপে এদেশীয় জনসমাজরূপ গিরিশিখরের যত উর্ধভাগ প্রত্যক্ষ করা যায়, ততই অনুৎসাহ, অননুরাগ, অযত্ন ও ঔদাস্যেরই নিদর্শন সকল দৃষ্ট হইতে থাকে। কি প্রকারে যে এই সকল দুর্নিবার প্রতিবন্ধক মোচন হইয়া এদেশের পরিত্রাণ সাধন হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। রাজপুরুষেরা মনোযোগ করিলে প্রজাদিগের বর্তমান দুরবস্থার অনেক প্রতিকার করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই। যদি তাহারা বিশিষ্টরূপে তদ্বিষয়ের কারণ সমুদায় অনুসন্ধান করেন ও কায়মনোবাক্যে তন্নিবারণের চেষ্টা পায়েন, তবে দুঃস্থ প্রজাদিগের অবশ্যই দুঃখ হ্রাস হইতে পারে। তাহারা তাহারদিগকে যন্ত্রণানলে অহরহ দগ্ধ হইতে দেখিয়াও যে কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করেন না, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। ইহাতে তাহারদের কর্তব্য কর্মের অন্যথা হইতেছে, এবং তন্নিমিত্তে তাহারা ঈশ্বর সন্নিধানে অপরাধী হইতেছেন তাহার সংশয় নাই।

তথ্যসূত্র

১. কলিকাতার দক্ষিণদিকস্থ এক ভূস্বামীর এইরূপ ব্যবহার শ্রবণ করা গেল, যে নির্দিষ্ট কালের পর এক বৎসরের মধ্যে যত রাজস্ব আদায় হয়, শতকরা ২৫ টাকা করিয়া তাহার বৃদ্ধি গ্রহণ করেন।

২. বারোয়ারী

৩. কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব কোন প্রসিদ্ধ ভূস্বামী একদা আপনার অধিকারস্থ প্রজাদিগকে কহিয়াছিলেন, "ওহে বাবা সকল! আমি ব্রাহ্মণ, এক মুষ্ঠি করিয়া চাউল ভিক্ষা দিলে আমরা যথেষ্ট হয়।" ইহা শুনিয়া তাহারা সকলেই কিছু কিছু প্রদান করিলেক। তাহারা অতি সরল স্বভাব; তাঁহার কুটিল ভাব অবগত হইতে পারিল না। কিছুদিন পরে তিনি সমুদয় তন্ডুলের সমষ্টি করিয়া তাহার ১৫০০ টাকা মূল্য নিরূপণ করিলেন, এবং এই অখণ্ড্য আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন, যে প্রজাদিগকে বৎসর বৎসর এই ১৫০০ টাকা করিয়া প্রদান করিতে হইবেক। প্রথমে যাহা ভিক্ষা দিল, পরে তাহা বার্ষিক হইল। কেমন প্রবঞ্চনা! কি অত্যাচার!

৪. প্রায় দুই বৎসর হইল, কলিকাতার আর এক ভূস্বামী আপনার গৃহ নির্মাণ উপলক্ষ্য করিয়া স্বাধিকারস্থ প্রজাদিগের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করেন। সে ধন ধনাগারে সঞ্চিত বা ইন্দ্রিয়ের উপভোগ সমাধানার্থেই ব্যয় হইয়া থাকিবেক।

৫. কলিকাতার দক্ষিণাংশে এক ভূস্বামী গাড়ি ও গরুর উপর শুল্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর হইল প্রজারা তন্নিমিত্তে রাজ-বিচারালয়ে অভিযোগ করাতে তাহার ধন-দণ্ড হয়।

৬. তাঁহাকে প্রতি মণে তিন আনা করিয়া লবণের শুল্ক দিতে হয়, নতুবা তাহার হস্ত হইতে

কোনক্রমে পরিত্রাণ প্রাপ্তির উপায় নাই। এই দুর্দান্ত ভূস্বামী লবণ ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয়াদি বিষয়ে স্বাধিকারে সন্নিহিত অন্য অন্য অধিকারস্থ লোকের উপরও এইপ্রকার দস্যু-বৃত্তি করিয়া থাকে।

৭. যাহার যত শক্তি, সে তত বল প্রকাশ করে। অতএব প্রতি টাকায় কেহ দুই আনা, কেহ তিন আনা, কেহ চারি আনা করিয়া ইজারাদারি লয়।

৮. কেহ প্রতি টাকায় অর্ধআনা এবং কেহ কেহ এক আনাও মাসিক বৃদ্ধি গ্রহণ করে। যাহারা ধান্যের বাড়ি দেয়, তাহারা সংবৎসরে বৃদ্ধি স্বরূপে মূল ধান্যের অর্ধেক প্রাপ্ত হয়। শতকরা ৫০ ও ৭৫ টাকা বৃদ্ধি! ইহার পর ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর কি আছে!

৯. অনেকানেক ভূস্বামীও প্রজাদিগকে ঋণদান করেন। এমত স্থলে তিনিই তাহারদের মরণ জীবনের একমাত্র কর্তা। তিনি একাকী সমুদায় শস্য লইয়া গৃহসাৎ করেন।

১০. অনেকানেক ভূস্বামীর এরূপ আচরণ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যে যদি তাঁহারা স্বকীয় প্রয়োজন সাধনার্থে আপন প্রজা বিশেষের আম্র, কাঁঠাল, বা অন্য বৃক্ষ ছেদন করিবার অনুমতি দেন, তবে সেই প্রজাকে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে হয়। ইহাতে দীন দুঃখী প্রজার বৃক্ষটি যায়, কিন্তু তাহার ফল ভোগার্থে ভূস্বামীকে যে কর দিতে হইত তাহা রহিত হয় না। তিনি সেই বৃক্ষস্থানে আর একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ রোপণ করিতে কহিয়া পূর্ববৎ করগ্রহণ করিতে থাকেন।

আর এ প্রকারও ঘটে, যদি কোন ভূম্যধিকারের পাঁচ অংশি থাকে এবং তন্মধ্যে কেহ প্রজার নিকট কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন, তবে তাহাকে ক্রয় করিয়াও আর চারিজনকে চারিটি সেই দ্রব্য দিতেই হইবে, নতুবা তাহার নিস্তার নাই।

১১. কুমর, বারুই, মুটে, মজুর, ধোপা প্রভৃতি সকলকেই নায়েব, গোমস্তা, মুহুরি প্রভৃতির এইরূপ সেবা করিতে হয়। আর ভূস্বামী যখন স্বাধিকারে স্থিতি করেন, তখন তাঁহাকেও নিজধনে বাসার ব্যয় সম্পাদন করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন তাহার বাটিতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে বিনামূল্যে চতুর্দিক হইতে নানাপ্রকার সামগ্রীপত্র আসিতে থাকে।

১২. শুনা গিয়াছে, কোন কোন ভূস্বামী কুত্রাপি অপহৃত বস্তুর সন্ধান পাইলে তদ্বিষয় বিচার করিবার ছলে তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ করিয়া তাহা আনয়ন করেন, এবং আনয়ন করিয়া নিজ গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখেন।

১৩. কিন্তু ইহা আশ্চর্যের বিষয়, যে এইরূপ পরিমাণ প্রজার ভূমি প্রায়ই অধিক হইয়া থাকে, কখনও ন্যূন হইতে দেখা যায় না।

১৪. অর্থাৎ প্রথমে যদি কোন প্রজাকে নির্দিষ্ট করে এক খণ্ড ভূমি প্রদান করেন, এবং কিছুদিন পরে অন্য কোন ব্যক্তি যদি ভূমির কিঞ্চিৎ অধিক কর দিতে চাহে, তবে পূর্বকার প্রজাকে অকারণ অধিকার-চ্যুত করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে ঐ ভূমি প্রদান করেন।

১৫. শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এ বিষয় রাজপুরুষদিগের গোচর হইয়া বিচারারূঢ় হইয়াছিল। লোকে কহে, তিনি ৩০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া পরিত্রাণ পান। যাহার ধন ব্যয়ের সামর্থ আছে, যে ব্যক্তি এদেশে দিবা দ্বিপ্রহর কালে দস্যুবৃত্তি করিয়া মুক্ত পুরুষের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারে!

১৬. ভূম্যধিকারীর লোকে বল দ্বারা তাহারদের ধান্যগ্রহণ করে, গো সফল হরণ করে, এবং তাহারদিগকে গোনী-বন্ধ করিয়া জল-মগ্ন করে ও প্রহার করে। ভূস্বামী ও দারোগা এবং তাহারদের কর্মচারিরা প্রজাদিগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলিকাতাবাসী অনেক লোকে সবিশেষ অবগত নহেন। অতএব পশ্চাৎ কয়েক প্রকার কায়দণ্ডের বিবরণ করা যাইতেছে, যথা—

১. দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত করে।

২. চর্মপাদুকা প্রহার করে।

৩. বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন করিতে থাকে।*

* (২০শে জ্যৈষ্ঠের 'ভাস্কর' পত্রে ইহার উদাহরণ আছে।)

৪. খাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকা মর্দন করে।

৫. ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ করায়।

৬. পৃষ্ঠভাগে বাহুদ্বয় নীত করিয়া বন্ধন করে এবং বন্ধন করিয়া বংশদণ্ডাদি দ্বারা মোড়া দিতে থাকে।

৭. গাত্রে বিছুটি দেয়।

৮. হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় নিগড় বন্ধ করিয়া রাখে।

৯. কর্ণধারণ করিয়া ধাবন করায়।

১০. কাটা দিয়া হস্ত দলন করিতে থাকে।

১১. গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে পদদ্বয় অতি বিযুক্ত করিয়া ইষ্টকোপরি ইষ্টক হস্তে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে।

১২. অত্যন্ত শীতের সময় জলমগ্ন করে ও গাত্রে জল নিঃক্ষেপ করে।

১৩. গোনীবদ্ধ করিয়া জলমগ্ন করে।

১৪. বৃক্ষে বা অন্যত্র বন্ধন করিয়া লম্বমান করে।

১৫. ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় পুরিয়া রাখে। (সে সময়ে গোলার অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এবং ধান্য হইতে প্রচুর বাষ্প উঠিতে থাকে।)

১৬. চুনেব ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

১৭. কারারুদ্ধ করিয়া উপবাসী রাখে, অথবা ধান্যের সহিত তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া তাহাই এক সন্ধ্যা আহার করিতে দেয়।

১৮. গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঙ্কা মরীচের ধূম প্রদান করে।

** অর্থাৎ দুইখান কঠিন বাখারির এক দিক বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মর্দন করিতে থাকে। এই প্রাণ-ঘাতক যন্ত্রের নাম কাটা।

* সম্প্রতি এ বিষয়ে এক উদাহরণ উপস্থিত হইয়াছে। নবদ্বীপের নিকটবর্তী কোন গ্রামের এক ভূস্বামি তৎপ্রদেশীয় গ্রামান্তরবাসী কোন ব্যক্তির কন্যাকে উদ্বাহার্থে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাহা স্বীকার না করাতে তাহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, এবং তিনি যষ্টিধারী লোক প্রেরণ করিয়া বল দ্বারা সেই কন্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন।

যে দেশে রাজশাসনের নিয়ম আছে, সেখানে এই সকল ব্যাপারের ঘটনা হওয়া আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হয়।

১৭. এত অধীনতা অপেক্ষায় মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

১৮. লেঠেল।

১৯. ভূস্বামী প্রজাবিশেষের কোন দোষ উপলক্ষ্য করিয়া তাহার উপর দুই এক টাকার চিঠি দেন; তাহাই তাহার রক্ষিত দস্যুদিগের পালিত পুত্রদিগের লভ্য।

আর গুরুতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে কোন কোন ভূস্বামীস্বাধিকারস্থ বলবান ও বীর্য্যবান। লোকদিগকে আনয়ন করিয়া ঐ সকল দস্যুর সমভিব্যাহারে দাঙ্গায় প্রেরণ করেন। উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস তাহারদিগকে বিনা বেতনে ভূস্বামির কার্য করিতে হয়, সে কয়দিন তাহারদিগের সমস্ত কর্মক্ষতি হয়, এবং তাহারা দাঙ্গায় হত বা আহত হইলেই হইতে পারে।

ভূস্বামীর অত্যাচার ও প্রজার দুরবস্থার বিষয় লিখিয়া শেষ করা যায় না—এক এক প্রকরণ উপস্থিত হইলে প্রসঙ্গক্রমে তদনুরূপ ভূরি ভূরি প্রকরণ উদয় হইতে থাকে। ভূস্বামিদিগের মাঙ্গনের অর্থাৎ ভিক্ষাস্থলে অপহরণের বিষয়পূর্ব বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তাহারদের উপদ্রব পর্যাপ্ত হয় না। আপনার বারম্বার ভূয়সী ভিক্ষা ব্যতিরেকে গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্ম পণ্ডিত এবং আশ্রিত ও আত্মীয় ব্যক্তি বিশেষের নিমিত্তেও পুনঃ পুনঃ মাথট করেন; এ কারণেও অবশ্য দীনদরিদ্র প্রজাদিগকে বৎসর বৎসর বহুদিবস অনাহারি থাকিতে হয়। যদি ইহারদিগকে নিরম্বু উপবাস না করিতে হয়, তাহাতেই বা কি? এই প্রস্তাব লেখকের কোন পরম মিত্র এইরূপ ভাবপ্রকাশ করিয়াছেন, যে তাহারদিগকে দুই এক মুষ্টি অন্ন সহকারে কেবল বনের লতা পত্রাদি দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইল। তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্তই বা শোকাকুল না হইবেক।

সম্প্রতি মাঙ্গনের বিষয়ে আর এক চমৎকার ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কলিকাতার দক্ষিণাংশের কোন ভূস্বামী একদা কারারুদ্ধ হইলে তাহার কারাগৃহে থাকিবার ব্যয় নির্বাহার্থে প্রজাদিগের নিকট এক মাথট হয়; তাহার নাম গারদ সেলামি। শুনিতে পাই, অদ্যাবধি নাকি বৎসর বৎসর গারদ সেলামি আদায় হইয়া থাকে।

২০. কৃষ্ণনগর জেলার কোন কোন অতি বিখ্যাত দুর্দান্ত নীলকরের এইরূপ কুব্যবহারের বিষয় শ্রুত হওয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ খড়ো নদীর তীরস্থ কোন গ্রামে এইপ্রকার ঘটনা হইবার সবিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, অত্যাচারিত ব্যক্তির এইমাত্র দোষ যে নীলকর সাহেব তাহার নিকট ঋণ চাহিলে তিনি তাহা প্রদান করেন নাই।

২১. শুনা গিয়াছে, ৫।৬ বৎসর পূর্বে কৃষ্ণনগর জেলার কোন নীলকর সাহেবের সহিত এক মোসলমান ভূস্বামীর ঘোরতর দণ্ডাদণ্ডি হয়, তাহাতে সাহেব এক একবারে প্রজাদের ৪০০/৫০০ গরু নদীতে নিক্ষেপ করেন, এবং হত ও আহত হইয়া উভয়পক্ষীয় অনেক ব্যক্তি নষ্ট হয়। ফলতঃ নীলকর ও ভূস্বামীদিগের দণ্ডাদণ্ডির বিষয় প্রসিদ্ধই আছে। তাহারা প্রজাদিগের সর্বস্বান্ত করিয়াও নিরস্ত নহেন, যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষ্যে তাহারদের প্রাণনাশেরও হেতু হয়েন।

[তত্ত্বোধিনী পত্রিকা বৈশাখ, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, ১৭৭২ শক]

অক্ষয়কুমার দত্ত

১৮২০-১৮৮৬

কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা

বালুময় উত্তপ্ত মরুভূমি ভ্রমণ পূর্বক ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া সম্মুখে কোনো নিবিড় কানন দৃষ্টি করিলে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে; কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিয়া যদি কেবল কতকগুলি নিষ্ফল বৃক্ষ ও শুষ্ক অথবা পঙ্ক পূরিত সরোবরে দেখা যায়, তবে কি প্রকার নিরাশ হইতে হয়! তদ্রূপ কোনো গ্রামবাসী স্বদেশের হিতৈষী বিজ্ঞ ও সুচরিত্র ব্যক্তি সমুদয় পল্লীগ্রামের বিষম দুরবস্থা জন্য বিষণ্ণ হইয়া, কলিকাতার বাহ্য শোভা এবং তত্রস্থ লোকের নানা হিতজনক বিষয়ে মৌখিক আন্দোলন অবগতি পূর্বক অতিশয় আনন্দিত হয়েন, কিন্তু তাহারদিগের আচার, ব্যবহার, চরিত্র বিষয়ে যত নিগূঢ় রূপে অনুসন্ধান করেন, ক্রমশ ততই ক্ষুব্ধ হইতে থাকেন। বৃদ্ধ যুবা বালক, ধনী মধ্যবর্তী দরিদ্র, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন না।

এইক্ষণকার প্রাচীন লোক এবং প্রাচীনদিগের সম্পূর্ণ মতানুগামী যাহারা, —বিষয়োপযোগী হস্তলিপি এবং কিঞ্চিৎ অংকপাত মাত্র যাহারদিগের বিদ্যার সীমা, এবং যাহারদিগের এই প্রত্যয় যে কেবল অর্থ উপার্জনই সমুদয় বিদ্যায় তাৎপর্য ও তাবৎ জীবের সুখ—স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল তাহারা চিন্তাই করেন না –'দেশের উপকার' এ বাক্যের অর্থও তাহাদিগের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহারা কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন—এই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক পাদও অগ্রসর হয়েন না—সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্তে রক্ষা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে কৃতকার্য বোধ করেন। ইহার জন্যেই দিবা-রাত্রি ব্যতিব্যস্ত, এ কর্মের সমাধা পরে যে কিঞ্চিৎকাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় অলীক আমোদেই ক্ষেপণ করেন। ইহারদিগের মধ্যে যাহারা আপনারদিগকে ধার্মিক বলিয়া অভিমান করেন, তাহারা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় ধর্মের অনুষ্ঠান করেন। বিষয় সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ সম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাহারদিগের ধর্ম প্রবৃত্তির প্রধান সূত্র; নতুবা প্রতিমা অর্চনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা প্রভৃতির জন্যেই বিশেষ মনোযোগী হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় অনেকে কেন করেন? বিশেষত তাহারদিগের উপাসনায় সাত্ত্বিকতার কি অপূর্ব চিহ্ন দেখা যায়, যাহারা আড়ম্বরের সহিত বিবিধ পূজার সামগ্রী সকল সম্মুখে রাখিয়া বিষয় ব্যাপার তাবৎ নিপুণ রূপে তৎকালে সমাধা করেন। এই সমুদয় মনুষ্যের ক্রোড়ে রাশিকৃত ধন স্থাপিত হইলেও তাহারা স্বদেশের বিন্দুমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্প্রদায় ভুক্ত দাতাও অনেকে আছেন, স্বীয় মণ্ডলী মধ্যে যশ উপার্জন করা তাহারদিগের প্রধান তাৎপর্য; অতএব বিবাহ ও দলাদলি প্রভৃতি কর্মে কেহ কেহ এককালে সহস্র সহস্র মুদ্রা অক্লেশে দান করেন। যিনি পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা একদিনে ব্যয় করিয়া থাকেন, তিনি সেই পুত্রের অধ্যয়ন হেতু মাসিক পাঁচ টাকাও প্রদান করিতে ক্লেশ

বোধ করেন। ব্রাহ্মণদিগের অজ্ঞান প্রবাহ রক্ষার প্রধান হেতু ইহারাই হইয়াছেন। দান বিষয়ে ইহারা পাত্রাপাত্র বিচার করেন না; সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও যে কোনো ব্রাহ্মণ বিবিধ ধর্ম চিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকে ধার্মিক রূপে প্রকাশ করে, অথবা তাহারদিগের যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয় মন্ত্র সকল কেবল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই যথেষ্ট সমাদর পূর্বক ধন প্রদান করিয়া থাকেন, সে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাপন্ন কি না ইহা ভ্রান্তিতেও বিবেচনা করেন না। এই প্রকার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ দশাকর্মোপযোগী কতকগুলিন মন্ত্র অভ্যাস করিয়াই আপনারদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন; —কঠোর জ্ঞানাভ্যাসে আর কেন পরিশ্রম করিবেন? তথাপি ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের পূর্বাভিমানেই মগ্ন রহিয়াছেন—বিবেচনা করেন না যে ব্রাহ্মণ নামের উপযুক্ত তাহারদিগের আর কি পদার্থ আছে? অন্যকে ধর্মের উপদেশ দিবেন কি? আপনারা তাহার সম্যক বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন, এবং অজ্ঞান ও কুপ্রবৃত্তি প্রযুক্ত বিজ্ঞ সমাজে ক্রমাগত হতাদর হইতেছেন। ইহা কি ব্রাহ্মণদিগের সামান্য লজ্জার বিষয় যে, যে শূদ্রেরা পূর্বে তাহারদিগের আজ্ঞাকারী দাস ছিল, এইক্ষণে তাহারা সেই শূদ্রদিগের আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছেন—ধন সেবা জন্য তাহারদিগের সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যাহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া দম্ভ করেন, অনাহূত অনাদৃত, তিরস্কৃত হইলেও ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাহারদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে, এবং ধনীদিগের উপাসনা আন্তরিক ধর্মানুষ্ঠান হইয়াছে। কি জানি তাহারা অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখেন, এনিমিত্তে কপালে দীর্ঘ রেখা, হস্তেতে কোষাপাত্র, এবং তদুপরি গঙ্গাস্নানের প্রত্যক্ষ চিহ্নস্বরূপ সিক্ত বস্ত্রখণ্ড পরিপাটি রূপে সংস্থাপন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্বাদ করত উপস্থিত হয়েন। অনেক মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কিঞ্চিৎ ধনপ্রাপ্ত হইলে দাতার মনোরম্য যে কোনো অভিপ্রায়, তাহাকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া প্রায়বক্ত্য করেন, এবং কত অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা স্বহস্তেও লিখিয়া প্রদান করেন! এবম্প্রকার অযোগ্য আচরণ প্রযুক্ত ক্রমে তাহারা সংসারে অধোগামী হইতেছেন, তদ্বিপরীতে অনেক শূদ্র জ্ঞান ও যোগ্যতা দ্বারা উচ্চপদে আরোহন করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা তাহারদিগের অধিক অপমানের বিষয় আর কি আছে যে ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো কোনো সভা হইলে শূদ্রেরা তাহার অধিপতি হয়েন? কিন্তু কি আশ্চর্য যে তাহারা সেই সেই শূদ্র সভাপতির দলাক্রান্ত বলিয়া আপনারদিগকে সম্ভ্রান্ত জ্ঞান করেন, ও লোকের নিকটে মান্য হয়েন। আপনারদিগের বৃত্তি যে ধর্মপালন তাহা তাহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং ধর্ম কি জ্ঞান প্রচারে এককালে বিরত রহিয়াছেন। কিন্তু যদি কোনো পরোপকারী ব্যক্তি জ্ঞান প্রচার, ধর্ম সংস্থাপন প্রভৃতি হিত কার্যে অনুরক্ত হয়েন, তবে তদ্দ্বারা আপনারদিগকে মান ও প্রভুত্বের হানি সম্ভাবনায় যাহাতে তাহার যত্ন নিষ্ফল হয়, এমত দুষ্ট চেষ্টা প্রতিজ্ঞা পূর্বক করিতে থাকেন, এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান ও অন্য অন্য সাংসারিক দুঃখ প্রদান করিতে সযত্ন হয়েন। ইতর বিশেষ সাধারণের নিকটে প্রভুত্ব রক্ষা ও দম্ভ প্রকাশ জন্য যাহার এতদ্রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহারদিগের পাদপদ্মধ্যায়ী শিষ্যদিগের নিকটে ঈশ্বরতুল্য মর্যাদা পালনের নিমিত্তে তাহারা কি না করিয়া থাকেন? শিষ্য সমীপে নানা প্রকার ছদ্ম ব্যবহার দ্বারা আপনারদিগকে পরম পবিত্র ঋষি তুল্য দেখান। যাহার আমিষ ভোজন ব্যতীত এক সন্ধ্যা যাপন হয় না, এবং কুলটা সংসর্গ বিনাও এক রজনী ক্ষেপণ হয় না, শিষ্য গৃহে তিনি হবিষ্যাশী হইয়া অতি শুদ্ধ সত্ব রূপে অবস্থান করেন, এবং সংযম উপবাসাদি কঠিন কঠিন নিয়ম পালন-পূর্বক পরম তপস্বীর

ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করেন। শিষ্যের বিত্তগ্রহণ জন্য গুরুদিগের এই প্রকার বিবিধ কৌশল, কিন্তু তাহার পরিত্রাণের উপায় বিষয়ে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কহেন যে প্রতিমাদি স্থূল ধ্যান দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের সোপান লাভ হইবেক। হা! একদিবস একবার মাত্র তাহার কর্ণকুহরে মন্ত্রধ্বনি প্রবিষ্ট করিয়া উপযুক্ত উপদেশ করিতে চিরকাল ক্ষান্ত থাকিলে সোপান সে কোথায় পাইবে যে তদ্দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিবেক? পরিত্রাণ দূরে থাকুক, অনেক শিষ্যের অধোগতির কারণ হয়েন। গোস্বামীরা কৃষ্ণমন্ত্রে বা রাধামন্ত্রে বা যুগলমন্ত্রে শিষ্যদিগকে দীক্ষিত করিয়া গোপাঙ্গনাদিগের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতিকে অহরহ আলোচনা করিতে অনুমতি করেন। ভণ্ড কথকদিগের সহায়তা দ্বারা শিষ্যেরাও সেই অনুমতি পালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না, বরঞ্চ কোনো নিপুণ শিষ্য সেই রাস লীলাদির অনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শক্তিমন্ত্রের উপদেশক বামাচারীরাও অল্প অনর্থের কারণ নহেন। তাহারা প্রচুর মদ্য-মাংস ভোজনাদিকে উপাসনার অঙ্গরূপে উপদেশ করেন, চণ্ডালী প্রভৃতি স্ত্রী-সঙ্গকেও অতি গুহ্য পরমার্থ সাধনরূপে ব্যাখ্যা করেন, এবং কদাপি স্বয়ং চক্রমধ্যে ভৈরবী সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইয়া চক্রেশ্বর রূপে কারণ বলে ও মন্ত্র বলে চক্রীদিগকে অভিভূত করেন, যেখানে গলিত নরমাংস পর্যন্ত তাহারদিগের লোভ হইতে পরিত্রাণ পায় না।

এই সমুদয় প্রাচীন ব্যক্তিদিগের সন্তানেরা, যাহারা ইংলন্ডীয় ভাষায় বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহারদিগের বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হয়। প্রাচীনদিগের সহিত তাহারদিগের ধর্মাধর্ম বিষয়ে কিছু মাত্র ঐক্য হয় না। পিতা অতি যত্নপূর্বক স্বীয় গৃহে প্রতিমা অর্চনার আয়োজন করেন, পুত্র তাহাকে কাল্পনিক জানিয়া অবহেলা করেন। পিতা অন্যের সহিত অসংশ্রবে আহারাদি সমাধা করেন, পুত্র কোনো জাতি বিচার করেন না—ম্লেচ্ছেরও সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া পিতার মানসিক ক্লেশের কারণ হয়েন। এই প্রকার পরিবারের মনে ক্লেশ প্রদান মাত্র অনেকের বিদ্যা শিক্ষার ফল হইয়াছে। জ্ঞানানুসারে হিতকার্য করিতে কয় ব্যক্তি প্রবৃত্ত আছেন? যদিও তাহারা পুস্তক আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করিয়াছেন যে স্বদেশের উপকার করা মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য-কর্ম, কিন্তু উৎসাহের দৃঢ়তা অভাবে তাহারদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইতেছে না। তাহারা যত দিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তত দিন গাঢ় রূপে জ্ঞানের চর্চা করেন, দেশময় বিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা করেন, ধর্মাধর্ম নানা প্রস্তাব বিচার করেন, এবং উৎসাগের সহিত স্বদেশের উপকার-জনক অনেক বিষয় কল্পনা করিয়া থাকেন। হা! যে দিন তাহারা বিদ্যালয় হইতে অবসর হয়েন, সেই দিবসাবধি তাহারদিগের বুদ্ধি, বিদ্যা, চরিত্র সমুদয় নতুন পথে ধাবিত হয়—পূর্বের উজ্জ্বল উৎসাহ ম্লান হয়, এবং স্বদেশের সুখ বাসনা অবসন্ন হয়। কতজন বিষয় কর্মে লিপ্ত হইয়া বিত্ত মোহে আচ্ছন্ন হয়েন এবং ধনোপার্জনেই সমুদয় যত্নকে সমর্পন করেন; জ্ঞান ধর্ম কি স্বদেশের হিত-বাসনা আর তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ ইংলন্ডীয় সমাজে গণ্য হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ ইংলন্ডীয় সমাজে গণ্য হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের আচার, ব্যবহার, বেশ বিন্যাস, অঙ্গ ভঙ্গী পর্যন্ত শিক্ষা করেন, এবং তাহারদিগের অবিকল প্রতিমূর্তি হইতে চেষ্টা করেন। পৃথিবীর মধ্যে তাহারা ভারতবর্ষকে কোনো অধোলোকের ন্যায় জ্ঞান করেন, তন্নিবাসি মনুষ্যদিগকে কোনো নীচ জাতি রূপে

দৃষ্টি করেন, এবং তাহারদিগের রীতি, নীতি, ভাষা পর্যন্ত সমুদয়ের প্রতি পদে পদে হেয় বাক্য প্রয়োগ করেন। জ্ঞান ধর্মের উন্নতি তাহারদিগের দ্বারা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, যখন ইংলন্ডীয় লোকের প্রথা, পরিচ্ছদ, ব্যবহার প্রভৃতি প্রচলিত করা তাহারদিগের নিকটে দেশের সমুদয় মঙ্গল হইয়াছে? কতকব্যক্তি সাধারণ লোকের অনুগামী হইয়া পুনর্বার পৌত্তলিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন—সে ধর্মে বিশ্বাস না থাকিলেও কেবল আমোদ জন্য তাহাতে মুগ্ধ থাকেন। অনেকে মৌখিক যদিও জগৎ-কারণ এক পরমেশ্বরকে স্বীকার করেন, কিন্তু দিন মধ্যে একবার শ্রদ্ধা পূর্বক তাহার উপাসনা করেন না,—কেহ পরলোক অবিশ্বাস করিয়া তাহার নিয়ম পালনেও যত্নবান হয়েন না। কতক ব্যক্তি কেবল মৌখিক বাগাড়ম্বর করিয়াই কাল হরণ করেন। তাহারা মনঃকল্পনাতে স্ত্রীদিগের নিমিত্তে কদাপি প্রকাশ্য পাঠশালা স্থাপন করিতেছেন, কদাপি বিধবার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছেন। তাহারা দেশের স্বরূপ অবস্থাকে আলোচনা করেন না—নিবিড় অন্ধকারময় পল্লীগ্রামকে স্মরণ করেন না—জ্ঞান ধর্মের যৎকিঞ্চিৎ আন্দোলন এই কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে দৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বিস্তীর্ণ ভারতভূমিকে একই দিবসে উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহারা মৌখিক যে প্রকার আন্দোলন করেন, তদনুসারে কি কার্য করিয়া থাকেন? সাধারণকে যে সকল কর্মে অনুরোধ করেন, আপনারদিগকে বিজ্ঞ জানিয়া তাহার ঈষদ্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনা করিতে কি অগ্রসর হয়েন? তাহারা প্রস্তাব রচনা মাত্র করিতে বিদ্যালয়ে যে অভ্যাস করিয়াছেন, তথা হইতে অবসর হইলেও সে বাল্য অভ্যাস তাহারদিগকে সম্যক পরিত্যাগ করে না। এ উদ্বোধন তাহারদিগের হয় না যে আলোচনা স্থল বিদ্যালয় হইতে এইক্ষণে কর্ম ভূমি সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যেখানে কর্ম-ব্যতীত অনর্থক বাগাড়ম্বরে কোনো ফল দর্শে না। শুভসূচক কর্মের মৌখিক আন্দোলন মাত্র যে ইহারা করেন সেও মঙ্গলের চিহ্ন; ইহারদিগের দ্বারা কালে দেশের উপকার যে হইতে পারে এমত আশাও আছে। কিন্তু তাহারদিগের কথা কি বলিব, যাহারা কেবল স্বয়ং নিরুৎসাহ থাকিয়াও তৃপ্ত হয়েন না, অন্য ব্যক্তিতে স্বদেশের হিতকার্যে চেষ্টিত দেখিলে তাহার প্রতি উপহাস করেন, এবং কত অযোগ্য বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করেন। ইহারদিগের এতদ্রূপ ব্যবহার নিতান্ত ক্লেশকর, কিন্তু যাহারা হতজ্ঞান হইয়া খ্রিস্টধর্মকে অবলম্বন করিয়াছে তাহারদিগের অত্যাচার অসহ্য তাহারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশের শত্রু হইয়াছে—মাতৃগর্ভকে বিদারণ করিতেছে। ইহারদিগের দ্বারাই ভারতভূমির দুর্ভাগ্যের সীমা হইল? অসাধারণ বিদ্যাভিমানী কতক যুবা ব্যক্তি বিকৃত বুদ্ধি হইয়া নাস্তিক হইতেছে; পুত্র হইয়া পিতাকে—পিতার সত্তাকে অমান্য করিতেছে। তাহারা জগদীশ্বরকে গ্রাহ্য করে না, পরলোক তাহারদিগের বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না; ঐহিক সুখ সম্ভোগে বিমুগ্ধ রহিয়াছে।

এইরূপে এইক্ষণকার বিদ্বান্ নামে খ্যাত যাহারা, তাঁহারদিগের দ্বারা উপকার না হউক, অপকার নানা প্রকারে হইতেছে। তাহারা স্বদেশের আচার-ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করিয়া ইংলন্ডীয় লোকের দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করিতেই শিক্ষা করেন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে তাহারদিগের উত্তম ব্যবহার সকলকে গ্রহণ না করিয়া যদ্দ্বারা অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা এমত আচরণ সকলের অনুবর্তী হইতেই অভ্যাস করেন। সম্প্রতি মদিরাপানের দৃষ্টান্ত তাহারদিগের বিনাশের হেতু হইয়াছে। তাহারা প্রথমত অল্প পরিমাণে এই ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, পরে লোভ সংবরণে অসমর্থ প্রযুক্ত ক্রমাগত উপভোগ দ্বারা তাহাতে প্রগাঢ়

আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হতজ্ঞান হয়েন। মদিরাপানে যাহার আসক্তি, তাহার দ্বারা কোন দুষ্কর্মের অসম্ভাবনা হয়? শুভকর্মের প্রবৃত্তিই বা তাহার কি প্রকারে হইতে পারে? ব্যক্ত করিতে অশ্রুপাত হয় যে কলিকাতার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের কত সুশিক্ষিত ছাত্র এই মোহকরী দুষ্কর্মে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে ব্যভিচার প্রভৃতি কুব্যবহার দ্বারা মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ বিদ্বানদিগের যখন এই প্রকার ব্যবহার, তখন তাহারদিগের দৃষ্টান্ত জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের চরিত্র কি পর্যন্ত ঘৃণিত না হইতে পারে? এই কলিকাতা মধ্যে স্থানে এমত সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্মে অজস্র লিপ্ত থাকে। তাহারদিগের ধর্মের নিয়ম নাই, কোনো কর্মেরও নিয়ম নাই; কখনও পৌত্তলিকের ন্যায়, কখনও ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায়, কদাপি নাস্তিকের ন্যায়ও ব্যবহার করিয়া থাকে। কদাপি দেব বিশেষের প্রতিমা সমীপে দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইতেছে, পুনর্বার পরিহাসচ্ছলে সেই দেবতার প্রতি অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কদাপি ইতরজাতিকে স্পর্শ করিয়া আপনারদিগকে অশুচি জ্ঞানে গঙ্গানীরে অবগাহন করিতেছে, তৎপরক্ষণেই সকল বর্ণের সহিত একত্র হইয়া একাকার রূপে পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে। মাদকদ্রব্য সেবন এবং লাম্পট্য ব্যবহার এই দলভুক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের সার কর্ম হইয়াছে।

বেশ্যাগমন পাপ এইক্ষণে কলিকাতা মধ্যে যে কি প্রকার বিস্তারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধনী, মধ্যবর্তী, অতি দীন পর্যন্ত এই দুষ্কর্মে এমত সাধারণ রূপে মগ্ন হইয়াছে যে অন্য অন্য কর্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পর কাহারও নিকটে কেহ বিশেষ গোপন করে না—আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জা বোধ করে না। এই নগর মধ্যে এমত পল্লী নাই যেখানে শত শত বেশ্যা একত্র বাস না করে, এবং তন্মধ্যে প্রায় এমত বেশ্যা নাই যাহার আলয়ে বহু লম্পট ব্যক্তিকে অহর্নিশি একত্র দেখা না যায়? সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত; কোনো স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কুত্রাপি কোনো বাবুর কদাচারের সাক্ষী-স্বরূপ অশ্বযান তাহার রক্ষিতা বেশ্যাদ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে; কোনো কোনো বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্ত সমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে, কুত্রাপি গণিকার অধিকার জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ, কলহ, সংগ্রামে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেছে। কুকর্ম দ্বারা চিত্তের বিকৃতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সম্ভব হয় যে আপনারা রক্ষিতা গণিকালয়ে স্বীয় বালক পুত্রাদি তাহার সাক্ষাতে, বরঞ্চ তাহার অনুমতিক্রমে স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করে, এবং তথায় পরিপাটি রূপে লাম্পট্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া চিরজীবন পাপের বর্ত্মে ভ্রমণ করে। তাহারা জন্ম কালে দুশ্চরিত্র পিতার অসৎ স্বভাব সকলকে অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং জীবনকালে তাহার কুদৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া সংসারে মহা উপদ্রবের হেতু হয়। এবং পরম্পরানুসারে এই জঘন্য দুষ্কর্ম গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় বহমান হইতেছে, এবং ক্রমশ বিস্তারিত হইয়া পল্লীগ্রাম পর্যন্ত প্লাবিত করিতেছে।

এই দলভুক্ত ধনী সকল এই দুষ্কর্মের প্রসঙ্গ, আয়োজন, এবং উপভোগে সর্বদা মগ্ন থাকেন, এবং ইহার আনুষঙ্গিক অশ্বযানের শোভা, পরিচ্ছদের পারিপাট্য, ও বিহঙ্গ ক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয়সুখের নিমিত্তে অপরিমিত রূপে রাশি রাশি ধন ক্ষেপণ করেন—কেহ কেহ সকল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া নানা প্রকারে অপমানের আস্পদ হয়েন। ইহারা কেবল স্বীয় অমঙ্গলের কারণ আপনারা হয়েন না, ইহারদিগের পার্শ্ববর্তী আশ্রিত যুবকগণের

বিষম দুরদৃষ্টের হেতু হয়েন। তাহারা বাবুর তুষ্টির নিমিত্তে তাহার সকল প্রিয় কুকর্মে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উল্লাসের সহিত যত্নবান হয়। এইরূপে অনেক নির্দোষী ব্যক্তি ধনী বাবুদিগের সংসর্গ দ্বারা দুষ্কর্মের আমোদে সুশিক্ষিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহারদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য একেবারে বিনষ্ট হয়।

যাহারদিহের কুকর্ম সম্পাদনের উপযোগী ধন নাই, অথচ বুদ্ধিবিদ্যার হীনতা প্রযুক্ত ন্যায় পূর্বক উপার্জন করিতে যাহারা ক্ষমতাবান নহে, তাহারা সামান্য কোনো বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া চৌর্য প্রবঞ্চনাকে ধনলাভের প্রধান উপায় রূপে স্থির করে। বেশ্যাগমন তুল্য কর্মস্থলে চৌর্য ব্যবহার এইক্ষণকার সাধারণ পাপ হইয়াছে, এবং অভ্যাস দ্বারা অনেকের চিত্ত এমত কঠিন হইয়াছে, যে এই কদাচারকে তাহারা কুকর্ম বলিয়া জ্ঞান করে না, এবং প্রভুর সকল সম্পত্তি হরণ করিতে পারিলেও তজ্জন্য আপনারদিগের দোষী বোধ করে না।

পুরুষদিগের এই প্রকার অত্যাচারে এবং দেশের নানা প্রকার কুপ্রথাতে এদেশীয় অবোধ স্ত্রী লোকেরা যেরূপ ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা স্মরণ করিলে রোদন করিতে হয়। তাহারা বিদ্যার উপদেশ অভাবে মনুষ্যের প্রধান সৌভাগ্য যে জ্ঞান সুখ, তাহার আস্বাদন হইতে সম্যক বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং কারারুদ্ধ প্রায় চিরজীবন নানা যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। যাহারা কাল্পনিক ধর্ম পৌত্তলিক উপাসনা হইতে বিরত হইয়া তাহার উচ্ছেদ জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহারা স্বীয়গৃহে ভার্যাদিগকে যখন তাহাতেই বিশেষরূপে মগ্ন দেখেন, এবং ভার্যারা যখন স্বীয় পতিদিগকে জ্ঞানধর্ম ও পানভোজনাদি সমুদয় বিষয়ে তাহারদিগের বিপরীত ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখে, তখন স্বামী-স্ত্রীতে সম্প্রীতির সম্ভাবনা কি? অনেক পুরুষ এপ্রকার দুরাচার যে ভার্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহারদিগের প্রবৃত্তিই হয় না—মাসান্তেও একবার তাহারা অন্তঃপুরের সংবাদ গ্রহণ করে না। অনেকে উপপত্নীর বশীভূত প্রযুক্ত কোপ-দৃষ্টি ব্যতীত একদিনের নিমিত্তে প্রণয় দৃষ্টিতে ভার্যার প্রতি অবলোকন করে না, এবং প্রায় অপ্রিয় ব্যতীত প্রিয় শব্দে তাহাকে সম্ভাষণ করে না। ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে কোনো কোনো পতির নিতান্ত নিদারুণ কুব্যবহার জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া কত স্ত্রী আত্মঘাতিনী পর্যন্ত হইয়াছে।

দুঃখের বর্ণনা আর শেষ হয় না। দেশস্থ লোক আপনারাই এই রূপে স্বীয় দুর্ভাগ্যের হেতু হইয়াছেন, তাহাতেও রাজা তাহার প্রতিকার জন্য সম্যক্ চেষ্টাবান না হইয়া রাজ্য মধ্যে কোনো কোনো কুকর্ম বৃদ্ধির প্রতি বরঞ্চ মুখ্য কারণ হইয়াছেন; মাদক দ্রব্য সেবন ও বেশ্যা গমন দুষ্কর্ম রাজার সম্যক আশ্রয় দ্বারা অত্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে। জগতের সমুদয় পদার্থ অপেক্ষা ধনের প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অধিক প্রীতি, এ নিমিত্তে দ্রব্যের কর, বাটির কর, ভূমির রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্তে তাহারা যে প্রকার সত্বর, প্রজায় হিতজনক কোনো ব্যাপারে তদ্রূপ যত্নবান্ নহেন। আয় বৃদ্ধির সুকৌশল নিয়ম স্থাপন জন্য তাহারদিগকে কাহারও অনুরোধ করিতে হয় না, বরঞ্চ তাহারদিগের এই অতিরিক্ত ধনাকাঙ্ক্ষা জন্য যে প্রজাপীড়ন হইতেছে, ইহা সংবাদপত্র সম্পাদকেরা চিৎকার পূর্বক জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। পূর্বে এই স্বাধীন ভারতবর্ষস্থ ধর্মশীল রাজাদিগের শাসনানুসারে মদ্য ব্যবসায় বা মদ্য ব্যবহার এদেশে প্রায় ছিল না। কিন্তু ইংলন্ডীয় লোকেব অধিকার হওয়া অবধি তাহারদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় যে মদিরা ব্যবসায় দেশময় প্রচলিত হইয়াছে, এবং তাহারদিগের দৃষ্টান্তে এদেশস্থ লোক সকল অপরিমিত মদ্য পানে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মাদক দ্রব্যের কর সংগ্রহ জন্য নিযুক্ত কর্মচারীরা অধিক ধনাগম করিতে পারিলেই রাজ পুরুষদিগের নিকটে প্রতিপন্ন হয়েন, এ প্রযুক্ত স্বীয় অধিকারে মদ্যাদির অধিক বিপণি স্থাপন দ্বারা অধিক কর সংগ্রহ জন্য তাহারদিগের একান্তত যত্ন হয়। ইহাতে মাদক দ্রব্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত এতন্নগরস্থ লোকেরা ধনে-প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে। অধুনা এই নগরে রাজশাসন অভাবে যেমন মদ্যপানের বাহুল্য হইতেছে, তদ্রূপ দিন দিন বেশ্যা শ্রেণিও বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্বকালে রাজ শাসনে নগর বা গ্রামের প্রান্ত ব্যতীত কদাপি তাহারা তন্মধ্যে বসতি করিতে সমর্থ হইত না; ইহার কতক দৃষ্টান্ত পল্লীগ্রামে অদ্যাপি রহিয়াছে। কিন্তু ইদানীং এই রাজধানীতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। লোক যখন স্বীয় বাটির চর্তুদিকে বেশ্যাদিগের হাব, ভাব, কটাক্ষ সর্বদা দেখিতে পায়, তখন সহজেই তাহারদিগের মন তাহাতে আসক্ত হয়। কেবল পুরুষেরা কুপথগামী হয় না, অনেকে অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী কুদৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম হইতে প্রচ্যুতা হয়। আপনারা কারারুদ্ধ থাকিয়া বেশ্যাদিগকে যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনা দেখে, অনেকে যখন স্বীয় পতিকে তাহারদিগের প্রমোদ আসক্ত দেখিতে পায়, তখন সুখ ভ্রমে কুকর্মের লালসা তাহারদিগের চিত্তে প্রজ্বলিত হওয়া কি অসম্ভব? অবগতি হইয়াছে যে এইরূপে অনেক অবলা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গাণিকাদিগের অনুগামিনী হইয়াছে। অতএব যতকাল রাজ পুরুষেরা মাদক সেবনের শাসন এবং বেশ্যাদিগের বসতির নিয়ম পরিবর্তন না করিবেন, ততকাল এদেশ সম্যক্‌রূপে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেক না।

যখন প্রাচীন লোক সকল দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষই করেন না; যখন যুবকদিগের মধ্যে কেহ নাস্তিক, কেহ খ্রিস্টিয়ান, কেহ যথেচ্ছাচারী হইতেছে, কেহ বা নানা অলীক আমোদে ও অসৎকর্মে কালক্ষেপ করিতেছে; যখন ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধি বিদ্যা বিহীন হইয়া ক্রমশ অপদস্থ হইতেছেন; যখন দেশের অর্ধলোক স্ত্রী জাতি বিদ্যার আলোক বিরহে অন্ধ প্রায় মুগ্ধ রহিয়াছে, ও পতির কদাচারে অহোরাত্র বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; যখন এই নগরে রাজা সুরাপানাদি কুকর্মের উপযুক্ত শাসন না করিতেছেন; তখন এদেশের সুখ সৌভাগ্যের দিন যে কত দূরে রহিয়াছে, তাহা সীমা করা যায় না। অসংখ্য ব্যক্তির বিচিত্র রোগ কদাপি দুই এক দেশহিতৈষী মনুষ্যের দ্বারা শান্তি হইতে পারে না। তাহারা পরস্পর সাক্ষাৎ করিলে কেবল আক্ষেপের আলাপ করেন, অবশেষে ক্ষুব্ধ চিত্তে সজল নেত্রে পৃথক হয়েন।

ফলত হে স্বদেশের হিতৈষী প্রিয় বান্ধবগণ! নিরাশ হওয়া উচিত হয় না—ঐক্য পূর্বক উৎসাহের সহিত যত্ন কর, যত্ন করিলেই কালে মানস সিদ্ধ হইবেক। যদিও গ্রীষ্মের উত্তাপ এইক্ষণে অস্থির করিয়াছে, তথাপি বর্ষার আগমন অবশ্য হইবেক। যিনি তোমাদিগকে এই সাধু ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন—এই গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই এ ভার মোচন করিবেন।

হে পরমাত্মন্! আমারদিগের দেশীয় লোককে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত কর, এবং অধর্ম পঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়া সৎকর্মের অনুষ্ঠান যত্নশীল কর, যাহাতে তাহারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরম ধর্ম তোমার উপাসনাতে অধিকারী হইয়া পরম সুখী হইতে পারেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১লা শ্রাবণ, ১৭৬৮ শক (১৮৪৬) ৩৬ সংখ্যা।

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৪৭-১৯১৯

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা

অতঃপর আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইতেছি। ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিগেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল। তাহার ক্রম কিঞ্চিৎ নির্দেশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

ইংরাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া কিরূপে রাজা হইয়া বসিলেন, সে ইতিবৃত্ত আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বণিকদিগের মনে রাজভাব প্রবেশ করা, ইহা দুই দশ দিনে ঘটে নাই। যতদিন তাহারা বণিক ছিলেন, ততদিন ভাবিতেন এদেশের লোকের সুখ দুঃখের সঙ্গে, উন্নতি অবনতির সঙ্গে, আমাদের সম্বন্ধ কি? আমরা বৈধ অবৈধ যেরূপ উপায়েই হউক এখান হইতে অর্থোপার্জন করিয়া লইয়া দেশে যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ। এইভাব কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মনে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সমুদয় কর্মচারীর মনে বহুদিন প্রবল ছিল। প্রথম প্রথম কোম্পানির কর্মচারীগণ এরূপ স্বল্প বেতন পাইতেন যে, সেরূপ স্বল্প বেতনে ভদ্রলোক এত দূরদেশে আসে না। কিন্তু অবৈধ অর্থোপার্জনের উপায় এত অধিক ছিল যে, তাহার প্রলোভনে লোকে এদেশে আসিতে ব্যগ্র হইত। এই সকল কর্মচারীর অধিকাংশকে ফ্যাক্টর বা কুঠিওয়ালা বলিত। কুঠিওয়ালাগণ কোম্পানির কুঠি সকলের পরিদর্শন করিতেন, বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, হিসাবপত্র রাখিতেন এবং বিবিধ প্রকারে কোম্পানির সওদাগরি কার্যের সহায়তা করিতেন।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি যখন দেওয়ানি সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির কর্মচারীদিগকে লইতে হইল। ফৌজদারি কার্যের ভার মুরশিদাবাদের মুসলমান গভর্নমেন্টের হস্তেই থাকিল। যখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে আসিল, তখন কুঠিওয়ালাগণই কালেক্টর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহারা জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানির এজেন্টের ন্যায় সওদাগরির তত্ত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেক্টরের কাজও করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না। যেরূপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাবটা তাহাদের মনে প্রবল থাকিল। আমরা দেশের রাজা, প্রজাদিগের সুখ দুঃখের জন্য আমরা দায়ী, এভাব তাহাদের মনে প্রবেশ করিল না। প্রমাণ স্বরূপ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেব উল্লেখ করা যাইতে পারে। অগ্রেই বলিয়াছি নবপ্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন প্রজাকূলের দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ নিবারণের জন্য

কিছুই করেন নাই। কেবল তাহা নহে; ইহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ হয় যে, দুর্ভিক্ষের বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রজা-সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তথাপি রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়া হয় নাই। সে বৎসরে যাহা আদায় হইতে পারে নাই পর বৎসরে সে সমগ্র আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তদানীন্তন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস বাহাদুর ১৭৭২ সালে ৩ নভেম্বর দিবসে ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন তাহাতে রাজস্ব আদায়ের নিম্নলিখিত তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৬৮-৬৯ সালে ১৫২৫৪৮৫৬ টাকা; ১৭৬৯-৭০ সালে ১৩১৪৯১৪৮ টাকা; ১৭৭০-৭১ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরে ১৪০০৬০৩০ টাকা; এবং ১৭৭১-৭২ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পর বৎসরে, ১৫৭২৬৫৭৬ টাকা। তবেই দেখা যাইতেছে তখন রাজগণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাবৃন্দের রক্তশোষণ করিতে ছাড়েন নাই। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, দুর্ভিক্ষের বৎসরে প্রজা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যদি কালগ্রাসে পতিত হইল, তবে পর বৎসরে এত রাজস্ব আদায় হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে হেস্টিংস বাহাদুর তাহার পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"It was naturally to be expected that the diminution of the revenue should have kept an equal pace with the other consequences of so great a calamity. That it did not was owing to its being violently kept up to its former standard. To ascertain all the means by which this was effected will not be easy. **** One tax, however, we will endeavour to describe, as it may serve to account for the equality which has been preserved in the past collections, and to which it was principally contributed. It is called Najar, and it is an assessment upon the actual inhabitants of every inferior description of lands to make up for the loss, sustained in the rents of their neighbours, who are either dead or fled form the country."

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়া রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের নিকট হইতে সুদে আসল বলপূর্বক আদায় করা হইয়াছিল। এই ব্যবহারের স্বপক্ষে হেস্টিংস বাহাদুর এইমাত্র বলিয়াছেন যে, এরূপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল। এবং গভর্নমেন্ট সাক্ষাৎভাবে এ প্রকারে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ করেন নাই। কিন্তু ইহাতে সংশয় নাই, তাহারা অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ গর্হিত উপায়ে রাজস্ব আদায় হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার মূল বক্তব্য এই যে, ইংরাজগণ দেশের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও বহুদিন রাজার দায়িত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। রাজার দায়িত্ব বুঝিলে প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার সম্ভব নয়। গ্রামের একজন সামান্য জমিদার যাহা করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহারা করেন নাই। দেশীয় রাজগণ সর্বদাই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিপদের সময় রাজস্ব রেহাই দিযা থাকেন এবং এখনও দিতেছেন। আমাদের বাস-গ্রামে জনশ্রুতি আছে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের জমিদারগণ পর্বত সমান অন্নের স্তূপ ও শালতি ভরিয়া ডাল রাঁধিয়া শত শত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাকে বহুদিন আহার করাইয়া বাঁচাইয়াছিলেন।

এইরূপে বণিকদিগের রাজা হইয়া বসিতে ও রাজার কর্তব্য সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে অনেক দিন গেল। অপর দিকে প্রজাদিগেরও নূতন রাজদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস

স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিল। প্রথম প্রথম এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজেরা এদেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবেন কি না? পলাশীর যুদ্ধে তাহারা দেশ জয় করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে অন্তর্বিদ্রোহ চলিল। একদিকে মুসলমান নবাবদিগের সহিত বিবাদ, অপরদিকে পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ও পূর্বে মগদিগের সহিত বিরোধ চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যেও বিষ্ণুপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে দলে দলে বিদ্রোহী দেখা দিতে লাগিল। ১৮২৫ সালের মধ্যে এই সকল উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদেশীয়গণ অনুভব কবিতে লাগিলেন যে, ইংরেজরাজ্য স্থায়ী হইল এবং তাহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নূতন রাজাদিগের প্রয়োজনানুসারে গঠিত হইতে হইবে। ইংরাজ-রাজপুরুষগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন যে, ভারত-সাম্রাজ্য বহুবিস্তীর্ণ হইতে যাইতেছে; এবং সেই সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার তাহাদের মস্তকে।

রাজা ও প্রজা উভয়ের মনে এই পরিবর্তন ঘটিয়া উভয় শ্রেণির মনে একই প্রশ্নের উদয় হইল। রাজারা ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এদেশ শাসন করি, প্রাচীন বা নবীন রীতি অনুসারে? প্রজাগণও চিন্তা করিতে লাগিলেন, কাহাকে এখন আলিঙ্গন করি—প্রাচীনকে বা নবীনকে? ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত উভয় প্রশ্নের বিচার ও মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া ঐ কালকে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছি। যেরূপে মীমাংসা হইয়াছিল তাহা পরে নির্দেশ করিতেছি।

নূতন রাজারা যতদিন এদেশ ও এদেশবাসীদিগকে বুঝিয়া লইতে পারেন নাই, ততদিন কোনো বিভাগেই লঘুভাবে প্রাচীনকে বিপর্যস্ত করেন নাই। সর্ববিভাগেই ভয়ে ভয়ে প্রাচীনের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রাজনীতি বিভাগে সর্বাগ্রে দেশীয় কর্মচারীদিগের দ্বারা, দেশীয় রীতিতেই, সকল কার্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম প্রথম এক একজন এদেশীয় নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন। কিন্তু বহুকালের পরাধীনতাজাত দায়িত্বহীনতা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের এমনি দুর্গতি হইয়াছিল যে, অনেকস্থলে এই নায়েব দেওয়ানগন মনে করিতেন বিদেশীয়েরা তো বেশ লুটিয়া লইয়া যাইবে, আমরা লাভ লোকসানের ভাগী নই, সুতরাং আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি করিয়া লই; এইরূপে তাঁহাদের উৎপীড়ন ও উৎকোচদিতে লোকে এত জ্বালাতন হইয়া উঠিল যে অবশেষে সে সকল পদ তুলিয়া দিতে হইল। ক্লাইভের নায়েব-দেওয়ান গোবিন্দরামের ও হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এইরূপে কিছুদিন গেল; শেষে, লর্ড কর্নওয়ালিস বাহাদুর এদেশীয়দিগকে উচ্চ উচ্চ পদ হইতে অপসারিত করিয়া সেই সকল পদে ইউরোপীয়গণকে স্থাপন করিলেন। তখন হইতে এদেশীয়গণ সর্ববিধ উচ্চপদ হইতে চ্যুত হইয়া হীনদশায় পতিত হইলেন। তৎপরে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত এদেশীয়দিগের সেরেস্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিল না। এই কালকে এদেশীয়দিগের প্রকৃত পতনের কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ এই সময় হইতেই এদেশীয়গণ সর্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকৃত হইয়া উন্নতির সম্ভাবনা ও তজ্জনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে বিদূরিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার গর্তে এদেশীয়গণ এখনও পড়িয়া রহিয়াছেন। এই লক্ষ্য, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার

ক্ষুদ্রতাকে পরাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ শোচনীয় ফল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। কারণ কোনো জাতি কিছুকাল এই অবস্থাতে বাস করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন হইতে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বলাভের স্পৃহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আইন আদালত সম্বন্ধেও রাজারা ভয়ে ভয়ে বহুকাল যথাসাধ্য প্রাচীন রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি বিলাত হইতে নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা ও এদেশীয় আইন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য উইলয়ম কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বহুবৎসর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক একজন হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবি রাখার নিয়ম হয়; তাহারা এদেশীয় আইনের ব্যাখ্যা করিয়া জজের সাহায্য করিতেন।

শিক্ষা বিস্তার বিষয়েও তাহারা যে বহুবৎসর প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন তাহাও পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। এমন কি এদেশীয়দিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখাইবার জন্য কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে চরক সুশ্রুতের ক্লাস ও মাদ্রাসার সঙ্গে আবিসেন্নার ক্লাস রাখা হইয়াছিল। ইহার বিবরণ পরে বিস্তৃতভাবে দেওয়া যাইবে।

অতএব ইহা নিশ্চিত যে, ইংরাজগণ লঘুভাবে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক প্রকৃষ্ট রাজনীতি বোধে, তাহারা প্রারম্ভে সর্ববিষয়ে প্রাচীনকে রক্ষা করিয়াই চলিতেন। এই সন্ধিক্ষণের মধ্যে মহা তর্ক-বিতর্কের পর প্রাচীনকে বিপর্যস্ত করিয়া নবীনের প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি হইয়াছিলেন।

এই আন্দোলন এদেশীয়দিগের মনেও উঠিয়াছিল। তাহারাও এই সন্ধিক্ষণে বিচার করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইহাদের মধ্যে কাহাকে বরণ করিবেন? তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে, প্রাচীনকে বর্জন করিয়া নবীনকেই বরণ করিতে হইবে। দেশীয় পক্ষে রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্য কার্যের ভার লইয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন। তবে ইহা স্মরণীয় যে, তাহাতে যাহা ছিল অপর কোনো নেতাতে তাহা হয় নাই। তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ত্ব তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে, পাশ্চাত্যনীতি পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক সকল প্রকার বিপ্লবেরই একটা ঘাত প্রতিঘাত আছে। প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ একদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণও অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গিয়াছিলেন। যাহা কিছু প্রাচীন সকলি মন্দ এবং যাহা কিছু নবীন সকলি ভালো, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল পরে নির্দেশ করিতেছি।

এই নবীনে অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিল। ফরাসি বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাহারা

শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মন ও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসিবিপ্লবজনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাহাদের মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ, এই তাহাদের মনের ভাব দাঁড়াইল। ইহাও অতিরিক্ত পাশ্চাত্য পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ। ফরাসি বিপ্লবের এই আবেগ বহুবৎসর ধরিয়া বঙ্গসমাজে কার্য করিয়াছে; তাহার প্রভাব এই সুদূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে।

যে ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক হইয়া আসিলেন, সেই মার্চ মাসেই তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট এদেশ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাহার পদাভিষিক্ত লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সমুদ্রপথে আসিতেছেন। পরবর্তী জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এদেশে পৌঁছিলেন। বঙ্গে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। একদিকে রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এবং নবপ্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার উন্মাদিনী শক্তি, অপরদিকের বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের শুভাগমন—বিধাতা যেন সময়োপযোগী আয়োজন করিলেন।

এই নবযুগের প্রবর্তনের সময় সর্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত রাজপুরুষের যে দুইটি সদ্‌গুণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কে সেই গুণদ্বয় পূর্ণমাত্রাতে বিদ্যমান ছিল। তাহাতে কর্তব্য নির্ধারণের পূর্বে ধীরচিত্ততা, বিচারশীলতা, সকল দিক দেখিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি, যেমন দেখা গিযাছিল, কর্তব্য পথ একবার নির্ধারিত হইলে তদবলম্বনে দৃঢ়চিত্ততা তেমনি দৃষ্ট হইয়াছিল। সহমরণ নিবারণ, ঠগিদমন, ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন, মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রভৃতি সমুদয় কার্যে তাহার গুণের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তিনি এদেশের সর্ববিধ উন্নতির সহায় হইবেন এই সংকল্প করিয়া রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে সপ্ত বৎসর গভর্নর জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাহার স্বদেশীয়দিগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এদেশে পদার্পণ করিলে রামমোহন রায়ের কার্যোৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাহার বন্ধু উইলিয়ম আডাম ত্রিশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হওয়ার পর তাহাকে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ রামমোহন রায়ের প্রতি জাতক্রোধ হন; এবং বৈরভাবে তাহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে খ্রিস্টীয়দিগের সহিত রামমোহন রায়ের ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায় উপর্যুপরি Precepts of Jesus, Appeals to the Christian public, Brahmanical Magazine প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। অগ্রে হিন্দুগণ তাহার বিরোধী ছিলেন, এক্ষণে খ্রিস্টীয়গণও বিরোধী হইলেন। রামমোহন রায় কিছুতেই স্বীয় অভিষ্টপথ পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন না। মিশনারিগণ আপনাদের প্রেসে তাহার লিখিত ইংরেজি গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি ধর্মতলাতে 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' নামে একটি প্রেস স্থাপন করিলেন; *হরকরা* নামক তদানীন্তন ইংরাজি সংবাদপত্রের অফিস গৃহের উপরতলায় তাহার বন্ধু আডামের জন্য সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন; আচার্যরূপে আডামের

ভরণপোষণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং স্বীয় সন্তানগণ ও বন্ধুগণ সহ তাহার উপনাসনালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বন্ধুবর আডামের জন্য রামমোহন রায় দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ইহা তিনি নিজে দিয়াছিলেন কি চাঁদা তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। বোধ হয় ইহার অধিকাংশ তাহার প্রদত্ত ও অপরাংশ বন্ধুদিগের মধ্যে হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

লর্ড আমহার্স্ট বাহাদুরের রাজত্বের প্রারম্ভেই সহমরণ নিবারণের জন্য যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা এই ১৮২৮ সালেও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। সে বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত জানা, ইংলন্ডের প্রভুদিগের সহিত চিঠিপত্র লেখা, নানাস্থান হইতে সহমরণ প্রথা সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করা হইতেছিল। তৎকালের নিজামত আদালতের কোর্টনি স্মিথ, (Courtney Smith) আলেকজান্ডার রস (Alexander Ross) আর. এইচ. রাট্রে (R. H. Rattray) প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ প্রথা নিবারণের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোনো কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী সতর্কতার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে নন-রেগুলেশন প্রদেশে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, প্রজারা সহ্য করে কি না। এই সকল সংবাদ ও মত সংগ্রহ করিতে ১৮২৭ সাল অতীত হইয়া গেল। ১৮২৮ সালের প্রারম্ভে লর্ড আমহার্স্ট লিখিলেন—"I think there is reason to believe and expect that, except on the occurrence of some very general sicknesss, such as that which prevailed in the lower parts of Bengal in 1825, the progress of general instruction and the unostentatious exertions of our local officers will produce the happy effect of a gradual diminution, and at no very distant period, the final extinction of the barbarous rite of suttee."—অর্থাৎ এরূপ আশা করা যায় যে, শিক্ষা বিস্তারের গুণে ও গভর্নমেন্টের কর্মচারীদিগের চেষ্টায় অচিরকালের মধ্যে এই নৃশংস প্রথা তিরোহিত হইবে। বলা বাহুল্য গভর্নর জেনারেলের এইরূপ মীমাংসা রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। তাহারা এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হিলেন। এখন তাহাদের প্রধান কার্য এই হইল যে, কোনো স্থানে কোনো রমণী সহমৃতা ইতেছেন এই সংবাদ পাইলেই কতিপয় বৎসর পূর্বে এই প্রথাকে দমনে রাখিবার জন্য যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিপালিত হইল কি না তাহারা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, সেই কারণে তাহারা দলে দলে সহমরণের স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। এই চেষ্টা এ প্রথা দমনের পক্ষে অনেক সহায়তা করিতে লাগিল।

এই বৎসরের (১৮২৮ সাল) ৬ ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতায় চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখানা ভাড়া লইয়া সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। একদিন রবিবার রামমোহন রায় বন্ধুবর আডামের উপাসনা হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। তখন তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার গাড়িতে ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন—'দেওয়ানজী বিদেশীয়ের উপাসনাতে আমরা যাতায়াত করি, আমাদের নিজের একটা উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না?' এই কথা রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি কালীনাথ মুনশি, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয়সভায় বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার্থ একটি বাড়ি ভাড়া করা

স্থির হইল। তদনুসারে উক্ত ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি ভাড়া করিয়া তথায় সমাজের কার্য আরম্ভ হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মোপাসনা হইত। কার্যপ্রণালী এইরূপ ছিল, প্রথমে দুইজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেন। তৎপরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করিলে সংগীতানন্তর সভা ভঙ্গ হইত। তারাচাঁদ চক্রবর্তী এই প্রথম সমাজের সম্পাদক ছিলেন।

ব্রাহ্মসভা স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্দুসমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল। তাহাদের অনেকে রামমোহন রায়ের সভার কার্যপ্রণালী পরিদর্শনের জন্য সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন তাহা নহে, সামাজিক বিষয়ে তাহার আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় লইয়া পথে ঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায়, রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্বদা কটূক্তি বর্ষণ হইত।

যখন একদিকে এই সকল বাগ্‌-বিতণ্ডা ও আন্দোলন চলিতেছে তখন হিন্দু কলেজের মধ্যে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা দৃষ্ট হইল। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে পদার্পণ করিয়াই চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে সেইরূপ কলেজের প্রথম চারিশ্রেণির বালককে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়া লইলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সম্বন্ধ, কেহ কখনও দেখে নাই। ডিরোজিও তিন বৎসর মাত্র হিন্দুকলেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে তাহার শিষ্যদলের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়া দিলেন যাহা তাহাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল। তাহাদের অনেকেই উত্তরকালে এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যে বিভাগেই গিয়াছিলেন, কেহই ডিরোজিওর শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার অপরাপর প্রধান প্রধান শিষ্যের পরিচয় পরে দিব, একজনের বিষয় সাধারণের জ্ঞাত নহে এই জন্য কিছু বলিতেছি।

একবার বোম্বাই প্রদেশে গিয়া তথাকার প্রার্থনাসমাজের সুযোগ্য ও সম্মানিত সভ্য পরকালগত নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে, তাহাদের যৌবনকালে বোম্বাই শহরে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছিলেন। তাহার অবলম্বিত নামটি এখন বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি ইংরেজি ভাষাতে সুশিক্ষিত ছিলেন। সন্ন্যাসী বোম্বাই হইতে গুজরাটের অন্তর্বর্তী কাটিওয়াড় প্রদেশে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ কোন সংবাদপত্রে "Misgovernment at Katiwad"—'কাটিওয়াড়ে অরাজকতা' নাম দিয়া পত্র সকল মুদ্রিত হইতে লাগিল। ঐ সকল পত্রে এমন বিজ্ঞতা, রাজনীতিজ্ঞতা ও লোকচরিত্রদর্শন ক্ষমতার পরিচয় ছিল যে, কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে চতুর্দিকে সেই চর্চা উঠিয়া গেল। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট হইল। কাটিওয়াড়ের রাজা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কে এই সকল পত্র লিখিতেছে। ক্রমে সন্ন্যাসী ধরা পড়িলেন। সন্ন্যাসী কিছুই গোপন করিলেন না; রাজাকে বলিলেন—'আপনার প্রজারা আমার নিকট আসিয়া কাঁদে, তাই তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া লিখিয়াছি, ইচ্ছা হয় আপনি শাসনকার্যের উন্নতি করুন, নতুবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।' রাজা সন্ন্যাসীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ন্যাসী একবর্ষকাল কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। এদিকে দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিল। একবর্ষ পরে রাজা সন্ন্যাসীকে কারামুক্ত করিয়া তাহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—'আমার

রাজপদের লালসা নাই, থাকিলে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিব কেন? তবে মহারাজ যদি দেশ সুশাসন করিতে চান, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারি।' তদবধি সন্ন্যাসীর রাজত্ব আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে, 'পুরাতন উৎকোচগ্রাহী কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া তৎ তৎ পদে ইংরেজি শিক্ষিত ও ইংরাজ গভর্নমেন্টের কার্যকলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে।' তদনুসারে সন্ন্যাসী বোম্বাই শহরে আসিলেন এবং একদল ইংরেজি শিক্ষিত কর্মচারী লইয়া গেলেন। নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি তাহারা প্রায় এক বৎসরকাল সন্ন্যাসীর অধীনে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে পূর্বপদচ্যুত কর্মচারীদিগের চক্রান্তে রাজার আবার মতিভ্রম হইল এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে, সন্ন্যাসীর দলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাটিওয়াড় ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তদনুসারে সন্ন্যাসীর সহিত তাহারা সকলে চলিয়া আসিলেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি সন্ন্যাসী ও তাহাদের নিকট তাহার গুরু ডিরোজিওর নাম সর্বদা করিতেন এবং তাহার অশেষ প্রশংসা করিতেন। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহাদের দলের মধ্যে কে সন্ন্যাসব্রত লইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না।

ডিরোজিওর কার্য গ্রহণের পর একবৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যগণ এক ঘননিবিষ্ট দলে পরিণত হইয়া পড়িলেন। এই ১৮২৮ সালের মধ্যেই শিষ্যদলের মনের উপরে ডিরোজিওর কি প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহার বিবরণ তৎকালীন কলেজের কেরানি হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে ডিরোজিওর জীবনচরিত লেখক মি. এডওর্ডস কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—

> "The students of the first, second and third classes had the advantage of attending a conversazione established in the school by Mr. Derozio, where readings in poetry, and literature, and moral philosophy were carried on. The meetings were held almost daily after or before school hours. Though they were without the knowledge or sanction of the authorities yet Mr. Derozio's disinterested zeal and devotion in bringing up the students in these subjects was unbounded, and characterised by a love and philanthropy which, up to this day, has not been equalled by any teacher either in or out of the service. The students in their turn loved him most tenderly; and were ever ready to be guided by his counsels and imitate him in all their daily actions in life. In fact, Mr. Derozio acquired such an ascendancy over the minds of his pupils that they would not move even in their private concerns without his counsel and advice. On the other hand, he fostered their taste in literature; taught the evil effects of idolatry and superstition; and so far formed their moral conceptions and feelings, as to place them completely above the antiquated ideas and aspirations of the age. Such was the force of his instructions, that the conduct of the students out of the College was most

exemplary and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of *truth*. Indeed, the *College boy* was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which, those that remember the time, must acknowledge, that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy'."

ডিরোজিও এইরূপ উপাদান লইয়া তাঁহার (Academic Association) অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের কার্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কিছুদিন অন্য কোনো স্থানে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া, শেষে মানিকতলার একটি বাটিতে অধিবেশন হইত। ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি ও উমাচরণ বসু নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে, উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেভিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি Col. Benson, পরবর্তী সময়ের এডজুটান্ট জেনারেল Col. Beatson. বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Mills প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও অসংকুচিতভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ডিরোজিওর শিষ্যদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠি; এবং তাহারা অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি নীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইল তাহা পূর্বোক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects; the sentiments of Hume had been widely diffused and warmly patronised * * * *. The most glowing harangues were made at Debating clubs which were then numerous. The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; their ingorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then re-solved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people. The degradation of the female mind was viewed with indignation; the question at a very large meeting was carried unanimously that Hindu women should be taught; and we are assured of the fact that the wife of one of the leaders of this movement was a most accomplished lady, who included amongst the subjects, with which she was acquainted, moral philosophy and mathematics."

হিন্দু কলেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বৃদ্ধদিগের সহিত বালকদিগের বিবাদ, কলহ ও তাহাদিগের প্রতি অভিভাবকগণের তাড়না চলিতে লাগিল। ডেভিড হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন—'ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের *ইলিয়ড* গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।' আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত; তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 'আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো' বলিয়া চিৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীগণকে ডাকিয়া বলিত, 'এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি' এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।

তখন শহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে বলিয়া বেড়াইত যে, ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই ধর্মাধর্ম নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে দোষ নাই; দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে শহরে একটু হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। হিন্দু কলেজের কমিটি প্রথমে হেড মাস্টার ডি. আন্সলেম সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন মাস্টারেরা স্কুলের সময় বা অপর সময়ে বালকদিগের সহিত ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন না করেন। হেড মাস্টার ডিরোজিওর উপরে চটিয়া গেলেন। একদিন ডিরোজিও তাঁহার কার্যের বিবরণ দিবার জন্য হেড মাস্টারের নিকট গেলেন, তখন মহাত্মা হেয়ার সেখানে দণ্ডায়মান। আন্সলেম সাহেব উক্ত কার্য বিবরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ খুঁত ধরিয়া ডিরোজিওকে মারিতে গেলেন। ডিরোজিও সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আন্সলেম রাগিয়া হেয়ারকে খোসামুদে বলিয়া গালি দিলেন! হেয়ার হাসিয়া বলিলেন—'কার খোসামুদে?' হেয়ারের অপরাধ এই যে, তিনি ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে ভালোবাসিতেন। হিন্দু স্কুল কমিটি আবার আদেশ করিলেন যে, শিক্ষকেরা বালকদিগের সহিত ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন না এবং স্কুল ঘরে খাবার আনিয়া খাইতে পারিবেন না।

একদিকে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তখন অপরদিকে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ করিয়া নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিলেন—

> "It is hereby declared, that, after the promulgation of this regulation, all persons, convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall be deemed guilty of culpable hemocide and shall be liable to

punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment."—*Regulation of 4th December, 1829.*

ইহার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১১ মাঘ দিবসে রামমোহন রায় তাঁহার নবনির্মিত গৃহে ব্রহ্মসভাকে স্থাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিনে সেই ভবনের ট্রাস্ট ডীড্ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, ঐ ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণির মানবের ব্যবহারার্থ থাকিবে; এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে; তদ্ভিন্ন তথায় কোনো পরিমিত দেবতার পূজা হইবে না।

উক্ত উভয় ঘটনাতে কলিকাতাবাসী হিন্দুগণকে অতিশয় উত্তেজিত করিয়া তুলিল। রাধাকান্ত দেব সারথি হইয়া ধর্মসভা নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। মতিলাল শীল কলুটোলাতে তাহার এক শাখা ধর্মসভা স্থাপন করিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পূর্ব হইতেই *চন্দ্রিকা*-র সম্পাদক রূপে কার্য করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে দ্বিগুন উৎসাহের সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে দিন ধর্মসভার অধিবেশন হইত সে দিন শহরের ধনীদের গাড়িতে রাজপথ পূর্ণ হইয়া যাইত। সভাতে সমবেত সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, তাহারা অনেক দিন রামমোহন রায়ের সভার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, আর উপেক্ষা করিবেন না, এবার তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন। এই আক্রোশ কার্যেও প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহারা রামমোহন রায়ের দলস্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। এমন কি যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহার দলস্থ লোকদিগের ভবনে বিদায় আদায় গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকেও বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে সমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া গেল। রামমোহন রায় অবিচলিত চিত্তে আপনার কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গিয়া উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, তিনি উপাসনা মন্দিরে আসিবার সময়ে পদব্রজে আসিতেন, ফিরিবার সময় নিজ গাড়িতে ফিরিতেন। গাড়িতে যাইবার সময় কোনো কোনো দিন পথের লোকে ইঁট পাথর, কাদা ছুড়িয়া মারিত ও বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ির দ্বার টানিয়া দিতেন ও বলিতেন, 'কোচম্যান হেঁকে যাও'। সতীদাহনিবারণ ও ব্রহ্মসভা স্থাপন নিবন্ধন কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের মন এমনি উত্তেজিত হইয়াছিল যে, সতীদাহ নিবারণ-বিষয়ক আইন রদ করিবার জন্য এক আবেদন পত্র বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর হইতে লাগিল। রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে সহমরণ নিবারণের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন পত্র লিখিলেন তাহাতে তাহার কতিপয় বন্ধু ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর করিলেন না।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সুবিখ্যাত খ্রিস্টীয় মিশনারি আলেকজান্ডার ডফ কলিকাতাতে পদার্পণ করিলেন। তখন রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন। ডফ রামমোহন রায়ের সহিত কথাবার্তা কহিয়া অনুভব করিলেন যে, এদেশে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিয়া ইংরেজি শিক্ষার ভিতর দিয়া খ্রিস্টধর্ম প্রচার করিতে হইবে। তদনুসারে তিনি এক প্রকার স্কটলন্ডস্থিত কর্তৃপক্ষের অনভিমতে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। রামমোহন রায় সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব ব্যবহৃত ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি নামক বাটি স্থির করিয়া দিলেন; এবং

প্রথম ছয়টি ছাত্র জুটাইয়া দিলেন। সেই কতিপয় ছাত্রের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পরে শহরের বড়লোক হইয়াছিলেন।

ডফ স্কুল স্থাপন করিয়া নবশিক্ষিত যুবকদলের নিকটে থাকিবার আশয়ে বর্তমান হিন্দু কলেজের সন্নিকটে বাসা করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায় ডফকে স্বীয় কার্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। কলেজের বালকেরা অনেকে ডফ ও ডিয়ালট্রির বক্তৃতাতে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহাও হিন্দু কলেজ কমিটির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাহারা আদেশ প্রচার করিলেন যে, কলেজের বালকগণ কোনো বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারিবে না। এই আদেশ প্রচার হইলে চারি দিকে লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোকের স্বাধীন চিন্তার উপরে এতটা হাত দেওয়া কাহারও সহ্য হইল না।

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে কলেজ কমিটির হিন্দুসভ্যগণ ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় হিন্দুসভ্যগণের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া এক বিশেষ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়া সভা ডাকিলেন। ঐ সভায় এই প্রশ্ন উঠিল—ডিরোজিও স্বভাব চরিত্র এরূপ কি না এবং তাঁহার সংসর্গে বালকদিগের এরূপ অপকার হইতেছে কি না, যাহাতে তাঁহাকে আর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত বোধ হয় না? ডাক্তার উইলসন ও মহামতি হেয়ার ডিরোজিওর সপক্ষে মত দিলেন, এবং হিন্দুসভ্যগণের অনেকেও এতটা বলিতে প্রস্তুত হইলেন না। অবশেষে এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া আর একভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল যে, দেশীয় সমাজের বর্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কলেজের অনিষ্ট হইবে কি না? উইলসন ও হেয়ার দেশীয় সমাজের অবস্থা বিষয়ে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়া এ-বিষয়ে সাহসের সহিত কিছু বলিতে পারিলেন না; সুতরাং কোনো পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন না। অধিকাংশের মতে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা স্থির হইল।

ডাক্তার উইলসন ডিরোজিওকে এই সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহার প্রতি যে যে দোষারোপ করা হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। বলিলেন তিনি কখনই নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ দুই যুক্তি তুলিয়া বালকদিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে; ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এরূপ অদ্ভুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন নাই; এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, সেরূপ ব্যবহার কোনো বালকে দেখিলে তাহাকে সাজা দিয়াছেন।

ডিরোজিও কলেজ পরিত্যাগ পূর্বক *ইস্ট ইন্ডিয়া* নামক একখানি দৈনিক সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। ঐ কাগজ ত্বরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ডিরোজিও কলিকাতার ফিরিঙ্গিদলের একজন নেতা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তৎপরে যে কয়েকমাস তিনি জীবিত ছিলেন, সে সময়ের মধ্যে ফিরিঙ্গি সমাজের উন্নতির জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনো কাজ হইত না। এইরূপে খাটিতে খাটিতে ১৮৩১ সালের ১৭ ডিসেম্বর শনিবার

তিনি দুরারোগ্য ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন তিনি রোগশয্যায় শায়ন ছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র, মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যদল আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দিন রাত্রি পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। ২৪ ডিসেম্বর প্রাণবায়ু তাঁহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ইহার পরে *ইস্ট ইন্ডিয়া* কাগজ একজন অপদার্থ ইংরাজের হস্তে গেল। সে ব্যক্তি ডিরোজিওর মাতা ও ভগিনীকে ধনে প্রাণে সারা করিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহারা জন্মের মতো সমাজসাগরবক্ষে চিরবিস্মৃতির তলে ডুবিয়া গেলেন। ডিরোজিও অন্তর্হিত হইলে কিছুদিন তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল; এবং তদর্থ একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কালাবর্তে সকলি মিলাইয়া গেল। নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক দীক্ষাগুরুর চিহ্নমাত্রও রহিল না।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজ ছাড়িয়ে গেলেন বটে, কিন্তু যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া গেলেন তাহা আর থামিল না। ১৮৩১ সালের ২৩ আগস্ট তাঁহার শিষ্যগণ এক মহা বিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। সে সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে ডিরোজিওর শিষ্যদলের একটা আড্ডা ছিল। উক্ত দিবস কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার যুবক বন্ধুগণ সেখানে জুটিলেন। তখন তাঁহাদের সর্বপ্রধান সৎসাহসের কর্ম ছিল মুসলমানের রুটি ও বাজার হইতে সিদ্ধ করা মাংস আনিয়া খাওয়া। সেইরূপ আহারের পর হাড়গুলি পার্শ্বস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়া দিয়া যুবকদল চিৎকার করিতে লাগিলেন, 'ঐ গোহাড়, ঐ গোহাড়।' আর কোথায় যায়! সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার মার শব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। যুবকদল যিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন। তৎপরে প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধরিয়া বসিল—'আপনার দৌহিত্রকে বর্জন করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব না।' ব্রাহ্মণ স্বীয় দৌহিত্রের প্রতি কোপে অধীর হইয়া গেলেন। বেচারা কৃষ্ণমোহন এ-সকলের কিছুই জানেন না। তিনি সায়ংকালে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর আশ্রয় পাইলেন না। সে রাত্রে যান কোথায়, উপায়ান্তর না পাইয়া স্বীয় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তখন কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কৃষ্ণমোহন এই বৎসরের মে মাস হইতে *Inquirer* নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই পত্রে তিনি নির্যাতনকারী হিন্দুদিগের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নব্যদলের সমরভেরী বাজিয়া উঠিল।

১৮৩২ সালের ২৮ আগস্টের *Inquirer* পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে, ডিরোজিওর শিষ্যদলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। মহেশ বাল্যকালে অত্যন্ত জেঠা, ইয়ার ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া বিদিত ছিলেন। একারণে রামগোপাল ঘোষ তাঁহার সঙ্গে বড় মিশিতেন না। কিন্তু ডিরোজিওর সংস্রবে আসিয়া মহেশের জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তিনি ধর্মানুরাগ সচ্চরিত্রাগুণে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

সেই ১৮৩২ সালে ১৭ অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি তখন এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, হিন্দু কলেজের সমুদয় ভালো ভালো ছাত্র খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করিবে।

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরে রামমোহন রায় ইংলন্ডের ব্রিস্টলনগরে ২৭ সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিলেন; এবং রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ও মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের পরামর্শে গভর্নমেন্টের অধীনে উচ্চ উচ্চ পদ এদেশীয় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য উন্মুক্ত হইল। ঐ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ পূর্ণগ্রহণের সময় পার্লামেন্ট মহাসভা ভারতশাসনের উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে এক নূতন আইন লিপিবদ্ধ করেন। তাহার ৮৭ ধারাতে লিখিত হইল—

> "And be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident therein, shall by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under this said Company.

লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় হইতে এদেশীয়গণ হাজার বড় হইলেও সেরেস্তাদারের উর্ধ্বে উঠিতে পারিতেন না। এমন কি রামমোহন রায়ও পদে উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতবাসকালে এদেশ শাসন সম্বন্ধে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দেওয়ার বিষয়ে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বিধি প্রচার হওয়ার পর সে দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর করা হইতে লাগিল। অতএব এই ১৮৩৩ সাল হইতে এদেশীয়দিগের বক্ষ হইতে একখানি পাথর তোলা হইল। সুখের বিষয় সে সময় হইতে এদেশীয়দিগকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহার অপব্যবহার করেন নাই, প্রত্যুত ঐ সকল পদকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৯

যাদবেশ্বর তর্করত্ন

১৮৫০—১৯২৬

সেকালের কথা

বয়সের দোষে কেমন হইয়াছি, কাল যাহা ঘটিয়াছে, আজই তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। কিন্তু সেকালের অনেক কথা বেশ মনে পড়িতেছে। কৈশোর যৌবনের অনেক কথা আধভাঙা ঘুমের স্বপ্নের মত অল্প অল্প মনে হয়। রকে উঠানে হামাগুড়ি দিয়া বেড়ানোর কথা অবশ্য মনে নাই, চারি পাঁচ বৎসর বয়সের প্রত্যেক ঘটনাগুলি নিখুঁতভাবে মনে পড়িতেছে। পিতামহী যখন সকালবেলা ফুলের ডালা হাতে করিয়া ফুল তুলিতে যাইতেন, ডাল নোয়াইয়া যখন ফুল তুলিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তখন যে কচি হাত বাড়াইয়া সেই নোয়ান ডাল হইতে দুই চারিটি ফুল ছিঁড়িয়া ডালায় ফেলিয়া কৃতার্থ হইতাম, তাহা বেশ মনে আছে। তাহার ফলে সমবয়স্ক প্রতিবেশী বালকদিগের সঙ্গে দশবার বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত যে ফুল তোলার একটা প্রতিযোগিতা ছিল, ডালা ভরিয়া ফুল আনিয়া দেবপূজার সহায়তা করিলাম বলিয়া যে আত্মপ্রসাদ পাইতাম, সেই নিখুঁত সুখটুকু সভ্যতালোকের সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন উপিয়া গিয়াছে। ফুলতোলার প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। সেকালে শুধু বর্ষীয়সীরাই ফুল তুলিতেন না; উত্তর-বঙ্গের সর্বপ্রধান অধ্যাপক অতিবৃদ্ধ রামানন্দ পঞ্চানন মহাশয়কেও ফুল তুলিতে দেখিয়াছি। তিনি ডালাহাতে করিয়া সমস্ত গ্রামটি ভ্রমণ করিতেন। বেশ মনে পড়িতেছে, তিনি নিমন্ত্রণে কর্মবাড়িতে যাইয়া সিধায় যে সন্দেশ পাইতেন, ফুল তুলিবার সময়ে সেই গুলি ডালায় করিয়া আনিতেন ও আমাদিগের মত বালকদিগকে বাঁটিয়া দিতেন। সেই সন্দেশ পাইয়া আমাদিগের কত আনন্দ, কত নৃত্য, দেখে কে? সেই অল্পে সন্তুষ্ট হইবার কথা মনে করিলে এখনও আনন্দে চোখে জল আসে। যেদিন তিনি সন্দেশ আনিতেন না, সে দিনও আমাদিগের কোন মনঃকষ্ট হইত না, আজ নাই, আনিতে পারেন নাই, যেদিন পাইবেন, নিশ্চয় আনিবেন, এই বিশ্বাস আমাদিগের (সেকালের বালকদিগের) ছিল।

শুনিতে পাই, দক্ষিণ-বঙ্গে ও পূর্ব-বঙ্গে ছেলেদের উপরে গুরুমহাশয়ের নিজের প্রভুতা ও জীবিতাবস্থায় অবনত বেত্রের মৃতাবস্থার ঔদ্ধত্য প্রতিমুহূর্তে সপ্রমাণ করিতেন; কিন্তু উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহুল আমাদিগের গ্রামে, বোধকরি, সেরূপ গুরুমহাশয় ছিলেন না। শূদ্র গুরুমহাশয় ব্রাহ্মণ বালককে দেববালক মনে করিয়া তাহার উপরে কখনই হাত উঠাইতেন না: শান্তভাবে মাটিতে, পাতায় ও ক্রমে কাগজে লিখাইতেন, শিশুবোধ পড়াইতেন, খেলার জন্য ছুটি দিতেন। প্রাতে টোপা ভাত (প্রাতরাশ) খাইবার জন্য ছুটি দিতেন। 'টোপাভাত' কাহাকে বলে, বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এখনে যেমন সকালে পচা ঘিয়ে ভাজা বাজারের খাবার আনিয়া, অথবা বাড়িতে চর্বি মিশান ঘিয়ে লুচি মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া বালক বালিকাকে খাইতে দেওয়া হয়, পূর্বে তাহা ছিল না। পূর্বে দক্ষিণ-বঙ্গে আখের গুড় বা খেজুর গুড়ের সঙ্গে

কিছু কিছু মুড়ি দেওয়া হইত; উত্তর-বঙ্গে মুড়ি না দিয়া বালক বালিকাকে ভাত রাঁধিয়া দিবার পদ্ধতি ছিল। তরকারি ভাল হইত না, ভাতে ভাত হইত। আলু, পটোল, কাঁচকলা, ডাল, পোস্ত, বা মাছ, ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ করিত, বেগুন পোড়া দিবারও রীতি ছিল। সকাল বেলায় বালক বালিকাকে দিবার জন্য যে ভাত রাঁধা হয়, তাহারই নাম 'টোপা ভাত'। রঙপুরী খাঁটি সরিষার খাঁটি তেল ও লবণের যোগে পাড়ার বালক বালিকার সহিত একত্র বসিয়া সেই টোপা ভাতে যে 'তার' পাইয়াছি, আজ পোলাও. খিচুড়ী, পক্বান্ন, মিষ্টান্নে সে তার পাইনা; কাল দোষে জিভ কেমন অসাড় হইয়া গিয়াছে। দুর্গা-পূজায় ব্রাহ্মণ বাড়িতে যে বাল্যভোগ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতেও লুচি পক্বান্ন দিবার রীতি নাই। অদ্যাপি খিচুড়ী বা ভাতে ভাত দিবার পদ্ধতি আছে। না সেকালে সেই বাল্যভোগের প্রসাদ খাইতে কতই আমোদ পাইয়াছি,—এককথায় তাহা বুঝাইতে পারি না। আহারের প্রসঙ্গ যখন উঠিয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আহারের কথার শেষ করিয়া অন্য কথা পাড়িব।

একদিন মধ্যাহ্নে পাড়ার বালক বালিকার সঙ্গে একটি ঘরে খাইতে বসিয়াছি, সেকালে একালের মত কোন বিষয়েই আড়ম্বর ছিল না। সেকালে গৃহদেবতাকে দিবার জন্য গৃহিণীরা নিজের প্রস্তুত তিলের নাড়ু, নারিকেলের নাড়ু, সর-ভাজা, ক্ষীরের ছাঁচ সর্বদা গৃহে রাখিতেন। সেকালে অধিকাংশ ফলাহারের নিমন্ত্রণে সরুধান্যের পাতলা চিড়া, খৈ, মুড়কি, উৎকৃষ্ট দধি, ক্ষীর ও চিনি দিলেই হইত; তাহার উপরে যিনি দুইচারিখানি লুচি ও দুই একটি সন্দেশ দিতেন, তাঁহার প্রশংসার পার ছিল না। ভোজনেও সেইরূপ পোলাও কালিয়ার ঘটা ছিল না। সিদ্ধ, ভাজা, ডাল ও ব্যঞ্জনের কিন্তু অবধি ছিল না, তাহার উপরে দধি ও পায়স থাকিত। পাচকের পৃষ্ট অন্ন সেকালে কেহই খাইতেন না; নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, সকল কার্যেই স্বয়ং গৃহকর্ত্রীকেই অন্নপূর্ণার কাজ করিতে হইত। এত ঘৃত, এত তৈল, এত মশলা লাগিত না; হাতের গুণে তাক-তুকের গুণে প্রত্যেক ব্যঞ্জনই অমৃততুল্য সুস্বাদু হইত। সেদিন আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী সমস্ত রন্ধন পরিবেশন করিয়াছিলেন। সেই দিনের একটি ব্যঞ্জন আমার মুখে বড় উপাদেয় লাগিয়াছিল, আমি সেই ব্যঞ্জনটি চাহিয়াছিলাম, মাতৃদেবী দিয়াছিলেন। পরে আবার চাহিলে তিনি গরম হইয়া বলিলেন, "যদি ভাল হইয়া থাকে, সকল বালক বালিকাই পাইবে, তোকে দিয়াই ফুরাইয়া ফেলিব, অন্য ছেলেপুলেকে দিব না, কেমন?" আর তিনি দিলেন না। আমারও অভিমান হইল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আহারের জন্য কখনও কোনও জিনিস চাহিব না। অদ্যাপি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছি। কিন্তু তখন আমি নির্বোধ বালক, মাতার মহিমা বুঝি না। যখন সেই জগদ্ধাত্রীর কথা মনে হয়, তখনই চোখে জল আসে; এখন কি আর গৃহিণীদিগের মধ্যে সেই উঁচু ভাবের ছবিটুকু দেখিতে পাইব? তখনকার মা যে শুধু আমার বা তোমার মা ছিলেন, তাহা নহে, বিশ্বসংসারের মা ছিলেন; এখনকার মা শুধু তার পেটের ছেলেটির। অন্য ছেলেরা হাঁ করিয়া দেখিতেছে, এখনকার মা লজ্জার মাথায় বাজ হানিয়া নিজের ছেলের মুখে অনায়াসে মিষ্টান্ন গুঁজিতেছে; হায়! কি ছিল; কি হইল! সোনার বাংলা ছাই হইয়া গিয়াছে। গৃহলক্ষ্মীদিগেরই যখন এতটা পতন, আমরা স্বার্থপর পুরুষ, আমাদের কথা ছাড়িয়াই দাও।

আমরা পাড়াগাঁয়ে সাদাসিদে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে জন্মিয়াছি। বলাবাহুল্য, তাহারা নিজের পয়সা দিয়া কখনও সহর হইতে মালদহী আম বা ভুটাকী কমলা লেবু পরিবারবর্গের জন্য কিনিয়া আনিতেন না। মাঝে মাঝে গ্রামের জমিদার আনাইয়া প্রত্যেক

ব্রাহ্মণের বাড়িতে দুই চারিটি করিয়া দিতেন। অংশানুসারে আমরা তাহার কতটুকু পাইতাম, পাঠক পাঠিকা ভবিয়া দেখুন। আমার স্মরণ হয়, একবার আমি অর্দ্ধাংশ কমলা লেবু পাইয়াছি। আমি খাইব, মনে করিতেছি, একটি ভিক্ষার্থিনী দরিদ্রা তাহার একটি ছেলেকে লইয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হইল, সেই বালকটি আমার হাতের কমলালেবুর দিকে তাকাইয়া আছে, আমি অমনি সেই লেবুখণ্ড সেই বালকের হাতে দিলাম। নিকটে বৃদ্ধা পিতামহী দাঁড়াইয়াছিলেন; দেখিয়া আনন্দে তাহার চোখে জল আসিল; তিনি বলিলেন, "দ্যাখ, তোর কখনই কষ্ট হইবে না, তুই সুখে কাল কাটাইবি।" বলাবাহুল্য, এইরূপ উৎসাহে বালক নিজের চরিত্র গড়িতে পারে। এস্থলে আরও একটু বলা ভাল যে, আমি নিজের জীবনচরিত লিখিতে বসি নাই, কোনগুণে আমি নিজের জীবন চরিত লিখিতে যাইব? মাতা পিতামহীর সংসর্গে যে এক আধটুকু সাধুভাব পাইয়াছিলাম, তাহাদিগের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও চলিয়া গিয়াছে; কখনও যদি বিজলীর মত এক আধবার আসে, স্বার্থপরতা তখনই তাহাকে পিষিয়া দূর করিয়া দেয়। কেবল সেকালের একটি চিত্র সকলের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের গুরু মহাশয় সকালে মাত্র শিক্ষা দিতেন, বিকালে আর তাহার সহিত সম্বন্ধ ছিল না। বিকালে আমরা খেলিয়া বেড়াইতাম। আমরা ফুটবল, ব্যাটবল, টেনিস খেলা জানিতাম না। আমরা রাম রাবণের যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের খেলা করিতাম; সে যুদ্ধ ব্যূহ রচনা পর্যন্ত হইত, তীর ধনুর যুদ্ধ অল্পই ছিল, গদা-যুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধের প্রচলন অধিক ছিল। কয়েকটি ছেলে চক্রাকারে দাঁড়াইত, তাহারই নাম ব্যূহ; বালকদিগের বাধাসত্ত্বেও যে বালক বল করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত, সে বাহবা পাইত। বিস্তৃত ভূমির শেষ সীমায় একটি পাকাটি পুতিয়া রাখা হইত; সেই ভূমির অপর সীমায় দাঁড়াইয়া দুইটি বালক একবারে দৌড় দিয়া যে আগে গিয়া পাকাটিটি ছুঁইবে, খেলায় সেই জিতিবে; অপর হারিবে। এক বালক একটি সুপারি মুটে ধরিবে, অপর বালক তাহা খুলিয়া লইবে, না পারিলে সে ঠকিবে। এক বালক একটি বাতাবি লেবু পেটের উপরে রাখিয়া দুই উরু তাহার উপরে রাখিয়া দুই হাতে সেই উরু দুইটি খুব আঁকড়াইয়া ধরিবে, অন্য বালক তাহা খুলিয়া লইবে, না পারিলে সে ঠকিবে। সাত হাত মাটি মাপিয়া সমুদ্র করা হইত, যে তাহা ডিঙাইবে, তাহার বাহাদুরী হইবে। বাহুযুদ্ধে জয়ী হইলে তাহারও প্রশংসা ছিল। মাতারা দাঁড়াইয়া জয়ের পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। অন্যের ছেলে নিজের ছেলেকে মারিল বলিয়া সে ছেলের উপর রাগ করিতেন না। আর এক প্রকার খেলা ছিল—দোল ও কালীপূজা। পাকাটির চৌদোল ও মকর কণ্ঠ তৈয়ারী করিয়া তাহাতে চৌদোল টাঙান হইত, শিব মৃত্তিকায় শালগ্রাম গঠন করিয়া তাহাতে বসাইয়া ফুল তুলিয়া পূজা হইত ঝুলন হইত, বালীর আবির দেওয়া হইত। একটি কাল কচুর গাছে কচুর 'নাইলে' চারিখানি হাত খড়কে দিয়া লাগান হইত, জবা ফুলের পাপড়িতে জিভ করিয়া লাগাইয়া কালী প্রস্তুত হইত; ফুলে জলও বালীব নৈবেদ্যে তাহার পূজা হইত; ছোট বড় কচু গাছে পাঁঠা ও মহিষ করিয়া তাহাকে বলি দেওয়া হইত। কত কি খেলার কথা বলিব? বুদ্ধিমান বালক আবার নূতন রকমের খেলা আবিষ্কার করিত। আরামের খেলা ছিল-দোলনায় দোলা। ছায়াবহুল গাছের মোটা ডালে অল্প মোটা শক্ত দড়িতে দুই দিকে বাঁধিয়া একখানি তক্তা টাঙান থাকিত; তাহাতে বসিয়া কোনও বালক আস্তে আস্তে দুলিয়াই আরাম পাইত, কোনও বালক আস্তে আস্তে দোলাইয়া দিত। কোনও দুষ্ট যুবক আসিয়া যখন মাথার উপরে তুলিয়া বেগে ছাড়িয়া দিয়া দোলাইত, তখন দোলনায়

উপবিষ্ট বালকের আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া যাইত সে তখন প্রাণপণে দুই হাতে দুইখানি দড়ি শক্ত করিয়া ধরে; এবং প্রাণপণে চীৎকার করে— ছাড়ার পরে সেই বেগে যখন দুই চারিবার বেগে দোলে, তখন আবার বালক খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে, "আবার দোলাও, আবার দোলাও বলে", কিন্তু মাথার উপরে তোলার সময়ে আবার চীৎকার করিয়া উঠে, বসন্তের শেষে ও গ্রীষ্মের প্রথমে বালকেরা যখন দৌড়াদৌড়ি খেলায় ক্লান্তি বোধ করিত, সেই সময়ে এই দোলনায় দুলিত। অন্য ডালে বসিয়া দোয়েল শিস্ দিত, আকাশে উড়িয়া একবার পঞ্চমে স্বর তুলিয়া বৌ-কথা-কও পাখি আকাশ ভাসাইত, আর অন্য দিকের ছায়ায় প্রবীণের মধ্যে কেহ কেহ পাতা মাদুরে বসিয়া বাঁ হাতে হুকা ধরিয়া দাবা খেলার পিলঠিকে ত্যাগ করিব, কি নৌকাকে ত্যাগ করিব, এই চিন্তায় তামাকু খাইবারও অবকাশ পাইতেন না। সকলেই নিজরে নিজের কাজে তন্মনস্ক, কাহারও দিকে কেহ চাহিতেছে ন, কাহারও কথায় কেহ কান দিতেছে না। যদি কখনও দোলনার দড়ি ছিঁড়িয়া ঝুপ করিয়া বালক পড়িয়া যাইত, এবং মুহূর্ত পরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত, তখন বৃদ্ধেরা দাবা খেলা ছাড়িয়া "সর্বনাশ হইল", বলিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিতেন; গাছের ডাল হইতে দোয়েল উড়িয়া যাইত; কিন্তু বৌ-কথা-কও পাখি উড়িয়া উড়িয়া আরও জোরে হাঁকিয়া আকাশের ঢেউ তুলিত, তাহা দ্বারা বুঝাইয়া দিত, সুবিস্তীর্ণ আকাশে উড়িয়াছি, সঙ্কীর্ণ মর্ত্ত লোকের সঙ্গে আবার কিসের সম্বন্ধ?

পূজা আসিয়াছে। পূজার নামেই বালক বালিকা আনন্দে অধীর। ছুতোর আসিয়া যখন প্রতিমার পীঠ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই দেখিবার জন্য বালক বালিকার ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি, আনন্দে উন্মত্ততা। আজি কুম্ভকার আসিয়া বুঁদি বাঁধিয়াছে, আড় মাটি লইয়াছে, আজ মাথা লাগাইয়াছে, আজ দোমাটি করিয়াছে,—সকল বালক বালিকার মুখে তখন এই সকল কথা শুনা যাইত। গঙ্গাজল নারিকেলের জলে হিঙ্গুল সহযোগে হরিতাল মাড়িয়া যখন রঙ প্রস্তুত করা হইত, প্রতিমা চিত্র করার পরে যখন প্রতিমাকে কাপড় পরান ও তারকুশির সাজে সাজান হইত, তখন দলে দলে বালক বালিকা আসিয়া সমস্ত দিন প্রতিমার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিত; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, সমস্তই তাহারা ভুলিয়া যাইত। সমস্ত বছর বালক বালিকা দেশী মোটা সুতার গ্রাম্য তাঁতীর প্রস্তুত মোটা ছোট ছোট কাপড় পরিয়া সময় কাটাইয়াছে; আজ তাহারা ধোয়া নকাসি পেড়ে শান্তিপুরী, ঢাকাই ধুতি, চাদর, শাড়ি পাইবে, সেজন্য তাহাদিগের আনন্দের সীমা নাই। তাহাদিগের মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়া বাহির হইত। সেকালের বালক বালিকা অল্পেই সন্তুষ্ট হইত; এ কালের বালক বালিকার মত উচ্চ মূল্যের ধুতি, উড়ানি, শাড়ির প্রয়োজন ছিল না। ৬ ডসনের জুতা, কফ্‌দার উৎকৃষ্ট শার্ট, কোট, মোজা ও সেমিজ, বডীর আবশ্যকতা ছিল না। দশ বার বছরের বালক বালিকা জুতা পরিত না, পৈতার সময়ে জুতা ও বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বরকে বনাতি জুতা ও অবস্থাপন্ন বরকে জরির জুতা দিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চটি জুতা ও বিষয়ীরা নাগরা জুতা সকল পথ হাতে করিয়া লইয়া কর্ম বাড়ির পুকুরে পা ধুইয়া পায়ে দিতেন। সেকালে খড়মের চাল বেশি ছিল। সেকালের ছুতোর উৎকৃষ্ঠ খড়ম প্রস্তুত করিতে পারিত। বাংলার ভিতরে মুর্শিদাবাদ ও রঙ্গপুরে হাতির দাঁতে নকাসি করা উৎকৃষ্ট খড়ম প্রস্তুত হইত। এখনও দুই একজন বৃদ্ধ ছুতোর আছে; তাহারা হাতির দাঁতের ও মহিষের শৃঙ্গের সকল কাজই জানে; কিন্তু কিনিবার লোক নাই। খড়ম জুতার সহিত প্রতিযোগিতায় টিকে নাই। আপাত-চটকদার অস্থায়ী কারপেটের সহিত

প্রতিযোগিতা করিয়া সতরঞ্চ ও গালিচা, কারপেটের আসনের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কুশাসন ও পিঁড়ি প্রায় অন্তর্ধান করিতে বসিয়াছে। পূজার সময়ে সে কালে—অবশ্য বালিকাকে নয়,—বালকদিগকে এক এক জোড়া নূতন খড়ম কিনিয়া দেওয়া হইত। সেই কড়ম লাল পাকা রঙে রঙ্গিন থাকিত। এখনকার ছুতোর সে পাকা রঙ ভুলিয়া গিয়াছে। সেই রঙিন খড়ম পাইয়া বালকদিগের কতই নৃত্য! সেকালের বালক বালিকাকে ও গৃহিণীদিগকে পূজার সময়ে যেরূপ ধুতি, চাদর ও শাড়ি দেওয়া হইত, একালের চাকর চাকরাণীকে যদি তাহা দেওয়া হয়, তবে তাহারা নাক সিঁটকাইয়া তখনই তাহা মুনিবের মুখের উপর ফেলিয়া দেয়। এখন আর গরিব লোকের ছেলেরাও এক-রঙী ধুতি চাদর পরে না, গরিব লোকের মেয়েরাও চুনারী শাড়ি পরে না; গৃহিণীরাও এখন আর বালুচরী বুটাদার চেলীর আদর করে না। যখন পরণ পরিচ্ছদের কথা, বসন ভূষণের কথা উঠিল, তখন এই প্রসঙ্গেই তাহা বলিয়া শেষ করি। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সকল সময়ে গ্রাম্য তাঁতির প্রস্তুতি মোটা ধুতি চাদর পরিতেন, বিষয়ীরাও তাহাই পরিতেন। কেবল পূজার মত উৎসবে সাদা সিমলাই ধুতি উড়ানী ব্যবহার করিতেন। রাজা জমিদারদিগের মধ্যে সকল সময়েই সিমলাই কাল ফিতা পেড়ে, শান্তিপুরী, বা ঢাকাই নকাসি পেড়ে ধুতি ও সেই সেই স্থানের উড়ানী ব্যবহারের প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সন্ধ্যাপূজার সময়ে তসর গরদ ও প্রাতে সভায় গরদের জোড় পরিতেন। মেয়েরা সর্বদা গ্রাম্য তাঁতির প্রস্তুত মোটা চওড়া লালপেড়ে শাড়ি, উৎসবে ঢাকাই, শান্তিপুরী শাড়ি, নীলাম্বরী, নীলকণ্ঠী বা বালুচরী বুটাদার চেলি পরিতেন। বড়মানুষের মেয়েদিগের ভিতরে বেনারসী চেলি ও উড়ানীও প্রচলন ছিল। দশবার বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত বড়মানুষের বালকেরা সোনার বালা, মধ্যবিত্তের বালকেরা রূপার বালা পরিত। পূজা পার্বণে প্রায় সকল বালকেরই গলায় সোনার হার, বাহুতে সোনার বাজু থাকিত। দশ বার বৎসর বয়সের পরে সকল বালকেই বালা খুলিয়া ফেলিত; কিন্তু বড়মানুষের গলায় হার ও বাহুতে বাজু আজীবন থাকিত। সকল ভদ্রলোকেরই আঙ্গুলে সোনার আঙটি থাকিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা আবার ক'ড়ে আঙ্গুলের পরের আঙ্গুলে একটি রূপার আঙটিও দিতেন। সৌখীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কোন কোন বিষয়ী সোনার সুতায় গাঁথা ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা ও সোনার ইষ্টকবচ ধারণ করিয়া হার ও বাজুর সখ মিটাইতেন। গৃহিণীরা কেহই কাঁকালে সোনার গোট পরিতেন না। নাভির নিচে সোনা ধারণ করিতে নাই, এই তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল। বড়মানুষের মেয়েরা সোনার, মধ্যবিত্তের মেয়েরা রূপার পৈঁচে, লবঙ্গদানা, নারিকেল-ফুল, কঙ্কন, বাউটি, হাতে ও বাহুতে কবচ দিতেন। সকলেরই বাহুতে সোনার বাজু, গলায় সোনার হার, কাণে সোনার ঢেড়ি, ঝুমকো, নাকে সোনার নত, মাথায় সোনার সিঁতি শোভা পাইত। শুনিয়াছি, আমাদিগের জন্মিবার পূর্বে গৃহিণীরা বাহুতে তাড় নামক একরূপ গহনা পরিতেন; আমরা তাহার ব্যবহার দেখি নাই।

শীতকালে সধবা মেয়েরা এক একখানি ফরাসী ছিটের দোলাই পাইতেন; সেকালের মেয়েদের কোনও প্রকারের জামা পরিবার রীতি ছিল না। বালক বালিকারা কুর্তা ও ছিটের দোলাই পাইত তাহাতেই তাহাদিগের আনন্দ উছলিয়া উঠিত। কিন্তু প্রায়ই তাহাদিগকে কুর্তার পরিবর্তে 'গাঁথি' পরাণ হইত। একখানি কাপড় এমন ভাবে গায়ে জড়াইয়া একটিমাত্র বাঁধ দেওয়া হইত, যাহাতে সেটি জামার মত হইত, এবং সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিত। তাহারই নাম গাঁথি। তখনকার মেয়েরা সকলেই গাঁথি করিতে জানিতেন;

এখনকার মেয়েরা নামও জানেন না। পুরুষদিগের মধ্যে আঙরাখার ব্যবহার ছিল। আঙরাখা আর কিছুই নয়, চাপকানের নিচের অংশ কাটিয়া ফেলিলেই আঙরাখা হয়। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কাপড়ের বাঁধ দেওয়া আঙরাখা গায়ে দিতেন; বড়লোকের আঙরাখার বোতাম থাকিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কোনরূপ জামা ব্যবহার করিতেন না। তুলা ভরা জামা ও ভুলা ভরা টুপীরও ব্যবহার ছিল। অবস্থানুসারে কেহ দোহর ও কেহ গ্রাম্য তাঁতির প্রস্তুত ডবল তিহাতি কাপড় গায়ের উপরে জড়াইয়া দিত। মওড়া চগজি হইলে দোলাই হয়, সূক্ষ মগজি হইলেই দোহর হয়। পুরুষ গায়ে দোলাই দিত না। কাল ও লাল বনাতেরও খুব ব্যবহার ছিল। বড়লোকেরা সময়ে সময়ে উচ্চ মূল্যের কাশ্মীরী শাল ব্যবহার করিতেন; অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরও সময়ে সময়ে শাল ব্যবহারের রীতি ছিল। পায়ে মোজা কাহারও দেখিয়াছি মনে হয় না। সেকালে শীত বস্ত্রের এত আড়ম্বর ছিল না; সেকালের লোক অনেক সময়েই ধুতির কোঁচা গায়ে দিয়া শীত কাটাইত। প্রবাদ আছে, যত কাপড়, তত শীত।

সেকালে বেশি বয়সের লোকের মাথায় লম্বা চুল থাকিত না; তাহাদিগের কপালের কিয়দংশ কামান হইত। উড়ে ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মত সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা মাথায় চুল রাখিতেন। কেহ কেহ শিখামাত্র রাখিয়া সমস্ত মুণ্ডন করিতেন। সেকালে তেল মাখিবার পদ্ধতিটা কিছু অতিরিক্ত ছিল। একঘণ্টা দু ঘণ্টা ব্যাপিয়া অনেককেই চাকরে তেল মাখাইয়া দিত। মেয়েরা নারিকেলের তেল মাখিত, মাথাঘষা মাখিয়া মাতা ঘষিয়া ফেলিত। তাহারা আগে খৈল বেসন দিয়া গা রগড়াইয়া পরে আবার দুধের সরে জাফরান বাটিয়া তাহা দ্বারা গা ঘসিয়া গা ধুইয়া ফেলিত। সেকালে সাবানের প্রচলন ছিল না। প্রথমে যখন দেশে সাবানের আমদানি হয়, তখন বৃদ্ধেরা রটাইয়াছিলেন,—"গাধার বিষ্ঠায় সাবান প্রস্তুত হয়।" সেই জন্য প্রথম প্রথম কেহই সাবান স্পর্শও করিত না। বিধবারা রুক্ষ স্নান করিতেন; তাঁহাদিগের মাথা ও গা ঘষিবার রীতি ছিল না; তাঁহাদিগের মাথায় লম্বা চুলও থাকিত না। তাঁহাদের অনেকেই, সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রাতঃস্নান করিতেন। বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে সকলেরই প্রাতঃস্নান করিবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা সেই তিনমাসে প্রতিদিন বিষ্ণুর বা অন্য দেবতার সহস্র নাম শ্রবণ ও এক একটি ভোজ্য উৎসর্গ করিতেন। অন্য সময়েও তাহাদের দ্বাদশীতে একটি ভোজ্য উৎসর্গ ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবার নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মণেব পক্ষে দ্বাদশীতে দুই তিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ পাইয়া এক বাড়িতে যাইয়া প্রায়ই অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করিতে হইত। বিধবারাই ছিলেন গৃহকর্ত্রী। প্রত্যেক বাড়িতে মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসীমা, কাকীমা, জেঠাইমা, ভগিনী বা শাশুড়ী কেহ না কেহ থাকিতেন। সেকালে কর্তা ও গৃহিণী তাহাদিগের আজ্ঞানুবর্তী ছিল, বাড়ির সেই বিধবার ভয়ে কর্তা ও গৃহিণী সর্বদা জড়সড় থাকিত। একালের মত সেকালের বিধবারা পাচিকার কার্য করিতেন না। তাহাদিগেরই হুকুমে সেকালের বধূরা দিনরাত খাটিত। সেকালের বিধবারা গরদ বা তসর পরিয়া গায়ে নামাবলী দিয়া ঠাকুরঘরে আসনে বসিয়া সন্ধ্যা, পূজা জপ তপস্যায় দিন কাটাইতেন। তাহাদিগের মুখে ও শরীরে কেমন একটা জ্যোতি বাহির হইত, দেখিলে পাষণ্ডের মনেও ভয় ও ভক্তির উদয় হইত।

সেকালে প্রত্যেক বাড়িতে বারো মাসে তের পার্বণ তো লাগিয়াই থাকিত। প্রত্যেক গৃহস্থকেই পিতামাতা, পিতামহ, পিতামহীর শ্রাদ্ধ মহালয়া বা দীপান্বিতায় পার্বণ শ্রাদ্ধ ও নবান্ন করিতে হইত।

আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইয়াও তত ব্রত উপবাসের নাম জানি না। আজ কি না অশ্বত্থ প্রতিষ্ঠা, কাল কি না পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পরশু কিনা মঠ প্রতিষ্ঠা, শিব স্থাপন, একটা একটা লাগিয়াই আছে। ইহার উপরে বৈশাখ, কার্তিক, মাঘ মাসে পাড়ার কোন এক বাড়িতে সেই বাড়ির বিধবার ইচ্ছায় সকালে রামায়ণ, মহাভারত, বা অন্য কোন পুরাণের পারায়ন, বৈকালে কথকের মুখে তাহার কথা বা পণ্ডিতের মুখে ব্যাখ্যা হইত। পাড়ার সকলে গিয়া তাহা শুনিত। তাহা দ্বারা পুরুষ, মেয়ে, এমনকি, বালক বালিকার পর্যন্ত ধর্ম, কর্ম, আচার, নীতি শিখিবার সুবিধা হইত। কোন্ তিথিতে কি খাইতে নাই, কোন বারে কি করিতে নাই, কোন তিথিতে কি করিতে আছে, কোন বারে কি করিতে আছে, তখনকার মেয়েরা পর্যন্ত জানিতেন। তখনকার মেয়েরা লেখাপড়া না শিখিয়াও অশৌচের ব্যবস্থা, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানিতেন। সেকালের মেয়েকে মন্ত্র পড়াইতে যাইয়া পুরোহিত থতমত খাইতেন। সেকালের মেয়েদিগের মুখের শুদ্ধ মন্ত্র ও শুদ্ধ স্তব, কবচ শুনিয়া একালের শিক্ষিতদিগের উচ্চারিত হ্রস্ব দীর্ঘ শূন্য একটানা উচ্চারণের হাত-পা-ভাঙা সংস্কৃত কবিতা শুনিলে দুঃখিত হইতে হয়। যাহা হউক, আমি দুর্গা পূজা প্রসঙ্গে সেকালের চিত্র দেখাইব, এইজন্য অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম; বাকি আছে, দুর্গাপূজায় বালক বালিকাদিগের উৎসাহের কথা; তাহা বলিতে হইবে।

বালক বলিকারা যে কেবল রাঙা কাপড়, রাঙাখড়ম পাইবার জন্যই উৎসাহিত হইত, এবং তাহা পাইয়াই যে কেবল তৃপ্ত হইত—বলিতে পারি না। তাহারা বেলবরণের দিন হইতেই নানা স্থান হইতে তুলিয়া ও কুড়াইয়া রাশি রাশি ফুল আনিত। পূজার সময়ে ও সন্ধ্যা আরতির সময়ে পূজাস্থানের চারিদিকে ঘুরিত, ফিরিত; ধূপচি জ্বালাইয়া দিত; নির্বানোন্মুখ ধূপচির উপরে ফুঁ দিত, বাতাস করিত; একদীপা, পঞ্চপ্রদীপ বরণডালার বাতি জ্বালিয়া ও উস্কাইয়া দিত; পুরোহিতের ঘন্টানাদের সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর, ঘণ্টা, করতাল ও শাঁখ বাজাইত; অনুপনীত বালকও অঞ্জলি দিবার জন্য জেদ ধরিত। প্রাতে, সন্ধ্যায় আরতির পরে, বলির পরে তাহারা গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিত। চরণামৃত পানের জন্য, ভোগের প্রসাদ খাইবার জন্য তাহাদিগের হুড়োহুড়ি দেখে কে? আবার বিসর্জনের জন্য প্রতিমা বাহির করিবার সময়ে তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইত। হইতে পারে—দেখাদেখি এই সকল কাজে তাহাদিগের উৎসাহ, হইতে পারে—কিন্তু কেবলমাত্র তাহা বলিতে পারি না। বলিতে হইবে, পিতামাতার সেইরূপ আচার আচরণ দেখিয়া তাহাদিগের হৃদয়েও একটা অস্ফুট ভক্তির সঞ্চার হইত; একটা অস্ফুট ভক্তির ছায়াপড়িত; সেই ভক্তির বীজ হইতে অজ্ঞাতসারে তাহার অঙ্কুর একুট আধটু করিয়া ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিত। স্কুল কালেজের শিক্ষায় গড়িতে পারে না, ভাঙিতে পারে। মাতাপিতার আচার আচরণ দেখিয়া শিখিয়া মানুষ গঠিত হয়।

ছোটবেলার কথা মনে পড়িতেছে। একদিন একটি বালক মাতার কোলে শুইয়া মাতার মুখে নানা কথা শুনিতেছিল। বালক জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মা, গ্রামের জমিদার বড়লোক. সকলে তাহাকে ভয় করে, মান্য করে; সে কেন আমাদিগকে প্রণাম করে?" মা উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা ব্রাহ্মণ, তিনি শূদ্র, সেইজন্য তিনি তোমাদিগকে প্রণাম করেন; জন্মজন্মান্তরে বহু পূণ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়; অন্যে প্রণাম করায়, সময়ে বা অন্য সময়ে যদি মনে হয়, আমি বহু পুণ্য করিয়াছি, সেই জন্য ব্রাহ্মণ হইয়াছি, তবে সেই পুণ্যক্ষয় হয়, আর পর জন্মে ব্রাহ্মণ হইবার আশা থাকে না। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে তাহা শুনিয়াছি।

অন্যে প্রণাম করিলে মনে মনে ভাবিবে, এই প্রণাম আমার নয়, আমাকে করা হয় নাই, এ ব্রাহ্মণদেবের প্রণাম, নারায়ণের প্রণাম। সাবধান, এই কথা ভুলিও না।" বালক মাতার উপদেশে প্রীত হইয়া আবার প্রশ্ন করিয়াছিল, "আচ্ছা মা, বেশি পুণ্যত অল্প লোকে করে, কম পুণ্য বেশি লোক করে, তবে ব্রাহ্মণ বেশি কেন? জমিদার কম কেন?" মাতা হাসিয়া বলিয়াছেন,—"আরে, তাহা নয়; এখনও আমাদিগের দেশে বেশি লোকেই বেশি পুণ্য করে, কম লোকে কম পুণ্য করে। ঈশ্বরের কাছে যা চাইবে, তাই তিনি দিবেন? না চাইলে দিবেন কেন? তুই আমাদিগের নিকট যা পাইবার জন্য জেদ ধরিস, তাই ত আমরা দিয়া থাকি; যার জন্য তোর জেদ নাই, তা কি আমরা দি? ব্রাহ্মণ হওয়া অপেক্ষা ধনী হওয়া যে কম, তাকি তুই বুঝিস না? ধনীর ধন কাড়িয়া লইলে সে পথের ভিখারী হয়, আর সে ধনী থাকে না; কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য কি করিয়া লওয়া যায়? সেই জন্য এদেশের লোক ধন চায় না, ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিতে চায়। যাহারা অজ্ঞানী, লোভী, তাহারাই ধন চায়; এদেশে তাহারা বড়ই কম। আবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ত লোকে বেশি পুণ্য করিত; তাহারা সকলেই ত মুক্তি পায় নাই। তাহারাই আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছে।" অবশ্য তখনকার নিরক্ষর মাতার এই উত্তর ঠিক কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু বালক এই উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। খেলার সময়ে তাহার মুখে এই কথা অনেকবার অনেকে বালকই শুনিয়াছিল। এইজন্য বলিতেছি,—তখনকার মাতা পিতামহী নিরক্ষর হইলেও তাহারা যেমন সহজ কথায় বালকের মনে বিশ্বাসের শিকড় বসাইয়া দিতে পারিতেন, এখনকার শিক্ষিতা মহিলাদের কথা ছাড়িয়া দাও, টোলের অধ্যাপক ভট্টাচার্যও সেরূপ পারেন কিনা সন্দেহ। খুঁটিনাটি করিয়া সেকালের সমস্ত নিখুঁত চিত্র দেখান অসম্ভব। ছোটখাট বিষয়গুলি ছাড়িয়া দিয়া বড় বড় বিষয় ধরিয়া দেখাইতে গেলেও একখানি প্রকাণ্ড পুস্তকে শেষ করিতে পারা যাইবে—এরূপ বিশ্বাস হয় না। আজ আর বলিতে চাই না।

সেকালে বিকালে, সন্ধ্যাব প্রথম খামে ছেলে মেয়েরা ঠাকুর দাদাকে বা ঠাকুরমাকে ঘিরিয়া বসিত, এবং তাহাদিগের মুখে সেকালের কথা বা রূপকথা শুনিত। বালক বালিকারা মাঝে মাঝে 'হঁ' 'হুঁ' না বলিলে তাহারা কথা বলিতেন না। 'হুঁ' 'হুঁ' বলিলে তাহারা বুঝিতেন, ইহাদিগের ভাল লাগিয়াছে, বলা আবশ্যক; না বলিলে বুঝিতেন, ভাল লাগে নাই, বলা উচিত নয়। একে একে ঠাকুরমা ঠাকুরদাদারা জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। একালে সেকালের কথা বলেই বা কে? শুনেই বা কে? একালের বালক বালিকা যুবক যুবতী সত্যপ্রিয়; কিন্তু মিথ্যা যাহার বনিয়াদ—সেই নাটক নভেল তাহারা ভালবাসে। নিখুঁত সত্য সেকালের কথা ভালবাসিবে কি না, কি করিয়া বলিব? নিজেকে বৃদ্ধা মনে করিয়া আপনা হইতেই সেকালের কথার কতক কতক আওড়াইয়া গেলাম। এখন 'হুঁ' এর অপেক্ষা। যদি কেহ "হুঁ" করে, আবার বলিব, নয়ত এই পর্যন্ত।

সাহিত্য ১৩২০ কার্তিক/মাঘ

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

১৮৬১-১৯২০

এ-কাল ও এ-কালের মেয়ে

আমাদের বর্তমান অবস্থাতে আমরা কখনই সম্পূর্ণ সুখ উপলব্ধি করি না। অতীত কালের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের কল্পনায় আমরা প্রকৃত সুখ অনুভব করি। কিন্তু বর্তমানে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, প্রায় সকলেই নিজ নিজ অবস্থা অপ্রীতিজনক বোধ করিয়া থাকি! অতীত কালের স্মৃতিতে কাঁটা খোঁচা নাই, ভবিষ্যতের কল্পনায় নিগড় নাই। সময়ের পরিবর্তনে অতীতের আশ-পাশের ঝঞ্ঝাট চলিয়া যায়—থাকে শুধু সুখময় স্মৃতিটুকু। প্রতি বৎসর শরতের জ্যোৎস্নায়, বসন্তের বাতাসে, বৈশাখী বেল-জুঁইয়ের গন্ধে পরিতৃপ্ত হইয়াও ভাবি, পূর্বে যেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না হইত—কই, তেমন তো আর এখন হয় না! বসন্তে এ-বৎসর বসন্ত নাই—এ তো শীত—বেলফুলে গন্ধ নাই—মালীরা কুঁড়ি তুলে মালা গেঁথেছে। গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছি—বাতাসটি মন্দ নহে—ঢেউগুলি বেশ কিন্তু শরীরটা ভালো নয়, এত জল হাওয়া লাগল, তাই তো! কিন্তু আজ আর সে সকল কিছু মনে নাই—মনে আছে শুধু গঙ্গার ধারটুকু—তাহার ঢেউগুলি, মৃদুমন্দ বাতাস—মোহময় জ্যোৎস্না।

পানসিতে ঢেউ লাগায়—সে দিন মাথা ঘোরায় যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা মনে নাই—মনে আছে সেই মাঝির গান—সেই দাঁড়ের ঝুপঝুপ শব্দ। অসুখকর স্মৃতি কি থাকে না? থাকে, কিন্তু তাহা তীব্রভাবে থাকে না;—অথবা আমরা মনুষ্য জাতি, তাহাকে সমাদরে স্থান দান করিতে চাহি না। আমাদের প্রিয়তমের রুগ্ন শয্যায় যখন আমরা তাহার সেবা করি, তখন আমরা কখনই মনে আনিতে পারি না যে, সে বিনা আমরা জীবিত থাকিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরে আর সে দুঃখের তীব্রতা থাকে না—মৃতকে বিস্মৃত হই—অন্তত হইতে চেষ্টা করি। কিন্তু সুখের স্মৃতি জ্বলন্তভাবে আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, স্মৃতিতেই আমরা প্রকৃত সুখানুভব করি। সুখের স্মৃতিকে আমরা অতি যত্নে আদরে পোষণ করি, বার বার তাহা স্মরণ করি, বার বার তাহার উল্লেখ করি। রুগ্ন শয্যায় সে যে কত কষ্ট পাইয়াছিল—তাহা মনে আনি না—কত যে মিষ্ট কথা কহিত, তাহাই মনে মনে শত বার আন্দোলন করিয়া থাকি।

এই বর্তমানের স্বাভাবিক অসন্তোষের ফলেই বোধ হয়, আজকাল বঙ্গসমাজের এক দল মানব এক দলের মেয়ের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট। তাহারা সেকালের মেয়েদের প্রভূত প্রশংসা ও এ-কালের মেয়েদের যথোচিত নিন্দা করিয়া দিন রাত খুঁত খুঁত করিতেছেন। তাহারা বলেন, এ-কালের মেয়েরা অতিশয় বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে, কোনো কাজকর্ম করে না, কেবল বিছানায় শুইয়া নভেল পড়ে, চেয়ারে বসিয়া কার্পেট বুনে। কেহ বলেন, বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া মেয়েরা নিতান্ত অকর্মণ্য হইয়াছে, বিনা পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হওয়াতে স্বামীর উপার্জিত অধিকাংশ ধনই ডাক্তারের ঘরে যায়। ছেলেরা দাসদাসীর

দ্বারায় প্রতিপালিত হওয়াতে তাহারাও অনিয়ম ও অযত্নে রুগ্ন ও অসৎচরিত্র হয়। কেহ বলেন, শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে এ-কালের মেয়েরা ভক্তি করেন না, অতিথি অভ্যাগতদের যত্ন করেন না, ছেলেপিলেকে স্নেহ করেন না। তাহারা বলেন, এ সমস্তই লেখাপড়ার দোষ—লেখাপড়া শিখিয়া মেয়েরা বিবি হইয়াছেন, তাহাদের আর লেখাপড়া শেখানো উচিত নহে। এইরূপ নানা জনে নানাবিধ দোষ দেখাইয়া পরিশেষে উপসংহারে বলেন যে, কখন গার্হস্থ্য সুখ চলিয়া গিয়াছে—দাম্পত্য প্রেম নাই, মাতৃস্নেহ নাই—বেচারী পুরুষদের মহা কষ্ট। তাহারা প্রাণপণে যে পরিবারের জন্য ধন উপার্জন করেন, যে পারিবারিক সুখ তাহার তিল মাত্র নাই, কেবল জ্বালাতন। অভাব কিছুতেই ঘোচে না। কেবল টাকা নাই, টাকা নাই! স্ত্রী-শিক্ষার দোষেই তো এত অভাব। গৃহিণীর বিবিয়ানার খরচ চাই, ডাক্তার খরচ চাই, দাস দাসী চাই, রাঁধুনি চাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় এ-কালের প্রবলা অবলারা, বেচারি পুরুষদের অভিযোগ হইতে কিয়ৎপরিমাণে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

এ-কালের মহিলাদের অভিযোগকারীগণ কহেন, সেকালে এত দাস দাসী রাখা প্রথা ছিল না—মহিলারা নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিতেন, নিজ হস্তে অন্য অন্য কাজকর্ম সকলই নির্বাহ করিতেন, কিন্তু এ-কালের মেয়েদের দাস দাসী নহিলে চলে না। তাহারা হাত ময়লার ভয়ে পান সাজেন না, দুর্গন্ধ বলিয়া গোময়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

সত্য বটে, এ-কালের মেয়েরা কতক পরিমাণে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা পান সাজিতে বসিয়া কাপড়ময় চুন খয়েরের হাত মুছিতে রাজি নহেন, তাহারা ভাতের হাঁড়ির কালি ও ব্যঞ্জনের হলুদে হস্ত রঞ্জিত করিতে নারাজ। পূর্ব প্রচলিত নিয়ম আছে যে, রন্ধনকারিণী হাত মুখ ধুইয়া, পরিধানবস্ত্র পরিবর্তন করিয়া, পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়া তবে পরিবেশনে যাইতেন। এ নিয়ম যত পালন হউক বা না হউক, সেকালের মহিলারা গামছার কার্য সমস্তই নিজ পরিধানবস্ত্রে সারিয়া লইতেন। এ-কালের মেয়েরা পরিচ্ছন্ন হওয়াতে যাহাতে হাত অপরিষ্কার না হয়, তাহার উপায় করেন, তাহারা হাত মুছিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন।

সেকালে তেল মাখিয়া স্নান করা পদ্ধতি ছিল, আজকাল সাবান মাখিয়া স্নান প্রচলিত হইয়াছে—চারি দিকে সাবান ছড়াছড়ি হওয়াতে সকলেই তাহা ব্যবহার করেন—মহিলারাও অবশ্য ব্যবহার করেন। কিন্তু যে সকল প্রভুরা দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলুন দেখি যে, তাহারাই কি আপিসের ফেরত সাবান, চিরুনি, পাউডার কিনিয়া আনিয়া গৃহলক্ষ্মীকে প্রলোভিত ও প্রফুল্লিত করেন কি না? বাস্তবিক যদি বিজাতীয় বিলাসদ্রব্য ব্যবহার ও বিজাতীয় অনুকরণ বঙ্গীয় পুরুষদিগের অনুমোদিত না হইত, তাহা হইলে কি বঙ্গীয় রমণীগণ তাহা ব্যবহার করিতেন—না তাহা ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন? যাহা হউক, তা বলিয়া কি এ-কালে যাহার রাঁধুনি রাখিবার ক্ষমতা নাই, তিনি কি বাজার হইতে ভাত কিনিয়া খাইয়া থাকেন? না তিনি নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া আহার করেন? তাহার স্ত্রী বা মাতা রন্ধন করিয়া দেন না তো কে দেয়? প্রায়ই শোনা যায়, বউ রাঁধে না; বুড়ো শাশুড়িকে দিয়ে রাঁধায়। কিন্তু সেটা এমনই কি দোষের? বিবেচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থের পক্ষে সুবিধা বলিয়াই শাশুড়িকে রাঁধিতে সচরাচর দেখা যায়—এবং শাশুড়ি বা মাতা ইচ্ছাপূর্বক রন্ধনের ভার লইয়া থাকেন। তবে কন্যাকে রন্ধন-ভার হইতে

মুক্ত করিয়া মাতা তাহাকে খোঁটা দেন না, কিন্তু শাশুড়ি এবং তাহার আত্মীয়ারা বধূকে দুই এক কথা না শোনাইয়া থাকিতে পারেন না।

আমাদের দেশে হিন্দু বিধবারা প্রায় সকলেই স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়া থাকেন। এমন স্থলে তাহার নিজের জন্য রাঁধিতেই হইল, তখন তাহার উপর আরও দু-চার জনের রাঁধিতে কিছু কষ্ট হয় না। বিশেষ গার্হস্থ্যের অন্য অন্য কার্যের তুলনায় বসিয়া বসিয়া রন্ধন করাই প্রাচীনাদের পক্ষে অল্প কষ্টকর। কারণ, প্রাচীন অবস্থায় নড়াচড়া স্বাভাবিক নহে। ছোট ছোট সন্তানাদি লইয়া ব্যস্ত হইতেও হয় না। অনেক স্থলে শাশুড়ি নিরামিষ রাঁধিলেন, বৌ একটু মাছ রাঁধিয়া লইলেন। নিতান্ত যদি বৌ ছেলেপিলে লইয়া বিব্রত থাকেন তো শাশুড়িই মাছ রাঁধিয়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলেন। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বয়োবৃদ্ধির সহিত সকল স্ত্রীলোকেরই রন্ধনে পটুতা জন্মে। বাস্তবিক পাক-প্রণালী পাঠ করিয়া ওজন করিয়া প্রত্যেক তরকারি রাঁধিতে হইলে দিনান্তে আহার জোটা ভার। সুতরাং বধূ হইতে শাশুড়ির রান্না উত্তম হওয়ায় এবং রন্ধন-কৌশলাদি জানা থাকাতে অল্প খরচে হওয়ায় শাশুড়ির উপর রন্ধন-ভার থাকা গৃহস্থেরও সুবিধা ও মঙ্গল। শাশুড়ি নিজে পুত্র পৌত্রের জন্য রাঁধিতে কিছু ক্লেশ বোধ করেন না। তার পর যাহার ঘরে রাঁধুনি আছে, এমন মহিলারাও কি রান্না হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন? বাবুর সখের খাবার, ছেলেদের জলখাবার—এ সকলই তো প্রায় তাহাদের নিজ হস্তে প্রস্তুত করিতে হয়।

এই কলিকাতায় রাঁধুনি বা দাস দাসী সহজে পাওয়া যায় বলিয়া এখন প্রায় সকলেই দাস দাসী রাখিয়া থাকেন। বিশেষ অন্তত একটি দাসী না রাখিলে কলিকাতায় বঙ্গকুলবধূর মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। কলিকাতায় বাড়ির চৌকাঠের বাহিরে কুলবধূর পা বাড়াইবার জো নাই, কোনো লোক বাড়িতে আসিলে স্বামী-পুত্রের অনুপস্থিতিতে কথা কহিবার কেহ নাই। কলিকাতায় একটি দাসী ভিন্ন বাস করা যে কত অসুবিধা, তাহা যাহাদের দাস দাসী নাই, তাহারাই অনুভব করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে দাস দাসীর তত আবশ্যক হয় না—পল্লীগ্রামে মহিলাদিগের কতকটা স্বাধীনতা থাকে, এবং বাটিতেও নিতান্ত পরিচিতেরাই সচরাচর হামেশা থাকে—তাহাদের সামনে যাওয়া ও স্পষ্ট না হউক, ইঙ্গিতেও কথা কহা চলে। অথবা আবশ্যক স্থলে খিড়কিদ্বার দিয়া বাহির হইতে পাড়ার মাসি, পিসি বা ভাইপো ভাইঝিকেও আনিয়া হাজির করা চলে। পল্লীগ্রামে দাস দাসী পাওয়াও সুকঠিন। জমিদার বা গ্রামের ধনী ব্যক্তিও অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া দাস দাসী পাইয়া থাকেন। সেখানে সকলেই প্রায় গৃহস্থ ও চাষি লোক। তাহারা নিজের ঘরে খাটে-খোটে, পরের দুয়ারে যায় না। পরের দুয়ারে যাইতে হইলেই কলিকাতায় চলিয়া আসে—কারণ, রাজধানীতে কাজ মিলিবেই। কলিকাতায় দাস দাসী সহজেই পাওয়া যায় বলিযা এবং আবশ্যকও অধিক বলিয়া এখানে সকল প্রয়োজনানুসারে ক্ষমতানুসারে দাস দাসী রাখিয়া থাকেন। একটা রাঁধুনির অসুখ হইলে সহজেই যদি আর একটা পাওয়া যায়, তবে কেনই বা কষ্ট স্বীকার করিবে? সকলেই তো সকল বিষয়ে দেখিতেছেন যে, হাতের কাছে উপায় থাকিতে কেহ কষ্ট করিতে চাহেন না। ট্রাম হওয়াতে ইতর ভদ্র সকলেই ট্রামে উঠিতেছে। পূর্বে যাহারা চিরদিন হাঁটিয়া দলে দলে কালীঘাট যাতায়াত করিত, এখন তাহাদের মধ্যে কয় জন হাঁটিবার কষ্ট স্বীকার করে? এখন শাদা ফুলে মালা গলায়, কপালে সিন্দুর, কোলে ছেলে মাথায় বোঝা, পরিশ্রান্ত পদাতিক যাত্রী বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেলা দুই প্রহরের সময় কালীঘাটের ফেরত ট্রামে যাত্রী বোঝাই দেখিতে

পাওয়া যায়। বিশেষ একান্নবর্তী প্রথা উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া দাস দাসীর আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইয়াছে। সেকালে একজন রাঁধিতে গেলেন, একজন বাড়ির সকল ছেলেগুলিকে একত্র করিয়া ভাত খাওয়াইতে গেলেন। তখন এড়া ভাত খাওয়া ছেলেদের একটা পদ্ধতি ছিল—তখন প্রায়ই কর্তারা প্রাতে উঠিয়া কাজকর্ম করিতেন বা দেখিতেন, দ্বিপ্রহরে বাটি আসিয়া স্নানাহ্নিক ও আহারাদি করিতেন। তাহাতে ২।৩ টার কম পুরুষদেরই আহার হইত না। সুতরাং রন্ধনকারিণী কিছু দশটার পূর্বে রান্নাঘরে যাইতেন না। তাই জন্য নিয়ম ছিল, একজন সকল ছেলেগুলিকে একত্র করিয়া 'চড়িভাতির' মতো দুই একটি ব্যঞ্জন ও ভাত রাঁধিয়া আহার করাইতেন। ইহাতে স্নানের বা শুচির বিশেষ আবশ্যক ছিল না—সকল দিন রন্ধন করাও হইত না—এক এক দিন গ্রীষ্মকালে চাহি কি পান্তা ভাতও খাওয়ানো হইত। তাই এই ভাতের নাম 'এড়াভাত' বা 'বাসী ভাত' সেকালে বহু পরিবার একত্রে থাকায় আজ ইনি, কাল উনি, এইরূপ পালা করিয়া রাঁধা হইত, সুতরাং সকলেরই সকলের নিকট কোনো-না-কোনো বিষয়ে সাহায্য পাওয়াতে তাদৃশ ক্লেশানুভব করিতেন না। কিন্তু এখন সকলেই প্রায় পৃথক হওয়াতে রোগে, শোকে, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়ও শিশু সন্তানগুলিকে লইয়া প্রত্যেককেই এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় যে দাস দাসী না রাখিলে চলে না। অনেক নির্বিরোধী প্রভু কহিবেন যে, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা উঠিয়া যাওয়ারও তো বৌ বৌ ঝগড়াই কারণ। একান্নবর্তী প্রথা আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র কথা আসিয়া পড়ে, সুতরাং এখানে তাহার বিশেষরূপে আলোচনা ছাড়িয়া দেওয়া গেল। পৃথক রহিবার একটি প্রধান কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ইংরেজ রাজত্বে কাশী যাইতে হইলে আর উইল করিয়া যাইতে হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বল্প আয়াসে অল্প খরচে বহু দূরদেশে যাতায়াত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং সকলেই নিজ নিজ কর্মস্থলে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া যান। সুতরাং ঝগড়া-ঝাঁটি না হইলেও পৃথক থাকা হয়—সেকালে বিদেশে নিজ প্রাণই রক্ষাই দুষ্কর ছিল, সুতরাং কেহই কর্মস্থানে নিজ স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতে পারিতেন না। দূরত্বানুসারে কেহ সপ্তাহে, কেহ মাসান্তে, কেহ বৎসরান্তে বাটি যাইতেন। কেহ বা দশ বিশ বৎসর উপার্জন করিয়া একেবারে বাটি ফিরিতেন। সুতরাং তখন এক কর্তার অধীনে বহু পরিবার প্রতিপালিত হইত। সময়ানুসারে একান্নবর্তী প্রথার আবশ্যকতা ছিল, এই জন্য সকলেই কিছু-না-কিছু কষ্ট সহ্য করিতেন। স্ত্রী পুত্র, মাতা পিতা, সকলেই পরস্পরে পরস্পরের কাছাকাছি থাকিতে চাহে। এখন রেলের গাড়ি হওয়াতে যাতায়াতের খুব সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতার কাছাকাছি পল্লীগ্রামে যাহাদের বাটি, সকলেই জানেন যে, তাহাদের মধ্যে যাঁহাদের পরিবার নিজ গ্রামে থাকেন, তাহারা প্রায়ই কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন না। তাহাদের ভিন্ন খরচ করিয়া থাকিতে যে অতিরিক্ত খরচ হয়, তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে রেলওয়ে কোম্পানিকে দিয়া থাকেন। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া স্নেহপূর্ণ গৃহে তাহারা যে আরাম পাইয়া থাকেন, তাহা কলিকাতার বাসায় পান না—তাই জন্য তাহারা নিজে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও বাটি হইতে যাতায়াত করেন।

যাহা হউক, এ-কালের মেয়েরা যে শুদ্ধ কার্যাক্ষম বলিয়া দাস দাসী রাখা হয়, এমন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সেকালে ছেলেরা প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, পাড়ার পাঁচ সাতটি ছেলে একত্রে পাঠশালায় হাজির হইত—দ্বিপ্রহরে বাড়ি আসিয়া খাওয়া দাওয়া করিত। কিন্তু এ-কালের ভিন্ন প্রথা—বেলা নয়টার সময় যেমন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বাড়ির কর্তাকে আপিস যাইবার জন্য হুড়াহুড়ি

করিতে হয়—তেমনি ছেলেদেরও স্কুলের তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়। এখন 'পাঠশালা' পরিবর্তন হইয়া যেমন 'স্কুল' হইয়াছে, তেমনই বেশভূষারও পরিবর্তন হইয়াছে। জামা জুতা, ছাতা, কত কি চাহি। অনেক সময় জুতা অভাবে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেকালে গৃহস্থ-বালকের মধ্যে কয় জন বারো মাস জুতা ব্যবহার করিতে পাইত? পাল পার্বণে পোশাকি-কাপড়ের মতো অধিকাংশের মাঝে মাঝে হয়তো জুতা আবশ্যক হইত। সেকালে যে-যাহার পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিত—এ-কালে কি কায়স্থ, কি ব্রাহ্মণ, কি অন্য শ্রেণির লোক, সকলেই স্কুল আপিস যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে। এই সকল স্কুল আপিসের হাঙ্গামায় গৃহিণী ধীর ভাবে রন্ধনাদি করিবে, না সকলকে আবশ্যকীয় ভাবে গুছাইয়া দিবে? আর এই তাড়াতাড়িতে কি রন্ধনই ভালো হয়? না সকল রকম ব্যঞ্জন হইয়া উঠে? মাছের ঝোল ভাত হয় তো ঢের। তাও বাজার আনিতে বিলম্ব সহে না, প্রায়ই বাসী মাছ রাখা হয়। প্রভাতে উঠিয়া, কয়লার উনানে আগুন দিয়া স্নান-সমাপনান্তে ভাত না চড়াইতে 'দাও দাও' শব্দ। কর্তা ভাত দাও দাও চিৎকার করিতেছেন; আপিসে জরিমানার ভয়। বড় ছেলে নূতন অ্যাপ্রেন্টিস্, ত্রাহি মধুসূদন—ভাতের জন্য বুঝি নাম কাটা যায়। মধ্যম 'স্কুলের বেলা হল, একটু সকাল সকাল না গেলে পড়া শুনতে পাব না।' তৃতীয়, 'মাস্টার মারবেন'। চতুর্থ, 'খিদে পেয়েছে' করিয়া আঁচল ধরিয়া ঝুলিতেছে—কোলের খুকিটি একাকী পড়িয়া দুগ্ধ অভাবে ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেছে। কে কাহাকে দেখে!—এমন অবস্থায় যে কি বিপদে পড়িতে হয়, তাহা যাহারা কখনও এমন অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন।

এ-কালের মেয়ে এ-কালেরই উপযোগী। দোষেই হোক, আর গুণেই হোক, এ-কালের মেয়ে, সেকালের মেয়ের মতো হইলে কি এ-কাল চলে? শুধু শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, রাঁধিতে জানিতে এ-কালে আর মান সম্ভ্রম নাই। পাঁঠার বড়া বড়ি চচ্চড়ি কে কতরকম জানেন, তাহারই এখন সকলে খবর লইয়া গেলেন। সাদা ভাতের মান নাই—হল্‌দে ভাত রাঁধিতে জানা চাহি। 'পিঁড়া আলপনা', 'ছাঁচ কাটা', 'কঁথা শিয়ান' এখন আর শিল্পের মধ্যে গণ্য নহে। আর তাহা বাস্তবিকই এত সহজ যে, এ-কালের মেয়েদের পক্ষে তাহা কষ্টকর নহে। এ-কালের মেয়রা 'পিঁড়া আলপনা.' 'কাঁথা শিয়ান' সত্ত্বেও অতি সুন্দর সুন্দর নানাবিধ শিল্প ও আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন। সেকালের মেয়েরা অবকাশ পাইলেই গল্প করিতে বসিতেন—গল্পটা কিরূপ, তাহা বোধ হয় বেশি বলিতে হইবে না, সেই গল্পের অধিকাংশই যে পরনিন্দায় পূর্ণ, সে বিষয়ে হলপ করা যাইতে পারে। এ-কালে একটু লেখা পড়া জানা থাকাতে, এবং বঙ্গভাষায় অনেক পাঠ্য পুস্তক হওয়াতে কেবল পরনিন্দা করিয়া সময় কাটাইতে তাহাদের আবশ্যকও হয় না। প্রবৃত্তিও হয় না। পাড়ার বামন পিসি কায়েত মাসিকে একটু নুন, চারটি চাল দিয়া, ভাব-সাব রাখিয়া আবশ্যকমতো সময় কাটাইবার খোরাক জোগাড় করিতে এ-কালের মেয়েরা ব্যস্ত হয়েন না। ধনী মহিলারা দাসীবেষ্টিত হইয়া নিজ প্রশংসা ও পরনিন্দা শ্রবণ করা অপেক্ষা নভেল পাঠ করিয়া, কার্পেট বুনিয়া সময় কাটানো গৌরবের বিষয় বিবেচনা করেন। এ-কালের মেয়েরা কিছু গর্বিতা, এ-কালের মেয়ে নিজ মনোদুঃখে বা সাংসারিক অভাব বা স্বামী পুত্রের নিন্দাবাদ যাহার তাহার কাছে করেন না। নিতান্ত সখ্যতা বা আত্মীয়তা না থাকিলে, সকল পেটের কথা খুলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তৃপ্তিলাভ করা, এ-কালের মেয়েরা পছন্দ করেন না। তাহারা বইখানি, কার্পেটটুকু, নিজের স্বামী পুত্র লইয়া দিন যাপন করিতে বা

একেলা থাকিতে কষ্ট বোধ করেন না। সুতরাং পরনিন্দার হাতে ততটা আত্মসমর্পণ করিতে হয় না। ধনীর গৃহ ব্যতীত কয় জন গৃহস্থ মহিলা বিছানায় পড়িয়া দিন কাটাইতে সময় পাইয়া থাকেন, তাহা আমরা তো বুঝিতে পারি না এবং জানিও না। রন্ধন বা বাসন মাজা ব্যতীত কত কাজ আছে, গৃহস্থ ঘরের মহিলাদের স্বহস্তে যে সকলই সম্পন্ন করিতে হয়। বিছানায় পড়িয়া যে তাহারা অসুস্থতা টানিয়া আনেন, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অন্যায় দোষারোপ করা হয়। পল্লীগ্রাম যে এদানিক ম্যালেরিয়া জ্বরে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা তো আলস্যের ফলে নহে। তারপর অতিথি অভ্যাগতকে যত্ন করা—সত্য বটে, এ-কালের মেয়েরা অতিথি অভ্যাগতকে যত্ন করেন না। কিন্তু অতিথি কোথায়—কাহাকে যত্ন করিবেন?

সেকালে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে পদব্রজে যাইতে লোকের আতিথ্য আবশ্যক হইত। তখন বহু পরিবারের অন্ন হইতে অনায়াসে দুই এক জনের অন্ন হইত এবং 'আসুন্তি যায়ুন্তি হাঁড়িতে দুটি চাল বেশি করে দাও' বলা হইত। কিন্তু আজকাল রেলওয়ের কল্যাণে কে কাহার দুয়ারে যায়? সুতরাং কালধর্মে অতিথির অভাবে আতিথ্যের ভাবও ঘুচিয়া যাইতেছে। আর কি এখন কেহ পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে চটি দেখিতে পান? সেকালে প্রতি ক্রোশে চটি—প্রতি পাঁচ ক্রোশ অন্তরে সরাই থাকিত। চটিতে মুদিনী—সে কি দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য বা পরকালের ফল ভোগের জন্য অতিথিদের যত্ন করিত, এ বিশ্বাস বোধ হয় কাহারও নাই। এখন রেলওয়ে স্টেশনে লুচি কচুরি, মোণ্ডা মেঠাই, দুগ্ধ ফল প্রভৃতি সকল জাতিরই আবশ্যকীয় সকল রকম খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। আবশ্যক হইলেই উপাদান হয়। সমাজের যখন যেরূপ আবশ্যক, তখন সেইরূপ পাওয়া যাইবেই। নিজ নিজ স্বার্থের জন্যই সকলেই আবার পরস্পরে পরস্পরের আবশ্যকীয় হইয়া উঠে। আজ আমার ঘরে অতিথি এল, আমি আজ সেবা যত্ন করলে, তারা আমাদের আবার করবে এখন—এই স্বার্থটুকু মনের এক প্রান্তে লুক্কায়িত থাকিতই। এখন তোমারও দরকার নাই, আমারও দরকার নাই—অতিথিও নাই, আতিথ্যও নাই।

এ-কালের মেয়েদের রুচি এখন সেকাল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াছে। সেকালের বাউটি পৈছাঁর আর এখন আদর নাই। 'কলসির কাণা'র মতো বাউটি পরিয়া নিমন্ত্রণ সভায় গেলে আর কেহ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে না। 'অমুক বোস্ অমন করে বেড়ায় বটে—কিন্তু দেখেছিস ভাই, মিন্‌সের পয়সা আছে—নইলে গিন্নিকে অমন কলসির কাণার মতো বাউটি দিতে পারে!' কথাগুলি সঙ্গিনীকে যদিও যথাসাধ্য চুপি চুপি বলা হইল বটে, কিন্তু বাউটি-ধারিণীর কানে তাহা পৌঁছিল। তিনিও প্রফুল্ল মনে, গৌরব নেত্রে বাউটি-সমালোচনাকারিণীর দিকে কটাক্ষ করিয়া 'ঠিক বলেছ' ভাবটি প্রকাশ করা এখন আর কেহ গৌরবের বিবেচনা করেন না।

এক ঝুড়ি সুতায় গাঁথা সোনার নুড়ি, ঢিল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, লম্বা, চওড়া পদার্থ—নারকেল ফুল, মাদুলি রুসণো, মরদানা, যবদানা নামে অভিহিত করিয়া এবং তাহাদের সোনার কলসির কাণায় সুকোমল বাহু আচ্ছাদন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী হরণ করা এ-কালের মেয়েরা যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন না। এবং 'আমার একখানি বেনারসি শাড়ি আছে গো' দেখাইবার মতো। একটি বার বেনারসি শাড়ি পরিয়া নিমন্ত্রণ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, অসহ্য গরমে শ্রান্ত হইয়া '১২৫ টাকার শাড়ি, খাসা! এক বার পরেই কি

মাটি করিব' এই কথা বার বার দাসীকে বলিয়া ও আশপাশের শুভ্র শাড়িধারিণীদের শুনাইয়া কাপড়খানি সন্তর্পণে ছাড়িয়া রাখা তাহারা হাস্যজনক বিবেচনা করেন না।

পরিপাটি ও সুশ্রী দেখাইবার জন্য বস্ত্র অলংকার পরিধান করা—বস্ত্র অলংকারে যদি তাহা বিনষ্টই হইল, তবে তাহাতে আবশ্যক কি? এ-কালে অলংকারসকল ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে—অলংকারের কারুকার্য এখন নজরে পড়ে—মূল্যের লাঘবতায় তাহার মানহানি হয় না। মূল্যের সমষ্টি ট্যারচা, চৌখোপা, বেনারসি, আলমারি, বাক্সে পোকা ধরিতেছে।

শুভ্র বস্ত্রের আদর আজকাল অধিক পরিমাণে দেখা যায়। কনে বধূদেরই বেনারসি শাড়ি ব্যবহার করানো হইয়া থাকে। ঢাকার গুলবাহার পঞ্চম পেড়ে, কেবল মাত্র আইবড় ভাতে মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া থাকে। এখন সুন্দর সুন্দর পাড়ের ঢাকাই শাড়ি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। লজ্জাহীনা বলিয়া এ-কালের মেয়েদের একটি দুর্নাম রটনা করা হইয়া থাকে। যদিও এ-কালে ঘোমটা দেওয়া পদ্ধতিটা কিয়ৎপরিমাণে কম দেখা যায় বটে, কিন্তু কোনো মহিলাই বিনা আচ্ছাদনে নীলাম্বরী শাড়ি পরিধান করেন না। এ-কালে বরঞ্চ বঙ্গ মহিলাদের পরিচ্ছদ লজ্জাশীলতা এবং সুরুচির পরিচায়ক।

সকলেই জানেন যে, বাঙালি মেয়ের 'যজ্ঞি' কি এক বিষম ব্যাপার। ৫০ জনকে নিমন্ত্রণ করিলে ২০০ শত জনের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে হয়। অনেক সময়ে লুচি সন্দেশ বাঁধিবার বাহুল্যতায় এত অধিক পরিমাণে খাদ্য মজুত রাখিয়াও নিমন্ত্রণকারিণীকে অপ্রতিভ হইতে হয়। এই কুপ্রথা এ-কালের মেয়েরা অতিশয় ঘৃণা করেন। আজকাল যে এই প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। তবে ধনীদের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ গৃহস্থ মহিলাও সেকালের মতো আহারস্থলে উপবেশন করিয়াই সরা কয়খানি এবং পাতের লুচি কয়খানি তুলিয়া পশ্চাতে রক্ষা করেন না। এই বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া যে অতিশয় কুপ্রথা এবং সুবিধাজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?—ইহাতে পরস্পরকেই কষ্ট পাইতে হয়। আজ তোমার ছেলের ভাতে আমি এক পালকি খাদ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া লইয়া আসিলাম—কাল আমার মেয়ের বিয়েতে তোমাকে তাহার সুদ সমেত বুঝাইয়া দিতে হইল। তবুও প্রত্যেকেই বাঁধিয়া লইতে ছাড়িতেন না, এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রণকারিণীও অসন্তুষ্ট হইতে ছাড়েন না। এই লজ্জাকর প্রথা এ-কালের মেয়ের রুচি অনুসারে বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা না হইলে আর সরা তুলিতে কোনো মহিলারই হস্ত অগ্রসর হয় না।

এ-কালের মেয়ের স্বামী-ভক্তি লইয়া মাঝে মাঝে বড়ই আন্দোলন হইয়া থাকে। বোধ হয় কোনো কোনো দুর্ভাগা পুরুষ স্ত্রীর অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আত্মবৎ জগৎসংসার দেখিয়া থাকেন। স্ত্রী পুরুষে অল্পবিস্তর বিবাদ বিসংবাদ সেকালেও ছিল, এ-কালেও আছে। সেকালের মহিলারা স্বামীদিগকে ভক্তি স্নেহের সহিত ভয়ও করিতেন, এ-কালের মেয়ে স্বামীকে ভক্তি ও স্নেহ করিয়া থাকেন। 'মেয়েলি কথা', 'মেয়েমুখো', 'স্ত্রৈণ' প্রভৃতি কথাতে মনে হয় যে, সেকালের পুরুষরা মেয়েদের কতটা হীন ভাবে দেখিতেন। সুতরাং মেয়েরাও কতকটা ভয় করিয়া চলিতেন। সেকালের মেয়েরা স্বামী-নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এবং স্বামীকেও সকল কথা কহা নিন্দনীয় বিবেচনা করিছেন। বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে স্বামীর সহিত তাহাদের বড় একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিত না।

এ-কালে স্বামী স্ত্রীকে কতকটা বন্ধুভাবে দেখেন; সকলকেই নিজ নিজ বাটিতে কর্তৃত্ব করিতে হয়, সকলেরই অনেক সময় পরামর্শের আবশ্যক হয়, সুতরাং স্ত্রীই অনেক সময়ে পরামর্শদায়িনী হয়েন। কারণ, তাহাদের ঘরকন্নার মঙ্গলাঙ্গল ইষ্টানিষ্ট উভয়ের সমান। এই সকল নানা কারণে এ-কালের স্বামীকে স্ত্রী তত দূর ভয় করেন না, বরং তিনিই বাটির গৃহিণী হওয়াতে স্বামী সদা সর্বদাই তাহার যত্ন স্নেহ পাইয়া থাকেন। এ-কালে স্নেহ ভক্তির সহিত ভয় নামক পদার্থটি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাস্তবিক এ-কালে গৃহস্থের মধ্যে দরিদ্রতার অতিশয় পীড়ন দেখা যাইতেছে। কিন্তু এ-কালের মেয়ের দোষে তাহা নহে। সেকালে ২ টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, এখন ৪ টাকার কম এক মণ চাউল পাওয়া যায় না। 'যত আনি, তত নাই' তাহা এ-কালের মেয়ের জন্য নহে—আহার্য সামগ্রী মহার্ঘ্য হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।

অধিক আর কিছু বলিবার নাই, একটু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিবেন যে, কালের পরিবর্তনে ও ইংরাজ রাজা হওয়াতে আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার গতিরোধ মানুষের অসাধ্য। আমাদের নব্যসম্প্রদায় ইংরেজি সম্প্রদায় দেখিয়া মুগ্ধ। তাহারা যথাসাধ্য সেইরূপ ধরনধারণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ সুখী না হইতে পারিয়া বোধ হয় মহিলাদিগকে সকল অসুখের মূল বিবেচনা করিতেছেন। রমণীগণ চিরকালই পুরুষদিগের আশ্রিত ও তাহারা যে চিরকালই পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া থাকেন, তাহা কাহারও মনে হইতেছে না। আমাদের বাঙালি যুবকদিগের রুচি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনুসারেই এ-কালের মেয়ে গঠিত হইতেছে। লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি পরা, মাথায় চওড়া সিন্দুর, কপালে বৃহৎ সিন্দুরটিপ, নাকে নথ, দাঁতে মিশি, কৃষ্ণবর্ণ ঠোঁট, হাতে শাঁখা, পায়ে দু-গাছা মল—ঝোটন করিয়া খোপাবাঁধা স্ত্রীর সহিত, বোধ করি এ-কালের স্বামী বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক, ঘরে ঢুকিতেও দিবেন না। তাহারা অতীত কালের মহিলাদের গুণটুকু মাত্র স্মরণ করিয়া, এ-কালের মেয়েদের উপর নানাবিধ দোষার্পণ করিতেছেন। বাস্তবিক ঐ সকল দোষে মহিলারা দোষী কি না—বাস্তবিক মহিলাদের নিজস্ব সম্পত্তি মায়া মমতা, স্নেহ ভালোবাসা এ-কালের মেয়েদের আছে কি না, তাহা কেহ কখন ভাবিয়াও দেখেন না। হাতের কাছে কলম পাইলেই এ-কালের মেয়ের সম্বন্ধে যাহা মনে আসে, লিখিয়া ফেলেন। কিন্তু এ-কালের মেয়ে সেকালের মেয়ের মতো হইতে পারে না এবং হইলেও তাহাদের উপর অধিকতর অনুরাগী হওয়া নব্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অসম্ভব। দূর হইতে লেপাপোছা উঠান—চালে লাউগাছ, মাচায় শশাগাছ, আশেপাশে কামিনীফুলের গাছ, লেবুগাছ, দু-চারটি বেল ও জুঁইয়ের গাছবেষ্টিত কুটিরখানি দেখিয়া আমরা কল্পনায় কত বার ঐ কুটিরে বাস করিতে কত না সাধ করিয়া থাকি, নিজেদের কোঠাবাড়ি ইট-কাঠের উপর কত তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ করি। কিন্তু বাস্তবিক যদি কোঠাবাড়ি ছাড়িয়া ঐ কুটিরে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তখন তাহার সমস্ত অসুবিধা আমরা জানিতে পারি। তখন কুটিরে বাস যে কতটা কষ্টকর এবং আমাদের পক্ষে কত দূর অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারি। এখনও পল্লীগ্রামে প্রতি গৃহস্থ বধূরা বাসন মাজে, রাঁধে, ধান সিদ্ধ করেন, উঠান ঝাঁট দেয়, গরুর সেবা করে। কিন্তু বল দেখি—কয় জন গৃহস্থ পুরুষ গরুর দড়ি ধরিয়া চরাইয়া বেড়ায়—কাটারি দিয়া বাঁশ কাটিয়া বাগানের বেড়া দিয়া থাকে? কয় জন পুরুষ ছাতা জুতা ব্যতীত টোকা মাথায়, খড়ম পায়ে দিয়া পথ চলিতে অপমান বিবেচনা করেন না? চাষাভূষার ঘরেও অন্তত একটি কামিজ

নাই, এমন ব্যক্তি কয় জন আছে? কিন্তু তাহাদের মেয়েরা জ্যাকেট একটা বৃহৎ জানোয়ার, কি বিলাতি খাবার, তাহা জানে না। তুমি আজ যদি আদর করিয়া তোমার মেয়েকে পূজার সময় একটি জ্যাকেট কিনিয়া দাও, তাহা হইলে সে শ্বশুরবাড়ি হইতেও কি দোলের সময় আর একটি জ্যাকেটের প্রার্থী হইবে না—এবং মেয়ের মা হইয়া স্বামীর নিকট সন্তানদের পোশাকের জন্য দৌরাত্ম্য করিবে না? অনেকে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার বিরোধী, কিন্তু এখন ছোট ছোট মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হইয়া থাকে, পাড়ায় স্কুল পাঠশালা বিরাজিত। পিতা মাতা ভাবেন, 'আহা, পরের ঘরে যাবে,—একটু লিখিতে পড়িতে শিখুক—এর পর তবু দুটো মনের কথা লিখেও তো জানাতে পারবে—পরের খোসামোদ করতে হবে না।' শুদ্ধ তাহা নহে, এ-কালে কন্যা দেখিতে আসিয়া, 'তোমার নাম কি?' জিজ্ঞাসা করিয়া 'যাও মা, উঠে যাও' ইহা কেহ বলেন না। তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা করিয়া, মেয়েটি বোবা কি না, পরীক্ষা করা হইল। এখন বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন, তাহারও তো পরীক্ষা চাই। 'কি পড়' তাহার প্রশ্ন। একটু পড়াশুনা জানা না থাকিলে এ-কালের মেয়ের বিবাহ হওয়া পর্যন্ত দায়। অধিকাংশ এম.এ., বি.এ.-র ধনুর্ভঙ্গ পণ, যেন শুধু রূপ দেখে না বিয়ে দেওয়া হয়, লেখাপড়া জানা চাই। বিবাহের সময় শিক্ষিত বর অশিক্ষিত কনে, অর্থাৎ কিছুই পড়িতে লিখিতে পারে না, শুনিলে অতিশয় দুঃখিত হন। তিনি বাসরঘরে শালি শালাজদের কনেকে লেখাপড়া শিখাইতে অনুরোধ করেন। ফুলশয্যা বাদে বর্ণপরিচয় প্রথম দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী ইত্যাদি অসংখ্য পুস্তক শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দেন এবং বার বার লেখেন, যেন লেখাপড়াটা শেখানো হয়। বালিকার বিবাহ হইয়াছে, আর স্কুলে যাইবার নিয়ম নাই, সুতরাং স্কুলের ভয় বা বন্ধন নাই—তাহার পুতুলখেলায় মন—সেও পড়িবে না, মাতাও ছাড়িবেন না—ভয়, পাছে জামাই রাগ করে। তিনি কর্তাকে পেড়াপীড়ি করেন—'ও গো, মেয়েটাকে একটু পড়াও না।' ছেলেকে বলেন, 'ও রে, সুশীকে সকাল বিকেল তোর কাছে বইখানা নিয়ে বসাতে পারিস্ নে?' দুপুরবেলা পাড়ার বিদ্যাবতী মহিলাদের সাধ্যসাধনা করিয়া বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইতে অনুরোধ করেন। এ দিকে 'ক খ' আরম্ভ না হইতে হইতে বরের নিকট হইতে মস্ত মস্ত প্রেমলিপি আসিতে আরম্ভ হইল। বিষম বিভ্রাট, কন্যার মাতা প্রমাদ গণিলেন, বাপ মেয়েকে লেখাপড়া শেখান নাই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পাড়ার মেয়েরা উক্ত পত্রের উত্তর দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন—কেহ ভালো কবিতা খোঁজেন, কেহ গান পছন্দ করেন—তাহাদের দিনগুলা বেশ আমোদে কাটিল—দেখিয়া শুনিয়া ঠাট্টার হাসিতে মেয়েটা লজ্জায় সারা হইল। তাই বলি, একটু লেখাপড়া না জানা থাকিলে বিবাহ হওয়া পর্যন্ত দায়। তবে যদি লেখাপড়াই শিখিল, তাহা হইলে এ-কালের মেয়ের ভাব ও রুচির পরিবর্তন অনিবার্য।

এ বিষয়ে আর অধিক কত বলি, এইখানেই ইতি করা যাক। শেষ কথা এই যে, এ-কালের মেয়ে এ-কালেরই উপযোগী।

ভারতী ও বালক, আশ্বিন-কার্তিক, মাঘ ১২৯৮

আলাপন-নিরতা পল্লীনারী

দাসী-পরিবৃতা সম্ভ্রান্ত মহিলার গঙ্গাস্নান

চিত্তরঞ্জন দাশ

১৮৭০-১৯২৫

বাংলার কথা

আজ বাঙালির মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য। আজ এই মিলনমন্দিরে আমরা যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকারে বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহংকার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাংলার যে মূর্তি তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনী মূর্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও ভালোবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জ্বলন্ত প্রদীপের মতো আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে। আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

সেই ভরসায় আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। যে কথাগুলি অনেকদিন ধরিয়া আমার প্রাণে জাগিয়াছে, যেসব কথা আমার জীবনের সকল রকমের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, যে কথাগুলি সত্য বলিয়া জীবনের ধ্যানধারণার বিষয় করিয়াছি, সেসব কথাগুলি আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ংগম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোনো ভয় হয় না। লজ্জা হয় না। হয়তো আমাদের শাসনকর্তাদের কাছে আমার অনেক কথা অপ্রিয় লাগিবে, হয়তো আমার অনেক কথার সঙ্গে আপনাদের অনেকের মনের মিল হইবে না। কিন্তু 'সত্যম্ ব্রুয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্' এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি এবং যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিব না। সে তো কাপুরুষের কথা, দেশভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারি বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্য কোনো অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক, কী অপ্রিয়ই হউক, অম্লানবদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

প্রথমেই হয়তো অনেকেরই মনে হইবে যে এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার

জন্য, এই সভায় বাংলার কথার আবশ্যক কী? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি এবং এই ধার করা জিনিস ভালো করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে আমরা রাজনীতি বা politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাঙলাদেশের, সমগ্র বাঙালি জাতির একটা সর্বাঙ্গীন সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, এইসব মনগড়া জীবন-খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীরবেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন-খণ্ড, ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আরদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙালি জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায়। রাজনীতি কাহাকে বলে? এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী? আমাদের সাধনায় ইহার কোনো বিশিষ্ট নাম নাই, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহার নামকরণ করার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। ইউরোপীয় সাধনায় যাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, তাহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজাপ্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিত্য সার্বভৌমিক সত্য নিহিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করা। ওই মতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনার বিষয় কোনো জাতির বা দেশের পক্ষে রাজাপ্রজায় কীরকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজাপ্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কীরূপ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যটা সদ্ভাবে ও সৎপথে চালনা করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কতটা রাজার হাতে থাকিবে, কতটা প্রজার হাতে থাকিবে, তাহাই বিচার ও নির্ণয় করা।

কিন্তু ওই যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এককথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙালিকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙালি যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালি বলিতে একটা অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙ্গালির যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে! বাঙালিকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাংলাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যাক যে, বাঙালির কতকগুলো দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক এবং সেইভাবে ধরিয়া লওয়া যাক যে, বাঙালি মানুষ। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য, এবং সেইজন্যই আমাদের দেশে রাজাপ্রজায় যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রাজাপ্রজায় কী সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করিতে গেলে, আমাদের যে এখন ঠিক কী অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের আর্থিক অবস্থা কীরূপ, তাহা

বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাবাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভালো করিয়া লইতে হইলে, আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে, কেন আমাদের পল্লিগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক শহরে আসিয়া বাস করে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লিগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোনো কারণে? সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষযোগ্য জমি আছে, সব ভালো করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ সচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এইসব কথা ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কিরূপ ছিল, আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা পূর্বে কীরূপ ছিল, কেমন করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতাম, এসব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষাদীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া শিক্ষা বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইতাম এবং এখন বর্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষাপ্রণালী কীরকম হওয়া উচিত, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব কথারই বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের কী সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ কথাকেও তাচ্ছিল্য করা যায় না। কী সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভালো করিয়া না বুঝিতে পারিলে আমাদের বর্তমান অবস্থায় কী সম্বন্ধ থাকা উচিত, কীরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে, কতটা আমাদের হাতে থাকা উচিত, এই প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করিয়া হইবে?

শুধু ইহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড়ো বড়ো সামাজিক ব্যবহার পর্যন্ত আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্মের কী সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্যকর্তব্য। সেদিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিব! সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোনো মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি বিপদ যে, আমরা ক্রমশই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচারব্যবহারে অনেকটা ইংরেজি ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা politics শব্দটি শুনিবামাত্র, আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংল্যান্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরেজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে আমরা সেই মূর্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। এ দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা তো একবারও ভাবি না। Burke-এর বুলি

যাহা স্কুলেকলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstone-এর কথামৃত পান করে আর মনে করি, ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। Seely-র *Expansion of England* নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwick-এর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসি স্কুল, জার্মান স্কুল এবং ইউরোপ রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে, *কোরান*-এ যত ধারালো বাক্য আছে, একেবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ্ করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্কবিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধার করা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবত সহজ সরল, তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক, তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গালার কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্বতোভাবে তুচ্ছ করি আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয়তো অনেকে স্বীকার করিবেন না।

কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে? আমরা চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না? আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহংকার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? কেন নাই? আমরা যে ভিতরে ভিতরে ইংরেজি ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা যে ইংরেজি পড়ি ও ইংরেজিতে ভাবি এবং ইংরেজি তরজমা করিয়া বাংলা বলি ও লিখি, তাহারা যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই ভালো। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কার্যে তাহাদের ডাকি? Government-এর কাছে কোনো আবেদন করিতে হইলে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া কোন্ কমিটিতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্য শ্রেণিভুক্ত? কোন্ কাজে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের মত লইয়া করি? যদি না করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিব না? কেন সত্য কথা বলিব না? মিথ্যার উপর কোনো সত্য বা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার সব দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আজ এই মহাসভায় আমি বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি!

কিন্তু আমি যে বিপদের কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য নিরাশ হইবার কোনোই কারণ নাই। আমাদের এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহার যথাযথ কারণ আছে। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের এদেশে আসে তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্বলতার আঁধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকার সনাতন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপরদিকে যে অপূর্ব প্রেমধর্মবলে মহাপ্রভু সমস্ত বাংলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক-কাটা ও মাল-ঠকঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাংলার হিন্দু সমগ্র ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনি। বাঙালি জীবনের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কী ধর্মে, কী জ্ঞানে বাংলার হিন্দু তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দি খাঁর পর হইতেই বাংলার মুসলমানও ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরেজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্বলতানিবন্ধন আমরা ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরেজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরেজি সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহবশত আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্মকর্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের ইতিহাস, ইংরেজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে 'বিজ্ঞানের তূর্যধ্বনি' করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি. অন্ততপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে তো আমাদের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা তো আমরা একবারও মনে করি নাই। তারপর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল। তার পর বঙ্কিম, সর্বপ্রথমে বাংলার মূর্তি গড়িলেন—প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন। সেই 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্' তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখো দেখো, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোলো।' কিন্তু আমরা তো তখন সে মূর্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।' তার পর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। সেসব কথা লইয়া

আলোচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অল্প ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালি জাতির, অন্ততপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালির আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস—একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তারপর আরও দিন গেল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে স্বদেশি আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙালি আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন :

বাংলার মাটি বাংলার জল
সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্

বাঙ্গালার জল বাঙ্গালার মাটি আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানীগুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশি আন্দোলন ইহা একটা বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্থ করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; কিন্তু অহংকার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যারা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিস সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিস লইয়া আঁক কষিতে বসেন। কিন্তু, প্রাণের যে বন্যা, সে তো অঙ্কশাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়! স্বদেশি আন্দোলন যে একটা ঝড়ের মতো বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন তো হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে তো হিসাব করিয়া জন্মায় না। বা জন্মাইতে পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া বাঁচিয়াছি। বাংলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাংলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাংলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণেব গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধনসংগীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরেজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম কী? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি।
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে—

সেই মাকে দেখিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'।

বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কী—সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল, বুঝিলাম, বাঙালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিস্টান হউক, বাঙালি বাঙালি। বাঙালির একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, বাঙালির একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালির একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে, বুঝিলাম, বাঙালিকে প্রকৃত বাঙ্গালি হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালি সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্রে বাঙালি একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাংলা সেই রূপের মূর্তি, আমার বাংলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।

স্বদেশি আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল, হিসাব না করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু এখন আমাদের হিসাব করিবার সময় আসিয়াছে, মা দেখা দিয়াছেন—এখন যে পূজার আয়োজন করিতে হইবে। হিসাব করিয়া ফর্দ তৈয়ারি করিতে হইবে, হিসাব করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে মহাবন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল এখন যে, সব পতিত জমি আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে। বিশ্বাস রাখিয়ো, সোনা ফলিবেই।

এখন আমাদের বিচার্য যে কেমন করিয়া এই নব-জাগ্রত বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারি। সেই কারণেই সেই দিক দিয়াই দেখিতে হইবে, আমাদের বিকাশের জন্য কী কী আবশ্যক এবং তাহা কী করিয়া পাইতে পারি।

এই বিচার লইয়াই সম্প্রতি একটা গোল বাধিয়াছে। ইউরোপে নাকি কোনো কোনো পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব—ইংরেজিতে যাহাকে 'Nation Idea' বলে, ইহা নাকি একেবারেই কাল্পনিক, কোনো বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোনো বিশিষ্ট জাতির নাকি কোনো একটা স্বতন্ত্র মূল নাই। প্রত্যেক জাতির রক্তের মধ্যে অন্যান্য জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে। আচারব্যবহারে, শিক্ষায়দীক্ষায়, ব্যবসাবাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছে এবং এই আদানপ্রদানের মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোনো বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে। এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নবজাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্ক্ষাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি, এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশি; আমাদের দেশে এইসব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশি যে তাহাদের কোনো মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমনকি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশি

আন্দোলনের সময় বাংলার মাটি বাংলার জলকে সত্য করিবার কামনায়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ—এখন স্যর রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ওই মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোনো কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, *Modern Review*-তে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছি, হয়তো সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙালি জাতির, এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বামানবের ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়? যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ না হইলে একটি পরিবারের উন্নতি হয় না, যেমন পরিবারসমূহের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, যেমন সমাজের উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ঠিক তেমনই সেই একই কারণে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট জাতির উন্নতি না হইলে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হয় না। বাঙালির শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, সে রক্ত আর্যই হউক কী অনার্যই হউক, কী আর্য-অনার্যের মিশ্রিত রক্তই হউক, যাহা সত্য, তাহা সত্যকামের মতো স্বীকার করিতে বাঙালি কখনও কুণ্ঠিত হইবে না—বাঙালির শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, বাঙালি যে বাঙালি, সে কথা আর তো সে ভুলিতে পারে না, সে যে বাংলার মাটি বাংলার জলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাংলার মাটি বাংলার জলের সঙ্গে নিত্যই যে তাহার আদান-প্রদান চলিতেছে। আর সেই আদান-প্রদানের মধ্যে যে একটা নিত্য সত্য জাগ্রত সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্বন্ধের উপর বাংলার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির সহিত ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষাদীক্ষার যে আদান-প্রদান, তাহাও এই জাতিত্বের লক্ষণ। জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়। ইহা সেই জাতির অবস্থার বিষয়, স্বভাবের বিষয়। তাহার পর বিরোধের কথা, জাতিত্বের প্রভাবে যে কতকটা বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সেও যে জাতির স্বাভাবিক ধর্ম, তা বলিয়াই জাতিগুলোকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিবার মধ্যে প্রত্যেক সমাজে বিরোধ-বিসংবাদ তো লাগিয়াই আছে, তা বলিয়াই কি সেই ব্যক্তিগুলার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে না উড়াইয়া দিতে হইবে? শত প্রকারের বিরোধ বাদ-বিসংবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়। এই যে বিশিষ্ট জাতিসমূহ, ইহাদের পক্ষেও ওই কথাই খাটে। এই বিরোধ-বিসংবাদ সংঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এইসব বিশিষ্ট জাতি সমস্ত মানবজাতির যে মিলনমন্দির, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

সংসারে প্রত্যেক জিনিসের প্রত্যেক ভাবের দুইটা মুখ আছে, এই যে বাদ-বিসংবাদ, ইহারও দুইটা মুখ। আমরা এক মুখ দেখি আর এক মুখ দেখি না। বিরোধ আছে চক্ষে দেখিতেছি, মনে জানিতেছে, ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই বিরোধেরই অপর মুখে যে মিলন, তাহা দেখিতে পাই না বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকি। ইউরোপে আজ যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত, এই অনলে ইউরোপের সকল ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দৈন্য,

অপার শক্তির অভিমানজনিত যে হীনতা, অসীম স্বার্থপরতার যে মলিনতা, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি, এই পবিত্র ভস্ম সমাধির উপরে ইউরোপ তাহার মিলনমন্দির রচনা করিতেছে। সকলপ্রকার হীনতা ও স্বার্থপরতার ধর্মই এই যে, সে নিজের আবেগে নিজের বিনাশসাধন করে এবং সেই বিনাশের মুখে পরানুরক্তি জাগাইয়া দেয়। সেই পরানুরক্তি না জাগিলে যথার্থ মিলন অসম্ভব। অনেকে হয়তো মনে করেন, এই যে কলিযুগের কুরুক্ষেত্র, ইহাতে ইউরোপের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমি বলি, কখনও না। সকল যুদ্ধক্ষেত্র যে ধর্মক্ষেত্র, সকল ইতিহাস যে ভগবৎলীলার পূত পূণ্যকাহিনি, ভারতের কুরুক্ষেত্রের ফলে কি তখনকার ভারত মিলনপথে অগ্রসর হয় নাই? নবজীবন লাভ করে নাই? আর্য-অনার্যদের মধ্যে কি একটা স্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হয় নাই? আমরা অমঙ্গলের দিকটাই দেখি, কিন্তু তাহার সঙ্গে জড়িত যে মঙ্গল, সেই দিক দেখিতে ভুলিয়া যাই।

ইউরোপ আজ অসীম দুঃখকষ্ট, যাতনা-বেদনা, অর্ধ অনশনের মধ্যেই মিলনপথে পা বাড়াইয়াছে। অহংকারের অবসান না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না। এই যে দুঃখকষ্ট আজ ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা সেই প্রেম-মিলনের আগমন-প্রতীক্ষার প্রসববেদনা। এই সমরানল নির্বাপিত হইতে দেখিতে পাইবে, ইউরোপ আপনার স্বার্থপরতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। একদিন দেখিবে, যে প্রবল অপ্রতিহত বেগে ইউরোপ আজ তাহার স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং সমস্ত প্রাণমন দিয়া সেই স্বার্থপরতাকেই পোষণ করিতেছে, সেই ইউরোপ তেমনই অপ্রতিহত বেগে ঠিক সেইরকম সমস্ত প্রাণমন দিয়া সে নিজের ও জগতের যথার্থ মঙ্গলসাধন করিতেছে। এই সমর, এই বিরোধ যে জাতিত্বের ফল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এই সমরক্ষেত্রের অপরপারে যে মিলনমন্দির রচিত হইতেছে, তাহাও এই জাতিত্বেরই ফল, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? যদি কোনো দিন সুদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মানবজাতি লইয়া একটা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে তখন সমস্ত বিশিষ্ট জাতিগুলি নিজ নিজ স্বভাব-ধর্মের পথ অবলম্বন করিয়া অপূর্বরূপে বিকশিত হইয়াছে এবং সেই যুক্তরাজ্যে সকল জাতিরই সমান অধিকার। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিশিষ্ট জাতিসমূহ সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য কোনো রাজত্বেরই আবশ্যক হইবে না।

এই যে বাঙালি জাতির জাতিত্বের দাবি, ইহার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথার আলোচনা আবশ্যক। আমি এমন কথা শুনিয়াছি—আমার কাছেই অনেকে বলিয়াছেন যে—আমাদের পক্ষে জাতিত্বের গৌরব করা নিতান্ত অসংগত. কারণ, এই যে জাতিত্বের ভাব, ইহার সমস্তই আগাগোড়া বিলাতের আমদানি—একটা ধার-করা সামগ্রী মাত্র। এটা যে তাঁহাদের ভুল, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমি আগেই বলিয়াছি, কোনো একটা বিশিষ্ট দেশের সঙ্গে সেই দেশবাসীর যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহারই উপরে জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এ সম্বন্ধ যাহা নিত্য আবহমান কাল হইতে আছে ও চিরদিনই থাকিবে, তাহার প্রতি এতকাল এমতভাবে আমাদের চোখ পড়ে নাই; হইতে পারে, আমাদের সভ্যতায় ও সাধনায় এই সম্বন্ধে কোনো বিশিষ্ট নাম রাখা হয় নাই; ইহাও হইতে পারে. ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস লইয়া এমন

করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে, হয়তো এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না—তাহা বলিয়া কি যাহা আমাদেব, আমাদেরই দেশের, যাহা বাংলার মাটি বাংলার জলের সঙ্গে অণুতে অণুতে প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া আছে, তাহাকে বিলাতের আমদানি বলিয়া সমস্ত বাঙালিজাতিকে অপমান করিব? যাহা চিরকাল আছে, তাহাকে দেখিতে পাই নাই, বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহার কোনো অস্তিত্ব ছিল না? বিজ্ঞান জগতে যে বড়ো বড়ো সত্য আবিষ্কার হইয়াছে, সেসব সত্যই সে সনাতন—তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব তো কোনো বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবিদের উপর নির্ভর করে না? মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মাইবার আগেও ছিল, আমাদের জাতির জাতিত্ব তেমনই ইংরেজ আসিবার আগেও ছিল। আমরা দেখিতে পাই নাই বলিয়া যে ছিল না, তাহা নহে। ইউরোপ হইতে একটা বিপরীত সভ্যতা আসিয়া আমাদের জীবনে আঘাত করিল, সেই আঘাতে আমাদের চৈতন্য হইল, সেই মুহূর্তেই আমাদের জাতির যে জাতিত্ব, তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। এমন করিয়াই মনুষ্যজীবনে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, বাহিরের রূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই ফলে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহা দেখি তাহা তো বাহিরের নয়, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু। আমাদের নবজাগ্রত বাঙালি জাতির যে জাতিত্ব, তাহা আমাদেরই প্রাণবস্তু, বিদেশের নহে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় ভগবৎ-কৃপায় আমাদেরই প্রাণের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি—তাহাকে ধার করিয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া আসি নাই।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা কথার বিচার ও আলোচনার আবশ্যক। আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, আমাদের দেশে ইংরেজের আগমনবিধির বিধান। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে এই কথাই বলিয়াছেন—এই কথার গূঢ় মর্ম কী, তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি। এই দুইটি কথাই মূলে এক কথা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভবপর কি না, এই বিষয়ে যে অনেক মতভেদ আছে। সেইসব ভিন্ন ভিন্ন মতের মর্মকথাটি কী, তাহা তলাইয়া বুঝিলে জাতির জাতিত্বের কথা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। Kipling লিখিয়াছিলেন—'East is East, and West is West, never shall the twain meet' অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে, তাহাদের মিলন অসম্ভব।

আবার বিলাতে ও আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন যে, এই মিলন একেবারে অবশ্যম্ভাবী। স্যর রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় বলিয়াছেন যে জাতির বদলে একটা Universal brotherhood of mankind হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি ভ্রাতৃভাবে একত্র হইবে। বোম্বাই-এর কংগ্রেসে স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলিয়াছেন :

The East and the West have met—not in vain. The invisible scribe, who has been writing the most marvellous history that has ever been written, not been idle Those who have the discernment and the inner vision to see will note that there is only one goal, there is only one path. অর্থাৎ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ব্যর্থ হয় নাই, যে অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ এতাবৎকাল

পর্যন্ত রচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে আশ্চর্য লেখা লিখিতেছেন, তিনি তো নিশ্চিত হইয়া নাই। যাঁহাদের বিচারবুদ্ধি ও দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা বলিবেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একই ইষ্ট, একই পন্থা। এই বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করি, মনে হয়, এই দুইটা কথা সত্য আবার দুইটা কথাই মিথ্যা, ইহার কোনোটাই একেবারে সত্য নয়। দুইটা একেবারে বিপরীত রকমের সভ্যতা ও সাধনা লইয়া এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ইহাদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বদলে আমি ইংলন্ড ও বাংলা দেশ ধরিয়া লই, তাহা হইলে কথাটা অনেক পরিমাণে সকল হইয়া আসিবে। এই মিলন কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিচার করা যাক। আমাদের ও ইংরেজের মিলনের মর্ম যদি এই হয় যে, আমরা ইংরেজের ইতিহাসের সাহায্যে এই ছাঁদে গড়িয়া উঠিব অর্থাৎ বাংলা দেশটা একটা নকল ইংলন্ড হইবে, আমাদের নরনারী সকল সাহেবমেম হইয়া উঠিবে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক হুবহু বিলাতের মতো হইবে, আমাদের চাষবাস, ব্যবসাবাণিজ্যের চেষ্টায় সমস্ত দেশটাই যথার্থ গৃহস্থের আশ্রম না হইয়া, একটা বৃহৎ ভীষণ কলের কারখানা হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে আমি বলি, মিলন একেবারে অসম্ভব। অনেকে হয়তো বলিবেন, কেন অসম্ভব?

এই শহরে তো অনেকেই ইংরেজি রকমে জীবন যাপন করেন। আহারবিহারে আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে ইংরেজের সহিত তাঁহাদের কোনো পার্থক্যই দেখা যায় না। কলিকাতায় আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য তো একরকম বিলাতের ছাঁচেই ঢালা, আর কলিকাতায় যাহা দেখা যায়, তাহা যে ক্রমশ দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে, আমরা বিলেতের ছাঁচে গড়িয়া উঠিব না? আমার কথা এই যে, নকল সাজা সহজ, কিন্তু যথার্থ নকল হওয়া বড়োই কঠিন। সাজা জিনিসটা খেয়ালের ব্যাপার, একদিন থাকে, তারপর থাকে না; কিন্তু হওয়া জিনিসটার সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধ আছে, কোনো একটা জাতিকে কিছু হইতে হইলে তাহার স্বভাবধর্মের মধ্যে সেই হওয়া জিনিসটার বীজ থাকা চাই। আমার কিছুতেই মনে হয় না, বাঙালির স্বভাবধর্মের মধ্যে ইংল্যান্ডের সভ্যতা ও সাধনার বীজ আছে, সুতরাং এই অর্থে ইংরেজ ও বাঙালির মিলন অসম্ভব, এবং এইভাবে দেখিতে গেলে Kipling-এর কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে, প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকিবে, ইহারা কখনও মিলিবে না।

তবে কি এই দুইটা জাতি ভাঙিয়াচুরিয়া নিজ নিজ সত্তা হারাইয়া একটা নূতন রকমের দোআঁশলা জাতি গড়িয়া উঠিবে, না একটা নূতন বর্ণসংকর জাতির উৎপত্তি হইবে? এ কথা অর্বাচীনের কথা, ইহার বিচারের কোনো আবশ্যকতা নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরেজের যাহা কিছু ভালো, আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভালো, তাহা ইংরেজ লইবে এবং উভয়ের যাহা কিছু মন্দ, তাহা বিসর্জন করিতে হইবে। এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের কি ইংরেজের যাহা ভালো যাহা মন্দ, তাহা কি এমন পৃথকভাবে জাতির জীবনের মধ্যে অবস্থিতি করে যে, একটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আর-একটা লওয়া যায়? একটা বিশিষ্ট জাতির ভালোমন্দ যে একসঙ্গে সেই জাতির রক্তমাংসের সঙ্গে জড়ানো। খাঁটি ভালোটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কী করিয়া? এমন করিয়া তো ছেঁড়া যায় না। একটা জাতির জীবন তো ঠিক ইটের ইমারত নয় যে, ঠেকা দিয়া খানিকটা ভাঙিয়া ফেলিয়া সে দিকটা আবার নূতন ধরনে নূতন উপকরণে গড়িয়া তুলিবে। কোনো জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে

সম্ভব হয় না। আমাদের যেসব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাবধর্মের মধ্যে যেসব শক্তি নিহিত আছে, তাহার বলেই হইবে। বিলাতের সমাজশক্তির বলে আমাদের আবশ্যকীয় সংস্কার সাধিত হইবে না হইতেই পারে না। দুইটা জিনিস যেমন আঠা দিয়া জোড়া লাগানো যায়, ঠিক তেমনই করিয়া তো বিলাতের ভালোটুকু আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জোড়া লাগানো যায় না। এ যে জীবনের লীলা—জীবন বিকশিত হয়, তাহার বিকাশের মধ্যে যাহা নাই, সে তো তাহার সঙ্গে জোড়া লাগে না।

এই কথাটি আর-এক দিক দিয়া দেখা যায়। ধরিয়া লও যে, বিলাতের ভালোটুকু তুলিয়া আনিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার ফলে কী হইবে, বিলাতি সামাজিক প্রথা বা অবস্থা যদি আমাদের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই প্রথা বা অবস্থার যাহা স্বাভাবিক ফল, তাহা ফলিবেই এবং তাহার ফলে আমাদের দেশের যে বিশিষ্ট রূপ, তাহা নষ্ট হইয়া বাঙালি সমাজ একটি দ্বিতীয় বিলাতি সমাজ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া আর-একটা জাতির প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিলে আমাদের বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায়?

এভাবে যাঁহারা আমাদের দেশে বিলাতি সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা করিতে দাও, আমাদের ভীত হইবার কোনো কারণ নাই। আমি জানি, বাঙালি জাতির একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে, তাহার একটা বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম আছে, সেই স্বভাবধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিবে এবং যাহা সেই স্বভাবধর্ম-বিরুদ্ধ, তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া এইসব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

তবে এই যে মিলন—যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন ও আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের যথার্থ মর্ম কী? এই বিষয়টা দুই দিক দিয়া দেখা যায়, ইহাকে জাতিত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ বাঙালি জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরেজ জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটি সত্যের দিক দিয়া দেখা যায়। আর-একটা দিক দিয়াও দেখা যায়, সেটা আমাদের নিজ নিজ শাসনবিভাগ অর্থাৎ গভর্নমেন্টের দিক দিয়া।

এই শেষোক্ত দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটি স্বতন্ত্র জাতি নিজ নিজ বিশিষ্ট রূপেই বিকশিত হইয়াও এই দুইটি জাতির শাসনবিভাগের উপরদিকে একটা একচ্ছত্র যোগযোগ থাকিবে। বাঙালি জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসনবিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসনবিভাগ, তাহার সহিত ইংলন্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কী হইবে, বাহিরের আকার কী হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব। স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বোম্বাই-এর কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন :

It seems to me that having fixed our goal it is hardly necessary to attempt to define in concrete terms the precise relationship that will exist between England and India when the goal is reached.

অর্থাৎ আমাদের যে উদ্দেশ্য, তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইলে ইংলন্ডের সঙ্গে আমাদের যে ঠিক কী সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা আমার মতে এখন অনাবশ্যক।

আমারও ঠিক তাহাই মনে হয়, তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, এমন সম্বন্ধ হইতে বা

থাকিতে পারে না, যাহাতে আমাদের ও ইংরেজের জাতীয় স্বভাবধর্মের বিনাশসাধন হইবে। শুধু জাতিত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংরেজ ও বাঙালির যথার্থ মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটি জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদানপ্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরেজ ও বাঙালি এই উভয় জাতিই সেইপ্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে। প্রকৃত মিলনের ফল এই যে, শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট রূপে বিকশিত স্বতন্ত্র জাতিসমূহ বিধাতার সৃষ্টিস্রোত ভাসিতেছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যেই যে একটা একত্ব আছে, এইসব ভিন্নরূপের যে স্বরূপ, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। জাতিত্ব মনের না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একত্ব আছে, তাহাই জাগিয়া উঠে। এই জন্যই ইংরেজ এ দেশে আসিয়াছিল। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলন। এই ক্ষেত্রেই Universal Brotherhood of man সম্ভব। তাই শুধু এই দিক দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, the East and the West have met—not in vain। অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে একত্র হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদের এই নবজাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কী কী উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম-সংগত অথচ সার্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্ধারিত করিতে হইবে।

উৎস : দেশের কথা

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১৮৭৬—১৯৬২

ভারতচন্দ্রের যুগ

দেশের ও সমাজের অবস্থা

বঙ্গদেশের শাসনকর্তাদিগের মধ্যেও বিলাসবাহুল্য অত্যন্ত প্রবল ছিল। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হেতু অনেকেরই দুর্নাম রটিয়া গিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মুর্শিদকুলির সহিত তদীয় জামাতা সুজা খাঁর মনান্তর হয়; মনান্তরের প্রধান কারণ, মুর্শিদকুলির কন্যা জিনেতউন্নিসা স্বামীর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে অত্যন্ত মর্মাহতা হইয়াছিলেন। এই এক দোষে সুজা খাঁর বহু সদগুণ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।[১]

দুর্ভাগ্য স্বল্পভোগী সরফরাজের দোষরাশির উপর বিস্মৃতির যবনিকাপাতই বাঞ্ছনীয়। শুনা যায়, তাহার শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের সংখ্যা ১৫০০ ছিল।[২] এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে দেশের প্রধানগণ তাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন। "জগৎশেঠের পুত্র এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি একদিন ঐ কন্যাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন যে, কেহই তাহার জিদ ভঙ্গ করিতে পারিল না। জগৎশেঠকে অগত্যা পুত্রবধূকে রাজভবনে লইয়া গিয়া নবাবকে দেখাইয়া আসিতে হইয়াছিল।"[৩] অপদার্থ সরফরাজ প্রজার মান সম্ভ্রমের বিষয়ে এমনই উদাসীন ছিলেন।

স্নেহান্ধ, স্ত্রৈণ আলিবর্দি স্বজনগণের দোষে একান্তই অন্ধ ছিলেন। যে যুবকের কুক্রিয়া-স্রোতে তাহার সযত্নসংস্থাপিত সিংহাসন ভাসিয়া গিয়াছিল, সে তাহারই অতিরিক্ত স্নেহে নষ্ট হইয়াছিল। বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবার কয়দিন পূর্বে সিরাজদৌলার জন্ম হয়; সেই হইতে তাহার প্রতি আলিবর্দির স্নেহ ক্রমেই বর্ধিত হইয়া উঠে। কামুকতাই আলিবর্দির বংশের কাল হইয়াছিল। তিনি সরফরাজের জননীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার ভ্রাতা হাজি আহম্মেদ সরফরাজের অন্তঃপুর হইতে বলপূর্বক কয় জন রমণীকে ভোগার্থ লইয়া যাইলে, আলিবর্দি তাহার প্রতীকার করা দূরে থাকুক, সে বিষয়ে দৃষ্টিপাতও করেন নাই। তাহার ক্ষমতাসূর্য যখন মধ্যাহ্নগগনে করবিস্তার করিতেছিল, তখন তাহার পরিবারে যে সকল কুকাণ্ডের অভিনয় হইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে লজ্জাবোধ হয়। হোসেন কুলী সিরাজের পিতৃব্যপত্নী ঘাসেটি বেগমকে পরিত্যাগ করিয়া যখন সিরাজজননী আমিনা বেগমের মোহে মুগ্ধ হন, তখনই সিরাজ ঈর্ষাজর্জরিতা পিতৃব্যপত্নীর সম্মতিক্রমে তাহার প্রাণনাশ করেন। এই কুকার্যে যে আলিবর্দিরও সম্মতি ছিল না, এমন বলা যায় না।[৪]

মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা সিরাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, তিনি কুক্রিয়াসক্ত অনুচরবর্গের সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদের রাজপথে পরিভ্রমণকালে, কি স্ত্রী,

কি পুরুষ, সকলেরই প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন। লোকেরা তাহার দর্শনমাত্রেই বলিয়া উঠিত, "ভগবান, দুরাত্মার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

অল্প দিনেই হীরাঝিলে বিলাস-বাসনাও ক্রমাগত চরিতার্থতা হেতু নূতনের চাকচিক্যহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মোগলরাজত্বের অন্তিমকালীন মুর্শিদাবাদের নবাবের সভা দিল্লির রাজসভার প্রতিবিম্বমাত্র।

বঙ্গদেশে ধান্য ও অন্য বহুবিধ শস্য,—রেশম, কার্পাস ও নীল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত।[৫] সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলায় যে ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহার উর্দ্ধত্ত অংশ নৌকাযোগে গঙ্গাতীরে পাটনা পর্যন্ত ও সাগরকূলে মছলীপট্টমে রপ্তানি হইত। এমন কি, সিংহলে ও মালদ্বীপেও বঙ্গ হইতে চাউল যাইত। বাংলা হইতে কর্ণাটে, মোকা ও বসোরার পথে আরবে, মেসোপোটেনিয়ায়, এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্যে চিনি যাইত। বঙ্গে আম, আনারস, লেবু, হরিতকী প্রচুর ফলিত।[৬] গোধূম যে না জন্মিত, এমন নহে। তবে দেশের লোক অন্নাহারী বলিয়া অধিক গোধূমের উৎপাদন করিত না। যে গোধূম জন্মিত, ইংরাজ, ডাচ ও পর্তুগিজ জাহাজের নাবিকগণ তাহাতে বিস্‌কিট প্রস্তুত করিত। কয় প্রকার উদ্ভিদ, অন্ন ও ঘৃতই দেশের সাধারণ লোকের প্রধান আহার ছিল। সে সকল দ্রব্যই সুলভ ছিল। ছাগমাংস, মেষমাংস, শুকরমাংস ও পক্ষিমাংসও সুলভ ছিল। তাই প্রবাদ ছিল, বঙ্গে প্রবেশের শত দ্বার মুক্ত, কিন্তু বঙ্গ হইতে বাহির হইবার একটি দ্বারও নাই। কারণ, খাদ্যাদি সুলভ ছিল। পক্ষান্তরে বঙ্গের জলবায়ু সহজে বিদেশীয়দিগের সহ্য হইত না। রেশম ও কার্পাসনির্মিত বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইত। এই সকল দ্রব্য কাবুলে, জাপানে, য়ুরোপেও প্রেরিত হইত। ডাচ ও ইংরাজগণ বঙ্গের সোরার ব্যবসায় চালাইত। জলপথবহুল বঙ্গে জলপথের উভয় পার্শ্বে বহু জনপূর্ণ গ্রাম ছিল। গ্রামের ক্ষেত্রে বহুবিধ উদ্ভিদ ও শস্য জন্মিত। তদ্ভিন্ন, গ্রামে রেশমের গুটীপোকার আহার্য তুঁত-গাছও যথেষ্ট দৃষ্ট হইত। নদীগর্ভে বহু চর ছিল, চরের ভূমিও বিশেষ উর্বর ছিল। দেশে কড়িও মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত।[৭] বঙ্গের পাটি তখনও প্রসিদ্ধ।[৮]

জলপথ বহুল সঙ্গে নানা প্রয়োজনানুরূপ নানাবিধ নৌকানির্মিত হইত।[৯]

দিল্লিতে সম্রাটের অনুকরণে মুর্শিদাবাদে নাজিম স্বয়ং বা কর্মচারীর সাহায্যে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতেন। আবার তাহার অনুকরণে জমিদারগণ আপন আপন অধিকার মধ্যে বিচার করিতেন। "জনশ্রুতি আছে যে. যবনরাজত্বকালে নবদ্বীপের রাজারা আপন অধিকার মধ্যে সর্বপ্রকার সম্পত্তির স্বত্বাসত্বের ও সর্বপ্রকার অপরাধের বিচার করিতেন। রাজা প্রতিদিন কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিচারাসনে বসিয়া সর্বসাধারণের আবেদন শুনিতেন ও তাহার বিচার করিতেন। স্বত্বাস্বত্বের বিচার প্রথমে তাহার দেওয়ান করিতেন, কিন্তু তাহার চূড়ান্ত আদেশ রাজা দিতেন। অপরাধের বিচারের ভার তাহার ফৌজদারের প্রতি অর্পিত ছিল। এই উভয় কর্মচারীর কৃত বিচারের আপীল রাজসন্নিধানে হইত। রাজা অবিচার করিলে তাহার আপিল নবাবের নিকট হইতে পারিত। কিন্তু রাজার বিচারের বিরুদ্ধে আপিল করা অতি দুঃসাহসের কর্ম ছিল।"[১০]

বর্ধমানের "গড়বর্ণনে" ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—দস্যু, তস্কর ও ভ্রষ্টাগণ "বেড়ীপায় মেগে খায় বাজার বাজার।" কোতয়ালি চতুরতায়,—

"যমালয় সমান লেগেছে ধুমধাম।।
ঠড়ঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্ম পাদুকার ছটছটি।।"

ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তে দেখা যায়, বর্ধমান রাজদরবারে উকিলও থাকিত।

নবদ্বীপের রাজাদের সদর কাছারিতে "ন্যূনাধিক দুই শত কর্মচারী থাকিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের "তিন সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্ত সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল।" বর্ধমান-বর্ণনায় ভারতচন্দ্র সেনাগণের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু একবারেই ভিত্তিহীন বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সেই দস্যুতস্করের অত্যাচারবহুল কালে জমিদারদিগকে লোকবলে আত্মরক্ষা ও প্রজারক্ষা করিতে হইত, এবং সেই জমিদারসম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই সীতারামের ও প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয়। প্রথম হইতে সেনাসংগ্রহ বিষয়ে বাধা পাইলে তাহারা অল্পকাল মধ্যে সেনাগর্বে মুসলমান-শাসন অবহেলা করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইতেন না। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা,—

"চালী খেলে উড়া পাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়-বেশে লোফে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মাল সাটে ফুটি হেন মাটী ফাটে
দূরে হৈতেঃ শুনিতে তরাস।"

তখন "ফিরীঙ্গি"রা দেশীয় জমিদারদিগের সেনাদলেও কার্য করিত; মোগল-পাঠানগণ সৈনিকের কার্য করিত; "অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল" ক্ষত্রিয় সকল ও "যুদ্ধে মজবুত" যত রাজপুত তাহাদিগের প্রধান বল ছিল।

সমাজে, এমন কি, পূজাদি-প্রচলনেও জমিদারদিগের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের—বিশিষ্ট প্রাধান্য ও অধিকার ছিল। নবদ্বীপের "রাজারা কদাচারীকে জাতিচ্যুত ও পতিতকে উদ্ধার করিতেন। শূদ্রজাতির মধ্যে কেহ দুষ্কর্মদোষে পতিত হইলে রাজসনন্দ ব্যতীত কখনই সমাজে চলিত হইত না। * * * * উজনীয়া গোপসম্প্রদায়ের জল পূর্বে ব্যবহৃত ছিল না। এই রাজারা এ প্রদেশে তাহাদিগকে চলিত করেন।"[১১] "চারি সমাজের প্রতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি" জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণার পূজা প্রবর্তিত করেন।

জমিদারগণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহারা অনেকেই প্রজারঞ্জক ছিলেন। সুগঠিত রাজবর্ত্ম, বিস্তৃত সেতু ও সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা অনেক স্থানে তাহাদিগের কীর্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পূর্বকালে সুলভ শ্রমজীবীর শ্রমে তাহারা যে সকল সরোবর খনন করিয়া গিয়াছেন, বর্তমানে তাহাদিগের বংশধরগণের পক্ষে সে সকল সংস্কৃত করাই দুঃসাধ্য।[১২] তখন পথিপার্শ্বে ছায়াবহুল বৃক্ষরোপণ, সরোবর-খনন প্রভৃতি লোকে পুণ্য কার্য বলিয়া মনে করিত। অনেক জমিদার বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে নবদ্বীপের রাজবংশীয়গণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বংশীয়গণ নানা স্থান হইতে পণ্ডিতদিগকে আনিয়া অধিকার মধ্যে স্থাপিত করিতেন, এবং অধ্যাপকদিগকে পরিবারের ও শিষ্যবর্গের ব্যয়নির্বাহার্থ ভূমি বা বৃত্তি দান করিতেন। রাজসমীপে পরীক্ষাপ্রদান পূর্বক ছাত্রদিগকে উপাধি গ্রহণ করিতে হইত। কৃষ্ণচন্দ্রের সভা "নানাজাতি সুগন্ধ সুন্দর কুসুমশোভিত উদ্যানের ন্যায় বিবিধগুণসম্পন্ন বুধগণে শোভমান ছিল।"

দেশীয় শিল্প এই সকল জমিদারের উৎসাহেই উন্নতিলাভ করিত। রাজসভায় সঙ্গীতচর্চা হইত। রাজপরিবারের জন্য বস্ত্রবয়নে তন্তুবায় শিল্পকৌশলে উন্নতিলাভ করিত। জমিদারদিগের সহায়তাতেই স্থপতিশিল্প ও ভাস্করকার্যে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিত। রাজগণ প্রকাশিত নানা দেবমূর্তিনির্মাণেই কৃষ্ণনগবের কুম্ভকারগণ মৃন্মূর্ত্তিনির্মাণে নিপুণ হইয়া

উঠে। এ কার্যে তাহারা বিশেষ উৎসাহ পাইত। তাহাদিগের বংশধরগণ নানাবিধ মৃন্ময়ী মূর্তির নির্মাণ করিয়া অদ্যাপি দেশ বিদেশে প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করিতেছে। এই সকল মূর্তিতে স্বভাবানুকরণনৈপুণ্য দেখিলে শিল্পীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বঙ্গে স্থপতিশিল্পেরও যে উন্নতি না হইয়াছিল, এমন নহে। বঙ্গের স্থাপত্যে বিশেষত্ব বিদ্যমান। বর্তমান সময়ের মিশ্রিত স্থাপত্যে যে সকল কদাকার গৃহ লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিতেছে, সে সকল ছাড়িয়া দিলে বুঝা যায়, বঙ্গের কুটীরে ও বঙ্গের মন্দিরাদি গৃহে বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যামান। তাহাই বঙ্গের স্থপতিশিল্পের বিশেষত্ব।[১৩] বঙ্গের স্থপতিশিল্পের অনেক উৎকৃষ্ট নিদর্শন অদ্যাপি বর্তমান। দিনাজপুরে কান্তনগরের মনোহর মন্দির ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়।[১৪] রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা রুদ্র, ঢাকা হইতে আলাল দস্ত নামক এক জন প্রসিদ্ধ স্থপতিকে আনাইয়া কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর চক ও নওবৎখানা ইত্যাদি প্রাসাদ নির্মাণ করান; এবং তাহাকে এখানে (কৃষ্ণনগরে) রাখিয়া অত্রত্য গাঁড়লজাতীয় অনেক ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ান। এই জাতির মধ্যে এরূপ সুনিপুণ স্থপতি সকল হয় যে, তাহারা কৃষ্ণনগরের রাজভবনে যে বৃহৎ শোভান্বিত পূজার দালান[১৫] ও শিবনিবাসের যে তিন দেবমন্দির নির্মাণ করে, তাহার কল কৌশল অদ্যাপি দেখিলে দর্শকগণ প্রীত ও চমৎকৃত হন। এমন সুন্দর সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় পূজার প্রাসাদ এবং এরূপ উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির বঙ্গ দেশের মধ্যে অন্য কোন স্থানে নয়নগোচর হয় না। * * * * শিবনিবাসের কোন কোন অট্টালিকার প্রাচীরে চূণ ও সুরকি ইত্যাদি সামান্য উপকরণ দ্বারা এরূপ সুন্দর ও সুদৃঢ় জাফরি নির্মিত হইয়াছে যে, যদিও তাহাতে দেড় শত বৎসর পর্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টির আঘাত লাগিতেছে, তথাপি এখন পর্যন্ত তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। ইহা দেখিলে প্রস্তর ব্যতীত আর কিছু অনুমিত হয় না।”[১৬] দিঘাপাতিয়া রাজবংশের বংশপতি দয়ারাম সীতারামের কৃষ্ণজীকে যে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে গৃহ এত দৃঢ় যে, গত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের দারুণ ভূমিকম্পে তাহার পরবর্তীগণ কর্তৃক নির্মিত সৌধমালা ভূমিসাৎ হইলেও, সেই প্রাচীন জরাজীর্ণ গৃহ ভগ্ন হয় নাই। ৫০০ খ্রিস্টাব্দ হইতে উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের নির্মাণে আরব্ধ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির ৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে ও পুরীর মন্দির ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়। বুদ্ধগয়ার বর্তমান মন্দির ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নির্মিত হয়। তখন বঙ্গে জমিদারগৃহ গড়বেষ্টিত হইয়া সুরক্ষিত ও সুন্দর হইত।

পূর্বে, যে যে সম্প্রদায়ের যে যে ব্যবসায়, তাহারা তাহাই করিত। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনশঙ্কায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত না। তখন ব্রাহ্মণগণ “নাজির বা দারোগার পদ পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন না।” “তদানীন্তন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ধর্মালোচনা ও গ্রন্থরচনা এই সকল অনুষ্ঠানেই জীবনযাপন করিতেন। সাংসারিক সুখ দুঃখের প্রতি প্রায় কিছুই মনোনিবেশ করিতেন না।”[১৭]

দস্যু তস্করের উপদ্রবে দেশবাসী যাহারা স্বচ্ছন্দাবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন, তাহারাও দীন অবস্থায় বাস করিতেন। “তাহাদের অর্থ চন্দ্র সূর্যেরও গোচর হইত না, নিয়ত গৃহের প্রাচীর মধ্যে অথবা ভূগর্ভে নিহিত থাকিত। ঋণের আদান প্রদান কার্য পর্যন্ত অতি সঙ্গোপনে সম্পাদিত হইত। অধিক লোকের বিদিত হইবার আশঙ্কায় ঋণপত্রে অন্য সাক্ষী না করিয়া কখন কখন কেবল ধর্ম সাক্ষী লিখিত হইত। দস্যুতস্কর ভয়ে সাধারণ লোকেরা ঘরের মেঝের মধ্যস্থলে একটি গর্ত রাখিতেন, এবং রাত্রিতে আভরণ ও

তৈজসাদি তন্মধ্যে রাখিয়া তদুপরি এক কাষ্ঠফলক প্রদানপূর্বক তাহার উপর শয্যা করিয়া নিদ্রা যাইতেন। সন্ধ্যার পর গ্রামান্তরে যাইতে হইলে বিষম বিপদ উপস্থিত হইত। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ আরও বিপদজনক ছিল।"[১৮]

ভারতবাসীদিগের অলঙ্কারপ্রিয়তার বিষয় পূর্বেই কথিত হইয়াছে। পূর্বে বঙ্গদেশ ধনবান ও সম্ভ্রান্তগণ আপনাদিগের কামিনীগণকে রত্নাভরণ ও স্বর্ণভূষণ দিতেন। "মধ্যবিত্ত মহিলাগণ নাসিকায় নথ, কর্ণদ্বয়ে নলঝুনকা বা ধেঁড়িঝুমকা, গলদেশে পাঁচনর বা সাতনর বা কণ্ঠমালা, এই কয়েকখানি স্বর্ণাঙ্কার পরিতেন। আর বাহুদ্বয়ে তাড়, হস্তদ্বয়ে বাউটি, গজরা, রুশুন, কুসীকঙ্কণ ও পুঁইচা, কটিদেশে গোট বা চন্দ্রহার, পাদযুগলে মল, পদাঙ্গুলিতে পাশুলি, এই কয়েকখানি রজতনির্মিত আভরণ পরিধান করিতেন।[১৯] অপেক্ষাকৃত হীনবিত্ত রমণীরা স্বর্ণাভরণের মধ্যে কেহ বা কেবল নখ ও কণ্ঠমালা, এবং তিন চারখানি রূপার অলঙ্কার পাইলেই চরিতার্থ হইতেন। অধমাবস্থার স্ত্রীলোকের স্বর্ণ বা রজত নির্মত কোন অলঙ্কার থাকিত না। তাহারা কাংস্য বা পিত্তলের আভরণ পাইলেই কৃতার্থ্যন্ম হইতেন। রাজপরিবারস্থ কামিনীগণ তৎকালেও বিবিধ রত্নখচিত স্বর্ণভূষণে ভূষিত থাকিতেন।"[২০] শাঁখা, সোনা, রঙিন শাড়ি সকলের ভাগ্যে জুটিত না।

বঙ্গদেশে নানাবিধ রেশমের ও কার্পাসের বস্ত্র হইতে। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে "পুনঃপুনঃ পাটের শাড়ি"র ও "তসরের শাড়ি"র উল্লেখ আছে। ঢাকাই মসলিন ও মালদহের পট্টবস্ত্র দিল্লির প্রাসাদে সাদরে ব্যবহৃত হইত।[২১] সেরূপ সুন্দর বস্ত্র এখন আর প্রস্তুত হয় না। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে মালদহের সেখ ভিক পারস্য উপসাগরের পথে তিন জাহাজ মালদহী বস্ত্র রুশিয়ায় প্রেরণ করেন।[২২] পাটনাতেও মসলিন প্রস্তুত হইত।[২৩] ঢাকাই মসলিনের সাধারণ নাম মলমলখাস অর্থাৎ রাজ-মসলিন)। এক প্রকার মসলিনের নাম ব্যাপ্ত হাওয়া (বয়নকৃত বায়ু), এক প্রকারের নাম আবরাওয়ান (প্রবাহিত সলিল), এক প্রকারের নাম শবনম (সান্ধ্য শিশির)। শেষোক্ত মজলিন সিক্ত অবস্থায় তৃণোপরি সংস্থাপিত হইলে শিশির ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হইত না।[২৪]

তক্রু ও চরকা উভয়বিধ যন্ত্রে সূত্র প্রস্তুত করণ মহিলাদিগের আয়ের এক উপায় ছিল। সূত্র তন্তুবায়গণ কর্তৃক ক্রীত হইত। "যাঁহারা যেরূপ সূক্ষ্ম সূত্র কর্তনে সমর্থ হইতেন, তাহারা সেইরূপ অর্থলাভ করিতে পারিতেন, এবং স্ত্রীমণ্ডলে তদনুরূপ প্রশংসাভাজন হইতেন। এই ব্যবসায় দ্বারা নিঃস্ব লোকের সংসারযাত্রা-নির্বাহের অনেক আনুকূল্য হইত। যদিচ মধ্যবিত্ত লোকেরা এই ব্যবসায়কে অপমানকর জ্ঞান করিতেন, তথাপি তাহাদের স্ত্রীলোকেরা যজ্ঞসূত্র বা নিজের বস্ত্রনির্মাণের ছলে অধিক সূত্র কর্তন করিতেন, এবং অতি সঙ্গোপনে অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা বিক্রয় করাইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন।"[২৫]

অশ্ব, গজ, পালকী ও গোযান ব্যবহৃত হইত। সুখাসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬]

দেশে তাম্রকূট ব্যতীত অন্য মাদক দ্রব্যের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরে গাঁজা ও অন্যান্য স্তরে সিদ্ধির ব্যবহার ছিল।

"অন্ন, ডাল, নিরামিষ ব্যঞ্জন, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, এই কয়েক দ্রব্য তদানীন্তন সাধারণ লোকের সচরাচর আহার ছিল। শাক্তসম্প্রদায়ী লোকে কখন কখন ছাগমাংস ভোজন করিতেন, কিন্তু এই ছাগ কোন শক্তিপূজার উদ্দেশে ছিন্ন না হইলে তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেন না। কদাচিৎ কেহ মেষ ও মৃগমাংসও ভোজন করিতেন। গোধূম বা যবচূর্ণ

পিষ্টকাদি কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবহৃত হইত না। ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রের বিধবারা নিরামিষ ভোজন ও একাহার করিতেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী লোকমাত্রেই মাংসস্পর্শ করিতেন না, এবং অনেকে মৎস্য-আহারেও বিরত থাকিতেন।"[২৭] হিন্দুশাস্ত্রনিষিদ্ধ পানভোজন তখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। দুই শত বৎসর পূর্বে "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ" নবদ্বীপ হইতে যে বৈষ্ণব ধর্ম কুলপ্লাবিণী বন্যার মত বাহির হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের সময় তাহার চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু জলরাশি তখনও অপসৃত হয় নাই। পূর্বে দেশে মাংসাহার চলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে ব্যাধপত্নীর বাজারে ও গৃহে গৃহে মাংসবিক্রয়ের কথা আছে। ফুল্লরা ব্রাহ্মণগৃহেও মাংস বিক্রয় করিত। ধনপতি সদাগরের গৃহে আহারের আয়োজনকল্পে দুর্বলা দাসী "জীয়ন্ত শশ", "জরঠ কমঠ" ও "খাসী" কিনিয়াছিল; সাধুও "মাংসের ব্যঞ্জন" ও "মাংসবড়ি" ভোজন করিয়াছিলেন।

"ইদানীন্তন স্ত্রীপুরুষেরা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, পূর্বকালীন লোকের সেরূপ পরিচ্ছদ ছিল না। তৎকালে মধ্যবিত্ত ও হীনবিত্ত পুরুষেরা গ্রীষ্মকালে ধুতি ও দোবজা অথবা একপাট্টা এবং শীতকালে ধুতি ও হামাম বা গ্লাপ ব্যবহার করিতেন। শীতকালে কদাচিৎ কেহ গায়ে বেনিয়ান বা মের্জাই ও মস্তকে টুপী দিতেন, অথবা উষ্ণীষ বাঁধিতেন। মধ্যবিত্ত কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি প্রাতে বনাৎ ও রাত্রিতে কার্পাসপূর্ণ রেজাই ব্যবহার করিতেন। তরুণ-বয়স্কেরা শীতনিবারণার্থ দোলাই ব্যবহার করিত। কোন কোন ধনী সময়বিশেষে পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। শাল, রুমাল, জামেয়ার প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্র অতি অল্প লোকেরই থাকিত। কি গ্রীষ্ম, কি শীত, সকল সময়েই স্ত্রীগণের এক শাটীমাত্র পরিধেয় ছিল। তাহারা শীতানুভব করিলে আর একখানি শাটী গায়ে দিত। রাজসংসারের উচ্চপদস্থ পুরুষেরা রাজভবনগমনকালে জামা ইজার ও পাকড়ি ব্যবহার করিতেন। করচরণাচ্ছাদনার্থ কোন প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না।[২৮] নবদ্বীপের রাজারা দেবার্চ্চন, ভোজন ও শয়নকালে ধুতি ও দোবজা পরিতেন। কিন্তু অন্য অন্য সময়ে পশ্চিমোত্তরীয় নানাবিধ পরিচ্ছদ পরিধান কবিতেন। রাজ্ঞী, রাজবধূ ও রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষেয় শাটী পরিতেন: কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভকার্যোপলক্ষে পশ্চিমোত্তরদেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিতেন।[২৯] ইহারা শীতকালে বিবিধ বহুমূল্য কৌষেয় ও রাঙ্কব বস্ত্র অঙ্গে দিতেন, এবং চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন। পূর্বকালে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, কোন শ্রেণির লোকই পাতলা কাপড় পরিতেন না। কেহ তাদৃশ বস্ত্র পরিলে জনসমাজে অতিশয় নিন্দাস্পদ ও উপহাসভাজন হইতেন।"[৩০] দিল্লীযাত্রাকালে ভবানন্দের বেশের ভারতচন্দ্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"শীরে চিরা হীরা তায় বিলাতি খেলাত গায়
নানা বন্ধে কোমর বান্ধিল।"

এই বেশ রাজদরবারে যাইবার জন্য—বহুদিন মুসলমান সংস্রবের ফল।

কেশবিন্যাস রমণীদিগের প্রসাধনের বিশেষ অংশ ছিল। উড়িষ্যার মন্দিরে ভাস্করকার্যে নানাপ্রকার কেশবিন্যাস ক্ষোদিত রহিয়াছে।[৩১] "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে চিরুণী দিয়া কেশ আঁচড়াইয়া কবরী বাঁধিবার উল্লেখ আছে। লহনা "কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি।" "শ্রীধর্মমঙ্গলে" নয়ানী "বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টানুনি।" "অন্নদামঙ্গলে" পদ্মমুখীর "চূড়া চাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল।"

তখন রমণীদিগের নয়নে অঞ্জনলেপনের প্রথা ছিল। ভারতচন্দ্রের সময় চুয়া, কেশর, কস্তুরী ও চন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আতর, গোলাবও ব্যবহৃত হইতেছে। তৎপূর্বে "চণ্ডী"তে 'সপত্নী-সোহাগে" দেখিতে পাই,—

"হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল আনিল দুর্ব্বলা।
খুল্লনায় অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মলা।।
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।"

তৎপরে "অঙ্গে আরোপিল রামা ভূষণ চন্দন।" "শ্রীধর্মমঙ্গলে"ও দেখিতে পাই, "গায়ে দিল চর্চিত চন্দন চারু চুয়া।" রঞ্জাবতী

"হরিষে হরিদ্রা তৈল আমলকী লয়ে।
সখীসঙ্গে স্নানে যায় হর্ষচিত্ত হয়ে।।"

হরিদ্রার ব্যবহার ভারতচন্দ্রের সময়েও ছিল। সুন্দর-দর্শনে বর্ধমানকামিনীদিগের এক জনের উক্তি,—

"হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।"

দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বিবাহের বয়সও অল্প ছিল। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে জানাই পণ্ডিত লক্ষপতিকে বুঝাইতেছেন,—

"সপ্তম বৎসরের কন্যা, বিভা দিলে হয় ধন্যা,
তার পুত্র কুলের পাবন।"

"শ্রীধর্মমঙ্গলে" রঞ্জাবতীর যখন "বয়স বছর বার", তখনই তাহার সহোদর তাহাকে "বন্ধ্যা বলি হেলে।" তিনি "মাসে মাসে ঔষধ অপত্য আশে খান", এবং "কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে।" আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সুন্দরের সহিত সাক্ষাৎকালে বিদ্যার বয়স অধিক হয় নাই—তাহাকে তখনও পদার্পিতমাত্রযৌবনাও বলা যায় কি না সন্দেহ। তথাপি কন্যার কলঙ্ককথা শুনিয়া রাণী রাজার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া "নূপুরের ঝনঝনে" তাহার বৈকালিক নিদ্রা ভাঙিয়া তিরস্কার করিয়া বিদ্যার কথায় বলিলেন, তাহার "বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।"

কাজ কর্ম প্রধানতঃ পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে নিষ্পন্ন হইত। লোকে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল কি না, তাহা বিবেচ্য।

দেশে বহুবিধ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। লোকে শুভাশুভচিহ্নে বিশ্বাস করিত। মন্ত্রতন্ত্রে লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল—মহিলাদিগের ত কথাই নাই। "চণ্ডী"তে কন্যার বিবাহে রম্ভাবতী বিবিধ বশীকরণ ঔষধের সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লহনাও দুর্বালা দাসীর পরামর্শে লীলাবতীর নিকট যে ঔষধ সংগ্রহ করিতেছিলেন, তাহাতে,—

"ঔষদের গুণে স্বামী বোল শুনে,
যেন পিঞ্জরের শুয়া।"

"শ্রীধর্মমঙ্গলে"ও আছে, "মুকে মাথে তৈল পড়া, নয়নে কজ্জল।" ভারতচন্দ্র ভবানন্দের গৃহাগমনকালে চন্দ্রমুখীর কথায় বর্ণনা করিতেছেন,—

"খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দুর পড়িলা।"

কোন কোন স্থান সম্বন্ধেও নানারূপ কুসংস্কার ছিল।

শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য অস্তিত্বহীন জীবের অস্তিত্বও কল্পিত হইত।

মোগল রাজত্বের অন্তিম দশায় দেশের সর্বত্র যে বিলাস ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বঙ্গেও তাহার যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। স্বভাবতঃ একপত্নীরত হিন্দুদিগের মধ্যে বহুবিবাহ বিশেষরূপ প্রচলিত হইতেছিল। "কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে ধনপতি ভর্ৎসনা করিয়া লহনাকে বলিতেছেন,—

"সেই নারী ভাগ্যবতী ধনবান যার পতি,
বিবাহ করয়ে দুই তিন।"

লহনা এ কথা যথার্থ বিবেচনা করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। বহুবিবাহের বহুল প্রচলন শেষে কুলীনব্রাহ্মণ ও কতকগুলি ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে "বিবাহ-ব্যবসায়ে" পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের "দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।" ভারতচন্দ্র তরুণ বয়সে গুরুজনদিগের অমতে এবং বংশমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াও স্বীয় মনোনীতা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর হইয়াও ভাগ্যদোষে ঘটনাস্রোতে লঘু তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে শেষে চল্লিশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসিয়া কূল পাইয়াছিলেন। তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে জীবনের শেষ কয় বৎসর যৌবনের সেই প্রণয়ভাগিনীকে লইয়া দাম্পত্য ও পারিবারিক সুখ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ছিলেন। তাই বহুবিবাহকারিগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"এ সুখে বঞ্চিত কবি রায়গুণকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর।।"

পুরুষসমাজে অন্যবিধ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের কথা "হরগৌরীর কথোপকথনে" জানিতে পারা যায়। ভারতচন্দ্রের দেবচরিত্র হইতে কেন আমরা মানবসমাজের আচার ব্যবহার অভ্যাসাদির আভাষ পাই, তাহার কারণ পরে আলোচিত হইবে। সমসাময়িক ইতিহাসেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোভাসিংহ বর্ধমানের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। বর্ধমানের রাজপুত্র স্ত্রীবেশে নারীগণের আরোহণযোগ্য যানে কৃষ্ণনগরে রামকৃষ্ণের গৃহে আসিয়া আত্মরক্ষা করেন।[৩২] সেনাবলে বলী রামকৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় ও শরণাগত-রক্ষায় সমর্থ হয়েন। রাজদুহিতার রূপলাবণ্যমুগ্ধ শোভাসিংহ রাজকন্যার তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

পূর্বে পাতলা কাপড় পরিলে জনসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হইতে সত্য; কিন্তু ক্রমে বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠে। "ঢাকা নগরে বহুকালাবধি অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা এক প্রকার বস্ত্র নির্মিত হইয়া থাকে, ইহা এ দেশে শবনম ও[৩৩] ইউরোপে ঢাকাই মসলিন নামে খ্যাত, এবং অতি আগ্রহসহকারে গৃহীত হয়।"[৩৪] তাহার অনুকরণে শান্তিপুরে পাতলা ধুতি ও শাটী প্রস্তুত হইয়া নবদ্বীপ অধিকারে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। বর্তমানে শান্তিপুরের বস্ত্র এত পাতলা যে, দীনবন্ধু মিত্র বলিয়াছেন,—

''শান্তিপুরে ডুরেশাড়ী সরমের অরি,
"নীলাম্বরী', 'উলাঙ্গিনী', 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী"।[৩৫]

নীলাম্বরী ভারতচন্দ্রের সময় প্রচলিত ছিল। তিনি বিরহতাপতপ্তা বিদ্যার বর্ণনায় "নীল কাপড়ে"র উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠ করিলে সহজেই জয়দেবের "চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং" মনে পড়ে। জয়দেবের পর কবিকঙ্কণও মেঘডুম্বরু কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রও অন্যত্র চিকণ শাড়ির উল্লেখ করিয়াছেন। সাধী

বড়রাণীকে সদুপদেশ দিতেছে,—"শাড়ি পর চিকণ শ্রীরামখানি গো।"

কৃষ্ণনগরের রাজা রঘুরাম স্বীয় পুত্র তরুণবয়স্ক কৃষ্ণচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে উত্তরাধিকারী করিবার জন্য নবাবের সম্মতি লইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের অধিকার-প্রার্থনার জন্য যখন নবাব-সন্নিধানে গমন করেন, তখন চতুর কৃষ্ণচন্দ্র ধুমপানাসক্ত পিতৃব্যের অভীষ্ট ব্যর্থ করিবার জন্য, মুর্শিদাবাদের চকের রাজপথের উভয় পার্শ্বে কয়েক ব্যক্তিকে অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ তামাক খাইতে বলেন। তাম্রকূটধুমগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি পথে বিলম্ব করেন। এ দিকে কৃষ্ণচন্দ্র নবাবসমীপে পিতৃরাজ্য প্রার্থনা করিলে, নবাব, চকে রামগোপালের ধুমপানের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে অপদার্থ বিলাসী বিবেচনা করেন, এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকেই রাজ্য দান করেন।[৩৬]

বিদ্যাসুন্দরের মিলনবর্ণনায় ভারতচন্দ্র বিলাসের যে চারুচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার উপাদান তাঁহার সময় অজ্ঞাত ছিল না,—

"গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পুরি।।
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পুরি কনকের থালা।।
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানাদ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি।।
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।[৩৭]
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত।।
মিঠাপান মিঠাগুয়া চূণ পাথরিয়া
রাখে দুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া।।
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।"

সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা করিলে সমাজে বিলাসিতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

দীর্ঘকাল মুসলমানদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে তখন হিন্দুসমাজে নানারূপে মুসলমানের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রাজসভায় মুসলমানের বেশ পরিহিত হইত। বেশভূষায়, গীতবাদ্যে, সাহিত্যে সে প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। তখন মুসলমানী গ্রন্থ বাংলায় ও হিন্দুর গ্রন্থ পারসীতে অনূদিত হইত। মুসলমান কবিরাও হিন্দুর মহাভারতাদি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছেন। "তৎকালে পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা কহিবার বা লিখিবার প্রথাই ছিল না। সকল কথোপকথন ও লিখনের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক পারস্য ও হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হইত।"[৩৮] দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক সন্ধানক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না। "অন্নদামঙ্গলে" "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ" হইতে নিম্নলিখিত কয়টি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

"ফারমাণী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার।।
কোঠায় কাঙ্গুরাঘড়ী নিশান-নহবৎ।
পাতশাহী শিরপা সুল্‌তানী সুলতানৎ।

ছত্রদণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।।”

এই কয় ছত্রে যবন শব্দ।

ভারতচন্দ্রের যে সকল রচনা বর্তমান, সে সকলের মধ্যে “সত্যপীরের কথা” সর্বপ্রথম রচিত,—

“গণেশাদি রূপধর বন্দ প্রভু স্মরহর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাতা।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা।।
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান।
ফকীর-শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি।—ইত্যাদি

মুসলমান রাজত্বকালে রাজদরবারে পারসী প্রচলিত ছিল। ক্রমে সমাজেও পারসীতে দক্ষতা আদৃত হইতে আরম্ভ হয়। তাই পারসী শব্দ অবাধে বাংলায় চলিয়া গিয়াছে। তখন পারসীর এত আদর ছিল যে, ভারতচন্দ্র প্রথম বয়সে পারসী না শিখিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করাতে স্বজনগণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে পারসীভাষা অনাদৃত ও ক্রমে তাহার আলোচনা ত্যক্ত হয়। কিন্তু তৎপূর্বে বহু পারসী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছিল। সে সকল বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হইয়াই রহিয়াছে। বর্তমান সময়ের অনেক রচনাতেও যে সকল শব্দ সংস্কৃত শব্দের পার্শ্বেই আসন প্রাপ্ত হয়। অনেক আচার যেমন বিধানের বক্র কটাক্ষ সত্ত্বেও সিংহদ্বারপথে না হউক, পশ্চাতের দ্বারপথে সমাজে প্রবেশ করে, এবং একবার প্রবেশ করিতে পাইলে সিংহদ্বারপথেও তাহাদের গতায়াত আর গোপণে নিষ্পন্ন হয় না, তেমনই সকল বিধান সত্ত্বেও, অনেক বিজাতীয় শব্দ ভাষায় প্রবেশ করে, এবং একবার প্রবেশ করিতে পাইলে রহিয়াই যায়। তখন জমিদারদিগের শাসনপ্রণালীও মুসলমানের অনুকরণে। এখনও নানা পদের বিজাতীয় নাম তাহাদিগের উৎপত্তির পরিচয় প্রদান করে।

মুসলমান শাসনকালে হিন্দুর আচারে ও ব্যবহারে, শিল্পেও সাহিত্যে, সমাজে ও সংস্কারে, মুসলমানের যে প্রভাব পতিত হইয়াছিল, তাহা দূর হয় নাই, পরন্তু তাহা হিন্দুর আচারে ও ব্যবহারে, শিল্পে ও সাহিত্যে, সমাজে ও সংস্কারে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই, সহজে লক্ষিত হয় না।

তথ্যসূত্র :

১. হাজি আহম্মদ তাহার জন্য সুন্দরী সংগ্রহ করিতে যাইয়া বহু মানবিরাগভাজন হয়েন। মুতাক্ষরীণের টীকায় সুজা খাঁর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের বিষয় যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সহজে বিশ্বাস করাই দুঃসাধ্য।—লেখক।

২. Stewart—History of Bengal.

৩. স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্নের “বাঙ্গালার ইতিহাস।” See Holwell—Interesting Historical Events.

৪. মুতাক্ষরীণ

৫. ভারতচন্দ্রের "দিল্লীতে উৎপাত" বর্ণনে দেখিতে পাই,—

"ধান চাল মাষ মুগ চোলা অরহর।
মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর।।
দেখান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব।।"

৬. সুপারী ও দাড়িম্বও জন্মিত। India of Aurangzeb গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। লেখক।

৭. Barnier.

৮. India of Aurangzeb.

৯. India of Aurangzeb.

"রঘুবংশে" রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় কালিদাস লিখিয়াছেন,—

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ।।"

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মৃকারণ খাঁর কথায় Stewart বলেন, তিনি ঢাকায় আসিয়া রাজধানী করিলেন। পূর্ববঙ্গ নদীবহুল, বিশেষ বর্ষাকালে অনেক স্থান জলমগ্ন থাকে; তজ্জন্য বঙ্গে শাসন-কর্তাকে বহুবিধ নৌকা রাখিতে হইত। জলদেবতার প্রতি হিন্দু ও মুসলমান প্রজার ভক্তির আধিক্য হেতু শাসন-কর্তাকেও বাধ্য হইয়া জলদেবতার পূজা দিতে হইত।—History of Bengal.

মুতাক্ষরীণের টীকায় দেখা যায়, ঢাকা হইতে বর্ষে বর্ষে দিল্লীতে নৌকা প্রেরিত হইত।

"কবিকঙ্কণচণ্ডী"তে "মধুকরাদি" যে সকল ডিঙ্গীর উল্লেখ ও বর্ণনা আছে, সে সকল পাঠ করিলে সহজেই মনে হয়, বঙ্গে বহু দিন হইতে নৌনির্মাণ চলিত ছিল।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে জলযানের ও জলদস্যুর কথা বঙ্গের ইতিহাসে অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইবে। বাহুল্যবোধে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

এখন বঙ্গদেশে নৌনির্মাণ ব্যবসায় বিলুপ্ত হইতেই বসিয়াছে।—লেখক।

১০. ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত

১১. ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত।

১২. তখন বেগারও চলিত ছিল। কিন্তু লোকের উপকারার্থ বলিয়া লোকে বেগার দেওয়া অন্যায় মনে করিত না। প্রাচ্যে এরূপ অনেক কার্যই বেগারশ্রমে-সম্পন্ন। Stein's Sand-Buried Ruins of Khotan দ্রষ্টব্য।—লেখক

১৩. Fergusson—Indian and Eastern Architecture.

১৪. Buchanan Hamilton—Eastern India, Edited by Martin.

১৫. "রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে গঠন,
কত সিঁড়ি, কত ঘর, যেন হর্ম্ম্যবন;
চমৎকার পরিপাটী পূজার দালান
ভবনের মধ্যে ইটি নৈপুণ্যে প্রধান,
বজ্র সম গাঁথা ইট, চিত্রিত উপরে,
কত কাল গেছে তবু চক্‌মক্ করে;
গড়ের বাহিরে সিংহদ্বারচতুষ্টয়,
নিপুণ গাঁথনি তার শক্ত অতিশয়,
প্রসর বিস্তর, আছে উচ্চতা বিশয,
খিলানে যোজনা করা নাহি কাঠলেশ।।ঃঃ—সুরধুনী কাব্য।

১৬. ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।
১৭. ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।
১৮. ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।
১৯. "কবিকঙ্কণচণ্ডীতে" বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। তাড় বালা, কঙ্কণ, কেয়ূর, (অঙ্গদ) অঙ্গুরী, হার, (পাঁচনর ও সাতনর ও কণ্ঠমালা) নূপুর পাঁসলি, চুড়ী ও কর্ণে হেমমুকুলিকা এবং কর্ণপুর ও শঙ্খ উল্লেখযোগ্য।

১৭১০ খ্রিস্টাব্দে ঘনরাম "শ্রীধর্মমঙ্গল" রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে অঙ্গুরী কর্ণপুর, কণ্ঠমালা ও শঙ্খ ব্যতীত আরও যে সকল অলঙ্কারের উল্লেখ আছে, "নয়ানী শিবাইদত্ত বারুয়ের বৌ"র নাউসেনাকে দেখিয়া "লাস বেশ"—বর্ণনায় সে সকলের নাম পাওয়া যায়। সে তালিকাও নিতান্ত সঙ্ক্ষিপ্ত নহে।—

"আরোপে অলকাকোলে মুকুতার পাঁতি।
সীমন্তে রচিয়া দিল সুবর্ণের সিঁথি।।
অঙ্গে পরে অপূর্ব অনেক অলঙ্কার।
প্রবাল পুরট পাঁতি গজমতিহার।।
দোসুতি তেসুতি মতি হেম কণ্ঠমালা।
গোরা গায় গজমতি গর্ব করে ভালা।।
নাসায় রেশম পরে করিয়া লাবণ্য।
*   *   *   *
কাণে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
সহজে সুন্দরী তার বেশ করে বড়ি।
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ বাজুবন্দ ছড়া।
*   *   *   *
পরিল পুরট টাড় বিচিত্র বাউলী।
কটীতে কিঙ্কিণী পরে পাদাগ্রে পাসুলি।।
• অপর যে পদভূষা পাতা গোটা মল।"—জামতি পালা।

অন্যান্য প্রাচীন কাব্যগ্রন্থেও প্রায় এই সকল অলঙ্কারের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গদেশে যথেষ্ট অলঙ্কার চলিত ছিল। তখন লোকে অলঙ্কার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিত। সাধারণ লোকের পক্ষে দেহই সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত তোষাখানা ছিল।—লেখক।

১৯. সুবর্ণবণিক স্বর্ণকারদিগের চাতুরীর পরিচয় "চণ্ডী"তে প্রাপ্তব্য।—লেখক

"সুবর্ণ বণিক বৈসে. রজত কাঞ্চন কসে,
পোড়ে ফোড়ে হইল সংশয়।
কিছু বেচে কিছু কেনে, মনুষ্যের ধন আনে,
পুরমধ্যে যাহার নিলয়।।
নিবসে পশ্যতোহর, পুরমধ্যে যা'র ঘর,
নির্মাণ করয়ে আভরণ।
দেখিতে দেখিতে জন, হরযে সভায় ধণ,
হাথ বদলিতে ভাল জান।।
(বণিক ও নবশায়কদিগের আগমন।)

২০. ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।
২১. Stewart—History of Bengal.

২২. Birdwood—Industrial Arts of India.
২৩. Birdwood—Industrial Arts of India.
২৪. মুতাক্ষরীণ; টীকা।
বর্তমান সম্রাট যখন ভারতে আসেন, তখন তাহার জন্য ২০ গজ দীর্ঘ ও ১ গজ প্রস্থ যে মসলিন প্রস্তুত করান হইয়াছিল, তাহার ওজন সাড়ে তিন আউন্স মাত্র।—লেখক।
২৫. ক্ষতীশ-বংশাবলি-চরিত।
২৬. India of Aurangzeb.
নেয়ানা নামক এক প্রকার দ্বারহীন পালকীরও সন্ধান পাওয়া যায়—লেখক।
২৭. ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।
২৮. "কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে" আছে, "পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দী কৈল।"
২৯. "চণ্ডীতে" "লহনার অভিসার"—বর্ণনায় ও ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" নয়ানীর "লাস বেশ" বর্ণনায় কাঁচুলির উল্লেখ আছে। ধনীদিগের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার ছিল বলিয়াই বোধ হয়।—লেখক।
৩০. ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।
৩১. Rajendra Lala Mitra—Antiquities of Orissa.
৩২. ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্।
৩৩. সকল প্রকার ঢাকাই মসলিন যে শবনম নহে, পূর্বেই তাহা বলা হইযাছে।—লেখক।
৩৪. ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।
৩৫. সুরধুনী কাব্য।
৩৬. ক্ষিতীশ-বংশোবলী-চরিত।
৩৭. বর্ধমানের রাজকন্যা কাঞ্চীপুরে কথায়ও বলিয়াছিলেন, "হার বিধি সে কি দেশে গঙ্গা নাই যথা।" বর্ধমান গঙ্গার উপরে অবস্থিত নহে সত্য, কিন্তু গঙ্গাজলের পাবন গুণ জ্ঞাত থাকায় তাহা সমাদরে ব্যবহৃত হইত। আইন আকবরীতে দেখা যায়, আকবর রাজধানীতেই হউক বা ভ্রমণকালেই হউক গঙ্গার জল পান করিতেন। গঙ্গাজল সঙ্গে যাইত।—লেখক।
৩৮. ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত।

সাহিত্য ১৩১১ অগ্রহায়ণ

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
১৮৯০-১৯৬৮

বাংলার জাতি ও সমাজবিন্যাস

বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণ বাংলায় সীতারাম রায়ের নেতৃত্বে মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদারদিগের সম্মিলিত জীবনপণ বিদ্রোহ যখন বিফল হইল, এবং ওই বীর যোদ্ধা যখন মুর্শিদাবাদে বন্দি হইয়া নীত হইলেন, হিন্দু বাঙালির স্বাধীনতা-প্রদীপের শেষ শিখা তখন ভাগীরথী জলে নির্বাপিত হইল।

১৭১২ সালে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। ওই সালেই আজিম ওস্মানের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি বাংলার নবাব হন। তাহার পর ৫০ বৎসরের মধ্যেই মুসলমানের পরিবর্তে ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত আরম্ভ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার মাটি ও নদীর প্রচণ্ড বিপ্লব দেখা দিল। হিন্দু-প্রধান মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গে নদনদীর গতি হ্রাস ও রোধ, এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গে নদীর বিপুলতর প্রবাহ ও ভাঙা-গড়া, বাংলার সমাজকে নূতন করিয়া ভাঙিতে ও গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নদনদীর বিপর্যয়ের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বাংলায় হিন্দুর অবনতি ও মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের সূচনা হইয়াছিল। ইংরেজ আমলে যখন প্রথম বাংলায় লোকগণনা হয়, তখন হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমান অপেক্ষা অধিক ছিল। ১৮৭১ সালে বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৮১ লক্ষ, মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৭৬ লক্ষ। ১৮৮১ সালে মুসলমানেরা বাড়িয়া ১৮৪ লক্ষ হইল, হিন্দুরা কমিয়া ১৮০.৭ লক্ষ হইল। সেই হইতেই মুসলমানের সংখ্যার প্রাধান্য দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে।

কী পরিমাণে বাংলার বিভিন্ন অংশে সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু ও মুসলমান বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল।

সমগ্র লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা পরিমাণ

পশ্চিমবঙ্গ	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩
হিন্দু	৮৪	৮৩	৮৩	৮২	৮২	৮৩
মুসলমান	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৪
মধ্যবঙ্গ						
হিন্দু	৫০	৫০	৫০	৫০	৫১	৫১
মসলমান	৪৯	৪৯	৪৯	৪৮	৪৭	৪৭

উত্তরবঙ্গ						
হিন্দু	৪০	৪০	৩৯	৩৭	৩৫	৩৬
মুসলমান	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬১
পূর্ববঙ্গ						
হিন্দু	৩৬	৩৪	৩৩	৩১	৩০	২৮
মুসলমান	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭০	৭১

১৮৮১—১৯৩১ শতকরা বৃদ্ধি

	পশ্চিমবঙ্গ	মধ্যবঙ্গ	উত্তরবঙ্গ	পূর্ববঙ্গ	সমগ্র বাংলা
হিন্দু	১৫.৪	২৬.৭	১৩.১	৩৮.৯	২২.৯
মুসলমান	২৭.৭	১৭.৪	২৭.১	৮৭.৫	৫১.২

উহার কারণ : প্রাকৃতিক বিপর্যয় বনাম সমাজের কুসংস্কার

একমাত্র মধ্যবঙ্গেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার কম। হিন্দুরা মুসলমান অপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে একমাত্র মধ্যবঙ্গেই। কৃষির দুর্দশা ও ম্যালেরিয়া মহামারী এখানে মুসলমানদিগকে সংখ্যায় বাড়িতে দেয় নাই। খুলনা ও ২৪ পরগণা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ও বর্ধিষ্ণু। এখানে পোদ, কৈবর্ত প্রভৃতি সতেজ হিন্দু জাতিরই প্রাধান্য। অপরদিকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের উত্তর অঞ্চলে যেখানে মুসলেমানের আধিক্য সে অঞ্চল ম্যালেরিয়া-পীড়িত ও ক্ষয়িষ্ণু। তাহা ছাড়া কলিকাতা ও ভাগীরথী তীরে শিল্পপ্রধান শহরগুলিতে হিন্দু শ্রমিক ও ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে অনেক আসিয়া বসবাস করিতেছে। মধ্যবঙ্গ ছাড়া অন্য সব অঞ্চলেই মুসলমানের বিপুলতর বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। পূর্ব অঞ্চলে মুসলমানের বৃদ্ধির হার (৮৭.৫) জগতের উপনিবেশ ও কৃষির ইতিহাসে অসাধারণ। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষয়িষ্ণুতম, এখানে বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিন্দু বৃদ্ধির বিষম অন্তরায়। যেখানে স্বাস্থ্য ও সম্পদ দুই-ই বর্তমান,—যেমন উত্তর ও পূর্ববঙ্গ,—সেখানে হয় হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত পুরাতন, ঘনবসতি ও অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে অবস্থানের জন্য, অথবা বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির অপ্রচলনের জন্য, মুসলমানের মতো সমান হারে বাড়ে নাই এবং মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে বরং কমিয়াই গিয়াছে।

নদনদীর গতি ও জল সরবরাহের ওলট-পালটের জন্য ৫০ বৎসরে মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রতিবেশের যে পরিবর্তন হইল তাহার ফলে ক্রমে প্রাকৃতিক বিধানে যেন হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক অঞ্চলেই বসবাস সূচিত হইতেছে। কোনো সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধে নয়, প্রকৃতির শাসনে ও অনুশাসনেই ইহা হইতেছে। ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ হইতে মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গে যাইয়া বাস করিতেছে না, এবং হিন্দুরাও উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতেছে না। প্রকৃতি ও কৃষির পরিবর্তনের জন্যই মুসলমানপ্রধান জেলাগুলিতেই মুসলমানের সংখ্যা অতি দ্রুত হিন্দুর সংখ্যা অতিক্রম করিয়া বাড়িতেছে। পক্ষান্তরে যেখানে হিন্দুর প্রাধান্য পূর্বে ছিল, সেখানেও হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হ্রাস হইতেছে। হিন্দুর মোট লোকসংখ্যা হিসাবে অনুপাত কমিতেছে প্রায়

সর্বত্র; এবং অস্বাস্থ্যকর জেলাগুলিতে উহা শোচনীয়ভাবে কমিয়াছে।

১৮৭১—১৯৩১ সালের মধ্যে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর মোট লোকসংখ্যা হিসাবে হিন্দু কমিয়াছে শতকরা ৮.৩, ১১.২ ও ৫.৬। ৬০ বৎসরে মুসলমান বাড়িয়াছে খুব বেশি রংপুর, পাবনা, মৈমনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলায়, মোট লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা ১১, ৭.১, ১১.৮, ১১.২ এবং যে সকল জেলায় হিন্দু খুব কমিয়াছে অথচ মুসলমান বাড়িয়াছে তাহাদিগের মধ্যে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুরে মুসলমান বাড়িয়াছে শতকরা ৭.৭, ১০.৪, ৭.৯। একমাত্র মধ্যবঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর আধিক্য শতকরা ৯.৩ বাড়িয়াছে। ক্ষয়িষ্ণুতম পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু অধিক দূর হটিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিন্দু-মুসলমান সংখ্যার অসমতার প্রধান কারণ হইলেও হিন্দু-সমাজের অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ের কারণকেও উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের কৃষক

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানপ্রধান ও নমশূদ্রপ্রধান জেলাগুলির অত্যুন্নতি এবং উচ্চ হিন্দুপ্রধান মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সভ্যতা, আচার, নিয়ম ও আদর্শ যে রূপান্তরিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধি হইতে মুক্তি, প্রচুর আমিষাহার, বনজঙ্গল ও জলাভূমির জীবনধারা ও কৃষির বিস্তার, নতূন ঔপনিবেশিক-সুলভ আগ্রহ ও শ্রমশীলতা, বাংলাদেশের পূর্ব অঞ্চলে, যমুনার চরে, পদ্মাতীরে, মেঘনার মোহনায় তাহাকে নূতন করিয়া গড়িতে থাকিবে। সেখানকার মুসলমান বা নমশূদ্র কৃষক যেমন পরিশ্রমী, তেমনিই সাহসী। উন্মত্ত ঝটিকা বা বন্যার আক্রমণে ত্রস্ত না হইয়া সে তাহার ফসল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যমুনা বা মেঘনার চরে হিংস্র পশুর সঙ্গে রাত্রিবাস করে। দক্ষিণ অঞ্চলের সুন্দরবনে ও পূর্ব অঞ্চলে আসামের উপত্যকায় সে কুঠারহস্তে নির্ভয়ে অগ্রসর হয়, নিবিড় জঙ্গল ভূমিসাৎ করিয়া সে রাস্তা বাহির করে, চাষ-আবাদের প্রবর্তন ও বসতি স্থাপন করে। জলে কুমির ও স্থলে বাঘের সঙ্গে তাহার নিরন্তর সংগ্রাম। যেখানে নদীচরে সে শস্য উৎপাদন করে, সেই জনবিরল বিপদসংকুল স্থানে হয়তো স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া বাস করা অসম্ভব, তাই সে দিনের কাজ শেষ করিয়া নির্ভয়ে সীমাহীন পাথারে তরি ভাসায়, নিঃশঙ্কচিত্তে ভগবানের নাম লইয়া সে তুফানকে অগ্রাহ্য করে। তাহার তুলনায় পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের কৃষক অলস, বিলাসী, ও ক্ষীণপ্রাণ।

কিন্তু উদ্যম, সাহস ও লোকবৃদ্ধি যেমন জাতিকে সতেজ রাখে, তেমনই তাহার চাই শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কার। পূর্ব-অঞ্চলে কৃষি উন্নতিশীল, পরিবার লোকবহুল, জনপদও উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু।

কিন্তু সংখ্যা বাড়িলেই কি সম্পদ ও কৃষ্টির পরিপুষ্টি হয়? বরং কৃষক ও বর্গাদারের অপরিমিত সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পদের বিঘ্ন, এবং সমাজের অনৈক্য ও অশান্তির কারণ; সমগ্র প্রদেশে উচ্চ ও শিক্ষিত স্তর অপেক্ষা নিম্ন ও অশিক্ষিত স্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি কৃষ্টিরও অন্তরায়---ধর্ম, জাতি ও বিদ্যাভিমান ভুলিয়া বাঙালি এই নিছক সত্যটি গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই শেষরক্ষা হয়। হিন্দুর উচ্চজাতি সমুদায়ের এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্ব।

উচ্চজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা, নিম্নজাতি ও মুসলমান অর্বাচীন বলিয়া অধিকতর শক্তিমান ও প্রজননশীল

উচ্চজাতিদিগের মধ্যে যেসকল কুপ্রথা তাহাদের বংশবৃদ্ধির অন্তরায়, সেগুলিকে বিনা দ্বিধায় সত্বর বিসর্জন দিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের গণ্ডি সংকীর্ণ এবং বিধবাদিগের সংখ্যা অধিক বলিয়া জীববিজ্ঞান যে নিকট যৌন সম্বন্ধের কুফল ভয় করে, তাহা দেখা দিয়াছে।

হিন্দুর সমাজবিন্যাসে যে শ্রেণি ব্রহ্মণ্য সভ্যতার মাপকাঠি অনুসারে উচ্চ সোপানে রহিয়াছে, তাহার স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষজাতির অনুপাতে কম, এবং যে শ্রেণি নিম্ন সোপান অধিকার করে, তাহাদিগের মধ্যে এই বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। পুরাতন জাতি মাত্রেই অধিকতর সংখ্যায় পুরুষের জন্ম দান করে। ইহা একদিকে যেমন তাহার যুদ্ধবিগ্রহের রক্ষাকবচ, অপরদিকে শান্তির সময় ইহাই আবার তাহার বংশহানি ও ধ্বংসের সূচনা করে। পক্ষান্তরে আদিম জাতিরা—প্রকৃতির সহিত গাছপালা ও মাটির সহিত যাহাদিগের শক্তির সহজ আদান-প্রদান হয়, যাহাদিগের মধ্যে সভ্যতার কৃত্রিমতা ও সমাজশাসনের নির্মম দৃঢ়তা অধিক প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহাদিগের যেমন প্রজনন শক্তি অধিক, তেমনই তাহাদিগের মধ্যে বিবাহযোগ্যা স্ত্রীলোকের অভাব তো দৃষ্টই হয় না, অধিক ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যই দেখা যায়। বাংলার মুসলমানেরা বেশির ভাগই সমাজের নিম্নস্তরে সেই আদিম বীর্যবান কর্মঠ জাতি সমুদায় হইতে উদ্ভূত। একই কারণে তাহাদিগের মধ্যেও বাংলার অতিসভ্য উচ্চজাতির ন্যায় বিবাহযোগ্যা স্ত্রীজাতির সংখ্যাল্পতা দেখা যায় না।

নিম্নে প্রদত্ত তালিকাটিতে উচ্চ ও অনুচ্চ হিন্দু জাতির ও মুসলমানের মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্যার বৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইল।

	প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা	প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের অনুপাতে বিধবার সংখ্যা
সাঁওতাল	৯৮৪	১৩৬
কোচ	৯৪৯	১৪৯
বাউরি	১০১৭	১৯৪
ডোম	৯৬৫	২০৩
নমশূদ্র	৯৬৪	২১৭
মুসলমান	৯৫৮	১৪০
মাহিষ্য	৯৫২	২৪৩
সাহা	৯৫০	১৯৬
বৈদ্য	৯২২	১৫৮
কায়স্থ	৯০১	২০০
ব্রাহ্মণ	৮৪৭	২০০

হিন্দুর বিবাহবিধির সংস্কার জাতিক্ষয় নিবারণের প্রধান উপায়

সমগ্র জাতি ও সম্প্রদায় মিলিয়া বাংলা দেশের প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯২৪। বাংলার উচ্চজাতি তিনটিতেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা এই গড় অপেক্ষা কম। সমস্ত হিন্দুজাতি ধরিলে স্ত্রীলোকের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ২২৬, কিন্তু মুসলমান বিধবার সংখ্যা মোট ১৪০। উচ্চ ও অর্ধোচ্চ হিন্দু জাতিগুলি বিধবাবিবাহ নিষেধ করিয়া স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক সংখ্যাল্পতার কুফল আরও অধিক প্রকট করিয়াছে।

মুসলমানদিগের মধ্যে বহু বিধবা পুনরায় বিবাহ করে। হিন্দুজাতি সমুদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ অনেক কম প্রচলিত। অনেক জাতির মধ্যে বিবাহের জন্য কন্যাকে উচ্চপণে ক্রয় করিতে হয় বলিয়া বহু পুরুষ যৌবন অতিক্রমের পূর্বে বিবাহ করিতে পারে না।

বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য বহু পুরুষ প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত শহরে উপার্জন করিতে বাধ্য হয়। সেখানে চারিদিকেই নিঃসঙ্গ যুবার পাপপথের প্রলোভন রহিয়াছে, অথচ তাহার পক্ষে সমাজ-শাসনের কোনো বাধা বা নিষেধ নাই। বিবাহের জন্য অল্পবয়স্ক বালিকাকেও সে গ্রহণ করে। তাহাও বংশবৃদ্ধির অন্তরায়। বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও পণপ্রথা বাস্তবিক পক্ষে অনুচ্চ হিন্দুজাতির মধ্যে পাপাচার, বন্ধ্যাত্ব ও ভ্রূণহত্যাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছে। সব দিক হইতেই জাতিক্ষয়ের পথ উন্মুক্ত।

তাহা ছাড়া বিবাহের গণ্ডি সংকীর্ণ হওয়াতেও বহুবিবাহের প্রচলনে, পুরুষের মধ্যে অবিবাহিতেরও সংখ্যার অনুপাত মুসলমান অপেক্ষা অধিক।

উচ্চজাতির আত্মঘাত

উচ্চজাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধীয় রাঢ়ি, বারেন্দ্র, বৈদিক,* ও অন্যান্য নানাপ্রকার বিভাগ-বর্জন অত্যাবশ্যক। বিধবা-বিবাহ প্রচলনও অতি প্রয়োজনীয়। একশত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশ জন বিধবা, কিন্তু মুসলমানের মধ্যে মাত্র ১৪ জন। উচ্চ হিন্দুজাতির মধ্যে বৈদ্যগণ সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা কম। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে বিবাহের পাত্রাপাত্র বিচারের সংকীর্ণতা সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর।

প্রাচীন এথেনীয়গণ ও বাঙালিদের ধ্বংসের তুলনা

যেভাবে বাংলার উচ্চজাতিগুলি এই যুগে প্রতিকূল আবেষ্টনের সহিত সংগ্রামে হটিয়া গিয়াছে, যেভাবে তাহাদিগের আদিম বাসভূমি অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহারা যেভাবে দারিদ্র্য ও ব্যাধির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাতে নির্দেশ করা যায় যে, সমাজ-সংস্কারের একটা চরম চেষ্টা না করিলে তাহাদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পুরাতন এথেনীয়দিগের সহিত তাহাদিগকে অনেক বিদেশি পণ্ডিত তুলনা করিয়াছেন। এথেনীয়গণ তাহাদের শেষ দশায় ম্যালেরিয়ার দ্বারা জর্জরিত হইয়াছিল এবং দাসশ্রেণি ও রোমক বর্বরগণ দেশ ছাইয়া ফেলিয়া তাহাদিগের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল। তাহাদিগেরই মতো, বাংলার যখন চারিদিকে অনুচ্চ হিন্দু অশিক্ষিত মুসলমান নূতন সম্পদ ও রাষ্ট্রবলে বলীয়ান হইয়া তাহাদিগের পুরাতন অধিকার করায়ত্ত করিতে থাকিবে তখনই পুরাতন ভদ্রলোকশ্রেণি ম্যালেরিয়ার দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, অসংখ্য বিধিনিষেধের দ্বারা

শতধাখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া, দারিদ্রমোচন ও অন্নসংস্থানের উপায় উদ্ভাবনে অশক্ত হইয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইবে। এই ভীষণ অসাম্যমূলক সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতায় যাহাদিগের বীর্যবত্তা ও জীবনীশক্তি কম, শিক্ষা ও শোভনতার কৃত্রিম বর্ম তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না। সংখ্যায় যাহারা অধিক, কায়িক পরিশ্রম ও শিল্পকৌশলে যাহারা গরীয়ান, রাষ্ট্রবলে যাহারা বলীয়ান ও আত্মম্ভরি, তাহারা ইহাদিগের ধ্বংসের জন্য অনুশোচনা করিবে না, হইলই বা তাহারা বংশপরম্পরা হিসাবে বাংলার সমস্ত প্রাচীন গৌরবের উত্তরাধিকারী, হইলই বা ইহারা তাহাদিগেরই বংশধর যাহারা বাংলাদেশ হইতে সমগ্র প্রাচ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাহারা নব্য ন্যায় ও বিচিত্র মরমিয়া সাধনের অগ্রদূত, যাহাদিগের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিশ্বচিন্তার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এবং যাহারা এই আধুনিক কালেও ভারতের নবচিন্তা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে গুরু ও নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছেন। এসকল কথা সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিমন্তের দল কি ভাবিয়া দেখিবে?

শিক্ষা সংস্কার এবং ভদ্রলোকের ভূমি-কর্ষণ ও কায়িক শ্রম স্বীকার

তাই বলিয়াছি উচ্চজাতির সমাজ-সংস্কার বাংলার কৃষ্টির ধারা রক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। নূতন রাষ্ট্রবিন্যাসে জমিসংক্রান্ত আইনকানুন অচিরেই পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা। যে-কোনো কৃষিপ্রধান, লোকবহুল দেশে এক অলস কর্মবিমুখ শ্রেণি শুধু স্বত্বাধিকারের অজুহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে না। ইতিপূর্বেই বাংলার যেসব জেলায় মুসলমান বা নমশূদ্রের প্রাধান্য, কৃষিকশ্রেণি নির্ভীক ও পীড়ন অসহিষ্ণু, সেসব জেলায় জমিদার ও জমিদারের আমলাশ্রেণির সংখ্যা কম দেখা গিয়াছে।

শতকরা জমিদার ও আমলার সংখ্যা-অনুপাতে কৃষকের সংখ্যা

জেলা	সংখ্যা
রংপুর	২৬৫
দিনাজপুর	২২৬৮
ত্রিপুরা	২১৭৪
ঢাকা	১৭৪৬
নোয়াখালি	১৫৪৪
যশোহর	৯৯৪
বর্ধমান	৯৩৩
বাঁকুড়া	৪১৯

বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় নিরীহ প্রজার পোষ্য অনেক আমলা। জমিদার গ্রাম ত্যাগ করিয়া তাহাদিগেরই উপর খাজনা আদায়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। এইসব জেলায় কৃষিকার্যেও আদিম মুণ্ডা ও সাঁওতাল জাতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ভবিষ্যতে বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানি হেতু আদিম জাতির বাহুবল চাষবাসে একটা বড়ো রূপান্তর আনিবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড়ো রূপান্তর আসিবে ভূমির স্বত্বাধিকার বিষয়ে। ভাগবিলি, জোতস্বত্বের রেহান ও ভোগদখল এবং ভূমির লেনদেন বিষয়ে

সর্বপ্রথমেই সংস্কার অতি প্রয়োজনীয়। বাংলা দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণি ভাগচাষের আশ্রয়ে বিনা পরিশ্রমে, বিনা মূলধনে, বিনা তত্ত্বাবধানে, জোতস্বত্ব ভোগ করিতেছে। তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের জোতদার কৃষকও শ্রমবিমুখ, ভদ্রলোক সাজিয়াছেন। তিনিও জমি বিলি করেন, মজুর লাগান, ভাগে ফসল ভোগ করেন। পূর্ব অঞ্চলে ভূমিস্বত্বের অংশীকরণও জমির ব্যবস্থায় কম অসুবিধা আনে নাই। ভূমিস্বত্বের সঙ্গে ভূমিকর্ষণের দায়িত্ব নিবিড়ভাবে জড়িত। এ দায়িত্ব বাংলার ভদ্রলোকশ্রেণি গ্রহণ করে নাই। বাংলার ভবিষ্যৎ আইনকানুন এ দায়িত্ব স্বীকার না করিলে যে শ্রেণি এখন ভূমধ্যকারী তাহাদিগকে ধীরে ধীরে অথবা জনসমাজ-শানিত আইনখড়্গার এক কোপে বিনষ্ট হইতে হইবে। সমাজ-সংস্কৃতি না হইলে মাঠের কাজে, কারখানায়, দোকানে, আড়তে ভদ্রলোকশ্রেণি হটিয়া যাইবে। কলিকাতা প্রভৃতি নগরে মাড়োয়ারি ও ভাটিয়ার আধিপত্যের মূল কারণ, বাঙ্গালার ভদ্রলোকের পরিশ্রমকাতরতা। তাই কলিকাতা নগরীর বিরাট সম্পদ বিদেশিরই করায়ত্ত। নব-নাগরিক সভ্যতা বিদেশির রোশনাই,—'পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।' মূলকথা এই—যে কায়িক পরিশ্রম এতদিন বাঙালি ভদ্রলোক অভদ্রোচিত জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিরর্থকতা ও বিফলতার যুগে তাহাকেই জীবনরক্ষার একমাত্র সহায় ও সম্বল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজনীতি নহে, মানবিকতাই হরিজন আন্দোলনের মূলশক্তি

শুধু নিজের ঘরে, পরিবারে ও গোষ্ঠীতে সংস্কৃতি হইলে চলিবে না। উচ্চজাতির সহিত প্রতিবেশী অনুচ্চজাতি ও মুসলমানের সামাজিক আদানপ্রদান, আচারনিয়মেরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। মহাত্মা গান্ধি জীবন পর্যন্ত পণ করিয়া যে হরিজন আন্দোলন প্রবর্তিত করিয়াছেন, রাষ্ট্রিক সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া যদি উহা সত্যসত্যই উদারতার নীতি ও মানবিকতার ভিত্তিতে বাংলা দেশে রাজনীতির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া প্রসার লাভ করে, তবেই রক্ষা। যেসব জাতি এখন অস্পৃশ্য রহিয়াছে, যেমন ডোম, হাড়ি, কেওড়া, লালবেগি, মেথর, ভুঁইমালি, চামার প্রভৃতি—তাহাদিগকে বাসগৃহের অন্দরে এবং মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার দান করিতে হইবে। তাহাদিগের মধ্যে বাংলা দেশ জুড়িয়া একটা পরিচ্ছন্নতার আন্দোলন জাগাইতে হইবে। সকল অনুচ্চ ও পতিত জাতির, পাড়ায়-পাড়ায়,—যেখানে, এখন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলে জাতিচ্যুতির ভয় আছে, সেখানে,—নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। দেশ জুড়িয়া মদ্যপান নিবারণ, সর্বজনীন পূজা, সর্বজনীন জলাচরণ, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মারফতে তাহাদিগের সংস্কার ও অখাদ্যনিবারণ, দীক্ষাদান—এইসকল উদ্দেশ্যে বাংলার উচ্চজাতীয়গণকে সকল কপটতা ত্যাগ করিয়া গভীর আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সহিত মূঢ়, মূক, অশুচি নারায়ণের নামে কাজে নামিতে হইবে।

বাংলা দেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া পার্বত্য, যাযাবর ও নীচ অনার্য জাতির শিক্ষা ও সংস্কারের ভার লইয়াছে। কত অনার্যশ্রেণি ব্রাহ্মণ সভ্যতাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে এই সংস্কারের বহু দৃষ্টান্ত আছে। হিন্দুর সামাজিক স্তর-বিভাগের উচ্চ-নীচতা এই ধীর সংস্কার-পদ্ধতির

বিভিন্ন ক্রম বা পর্যায় নির্দেশ করে। দেশ যখন স্বাধীনতা হারাইল, তখন হইতেই এই সহজ শিক্ষা ও সংস্কারকার্য বাধা পাইল। তখন হইতেই যতপ্রকার অস্বাভাবিক স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের সূচনা। নূতন শিক্ষা ও প্রজাতন্ত্রের দিনে হিন্দু-সভ্যতার এই প্রচ্ছন্ন প্রচারশক্তিকে পুনঃপ্রবুদ্ধ করিয়া দেশময় যে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ অনুচ্চ বা পতিত জাতি আছে, তাহাদিগকে সমাজের ক্রোড়ে টানিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রিক নির্বাচন-প্রণালী যে নূতন ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে, তাহা উদারতর নীতি ও অভিনব সমাজবিন্যাস ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে।

বিবাহ-সংস্কার

ধর্মগত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত সর্ববিধ সামাজিক বিচ্ছেদকে প্রশ্রয় না দিয়া সমগ্র বাংলা দেশে এমন একটা শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আনিতে হইবে যাহাতে মুসলমান, মাহিষ্য, রাজবংশি ও নমশূদ্র বাংলার কৃষ্টিকে নিচের দিকে না টানিয়া বরং তাহা যুগপরম্পরার্জিত জাতির প্রগতিরই পুষ্টি সাধন করিতে পারে। হিন্দুজাতির মধ্যে নিম্নশ্রেণির উন্নয়ন ও সামাজিক অধিকার প্রবর্তন ও উচ্চ-নীচ জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনের গণ্ডির বিস্তার, সর্বপ্রকার কায়িক শ্রম ও শিল্পানুশীলনের অস্পৃশ্যতাবর্জন ও পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ,—দূরদৃষ্টিতে দেখিলে, তাহা শুধু হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার উপায় নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির আত্মরক্ষার সুনিশ্চিত পথ।

ধর্মান্তর গ্রহণ ও বিবাহ রেজিস্ট্রি

বাঙালি সমাজে কী হিন্দু কী মুসলমানের আর-একটি আত্মরক্ষার পথ হইতেছে সরকারি দপ্তরে বিবাহ ও ধর্মান্তর গ্রহণ রেজিস্ট্রি করা। পূর্বে রাষ্ট্র আমাদের দেশের সমাজবিন্যাসে অধিক হাত দেয় নাই। আধুনিক শাসনব্যবস্থায় ধর্মই ভোট দিবার অধিকার দিতেছে। বাঙালি বলিয়া নয়, হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া, আমরা রাষ্ট্রিক অধিকার পাইয়াছি। এই পদ্ধতি জাতীয়তা বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু যখন ইহাকে অবলম্বন করিতেই হইয়াছে, তখন ধর্মান্তরগ্রহণকে একটা রাষ্ট্রিক অনুষ্ঠান বলিয়া মানিতেই হইবে। কোনো ধর্ম পরিবর্তন সরকারি দপ্তরে রেজিস্ট্রি না হইলে মঞ্জুর হওয়া উচিত হইবে না। ইহাও আইন হওয়া উচিত যে অন্তত ১৮ বৎসর পূর্ণ না হইলে ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কোনো পুরুষ বা নারীর থাকিবে না। এমনকি, ওই বয়সটি বাড়াইয়া ২১ বৎসর করিলেও অসংগত হইবে না।

দ্বিতীয়ত, নূতন শিল্প-প্রণালী ও নাগরিক জীবন যেভাবে আমাদিগের পঞ্চায়েত শাসন, গোষ্ঠী ও জাতির প্রভাব ও একান্নবর্তী পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ নষ্ট করিয়া দিতেছে সেক্ষেত্রে যৌন জীবন ও পারিবারিক জীবনের শুদ্ধি রক্ষা কল্পে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহে রেজিস্ট্রির প্রচলন হইলে বহুবিবাহ ও অবৈধ যৌন সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব হইবে। পাট ও তুলা সম্বন্ধীয় নূতন শিল্প-প্রধান গ্রাম পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে এত অধিক তারতম্য দেখা দিয়াছে যে, আইনানুমোদিত দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এখানে পারিবারিক ও সামাজিক শীলতা রক্ষা করা সুকঠিন।

নারীহরণের প্রতিরোধ

একই ধর্মানুলম্বী পতি ও পত্নী হইলে নারীর ১৪ বৎসরে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন আইনবিরুদ্ধ হইবে না। কিন্তু পতি বা পত্নী বিবাহের পূর্বে অন্য ধর্মাবলম্বী থাকিলে ধর্মান্তর গ্রহণ এবং বিবাহ-সম্বন্ধের সম্মতির বয়স অন্তত ১৮ বৎসর হওয়া উচিত। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের অনেক বিভাগে বিবাহে সম্মতির বয়স ১৮। অন্তর্জাতি-বিবাহেও সম্মতির বয়স ১৮ হওয়া উচিত। এখনকার আইনে নারীহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত কেবল পুরুষ খালাস পাইতে পারে, যদি হৃতা বা অত্যাচারিতা নারীর বয়স ১৬ বৎসর বা ততোধিক হয় এবং তাহার সম্মতির প্রমাণ হয়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের মতো, সম্মতির বয়স বাড়াইয়া অন্তত ১৮ বৎসর করা উচিত এবং যদি প্রলুব্ধক বিবাহিত পুরুষ হয় তাহা হইলে তাহার ইতালির আইনের মতো শাস্তিবিধান নিতান্ত কর্তব্য। এই উপায় অবলম্বন করিলে একদিকে যেমন নারী-রাখা প্রভৃতি দুর্নীতিমূলক অনুষ্ঠান ও বহুবিবাহ সমাজে স্থান পাইবে না, অপরদিকে বাংলার সমাজের প্রধান কলঙ্ক নারী-নির্যাতনেরও অনেকটা প্রতিকার হইবে। বাংলায় ক্রমবর্ধমান নারীহরণের তালিকা সামাজিক রীতি-নীতির ব্যর্থতার নির্মম উপহাস। দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনে রেজিস্ট্রির প্রয়োজন হইলে নারীহরণ অনেক কমিবে। বিবাহের রেজিস্ট্রির সময়ে ধর্ম সম্বন্ধে কোনোরূপ নির্ধারণ প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর স্বকীয় ধর্ম ও নিজধর্মগত আইন বজায় রাখিবার স্বাধীনতা থাকিবে। জাপানে ও কানাডায় এইপ্রকার বিধিব্যবস্থা অনেকটা সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণের উপায় হইয়াছে। নারীহরণ সম্বন্ধে তালিকা পড়িলে জানা যায় যে, নির্যাতিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৩৭-৩৮ সালে হিন্দু নারীর নির্যাতনের মোট অভিযোগ সংখ্যা ছিল ১৪০, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের নারীর নির্যাতনের মোট সংখ্যা ছিল ৪১০। মুসলমান নারীহরণ সর্বাপেক্ষা বেশি এবং যেসকল জেলা মুসলমানপ্রধান তাহারা এই অপরাধে অধিকতর কলঙ্কিত। বিবাহে রেজিস্ট্রির প্রচলন হইলে নারীকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হরণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অথবা স্বগৃহে পৈশাচিক অত্যাচার অনেক কমিয়া যাওয়া সম্ভব। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে জর্জ সৈয়দ আমীর আলির প্রস্তাবের কথা তুলিয়াছেন যে, দলবদ্ধভাবে যাহারা নারী ধর্ষণ করে তাহাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত। নতুবা এই দুর্বৃত্ততার উচ্ছেদ-সাধন করা বড়োই কঠিন। অস্ট্রেলিয়াদেশে কিছু দিন পূর্বে গুণ্ডারা দল বাঁধিয়া নারীদিগের উপর অত্যাচার করিত। ওই দেশ আইন পরিবর্তন করিয়া নারীধর্ষণের অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ড দিতে আরম্ভ করে, তাহাতেই এইরূপ কুকর্ম একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পুরাতন মুসলমান নীতিশাস্ত্রে এইরূপ নারীধর্ষক ব্যভিচারীর দণ্ড ছিল লোষ্ট্র নিক্ষেপে প্রাণবধ। সুতরাং যে ক্ষেত্রে মুসলমান নারীরাই অধিকতর নিপীড়িত সে ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের নারীর মর্যাদা ও পারিবারিক জীবনের শুচিতা, শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে নারী বিষয়ক অপরাধ সম্বন্ধে অতি কঠোর আইনকানুন প্রবর্তন করিলে সবদিক রক্ষা হয়।

পারিবারিক শুচিতা ও নারীর মর্যাদা

বাংলার কোনো এক জেলায় যদি একটা নারী লাঞ্ছিত হয় এবং অপরাধী যদি খালাস পায় বা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে ইহাতে সকল সম্প্রদায়েরই পারিবারিক

নীতির একটি গ্রন্থি অলক্ষিতে শিথিল বা ছিন্ন হয়, এবং সমগ্র সমাজেরই অকল্যাণ হয়। গত বৎসরে নারী-নির্যাতনের মোট ৪১০টি মোকর্দমার মধ্যে শাস্তি হইয়াছে কেবল ১২৭টাতে; খালাস তাহা অপেক্ষা বেশি,—১৪৮টাতে। বাকিগুলা এখনও বিচারাধীন বা অন্য কিছু। হিন্দু নারীদিগের অভিযোগ ছিল ১৪০টা; তাহাতে সাজা হয় ৫২টাতে, আসামিরা খালাস পায় ৫৩টাতে। এতগুলি অভিযুক্ত লোকের খালাস কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষেই হিতকর নহে। মুসলমানের শিক্ষা ও নীতি যতই এক বিবাহের পবিত্রতা ও সংযমের দিকে অগ্রসর হইবে, যতই মুসলমান-নারীর শিক্ষা ও প্রগতির সঙ্গে তাহার নৈতিক অধিকার পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, ততই পারিবারিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের আদর্শের বৈষম্য কমিতে থাকিবে এবং তখন হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া সমাজ-রক্ষা ব্রতে এক প্রাণে উদ্যোগী হইতে পারিবে। বহুবিবাহ-বর্জন ও দাম্পত্য-সম্বন্ধ রেজিস্ট্রিকরণ ও নারী-ধর্ষককে প্রাণদণ্ড দান—উভয় সম্প্রদায়ের নারীর প্রগতি ও সামাজিক কল্যাণ সহজ করিয়া দিবে। অন্যদিকে ধর্মান্তরগ্রহণ আইনানুমোদিত হইলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যার পরিমাণ লইয়া যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে তাহারও নিরাকরণ হইবে। উভয়ের অবাধ লোকবৃদ্ধি বাটোয়ারা হিসাবে কিছু আপেক্ষিক রাষ্ট্রিক সুবিধা আনিতে পারিবে সত্য, কিছু তাহা সাময়িক হইবে। লোকবাহুল্য কী হিন্দু কী মুসলমানকে আর্থিক হিসাব আরও হীন ও আরও দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া বরং অচিরেই রাষ্ট্রিক অধিকার সংকোচ করিয়া দিবে।

হিন্দু-মুসলমানের একই মাটি ও জল

বাংলার নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রে মুসলমানের প্রাধান্যকে ভয় করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক বৈষম্যকে বাড়াইতে দেওয়া বাঙালির আত্মঘাতের পথ। রাজনীতিজ্ঞের দূরদর্শিতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। ছয় শতাব্দীর নদীপথের গতি ও তজ্জনিত জাতীয় অধোগতিকে রাষ্ট্রিক নিয়মকানুনের দ্বারা বাঙালি কী করিয়া লঙ্ঘন বা রোধ করিবে? বরং প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মানিয়া লইয়াই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া বিবেচনার কাজ। সাহিত্যের ভিতর দিয়া, সামাজিক ভাব-বিনিময়ের দ্বারা, মহরম অথবা জন্মাষ্টমী পার্বণে, এবং মুসলমানের সত্যপীর ও হিন্দুর বুড়ি মনসা ও শীতলার পূজা-অনুষ্ঠানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগদান করিয়া সমান উদাসীনতার সহিত ইতিহাস তাহাদের জয়-পরাজয়ের কাহিনি পাশাপাশি স্থান দিয়াছে। এমনকি নামকরণে হিন্দু-মুসলমান প্রথা একযোগে গ্রহণ করিয়া দুই সম্প্রদায়ের সহজ, আন্তরিক মিলন আনিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমান দুই-ই এক মাটি ও জলে জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে।

বিশ্ব-প্রকৃতি সমান স্নেহে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। ভবিষ্যৎও নিরপেক্ষভাবে তাহাদিগকে আশীর্বাদ ও অভিশাপ দিবে। মন ও শরীরের গঠন হিসাবে মুসলমান ও হিন্দুর কোনো পার্থক্যই নাই। কারণ অনুচ্চ হিন্দুজাতি সমুদয় হইতেই বেশির ভাগ মুসলমান ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুরা সমাজ-বিন্যাস হইতে পৃথক হইয়াছে। এই কারণে যাহাতে রাষ্ট্রিক প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা পরস্পরের বিরোধ না বাড়ায়, তাহার জন্য স্বার্থানুসন্ধিৎসু মোল্লা বা পণ্ডিতের হস্তে সমাজের শিক্ষাদীক্ষার ভার না দিয়া বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে একটা উদার সর্বজনীন ধর্মবুদ্ধির অনুশীলন করিতে হইবে।

বিজয়ার সময় মুসলমান প্রবীণ হিন্দুর চরণধূলি লইবে, ইদের সময় হিন্দু-মুসলমানের পার্বণে যোগদান করিয়া সকলকে প্রীতি-আলিঙ্গন করিবে। পরস্পরের আদবকায়দা,

বিধিনিষেধ পালন শুধু শিষ্টাচারসম্মত নয়, ধর্মের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ না ঘুচাইতে পারিলে, পূর্ববঙ্গ ও মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের যে প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক ব্যবধান বিংশ শতাব্দীতে ক্রমশ বাড়িতে থাকিবে, তাহাই বাঙালির বৈশিষ্ট্য রক্ষার ঘোর অন্তরায় হইবে।

অন্যদিকে যে অনুচ্চ মুসলমান ও অবনত হিন্দুশ্রেণি সমুদায় বাংলার চিন্তা ও সাধন, কৃষ্টি ও আচারকে অধোমুখী করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের সংস্কার ও উন্নতিসাধনে শুধু হিন্দু বা মুসলমান-সমাজের নহে, সমগ্র বাংলারই গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে।

বাঙালি যুগনির্দেষ্টা, নূতন অবদানের অগ্রদূত

পলি-পড়া উর্বরা, তরল ভূমিতে বাঙালি জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙালির সভ্যতা সর্বাপেক্ষা পরিবর্তনশীল। বাংলার পূর্ব-ইতিহাসের সাক্ষী ইষ্টক-নির্মিত মন্দির, প্রাসাদ কত উঠিয়াছে, কত ভাঙিয়াছে, পলি-পড়া ভূমিতে অথবা নদীগর্ভে তাহার চিহ্নমাত্রের নির্দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইরূপ বাংলার সভ্যতাও অচল অটল নহে, গঙ্গার ঢেউয়ের মতো তাহা নিত্যনূতন সৃষ্টি করিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। যুগে যুগে চিন্তার নূতন ধারা, ধর্মের নূতন আদর্শ, শিল্পকলার নূতন রীতি, সমাজের নূতন নিয়ম ও বিন্যাস গ্রহণ করিয়া বাঙালি চিরকালই ভারতের সভ্যতার পথ নির্দেশ করিয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত ভারতের ইতিহাসে বাঙালির দান ও অবদানের কথা কোনো বাঙালির অবিদিত আছে? বাঙালির কী উচ্চ, কী নীচ জাতির রক্ত যে বিভিন্ন আর্য-অনার্যের রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহাও বাঙালির প্রগতি ও বিপ্লববাদের সহায়। এমন মিশ্রিত জাতি ভারতবর্ষে আর কোথায়? দুই হাজার বৎসর পূর্বে বাঙালি ব্রাহ্মণ বেদবিরোধী বৌদ্ধভাব সর্বপ্রথম গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে নূতন পথে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বাঙালির সর্বজনীন সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্ম উচ্চনীচ হিন্দুজাতির সহিত মুসলমানকে একসূত্রে বাঁধিয়া নূতন সাম্যমূলক সমাজ-বিন্যাসের সূচনা করিয়াছিল। মাত্র দেড় শত বৎসর পূর্বে রাজা রামমোহন রায় শাক্ত ও সুফি, ঔপনিষদিক ও ঈশাহি সাধন সম্মিলনে বিশ্বজগতে যে এক নূতন সর্বজনীন ধর্মসাধনের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। রামমোহনের ধর্ম ও জাতি মিলনের বিরাট কল্পনার তুলনায় বর্তমান ক্ষুদ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতা কত হীন, কত জঘন্য, কত অবাঙালি। বাংলার যাহা লৌকিক ধর্মসাধন, যাহার গুরু শত শত আউল-বাউল আজও কৃষকের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাও যে মানুষকে পরম পুরুষ বা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে,—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বিশ্বের কোনো ধর্মে মরমীর অমন রহস্যময় আত্মবিশ্বাসের সাহস দেখা যায় নাই। বাঙালির ভবিষ্যতের সমস্যা, এই একইপ্রকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সমাজ-গঠনের সমস্যা। বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক সুবিধা-অসুবিধায় বিমূঢ় না হইয়া, স্বল্প সময়ের ধর্ম ও সমাজের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত না হইয়া, বাঙালি যদি স্থিরচিত্তে ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে আপনার যুগপরম্পরালব্ধ সাধনের গুরুদায়িত্ব বরণ করিতে পারে, তবেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে, উচ্চ ও নীচ জাতির মিলনে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ ও বর্ধিষ্ণু পূর্ববঙ্গের সম্মিলনে একটি অপূর্ণ সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহাতে হয়তো গৌড় সপ্তগ্রাম কলিকাতার নাগরিক সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য ও সমারোহ না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা শ্রম. সাহস, ও

হস্ত-কৌশলের সাহায্যে অধিকতর সতেজ, লোকবৃদ্ধির সাহায্যে অধিকতর বলীয়ান এবং নূতন মৈত্রী স্থাপনের সাহায্যে অধিকতর গরীয়ান হইবে, সন্দেহ নাই।

বাঙালির মানবিকতা

বাঙালির এই নূতন নির্নিমেষ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি চাই। নূতন বাংলা দেশ ও নূতন বাঙালির সভ্যতা গড়িবার যুগে বাঙালি যদি অল্পদর্শী হইয়া সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিরোধকে বড়ো করিয়া দেখে, তাহা হইলে তাহার শতযুগের সাধনা ব্যর্থ হইবে এবং এই শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলা ভূমিতে বাঙালিজাতি শিক্ষায় ও দীক্ষায় সবরকমে অবাঙালি হইবে। বাংলার আগামী যুগ সমাজ-সংস্কৃতির যুগ। জাতি, কৃষ্টি ও ধর্মসমন্বয়ের সূচনা না হইলে, একটা ব্যাপকতর জাতীয়তার অভাবে বাংলার রাষ্ট্রিক আন্দোলন পদে-পদে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হইবে। এমনকি রাষ্ট্রই তখন সমাজের শান্তি ও সাধনার ঘোর পরিপন্থী হইবে। অনুন্নতের সংখ্যা ও কর্মপরায়ণতার সহিত উন্নতের বুদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ শক্তির সংযোগ চাই। তাহা যদি সহজ বুদ্ধি ও সাধারণ সামাজিক রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতার ফলে না আসে, তবে আমাদিগকে কবির, রামানন্দ ও চৈতন্যের আন্দোলনের মতো কোনো ভবিষ্যৎ যুগ প্রবর্তনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তবেই প্রকৃতির অভিশাপকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আমরা অন্তরের সম্পদে মহত্তর বাঙালি সমাজ ও সভ্যতা গড়িতে পারিব নূতন কোনো নদীধারাকে অবলম্বন করিয়া নূতন সমুদ্রের মোহনায়। বাংলা দেশ ও তাহার দেবতা, দুই-ই যে 'নিতুই নব'।

বাঙলা ও বাঙালি ঃ ১ বৈশাখ ১৩৪৭/(১৯৪০)।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

বাংলার অধোগতি ও অব্যবস্থা

দারিদ্র্যের পরিমাণ—বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের এই প্রভেদ যে বিজ্ঞান বহু ও বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করিয়া মূল সূত্র ও সাধারণ নিয়ম বাহির করে এবং তথ্য সমুদায়ের আলোচনার মাপকাঠির সাহায্যে বিশিষ্ট শক্তির বিচার ও গতিনির্ধারণ করে। এ কথা অর্থ-বিজ্ঞানেও খাটে। বরং অর্থ-বিজ্ঞান সমাজবিদ্যার অন্তর্গত বলিয়া আর্থিক অভাব ও শক্তির আলোচনা মানুষের সুখদুঃখের রং-এ বিচিত্র ও আত্মীয় হয়, মানুষের আদর্শের রেখাপাতে গভীর, মর্মস্পর্শী হয়।

ভারতবর্ষ যে অভাবগ্রস্ত তাহা সকলেই জানে বা অনুভব করে। অর্থ-বিজ্ঞানের কাজ হইতেছে এই অভাব বা দুর্দশার পরিমাপ করা, তাহার ফলাফল অন্তরের অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া বাস্তব জগতের মানদণ্ডে পরখ করা, এবং অভাব বা দুর্দশা মোচনের ব্যবস্থা নির্দেশ করা।

পরিমাপ করিতে যাইলেই সংখ্যার আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং অর্থ-বিজ্ঞান পদার্থ-বিজ্ঞানের মতই যে দ্বিধা ও সন্দেহ-হীন বস্তুতান্ত্রিক হইতেছে তাহা সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্যে। এ দিকে অর্থ-বিজ্ঞানের বিষয়ই হইতেছে মানুষের অভাবের সঙ্গে, তাহার সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে অশন বসন প্রভৃতি বা ব্যবহারে যাবতীয় উপকরণের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ধারণ।

লোকবাহুল্যের মাপকাঠি—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য সবদেশেই সব কালেই অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতবর্ষের অভাব অনটনের আলোচনা করিতে গেলেই গত শতাব্দীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিবিস্তারের অনুপাতের আলোচনা গোড়াতেই করিতে হয়। আকবরের মৃত্যুর সময় ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল আন্দাজ দশ কোটি। গত দিন শতাব্দীতে লোকসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৎসর	লোক সংখ্যা কোটী — লক্ষ	লোকবৃদ্ধির হার
১৬০০	১০ — ০	—
১৭৫০	১৩ — ০	—
১৮৫০	১৫ — ০	—
১৮৭২	২০ — ৬০	—
১৮৮১	২৫ — ৪০	১.৫
১৮২১	২৮ — ৭০	৯.৬
১৯০১	২৯ — ৪০	১.৪

বৎসর	লোক সংখ্যা কোটী — লক্ষ	লোকবৃদ্ধির হার
১৯১১	৩১ — ৫০	৬.৪
১৯২১	৩১ — ৯০	১.২
১৯৩১	৩৫ — ৩০	১০.৬
১৯৩৫	৩৭ — ৭০	৬.৮

জেনেভাতে এক বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে অধ্যাপক ইষ্ট নির্ধারণ করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভরণপোষণের জন্য অন্তত আড়াই একর জমির প্রয়োজন। প্রাচ্য জগতে উত্তাপ ও সিক্ততা হেতু মানুষের আহার্য কম এবং মরসুম বৃষ্টির প্রভাবে জমি অনেক অঞ্চলেই ২/৩ বার পর্যন্ত ফসল উৎপাদন করে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের কৃষির আলোচনা করিয়া আমরা একটা সাধারণ মাপকাঠি গ্রহণ করিতে পারি যে প্রত্যেক পরিবারের অন্তত ৫ একর করিয়া জমির প্রয়োজন। চীনদেশেও ৫/৬ একরের কমে কৃষক পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। ভারতবর্ষে গড়পড়তা পরিবারের সংখ্যা ৪.২ এবং চীনে ৫.৪ জন। ইহা হইতে আমরা এই নির্দেশ করিতে পারি যে অন্তত জন পিছু ১ একর চাষের জমির প্রয়োজন এবং চীন ও ভারতবর্ষের লোকবাহুল্যের সূচক সংখ্যা হইবে, ১ একর জমিতে প্রতি প্রদেশের লোক পিছু আবাদী জমির দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাই।

প্রাচ্য জগতের লোকবাহুল্য

দেশ	লোক সংখ্যা কোটী	লক্ষ	অবাদী জমি মোট (১০০০,০০০)	জন-প্রতি	লোকবাহুল্যের (ইষ্ট) সূচক সংখ্যা	লোকবাহুল্যের সূচক সংখ্যা (পরিবর্তিত)
জাপান	৬	৬৩	২৩.৯	০.৩৬	৬.৯৪	২.৮
চীন	৪৫	০	২০৮	০.৪৪		২.৩
ভারতবর্ষ	৩৪	৫০	২৯৮.১	০.৭৮	২.৮	১.৩
সোভিয়েট রাশিয়া	২৬	৫৭	৭০০.০	৪.২	০.৫৯	০.২৪
আমেরিকা যুক্ত-রাজ্য	১২	৫০	৪১৩.২	৩.৩	০.৭৭	০.৩০
কানাডা	১	৩	৩৯৯.০	২৮.৯	০.০৮	০.০৩

নিরন্নের সংখ্যা—আবাদী জমির ন্যূনতা হইতে লোকবাহুল্যের একটা ধারণা হইলেও খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণ হইতে উহার বিচার আরও সুস্পষ্ট হইবে। ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনের হার তুলনা করিলে দেখা যাইবে, যে দেশে ক্রমশ চাষের জমি ও মোট খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও লোকসংখ্যা ও খাদ্য জোগানের নির্ঘণ্টের বিয়োগসংখ্যা ক্রমশ কমিতেছে, ইহা দেশের খাদ্য জোগানের অবনতিরই সূচনা করে। বিশেষতঃ গত ৪ বৎসর হইতে লোকসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইলেও খাদ্য-শস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ আগেকার বৎসর হইতে ১৯ লক্ষ ও ৭ লক্ষ টন কমিয়াছে। ১৯৩৪ সালেও ৮ লক্ষ টন উৎপাদন কম হইয়াছে। গম উৎপাদন ১৯৩২ সালে কমিয়াছে,

কিন্তু এই কয় বৎসর কিছু বাড়িতেছে। বাংলাদেশে সুবৎসরেও আমাদের দেড় লক্ষ টন ধানের পরিমাণ কমতি, তাহা বর্মা হইতে আসে।

এক দিকে যাবতীয় খাদ্যশস্য, দুধ মাছ প্রভৃতি ধরিয়া, খাদ্যশস্যের আমদানি রপ্তানি ধরিয়া এবং বীজশস্য ও অপচয়ের হিসাব করিয়া এবং অপরদিকে জনপ্রতি অবশ্য গ্রহণীয় আহার্যের হিসাব করিয়া আমি নিম্নলিখিত তথ্যে উপনীত হইয়াছি।

(ক) ১৯৩১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫.৩ কোটি।

(খ) ১৯৩১ সালে খাদ্যের জোগান অনুসারে ভারতবর্ষের লোক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা ২৯.১ কোটি।

(গ) ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষের খাদ্যাভাব ৪২০০ কোটি ক্যালরি।

(ঘ) ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩৭.৭ কোটি।

(ঙ) ভারতবর্ষের এখনকার খাদ্যাভাব ৪১১০ কোটি ক্যালরি।

(চ) যদি অন্য সকলে যথাযত আহার্য পায় তাহা হইলে খাদ্যবঞ্চিতের সংখ্যা ৪.৮ কোটি।

খুব সম্ভবত ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৪০ কোটি। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যবঞ্চিতের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটীরও অধিক হইবে।

কৃষির অবনতি ও অব্যবস্থা—এ দিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু চাষের জমি এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে ও কৃষকের পরনির্ভরতা এত বাড়িয়াছে যে ফসল পরিমাণের হার বাড়ান সুকঠিন। কেবলমাত্র গম ও ধানের প্রতি একার উৎপাদনের হার (পাউন্ড হিসাবে) তুলনা করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি :—

	ভারতবর্ষ	চীন	পৃথিবীর উৎপাদনের মান
ধান	৯৮৮	২,৪৩৩	১৪৪০
গম	৮১১	৯৮৯	৮৪০

অথচ এটা ঠিক, যে রকম আমাদের দেশে জনবাহুল্য, জনশিক্ষা ও জমির ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে শিল্পোন্নতি অপেক্ষা চাষের সুব্যবস্থার উপরই আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অধিক নির্ভর করিতে হইবে। বসুন্ধরা আজ জনভারাক্রান্ত, কিন্তু মৃত্তিকা হইতেই ভারতবর্ষকে লোকপালনের জন্য আহার্য, ব্যবহার ও বিলাসের উপকরণ গ্রহণ করিতেই হইবে। কিছুকাল পূর্বে ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌গণের একটি ধারণা ছিল যে শিল্পোন্নতিই আমাদের একমাত্র কল্যাণের পন্থা। পৃথিবীময় আর্থিক সঙ্কট ও শস্যের অল্পমূল্যতার দিনে ভারতবর্ষ আজ বুঝিয়াছে, যে যদি আমাদের কৃষক খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে জমি অনেক পরিমাণে রপ্তানি বা ব্যবসায়ের শস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, কিংবা দেশীয় শিল্পের কাঁচামাল জোগান দিয়া শিল্পপ্রসারের পথ উন্মুক্ত করিতে পারে। ইহাতে কৃষি ব্যবসায়ে যে বিষম লোকবাহুল্য ঘটিয়াছে তাহাব কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে জাপানে ধান উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি একর পিছু বাংলা দেশ অপেক্ষা প্রায় ৩ গুণ ও ইতালিতে ৬ গুণ। যদি আমরা ধান চাষের

উৎপাদনের পরিমাণ অন্তত দ্বিগুণ বাড়াইতে পারি তাহা হইলে আরও কতক পরিমাণে বাংলায় আখ, সরিষা, তিসি, তিল ও চীনা বাদামের চাষ বাড়ে। ইহাতে এক দিকে যেমন খাদ্যের সঙ্কুলান হয় অপর দিকে কাঁচামালের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে ছোট খাট কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন অর্থাগম ও কৃষির গুরুভার মোচনের উপায় হয়।

বাংলা দেশে চাষের অবনতির কথা আমি অনেক বার উত্থাপন করিয়াছি। নদনদীর গতিহ্রাস ও মৃত্যুহেতু বাংলা দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ এখন ধ্বংসোন্মুখ। এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণে এই কয়টি জেলার চাষের অধোগতি হইয়াছে।

আবাদীজমির পরিমাণ হ্রাস

	(শতকরা)
হুগলি	৪৫
বর্ধমান	৪০
যশোহর	৩১
মুর্শিদাবাদ	১৪
নদীয়া	৭

এইরূপ আরও অন্য জেলায়ও যেমন কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিতেছে তেমনই জঙ্গল বা জলাভূমি ক্ষেত, পথঘাট ও বসবাস পর্যন্ত ক্রমশ ঘিরিয়া ফেলিতেছে। বাংলা দেশে যেখানে জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ও অসমতল সেখানে আউস ধানের পরিমাণ বেশি। আউস ধান যেখানে বেশি সেখানে লোকসংখ্যাও কম। আউস ধান বাংলার ব' প্রদেশের অধোগতিই সূচনা করে কিন্তু বীরভূম, বর্ধমান ও যশোহর জেলায় এখন এমন হইয়াছে যে, যদিও মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের সব জেলাতেই আউস, ধান বাড়িতেছে, কিন্তু এসব জেলায় আউসও খুব বৈশি পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, খাদ্যশস্যের এই পরিমাণহ্রাস কৃষকের দুর্গতির পরিচায়ক। বাংলার অনেক জেলাতেই পুষ্করিণী মজিয়া যাওয়ায় ও বাঁধগুলি রক্ষিত না হওয়ায় রবিশস্য অধিক পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে ১৯২৪ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে রবি চাষ এই কয়েকটি জেলায় নিম্নলিখিত ভাবে কমিয়াছে :—

মুর্শিদাবাদ ১৮২,২০০ একর; নদীয়া ১৪,১০০ একর; বর্ধমান ২১,১০০ একর; যশোহর ১৫,৬০০ একর। বাঙ্গালী মানুষ হয় তেলে জলে, কিন্তু কিছুকাল হইতে বাংলাদেশে সরিষা, তিসি প্রভৃতির চাষ বিশেষ কমিয়া যাইতেছে। সরিষার তেল বাঙালি খাদ্যে স্নেহ, মেদের প্রধান উপকরণ, তাহা ছাড়া জলীয় আবহাওয়ায় তেল ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু বাংলাদেশ, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে সরিষা ও অন্যান্য তৈল বীজ আমদানি করিতেছে। ১৯২৪ সালে বাংলা দেশে ১০ লক্ষ একর তৈলবীজ শস্যের চাষ ছিল, ১৯৩৪ সালের পরিমাণ একই রহিয়াছে। ১৯২৪ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় তেল শস্যের যে অবনতি হইয়াছে তাহা দেখান হইল :—

মুর্শিদাবাদ ১৯,৪০০ একর; নদীয়া ৩,৭০০ একর; বর্ধমান ৪,৫০০ একর; যশোহর ৫,৫০০ একর।

প্রোটীনবহুল ফসলের পর্যায়—বাংলা দেশে যে সব জেলায় এখন পাট চাষ কমান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে সেখানে সরিষা ও রেড়ীর চাষ ও শন ও মাসকলাই বাড়াইলে পাটের অভাব পূরণ হইবে। পাটের জমিতে যে উর্বরতার হ্রাস অবশ্যম্ভবী শন ও মাসকলাই উৎপাদনে তাহার অনেকটা ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। বাংলাদেশে পাটের চাষ অনেক অর্থ আনিলেও চাষের রীতি নীতি ও পর্যায়কে এমন পরিবর্তিত করিয়াছে যে ইহাতে ঘোর অনিষ্টও ঘটিয়াছে। পাট চাষ কমাইয়া তাহার পরিবর্তে রবি চাষ অবলম্বন করিলে, বিশেষতঃ যে সব দাল ও শুঁটি বাঙালির খাদ্যের প্রোটিনের প্রধান পরিপোষক এবং তেলবীজ শস্য যাহা মেদের পরিপোষক তারা ক্রমশ বাড়াইতে পারিলে বাঙালি কৃষকের খাদ্য, শরীরবিজ্ঞানের অনুসারে, কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে।

যে কোন জনবহুল দেশে ফসল উৎপাদনের পর্যায় এমন হওয়া চাই যে জমি হইতে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রোটিন পাওয়া যাইতে পারে। চীনদেশের অনেক জায়গায় প্রায় ১৬টি ফসল কৃষকেরা উৎপাদন করে। গম, যব, দাল, সরিষা, শুঁটির সঙ্গে ধান, সোয়াবীন, শাঁকালু, ভুট্টা ও নানা প্রকার শাকশব্জী মিলিয়া ১০/১২ বা ১৫টি ফসল তাহারা জমি হইতে গ্রহণ করে। আহার্যে চাউলের প্রাচুর্য কমাইয়া উত্তর ভারত হইতে সস্তা গম এবং চীবাক আমদানি করা উচিত। চীনে যেমন চাউলের পরিপূরক হিসাবে সোয়াবীন ব্যবহৃত হইতেছে সেইরূপ চাউলের পরিপূরক একটা বাহির হওয়া প্রয়োজন। প্রোটিনধারক মুগ, ছোলা, কলাই, অরহর প্রভৃতি এবং কচু, ও, মূলা, পেঁয়াজ ও নানা প্রকার শাকের দিকে ঝোঁক দিলে দরিদ্র কৃষকের খাদ্যেও পলীয়ের (প্রাটিনের) ভাগ বাড়ে এবং অম্লতাও কমে। যেমন যেমন লোক-সংখ্যা বাড়ে তেমনই জমি হইতে খাদ্যেরও সংস্থান করিয়া লইতে হয়; বাংলা দেশে আমরা বিপরীত পথে চলিতেছি।

১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালে আমাদের লোকবৃদ্ধি হইয়াছে ৩০ লক্ষ অথচ বাংলার কর্ষিত জমির পরিমাণ বরং কমিয়াছে, বাড়ে নাই। ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সালে গড়পড়তা বাংলার কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল ২৩,৫২৭,২০০ একর। ১৯২৮ হইতে ১৯২৯ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছিল ২৩,৫১৪,৪৪০ একর। ১৯৩৫ সালে তাহা আরও কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ২৩,৩৫৭,১০০ একর। পূর্ববঙ্গে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ এখন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ এত দ্রুত অধোগতির পতে চলিতেছে যে ইহার ফলে সমগ্র বাংলা দেশে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ এ বার বৎসর ধরিয়া কমিতেছে। শুধু কর্ষিত ভূমির হ্রাস প্রতিরোধ করা নয়, যাহাতে কর্ষিত ভূমি হইতে আরও ৩/৪টি ফসল পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা না করিলে দেশের খাদ্যসঙ্কট আরও নিদারুণ, ভীষণ হইবে।

নদী সংস্কার ও জলসেচ—বাংলার কৃষির অবনতি এত দ্রুত ও অনিবার্য গতিতে চলিয়াছে যে একটা ব্যাপকভাবে জলসরবরাহ ও কৃষিসংস্কার উদ্ভাবন না করিতে পারিলে আমাদের রক্ষা নাই। মোটামুটি জলসরবরাহ ও কৃষি সংস্কারের পন্থাগুলি আমি এখানে ইঙ্গিত করিতেছি। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গের কৃষিরক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে নদীরক্ষা ও সংস্কার। যেখানে যে নদী জীবিত ও প্রবহমান সেখান হইতে খাত কাটিয়া আনিয়া মরা নদীকে বাঁচাইতে হইবে ও কৃষির উপকার ও ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য নিয়ন্ত্রিত

জলপ্লাবন প্রবর্তিত করিতে হইবে। যেখানে দামোদরের মত বাঁধ দেশকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তৃত অঞ্চলের যথাযত প্লাবন ও জলনিকাশের অন্তরায় হইয়াছে সেখানে এইরূপ বাঁধে শ্লুইস দরজা আটকাইয়া কৃষির উন্নতিকল্পে প্লাবনের শাসন ও পরিচালন করিতে হইবে। বাঙালিকে এই সব অঞ্চলে একটু যাযাবার হইতে শিখিতে হইবে। টিনের ঘর তৈয়ার করিয়া, প্রয়োজন মত যাহাতে কৃষক ভিটামাটিকে আঁকড়াইয়া না থাকিয়া প্লাবনের সময় দ্রুত স্থান পরিবর্তন করিতে পারে এরূপ শিক্ষা ও রীতি তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। দামোদর, পদ্মা, তিস্তা বা যমুনা, যে সব নদী বাংলায় বন্যা আনিয়া দেশেকে বিধ্বস্ত করে, সেই সেই নদীগুলির স্রোতে কঙ্কালাবশিষ্ট অন্য নদীগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে। বিভিন্ন ক্ষয়িষ্ণু জেলার মধ্যে এইরূপে খাল কাটিয়া মরা গাঙ্গে বান ডাকাইতে হইবে। খাত কাটিয়া ভরা বিপুলস্রোত নদী হইতে জল আনিয়া জীর্ণ নদীর পুনরুদ্ধারের কথা বাংলায় একশত বৎসরের পুরাতন কথা। ১৮৩৬ সালে নদীয়া নদীবিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট নির্দেশ করিয়াছিলেন যে দেশ রক্ষা হয় যদি ভাগীরথীর সঙ্গে নবগঙ্গার যোগ সাধন করা হয়, শান্তিপুর হইতে মাঙ্গরা পর্যন্ত একটি খাত খনন করিয়া। তেমনই ১৮৪৪ সালে সৈন্যবিভাগ হইতে পরামর্শ আসিয়াছিল যে পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির রক্ষা অসম্ভব যদি না উপরে রাজমহল হইতে বর্ধমান জেলার কালনা পর্যন্ত খাল টানিয়া না আনা যায়। প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ উইলকক্সও এইরূপ নানাপ্রকার পরিকল্পনা দিয়া বাংলার পূর্তবিভাগকে সম্প্রতি চঞ্চল, এমন কি উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ দরিদ্র । তাই উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ। গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা ও তিস্তার অতিরিক্ত জলপ্লাবন যদি ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের মধ্যে বিতরণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে নদী ভাঙনেরও প্রতিরোধ হইবে। অপরদিকে যে পরিমাণ পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের নদীগুলির অধোগতি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আরও নূতন কীর্তিনাশা নদী উঠিয়া পূর্ব অঞ্চলকে বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করিতে থাকিবে। নদীপ্রবাহের উত্তর পথে বাঁধ বাঁধিয়া বিরাট কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করিয়া সেখান হইতে জলসেচ বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, মান্দ্রাজ ও মহীশূর প্রদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। বাংলাদেশেও তিস্তা, ময়ূরাক্ষী, দামোদর বা দ্বারকেশ্বরে বাঁদ বাঁধিয়া. হ্রদ নির্মাণ করিয়া, খাল কাটিয়া জলসেচের বিপুল আয়োজন করিতে পারা যায়। এই সকল খাতের জলপ্রপাতের সাহায্যে যুক্ত-প্রদেশের মত বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্ভাবন করিয়া দূরে যে অঞ্চলে খাত পৌঁছাইতে পারে না সেখানে নলকূপ বসাইয়া কৃষির উন্নতি সাধন করা কঠিন নয়। অযোধ্যায় পর্বতের সানুদেশে অসমতলের অপেক্ষা না করিয়া যেভাবে সমতল পথে ধাবিত বিপুল গঙ্গাস্রোতের অবলম্বনে তৈলের ইঞ্জিন বসাইয়া জল তুলিয়া জলসেচের ব্যবস্থা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে, তাহা হইতে বাংলা দেশের ইঞ্জিনিয়ারগণের অনেক শিখিবার আছে।

কায়েমী খাজনা-ব্যবস্থার পরিবর্তন—সকলেই প্রশ্ন করিবেন অদূরে যুক্ত-প্রদেশে এত বিরাট নিত্য নূতন জলসেচ প্রণালী ও বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রামে গ্রামে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে, বাংলা দেশে কিছুই হইতেছে না কেন? বাংলার রাজনৈতিকগণ ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না, বরং রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব দেশের কল্যাণকর আর্থিক

পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থার প্রধান বিঘ্ন হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে কোটি কোটি টাকা কৃষির উন্নতি ও প্রজার কল্যাণের জন্য ব্যয় তখনই সম্ভব ও সার্থক যখন সমৃদ্ধিশালী কৃষকের দেওয়া জমির খাজনা ও শুল্ক সাধারণ তহবিল আবার পূরণ করিয়া দেয়। সমস্ত ব্যয়সাপেক্ষ আয়োজন তখন লাভজনক হইয়া রাষ্ট্রের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিভাগের খাতে অজস্র অর্থ ঢালিয়া দিতে পারে। বাংলার কায়েমী খাজনা-ব্যবস্থার জন্য ইহা সম্ভবপর একেবারেই নয়, কারণ নদীর সংস্কার, জমির উন্নতি ও কৃষির সুব্যবস্থা রাষ্ট্রের সাহায্যে হইলে তাহার ফলভোগ বেশি করে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিয়া সমাজের মুষ্টিমেয় লোক ধনী, জমিদার শ্রেণি। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে জমির খাজনা আয়শুল্কের দ্বিগুণ, কিন্তু বাংলা দেশে কায়েমী বন্দোবস্ত হেতু উহা তাহার অর্ধেক মাত্র। আরও অন্য কারণ এখানে আলোচনা না করিয়া শুধু বাংলার কৃষি সংস্কারের জন্যই কায়েমী বন্দোবস্তের একটা আমুল পরিবর্তন অনিবার্য বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। নদীসংস্কার ও কৃষির উন্নতির জন্য যে বিপুল অর্থব্যয়ের এখন প্রয়োজন তাহা সম্ভব হইবে না যদি সাধারণ রাষ্ট্রের তহবিল তাহার যথাযথ লভ্য হইতে বঞ্চিত হয়। যেমন পল্লীগ্রাম ও কৃষক সাধারণের অর্থে পালিত ও সমৃদ্ধ হইবে, তেমনই সেই সমৃদ্ধি রাষ্ট্রকেও শক্তিমান করা চাই। যদি এরূপ আদান প্রদান পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে জমিদারশ্রেণি মধ্যবর্তী হইয়া ঘটিতে না দেয় বরং লভ্যের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে ইহাতে রাষ্ট্রেরও অকল্যাণ, প্রজারও অনিষ্ট। ভাগীরথী নদী কায়েমী বন্দোবস্তের কাল হইতে বাংলাকে বহু বৎসর দরিয়া অনেক জলকল্লোল শুনাইয়াছে, তাহাতে মিশিয়াছে কত কৃষকের করুণ আর্তনাদ এবং ধনীর তীব্র শ্লেষ ও ভর্ৎসনা। আজ বাংলা দেশে রাজকর বিষয়ে তহবিলের আয়ব্যয়ের নূতন রীতি গ্রহণ করিতে হইবে। রাজস্ব অপেক্ষাকৃত ক্রমবর্ধনশীল না হইলে কোন দেশই প্রজার উন্নতিসাধনা করিতে পারে না।

কৃষকের পোষ্য—জমির কায়েমী বন্দোবস্তের সঙ্গে আরও কয়েকটি অনিষ্টকর রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার আশু প্রতিকার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জমিদার ও প্রজার মাঝে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার এবং জোতদার, প্রজার নীচে চুকানিদার, দরচুকানিদার, দরন্দর চুকানিদার, তস্য-চুকানিদার, তেলে-তস্য চুকানিদার, এইরূপে কত প্রকার অদ্ভুত জীব মইয়ের পইঠার মত নীচ হইতে উপরে উঠিয়াছে, আর সর্বোপরি দাঁড়াইয়াছেন জমিদার। ইহার ফলে হইয়াছে, প্রতি কৃষককে শুধু যে আপনার পরিবার বর্গকে পালন করিতে হয় তাহা নয়—বাংলায় পরিবারের সংখ্যা গড়পড়তায় ৫½ জন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গ আরও ২/১টি জমিদারজাতীয় জীবকেও পোষণ করিতে হয়। যে যে জেলায় জমিদারশ্রেণির লোক বেশি তাহা নীচে দেখান হইল :—

	একজন খাজনা আদায়ী প্রতি খাজনা-দাতার সংখ্যা
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	১৪
বর্ধমান বিভাগ	১৬
ঢাকা জেলা	২১

বরিশাল জেলা	২৩
ফরিদপুর জেলা	২৩
নোয়াখালি জেলা	৩৪
ময়মনসিংহ জেলা	৪৮
ত্রিপুরা জেলা	৪৮
রাজসাহী বিভাগ	৫৮

আর একটি তালিকার দ্বারা অন্যভাবে দুই শ্রেণির লোক সংখ্যার তুলনা করা হইল :–

জিলা	কৃষকের সংখ্যা, ১০ জন জমিদার ও তাহাদিগের প্রতিনিধি প্রতি
বাঁকুড়া	৪২
হাওড়া	৭৩
বর্ধমান	৯৩
যশোহর	৯৯
ফরিদপুর	৯৬
চট্টগ্রাম	৮১
২৪ পরগণা	১,১৩
হুগলি	১,২১
নদীয়া	১,১১
মুর্শিদাবাদ	১,৫১
ঢাকা	১,৭৫
রংপুর	২,২৭
মেদিনীপুর	২,৬৬

বাঁকুড়া, হাওড়া, বর্ধমান, চট্টগ্রাম, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার প্রতি কৃষককে তাহার শ্রম হইতে অন্তত ৭ জন লোককে পরিপালন করিতে হয়। বাংলা দেশের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা, সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও ক্ষয়িষ্ণু; তাহারই ভার সর্বাপেক্ষা বেশি।

ভূমিহীন শ্রেণীর আধিক্য—বাংলা দেশের চাষী এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত :—

	সংখ্যা
স্বত্ববিশিষ্ট	৫,৩১৭,৯৭৩
প্রজা	৮৭৩,০৯৪
মজুর	২,৮৭৪,৮০৪

১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালে প্রথম দুই শ্রেণির সংখ্যা ৯২ লক্ষ হইতে কমিয়া ৬০ লক্ষ হইয়াছে, এক-তৃতীয়াংশের বেশি (শতকরা ৩৫) হ্রাস, অথচ মজুর, মুনিষ, আধিয়ার, বর্গাদার, ভাগচাষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে ১,৮০৫,৫০২ হইতে ২,৭১৮,৯৩৯, অর্ধেকের বেশি বৃদ্ধি। কৃষির দুর্দশার ইহা অপেক্ষা কি শোচনীয় নির্দশন আর হইতে পারে! দারিদ্র্য-পীড়িত ঋণভারগ্রস্ত বাংলার জোতদার ও চুকনিদার আপনার শেষ সম্বল ক্ষুদ্রায়তন জমিটুকু পর্যন্ত

সমর্পণ করিয়া নিজেরই জমিতে দীন, ভাগীদার, বর্গাদার ও মজুরে রূপান্তরিত হইয়া পরিশ্রম করিতেছে। খাজনা বা মহাজনের সুদ দিবার সামর্থ হারাইয়াই সে আজ মজুর শ্রেণির অন্তর্গত। অপর দিকে এই সুযোগে জমিতে সহর হইতে আর এক শ্রেণি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে। এই দশ বৎসরে বাংলা দেশে প্রজাস্বত্বভোগী অথচ চাষবিমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণি সংখ্যায় বাড়িয়াছে ৩৯০,৫৬২ হইতে ৬৩৩,৮৩৪, শতকরা ৬০ বৃদ্ধি!

বিশেষ করিয়া আর একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে প্রজাস্বত্বের লেনদেনের অধিকার কৃষির কল্যাণপ্রদ হইতেছে কি না। যদি জমি ক্রমশ মহাজন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে আসিয়া পড়ে, বিশেষত কৃষির এই দুর্দিনের যুগে, তাহা হইলে কৃষির অবনতি ও পল্লীগ্রামের অশান্ত অনিবার্য। প্রায় ২৯ লক্ষ ভূমিহীন বা ভূমি হইতে বিতাড়িত মজুর বাংলায় আজ বর্তমান। ইহা কোন দেশের পক্ষেই সমাজের শান্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক নয়। ১৯২৮ সালের সংস্কার আইনের ব্যাপকভাবে পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে কোন হলধারী জমিকে একাধিকক্রমে বার বৎসরের অধিক চাষ করিয়াছে, ভাগহিসাবেই হউক বা দিনমজুর হিসাবেই হউক, তাহাকে জমির উত্তরাধিকার ও প্রজাস্বত্ব না দিতে পারিলে নিঃস্ব মজুরশ্রেণির বৃদ্ধি ভবিষ্যতে ঘোর অকল্যাণ ঘটাইবে।

কায়েমী জমির বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্বসংস্কার লইয়া যে কয়েকটি মাত্র কথা বলিলাম তাহা সমাজ-তন্ত্রবাদের কথা নয়। পৃথিবীতে সব কৃষিপ্রধান দেশই এই রকম উপায়ে প্রজাকে রক্ষা করিতেছে। বিলাতে, স্কটল্যান্ড ও আয়ার্লান্ডে জমি-সংক্রান্ত নিয়ম কানুনের সংস্কারও এই রীতিরই ইঙ্গিত করিবে।

গোবংশবৃদ্ধি—বাংলা দেশে লোকবৃদ্ধির কথা আগেই বলিয়াছি। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা এখানে চাষের জমি ভাগবাটোয়ারার জন্য গড়পড়তায় ক্ষুদ্রতম। জোত যে শুধু খণ্ডিত হইয়াছ তাহা নয়, টুকরা টুকরা জমি বসন্ত কালের শুক্‌না পাতার মত মাঠের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। বাংলাদেশে জনপিছু আবাদী জমির পরিমাণ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা সবচেয়ে কম। অপর দিকে বাংলাদেশে আবার গোজাতির সংখ্যা সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশি। মানুষের খাদ্যের অকুলানে গোপালন করিতে সর্বাপেক্ষা অসমর্থ হইলেও বাংলা গোবংশবৃদ্ধিতে অগ্রণী হইয়াছে।

প্রদেশ	প্রতি বর্গমাইল লোকসংখ্যা	১০০ একর আবাদী জমিপ্রতি গোসংখ্যা	জন পিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ (একর)	লোক বাহু-ল্যের নির্ঘণ্ট
বাংলা	৬৪৬	১০৮	.৪৭	২.১
বিহার উড়িষ্যা	৪৫৪	৮৯	.৬৩	১.৫৮
যুক্ত-প্রদেশ	৪৫৬	৮৮	.৭৪	১.৩৫
মাদ্রাজ	৩২৮	৬৬	.৭৪	১.৩৫
পাঞ্জাব	২৩৮	৫৪	১.১২	০.৮৯
মধ্য প্রদেশ	১৫৫	৫১	১.৫৮	০.৬৩
বোম্বাই	১৭৭	[illegible]	১.৬১	০.৬২

বাংলার গরু ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, হীনবল ও নিকৃষ্ট। অথচ সংখ্যায় তাহারা তিন কোটি চোদ্দ লক্ষ। কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর। তাহার মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ একর জমি গরুর খাদ্য-ফসল উৎপাদন করে। যদি বাংলা দেশে সমস্ত খড়ের পরিমাণ ধরা যায় ও মনে করা যায় গরুর খাদ্য ছাড়া খড়ের অপর কোন ব্যবহার নাই, তাহা হইলে প্রত্যেক গরু পিছু মাত্র ২ সের করিয়া খড় পাওয়া যাইবে, অথচ ৫ সেরের কমে গরুর চলে না। বাংলাদেশে চাষের খেত লোকবাহুল্যের জন্য শুধু যে পথ ঘাট আক্রমণ করিয়াছে তাহা নয়, জলা ও নদীর শুষ্ক বক্ষে নামিয়া চাষী ধানরোপণ করিতেছে। সুতরাং গরুর খাদ্যাভাব ঘটিবেই। খাদ্যাভাবে গরু যত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণবল হয় চাষী তাহাদের সংখ্যা ততই বাড়াইতে থাকে; লাঙ্গল ও গাড়ি টানা তাহাদের দ্বারা ত করাইতে হইবেই! কিন্তু যে পরিমাণে গাই বলদ ছোট ও ক্ষীণবল হয় সে পরিমাণে তাহাদের আহার্য কমে না। এই উপায়ে শুধু বাংলাদেশের কোন যুক্তপ্রদেশের পূর্বাংশ, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের চাষী, যাহাদের মোটে তিন একর হইতে পাঁচ একর পরিমাণ জোতের সম্বল, তাহারা গাই বলদের সংখ্যা অজস্র বাড়াইয়া চলিয়াছে। পাঞ্জাবের মুসলমান বলদ বাঁধিয়া রাখে, অকেজো অথবা অতিবৃদ্ধ গাই বলদ প্রয়োজনমত বিক্রয় করিয়া দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য লোকবহুল প্রদেশে হিন্দু ধর্ম ও নীতি গরুপালন সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি খেলিতে দেয় না, অথচ শ্রাদ্ধের সময় যখন ষাঁড় উৎসর্গ করিতে হয় তখন সবচেয়ে সস্তা ও নিকৃষ্ট ষাঁড় বাছিয়া লওয়া হয়, ইহার বিপক্ষে তখন হিন্দু ধর্ম ও নীতি নির্বাক। ফলে ঐ অঞ্চলের গোজাতির দ্রুত অবনতি অনিবার্য হয়।

অব্যবহার্য, অতিরিক্ত গো-মহিষের সংখ্যা ২ কোটি—বাংলা দেশ গরুপালন সম্বন্ধে কি বিপরীত বুদ্ধি ও ব্যবস্থা দেখাইতেছে তাহার সম্বন্ধে আর একটি উদাহরণ দিব। নদীর মৃত্যু ও জল সরবরাহের ব্যাঘাতের জন্য হুগলি জেলার কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিয়াছে শতকরা ৪৫, বর্ধমানে কমিয়াছে শতকরা ৪০ ও যশোহরে কমিয়াছে শতকরা ৩১। এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধেক জমি যদি কোন জেলায় পতিত বা জঙ্গলাকীর্ণ থাকে ও ম্যালেরিয়া রোগে যদি লোক অনবরত ভুগে (হুগলিজেলার জ্বরের প্রকোপের মান ৪৬.৬; বর্ধমানের ৫৩.৪; ও যশোহরের ৪৮.২) তাহা হইলে ত দারিদ্র্য ও অনশন বাড়িয়াই চলিবে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ১৯২০ হইতে ১৯৩০ সাল এই দশ বৎসরে হুগলি জেলায় গোমহিষের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৪৭২,২৬৫ হইতে ৫২১,০২৮; বর্ধমান জেলায় ৯১৮,১০৬ হইতে ৯৭৯,৮৫২; এবং যশোহর জেলায় ৮৪৪,৯৮৫ হইতে ১,০৭৫,৪৬২। কিছু দিন পূর্বে বর্ধমানের কয়েকটি গ্রামে যাইয়া অকেজো ও অতিরিক্ত গরুর সংখ্যা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলাম।

	আলিগ্রাম	আউসগ্রাম
চাষের বলদ	১৪৪	১৫০
অকেজো গরু, ষাঁড়	৩	২
গাই	৪৩	৪০

এতগুলি গরু থাকা সত্ত্বেও গ্রামে দুধের পরিমাণ মাত্র এক মণ ছিল।

বাংলা দেশে ১০০ একর আবাদী জমি প্রতি গোমহিষের সংখ্যা ১০৮, কিন্তু ইজিপ্টে এই হিসাবে গোমহিষের সংখ্যা ২৫; চীনের ১৫ এবং জাপানের মাত্র ৬। গোমহিষের সংখ্যা বাংলায় সবপ্রদেশ অপেক্ষা বেশি হইলেও বাঙালি কৃষক খুব কম পরিমাণেই দুধ ঘি খাইতে পায় ও বৎসরের পর বৎসর বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রজননের জন্য বাংলায় ষাঁড় আমদানি করে। নীলনদের তটভূমির কৃষিকে মাপকাঠি ধরিলে বাংলাদেশে তিনভাগের দুই ভাগ গোমহিষ না থাকিলেও কৃষিকার্য বেশ সুচারুরূপে চলিতে পারে। ইহাতে বুঝা যায়, ৩ কোটি ১৪ লক্ষ গোমহিষর মধ্য অন্তত ২ কোটি গোমহিষ বাংলাদেশে অতিরিক্ত; তাহাদিগের পালন অনর্থক কৃষকের দারিদ্র্য, ঋণভার ও অনশন বাড়াইতেছে।

গোজাতি-অবনতির প্রতিকার—বড় লাটসাহেবের গোজাতির উন্নতিসাধন কিছুই সম্ভবপর হইবে না যদি কৃষকগণ গোজাতির সংখ্যা অযথা ও অনর্থক বৃদ্ধি করিতে থাকে, ভাল ও মন্দ গরুর প্রভেদ না করে এবং দুইয়েরই পক্ষে ভীষণ খাদ্যসঙ্কট প্রতিকার করা দূরে থাক আরও নিদারুণ করিতে থাকে।

পাঞ্জাব প্রদেশে এক বৎসরের মধ্যে (১৯৩২—১৯৩৩) ৪৮২,০০০ পশুর বংশবৃদ্ধি নিবারণ করা হইয়াছিল। বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে আইন করিয়া অকেজো ও নিকৃষ্ট পশু বৃদ্ধি নিবারণ না করিতে পারিলে কৃষকের ঋণভার কমিবে না, গুরুভারাক্রান্ত ভূমি অনুর্বর হইতে থাকিবে এবং কৃষকও দুধ ও ঘি হইতে বঞ্চিত থাকিবে। গরু ও কৃষক দুইয়ে মিলিয়া এখন জমি হইতে যত রস টানিতে পারে তত টানিতেছে, যত ফসল, যত শাক, যত ঘাস, কিন্তু এই অসম নিরর্থক চেষ্টায় কাহারও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না। বাংলার লোকসংখ্যা এখন প্রায় ৫ কোটি ৫ লক্ষ, তাহার মধ্যে ধরা যাইতে পারে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক শরীরবিজ্ঞানের অনুমোদিত খাদ্যের মাপকাঠি অনুসারে অন্য সকলে উপযুক্ত আহার করিলে ইহারা একেবারে নিরন্ন। যদি মানুষের এত দৈন্য ও ক্লেশ তবে নিরর্থক পশু পালন ও বৃদ্ধি করিয়া পশুর অনশন ও অবনতি, উপযুক্ত চাষ ও সার হিসাবে জমির উর্বরতাহানি এবং পরিমাণ ও গুণ দুইই অনুসারে মানুষের খাদ্যের অভাব অভাব বাড়াইয়া বাঙালি কি গোমাতার চরণে সবই বিসর্জন দিবে!

উপার্জনশীলের সংখ্যা-হ্রাস—বাংলার কৃষির দুরবস্থা হইতে যদি আমরা শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলেও আমরা আশার কারণ খুঁজিয়া পাই না। যেমন ভারতবর্ষে তেমনই বাংলায় লোকবৃদ্ধি অনুপাতে শিল্পোন্নতি কিছুই দেখা যাইতেছে না, বরং সমগ্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে শিল্পী ব্যবসায়ীর সংখ্যা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলায় বেশ কমিয়া যাইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে,—

		১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯১১—১৯৩৩
		কোটি লক্ষ	কোটি লক্ষ	কোটি লক্ষ	শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি
লোকসংখ্যা	ভারতবর্ষ	৩১।৫০	৩১।৯০	৩৫।৩০	+১২.১
	বাংলা	৪।৬৩	৪।৭৫	৫।১	+১০.০
উপার্জনশীল কর্মীর সংখ্যা	ভারতবর্ষ	১৪।৯	১৪।৬	১৫।৪	+ ৪.০
	বাংলা	১।৬২	১।৬৮	১।৪৭	– ৯.০

শিল্পকারখানা প্রভৃতিতে শ্রমিকের সংখ্যা	ভারতবর্ষ	১।৭৫	১।৫৭	১।৫৩	–১২.৬
	বাংলা	।১৭	।১৭	।১৩	–১৪.২
শতকরা হিসাবে কর্মীর সংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা	ভারতবর্ষ	১১।০	১১।০	১০।০	– ৯.১
	বাংলা	১০।৫	১০।১	৯।০	–১৪.২
শতকরা হিসাবে মোট লোকসংখ্যা অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা	ভারতবর্ষ	৫।৫	৪।৯	৪।৩	–২১.৮
	বাংলা	৩।৯	৩।৭	২।৫	–৩৫.৮

গত ৩০ বৎসরে বাংলায় শিল্পী, ব্যবসায়ীর সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। এই সংখ্যা হ্রাস ও মোট কর্মী ও লোকসংখ্যার অনুপাতে বাঙালি শ্রমিকসংখ্যার শতকরা অবনতি ভারতবর্ষের অপেক্ষা অধিক বেশি। ইহা হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় বাংলার দ্রুততর আর্থিক অবনতি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। ত্রিশ বৎসরে বাংলায় উপার্জনশীল কর্মীর সংখ্যা হ্রাস (শতকরা ৯) বিশেষ আশঙ্কার কথা। অথচ বাংলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১০। যাহারা মুখের গ্রাস চাহে, তাহাদের দুই হাতই যে কাজ করে তাহা নহে। এই বৈপরীত্যই বাংলার অধোগতির প্রধান কারণ।

শ্রমিকের সংখ্যাহ্রাস—কিছুকাল যাবৎ বাংলায় শুধু যে শিল্পের প্রসার হয় নাই তাহা নহে, বরং হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২১ সালে বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যত লোক কাজ করিত ১৯৩১ সালে তাহা অপেক্ষা ৪ লক্ষ কম লোক কাজ করিত। ১৯২১ সালে তন্তুবায়রা সংখ্যায় ছিল ৪½ লক্ষ, ১৯৩১ সালে তাহা ২ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯৩৩ সালে কারখানার সংখ্যা ২ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু শ্রমিকসংখ্যা ৫০ হাজারের অধিকও হ্রাস পাইয়াছিল। অবশ্য তাহার পর ১০/১২টি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার ফলে কয়েক হাজার শ্রমিক বৎসরে কয়েক মাস ধরিয়া কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। শিল্পের অবনতিতে বাংলার কৃষি যাহা আর লোকসংখ্যার গুরুভার বহন করিতে পারিতেছে না আরও বিপর্যস্ত হইতেছে। যত লোক এখন কৃষির উপর নির্ভরশীল তাহাদের সকলের কৃষির দ্বারা জীবনযাত্রা অসম্ভব, অথচ কৃষিনির্ভর লোকের সংখ্যাই দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এদিকে আর্থিক মন্দার কারণে ১৯৩১ সালে বাংলায় উৎপন্ন সকল প্রকার ফসলের মোট মূল্য শতকার ৬১ হ্রাস পাইয়াছে; অন্য কোন প্রদেশে এই পরিমাণে মূল্যহ্রাস ঘটে নাই, অথচ অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় কৃষিনির্ভরতা অনেক অধিক বাড়িয়াছে। কুটীর-শিল্পগুলিও ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। মাদ্রাজে যে কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির চেষ্টা চলিয়াছে বাংলায় তাহার কিছুই দেখা যায় না। শুধু তুলা শিল্পই ১০ বৎসরে মাদ্রাজে ৭০ হাজার বেশি লোককে কাজ দিয়াছে।

কারখানা ও কুটীর-শিল্প—বর্তমান বাংলার কলকারখানাগুলির অধিকাংশই ব্যান্ডেল হইতে বজবজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং এই সকল কল কারখানায় প্রধানতঃ অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা আসিয়া কাজ করে। যে সকল অঞ্চলে যেরূপ কাঁচামাল পাওয়া যায়,

সেই সকল অঞ্চলে যদি সেই শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়, তবে পড়তা কম হওয়ায় ও বাঙালি মজুর সহজে পাওয়া যাওয়ায় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে এবং বাংলার পল্লিবাসীদেরও ঐ সকল কারখানায় জীবিকার্জনের সুযোগ হইতে পারে। পল্লি অঞ্চলে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হইলে কি উপকার হইতে পারে, কুষ্টিয়া ও ঢাকার কাপড়ের কলগুলি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এই সকল কলকারখানা কৃষিজীবীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে এবং পল্লীবাসীদের জীবিকার মান এত উন্নত করিয়াছে যে, পাটের আবাদ দ্বারা বহু বৎসরেও তাহা সম্ভব হইত না।

বাংলার অনেক কুটীর-শিল্প বহুকাল হইতে ভারতীয় এমন কি বহির্বাণিজ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অনেক কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য এখনও বাংলার বাহিরে রপ্তানি হয়। ঢাকা, মালদাহ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরের কাপড়; দাঁইহাট ও খাগড়ার ধাতব বাসন; নদীয়ার সোলার টুপি কিংবা ঢাকার শাঁখা বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন ও বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ঋণগ্রহণ ও বিক্রয়ের প্রকাণ্ড আয়োজন চলিতেছে। যুক্ত-প্রদেশে ছোট কারখানা ও কুটীর-শিল্পকে যথাযথ ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা দানের জন্য একটি ব্যাঙ্ক ও পণ্য সরবরাহের কোম্পানি গঠিত হইতেছে, বাংলাদেশে ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয়। যেখানে আপাততঃ শিল্পীদের মধ্যে সমবায়প্রথায় কাজ করা সম্ভব নহে, সেখানে কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠান মাল বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করিবে এবং কাঁচামাল সরবরাহেরও বন্দোবস্ত করিবে। শিল্পীদের উচ্চমূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করিতে হয়, এদিকে তাহারা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়েরও সুবন্দোবস্ত করিতে পারে না। পূর্বোক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কলিকাতার বঙ্গীয় কুটীর-শিল্প সমিতির সহযোগে মফঃস্বলের প্রত্যেক সহরে এবং পল্লি অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে একযোগে কাজ করিতে পারে। বস্ত্র, আসবাবপত্র। ধাতব বাসন, প্রভৃতি যে সকল শিল্পে কারু, কলা ও নক্সার প্রয়োজন, কলিকাতার আর্ট স্কুলের ঐ সমস্ত শিল্পের জন্য নূতন নূতন মনোজ্ঞ নক্সা প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। গবর্নমেন্ট ঢাকা ও বিষ্ণুপুরে তন্তুবায়দিগের জন্য একটি ক্যালেন্ডারিং কল স্থাপন করিতে পারিলে বয়নশিল্পের বিশেষ সুবিধা হয়। বর্ধমানেও তেমনই একটি নিকেল প্লেটিং কল স্থাপিত হইতে পারে। উহাতে ধাতু-শিল্পের বিশেষ সাহায্য হইবে। স্যাক্সনি এবং সুইজারল্যান্ডের মত ঘড়ি প্রস্তুত, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও জাপানের মত কাঠ, ধাতু, সেলুলয়েড বা রবারের পুতুল, বেভেরিয়ার মত পেন্সিল প্রস্তুত যদি কুটীর-শিল্প হিসাবে করা যায়, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত বহু যুবকের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে। অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে ও রাষ্ট্রের সুবিধাবিধানে এই সমস্ত শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ শিল্পে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং ফলিত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। বাংলার শিক্ষিত যুবকের পক্ষে অল্প মূলধনে জার্মানী ও জাপান হইতে অল্প টাকার কল আমদানি করিয়া এই সকল শিল্পের পরিচালনা বিশেষ লাভজনক হইতে পারে।

মাঝারি ও বড় কারখানা হিসাবে বাংলায় কাগজ, গালা, দেশলাই, চামড়া, শণ, তামাক, তৈল ও হাড় প্রভৃতির ব্যবসায়ের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। যত প্রকার শিল্প

হইতে পারে, ছোট, মাঝারি, বড় সব রকম শিল্পের বিস্তার না হইলে বাংলায় যে কৃষিনির্ভরশীলতা এই ৩০ বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার প্রতিরোধের উপায় নাই; অথচ উহার প্রতিরোধ না করিতে পারিলে অনশন, অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু বাড়িতেই থাকিবে। কয়েকটি সহরে বড় বড় কারখানা স্থাপন অপেক্ষা যদি পল্লি অঞ্চলে আখ, তেল, তামাক, চামড়া প্রভৃতির কারখানা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা হইলে জনসংখ্যার ভার কমিয়া কৃষির উন্নতি সাধন হইবে এবং কৃষকও সমবৎসর সমানভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইবে, এখনকার মত বৎসরে ২/৩ মাস করিয়া আলস্যে অথবা অল্পশ্রমে দিন কাটাইতে হইবে না।

মৎস্যের ব্যবসায়—পূর্ববঙ্গে কৃষির অবসরে অনেক কৃষক মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা চালায়। বাংলাদেশ বহুকাল ধরিয়া মৎস্যের অপচয় করিতেছে। অনেক জেলায় মাছ মুড়ির দরে বিক্রয় হইতেছে, আবার সেই সময় অন্য জেলায় লোক অনশনে কাটাইতেছে। মাছের পরিমাণ দেশে খুব দ্রুত কমিয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে। আইন পাস করিয়া যে সময়ে মাছ ডিম পাড়ে সেই সময় মাছধরা নিষেধ কিংবা যে সব জাল বা বেতের ফাঁদ অতি ক্ষুদ্র মাছকেও পলাইতে দেয় না তাহার ব্যবহার নিষেধ, কিংবা নদীতে সহরের ময়লা বা কারখানার তেল ও আবর্জনা নিক্ষেপ করিয়া মাছের অবনতি সাধন বন্ধ করিতে হইবে। নদীর মোহানায়, সুন্দরবনে বা সমুদ্রতটে মোটর পোতের সাহায্যে মাছ ধরা, তৈল দ্বারা বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংবন্ধন করা, বরফের কারখানা স্থাপন করিয়া মাছ রক্ষা করা এবং সুবন্দোবস্ত করিয়া বরফের আবরণে দূর অঞ্চলে মাছ পাঠান আমাদিগের শিক্ষিত যুবকদিগকে এই প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী মাছের ব্যবসায়ে উদ্ভাবন করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন সমস্ত বাংলাদেশে মাছের দর কমিবে, অপরদিকে অপচয়ও বন্ধ হইবে। জাপানীরা পূর্বসমুদ্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মাছের ব্যবসায় করতলগত করিয়াছে। শিক্ষিত বেকার বাঙালি যুবকের এই ব্যবসায়ে প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার অপকর্ষ—বাংলার অধোগতির যে চিত্র আমি খুব সহজ ও সরল রেখায় টানিলাম তাহা পাছে অতিরঞ্জিত কাহারও মনে হয় এই জন্য মোটামুটি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা বাঙালি যে দুর্গতির পথযাত্রী তাহার তুলনামূলক পরিচয় এইবার দিব।

১। ভারতবর্ষের সকলপ্রদেশ অপেক্ষা বাংলা সর্বাপেক্ষা লোকবহুল এবং জন প্রতি কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাংলার সর্বাপেক্ষা কম (.৪৭ একার)। বিহার ও উড়িষ্যার সংখ্যা হইতেছে .৬৩ একার; যুক্ত-প্রদেশ ও মাদ্রাজের সংখ্যা .৭৪ একার। বাংলার অতিজননসমস্যা সব প্রদেশ অপেক্ষা ভয়াবহ।

২। উপরোক্ত কারণে বাংলা দেশের জোত সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র খণ্ডবিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; ইহাতে কৃষিকার্যের সর্বাপেক্ষা অবনতি দৃষ্ট হইয়াছে।

৩। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার গো-মহিষ যেমন সংখ্যায় অধিক, তেমনই সর্বাপেক্ষা নির্জীব ও নিকৃষ্ট। প্রজননের ষাঁড়ের জন্য বাংলা অন্য প্রদেশের উপর নির্ভর করে।

৪। বাংলার খাদ্য উত্তর ভারতের অন্যপ্রদেশ অপেক্ষ নিকৃষ্টতর। তাহাতে যেমন চাউলের প্রাচুর্য তেমনই পলীয়ের (প্রোটিন) অভাব। পাঞ্জাবের কয়েদখানায় আমাশয়ে মৃত্যু বিরল; বাংলায় উদরাময়, আমাশয়, বেরিবেরি, চোখের রোগ, যক্ষ্মা প্রভৃতিতে মৃত্যু তাহার খাদ্যের অভাব ও অসামঞ্জস্যের সাক্ষ্য দেয়। শুধু জল বায়ুর জন্য নহে, অপরিপুষ্টির জন্য বাঙালির দেহে, উত্তর ভারতবাসী অপেক্ষা শক্তি ও সহনশীলতা কম।

৫। বর্তমান জগদ্ব্যাপী মান্দ্যের সময় অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ১৯২৮—২৯ সালের তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশি কমিয়াছে। বাংলায় কমিয়াছে শতকরা ৬১.১; বিহার ও উড়িষ্যায় ৫৮.২; মান্দ্রাজে ৪৫ এবং যুক্তপ্রদেশে ৩৫.২। পাট ও চাউলের মূল্যহ্রাস ইহার প্রধান কারণ। ইহাতে বাংলাদেশে যে পরিমাণে এখন জীবনযাত্রার মান কমিয়াছে অন্যপ্রদেশে তাহা হয় নাই।

৬। সমগ্র ভারতবর্ষ ধরিলে উপার্জনরত কর্মীর সংখ্যা গত ৩০ বৎসরে শতকরা ৪ বাড়িয়াছে, কিন্তু বাংলায় কমিয়াছে (–.৯০)।

৭। এই ৩০ বৎসরে বাংলায় শিল্প প্রসার দূরে থাক মোট শিল্পী ব্যবসায়ীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশি কমিয়াছে (শতকরা –১৪.২); যদি সমগ্র জনসংখ্যা হিসাবে শ্রমিক সংখ্যার অনুপাত ধরা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশে এই হার শতকরা ৩৫.৮ কমিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষে কমিয়াছে শতকরা ২১.৮।

৮। বাংলা দেশের জন্মহার ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা দ্রুততর কমিতেছে। বাংলার জন্মহার ১৯২৯—৩৩ সালে গড় পড়তায় (১০০০ প্রতি) ২৭.০; বিহার ও উড়িষ্যায় ৩৪.০; যুক্তপ্রদেশে ৩৬.০। এই জন্মহ্রাস আনন্দের বিষয় হইত যদি ইহা মানুষের স্বেচ্ছায় হইত। অর্ধাশন ও অনশনের ফলে খুব সম্ভবত এই প্রকার জন্মহ্রাস দেখা গিয়াছে।

৯। ১৯৩৩—৩৪ সালে বাংলার পল্লি অঞ্চলে শিশুমৃত্যু হাজার প্রতি ১৮৯। ইহা শুধু মাদ্রাজ অপেক্ষা কম, অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশি; যুক্তপ্রদেশের সংখ্যা হইতেছে হাজার প্রতি ১৭৫, ও মাদ্রাজের হাজার প্রতি ১৯২।

১০। বাংলা দেশে গড় পড়তায় স্ত্রীলোকের পরমায়ুর হার কমিয়া যাইতেছে, অন্য প্রদেশে তাহা হইতেছে না। ১৮৮০ সালের ২৬.৫১ হইতে কমিয়া ১৯৩১ সালে উহা ২৪৮০ হইয়াছে; যুক্তপ্রদেশে তাহা ২৪.৯৪ হইতে বাড়িয়া ২৫.০৯ হইয়াছে ও সমগ্র ভারতবর্ষে, তাহা ২৫.৫৮ হইতে বাড়িয়া ২৬.৫৬ হইয়াছে।

১১। কিন্তু পুরুষের পরমায়ুর হার বাংলা ও যুক্ত প্রদেশে সর্বাপেক্ষা কম, যথাক্রমে ২৪.৯১ ও ২৪.৫৬; পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যার ও মাদ্রাজের হইতেছে ২৮, বোম্বাইয়ের ২৭.৮৪ ও সমগ্র ভারতবর্ষের ২৬.৯১।

১২। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জাতিসমুদার বেশি বংশ বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে যেমন শিশুসংখ্যা অধিক তেমনই আবার মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধের সংখ্যা কম। পাঞ্জাব যুক্তপ্রদেশ ও বিহার অপেক্ষা

বাংলাদেশের মুসলমানদিগের মধ্য শিশুমৃত্যু যেমন অধিক তেমনই তাহাদিগের বৃদ্ধের সংখ্যার অনুপাতও কম। বাংলার কু-জনন সবপ্রদেশ অপেক্ষা কৃষ্টির অন্তরায়।

১৩। বাংলা দেশে যদিও পাঁচ ও ততোধিক বয়স্ক হাজার করা শিক্ষিতের সংখ্যা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রদেশ অপেক্ষা বেশি (১১.১), কিন্তু এই দশ বৎসরে বাংলায় শিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় সকল প্রদেশ অপেক্ষা কম বাড়িয়াছে (+৯.৭); যুক্তপ্রদেশে বাড়িয়াছে ৩৪.৪; বোম্বাইয়ে ২০; মাদ্রাজে ১৯.১; বিহার ও উড়িষ্যায় ৮.৯।

১৪। বাংলায় ম্যালেরিয়া রোগে লোক মরে গড়পড়তায় বৎসরে ৩৫০,০০০। সকল প্রদেশ অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাংলাতেই বেশি, এবং ইহা বাংলার অধিক অধোগতি, স্বাস্থ্যহানি ও জন্মহ্রাসের একটি প্রধান কারণ। বাংলার ৮৬,৬১৮ গ্রামের মধ্যে ৬০,০০০ গ্রাম ম্যালেরিয়ার দ্বারা প্রপীড়িত। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে পরিশ্রম কমে, মাঠে পথে ঘাটে জঙ্গল বাড়ে। মানুষ সহজে অন্য রোগাক্রান্তও হয়। ডাক্তারেরা নির্ধারণ করিয়াছেন ম্যালেরিয়া মৃত্যুতে গড়পড়তায় মানুষের ভোগ হয় ২০০০ দিন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় এই সব লোক মাসে ১০্ করিয়া উপার্জন করে, তাহ হইলে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া হইত, মৃত্যুছাড়া, আর্থিক ক্ষতি হয় বৎসর বৎসর প্রায় ২৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

১৫। সকল প্রদেশ অপেক্ষা মেষ্টন বাটোয়ারায় বাংলার সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতি হইয়াছিল। তাহার ফলে বাংলায় কিছুকাল শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্য কোন দিকের জাতীয় উন্নতি অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। বাটোয়ারাতে বাংলার ৪ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের জন্য নিজস্ব বাক রাজস্ব ধার্য করা হইয়াছিল ১১ কোটি টাকা, কিন্তু বোম্বাইএ ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের জন্য ধার্য করা হইয়াছিল ১৫ কোটি, এবং পাঞ্জাবের ২ কোটি লোকের জন্য ধার্য করা হইয়াছিল ১১ কোটি টাকা। ইহার ফলে জন প্রতি রাজস্বের ব্যায়ের পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক কম হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যার জন্য প্রতি রাজস্ব ব্যয় বাংলা অপেক্ষা কম হইয়াছে মাত্র ১।/০। বাংলায় ব্যয়ের পরিমাণ, ১৯৩১।৩২ সালে হইয়াছে ১৸/ বোম্বাইয়ে হইয়াছিল পক্ষান্তরে ৬ ৸০; পাঞ্জাবে ৪॥/ এবং মাদ্রাজে ৩ ।॥/। শিক্ষার জন্য ইহার ফলে সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশে কম খরচ হইয়াছে। ১৯৩০ সালে রাজস্বের খরচ হইয়াছে শিক্ষার জন্য, টাকা হিসাবে বাংলায়, .২৮; যুক্ত প্রদেশে .৪২; মাদ্রাজে .৬; পাঞ্জাবে .৮০; বোমাইএ ১। সেইরূপ জনস্বাস্থ্য ও ডাক্তারী ভিাগের জন্য শুধু যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষা বাংলার রাজস্বের ব্যয় সবচেয়ে কম হইয়াছে। ধাকা হিসাবে বাংলার খরচ .২১; যুক্তপ্রদেশের .১৪; পাঞ্জাবের .৩৯; মাদ্রাজের .৩৩; বোম্বাইয়ের .৪৭।

১৬। রাজস্ব বিভাগে এই অন্যায়ের কোন প্রতিকার নাই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি মন্ত্রিবিভাগে ব্যয়ের পরিমাণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় মন্ত্রিগণের নিজস্ববিভাগের ব্যয় খুব কম বাড়িতে পারিয়াছে। ১৯২২ সালের মধ্যে বাংলার মন্ত্রিবিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা ১৪; বোম্বাইএ বাড়িয়াছে শতকরা ২৫; যুক্ত প্রদেশে শতকরা ৩০; পাঞ্জাবে শতকরা ৮২;

মাদ্রাজে শতকরা ৮৬। অবশ্য পাটশুল্ক হইতে আদায়ের অর্ধেক বাংলার রাজস্বের অন্তর্গত করায়, অন্যায় প্রতিকারের কিছু চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু পাটের দর এখন কম এবং বিদেশী বাজারও মন্দা, ইহাতে শুল্কের চাপ খানিকটা বাংলার কৃষককে বহন করিতেই হইবে। বাংলার দীন চাষীর দেওয়া ধন বাংলাতেই সবটা ব্যয় হইলে পাট রপ্তানির উপর শুল্কের খানিকটা অনুমোদন করা যায়। কৃষির এই দুর্দিনে শস্যের উপর শুল্ক ধার্য করা বিশেষতঃ যে শস্যের চাষ কমাইতে হইতেছে তাহার খানিকটা কৃষিকার্যের উপর এমন কি জীবনযাত্রার উপরও আসিয়া পড়ে।

১৭। তবুও ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা সর্বাপেক্ষা বেশি করভারাক্রান্ত। বাঙালি ট্যাক্স দেয় ৭।।৵ টাকা জনপ্রতি। যুক্তপ্রদেশের ট্যাক্সের পরিমাণ ৩।।৶, মাদ্রাজে ৫।।৴ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ১৸৹। বাংলার করপ্রদানের ক্ষমতা বোম্বাইয়ের অপেক্ষা কম; অথচ বহির্বাণিজ্যের শুল্ক, পাট রপ্তানির শুল্ক, ইন্‌কম ট্যাক্স এবং লবণ শুল্ক মিলিয়া বাংলা বোম্বাইএর দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশি পরিমাণে কর দেয়। জমির স্থায়ী বন্দোবস্তের অজুহাতে যে বাঙালিকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা অযৌক্তিক, কারণ দেড় শত বৎসরের পুরাতন অনুষ্ঠান এইটি। যে ধন ইহা কোন পরিবার বা শ্রেণি বিশেষ উদ্বৃত্ত রাখিয়াছিল, তাহা এই শতাব্দীতে বহু হস্তান্তরিত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ঐ ধন বণ্টিত হইয়াছে, তাহার ফলে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি এবং তাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট নয়, কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টই বেশি লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া জমির কায়েমী বন্দোবস্ত বাঙালি কৃষকের প্রয়োজন মত, এমন কি জমিদারেরও প্রয়োজন মত প্রবর্তিত হয় নাই। উপরন্তু, উহার ফলে বাঙালি কৃষকের ও জমিদারের দেওয়া অর্থে ইংরাজের সমগ্র ভারতবিজয়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বাংলা তখন যে সকল যুদ্ধ চালাইবার জন্য অজস্র অর্থ ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহা ফেরতের সে এখন ন্যায্য দাবি করিতে পারে যদি অন্য প্রদেশ তাহাতে গত যুগের জমির কায়েমী বন্দোবস্তের জন্য সাধারণ করদানের হার আরও বাড়াইতে বলে।

১৮। বাংলাদেশের মত আর কোন প্রদেশের প্রাদেশিক বাজেটে এতবার ঘাটতি দেখা যায় নাই। এই বৎসর ঘাটতির সপ্তম বর্ষ এবং আমরা যদি ১৯২৮ ও ১৯৩০ এই দুই সালের অল্প বাড়তি ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে রাজস্বের ঘাটতির অবস্থা সুরু হইয়াছে ১৯২৬ সাল হইতে। এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী রাজকোষের অনটন বাংলার সব দিককার উন্নতি স্থগিত করিয়াছে। অথচ ঠিক এই সময়ের মধ্যে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও বিশেষতঃ বোম্বাই অনেক দিকে বাংলা অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিকে বাংলা তাই তাল রাখিতে পারে না।

অস্তমিত গৌরব—প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও মানুষের অবহেলায় বাংলার নদী ও জলসরবরাহের অবনতি। ইহার ফলে বাণিজ্যের হ্রাস, স্বাস্থ্যহানি এবং কৃষির অধোগতি। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন বিরাট সপ্তগ্রাম রাজধানী য়ুরোপীয় ও আরব বণিকের সমাগমে, ধনীর বিলাসপ্রমোদে ও বিরাট সৌধের উচ্চ আস্ফালনে আপনার সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতে, তখন কে জানিত তিন শতাব্দীর মধ্যেই এই অঞ্চল শ্রীহীন, স্বাস্থ্যহীন ও অরণ্যাবৃত হইয়া

পড়িবে, ফিরিঙ্গি কথিত "পোর্টো পেকুইনোর" চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে! সপ্তগ্রাম যখন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছিল তাহার প্রায় সওয়া শত বৎসর পরে একজন ফরাসি নৌসেনাপতি (১৭২৫) কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়াকে ভাগীরথীর উপর সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য সহর বলিয়া লিখিয়াছিলেন। অবশ্য টেভারনিঁয়া বিদিত (১৬৬৬) নদীয়া, কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধির সহিত তাহার পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। কিন্তু ঠিক ঐ সময় হইতেই ভাগীরথীর অবনতি হেতু জাহাজগুলিকে ত্রিবেণীতে নঙ্গর করিতে হইত; সেখান হইতে দেশী নৌকায় পণ্যদ্রব্য কাশিমবাজারে লইয়া যাইতে হইত। ঠিক যেমন এক শতাব্দী পূর্বে ফেডারিকি (১৫৭৮) বর্ণনা করিয়াছিলেন বেতড়ে (হাওড়া সহরের অন্তর্গত বেতাই) জাহাজ নঙ্গর করিয়া নৌকায় পণ্যদ্রব্য বেঝাই করিয়া সপ্তগ্রাম বন্দরে বিদেশী বণিকদিগকে যাইতে হইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশিমবাজার ইংরাজের সুপরিচিত, বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রেশমব্যবসার কেন্দ্র ছিল। তখন কে অনুমান করিতে পারিত যে পশ্চিমবঙ্গের এই বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার শেষ দীপ্তি! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বর্ধমানকে বাংলার উদ্যান বলিয়া ইংরাজেরা বর্ণনা করিতে সেই স্বাস্থ্যকর মনোরম দীর্ঘিকা ও আম্রকানন সুশোভিত বহু মন্দির ও চতুষ্পাঠীমণ্ডিত শাস্ত্রাধ্যয়ন-মুখরিত জনপদ যে এত অধঃপাতে যাইবে তখন কে কল্পনা করিয়াছিল! অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ক্লাইভ ভাগীরথীর পথে মুর্শিদাবাদ পৌছিয়া নগরীর ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া লণ্ডনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিরাট রাজধানীকে বর্ণনা করিয়াছিলেন তখন কে জানিত ৫০ বৎসরের মধ্যেই রাজধানীর অদূরবর্তী রাণী ভবানীর প্রসিদ্ধ বরানগর ম্যালেরিয়ায় একেবারে বিধ্বস্ত হইবে! ঊনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ না হইতেই সেই প্রথম বাংলায় এই মহামারীর আবির্ভাব বরানগরে হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ আজ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জর্জরিত। শৃগাল, কুক্কুর আজ স্বচ্ছন্দে গঙ্গাপার হইয়া যায়, আর রাজধানীর অপর-পারে জগৎ শেঠের গুপ্ত রাজকোষের রক্ষী যক্ষের আত্মা সুবর্ণ মুদ্রা গুণিতে গুণিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, কবরে সিরাজউদৌলার খণ্ডবিখণ্ডিত গৌরবহানিতে শিহরিয়া উঠিয়া উত্তপ্ত শোণিত রক্তিম হয়! ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও কাশিমবাজার, জঙ্গীপুর, সৈদাবাদ (ফরাশডাঙ্গা), কুমারখালি ও রাধানগর রেশমের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে আজ নদী-প্রবাহও নাই, বাণিজ্যও নাই, শিল্পও নাই, আছে শুধু বিপণির পরিবর্তে প্রাচীন ভগ্নস্তূপ, শস্যক্ষেত্রের পরিবর্তে অরণ্য, গ্রামভিটার পরিবর্তে ফণী মনসার কণ্টকবন, মানুষের পরিবর্তে মশককুল!

অর্থিক পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থা—নদীরক্ষা না হইলে বাংলার তিনভাগের দুইভাগে কৃষির উদ্ধার ও পল্লির সমৃদ্ধি নাই। বাংলার পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চল যদি এমনই ভাবে আরও অধোগতির দিকে অগ্রসর হয় তবে অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই কলিকাতাও সপ্তগ্রাম বা মুর্শিদাবাদের মত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। নদী রক্ষা ও সংস্কার, জলসেচ ও নিয়ন্ত্রিত জলপ্লাবন প্রবর্তনের যে প্রণালী আমি ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহা প্রবর্তন করিতে হইলে কলিকাতা বা ঢাকার মত সহরে জলস্রোত ও জলসরবরাহ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার বসাইতে হইবে। গঙ্গা নদী কমিশন বসাইয়া যাহাতে আসাম ও

ছোটনাগপুরের অরণ্য ছেদন বাংলার নদীরও জলপথের উত্তরোত্তর অপকর্ষ সাধন ও উপর্যপরি বন্যা আনয়ন না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যুক্ত-প্রদেশ তাহার সুবিধামত জলসেচের জল গঙ্গা, যমুনা ও সর্দা হইতে অপর্যাপ্ত টানিয়া লইতেছে। ইহাও বাংলার নদীর গতিহ্রাসের একটি কারণ। একটি নিখিল ভারতীয় গাঙ্গেয় কমিশন যুক্ত-রাষ্ট্র গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বিভিন্ন গাঙ্গেয় প্রদেশের বিপরীত স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। নদী শাসন ও সংস্কার এবং জলসেচের আয়োজন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। যুক্তপ্রদেশ বা পাঞ্জাবের মত প্রাদেশিক উন্নতিবিধানে ঋণের অসুবিধা বা অর্থের অভাব হইবে না। যদি কায়েমী জমি বন্দোবস্তের পরিবর্তন হয়। মজুর, প্রজা, জমিদার ও বণিক সকলেরই স্বার্থ এখন কৃষির সম্পদ ও পল্লির স্বাস্থ্যের সহিত জড়িত। একটা বড় রকমের বহুবর্ষব্যাপী নদীশাসন, সংস্কার ও জলসেচের পরিকল্পনা উদ্ভাবন ও কার্যকরী না করিতে পারিলে দেশের রক্ষা নাই; ইহাতে যেমন প্রজা ও মজুরের ক্ষতি তেমনই ক্ষতি জমিদারের। জমিদারকে আপনার শ্রেণিগত স্বার্থ ভুলিতে হইবে না, তাহাকে শুধু অর্জন করিতে হইবে সৎসাহস। কি উপায়ে নির্ব্বিবাদে জমির বন্দোবস্ত পরিবর্তিত হইতে পারে তাহা আমি আমার "Land Problems of India" গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। জমিদারকে এখনকার খাজনার হার কিছু বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্র তাহাকে তাহা দিবার দায়িত্ব স্বীকার করিবে। যেমন ঋণশোধ হয় তেমনই কয়েক বৎসর ধরিয়া সুদ ও কিছু আসল হিসাবে রাষ্ট্র জমিদারের নিকট হইতে স্বত্ব কিনিয়া লইয়া কিস্তি অনুসারে শোধ দিবে এবং জমির নূতন বন্দোবস্ত করিবে প্রত্যেক প্রজার সঙ্গে। খাজনার কত গুণ কিংবা কত কিস্তিতে জমিদার তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিবে এ সম্বন্ধে জমিদারকে, বর্তমান কৃষির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে। জমি-বন্দকী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দিয়া প্রজাদিগকে, রাষ্ট্রের জামিন অবলম্বনে, জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

কায়েমী বন্দোবস্তের পরিবর্তন হইলে বাংলায় শিল্প ও ব্যবসা নূতন বল পাইবে। জমি বাংলার প্রায় অধিকাংশ উদ্বৃত্ত অর্থ টানিয়া লইতেছে, বাঙালি উকিল, ব্যবসায়ী ও মহাজনের অর্থ। তাই আজ বাংলার বড় শিল্প ও কারখানা ব্যবসায়ের মালিক ধনিক ইংরাজ, গুজরাঠি ও মাড়োয়ারী। যখন লোক শিল্প ব্যবসায় বা জমিকে সমানভাবে মূলধন রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার ক্ষেত্র মনে করিবে, তখন জমির দিকে ঝোঁক কমিবে। বাণিজ্যের মূলধনের তখন অভাব হইবে না। বাঙালি যেমন যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্রপোতবাহী বণিক ছিল তেমনই আবার হইবে। শিল্প, কারখানা ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য যেমন জমির সুবন্দোবস্ত অনুকূল হইবে, তেমনই উহার অনুকূল হইতে পারে যে কয়লার খনি-বহুল সিংভূম, মানভূম প্রদেশ বাংলাভাষাভাষী তাহাকে বাংলার রাষ্ট্রিক সীমানার মধ্যে ফিরাইয়া আনা। বঙ্গ বিভাগ এখনও রদ হয় নাই, উহার পূর্ণ রদ করিতে পারিলে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সাহায্যে বাংলায় যে এখন কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা অসমতা রহিয়াছে তাহা শীঘ্র সংশোধন হইতে পারে।

এত বিপুল কৃষিপ্রধান লোকবহুল দেশে কৃষি ও শিল্প কার্যের একটা যথাসম্ভব সমতা ও আদান প্রদান প্রবর্তিত না করিতে পারিলে আমাদের দুর্গতি ঘুচিবে না। কারখানা ও শিল্পর প্রবর্তন হইলে পল্লি অঞ্চলে একটা নূতন বিজ্ঞান বুদ্ধি ও কৌশল আসিবে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে জমির ফসলেরও কিছু পরিবর্তন করিতেই হইবে। যুক্ত প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলের ন্যায় এখানেও আউস ধান, যব, যাওয়ার, রবিশস্য প্রভৃতি অধিক পরিমাণে চাষ করিতে হইবে। কূপ খনন বহুল পরিমাণে চালাইতে হইবে। দামোদর বা দ্বারকেশ্বরের সানুদেশে যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রস্তুত হইবে তাহা যেমন লোহার ও ইস্পাতের কারখানার বিরাট যন্ত্রগুলিকে উঠাইবে, নামাইবে, তেমনই আবার নলকূপ হইতে জল তুলিয়া দিকে দিকে কৃষকের শস্যক্ষেত্র সিক্ত করিয়া দিবে অথবা তন্তুবায়ের কুটিরে তাঁত এবং লোহা, পিত্তল ও কাসার কারীগরের কুটিরে লৌহযন্ত্র চালাইতে থাকিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফসলের পর্যায় ও কৃষির প্রণালী না বদলাইলে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরেও আক্রমণ করিবে। শিল্পবিস্তার না হইলে কৃষির সম্যক উদ্ধার নাই। বাংলাকে এই আসল আর্থিক তত্ত্বটুকুকে আজ আগ্রহে গ্রহণ করিতেই হইবে।

বিজ্ঞান ও সামাজিক বিচার বুদ্ধি—শিল্পের সঙ্গে আসে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের সঙ্গে আসে কর্মকুশলতা ও সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধি। বাঙালি আজ অভাবগ্রস্থ, অনশনক্লিষ্ট, তবুও সে অভাব ও অনশন বাড়াইতেছে অমিতব্যয়িতার দ্বারা। তাহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্ধশতাব্দীতে মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য সব প্রধান প্রদেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, আর এই লোকবৃদ্ধি হেতু বাংলার শিক্ষা প্রচারে, স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, সংস্কৃতির বিস্তার শুধু নয় কৃষির উন্নতিও সুদূরপরাহত হইতেছে। কৃষকের পরিবার বাড়িলে জোত খণ্ড বিখণ্ডিত হয়, চাষের ব্যাঘাত ঘটে। বাঙালি চাষীর অতি ক্ষুদ্র জমি তাহার গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইতে পারে না, অথচ সে পরিবার বৃদ্ধিকে ধর্মের রীতি বলিয়া আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। সহরে সহরে দিনমজুরের সংখ্যা বাড়িয়া চলাতে মজুরির হার বৃদ্ধি, শ্রমিকের বাসস্থান নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যবিধ সামাজিক কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানেরও বিঘ্ন বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি প্রজাস্বত্ব সংস্কার, যাহা না হইলে কৃষকের মিতব্যয়িতা ও জীবনের উচ্চতর মান লাভ অসম্ভব তাহাও অতিরিক্ত, বিক্ষিপ্ত, জমি ও ভিটাবঞ্চিত, কৃষাণশ্রেণির ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সংখ্যা আজ প্রতিরোধ করিতেছে। বহু বৎসর হইতে বাংলার জনসমাজ বংশবৃদ্ধি ব্যাপারে ঘোর অমিতব্যয়ী হইয়াছে! বাঙালি স্ত্রীলোক অল্প বয়সে ঋতুমতী হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ এবং মুসলমানদিগের মধ্য বহু বিবাহ ও নিকাপদ্ধতি প্রচলিত। যৌবনজীবনে স্মৃতি ও আচারের বিধি নিষেধ বাংলার পল্লিসমাজ বহুকাল ভুলিয়া গিয়াছে, অপরদিকে অনাহার ও অস্বাচ্ছন্দ্য মানুষের জীবনের উচ্চ আশা নির্মুল করিয়াছে। অনশক্লিষ্ট, রুগ্ন ও অবসন্ন দেহে সংযম রক্ষা করা সুকঠিন। তাই মিতব্যয়িতার আদর্শ দেশে টিকে নাই। বাংলার কৃষকবধূ ১২ কিংবা ১৩ বৎসরেও জননী হয় এবং গৃহস্থালীর কাজ, মাঠ বা গোয়াল ঘরের কাজ যেমন তাহাকে বিশ্রামের অবসর দেয় না তেমনই তাহার সন্তান উৎপাদন দ্রুত চলিতে থাকে। যদি তাহার সন্তান ধারণের ব্যবধান বাড়ে তাহা হইলে হয়ত এতগুলি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, হয়ত ২/১ জনের শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগের সেবা হয়, অবসরসময় সে একটু বিলাস প্রমোদ করিতে পারে, সুজন্মার দিনে হয়ত ২/১টি রূপার গহনাও সে ন্যায্য দাবি করিতে পারে। একটি সুনিয়ন্ত্রিত, ক্ষুদ্র পরিবারের নূতন আদর্শ কৃষকের কুটিরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে দারিদ্র্য ও

দুর্ভিক্ষ, অস্বাস্থ্য ও মহামারী বাংলার নিত্য সঙ্গী হইবে। আচার ও সংযম, মিতব্যয়িতা ও দূরদর্শিতা হারাইবার ফলে বাঙালি আজ দারিদ্র্যকে ও মহামারীকে অলঙ্ঘ্য বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। বাংলার আর্থিক অধোগতির পশ্চাতে রহিয়াছে আরও ভীষণতর দারিদ্র্য চিত্তের ও চরিত্রের।

মানুষ ও আবেষ্টন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। দুইএর মধ্যে আদান প্রদানই জীবন। সূর্যচন্দ্র, ঋতু পর্যায়, নদী সমুদ্র যেমন মানুষের পরিশ্রম, গৃহস্থালী ও তাহার আচার ব্যবহার, বিধি নিষেধের সঙ্গে গাঁথিয়া রহিয়াছে, তেমনই তাহারা অনুপ্রবেশ করিয়াছে মানুষের অন্তর্জীবনে তাহার আশা নিরাশায়, তাহার জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে। এই দেড় শত বৎসরের ভৌগোলিক প্রকৃতির বিপর্যয় কৃষ্টি ও শিল্পের প্রধান প্রাচীন কেন্দ্রগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া বাঙ্গালীজাতিকে অদৃষ্টবাদী ও জাতীয় তাহার চরিত্রকে আজ হীনবল করিয়াছে। কিন্তু জাতীয় চিত্তের গোপন অন্তঃপুর হইতেই জীবনের প্রথম সাড়া জাগে। এবং ঐ সাড়া জাগিলে মানুষের শ্রম ও চাতুর্য, বুদ্ধি ও বিক্রম বিরুদ্ধ ভৌগোলিক প্রকৃতিকে পরাস্ত ও বশীভূত করিয়া, কুম্ভকার যেমন বাংলার পলিমাটি লইয়া স্বেচ্ছামত পুতুল তৈয়ার করে তেমনই প্রকৃতিকে তাহার জীবনের প্রয়োজনের অনুযায়ী করিয়া গড়িতে থাকে। বাঙালির জাতীয় চিত্তে সেই প্রেরণা আসিয়াছে, যাহার ফলেই তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিশ্রম ও নির্মাণদক্ষতা উচ্চতর জীবনযাত্রার আদর্শে ধ্বংসোন্মুখ আবেষ্টনকে ধনসম্পদে রূপান্তরিত করিবে, বাংলাকে নূতন করিয়া গড়িবে, যেমন যুগ যুগ ধরিয়া বাংলাকে নিত্যনূতন করিয়া গড়িয়াছে বাংলার বালার্ককিরণস্নাত, ঈষৎ রক্তাভ পঙ্কিল জলস্রোত।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ অধিবেশনে অর্থনীতিশাখার সভাপতির অভিভাষণ

জমিদার
ও
রায়তের কথা

বঙ্গদেশের কৃষক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের শ্রীবৃদ্ধি

আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসন কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইতেছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সম্বাদ দিল, তুমি রাত্রি মধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে। সে রোগ পূর্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ, রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যাব পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যু হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, কাণ্ডেলাব্রা, মারবেল, আলাবাষ্টার,—কত বলিব? যে বাবু দূরবীন কষিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাল কলা ধূপ দীপ দিযা বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগা, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট্ নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচকচিতে মাতা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর।

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে, কাহার্ এত মঙ্গল? ঐ যে হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাতায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্তিচর্মাবশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চসিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাতা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাসের সময়। সন্ধ্যা বেলা গিয়া উহারা ভাঙা পাতরে রাঙ্গা২ বড়২ ভাত, লুন লঙ্কা দিয়া আধ পেটা

খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয়, ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পর দিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে— যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত, চসিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি, চষ্‌মা নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখা পড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংস পক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি, যে তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি, অনুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার্ মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ— দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা এই প্রবন্ধে একটী উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পবে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার্ দোষ।

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। দস্যুভীতি, চৌর ভীতি, বলবানকর্ত্তৃক দুর্বলের সম্পত্তি হরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষের, প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সর্বস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারিরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবার প্রতিপালনশক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসার ধর্মে বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্য্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কর্ষিত হইবে,—কেননা অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,—তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি উৎপাদ না করিলে চলে না। কে[illegible] যে ভূমির উৎপন্ন লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত,

হইলেই চাস বাড়িবে। যাহা পূর্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

আর এক কারণে চাসের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে বলিবেন, "টাকা"; তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,— সেই টাকাটি ভারতব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনাফা। কিন্তু সে টাকা. ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্তসামগ্রীর কোন অংশের মূল্য কি না, সন্দেহ! অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্য সকল পাঠাই— যথা, চাউল, রেশম, কার্পাশ, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাসও বাড়িবে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পর্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে— সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর২ অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাস বাড়িতেছে।

চাস বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি— শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্বে ১০০ বিঘা জমী চাস করিয়া বার্ষিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাস করিলে, ন্যূনাধিক* ২০০ টাকা পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাস করিলে, তিন শত টাকা পাইব। বঙ্গদেশে দিন২ চাসের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটা কথা আছে। সকলে মহা দুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত করা ভার— দ্রব্য সামগ্রী বড় দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নির্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্মাক্রান্ত যুগ— দেশ উচ্ছন্ন গেল! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্তমান সাধারণ দৌর্মূল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে টাকায় তিন সের ঘৃত ছিল; সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা ঘৃত দুর্মূল্য হইয়াছে, টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার পূর্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই

* সমাজতত্ত্ববিদেরা বুঝিবেন, এখানে "ন্যূনাধিক" শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, কিন্তু সাধারণ পাঠ্যে এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্য বৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় টাকা; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার্ ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি।

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০-৭১ শালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ শালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি? শক্ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দেশ করিয়াছেন— যথা তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেআপ্ত, নূতন "পয়স্তি" ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকে বলিবেন, ঐ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু, শক্ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পূর্বাবধারিত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণনেণ্ট পাইতেছেন— সাড়ে বাষট্টি লক্ষ টাকা— তাহা কৃষিজাত ধন হইতেই পাইতেছেন।

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাণ্ডারে যাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত। কষ্টমহৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়।

শক্ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই বণিক্ এবং মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক্ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের লাভ স্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু, কৃষিজাত ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্ সাহেবের ভ্রমমাত্র। এ ভ্রম কেবল শক্ সাহেবের একার নহে। "ইকনমিষ্ট" এই মতাবলম্বী। "ইকনমিষ্টের" ভ্রম "ইণ্ডিয়ান অবজর্বরের" নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক নাই।

অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামিরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী; জমিদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্য্যে নাই। অধিকার থাক বা না থাক, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজানা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ।

প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমীর খাজানা বাড়িবে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমী দিবেন। রামা কৈবর্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজানা দেয়। হাসিম শেখ, সেই জমী চায়— সে দেড় টাকা হার স্বীকার করিতেছে। জমীদার রামাকে উঠিতে বলিলেন। রামার হয় ত, দখলের অধিকার নাই, সে অমনি উঠিল। নয় ত, অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জন দিয়া সেও উঠিল। জমীদার বিঘা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন।

এই রূপে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন সুযোগে না কোন সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে। আইন আদালতের আবশ্যক করে নাই— বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে।

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, আইন আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া ধর্ম আছে। আইন— সে একটা তামাসা মাত্র— বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্ব বর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমীদারের দয়া ধর্ম— তাহার আর একটি নাম স্বার্থপরতা। যতদূর স্ক্রু ফিরে, তত দূরে ফেরান। যখন আর ফিরে না, তখন দয়া ধর্মের আবির্ভাব হয়।* স্ক্রু ফিরাইয়া ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বর্ধিত ধার্য্য আয় ভূস্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে। কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদারী অতি অল্প।

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেমিক কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্ পায়েন, মহাজন পায়েন,— কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ, কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাতার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থ বর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয় গান করিব না।

[বঙ্গদর্শন ১২৭৯ ভাদ্র, পৃষ্ঠা ২২৬-২৩১]

* আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, সকল ভূস্বামী এ চরিত্রের নহেন। অনেকের যথার্থ দয়া ধর্ম আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জমীদার।

জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালি কৃষকের শত্রু বাঙ্গালি ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমন নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমিদারকর্ত্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে সুহৃৎগণের প্রতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালি জাতির চূড়া, কে না তাহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে প্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয় ত তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র হইব। তাহা হইলে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। কিন্তু কর্তব্য কার্য্যানুরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্য মধ্যে নিতান্ত দুর্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজ-মধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম. তবে মহা পাপ স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত, সমাজশ্রেষ্ঠ ভূস্বামিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইব— অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভৎর্যিত উপহাসিত অমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইব— বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে,— পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে,— যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতিবিবেচনা করিব না। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মার্জনা করিবেন,— এই ভিক্ষা। আমরা জানিয়া শুনিয়া কোন অযথার্থোক্তি করিব না। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্ত কণ্ঠেই বলিব।

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা জমীদার সম্প্রদায়

সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজা বৎসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অত্র প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেই খানে ঐ অত্যাচারী জমীদার গুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় জমীদার সম্প্রদায় বুঝিবেন না।

বাঙ্গালি কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাসের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী শুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধাব লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে হইবে। তাহা দিলেক। পরে যাহা বাকি রহিল, অল্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি। তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন।—

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল-- কাহার বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্রমাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল- দোহাই পাড়িল— হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত, তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিক টাকায় চারিআনা। তিন বৎসরেও চারিআনা, এক মাসেও চারিআনা। তিন টাকা বাকির সুদ বারআনা। পরাণ তিন টাকা বারআনা দিল। পরে চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্বণী। নাএব, গোমস্তা, তহশীলদার, মহুরি, পাইক, সকলেই পার্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব

গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার্ দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে?

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক২ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন— তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা। তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা— তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল— তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাসের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা, মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী-সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাসা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাসা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলা বাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া পরিশেষে কর্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেননা মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা "রিলিফ" কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্প সংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসাস্থল নহে। মনে কর, সে বার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালশোহানা, কোটাল, বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্বুদ্ধি ঘটিল— সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া দিয়া গোমস্তাকে বলিল. "পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।" তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটী ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল— শরীরেও কিছু

উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন, কাছারিতে রহিল। হয় ত, পরাণের মা কিম্বা ভাই, থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব ইনস্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনষ্টেবল পাঠাইলেন। কনষ্টেবল সাহেব— দিন দুনিয়ার মালিক— কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া-- একটু কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল। কনষ্টেবল সাহেব একটু ধুম ধাম করিতে লাগিলেন— কিন্তু "কয়েদ খালাসের" কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্— বৎসরে দুই তিন বার পার্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সেদিনও সর্বসুখময় পরমপবিত্রমূর্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টি মাত্রেই মনুষ্যের হৃদয়ে আনন্দ রসের সঞ্চর হয়— ভক্তি প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, "কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক— সে পুকুর ধারে তালতলায় লুকাইয়াছিল— আমি ডাক দিবামাত্র সেই খান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।" মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে যে কারণে হয়। আজি, গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, "পরাণ আমাকে লইয়া খায় না"— তখন পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐ রূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, "পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে"— অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে— অমনি পরাণকে ধরিতে লোক ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক, বা জামিন লইয়াই হউক, বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক, বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশয়েই হউক, পুনর্বার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক, যা বহুকাল আবদ্ধ রাখার কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাস আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা। মহলে মাঙ্গল চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর চারি আনা দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে। দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে— তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল— পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই— সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল— গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড়২ কালো২ পাঁটা আনিয়া, মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড়২ জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড়২ কালো২ বার্তাকু, গোল আলু, কপি, কলাই সুঁটিতে ঘর পুরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে "আগমণী", "নজর" বা "সেলামী" দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে দুই আনা বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে "ক্রোক সহায়তার" প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, "পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক কবিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হেঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়ত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।" গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধান গুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম "ক্রোক সহায়তা।"

পরাণ দেখিল, সর্বস্ব গেল। মহাজনের ঋণও পরিশোধ করিতে পারিব না, জমিদারের খাজনাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল— কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গণার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের মূল্য চাই; উকীলের ফিস চাই; আশামী সাক্ষির তলবানা চাই; সাক্ষির খোরাকি চাই; সাক্ষিদের পারিতোষিক আছে; হয় ত আমীন খরচা লাগিবে; এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলা বর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব।— তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষিরা সকল জমীদারের প্রজা-- সুতরাং জমীদারের বশীভূত; স্নেহে নহে— ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্য মন্ত্রে সেই পথবর্ত্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অদুল করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্‌মিস্ হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতি পূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল; অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচার গুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এ রূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি— একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজি এক জনের উপর এক রূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদার বিশেষে, প্রদেশ বিশেষে, সময় বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্বত্র এক নিয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটি যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া এক খানি তালিকা উদ্ধৃত করিব।

যে প্রদেশ গত বৎসর ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের এক খানি গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগষ্টের অবজর্বরের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল। গ্রাম খানি সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় জলে ভাসিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের কর্তব্য, অর্থদানে খাদ্যদানে প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজানা মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজানাটা দুদিন রহিয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া বসিয়া খাজানা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময়ে পাইক পিয়াদা সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দলবলসহ উপস্থিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১২।১৪ জন খোদকাস্ত প্রজা, এবং ১২।১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট চুয়ান্ন টাকা দুই আনা আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা এই;—

নায়েবের পুণ্যাহের নজর	...	৬৲
জমীদারদিগের পাঁচ শরিকের ঐ	...	৫৲
গোমস্তাদিগের ... ... ঐ	..	২৲
পুণ্যাহের পিয়াদার তলবানা	..	১৲
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ	..	১৲
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা	.	তের আনা
ভাদ্রের ... ... ঐ	...	১৲ পাঁচ আনা
নৌকা ভাড়া	...	১৲ আট আনা
সদর আমলার পূজার পার্বণী	..	৬৲ আট আনা
কাছারির জমাদার	...	১৲
ঐ হালশাহানা	...	১৲
পাঁচ শরিকের পার্বণী	...	৫৲
শ্রীরাম সেন, হেডমুহুরি	...	১৲
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা	...	২৲
গোমস্তাদের ... ... ঐ	...	১২৲
মুহুরিদের ... ... ঐ	...	৩৲
বরকন্দাজদিগের দোলের পার্বণী	...	১৲
ডাকটেক্স	...	৩৲
		৫৪৲ দুই আনা

এই [illegible] সময়ে প্রজাদিগের [illegible] পড়িল।

আদায় করা অসাধ্য; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা কায়ক্লেশে মেঙ্গেপেতে বেচে কিনে হাওলাত বরাত করিয়া, ঐ টাকা দিল। কিন্তু লোকে মনে করিবে, মনুষ্য দেহে সহ্য অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে করিলেন না। তাঁহারা জানেন, একটি একটি প্রজা, একটি একটি কুবের। যে দিন টাকায় তিনআনা হারে ৫৪ টাকা দুই আনা আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার ৪।৫ দিন মধ্যেই আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে।

প্রজারার নিরুপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠীতে গিয়া কর্জ চাহিল। কর্জ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল— মহাজনও বিমুখ হইল।

তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল— ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আশামীদিগকে সাজা দিলেন। আশামীরা আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, "প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আমি আশামীদিগকে খালাস দিলাম।" সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আশামী খালাস?

এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইণ্ডিয়ান অবজর্বর হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। দুষ্ট লোক সকল সম্প্রদায় মধ্যেই আছে, দুই একজন দুষ্ট লোকের দুষ্কর্ম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে— এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না।

উপরের লিখিত তালিকার শেষ বিষয়টির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। "ডাকটেক্স।" গবর্ণমেন্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া মহা কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন। ঐ "ডাকটেক্স" কথাটি তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেন্ট বিধান করিলেন, মফঃস্বলে ডাক চলিবে, জমীদারেরা তাহার খরচা দিবেন। জমীদারেরা মনে মনে বলিলেন, "ভাল, দিতে হয় দিব, কিন্তু ঘরে থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যদি বসাইতে হইল, তবে একটু চাপাইয়া বসাই, যেন কিছু মুনাফা থাকে।" তাহাই করিলেন। প্রজার খরচে ডাক চলিতে লাগিল—জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ করিলেন। গবর্ণমেন্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার ঘাড়ে পড়ে।

ইন্‌কমটেক্সও ঐ রূপ। প্রজারা জমীদারের ইন্‌কমটেক্স দেয়। এবং জমীদার তাহা হইতেও কিছু মুনফা রাখেন।

খাস মহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে "রোড ফণ্ড" দিতে হয়। ঐ রোড ফণ্ড আমরা ভূস্বামির জমাওয়াশীল বাকি ভুক্ত দেখিয়াছি।

রোডসেস্ এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট কোথাও হইতে আদায় করেন নাই। কিন্তু জমীদারেরা কেহ২ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নালিশ করিল, এ বার আশামী "আইন অনুসারে" খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন।

সর্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত "হাস্পাতালির" বৃত্তান্তটি কৌতুকাবহ। সবডিবিজনের হাকিমেরা স্কুল, ডিস্পেন্সরি করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণার কোন আসিষ্টান্ট মাজিস্ট্রেট স্বীয় সবডিবিজনে একটি ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য তৎপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা করিলেন। সকলে কিছু২ মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন বাটী গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, "আমাকে মাসে২ এত টাকা হাস্পাতালের জন্য চাঁদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় এক আনা হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।" গোমস্তরা তদ্রূপ আদায় করিতে লাগিল। এ দিকে ডিস্পেন্সরির সকল যোগাড় হইয়া উঠিল না— তাহা সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং ঐ জমীদারকে কখন এক পয়সা চাঁদা দিতে হইল না। কিন্তু প্রজাদিগের নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা হাস্পাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার ঐ প্রজাদিগের খাজানার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ করিলেন। প্রজারা জবাব দিল যে, "আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে খাজনা দিয়া আসিতেছি— কখন হার বাড়ে কমে নাই— সুতরাং আমাদিগের খাজানা বাড়িতে পারে না।" জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহারা অমুক সন হইতে হাস্পাতালি বলিয়া এক আনা খাজানা বেশী দিয়া আসিতেছে সেই হেতুতে আমি খাজানা বৃদ্ধি করিতে চাই!

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবাব প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন২ অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামিদিগের কোন অত্যাচার নাই— যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমত বিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐ রূপ। বড়২ জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে,— অনেক বড়২ ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই, সামান্য২ ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে— অধর্মাচারণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর ২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়ারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে হইবে, তাঁহার মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইঁহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পাত্তনি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতে তাঁহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবর্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমত বিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোন রূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব

ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে২ যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন২ গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদি সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন— জমীদারদের সমাজ। তদ্দ্বারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না, বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদার দিগের কেবল নিন্দা করা, অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন২ লোকের দ্বারা যে প্রজা পীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবার পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না— জন সমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্য্যকরী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্য্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসিদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে অনেক দুর্বৃত্ত জমীদার দুর্বৃত্তি ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য, আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশনকে অনুরোধ করি। যদি তাঁহারা কুচরিত্র জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্তকাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্তিত হইবে। এবং তাঁহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে। এ কাজ না হইলে বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। যাঁহা হইতে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাঁহারা সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বহুদর্শী, এবং কার্য্যক্ষম। তাঁহারা ঐকান্তিক চিত্তে যত্ন করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে পারে। আমরা যাহা কিছু এবিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়াই, আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাঁহারা যদি এবিষয়ে অনুরাগহীনতা দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও অখ্যাতি।

[illegible]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আইন।

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র— অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ নহে। দুর্বলের উপর পীড়ন করা, বলবানের স্বভাব। সেই পীড়ন নিবারণ জন্যই, রাজত্ব। রাজা বলবান হইতে দুর্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যের রাজশাসন শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যক। যদি কোন রাজ্যে দুর্বলকে বলবানে পীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্তব্য সাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাঙ্মুখ। যদি এদেশে জমীদারে কৃষককে পীড়িত করেন, ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অবশ্য দোষ আছে। দেখা যাউক, তাঁহারা আপন কর্তব্য সাধন পক্ষে কি করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত; কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পার্বণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা স্বজাতির রাজ্যকালের পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্য বিষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়। তদ্দ্বারা জানা যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না। যাঁহারা মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ের প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন যে, প্রাচীন হিন্দু রাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাপীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। যদি প্রজাপীড়নের প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত; কেননা সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতি মাত্র। প্রজাপীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজা পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার গৌরব। যূনানী রাজগণের নামই ছিল "Tyrant" সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপীড়ক। ইংলণ্ডীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক বলিয়া প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিবাদ হইত; একজন রাজা প্রজা কর্তৃক পদচ্যুত, অন্য একজন নিহত হন। ফ্রান্স, প্রজাপীড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং অসহ্য প্রজাপীড়নের জন্যই ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রজাপীড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন রাজগণের এবিষয়ে বিশেষ গৌরব। তাঁহারা কেবল ষষ্ঠাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা এক প্রকার কর সংগ্রহের কন্ট্রাক্টর হইল রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে

পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারির সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি। এই কন্ট্রাক্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সর্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।

তাহার পর ইংরাজেরা রাজা হইলেন। তাঁহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন তাহাদিগের সেই অবস্থা। তাহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস মহা ভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর সর্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই, জমীদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কন্ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন।

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একবারে লোপ হইল। প্রজারই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিন্ কালে কালে কেহ নহেন— কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামির নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ রাজ্যে বহু দেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র-- কস্মিন্ কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী, কেননা এ বন্দোবস্ত "চিরস্থায়ী।"

কর্ণওয়ালিস্ প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন— জমীদার কর্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, "প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনেরল যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।"*

"বিধিবদ্ধ করিবেন" আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমীদার কর্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ। ১৮১৯ শালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ লিখিলেন, "যদিও সেই বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদিগের স্বত্ব নিরূপণ এবং সামঞ্জস্য করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুযায়ী অদ্যাপি কিছুই করা হইল না।" এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ শালে কাম্বেল নামক একজন বিচক্ষণ রাজ কর্মচারী লিখিলেন, "এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট গ্রাম্য ভূস্বামী (প্রজা) দিগের অগ্রে জমীদারকে দাঁড় করাইয়া, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন; সুতরাং যে অঙ্গীকার মত কর্ম করেন নাই।"

* ১৭৯৩ শালের ১ আইনের ৮ ধারা।

বরং তদ্বিপরীতই করিলেন। দুর্ব্বলকে আরো দুর্ব্বল করিলেন, বলবানকে আরও বলবান করিলেন। ১৮১২ শালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাট্টা দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট যে কোন হারে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। ডিরেক্টরেরা স্বয়ং এই অর্থ করিলেন,* সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না। কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ।

এই ১৮১২ শালের ৫ আইন পূর্ব্ব কালের বিখ্যাত "পঞ্জম"। যদি কেহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহিত, সে "পঞ্জম" করিত, এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই। "কোরোক" কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। সন ১৮১২ শালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে বৎসর জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেন, সেই বৎসর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল।† জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন। অদ্যাপি এই দস্যুবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ কপালের দোষ।

পরে ১৮১২ শালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ডিরেক্টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন।‡

তাহার পর সন ১৮৫৯ শাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ শালে, বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ শালে কর্ণওয়ালিস যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় লার্ড কানিঙ হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ প্রথম, সেই পূরণও শেষ। তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৫৯ শালের ৮ আইন দশ আইনের অনুলিপি মাত্র।¶

১৮৫৯ শালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না। প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা, হয় নাই। কোরোক-লুটের বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, প্রজার খাজানা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ রহিয়াছে। এ আইনের সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে।

তথাপি এই টুকু মাত্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার কতই কোলাহল করিয়াছিলেন! অদ্যাপি করিতেছেন!

* Revenue Letter to Bengal 9th may, 1821 para 54.

† সন ১৭৯৩ শালের ১৮ আইনের দুই ধারা।

‡ Revenue Letter 9th may, 1821 para 54

¶ এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গীয়প্রজা" (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রবন্ধের এ অংশের কতক২ সেই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি।

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে২ প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতিবারে দুর্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলরাম জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন?

ইচ্ছাপূর্বক ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দেওয়ানী পাইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত, কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেষ্টা। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা বিদেশী; এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে২ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভ্রমে পতিত হইয়া এই মহৎ অনিষ্টকর বিধি সকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ— সে প্রতাপে সমগ্র আশিয়া খণ্ড সঙ্কুচিত; তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না কেন? বহুদূরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা জন কয়েক ইংরাজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্য লোপ হইল। আর রাজপ্রতিনিধির অট্টালিকার ছায়াতলে লক্ষ২ প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতীকার হয় না কেন? জমীদার প্রজা ধরিয়া আনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফশল লুটিতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্বস্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতীকার হয় না কেন? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুরুষেরা আইন করিয়াছেন, আদালত করিয়াছেন, তবে গবর্ণমেণ্টের ক্রটি কি? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। আইন আছে— সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে— সে আদালতে দোষী জমিদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না— সে আইন আইন কিসে? সে আদালতের বল কেবল দুর্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে? শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধা করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ব করেন? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালি কৃষকের জন্য তাঁহাদিগের নিকট যুক্ত করে রোদন করিতেছি— তাঁহাদের মঙ্গল হউক।— ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় হউক।— তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা সংক্ষেপে নির্দেশ করিব।

প্রথমতঃ মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকার ব্যয়, তাহার উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। যাহা ব্যয়সাধ্য, তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ত্ত নহে। সুতরাং তাহারা তদ্দ্বারা সচরাচর উপকৃত হয় না; বরং তদ্বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। জমীদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন। দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে লইয়া উপস্থিত করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুর্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, কৃষককে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাস প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে

পারে না। ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য্য ক্ষতি হয়, এবং অনেক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ করিতে গেল, সেই অবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুরি করিয়া লইয়া গেল, না হয়, আর এক জন কৃষক গোমস্তার নিকট হইতে পাট্টা লইয়া তাহার জমী খানি দখল করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক অত্যন্ত আলস্য পরবশ। শীঘ্র নড়ে না, সহজে উঠে না, কোন কার্যেই তৎপরতা নাই। দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমীদারের অত্যচার নীরবে সহ্য করিবে, তথাপি দূরে গিয়া তাহার প্রতীকার করিতে চাহে না। যাঁহাবা বিচারকার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের বিচারালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক; দূরের মোকদ্দমা প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকিলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার আর একটি ফল এই হইয়া উঠিয়াছে যে, অত্যাচারী গোমস্তারাই বিচারকে স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যখন এক জন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, তখন তাহার নালিশ জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নালিশ হয় না, যে ব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়ক, এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচার কার্য্য থাকায়, দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমানে বুঝিবেন।

তৃতীয়তঃ, বিলম্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতীকার বলিয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য নালিশ করিল। যদি বড় কপাল জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বৎসরে। আপীলে আর এক বৎসর। যদি আত্যন্তিক সৌভাগ্য গুণে আপীলে ডিক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারিত টাকা আদায় হইল, তবে সে আর এক বৎসরে। বাদির কুড়ি টাকায় ধান ক্ষতি হইয়াছিল, ডিক্রীজারি করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল। এরূপ প্রতীকারের আশায় কোন্ কৃষক জমীদারের নামে নালিশ করিবে?

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অল্প— যেখানে তিন জন বিচারক হইলে ভাল হয়, সেখানে এক জন বৈ নাই। সুতরাং মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে বিলম্ব ঘটিয়া যায়। আর প্রচলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচারপ্রণালীতে অত্যন্ত লিপি বাহুল্যের, এবং অত্যন্ত কার্য্য বাহুল্যের আবশ্যকতা। আজ এ মোকদ্দমার প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে একটি মোকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল; সুতরাং আর পাঁচটি মোকদ্দমার কিছু হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার দিন পড়িল। কাল নিষ্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি নিষ্প্রয়োজনীয় সাক্ষী অনুপস্থিত, তাহার উপর দস্তক করিতে হইল। সুতরাং মোকদ্দমা আর এক মাস পিছাইয়া গেল। এ সকল না করিলে বিচার আইনসঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আপীলে টিকে না। বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,—অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারি আইন ঘূণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজি আইনের মর্ম্ম এই।

আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন২ যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয়। আমদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে ঢোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে

গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে২ কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলা গিরি প্রভৃতি অনেক গুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন২ পণ্য দ্রব্যের প্রশংসা করিতে২ অধীর হইতেছেন। গলাবাজির জোরে, আগে যাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা বড় লোক হইতেছেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা নাই, সর্ব্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে। আর কেহ বেআইনি করিয়া সুবিচার করিতে পারে না। তাহাতে দীন দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র।

মনে কর, গোমস্তা কি অপর কেহ কোন দুঃখী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্ম্য করিল। গোমস্তা সেশ্যনের বিচারে অর্পিত হইল। সেশ্যনের বিচারে প্রতিবাদী সাক্ষিদিগের সত্য কথায় অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জুরির হাতে। জুরর মহাশয়েরা এ কাজে নূতন ব্রতী, প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষির জোবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে২ নিকাশ করিতেছিলেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্বোধ্য বাঙ্গালায় "চার্য্য" দিতেছিলেন, তখন তাঁহারা মনে২ জজ সাহেবের দাড়ির পাকা চুল গুলিন গণিতেছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বলিলেন, "সন্দেহের ফলে প্রতিবাদী পাইবে," তাহাই কেবল কানে গেল। জুরর মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ— কিছুই শুনেন নাই, কিছুই বুঝেন নাই; শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয়ত সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। গোমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার কাছারিতে গিয়া জমকিয়া বসিলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল। যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটামাটী লোপ করিলেন। আমরা বড় সন্তুষ্ট হইলাম— কেননা জুরির বিচার হইয়াছে— বিলাতি প্রথানুসারে বিচার হইয়াছে— আমরা বড় সভ্য হইয়া উঠিয়াছি।

বর্ত্তমান আইনের এই রূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা অবিচারের চতুর্থ কারণ।

পঞ্চম কারণ, বিচারক বর্গের অযোগ্যতা। এ দেশের প্রধানতম বিচারকেরা সকলেই ইংরাজ। ইংরাজেরা সচরাচর কার্য্যদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদনুষ্ঠাতা। কিন্তু তাহা হইলেও বিচার কার্য্যে তাঁহাদিগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেননা তাঁহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা তাদৃশ অবগত নহেন, এ দেশের লোকের চরিত্র বুঝেন না, তাহাদিগের সহিত সহৃদয়তা নাই, এবং অনেকে এ দেশের ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। সুতরাং সুবিচার করিতে পারেন না। বিচার কার্য্যের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকেরই হয় নাই।

কেহ২ বলিতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকদ্দমাই অধস্তন বিচারকের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশীয়,— তবে উপরিস্থ জন কতক ইংরাজ বিচারকের দ্বারা অধিক বিচারহানি সম্ভবে না। ইহার উত্তর, প্রথমতঃ, সকল বাঙ্গালী বিচারকই বিচারকার্য্যের যোগ্য নহেন। বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি, অশিক্ষিত, অথবা অসৎ। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন অল্প সংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীরা বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহার কারণ, এ দেশীয় উপার্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক, বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন না। সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচারকে সুবিচার করিলে কি হইবে? আপীলে চূড়ান্ত বিচার

ইংরাজের হাতে। নীচে সুবিচার হইলেও উপরে অবিচার হয়, এবং সেই অবিচারই চূড়ান্ত। অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পারিলেও আপীলের ভয়ে করেন না; যাহা আপীলে থাকিবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে হাইকোর্ট অনেক সময়ে বিশেষ অনিষ্টকর। তাঁহারা অধস্তন বিচারকবর্গকে বিচারপদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন;— বলেন, এই রূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এই রূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি ভ্রমাত্মক— কখন২ হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে। কিন্তু অধস্তন বিচারকদিগকে তদনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন সুবার্ডনেট জজ, মুন্‌সেফ ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অনেক আছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞদিগের নির্দেশবর্তী হইয়া চলিতে হয়।

এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর, "সমাজদর্পণ" নামে এক খানি অভিনব সম্বাদ পত্র দৃষ্টি করিলাম। তাহাতে "বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ" এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে, আমাদিগের এই প্রবন্ধের পূর্ব পরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি, কেননা লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেই রূপ বিবেচনা করেন, বা করিতে পারেন। তিনি বলেন,—

"একেই ত দশ শালা বন্দোবস্তের চতুর্দিকে গর্ত খনন করা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদর্শনের মত দুই একজন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালির অনুমোদন বুঝিলে কি আর রক্ষা আছে?"

আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি, যে দশ শালা বন্দোবস্তের ধ্বংস আমাদিগের কামনা নহে, বা তাহার অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ শালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেহ ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গ সমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলের মিথ্যাচারী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই নাই। যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব। এবং ইংরাজেরাও এমন নির্বোধ নহেন যে, এমত গর্হিত এবং অনিষ্টজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যতদূর প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, "যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোন রূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা উভয়েরই অনুকূলে এ রূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত হয় যে তদ্দ্বারা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্তব্য।" আমরা তাহাই চাই।

ইহাও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায়, এবং অনিষ্টকারক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যে ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ববান করিয়াছেন, এবং কর বৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দূষ্য বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন। এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, ন্যায় সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক। আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের

সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।

লেখক আরও বলেন;—

"আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে।** সকলেই বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, বিদেশীয় বণিক্ ও রাজপুরুষেরা প্রায়ই লইয়া যাইতেছেন। যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগের বর্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবেচনায় যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্বকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। **"বঙ্গদেশের কৃষকের"** প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন২ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। তদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই।

২। বিদেশী বণিক্ ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে দেশে টাকা থাকিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিকদিগের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর তাৎপর্য্য বোধ হয়, এই যে, বণিকেরা এই দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ কি? যে টাকাটা তাঁহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা। বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন তাহা দুই প্রকারে; এক আমদানিতে, আর এক রপ্তানিতে। এ দেশের দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশান্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। দেশান্তরের দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার লাভ নাই।

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না। যে দেশে তাহা বিক্রয় হয়, সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান। এখানে তিন টাকা মন চাউল কিনিয়া, বিলাতে পাঁচ টাকা মন বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা করিলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল। বরং এ দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার চাউল তাঁহাদের কাছে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা করিল। অতএব বিদেশীয় বণিকেরা এদেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পরিলেন না। বরং কিছু দিয়া গেলেন।

তবে ইহাই স্থির যে, তাঁহারা যদি কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশান্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনাফায়। বিলাতে চারি টাকার থান কিনিয়া এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা হইল, তাহা এ দেশের

লোকে দিল। সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় বটে, যে এ দেশের টাকাটা তাঁহাদের হাত দিয়া বিদেশে গেল। দেশের টাকা কমিল। এই ভ্রমটি কেবল এ দেশের লোকের নহে। ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং তথায় কৃতবিদ্যা ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অদ্যাপি দূর হয় নাই। ইহার যথার্থ তত্ত্ব এত দুরূহ যে, অল্পকাল পূর্বে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। রাজগণ ও রাজমন্ত্রীগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন। এবং সেই প্রবৃত্তির বশে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক বসাইতেন। এই মহাভ্রমাত্মক সমাজনীতি সূত্র ইউরোপে (Protection) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুচ্ছেদ পূর্বক আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য প্রণালী (Free Trade) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট্ ও কব্‌ডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ফ্রান্‌সে তাহা বিশেষ রূপে বদ্ধমূল করিয়া, তৃতীয় নাপোলিয়নও প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছেন। তথাপি এখনও ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দূর হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চর্য কি? Protection হইতে ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বক্লের গ্রন্থ পাঠ করিবেন। যিনি তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল পাঠ করিবেন। ঈদৃশ দুরূহতত্ত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ ভাগে হইতে পারে না। আমরা কেবল গোটা কত দেশী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

আমরা ছয় টাকা দিয়া বিলাতি থান কিনিলাম। টাকা ছয়টি কি অমনি দিলাম? অমনি দিলাম না,—তাহার পরিবর্তে একটি সামগ্রী পাইলাম। সেই সামগ্রীটি যদি আমরা উচিত মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশী দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের ক্ষতি। কিন্তু যদি একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতিই নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশীমূল্য দিয়াছি কি না। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও পাই না, পাইলে তাহা সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এক পয়সা কমে ঐ থান কোথাও পাই না, তবে ঐ মূল্য অনুচিত নহে। যে ছয় টাকায় থান কিনিল, সে উচিত মূল্যেই কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামগ্রীটি কেনা হইল, তবে ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক বিদেশে পলায়ন করিল? তাহারা দুই টাকা মুনাফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কোন ক্ষতি করিয়া লয় নাই, কেননা উচিত মূল্য লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া মুনাফা করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, সেখানে দেশের অনিষ্ট কি?

আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপত্তি কারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত। ভালই। কিন্তু দেশী তাঁতির কাছে থান কই? সে যদি থান বুনিতে পারিত, ঐ মূল্যে ঐ রূপ থান দিতে পারিত; তবে আমরা তাহারই কাছে থান কিনিতাম— বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেননা বিদেশীও আমাদের কাছে থান লইয়া বেচিতে আসিত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি সমাজ নীতির আর একটি দুর্বোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থূল কথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী

তাঁতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি নাই, তাহা দেখাইয়াছি। দেশী তাঁতিরও ক্ষতি নাই। সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপড় বুনিতেছে। যে সময়ে ঐ ছয় টাকার জন্য থান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে। অতএব তাহার যে উপার্জন হইবার, তাহা হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর অধিক উপার্জন করিতে পারিত না; থান বুনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকিত। যেমন থানের মূল্য ছয় টাকা পাইত, তেমনি ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না; সুতরাং লাভে নোকসানে পুষিয়া যাইত। অতএব তাঁতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তার্কিক বলিবেন, তাঁতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাঁতির ব্যবসায় মারা গেল। তাঁতি থান বুনে না, ধুতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এ জন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে।

উত্তর। তাঁতির তাঁতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতত্ত্ববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাঁত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাঁচ টাকা লাভ করিবে। থানে বা ধুতিতে সে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। তবে তাঁতির ক্ষতি হইল কই?

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে। তুমি বলিতেছ, তাঁত বুনিয়া খাইতে না পাইলেই ধান বুনিয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনিবার অনেক লোক আছে। আরও লোক সে ব্যবসায়ে গেলে ঐ ব্যবসায়ের লভ্য কমিয়া যাইবে, কেননা অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে সুতরাং ধান সস্তা হইবে। যদি ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, তবে দেশের টাকা কমিল বই কি?

উত্তর। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমরা বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক সামগ্রী লয়। যেমন আমরা কতক গুলিন বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তুত সেই২ সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, সেই রূপ বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতক গুলি সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের সেই২ সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন ধুতির প্রয়োজন কমিতেছে, তেমনি চাউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতকগুলি তাঁতির ব্যবসায় হানি হইতেছে, তেমনি কৃষি ব্যবসায় বাড়িতেছে, বেশী লোকের চাস করিবার আবশ্যক হইতেছে। অতএব চাসীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না।

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পূর্ব ব্যবসায়ের হানি হয়, নূতন ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের ক্ষতি পূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি থান খরিদে তাঁতির ক্ষতি নাই। তাঁতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। যদি বণিক থান বেচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না, তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাণ্ডার লুঠ করিল কেন? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কিসে?

আমরা তাঁতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাঁতি অন্য

ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহা তাঁতিদের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ধনক্ষতি নাই; কেননা থানের পরিবর্তে যে চাউল যায়, তদুৎপাদন জন্য যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে। তবে তাঁতি সেই ধন না পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে। তাঁতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না।

অনেকের এই রূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া নগদ টাকা বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এ রূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য,—

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থ হানি হইল না। নগদ টাকাই ধন নহে। যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র। তাহার বিনিময়ে আমরা যদি অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না।

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে। একজনের একশত টাকা নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়া গোলা জাত করিল। তাহার আর নগদ টাকা নাই, কিন্তু এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পূর্বাপেক্ষা গরিব হইল?

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবিক বিদেশীয় বণিকেরা এদেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূল্য হুণ্ডিতে চলে। সঞ্চিত অর্থ দলিলে থাকে। অতি অল্পমাত্র নগদ টাকা বিলাতে যায়।

তৃতীয়তঃ, যদি নগদ টাকা গেলেই ধন হানি হইত, তাহা হইলে বিদেশীয় বাণিজ্যে আমাদিগের ধন হানি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে। কারণ যে পরিমাণে নগদ টাকা বা রূপা আমাদিগেব দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই রূপায় নগদ টাকা হইতেছে। নগদ টাকাই যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয়া নিজের ধন বৃদ্ধি করিতেছি, নিজে নির্ধন হইতেছি না।

এ সকল তত্ত্ব যাহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছে না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেলওয়েগুলি প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার?

বিদেশীয় বণিকদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা কিছু২ বর্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রাজ কর্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে সামান্য মাত্র। বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের পরিচয় মত কৃষি জন্য যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর২ বাড়িতেছে, কমিতেছে না।

৩। লেখক বলিতেছেন, "যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস জমীদারদিগের বর্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়?"

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে— তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত?

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার এক মাত্র কারণ যে তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ২ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটিই এই ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড়ি বাঁধিলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন; কাঁড়ি না দেখিতে পাইলে তাঁহারা ধন আছে, বিবেচনা করেন না। লক্ষ২ টাকা এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায়; কিন্তু আধ ক্রোশ অন্তর একটি একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করা কর্তব্য, ধনের কোন্ অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল, দুই এক স্থানে কাঁড়ি ভাল, না ঘরে২ ছড়ান ভাল? পূর্ব পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, একস্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গল কারক হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরাও এ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেই রূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানানুসারে ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাই ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দূষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে এই দুই চারিজন অতিধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশ শুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না, সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এদেশে প্রায় তাঁহার গর্দভ জন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহারা নিতান্ত অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড় মানুষ না হইয়া, জন সাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যানের ঘরে বসিয়া মৃদু২ কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্র গর্জন গম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত। আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাঁহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

|বঙ্গদর্শন ১২৭৯ পৌষ, পৃষ্ঠা ৩৯৪-৪০৯|

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাকৃতিক নিয়ম।

আমরা জমীদারের দোষ দিই, বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অনুন্নতি ধারাবাহিক; যতদিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দশার সূত্রপাত। পাশ্চাত্যের কথায় বলেন, একদিনে রোমনগরী নির্মিতা হয় নাই। এদেশের কৃষকদিগের দুর্দশাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। আমরা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দু রাজ্যের রাজ্যকালে রাজা কর্ত্তৃক প্রজাপীড়ন হইত না; কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় না যে তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল। এখন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ অনেক জমীদারে প্রজাপীড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পীড়িত করিত। তাহারা কে, তাহা পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানুসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অদ্য যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যত দূর বঙ্গদেশের প্রতি বর্ত্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি ততদূর বর্ত্তে; বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ড মাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে। এবং সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমত নহে; শ্রমজীবীমাত্রেই সমভাগে সে ফলভোগী। অতএব আমাদিগের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে অভিপ্রেত, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষিজীবী এত অধিক যে, অন্য শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা, সমান।

জ্ঞান বৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বক্ল কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বক্ল বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না, এবং এই বঙ্গদর্শনে অন্য লেখক কর্ত্তৃক সে কথার প্রতিবাদ হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজ মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিদ্যালোচনার পূর্ব্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহ জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতি ব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজ মধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্ম ভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণ পোষণের যোগ্য খাদ্যোৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না, কেননা যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য

থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্ম ভরণ পোষণে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণ পোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্দ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্বে প্রথমে আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশ বিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্বরতা। যে দেশের ভূমি উর্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবিদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতক গুলিন স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই; আমরা এতদংশ বক্লের গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়া লিখিতেছি; কৌতূহলবিশিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বক্ল এই বলেন, যে তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যক হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্যের অধিক আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজলের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্বন। অতএব শীত প্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক— বনজের অধিক আবশ্যক। বনজ সহজে প্রাপ্য — কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু দুর্লভ। অতএব উষ্ণ দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও উর্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্ব কালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু, একটী সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর হইয়া, জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অর্জিত ও প্রচলিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এই রূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে২ নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না,—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দশা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা

ইত্যাদি তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজ মধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রম করে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কার স্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অর্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে, দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যোপজীবীর। প্রথম ভাগ, "মজুরির বেতন," দ্বিতীয়ভাগ ব্যবসায়ের "মুনাফা।"* আমরা, "বেতন" ও "মুনাফা," এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। "মুনাফা" বুদ্ধ্যোপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা "বেতন" ভিন্ন মুনাফার কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, "মুনাফার" মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না।

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ "বেতন," পঞ্চাশ লক্ষ "মুনাফা"। মনে কর, দেশের পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা "বেতন," পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা "মুনাফা," তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণ পোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই, তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দশা হইবে।

যদি ঐ লোকাগমের সঙ্গে২ আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কুলাইত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোক সংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি— যথা ইংলণ্ড ও আমেরিকার। আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দুর্দশা। ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘটিল।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার একটি২ সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুর্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায়

* "ভূমির কর" এবং "সুদ" ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না।

আছে। প্রকৃত সদুপায় সঙ্গে২ ধনবৃদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধন বৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মাত্র। এক উপায়ে দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক শেষোক্ত দেশে যাউক,— তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোক সংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, আস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহ প্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকা নির্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহ প্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে, এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি দায়ক। দেশান্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং পরিশ্রমের কাজ। বিশেষ প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলঙ্ঘ্য পর্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্র মধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এই রূপ সামান্য ঔপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহ প্রবৃত্তির দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটী আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি এবং জীবন ধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতা প্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহ প্রবৃত্তি দমনে প্রজা পরাঙ্মুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই, ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতা হেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জন সাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্ট হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম ধনের তারতম্য— তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যোপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফলে অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতি শাস্ত্রের মূল।

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায়।

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ। প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দারিদ্র্য।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেননা যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যোৎজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব।

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।

২। ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলেই ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়ম গুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিপ্সা সভ্যতা বৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত, মনুষ্য হৃদয়ের দুইটী বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয় ধনলিপ্সা। প্রথমোক্তটী মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টী স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু "History of Rationalism in Europe" নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, দুইটী বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সা কদাচিৎ, ধনলিপ্সা সর্বসাধারণ; এজন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনের জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। সর্বদা নূতন২ সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যকীয় বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব সুখ স্বচ্ছন্দতার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্যসুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্বলা হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও থাকেনা, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। অতএব যে "সন্তোষ" কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টভাব, ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম গুণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে, তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য। তৎকারণ পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীর মধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভাবের আবশ্যকতা হয় না বলিয়া তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্য্য তৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পূর্বকালীন তাদৃশ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। উদ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্তসিংহের মুখে আহার্য্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেক গুলিন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয়কর্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ,

কি স্মার্ত্ত কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন, যে ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্ম যাজকগণ কর্তৃক ঐহিক সুখে অনাদর তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্রবৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এই রূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন যুনানী সাহিত্য, যুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষা নিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে২ সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমুল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধমুল হয়। এদেশের ধর্মশাস্ত্র কর্তৃক যে নিবৃত্তিজনকশিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আবার সেই ধর্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা জন্যা নিবৃত্তি আর দৃঢ়ীভূতা হইল।

৩। শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে, সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা জন্মে।

(ক) উপজীবিকানুসারে, প্রাচীন আর্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্দশার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্য ব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্য ব্যবসায়িদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাব বৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশূন্য, নিজ শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিকদিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈকি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্বর ভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্য বাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,— অতি প্রাচীনকালেই যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। অদ্য কয়েক বৎসর তাহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। বাণিজ্য হানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা ধর্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা, রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিৎ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই, যে সাধারণ প্রজা সতেজঃ, এবং রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই, আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল, এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। এতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী, সেই খানেই রাজপুরুষ দিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জনে ব্যস্ত, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারত কীর্ত্তিত বলশালী, ধর্মিষ্ঠ, ইন্দ্রিয় জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের

কাব্যনাটকাদি চিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রৈণ, অকর্মঠ দশা প্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্মতি দেখিলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণ সকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। নির্বিরোধে তৎ সমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে, ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে, প্লিবিয়ানদিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমনদিগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন, অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া, পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিনবর্ণের অনুন্নতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপরবর্ণের মানসিক শক্তি হানি হওয়াতে, তাহাদিগের চিত্ত উপধর্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক হয়। উপধর্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতা পূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম। অতএব অপরবর্ণত্রয়, মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্ম-পীড়িত হইল; ব্রাহ্মণেরা উপধর্মের যাজক, সুতরাং তাঁহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থা জাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল— নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি উর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এদিগে রাজশাসন প্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। "আমরা যে রূপে বলি, সেই রূপে শুইবে, সেই রূপে খাইবে, সেই রূপে বসিবে, সেই রূপে হাঁটিবে, সেই রূপে কথা কহিবে; সেই রূপে হাসিবে, সেই রূপে কাঁদিবে, তোমার জন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদি'াকে দক্ষিণা দিও।" জালের এইরূপ সূত্র। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়, কেননা ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে২ যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুবর্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত রোধ করিলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দু সমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়ম জালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধি স্ফূর্তি লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্য দর্শন প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানসক্ষেত্র মরুভূমি হইল।

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটী প্রাকৃতিক কারণ ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবীদের চিরদুর্দশা। প্রথম ভূমির উর্বরতাধিক্য, দ্বিতীয় বাযবাদির তাপাধিক্য। এই দুই কারণে অতি পূর্বকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন অল্প হইয়া উঠিল। এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম প্রথম শ্রমোপজীবীদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব। দ্বিতীয়, এই দশা একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক

নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই দুর্দশা ক্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক স্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্য, একত্রে নিম্ন ভূমে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল আইন করিলে কি ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমিদার প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অনুর্বরা হইবে? উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য, যে যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরূপ না হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সকল ফলোৎপত্তি কারণান্তরে প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাহিত্যাদির আবিষ্ক্রিয়া না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্বরতা বা অন্য বাহ্যপ্রকৃতির কোন কারণের কিছু পরিবর্তন হইত না।

[বঙ্গদর্শন ১২৭৯ ফাল্গুন, পৃষ্ঠা ৪৯১-৫০০]

রায়তের কথা

প্রমথ চৌধুরী

ভূমিকা
শ্রীমান্ প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু

আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা উর্ধমূল অবাক্‌শাখ। উপরের দিক থেকে এর শুরু, নিচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে। তোমার 'রায়তের কথা' পড়ে আমার মনে হল যে আমাদের পলিটিক্‌স্‌ও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল এই জিনিসটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর-মহলে,—কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই উর্ধলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষ ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্‌স্‌। সেই পলিটিক্‌সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষা—কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলি, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের উর্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্ছে, —যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে, হাসছে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে কষাঘাত করে বলছে "অদৃষ্ট"! দেশের সেই পোলিটিশান্ আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্‌স্‌ আজ মুখ ফিরিয়েছে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছ থেকে মুখ ফেরায়। বলছে, "কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।" তখন ছিল পূর্বরাগ ও অভিসার, এখন চলছে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয়নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম "চাই", আজ তেমনি জোরেই বলছি "চাইনে"। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু "চাইনে, চাইনে" বলবার হুহুংকারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু "চাই" জুড়ি, তার আওয়াজ বড়ো মিহি। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি, ভদ্রসমাজের পোলিটিক্যাল বারোয়ারি জমিয়ে তুলতেই তা ফুরিয়ে যায়, তারপরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ আমাদের আধুনিক পলিটিক্‌সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি—দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারো বা আছে জমিদারি, কারো বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে, পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই, অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন—কী শব্দ-সম্বলে, কী অর্থ-সম্বলে। যদি দেওয়ানি

অবাধ্যতা চলত তাহলে তাদের ডাকতে হত বটে,—সে কেবল খাজনা বন্ধ করে মরবার জন্যে; আর যাদের অদ্যভক্ষ্য-ধনুর্গুণ তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ ক'রে হরতাল করবার জন্যে, উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁকা ভঙ্গিটাকে অত্যন্ত তেড়া করে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতবিই থেকে যায়। আগে পাতা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার পরুক কোপনি—তারপর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ, দেশের পলিটিক্স্ আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই শুরুতেই পলিটিক্সের সাজ ফরমাশের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে ছেঁটে বদলে জুড়ে যে-সাজ বানিয়েছে ঠিক সেই নমুনাটা দরজির দোকানে চালান করলেই হবে। সাজের নামও জানি, একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য মুখস্থ, কেননা আমাদের কারখানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে; ডিমোক্রেসি, পার্লামেণ্ট, কানাডা অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি; এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি; কেননা গায়ের মাপ নেবার জন্যে মানুষকে সামনে রাখবার কথাই একেবারে নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তারপর স্বরাজ যাদের জন্যে। তারা পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেছে, জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারিতে আগে স্বরাজ পাব, তার পরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে হোক সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিশের পেয়াদা আছে, গলায় ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্সো, আর আছে ওকালতির দংষ্ট্রাকরাল সর্বস্বলোলুপ আদালত।

এই সব কারণে আমাদের পলিটিক্সে তোমার 'রায়তের কথা' স্থানকালপাত্রোচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোডবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না—শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোতবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেলে কিনা, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে—আগে গাড়ি টানাও, তাহলেই অমুক শুভলগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই; তারপরে পৌঁছবামাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে, ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল, হাল-আমলের পলিটিক্সে টাইম-টেবিল তৈরি, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধানা কর্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেব্‌লের দোষ নয়, ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তার্কিক, এত বড়ো উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও,—ঘোড়াটা যে চলে না, বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাশানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চাও। এদিকে হালফ্যাশানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘসছে; ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলছে, অতি শীঘ্র-পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার

গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার রায়তের কথা সেই ঘোড়ার কথা—যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

২

কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজির পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে—Made in Europe। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্, সিণ্ডিক্যালিজম্ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধিবুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে পিষে ফেলো, দ'লে ফেলো; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক্। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বউয়ের দল বলছে শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তাহলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরি হবে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই ভববন্ধন ছেদন করা যায় না—স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মারমুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে—তাদের সে তর্ সয় না। তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্স্ নিয়ে পার্লামেণ্টীয় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেছে তার মধ্যে মাট্‌সিনি গারিবাল্‌ডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরানীকে বিসর্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এক প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়, এখনকার গান ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বল্‌শেভিজ্‌ম্, ফাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে-সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্য-কারণ তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকলনিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ অবতার পঙ্কনিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্তমির দ্বারা উপর ও নিচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের

চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্যেই আজকের দিনের নিচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নিচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডবনৃত্য করা যায়, তাহলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক এক সময়ে মাথায় বিপরীত চক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়—কিন্তু, সেই দেখাদেখি পাগলামি চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে—মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

৩

আমি নিজে জমিদার, এইজন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তাহলে দোষ দেওয়া যায় না— ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে-বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি— অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয় ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁত নখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে-সব উচ্চ অঙ্গের কথা বলে তাতে বোঝা যায় তাদের "নামে রুচি" আছে, কিন্তু কাল যখন "জীবে দয়া"র দিন আসবে তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ, নামটা হচ্ছে মুখে আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে-জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তাহলে তাকে দ'লে ফেললেও সেই মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ, মাটি বদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট্, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জন না ক'রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা ব'লে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে, 'রায়তের কথা'য় পুরাতন দফতর ঘেঁটে তুমি সেই সুখস্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ রাজ-সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি, রায়তদের বলছি 'প্রজা', তারা আমাদের

বলছে 'রাজা';— মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলামচোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই—তার দ্বারা গোলামচোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে? জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারি হওয়া উচিত যে-মানুষ বই পড়ে। যে-মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয় বইয়ের সদ্‌ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে, তাহলে যার বইয়ের শেল্‌ফ্‌ আছে, বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কী করে করা যায়। সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে-ছবি রচনা করে লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল ক'রে বসে। অধিকার আছে ব'লে নয়—ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে: যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে—মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে ছবি যতদিন বাজারে আসতে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৪

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-সত্ত্ব হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি, জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করিনি, কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারত পাবে কিনা, সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল, তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত তাহলে নীলের বন্যায় রায়তি জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়াড়ি দখল-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্রমশ

প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তাহলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মতলব এদের কারো মাথায় যে কোনোদিন আসেনি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা নিযুক্ত আছে, তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই-সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্ছে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল-খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো? মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়তখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে, তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে-প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে, অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্তসীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জন-গর্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোটো মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে—এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ত।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকে নিজের করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে-আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উলটিয়ে মারা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড়ো বড়ো পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব, রায়ত যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে ততদিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।

একথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু ততো বড়ো স্বাধীনতার অধিকার তারই যার শিশু-বুদ্ধি নয়। যে-রাস্তায় সর্বদা মোটর চলাচল হয় সে-রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম—কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে। তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

৫

আমি জানি জমিদার নির্বোধ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সংকীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও তেমনি, কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া—যদি তাও না মান এটা মানতে হবে, সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমা-বৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনাপাওনায় জমিদারের রাজস্ব-বৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ-কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনোমতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরখায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানিনে—জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু, আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে, নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া সে ততকাল পর্যন্ত টিকবে কিনা সন্দহে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টীকা

রবীন্দ্রনাথ যে আমার 'রায়তের কথা'র দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এ আমার পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আমি এ কথাটি তুলি এই আশায় যে, বাংলার বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সহৃদয় লোকেরা এ কথার বিচার করবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, মহামতি শিক্ষিত সম্প্রদায় আমার কথায় কর্ণপাত করেন নি। ফলে, এ বিষয়ে তাঁরা হাঁ না কিছুই বলেন নি। সম্ভবতঃ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, আমি পূর্বে যেমন সাধুভাষা বনাম বাংলাভাষার মামলা তুলেছিলুম এ ক্ষেত্রেও তেমনি পলিটিকাল সাধু মনোভাবের বিরুদ্ধে পলিটিকাল বাংলা মনোভাবের মামলা তুলেছি। অতএব, এ ক্ষেত্রে চুপ করে যাওয়াই শ্রেয়, নচেৎ তর্কের চোটে আমি লোকের কান ঝালপালা করে দেব। আমি যে একজন নাছোড় তার্কিক, তার পরিচয় যাঁরা বাঙলা জানেন তাঁরা পূর্বে যথেষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু এ নীরবতার যথার্থ কারণ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন।

আমারও একটা পলিটিক্স্ আছে, যুগধর্মের প্রভাব আমার মনের উপরও পূর্ণমাত্রায় প্রভুত্ব করে। কিন্তু আমার পলিটিক্সের প্রস্থানভূমি হচ্ছে বাঙলার জমি, বিলেতের আকাশ নয়। ফলে ও উড়ো পলিটিকসের মতো বিচিত্র ও চমকপ্রদ নয়। মহাভারতে পড়েছি যে একটি হংস বলেছিলেন, "তোমাদের সাক্ষাতেই আমি উর্ধগতি, অধোগতি, বেগগতি, সমগতি, ধীরগতি, সম্যক্গতি, বক্রগতি, বিচিত্রগতি, সর্বদিকে গতি, পশ্চাদগতি, সুকুমারগতি, প্রচণ্ডগতি, দীর্ঘগতি, মণ্ডলাকারে সমগতি, সর্বদিকে সমগতি, বেগে অবরোহণ, বেগে উর্ধগমন, শোভনগমন, মণ্ডলাকারে অধঃপতন, শোভনভাবে উর্ধগমন. শোভনভাবে অধঃপতন, অনেকের সহিত গমন, পরস্পর ঈর্ষাসহকারে গমন, পরস্পর স্নেহভাবে গমন, গতাগত, প্রতিগত, কাক-সমুচিত, বহুতর গতিতে বিচরণ করিব।" —আমি দেশের লোকের কাছে উক্তরূপ বিচিত্র শূন্যলীলা প্রদর্শন করতে অঙ্গীকার কস্মিনকালেও করিনি, কারণ পলিটিকাল পরমহংস হবার শক্তি যে নিজদেহে ধারণ করিনে—এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল, এখনো আছে। আর. যে পলিটিক্সের শিকড় দেশের মাটিতে-বদ্ধ সে পলিটিক্স্ যে উঁচু নজরের লোকের চোখে পড়বে না, সে তো ধরা কথা।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আমার কি এমন কোনো মন্ত্রণাদাতা বন্ধু ছিলেন না যিনি আমাকে এই মেঠো পলিটিক্স্ থেকে বিরত করতে পারতেন। বন্ধুভাগ্যে আমি একেবারে বঞ্চিত নই। আর, সকলেই জানেন, বন্ধুমাত্রেই বন্ধুর মন্ত্রী যেমন স্ত্রী মাত্রেই স্বামীর প্রাইভেটটিউটার। তবে যে আমার বন্ধুবর্গ আমাকে পলিটিক্সের বহুজনসেবিত শূন্যমার্গ অবলম্বন করতে পরামর্শ দেন নি, তার কারণ, তাঁরা জানেন যে আমি

পলিটিশিয়ান নই, সাহিত্যিক। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে লোকের মুখে লাগাম দেওয়া চলে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়। আর সাহিত্যিককে সামাজিক করবার চেষ্টা যেমন বৃথা তেমনি অনর্থক।— দেশের সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিশিয়ান হয়ে ওঠে তাহলে পালটা জবাব দেবার জন্য সব পলিটিশিয়ান রাতারাতি সাহিত্যিক হয়ে উঠবে। ফলে মনোরাজ্যে কি ভীষণ অরাজকতা ঘটবে তা ভাবতে গেলেও আতঙ্ক হয়। পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু যদি কাব্য লিখতে শুরু করেন আর মৌলানা মহম্মদ আলি দর্শন, আর আমরা তা পড়তে বাধ্য হই, তাহলে কোন্ সাহিত্যিক না বানপ্রস্থ অবলম্বন করবার জন্য ছট্‌ফট্ করবে। এই সব কারণে আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা আমার মুখে হাত দিতে চেষ্টা করেননি। "যার কর্ম তারে সাজে"—এ জ্ঞান তাঁদের ছিল। আসল কথা হচ্ছে, সাহিত্যিকের পলিটিক্স্ একেলেও নয়, সেকেলেও নয়, তেকেলে। সুতরাং তা একালের সঙ্গেও খাপে খাপে মিলে যাবে না, সেকালের সঙ্গেও নয়, অথচ ও দুকালের সঙ্গেই তার যোগাযোগ্য আছে।

২

আজকাল এমন কোনও কথা বলবার জো নেই আর-পাঁচজনে যাকে একটা ismএর ভিতর টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা না করবেন। তা যদি না করেন তাহলে তাঁরা যে শিক্ষিত তা কী করে প্রমাণ হয়। আমি যে ism-নাস্তিক তার পরিচয় বোধ হয় আমার 'রায়তের কথা'র পত্রে পত্রে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথও সোশ্যালিজম্, কম্যুনিজ্‌ম্, সিন্‌ডিকালিজ্‌ম্ প্রভৃতি কথায় ভয় পান এবং কেন ভয় পান সে কথা তিনি তাঁর পত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। ও সব ধর্ম ভারতবর্ষের নয়। কেন যে নয়, সংক্ষেপে তা বলছি।

কালী, তারা, মহাবিদ্যা প্রভৃতি যেমন একই আদ্যাশক্তির বিভিন্ন মূর্তি— সোশ্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্, সিণ্ডিকালিজ্‌ম্ প্রভৃতিও ক্যাপিটালিজ্‌মেরই বিভিন্ন মূর্তি। এ কথা এতই সত্য যে স্বয়ং লেনিন কম্যুনিজ্‌ম্ ওরফে বলশেভিজ্‌মের নাম দিয়েছেন স্টেট ক্যাপিটালিজ্‌ম্।

এই ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্ জিনিসটে কী? ওর জন্ম হয়েছে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ থেকে। যতদিন ইউরোপে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ থাকবে ততদিন ক্যাপিটালিজ্‌মও থাকবে, বদল হবে শুধু ওর নামরূপে।

—এর থেকে প্রমাণ হয় যে, যে দেশে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ নেই সে দেশে সোশ্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্, সিণ্ডিকালিজ্‌ম্ প্রভৃতি, যার মাথা নেই তার মাথা-ব্যথার সামিল। এ জাতীয় শিরঃপীড়ায় লোক অবশ্য ভীষণ আর্তনাদ করতে পারে যেমন খালিফের অভাবে খিলাফত করছে, কিন্তু সে চীৎকারধ্বনিতে সহজ লোকের কান্না না পেয়ে হাসি পায়।

আমাদের দেশে এই রায়তের সমস্যাটা হচ্ছে নন্-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্ সমাজের সমস্যা। এ বিষয়ে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের কটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, রাসেলের তুল্য বিদ্বান ও

বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইউরোপের পলিটিক্সের ভাবরাজ্যে আর দ্বিতীয় নেই, সুতরাং তাঁর কথা শোনা যাক।—

In a non-industrial community, liberal ideals, if they could be carried out, would lead to a division of the national wealth between peasant proprietors, handicraftsmen and merchants. Such a society exists at this day on China, except in so far as it is interfered with by foreign capitalists and native military commanders.' The latter revert to the right of the sword, the former introduce fragments of modern industrialism.

—*Prospects of Industrial Civilization,* p. 55.

বলা বাহুল্য যে ইকনমিকালি ভারতবর্ষ ও চীন সমাবস্থ। আমি 'রায়তের কথা'য় বাংলার রায়তরা যাতে peasant proprietor হয়ে উঠতে পারে সেই প্রস্তাবই করেছি। এতে শুধু প্রজার নয় সমাজেরও মঙ্গল হবে। আমি রায়তের পক্ষ থেকে যে-সব ছোটোখাটো অধিকারের দাবি করেছি সে-সব অধিকার লাভ করলে বাংলার রায়তের দল peasant proprietorship-এর দিকে আর একটু অগ্রসর হবে। চীনের রায়তের অপেক্ষা বাংলার রায়তের অবস্থা এক বিষয়ে ভালো। আমাদের দেশে কোনো native military commanders নেই যারা তরবারির সাহায্যে রায়তের স্বত্ব অপহরণ করতে পারে। Foreign capitalist অবশ্য দুই দেশের আছে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গে একদল রায়ত-বন্ধুর সন্ধান পেয়েছেন যারা নাকি শুধু দ'লে ফেলবার, পিষে ফেলবার পক্ষপাতী। পৃথিবীতে যে মতই প্রচার করা যাক না, লোকে তা নিজের বুদ্ধি ও চরিত্র অনুসারে অঙ্গীকার করবে। এবং এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীতে বহু নির্বোধ লোক আছে এবং নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধির সদ্ভাবও অনেক ক্ষেত্রে মেলে। সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়ের উপসর্গ জুড়ে দিতে অনেকে লালায়িত। এর জন্য মানুষে দুঃখ করতে পারে, কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে না। ধর্মের অর্থ যে অনেকের কাছে বিদ্বেষবুদ্ধি তার প্রমাণ তো হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য অবশ্য ধর্ম দায়ী নয়। আর যেখানে মামলা হচ্ছে ধর্মের নয় অর্থের, সেখানে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য প্রভৃতি রিপুর স্ফূর্তি তো হবেই। যে যাই হোক 'রায়তের কথা' যে riotএর কথা নয় তা বোঝবার মতো ভাষাজ্ঞান আশা করি অধিকাংশ পাঠকেরই আছে।

৩

রায়তকে তার দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট জোত হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ আছে। তাই তিনি হস্তান্তর করবার পক্ষে আমার কী বলবার আছে তা শুনতে চেয়েছেন। 'রায়তের কথা'য় এ বিষয়ে আমি কোনো আলোচনা করিনি। এই মাত্র বলেছিলুম যে, এ ব্যাপারের পক্ষে ও বিপক্ষে যে-সব কথা বলবার আছে সে-সব কথা আর যার মুখেই শোভা পাক বাংলার অধিকাংশ জমিদারের মুখে

শোভা পায় না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা যা দেখেন তা প্রজার হিতাহিত নয়—দেখেন শুধু দাখিল-খারিজের নজরের তারতম্য। যে ব্যাপারে নিজের পকেট ভারি হয় তাতে যে অপরেরও হিত হয়, এ রকম মনে করায় বিশেষ আরাম আছে। পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ঐ রকম বিশ্বাসের প্রতি মানুষের মন সহজেই অনুকূল।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি,—কেননা তাঁর জমিদারি-সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো।—কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাংলার জমিদার মাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি unique। আমি সেই সব জমিদারের কথা বলছি যাঁরা শতকরা নিরেনব্বই।

আমরা হাজার স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও যেমন শিশুকে সকল বিষয়ে সমান স্বাধীনতা দিতে নারাজ তার ভালোর জন্য, তেমনি বাংলার রায়তকে তার নিজের সর্বনাশ করবার স্বাধীনতা দিতেও নারাজ হতে পারি—রায়ত বেচারার ভালোর জন্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। আমি অনেক বিষয়েই লিবারাল অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও, সকল লোককে কথায় কাজে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ যে তাকে অমানুষ করা, এ জ্ঞান আমারও আছে। বিলেতে যখন অবাধ মদ্যপানকে আইনত সবাধ করবার প্রস্তাব ওঠে তখন জনৈক লিবারাল বলেছিলেন যে, I would rather have England free than England sober। আমার লিবারালিজ্‌ম্‌ অবশ্য অতদূর উঁচুতে ওঠে না। Drink স্বাধীনতার উপর যদি হস্তক্ষেপ করা না যায় তো তা sober স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবে। প্রবৃত্তির অধীনতাকে যে অনেকে ইচ্ছার স্বাধীনতা মনে করেন, তার পরিচয় তো নিত্যই পাওয়া যায়।

তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, শিশু ছাড়া আর কারো শৈশব আমার কাছে প্রীতিকর নয়। একহাত পরিমাণ ছেলেকে কোলে করতে সকলেরই লোভ যায় কিন্তু সেই মাপের প্রাপ্তবয়স্ক লোককে অর্থাৎ বামনকে অঙ্কস্থ করতে সহজ মানুষে সহজেই নারাজ হয়। অনেক লোক যাদের আমরা শিশু বলি তারা মনোজগতে বামন ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনো দেশে বেশির ভাগ লোক এই জাতীয় হয় তাহলে সেটা অবশ্য এতটা দুঃখের বিষয় যে, কী করে তাদের আবার মানুষ করা যায় সেইটিই হচ্ছে আসল ভাবনার কথা। এ দেশে রায়তের দল উক্ত হিসেবে বাস্তবিকই শিশু,—কিন্তু এই শিশুদের কী করে মানুষ করতে হবে সেটা একটা মস্ত সমস্যা, তবে আমি যে সমস্যা তুলেছি তার থেকে পৃথক সমস্যা।

আমি অবাধ হস্তান্তরের পক্ষপাতী এই কারণে যে হস্তান্তর করবার অধিকার হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে একটা proprietory right এবং সে right আমার মতে যে জমি চষে তার থাকা উচিত। সে চাষী ক অথবা খ তাতে কিছু যায় আসে না। ক জমিদারের স্বত্ব-স্বামিত্বও তো নিত্য খ জমিদারের হাতে যাচ্ছে। এখন যদি কেউ প্রস্তাব করে যে

জমিদারি কেউ হস্তান্তর করতে পারবে না, তাহলে ক চ ট ত প পঞ্চবর্গ জমিদার পঞ্চমুখে তার প্রতিবাদ করবেন। মানবচরিত্র এই যে কোনোরূপ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে কোনো বিশেষ লোককে চিরকাল বেঁধে রাখা যাবে না। লক্ষ্মীর সঙ্গে মানুষের এমন বিবাহ হতে পারে না যার আর ডিভোর্স নেই। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষ নামক জঙ্গম জীবকে সেকালের ভূম্যধিকারীরা তাঁদের জমিতে শিকড় গেড়ে গাছের মতো স্থাবরজীব হতে বাধ্য করেছিলেন, এ ব্যবস্থার নাম সার্‌ফ্‌ডম্। একালে আমাদের ও নাম শুনলেই ভয় হয়। অপরপক্ষে ক'র জমি খ'র হাতে যাওয়াটা আমরা বিশেষ দুঃখের কথা মনে করিনে।

তবে কথা হচ্ছে, ক'র জোত যদি খ'র হাতে না গিয়ে গ'র হাতে যায়? ক-ও চাষী-প্রজা খ-ও তাই, কিন্তু গ হচ্ছেন তিনি যিনি প্রজা কিন্তু চাষী নন, তিনি যিনি জমি চষেন না, কিন্তু তার উপর-টপকা ফল ভোগ করেন—অর্থাৎ জোতদার। গ যখন জমি চষে না তখন সে তা অবশ্য ঘ'কে দিয়ে চষাবে। এই ঘ হবে তখন একজন কোর্ফা প্রজা অথবা আধিয়ার। ফলে এই নূতন জাতের প্রজার উপর অবশ্য সে জমির পূর্ব মালিক ক'র কোনো অধিকারই বর্তাবে না, তার সকল অধিকারের মালিক হবে গ। ফলে এই হস্তান্তরের বলে ঘ'র জোতে দখলী স্বত্বও থাকবে না, তাঁর হস্তান্তরের অধিকারও থাকবে না। অর্থাৎ আমি জমিদারের অধীনস্থ রায়তকে যে সব স্বত্ব-স্বামিত্ব দিতে চাই জোতদারের অধীনস্থ রায়তের তা কিছুই থাকবে না। ফলে হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই রায়তের সকল স্বত্ব জোতদারের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাবে। আর হস্তান্তরের ফলে বহু জোত যে জোতদার আত্মসাৎ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; খরিদ-বিক্রির কথা অবশ্য টাকার কথা। সুতরাং যার টাকা আছে সেই যে জোত খরিদ করবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। জমিদার ও রায়তের ভিতর মহাজনের হবে মধ্যস্বত্ব।

কিন্তু এর উপায় কী? ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছি যে land, labour এবং capital এই তিনের যোগে ধন সৃষ্টি হয়। কৃষিকর্মের কথাই ধরা যাক। ল্যাণ্ড বাদ দিয়ে শূন্যে চাষবাস হয় না, লেবার বাদ দিলে ফসল জন্মায় না, জন্মায় ঘাস. আর সে ঘাসও কাটবার জন্য লেবার্ চাই। আর হালবলদ মই বিদে নিড়ুনি বীচন—ক্যাপিটালের অভাবে এসব কিছুই জোটে না, আর জোটে না চাষের গোরুর ও চাষীর খোরাক। আজ বীজ বুনে কাল যদি পাকা ধান পাওয়া যেত তাহলে ব্যাপার হয়তো অন্যরূপ হত। বাজিকররা অবশ্য আঁটি পোতবার অব্যবহিত পরেই ফজলি আম ফলিয়ে দেয়। এ বিদ্যে মূর্খ চাষীদের জানা নেই। আর তাছাড়া বাজির আমে শুধু নয়ন তৃপ্ত হয় উদর তৃপ্ত হয় না। ল্যাণ্ড্, লেবার্ এবং ক্যাপিটাল্ এ তিনের কো-অপারেশন যখন চাইই তখন এই তিনের ভিতর যাতে বিরোধ নয় সামঞ্জস্য ঘটে তারই চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য,—অন্ততঃ ততদিনের জন্য যতদিন সোশ্যালিজ্‌মের কৃপায় জমি nationalised এবং কম্যুনিজ্‌মের কৃপায় ক্যাপিটাল্ internationalised না হয়ে যায়।

এখন এই মহাজনের হাতে জমি যাওয়ার ফলে মহাজনের অস্থাবর সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তির পরিণত হয়। জমি কেনাবেচার অর্থ এই যে, যে জমি বেচে সে স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে আর যে কেনে সে অস্থাবর সম্পত্তিকে স্থাবর

সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ একই জিনিস শুধু ভিন্নরূপ ধারণ করে। জমিও ক্যাপিটাল্ টাকাও ক্যাপিটাল্ দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে একটি স্থূল ও অচল ক্যাপিটাল্, আর-একটি তরল ও চঞ্চল ক্যাপিটাল্। আর এ পৃথিবীর নিয়মই এই যে স্থূল নিত্য তরলে রূপান্তরিত হচ্ছে, আর তরল নিত্য স্থূলে রূপান্তরিত হচ্ছে।

যদি কেউ বলেন যে, চাষী প্রজা যে জোত হস্তান্তর করে সে দেনার দায়ে আর সেই সূত্রে মহাজন জোতদার হয়ে ওঠে, তাহলে বলি, জোত খালি মহাজনের দেনার দায়ে বিক্রি হয় না, জমিদারের বাকি খাজানার দায়েও বিক্রি হয়, আর তখন তা হয় সম্পূর্ণ নির্দয়রূপে। সুতরাং জমির কেনাবেচা যেমন চলছে তেমনি চলবেই,—মহাজন নামক ক্যাপিটালিস্টের হাত থেকে রায়তী জোত আইনতঃ রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও জমিদার নামক ক্যাপিট্যালিস্টের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা যাবে না।

এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি, সেইরকম আইন হওয়া উচিত যাতে জমিদারের হাত থেকে জোতদারের হাতে গেলে রায়তের স্বত্ব-স্বামিত্ব খর্ব না হয়। মধ্যস্বত্বকে খর্ব করাই তার উপায়। কী করে তা করা যাবে তার সন্ধান উকিলবাবুদের কাছে পাওয়া যাবে।

৪

রায়তের কাছে জমিদার দেবতা হতে পারে কিন্তু জোতদার ওরফে উপ-জমিদার যে উপ-দেবতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই উপ-দেবতার উপদ্রব থেকে রায়তকে যে কী করে বাঁচানো যায় সে বিষয়ে আমি রায়তের কথায় আলোচনা করিনি—দু কারণে।

প্রথমতঃ, আমি আলোচনাটিকে সরল করবার জন্য রাজা-প্রজার সম্বন্ধের বিচার করি, তাই যে ব্যক্তি রাজাও নয় প্রজাও নয় অথচ একাধারে ও-দুই তার নাম আর উল্লেখ করিনি। দ্বিতীয়তঃ, এ জ্ঞান আমার ছিল যে, জাতিভেদের মতো মধ্যস্বত্বের অস্তিত্ব হচ্ছে ভারতবর্ষের সমাজগঠনের বিশেষত্ব। বিলেতে যেমন মিডল্ ক্লাস্ প্রবল, এদেশে তেমনি মিডল্‌ম্যান্ প্রবল, শুধু কৃষিকর্মে নয় শিল্পবাণিজ্যেও। যে ধন সৃষ্টি করে ও যে তা ভোগ করে, সে দুই ব্যক্তির ভিতর অসংখ্য মিড্‌ল্‌ম্যান্ আছে। কথায় বলে, যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই। এই বিরাট নেপোর দলের নাম ভদ্রলোক। সমাজের এ ব্যবস্থা আর যে হিসেবেই আমাদের উন্নতির কারণ হোক, জাতীয় ধনের হিসেবে আমাদের অবনতির কারণ। আমি নিজে এই ভদ্রশ্রেণীভুক্ত, জাতি হিসেবেও পেশা হিসেবেও, তবুও এ স্পষ্ট সত্যটা অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই ব্যবস্থার সঙ্গে আমার জীবনকে দিব্যি খাপ খাইয়েছি, কিন্তু আমার মনকে তদ্রূপ খাপ খাওয়াতে পারিনি। তাই সমাজদেহের রোগের কিসে প্রতিকার হয়, সে ভাবনা আমি ভাবতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, আমি এ রোগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা দিয়েছি সে হচ্ছে ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে symptomatic treatment; তার ফলে জাতীয় হীনতা দূর হবে না। এ জ্ঞানও আমার ষোলো আনা আছে। তবে যে লোকের ছোটোখাটো কষ্টের কী করে প্রতিকার হতে পারে সে বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করেছি, তার কারণ আয়ুর্বেদে আদেশ আছে, মানুষের পায়ে কাঁটা ফুটলেই যদি পার তো তা তুলে দিয়ো—

দর্শনের সব গভীর তত্ত্বের মীমাংসা না হওয়া তক্ ও কাজ করতে নিরস্ত হোয়ো না।

আমাদের সর্বপ্রকার জাতীয় দুর্দশার কারণ হচ্ছে, জাতির প্রাণশক্তির অভাব। এই জীবন্মৃত জাতির অন্তরে আবার কী করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায়, সেইটেই হচ্ছে অবশ্য একমাত্র জিজ্ঞাস্য। চারদিকে যে চেষ্টা হচ্ছে তাতে তা হবে না। কারণ অনেকে যা করছেন তা হচ্ছে বিলেত থেকে আমদানী গ্যাল্‌ভানিক ব্যাটারির শক্ প্রদান। ও শকে মরা জানোয়ার হাতপা ছোঁড়ে কিন্তু বাঁচে না। তবে হবে কিসে? এ বিষয়ে মুক্তি কোন্ দিকে, সে দিক্‌নির্ণয় আমি হয়তো করতে পারি—কিন্তু সে পথে কাউকে চালাবার শক্তি আমার নেই। তা ছাড়া ধান ভানতে শিবের গীত গাইতেও আমি সংকুচিত। রায়তের কথা আগাগোড়া কত ধানে কত চাল হয় তারই কথা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১৩৩৩ আষাঢ়ের সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি ও লেখকের টীকা একত্র প্রকাশিত হয়।

দেশের অবস্থা

দেশের লোককে পলিটিক্যাল শিক্ষা দেবার সদুপায় কি?

বই পড়ানো যে নয়, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি আমাদের পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দর্শন অথবা রাজনৈতিক বিজ্ঞানের লেকচার দিতে হবে?—তাও অবশ্য নয়। কেননা ও-সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার বি.এ., এম.এ. পাশ করবার জন্যে, এবং কলেজের প্রফেসারি করবার জন্যে। ও-জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয় নয়, অন্তত চাষাভুষোর পক্ষে তো নয়ই। তাদের অবস্থানুযায়ী অধিকারের কথা চাপা দিয়ে তাদের কাছে rights of man-এর ব্যাখ্যান করার অর্থ, গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। বিশেষ অধিকারের মূল থেকেই যে সামান্য অধিকারের ফুল ফুটেছে, এ-কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কে না জানে? তা ছাড়া এ শাস্ত্রের বড় বড় কথা প্রচার করবার ভিতর বিপদও আছে। জনগণ হয় সে-সব বুঝবে না, নয় উল্টো বুঝবে; আর তখন আমরা তাদের উপর হাত চালাতে প্রস্তুত হব।

এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কিংকর্তব্য?—উত্তর খুব সোজা।

মানুষের বিশেষ অধিকার সকল তার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তার স্বার্থ যে কোথায়, এবং কি উপায়ে সেই স্বার্থের রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যেতে পারে, সেই জ্ঞান দান করতে পারলেই আমরা তাদেব পলিটিক্যাল শিক্ষা দান করতে পারব। আপনার কড়াগণ্ডাটা বুজে নেবার ক্ষমতাটাও মানুষের একটা শক্তি আর শক্তিই হচ্ছে সকল উন্নতির মূল। কেবলমাত্র জনসাধারণের দিক থেকে নয়, সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও, যাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করাটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে। আদমসুমারিতে জনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য, আর অসাধারণ জন অর্থাৎ ভদ্রলোকের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। আর যে জাতির বেশির ভাগ লোক দুর্দশাপন্ন, সে-জাতির কি শরীরে কি অন্তরে কোনো শক্তিও নেই, কোনো উন্নতির আশাও নেই।

সুতরাং রাজনৈতিক ভাবের বিলেতি আকাশ থেকে বাংলার মাটিতে নেমে এসে দেখা যাক, সে-দেশের অবস্থাই বা কি, আর দেশবাসীদেরই বা অবস্থা কি? অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধে হবে। তোমরা সকলে লাটদরবারে ঢুকতে চাচ্ছ শুধু যে উচিত ব্যবস্থা করবার জন্যে, তা সে দরবারের নামেই প্রকাশ। কে না জানে সে সভার নাম ব্যবস্থাপক সভা।

ছেলেবেলায় কথামালায় পড়েছিলুম যে, জনৈক বৃদ্ধ কৃষক তাঁর ছেলেদের ডেকে বলেন যে, তাঁর খেতে ধনরত্ন পোঁতা আছে। সেই ধনরত্নের লোভে তাঁর ছেলেরা সেই খেত আগাগোড়া খুঁড়ে ওলটপালট করলে; কিন্তু পোঁতা ধনের কোথাও সাক্ষাৎ পেলে না, তবে এই খোঁড়ার ফলে এই ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ফসল জন্মাল।

আমাদের বাংলা দেশ হচ্ছে ঐরকমের একটি প্রকাণ্ড কৃষকের ক্ষেত্র; ওর বুকের ভিতর কোনো গুপ্তধন পোঁতা নেই, ও-ক্ষেত্রে শুধু ফসল জন্মায়। বাংলা দেশ যে সোনার

খনি নয়, তা বলে কোনো দুঃখ করবার দরকার নেই, কেননা আবাদ করতে জানলে এ জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি। আর খনির সোনা দুদিনেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু আবাদের সোনা অফুরন্ত ও চিরদিন ফলে।

বাংলাদেশ যে শস্যক্ষেত্র, এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান ছেরেপ জমিতে সার দিয়ে। তাঁরা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয়, তাহলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানব-জমিন; আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই, তাহলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানব-জমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত, এ দুই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আগামী ইলেক্‌শনের জন্য সেই প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে বাংলার কৃষকের, ওরফে বাঙালী জাতির অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্র জাতির দুরবস্থা দূর করা যে কত কঠিন, এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই, এ কথা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে, কেননা সে চেষ্টার ফল ভালো না হয়ে যায় না।

কৃষকের অবস্থা

ইলেক্‌শনের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিশিয়ানদেরই তৈরি করতে হবে, কেননা দেশ উদ্ধারের ভার তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। অতএব কৃষকের অবস্থার যাতে উন্নতি হয়, সেই মর্মে প্রোগ্রাম তৈরি করা অবশ্য আমাদের পলিটিশিয়ানদের পক্ষেই কর্তব্য। তাঁদের নিজের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও এ কর্তব্য তাঁরা অবহেলা করতে পারবেন না। গাঁয়ে যাঁকে মানে না তাঁর পক্ষে দেশের মোড়লি করা আর চলবে না। তবে এ প্রোগ্রাম তাঁরা তৈরি করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

আমি না হই, তুমি যখন আধ-আধ কথা কইতে, সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে :

"জমিদারের ঐশ্বর্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সংবাদপত্রে লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন।"

বঙ্কিমের যুগে পলিটিশিয়ানদের অজ্ঞতার যা পরিমাণ ছিল, ইতিমধ্যে তা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে সে-কথা বলাই বাহুল্য, কেননা ইতিমধ্যে বাংলার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি, ওকালতি ও ডাক্তারির উপর। ডাক্তারি-কেরানীগিরির সঙ্গে জমিজমার কোনোই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে শুধু ওকালতির সঙ্গে। আমাদের উকিলসম্প্রদায়ের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রায়তের বিপদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Bengal Tenancy জানা এক কথা আর Bengal Tenantry জানা আর-এক কথা। এর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ হয়ে

আর-একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমার বিশ্বাস বেশির ভাগ শহুরে উকিল মহোদয়েরা কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নন। আর যাঁরা জানেন তাঁরাও কৃষকের ব্যথার ব্যথী হতে পারেন, কিন্তু বিনে পয়সায় তার কথায় কথক নন। বাঙলার উকিল-রাজ হচ্ছেন জমিদারের মিত্র-রাজ। এ entente cordiale-এর ভিতর যথেষ্ট অর্থ আছে। এঁরা যে একমাত্র জমিদারের অন্নে প্রতিপালিত, তা অবশ্য নয়। জমিদার ও রায়ত উভয়েই এঁদের মক্কেল; এঁরা গাছেরও পাড়েন, তলারও কুড়োন। তবে তিল কুড়িয়ে তাল করার চাইতে গোটা তাল হাতে পাওয়া ঢের বেশি আরামের ও আহ্লাদের কথা। ফলে এঁদের লুব্ধদৃষ্টি উপরের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয়, তারপর আর নামে না। অথচ এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্‌সের ল্যাজা-মুড়ো দু-ই। পলিটিশিয়ানরা প্রজার হয়ে কোনোরূপ দাবি করতে প্রস্তুত নন, আমার এ বিশ্বাস যদি অমূলক হয়, তাহলে তার জন্য প্রধানত পলিটিশিয়ানরাই দায়ী। মডারেট এক্‌স্‌ট্রিমিস্ট কোনো দল থেকেই অদ্যাবধি কোনো প্রোগ্রাম বার হয়নি, এবং তা বার করবার তাঁদের যে কোনোরূপ অভিপ্রায় আছে, তার কোনো আভাসও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

শুনতে পাই যে মডারেট দল জমিদারের সঙ্গে সন্ধি করবার চেষ্টায় ফিরছেন। তাঁদের নাকি বিশ্বাস যে নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে তাঁরা প্রজার ভোট আদায় করতে পারবেন, উপরন্তু জেলার হাকিম ও পুলিশের কো-অপারেশনের উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন। এ-কথা যদি সত্য হয় তাহলে তাঁদের অন্য প্রোগ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই। "জোর যার ভোট তার" এই হচ্ছে তাঁদের প্রোগ্রাম।

এ বিষয়ে একস্ট্রিমিস্ট দলের মত জানবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টায় কোনোই ফল হয়নি। এ দলের দু-চারজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার এ বিষয়ে যে কথাবার্তা হয়, তা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট-দরবারে তাঁরা ঢুকলে বাংলাদেশকে সেই দেশে পরিণত করবেন, যে-দেশে আমাদের মেয়েরা খোকাবাবুর বিয়ে দিতে চায়,—অর্থাৎ যে দেশে

"লোকে গাই বলদে চষে,
দাঁতে হীরে ঘষে,
রই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে।"

এ সংকল্প যে অতি সাধু সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু সন্দেহ আছে তার সিদ্ধির উপায় নিয়ে। স্বদেশকে "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" করে তোলবার উপায় সম্বন্ধে এঁরা নীরব। এ ধরণের কথা আমাদের মুখেই শোভা পায় কেননা ছেলে ভুলোনো ছড়া ভালো করে বাঁধতে ও কাটতে আমরাই পারি। কবিত্ব কবিতাতেই করা কর্তব্য, ও-জিনিস গদ্যে খাপ খায় না। আর পলিটিক্‌সের তুল্য ঝুনো গদ্য এক আইন ছাড়া আর কিছু নেই। সে যাই হোক, এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, কি উপায়ে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে-বিষয়ে হয় তাঁদের কোনো মত নেই, আর না হয় তো সে মত এখন তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। সম্ভবত তাঁরা তাঁদের প্রোগ্রাম প্রকাশ করতে ইতস্তত করছেন এই ভয়ে যে পাছে অপরে তা চুরি করে। সাহিত্যে ও পলিটিক্‌সে চোরাই-মালের কারবার যে রকম বেড়ে গেছে, তাতে এ ভয় অকারণ নয়। তবে এ বিষয়ে কথা তুললে তাঁরা যে-রকম অসোয়াস্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন তাতে মনে হয় তাঁরা একটু উভয় সংকটে পড়েছেন। প্রজার উপকার করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রজাকে

কোনো অধিকার দিতে রাজি নন, এমন লোক সকল সমাজেই আছে। এই মনোভাবকেই না ব্যুরোক্রাটিক মনোভাব বলে? তবে এ-কথাও ভোলা উচিত নয় যে, আমাদের ন্যাশনালিস্টরা আপাতত বিদেশী বড় পলিটিক্স নিয়ে এতটা ব্যস্ত আছেন যে, স্বদেশী ছোট পলিটিক্সে মন দেবার তাঁদের একদম ফুসরত নেই। বড় পলিটিক্সের কারবার অবশ্য রাজারাজড়া নিয়ে। মানুষে যখন রাজা-উজির মারতে বসে, তখন কি কত ধানে কত চাল হয় তার ভাবনা সে ভাবতে পারে?

রায়তের প্রোগ্রাম

দেশের পলিটিশিয়ানরা যখন এ বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছেন, তখন যা হোক একটা একমেটে প্রোগ্রাম তৈরি করবার চেষ্টা করা যাক। যদি কেউ বলেন :

"যার কর্ম তার সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে"

তার উত্তর, রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকারচর্চা নয়, এর ভালো ভালো নজির আছে। বাঙালীর মধ্যে যে শ্রেণীর লোকেদের আমরা গুরু বলে মান্য করি, তারা সকলেই প্রজার ব্যথার ব্যথী এবং সে ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সবাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন। তাঁদের শিষ্যত্বই হচ্ছে এ-বিষয়ে কথা কইবার আমার দ্বিতীয় দলিল।

তুমি আমি যখন বালক সেই কালে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রজার অবস্থা বিচার করে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রায়তকে যে অবস্থায় আমরা রেখেছি, তার ফল ত্রিবিধ—"দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।" তিনি আরও বলেন যে "ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশের প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ, আজকের দিনের বাংলার রায়তের দল দরিদ্র, মূর্খ ও দাস।

তারা যে মূর্খ, সে-বিষয়ে তো আর কোনো মতভেদ নেই। তারপর তারা আইনত না হলেও বস্তুত যে দাস,—"ক্রীতদাস" না হলেও যে "গর্ভদাস", এ-কথা অস্বীকার করা কঠিন। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও তারা নিজের অধিকারের উপর দাঁড়াতে পারে না, প্রভুর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য ইংরেজের আইন তাদের অনেক অধিকাব দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু নামে। টেন্যান্সি অ্যাক্ট আজকের দিনে জমিদারের হাতে সঙীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও তো করো উচ্ছেদের মামলা, স্বত্বের মোকদ্দমা, জমাবৃদ্ধির নালিশ, ফসলক্রোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকী-খাজনার নালিশ; আর তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও তো করো তার নামে বাকী-পড়া ও খাসদখলের নালিশ।

তবে যে প্রজা টিঁকে আছে তার কারণ, বেশির ভাগ জমিদার আইনের মার রায়তদের মারেন না, তা ছাড়া মুনসেফবাবুরা জমিদারের দাখিলী কাগজ, তা সে জমারই হোক সুমারেরই হোক, পারতপক্ষে প্রামাণিক বলে গ্রাহ্য করেন না। আর আমলা-ফয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ, এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ় ধারণা। এঁরা যে জমিদারের প্রতি

সব সময় সুবিচার করেন তা নয়, তবে প্রজা যে বেঁচে বর্তে থাকে সে মুনসেফবাবু ও সেটেলমেন্ট আপিসের গুণে। সরকারের বেতনভোগী এই রাজকর্মচারীরাই হচ্ছেন বাংলার রায়তের যথার্থ রক্ষক, জমিদারের বিত্তভোগী রাজনীতিব্যবসায়ী উকিল-মোক্তারেরা নন। অতএব এ-কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, প্রজার দাসত্ব আজও ঘোচে নি।

আর তার দারিদ্র্য যে কি ভীষণ, তা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ব্যারিস্টার মহোদয়ের কথাতেই প্রকাশ। তিনি সেদিন Bengal Land-holders-দের তরফ থেকে গবর্মেণ্টকে যে পত্র লিখেছেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"Bengal if not the whole of India, Bengal probably more so than the rest of India, is an agricultural community—seventy-seven per cent of her population being agriculturists. It is an undeniable fact that seventy per-cent of the peasantry out of the seventy-seven per cent of the whole population is so poor, that the income *per capita* is not more than a few rupees a year and they go to bed every day without a square meal."—*Statesman*, 5th March, 1920.

অস্য বাংলা :

"বাংলা যদ্যপি সমগ্র ভারতবর্ষ না হয়,—বাংলা সম্ভবত বাকী ভারতবর্ষের অধিক, হচ্ছে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়, কারণ তার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সাতাত্তর জন কৃষক। এ-কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, কৃষকদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন, যে কৃষকেরা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা সাতাত্তর, এতাদৃশ দরিদ্র যে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় দু-চার টাকা মাত্র, এবং তারা নিত্য পেট ভরে না খেয়েই শুতে যায়।"

চক্রবর্তী সাহেবের বক্তব্য আমি যতদূর সম্ভব কথায় কথায় অনুবাদ করেছি, তার উপর সাহিত্যিক হাত চালাইনি এই ভয়ে যে পাছে কেউ বলে আমি তার গায়ে রং চড়িয়েছি। বাংলাদেশে শতকরা সত্তর জন লোক বারো মাস আধপেটা খেয়ে থাকে, স্বজাতির অবস্থা যে এতদূর সাংঘাতিক—এ জ্ঞান আমার ছিল না। দিনের পর দিন ও-অবস্থায় যারা শুতে যায় তারা যে আবার বিছানা থেকে ওঠে এইটেই আশ্চর্যের বিষয়। তবে এ-কথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা তাঁর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, চক্রবর্তী সাহেবের কখনো ঠিকে ভুল হয় না। বিশেষত তিনি যখন জমিদারের পক্ষ থেকে প্রজার এই ভীষণ দারিদ্র্য কবুল করেছেন, তখন রায়তের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহাম্মকি। আর আজ আমি প্রজার হয়ে ওকালতি করতে দাঁড়িয়েছি।

প্রজার দুর্দশা সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন, সে হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের কথা। সম্ভবত সে-যুগে ম্যালেরিয়া দেশকে তেমন আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। আজকের দিনে জনসাধারণের শরীরগতিক কি রকম, তার পরিচয় সরকারের তরফ থেকে বর্ধমানের মহারাজাই দিয়েছেন। তাঁর কথা তাঁর ভাষায় এস্থলে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"Roughly speaking we may say that in each of these two years (1918-19) very nearly four per cent of the population has died, and unfortunately

the births have not entirely replaced this loss. The more regrettable thing about this appalling mortality is the fact that a large proportion is due to causes that are entirely preventable."—*Statesman*, March 6, 1920.

অস্য বাংলা :

"মোটামুটি বলতে গেলে, গত দুই বৎসরের প্রতি বৎসর বাংলা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা চারজনের মৃত্যু হয়েছে, এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যত মৃত্যু হয়েছে তত জন্ম হয়নি। বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, যে-সব কারণে লোকক্ষয় হচ্ছে তার অধিকাংশই নিবার্য।"

এই তো গেল মৃত্যুর তালিকা: কিন্তু যারা বেঁচে থাকে, তার মধ্যেও অধিকাংশ লোক জ্বরজীর্ণ জীবন্মৃত। আর বলা বাহুল্য যে এই রোগের অত্যাচার বিশেষ করে সহ্য করতে হয় আমাদের প্রজাসাধারণকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে রোগের যোগাযোগটা যে অতি ঘনিষ্ঠ, সে-কথা উল্লেখ করবার কি আর কোনো দরকার আছে? যারা বারোমাস একসন্ধ্যে আধপেটা খেয়ে শুতে যায়, তারা যে রোগশয্যায় শয়ন করলে সেখান থেকে আর ওঠে না, সে-বিষয়ে আর আশ্চর্য কি?

অতএব তোমাদের সেই প্রোগ্রাম খাড়া করতে হবে, যার বলে বাংলার রায়ত মূর্খতা, দারিদ্র্য, দাসত্ব ও রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বাংলার না হোক, বেহারের প্রজাবর্গ পলিটিশিয়ানদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই স্বপক্ষের একটি প্রোগ্রাম খাড়া করেছে। সেই প্রোগ্রাম যদি সংগত হয়, তাহলে তা আমাদের শিরোধার্য করে নিতে হবে। এখন আমি সেই প্রোগ্রামের বিচার করতে প্রবৃত্ত হলুম।

প্রোগ্রামের পরিচয়

কিছুদিন আগে "ইংলিশম্যান" কাগজে হঠাৎ চোখে পড়ল যে, বেহারের রায়তেরা মজঃফরপুরে এক প্রকাণ্ড সভা করে সকলে একমত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ক'টি পাশ করেছে।

প্রথম। দেশময় compulsory primary education প্রচলিত হওয়া কর্তব্য।

দ্বিতীয়। প্রতি চার মাইল অন্তর একটি ক'রে দাতব্য ঔষধালয় থাকা চাই।

তৃতীয়। প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই সর্বত্র আইনত হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ, উক্ত শ্রেণীর জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার থাকবে।

চতুর্থ। নিজের দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজার থাকবে, অর্থাৎ প্রজা সে গাছের স্বত্বাধিকারী স্বরূপে স্বীকৃত হবে।

পঞ্চম। প্রজা জমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী জমিতে পুকুর কাটাতে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ি তৈরি করতে পারবে।

ষষ্ঠ। প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতের জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের অতঃপর আর থাকবে না। অর্থাৎ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রই আইনত মৌরসী-মোকররী বলে গণ্য হবে।

প্রজাপক্ষের প্রথম দুটি দাবি যে ন্যায্য, সেবিষয়ে কোনোরূপ মতভেদ নেই। লোকশিক্ষার বিস্তারের জন্য আজ বছর দশেক ধরে সকল দলের পলিটিশিয়ানরা তো সমান চীৎকার করছেন। এবং গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেন না ব'লে, আমরাও সরকার কর্তব্যের অবহেলা করেছেন ব'লে তাঁর প্রতি নিত্য দোষারোপ করি। তার পর, প্রজার রোগের প্রতিকার করাও যে গবর্মেণ্টের কর্তব্য, সে কথা গবর্মেণ্টও মানেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে প্রকাশ যে, আর পাঁচরকম জিনিসের মধ্যে, the provision of schools and dispensaries within reasonable distance,—these are the things that make all the difference to his life.

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজাপক্ষ ও সরকারপক্ষ এ বিষয়ে একমত। জমিদারপক্ষও এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী নন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর পূর্বোক্ত পত্রে লিখেছেন যে, বাংলার ভবিষ্যৎ গবর্মেণ্টকে এই দুই কর্তব্য সর্বাগ্রে পালন করতে হবে :

1. Sanitation—involving, as it must, ways and means as to how she is to combat the scourge of malaria and cholera and other similar scourage.

অস্যার্থ :

"বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করতে হবে, অর্থাৎ ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বন্দেবস্ত করতে হবে।"

2. She will be further called upon to provide for the education of her children in the light of the recent University Commission Report.

অস্যার্থ :

"নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায় বাংলার ঘাড়ে পড়বে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী লোকশিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।"

বলা বাহুল্য যে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে যা দু-কথায় বলা হয়েছে, জমিদারপক্ষ তাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। এ দু-মতের ভিতর কিন্তু একটু গরমিল আছে। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট চায় ডিসপেনসারি, আর জমিদারপক্ষ চান দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন। অবশ্য এ দু-ই আমাদের চাই। তবে সর্বাগ্রে চাই রোগীকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা, সমগ্র দেশকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা পরে হবে যদি আমরা হাত-হাত চিকিৎসারা ব্যবস্থা না করি, তাহলে স্যানিটেশনএর দৌলতে দেশকে যেদিন স্বর্গ করে তুলব, সেদিন হয়ত দেখব যে, দেশে আর মানুষ নেই, সবারই ইতিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্কুল ডিসপেনসারি প্রভৃতি প্রজার জীবনকে একদম বদলে দেয়, অর্থাৎ তার উন্নতি সাধন করে। শিক্ষা জিনিসটের প্রভাব শুধু জীবনের উপর নয়, মনের উপর আছে। আজকের দিনে দেশের প্রজাসাধারণের মনের অবস্থা কি?

রাশিয়ার বিষয় একজন জার্মান লেখকের বই সেদিন আমি পড়ছিলুম। রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ব্যারিস্টার উক্ত—জার্মান-ভদ্রলোককে যা বলেছিলেন, তার গুটিকয়েক কথা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি :

"আমাব দেশের লোক অবিচারে অভ্যস্ত। জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা আর

না করা বড়লোকের মরজির উপর নির্ভর করে। আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরে এই ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি, কাজেই আমরা সকল অন্যায় অত্যাহিত অদৃষ্টের নিয়তি বলে মেনে নিই। যে শিলাবৃষ্টি তাদের শস্য নষ্ট করে, এবং উপরওয়ালার যে অত্যাচারে তারা বঞ্চিত ও পীড়িত হয় রাশিয়ার কৃষকদের কাছে এ-দুয়ের ভিতর কোনো তফাত নেই, দু-ই একজাতীয় ঘটনা।" —Hugo Ganz, *Le Debacle Russe.*

আমি জিজ্ঞেস করি যে আমাদের কৃষকদের মনোভাবের সঙ্গে রাশিয়ান কৃষকদের মনোভাবের কোনো তফাৎ আছে কি? এরা উভয়েই কি একজাত নয়? একেই বলে 'দাস'-মনোভাব। আর আমার মতে মনের দাসত্বই হচ্ছে সবচেয়ে সর্বনেশে দাসত্ব। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে, তার প্রসাদে মানুষ মনেও মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। নিজের দাসত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়াই, মুক্তিলাভের প্রথম সোপান। অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মুক্তির পথ যে জ্ঞানমার্গ, এ সত্য বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সুতরাং গ্রামে গ্রামে স্কুল বসালে আশা করা যেতে পারে যে, আমাদের প্রজাসাধারণের মনের আবহাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে আসলে মনের স্যানিটেশন বই আর কিছুই নয়। মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে রায়তের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

His mind had been made up for him by his landlord or his banker or his priest or his relatives or the nearest official.

অর্থাৎ, রায়তের মন হয় তার জমিদার নয় তার মহাজন, হয় তার পুরুত নয় তার আত্মীয়স্বজন, আর না হয় তো হাতের গোড়ায় যে রাজপুরুষ থাকেন তিনি গড়ে তোলেন।

আশা করা যায় শিক্ষা পেলে রায়তদেরও নিজের মন বলে একটা জিনিস জন্মাবে।

দেখা গেল যে, রায়তদের শিক্ষার দাবি ও স্বাস্থ্যের দাবি সকলেই মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাদের স্বত্বের দাবির কথা কানে ঢোকবামাত্র চমকে ওঠেন, এমন লোকের এ দেশে অভাব নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রজার পক্ষ যাঁরা সমর্থন করতে উদ্যত হন তাঁদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উপর নানারূপ দোষারোপ করতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করেন না। যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারও মতে সে 'বলশেভিক', কারও মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের মারামারি-কাটাকাটির পক্ষপাতী।

এঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলেই দেখতে পাবেন যে, এ সকল অপবাদ কতদূর অমূলক।

প্রথমত, বলশেভিক জন্তুটি যে কি, তা তাঁরাও জানেন না, আমরাও জানি নে। জুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে অপরকে দেখানোও যেমন অনুচিত নিজে পাওয়াও তেমনি ছেলেমি।

দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার প্রস্তাব করা আমাদের পক্ষে মূর্খতা হবে। কেননা উক্ত বন্দোবস্তে প্রজার কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচ্ছে স্টেট-এর। সমস্ত বাংলা কাল সরকারের খাসমহল হলে প্রজার দেয় খাজনা কমবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রজার তরফ থেকে সে প্রার্থনা কেউ করবে না।

তৃতীয়ত, নতুন অধিকারের দাবি যে-কেউ করে, তার বিরুদ্ধে সকল দেশে চিরকালই ঐ ঘর-ভাঙানোর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এ-স্থলে কথাটা একটু ব্যক্তিগত হলেও

আমি তা বলতে বাধ্য। বাংলার জমিদার-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কুসংস্কার আমার নেই, এবং থাকতে পারে না। আমার মন স্বতই এঁদের প্রতি অনুকূল, কেননা আমার আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব সবাই জমিদার,—কেউ বড়, কেউ ছোট, কেউ মাঝারি। আমি জন্মাবধি এই জমিদারের আবহাওয়াতেই বাস করে আসছি। সুতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তরঙ্গ, অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়। জমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন, সে আক্রমণ করতে আমি অপারগ, কেননা আমি জানি যে সে আক্রমণ অন্যায়। ভালোমন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে; কিন্তু এ-কথা জোর করে বলতে পারা যায় যে সাধারণত জমিদারের দল অর্থলোভী নয়। জমিদার আর যাই হোক, মহাজন নয়। আয় বাড়ানোর চাইতে ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, প্রজার স্বত্বের দাবি মঞ্জুর করতে জমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না। হয়ত দুদিন পরে দেখা যাবে যে, জমিদারেরাই প্রজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রায়তের প্রোগ্রামের বাকী ক'টি দাবি যদি গ্রাহ্য হয় তো আমার বিশ্বাস তার দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। অতএব দাবিগুলির পর পর বিচার করা যাক।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তরযোগ্য কিংবা নয়, এ প্রশ্নের উত্তরে আইন এখন প্রথার দোহাই দেয়। আইনের কথা হচ্ছে যে, যে-জেলায় উক্ত জোত হস্তান্তর করবার প্রথা আছে, সে-জেলায় সে জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত হস্তান্তর করতে পারে; আর যে জেলায় সেরূপ প্রথা নেই, সে-স্থলে তার দান-বিক্রয় জমিদার ইচ্ছে করলে গ্রাহ্য করতে পারেন, ইচ্ছে করলে অগ্রাহ্য করতে পারেন।

কিন্তু আসলে ঘটনা কি জানো?—ও-জোত সমগ্র বাংলার নিত্য নিয়মিত হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং জমিদারও তা হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন, কেননা তাতে তাঁর লাভ আছে। তবে জমিদার যে প্রথার দোহাই দেন, সে শুধু দাখিল-খারিজের একটা মোটা রকম সেলামি আদায় করবার জন্য। কোথাও বা জোতের খরিদা মূল্যের চৌথ আদায় করা হয়, কোথাও বা জমার পাঁচ থেকে দশগুণ পণ। এ-বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, যার যেরকম প্রবৃত্তি ও শক্তি তিনি এই সুযোগে প্রজাকে সেই অনুসারে দুইয়ে নেন। যে সম্প্রদায়ের সাতাত্তর জনের মধ্যে সত্তর জন বারোমাস একদিনও পেটভরে খেতে পায় না, তাদের এরূপ দোহন করা যে অত্যাচার, এ কথা যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না। তা ছাড়া, এই দাখিল-খারিজসূত্রে প্রজাকে যে কি পর্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায় ও করা হয়, তা জমিদারি সেরেস্তার সঙ্গে যাঁর কোনোরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে তিনিই জানেন। দাখিল-খারিজের প্রার্থীদের জমিদারের কাছারিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নড়ি ছিঁড়ে যায়। জোতখরিদ্দারের পক্ষে জমিদারের সেরেস্তায় নামপত্তন করার চাইতে বিয়ে করা কম কথায় হয়, যদিচ, বিয়ের জন্য লাখ কথা চাই। এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব গোমস্তা জমানবিশ সুমার-নাবিশ পাইক বরকন্দাজ যে পারে সেই মোচড় দিয়ে দু-পয়সা আদায় করে নেয়। সুতরাং তার এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে আশা করি বলশেভিজ্‌ম্-এর পরিচয় দেওয়া হয় না।

আমার এ কথা শুনে হঠাৎ-প্রজাহিতৈষীর দল কি জবাব দেবেন তা জানি। তাঁরা বলবেন যে, প্রজার ভালোর জন্যই তাকে জোত হস্তান্তর করবার অধিকারে বঞ্চিত করা

কর্তব্য। নচেৎ বাংলার জমি দেনার দায়ে মহাজনের হাতে চলে যাবে, ও বাংলার কৃষক ভূমিশূন্য হয়ে পড়বে। এ আপত্তির বিচার বারান্তরে করব, এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, জোত যখন দুবেলা কেনাবেচা হচ্ছে, তখন জমিদারের জরিমানার দায় থেকে প্রজাকে অব্যাহতি দেওয়া কর্তব্য। কৃষকের জোত অ-কৃষকে কিনতে পারবে কি না, এ সমস্যার সঙ্গে জমিদারের লাভালাভের কোনোই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে রাষ্ট্রের সঙ্গে।

তারপর নিজের জোতের গাছ কাটবার অধিকার। যার নিজের বোনা শস্য কাটবার অধিকার আছে, তার নিজের পোঁতা গাছ কাটবার অধিকার যে কেন থাকবে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এ-কথা বলতে গেলেই আইনের তর্ক উঠবে। উকিলবাবুরা আমাদের ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্ট পড়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা শিখে নিতে বলবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি বলব যে বাংলার রায়তকে যদি মানুষ করতে চাও তো প্রপার্টি সম্বন্ধে অনেক পুঁথিগত বিদ্যে ভুলতে হবে। কায়ক্লেশে বেঁচে থাকবার জন্যেও প্রজার আমকাঁঠালের তক্তার প্রয়োজন আছে—শোবার তক্তাপোষের জন্যে, দুয়োরের কপাটের জন্যে, চালের খুঁটির জন্যে; আর যদি বল যে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই তাহলেও তাদের কাঠের দরকার আছে—ম'লে পোড়াবার জন্যে। যেমন মুসলমান প্রজার সাড়ে তিন হাত জমিতে অধিকার আছে, তার গর্ভে অনন্তশয্যায় শয়ন করবার জন্যে। সুতরাং গাছ কাটাটা এমন কিছু অপরাধ নয়, যার জন্যে তাকে দণ্ড দিতে হবে। তার দারিদ্র্যের কথাটা স্মরণ করলে এ জরিমানার দায় হ'তে তাকে মুক্তি দেওয়াটা কি অধর্ম?

তার পর আসে কুয়ো খোঁড়বার, কোঠাবাড়ি তৈরি করবরার অধিকার। এ সম্বন্ধে আইনের কথা হচ্ছে একটা বেজায় রহস্য। আইনের বলে যাতে জোতের উন্নতি হয়, তা করবার অধিকার প্রজার আছে। এবং জোতের উন্নতি কাকে বলে, সে সম্বন্ধে অনেক আইনের তর্ক ও দেদার নজির আছে। Bench এবং Bar-এর এই সব চুলচেরা তর্ক, সূক্ষ্ম বিচারের গুণে এ-বিষয়ে আইন ক্রমে সরু হতে হতে শেষটা লুতাতন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, এ মামলায় প্রজার শুধু দোকর দণ্ড দিতে হয়, একবার উকিলের কাছে আর-একবার জমিদারের কাছে। নিজের পয়সায় প্রজা কোঠাবাড়ি তৈরি করলে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ চলে। বাস্তু পাকা করতে চেষ্টা করলে প্রজাকে যে ভিটে থেকে উচ্ছন্ন হতে হবে, এর চাইতে আর অদ্ভূত ব্যবস্থা কি হতে পারে? তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, আদালতে-বোনা আইনের মাকড়সার জালে বাঁধা পড়ে কীট, মানুষ নয়। আর আমরা চাই বাংলার প্রজা অতঃপর আর কীট হয়ে থাকবে না, সব মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রজার শেষ দাবি এই যে, তার জোত মৌরসী ও মোকররি হবে। অর্থাৎ অতঃপর জমাবৃদ্ধির অধিকার জমিদারের আর থাকবে না। আমার মতে Record of Rights প্রজার জমি অনুসারে যে জমা ধার্য করে দেয়, সেই জমাই আইনত চিরস্থায়ী হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ, যতদিন স্টেট-এর সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গেও রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, এ দাবি অপূর্বও নয় অদ্ভুতও নয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে পার্লেমেণ্টারি কমিশনের সুমুখে যখন সাক্ষ্য দেন, তখন তিনি প্রজার হিতকল্পে এই দাবি উপস্থিত করেছিলেন। বাংলাদেশের এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের বাক্য আমার শিরোধার্য, তাঁর সেই সাক্ষ্যের রিপোর্ট পড়ে

দেখলেই বুঝতে পারবে যে, পলিটিক্স সম্বন্ধেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল! তার পর আমার মতের স্বপক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা আবার উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলুম। তিনি গবর্মেণ্টকে লিখেছেন ঃ

"It would be iniquitous to think of taxing a population so poor as this, and my Committee venture of enter an emphatic protest against any idea of further taxation."

অস্য বাংলা ঃ

"এরূপ দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপর ট্যাক্স বসানোর চিন্তাও পাপকার্য হবে, এবং আমার কমিটি এ স্থলে আবার নূতন কোনো ট্যাক্স বসানোর বিরুদ্ধে তাদের ঘোর আপত্তি জোরগলায় জানিয়ে রাখতে সাহসী হচ্ছে।"

উপরোক্ত কথা ক'টির মধ্যে 'ট্যাক্স' কথাটি বদলে তার জায়গায় 'খাজনা' বসিয়ে দিলে, আমার বক্তব্যের একটা জোবালো সংস্করণ পাবে। ট্যাক্স অবশ্য স্টেট আদায় করে আর খাজনা জমিদার, অর্থাৎ, প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং যে-টাকা জাতীয় কার্যে ব্যয় করবার জন্য জাতির পক্ষে আদায় করা পাপকার্য, সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে কি হিসেবে পুণ্যকার্য, তা বোঝবার মত সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান আমার নেই।

আমি জানি এর উত্তরে পলিটিশিয়ানরা কি বলবেন। তাঁরা বলবেন যে, বর্তমান স্টেট তো জাতীয় নয়, ও হচ্ছে বিদেশী গবর্মেণ্ট, অতএব এ ক্ষেত্রে স্টেট-এর স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক নয়। তথাস্তু। কিন্তু নূতন ট্যাক্সের বিরুদ্ধে চক্রবর্তীসাহেব প্রমুখ জমিদারবর্গের জোরগলায় ঘোর প্রতিবাদের কারণ দর্শানো হয়েছে—রায়তের দারিদ্র্য। রায়ত যদি নতুন ট্যাক্সের চাপ আর তিলমাত্রও সইতে না পারে, তাহলে জমাবৃদ্ধির চাপই যে সে কি করে সইতে পারবে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে আমি বুঝতে পারিনে ব'লে যে পলিটিশিয়ানরা বুঝতে পারেন না তা অবশ্য হতেই পারে না। সুতরাং জমিদার কর্তৃক হতদরিদ্র প্রজার উপর মাজবৃদ্ধির চাপ দেবার কি সব পেট্রিয়টিক এবং ন্যাশনলিস্ট ওরফে 'স্বদেশী' ও 'স্বরাজী' যুক্তি আছে, শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলুম।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি যে, যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে, সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পলিটিশিয়ানদের পেট্রিয়টিক জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেশের যাঁরা ভালো চান, তাঁদের পক্ষে রায়তদের উপরোক্ত দাবি ক'টি প্রসন্নমনে গ্রাহ্য করে নেওয়া কর্তব্য। প্রথমত, এ-ক'টি অধিকারে তারা অধিকারী হলে, তাদের দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে; দ্বিতীয়ত, তারা তাদের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করবে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার বলে তাদের 'দাস'-বুদ্ধি দূর করা যাবে না, সেই শিক্ষার সঙ্গে চাই তাদের অবস্থারও উন্নতি ঘটানো।

পূর্বে যে রাশিয়ান ব্যারিস্টারের উক্তি উদ্ধৃত করে দিয়েছি, তিনিই তাঁর জার্মান অতিথিকে আর যে একটি কথা বলেছিলেন, সেটি এখানে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। সে-কথা এই ঃ

"আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সব চেয়ে কিসের বিশেষ অভাব আছে জানেন?—স্বাধিকারের জ্ঞান। মনস্তত্ত্ববিদেরা জানেন যে, স্বত্বের জ্ঞান থেকেই মানুষের অধিকারের

জ্ঞান জন্মায়। আপনি বোধহয় জানেন না যে, এ দেশের কৃষকদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের জমি তার নিজস্ব সম্পত্তি।"

বাংলার প্রজা যদি জমি হস্তান্তর করবার, গাছ কাটবার, কোঠাবাড়ি করবার, কুয়ো খোঁড়বার অধিকার পায়, এবং সেই সঙ্গে তার জোত মৌরসী-মোকররি হয়, তাহলে সে ইংরেজিতে যাকে বলে peasant proprietor তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠছে, জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য যে কতদূর বেড়ে যায় তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ, বর্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে স্বত্বহীন ও দরিদ্র করে রাখলে তার ফল যে কি হয়, তারও জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান রাশিয়া। যাঁরা বলশেভিজমের ভয়ে কাতর, তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাংলার রায়তকে বাংলার peasant proprietor করবার জন্য তৎপর হোন। যে-রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে করে মানুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রজাকে এ-সব অধিকার আমরা যদি আজ দিতে প্রস্তুত না হই, তো কাল তারা তা নিতে প্রস্তুত হবে। পৃথিবীর লোকের এখন মাথার ঠিক নেই, তার উপর তাদের ঐহিক সুখের পিপাসা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। আবালবৃদ্ধবনিতা আপামরসাধারণ সবাই আজ রাতারাতি বড়মানুষ হতে চায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

প্রজার এক নম্বর ও দু-নম্বর দাবি আমরা যে মুখে অত সহজে মেনে নিই তার কারণ, আমরা জানি কাজে তা পূরণ করতে হবে না; কেননা তা করা এত কঠিন যে, একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেশজোড়া রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে টাকার দরকার, সরকারের তহবিলে তার সিকির সিকিও নেই। এবং এই অতিরিক্ত টাকা যে কোথা থেকে আসবে, তার সন্ধান আমরা আজও পাইনি। আয়বৃদ্ধি না করে অবশ্য ব্যয়বৃদ্ধি করা চলে না, আর সরকারী তহবিলের আমদানির মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরদিনের মত বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মামলাটা এখন মুলতুবি থাকবে। কতদিনের জন্য বলা কঠিন, কেননা আজকের দিনে ও-মামলার তারিখ ফেলতে কেউ রাজি হবেন না। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধানের যে-সব অকিঞ্চিৎকর ও লোকদেখানো বন্দোবস্ত করা হবে, তাতে করে দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কোনোই সুসার হবে না—মধ্যে থেকে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।

অপরপক্ষে প্রজার অপর দাবিগুলি আমাদের পার্লামেন্ট বসবামাত্র আমরা একদিনে পূরণ করে দিতে পারি। টেন্যান্সি অ্যাক্টের গুটিকয়েক ধারা বদলালেই কার্য উদ্ধার হয়ে যায়। প্রথমত এতে কোনো খরচা নেই, দ্বিতীয়ত ব্যুরোক্রাসি এতে বাদ সাধবে না।

তবে বর্তমান টেন্যান্সি অ্যাক্টের উপর হস্তক্ষেপ করবার প্রস্তাব করলেই অমনি চারিদিক থেকে চীৎকার উঠবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমন কথাও শুনতে পাব যে, ও-কার্য করাও যা আর ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করাও তাই। জানোই তো আজকাল ধর্ম শব্দের মানে বদলে গেছে। আগে ধর্ম বলতে লোকে বুঝত সেই বস্তু, যার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে, যার উপরে লোকের পারলৌকিক ভয়ভরসা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল ধর্মের মানে হয়েছে temporal, অর্থাৎ সাংসারিক ব্যাপার।

এতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা যে-কালে পলিটিক্স হয়ে উঠেছে ধর্ম, সে-কালে ধর্ম অবশ্য পলিটিক্স হতে বাধ্য। অতএব এখানে বলা দরকার যে, প্রজার দাবি অনুযায়ী টেন্যান্সি অ্যাক্টের বদল করলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কি করা হবে জানো?—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কানুনে সরকার প্রজাকে যে-কথা দিয়েছিলেন এবং যে-কথা আজ পর্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে, শুধু সেই কথা রাখা হবে—এর বেশি কিছুই না।

আমার এ-কথা যে সত্য, তা যিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মবৃত্তান্ত জানেন তিনিই স্বীকার করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ইতিবৃত্ত খুব কম লোকেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয়-স্মরণশক্তি এতই কম যে, যে-জিনিস ইংরেজের আমলে জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে আমরা মান্ধাতার আমলের বলে মেনে নিই। অতএব এ-স্থলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসটা বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে ঘোর অরাজকতা ঘটেছিল। সেই অরাজকতার ফলে ইংরেজ এদেশের রাজা হয়ে বসলেন, এবং সেই অরাজকতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করলেন। এ আইন হচ্ছে আসলে একটি emergency legislation, যেমন গতকল্যের ঘী অ্যাক্ট এবং আগামী কল্যের রেণ্ট অ্যাক্ট; এ-রকম আইন অবশ্য মেয়াদিই (temporary) হয়ে থাকে; কিন্তু জমিদারের কপালজোরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়ে গেল। এরূপ হবার কারণ কতকটা দেশের অবস্থার গুণ, আর কতকটা ইংরেজের বুদ্ধির দোষ।

দেশ যে কতদূর অরাজক হয়ে উঠেছিল, তার সাক্ষী স্বয়ং ভারতচন্দ্র। মোগলে-মারহাট্টায় মিলে বাংলার অবস্থা যে কি করে তুলেছিল, তার বর্ণনা অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনাতেই পাবে। সে বর্ণনার কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

সুজা খাঁ নবাবসুত সর্‌ফরাজ খাঁ।
দেয়ান আমলচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া।
ছিল আলিবর্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়।।
তদবধি আলিবর্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিল পাতসা খেতাব।।...
কটকে হইল আলিবর্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল।।...
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া।।

এই তো গেল মোগলের ব্যবহার। তারপর শোন মারহাট্টার কীর্তি :

স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইলা রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত।।...
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।।
লুটি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।

কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম পুড়ি পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ি বহুড়ি।।
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল।।

নবাব বর্গির ভয়ে কোঠে পালিয়ে রইলেন বটে, কিন্তু বেচারা বাঙালীর উপর অত্যাচার তাঁর বাড়ল বই কমল না। আবার ভারতচন্দ্রের কথা শোনো :

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।।
নদীয়া প্রভৃতি চার সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি।।
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বারো লক্ষ টাকা চায়।।...
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বারো লক্ষ।
সাজোয়াল হইব সুজন সর্বভক্ষ।।
বর্গিতে লুটিল কত, কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন।।

উপরোক্ত বর্ণনা কাব্য নয়—খাঁটি ইতিহাস। আলিবর্দি খাঁ যে প্রজাপীড়ন ক'রে টাকা আদায় করেছিলেন, সে বর্গির রাজাকে চৌথ দেবার জন্য। একদিকে দিল্লীর বাদশাকে, আর একদিকে বর্গির রাজাকে কর দিতে না পারলে তার নবাবী থাকে না, কাজেই বাংলার প্রজাকে সর্বস্বান্ত করতে তিনি বাধ্য হলেন। এখানে একটি কথার মানে বলে দিই। সাজোয়াল শব্দের অর্থ সেই সরকারী কর্মচারী, যে সরকারের তরফ থেকে খাসে প্রজার কাছ থেকে খাজানা আদায় করে। এই সুজন সাজোয়ালটি যে কে তা জানিনে, কিন্তু সেকালে অমন সুজন দেদার মিলত। এবং এই সব সুজনের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার অন্যতম কারণ।

ভারতচন্দ্রের কবিতার একটা অংশ উদ্ধৃত করে দিতে এই কারণে বাধ্য হলুম যে, অন্নদামঙ্গল আজকাল কেউ পড়ে না, সকলে পড়ে মেঘনাদবধ। বাংলার চেয়ে লঙ্কা একালে আমাদের ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাংলার তক্তে সিরাজউদ্দৌলা। এঁর শাসন যে দেশের লোকের কাছে কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ বছর না পেরতেই বাংলায় ঘটল রাষ্ট্রবিপ্লব, যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈত্রিক প্রাণ, দু-ই হারালেন। একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি, কেননা জন কোম্পানীর সেকালের কর্তাব্যক্তিরা সকলেই এ ব্যাপারকে রেভল্যুশন বলেই উল্লেখ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ জেতবার ফলে কোম্পানী বাহাদুর বাংলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ পরগণার জমিদারীস্বত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত মিরজাফরের আমল। এ তিন বৎসর গোলমালে কেটে গেল; ফলে বাংলার অরাজকতা দিনের পর দিন শুধু বেড়েই চলল।

তার পর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবীর মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাংলার প্রজার রক্তশোষণ করলেন। কি উপায়ে তা বলছি। রাজা

টোডরমলের সময় বাংলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে ল্যাণ্ড ট্যাক্স বলা যেতে পারে। এ জমাবৃদ্ধি কোনো নবাব করেননি। আসল জমা স্থির রেখে, নবাবের পর নবাব শুধু আবওয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন। এই আবওয়াবকে cess বলা যেতে পারে। মিরকাশিমের হাতে এই আবওয়াব কিরকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল, তার সাক্ষাৎ পাবে Fifth Report-এ। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

তার পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশা কোম্পানী বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ সর্‌ফরাজ খাঁর আমলে আমলচন্দ্র রায় রায়-রাঁয়ার যে পদ ছিল, ১৭৬৫ সালে কোম্পানী বাহাদুর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে, আমলচন্দ্র প্রভৃতিরা বাংলার নবাব কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, আর কোম্পানী বাহাদুর দেওয়ান হলেন দিল্লীর বাদশার সনন্দের বলে। ফলে কোম্পানী পেলেন বাংলার অর্ধেক রাজত্ব, আর বাকী অর্ধেক রইল নবাব নাজিমের হাতে। একালের ভাষায় বলতে হলে, দিল্লীর বাদশা ডায়ার্কির সৃষ্টি করলেন।

এক্ষেত্রে ফৌজদারী সংক্রান্ত সকল রাজকার্য নবাব নাজিমের হাতে রিজার্ভড সাবজেক্ট-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানীর হাতে যে কি কি বিষয় ট্রান্সফার্ড হয়ে এল, তার সন্ধান নেওয়া দরকার; কেননা এই ট্রান্সফার-সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্মলাভ করল। বলা বাহুল্য নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লীর বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানী বাংলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন, কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ হাতে নিলেন না—নবাবের নিয়োজিত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন।

তারপর ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে (বাংলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যখন বাংলায় এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহাশ্মশানে পরিণত হল, তখন কোম্পানীর বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথার টনক নড়ল। তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে হেস্টিংস সাহেবকে বাংলার গবর্নর পদে নিযুক্ত করে এদেশে পাঠিয়ে দিলেন—প্রধানত খাজানা আদায়ের একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য। প্রচলিত ব্যবস্থা যে সুব্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই দুর্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা আদায় হয়, তার পূর্বে কোনো বৎসর তত টাকা হয়নি।

এই দুর্ভিক্ষে দেশের যে কি সর্বনাশ ঘটেছিল, তার পরিচয় হাণ্টারের Annals of Rural Bengal-এ পাবে। এর ভোগ বাঙালী জাতিকে আরও ত্রিশ বৎসর ভুগতে হয়েছিল। এই মন্বন্তরের ধাক্কা বাংলা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর সামলে উঠতে পারেনি। এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন আমি emergency legislation বলেছি।

হেস্টিংস সাহেব কলকাতায় এসে বাংলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকসুরত, ইজারাদারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্বিচারে সর্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য এইসব ইজারাদার বাংলার প্রজাকে লুটে নিলে। এই সূত্রে হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিলের ঝগড়া বাধল। কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং হেস্টিংস সাহেব এবং অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই সুযোগে

হেস্টিংস সাহেবের পরম শত্রু ফ্রান্সিস সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানীর বিলেতি ডিরেক্টরদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টর-মহোদয়দের এবিষয়ে যাহোক একটা মন স্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলাকওয়া অনেক লেখালেখির পর তাঁদের আদেশ-উপদেশমতই, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দশশালা-বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ যে-বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorship-এর সূত্রপাত হল, সেই বৎসরই বাংলার প্রজা জমির উপর তার সকল স্বত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারটি সমস্যা ওঠে :

১। বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে— প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের সঙ্গে?

২। জমিদার বলতে কি বোঝায়—ভূম্যধিকারী, না সরকারের ট্যাক্স কলেক্টর?

৩। যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়, তাহলে সে বন্দোবস্ত মেয়াদী না মৌরসী করা হবে?

৪। জমিদারকে যদি মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয়, তাহলে তার দেয় মালখাজানা চিরদিনের মত নির্ধারিত ও স্থায়ী করে দেওয়া হবে কি না?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে; এবং তার কারণ এই যে, কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না, কেননা কোম্পানীর গবর্মেন্ট হচ্ছে বিদেশী গবর্মেন্ট।

কি সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের সঙ্গে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্থির হল, তার আনুপূর্বিক বিবরণ Fifth Report-এ দেখতে পাবে। এ স্থলে আমি সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে সার জন শোর-প্রমুখ কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীরা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তারই উল্লেখ করছি।

প্রথম। জমি রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এদেশে জমিজমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব,—বিশেষত তাঁরা যখন বাংলা ভাষা জানেন না। এ ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরি করবার, খাজনা আদায় করবার, বাকীবকেয়ার হিসাবকিতাব রাখবার ভার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুশি তাই করবে, তহবিল তছরূপ করবে, রাজা প্রজা দু-দলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরেজ কলেক্টররা তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশী তহশিলদারদের কাছ থেকে হিসেবনিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরেজ কলেক্টরের নেই। অতএব খাজনা যদি নিয়মমত ও নিয়মিত আদায় করতে হয়, তাহলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়। জমিদার ভূম্যধিকারী কিম্বা ট্যাক্স-কলেক্টর, তা বলা অসম্ভব; কেননা ownership বলতে ইংরাজ যা বোঝে, এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি অস্টিন-এর ভাষায় স্বত্বের অর্থ হচ্ছে .

"A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration."

জমির উপর যে তাদের উক্তরূপ স্বত্ব আছে, এ-কথা সেকালে কোনো জমিদারও দাবি করেননি। কেননা তাঁরা জানতেন যে, রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তী জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাংলার নবাব ও দিল্লীর বাদশা, এঁদের ভিতর যাঁর

খুশি তিনিই যখন-তখন জমিদারের গালে চড় মেরে তাঁর জমিদারি কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদকুলি খাঁ কিছুদিন পূর্বে বাংলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্বংশ করে নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে, জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয়, তো আইনত তাঁদের তা হতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে-যুগে English landlord-দের সঙ্গে Irish tenant যে সম্বন্ধ ছিল। এ-স্থলে সার জন শোর-এর মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"The most cursory observation shows the situation of things in this country to be *singularly confused,* The relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar, is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietary right – the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot be a zemindar to the simple principles of landlord and tenant."—Fifth Report, vol ii.

এই উদ্ধৃত বাক্য ক'টির বাংলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই; কেননা কি বাংলা কি সংস্কৃত, এই দুই ভাষাতে এখন কোনো শব্দ নেই যা ইংরেজি real property-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাদের দেশে ও-আপদ কস্মিন্‌কালেও ছিল না।

শোর সাহেবের কথাই প্রমাণ যে, এদেশে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে ঠেকেছিল। কাজেই যা গোল, তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের কিন্তু আর ত্বর সইল না। তিনি আইনের ঠুকঠাকের বদলে এক ঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাংলার প্রজা বাংলার জমির উপর তার চিরকেলে স্বত্বস্বামিত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাংলার জমির নির্ব্যূঢ় স্বত্বাধিকারী জমিদার নামক আর এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।

যদি অত তাড়াহুড়ো করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে বসতেন, তাহলে রায়তের peasant proprietorship নষ্ট হত না। কারণ রাজাপ্রজার যে সম্বন্ধ সেকালের ইংরেজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল, কালক্রমে তার মর্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়-শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণার জন্মেছে যে, রায়তের আর যাই থাক্, জমির উপর কোনোরূপ মালিকীস্বত্ব নেই, এবং পূর্বেও ছিল না। লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার। তাই এ-স্থলে ভারতবর্ষের জমিজমার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ইংরেজের কথা নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"It is well-known that in the only place where the 'Laws of Manu' allude to a right in land, the title is an individual one, and is attributed to the natural source—still so universally acknowledged throughout India — that a man was the first ro remove the stumps and prepare the land for the plough. At the same time we see, from very early times, how the grain-

produce of every allotment is not all taken by the owner of the land, and part of it is by custom assigned to this or that recipient. It is not, observe, that the land allotment itself is not completely separated, but when the crop is reaped, the owner (as we may call him) at once recognised that, out of his grain-heap at the threshing-floor, not only the great Chief or Raja, and his immediate headman, but a variety of other villagers have customary rights to certain shares—if it is only sometimes a few double-handfuls or other small measure. All this seems to spring from the sense of co-operation (however indirect) in the work of settlement that made the holding possible. It seems to me quite clear that a sense of individual 'property' may arise coincidently with a sense of a certain right in others to have a share of the produce (on the ground of co-operation) and the two are not felt to conflict.

—Baden Powel, *Village Community,* pp. 130-31.

কষ্ট করে এর বাংলা করবার কোনোই প্রয়োজন নেই। কেননা বিলেতি আইন চর্চার ক'রে যাঁদের মন ও মত সার জন শোর-এর অনুরূপ হয়ে উঠেছে, সে আইনের নজির যাঁদের নজরবন্দী করেছে, তাঁদের দৃষ্টির জন্যই ব্যাডেন পাওয়েল সাহেবের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল। আশা করি এতে তাদের চোখ ফুটবে।

যে চষে, জমি তার। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথম রাজার তার পর আর পাঁচজনের, যথা, গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে ব্যাডেন পাওয়েল সাহেবের মোদ্দা কথা। আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরেজরাজ যখন বিদেশীরাজ, তখন দেশে এমন একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক যাদের স্বার্থ ইংরেজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপদেবিপদে এই দল ইংরেজরাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।

তৃতীয়। জমিদারকে যখন জমির মালিক সাব্যস্ত করা হল, বলা বাহুল্য তখন সে মালিকীস্বত্ব চিরস্থায়ী বলে স্বীকৃত হল। যে স্বত্ব "unlimited in point of duration" নয়, সে স্বত্ব ইংরেজের মতে আইনত মালিকীস্বত্ব হতেই পারে না।

চতুর্থ। তারপর জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মত ধার্য করে দেবার প্রস্তাব ফ্রান্সিস সাহেব প্রথমে উত্থাপন করেন। তাঁর কথা এই যে, কোম্পানী বাহাদুর বাংলা থেকে যে রাজস্ব আদায় করবার অধিকারী, তা "not a tribute imposed on a conquerred people, but its land revenuc."

মনে রেখো যে, এ সময়ে জন কোম্পানী রাজা হিসেবে নয়, দিল্লীর বাদশার দেওয়ান হিসেবেই ভূমিকর আদায় করবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় আদায়ী সেরেস্তার ব্যয়সংকুলান করবার জন্য যে-পরিমাণ টাকা আদায় করা আবশ্যক, তার অতিরিক্ত টাকা আদায় করা ফ্রান্সিস সাহেবের মতে যুগপৎ অন্যায় ও অসংগত। তাঁর নিজের কথা এই :

"The whole demand upon the country, to commence from April 1777, should be founded on an estimate of the permanent services, which the government must indispensably provide for; with an allowance of a

reasonable reserve for contingencies... I know not for what just or useful purpose any government can demand more from its subjects; for unless expenses are collected for the express purpose of absorbing the surplus, it must be dead in the treasury, or be embezzled. Having ascertained the amount the government needed to rise by land revenue, the contribution of the districts should be settled accordingly and 'fixed for ever'."—Fifth Report, vol. i.

সংক্ষেপে ফ্রান্সিস সাহেবের মতে গবর্মেন্টের পক্ষে যত্র ব্যয় তত্র আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব দেশের শাসনসংরক্ষণ করবার জন্য, সম্ভাবিত ব্যয়-আয়ের একটা বজেট তৈরি করে আবহমানকালের জন্য সেই বজেটই কায়েম রাখা দরকার। এই মতানুসারে বাংলার রাজস্বও চিরস্থায়ী করা হল। উপরোক্ত সব কারণে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ঠিক। এদেশের জলবায়ুর গুণে সব জিনিসই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব

এখন দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার স্বত্ব আরও পাকা হ'ল, কিংবা একদম কেঁচে গেল।

প্রজার যে ভিটে ও মাটি দুইয়েরই উপর কিছু কিছু স্বত্ব ছিল, সে সত্য সার জন শোর প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই না তাঁদের মনে অতটা ধোঁকা লেগেছিল। একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত, উভয়েরই যে একযোগে স্বত্বস্বামিত্ব কি করে থাকতে পারে, এ ব্যাপার তাঁদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। কেননা, কি রোমান ল, কি বিলাতের কমন ল, ও-দুয়ের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না। ফলে যে-সম্বন্ধ ছিল মিশ্র, তাকে তাঁরা করতে চাইলেন শুদ্ধ। ভারতবর্ষের মাটির এমনি গুণ যে, সে মাটি যে মাড়ায় সে-ই শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ফলে এদেশের প্রাকৃত প্রথা তাঁরা সংস্কৃত করতে প্রবৃত্ত হলেন।

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—খোদকস্ত আর পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্তু ও ক্ষেত্র দু-ই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকস্ত প্রজা; আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে-ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবস্তে সুরৎ জমি চাষ করে, তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রজাস্বত্ব শুধু খোদকস্ত প্রজারই ছিল, কেননা পাইকস্ত প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনরূপ স্বামিত্ব ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনোরূপ স্বত্ব ছিল না

সেকালের প্রজাস্বত্বের মোটামুটি ফর্দ এই :

১। প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না, অর্থাৎ তার জোত ছিল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট।

২। সে জোত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার অধিকার খোদকস্ত রায়তমাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার স্বত্ব যে মালিকীস্বত্ব, এ বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিলের নজির আছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজামাত্রেরই ছিল। তবে এ-কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করবার

সুযোগ ও প্রয়োজন, এ দুইয়েরই বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, জমিদারেরা নামমাত্র নিরিখে পাইকস্ত প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ করাতেন।

৩। জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি প্রমাণ এই যে, বাংলার কোনো নবাবই আসল জমা কখনো বাড়াননি। আসল জমা স্থির রেখে আবওয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামুলি দস্তুর। রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশমাত্র, সে অংশের হ্রাসবৃদ্ধি করবার অধিকার চিরাগত প্রথা অনুসারে রাজারও ছিল না।

খালি বাংলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এই সকল স্বত্বে স্বত্ববান ছিল। প্রমাণস্বরূপ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের "পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি" নামক প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"মারাঠী পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মিরাসদার বা মিরাসী (খোদকস্ত) ও উপরি (পাইকস্ত)। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজনা বাকী না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে, তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজনার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীয় স্বত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ত্রিশ চল্লিশ এমন কি ষাট বৎসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিয়াসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। মিরাসীরা গ্রাম-প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই গ্রাম্য জমির মালিকস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ...অবশ্য সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রাম্যসমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার সরকারের কর্মচারীগণ 'পাটীলে'র (মণ্ডল) সঙ্গে একত্র হইয়া গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন।"
—ভারতবর্ষ ফাল্গুন, ১৩২৬

এককথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, আর তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার রাজস্বেরই এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরেজিতে যাকে বলে ট্যাক্স-কলেক্টার, অর্থাৎ জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিশন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারিতে তহশিলদারেরা পেয়ে থাকে। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচ টাকা হারে কমিশন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশটাকা হারে পেতেন।

জন কোম্পানী কিন্তু এদেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন, এই সম্বন্ধ উল্টে ফেলে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাংলার মাটীর স্বত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী।

কিন্তু এ পরিবর্তন কোম্পানীর বড়কর্তারা স্বেচ্ছায় করলেও স্বচ্ছন্দচিত্তে করেন নি। এ ভয় তাঁদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্তব্য, সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন। এখানে আমি শুধু দুটি লোকের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, প্রথম ফ্রান্সিস সাহেবের, তারপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের; কারণ এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর একজন তার জননী।

"Mr. Francis proposed that it should be made an indispensable condition with the zemindar, that in the course of a stated time, he shall grant new pottahs to his tenants, either on the same footing with his own

quite sents, that is as long as the zemindar's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree."

ফ্রান্সিস সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে শোর সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে এই :

"The former is the custom of the country, this will become a new *assil jumma* for each ryot, and ought to be as sacred as the zamindar's quit rent."—Fifth Report, vol. ii.

এখন লর্ড কর্ণওয়ালিসের কথা শোনা যাক :

"Unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zemindars, every *begha* of land possessed by them must have been cultivated under an expressed or implied agreement, that a certain sum should be paid for each *begha* of produce and no more."—Fifth Report, vol. ii.

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজা আজ যে সকল স্বত্বের দাবি করছে, সে-সকল স্বত্ব প্রজার যে মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মদাতারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রজার ঐ সব মামুলি স্বত্ব যে তাঁরা আইনত রক্ষা করবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

"It being the duty of the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Govetnor General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent taluqdars, ryots and other cultivators of the soil."—(*Vide* cl. I, s. 8, Reg. I of 1793.)

দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোটেই পালন করেন নি; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টারী কমিটিকে কোম্পানী বাহাদুরের এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে যখন মহারাণীর আমল শুরু হল, তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশ আইন পাশ করা হল। এই হচ্ছে টেন্যান্সি আক্টের প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য ক্রমে ক্রমে অনেক-পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এ আইনের প্রসাদে যে শুধু মামলা বেড়েছে, তার কারণ ইংরেজিতে যাকে বলে half-measures, অর্থাৎ আধাখেঁচড়া ব্যবস্থা, যার ফলে শুধু নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হয়।

আজকের দিনে প্রজার সকল দাবি আইনত গ্রাহ্য হলে প্রজা যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে, সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই; এবং জমিদারবর্গের নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ-বিষয়ে প্রজার স্বার্থের হন্তারক না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে এ-কথা ভরসা করে বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আল্‌গা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে শুরু না করি, তাহলে দুদিন বাদে হয়তো দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। বহুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন :

"তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার গুণে নহে; অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন সে তোমারই ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরান মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা।"

তিনি আরও বলেন :

"এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জানো?—ইংরেজিতে যাকে বলে কম্যুনাল প্রপার্টি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাংলার প্রজাকে peasant proprietor না করে তুলি তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশিদিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের কো-অপারেশন-এর প্রয়োজন আছে, বিশেষত যখন বাংলার বেশির ভাগ জমিদার হিন্দু, আর বেশির ভাগ রায়ত মুসলমান। এই হচ্ছে এ প্রবন্ধের সার কথা।

বাঙ্গলার জমিদার

শ্রীবামাচরণ মজুমদার প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা ২১।১ নং আন্তনী বাগান লেন
হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

বাঙ্গলার জমিদার প্রধান-

বর্দ্ধমানাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল স্যার

বিজয়চন্দ্ মহাতাপ,

কে, সি, এস্, আই; কে, সি, আই, ই; আই, ও, এম্,

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহামহিম মহিমার্ণবেষু —

মহারাজাধিরাজ!

আপনি বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন জমিদার। জমিদারের নিকটেই "বাঙ্গলার জমিদার" অধিকতর শোভনীয় ও আদরণীয় হইবে বিবেচনায়, আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত আমার বহু যত্ন ও পরিশ্রমের ফল "বাঙ্গলার জমিদার" ভবদীয় করকমলে অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

নিবেদন

পুস্তক লিখিলেই মুখবন্ধ লিখিতে হয়, এই প্রথাটি স্মরণাতীত কাল অবধি সর্বত্র প্রচলিত আছে। এখানে আমাকে সেই প্রথার অমর্যাদা করিতে হইল। কারণ পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত এবং যে দরবারে হাজির করিতে পারিলে লেখক ধন্য হইবে, সে দরবারের মালিক জমিদার। জমিদার—এ দেশের ধর্মাবতার, সুতরাং মুখবন্ধ না করিয়া এখানে তাহাদের কাছে নিবেদন করাই আমার উচিত কার্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন বঙ্গবাসীর নিকটে বঙ্গভাষার সমধিক আদর আছে, জোর করিয়া এ কথা বলিলে কতকটা মিথ্যা বলা হয়; জমিদার সম্প্রদায় মধ্যেও সে শ্রেণির লোকের অবিদ্যমানতা স্বীকার করা যায় না; তাহাতেই ভয় হয়, এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি হয়ত তাহাদের হাতে পৌঁছিবে না। আরও এক আশঙ্কা,—যে দরবারের জন্য ইহা লেখা হইয়াছে, সে দরবার বড় আলস্যপরায়ণ, অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী; কিন্তু এই পুস্তকখানি তাহাদিগকে না পড়াইতে পারিলেও লেখকের চির পোষিত আশা পূরণ হইবে না, —উদ্বেগাকুল চিত্তেও শান্তি আসিবে না।

লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি সীমাবদ্ধ; ভাষাজ্ঞান অল্প, লিপি কৌশলও কিছুমাত্র নাই। কাজেই ভাষায় ভাব প্রকাশ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, অধিকন্তু পুস্তকে ভুলভ্রান্তি এবং প্রয়োগ দৃষ্টিরও অভাব হয় নাই, লেখক তজ্জন্য লজ্জিত বা দুঃখিত নহেন; কেন নহেন, উপরেই তাহা বলা হইয়াছে।

সাহিত্য সমাজে নাম ও যশের কাঙ্গাল হইয়া এই পুস্তক প্রচার করা হইতেছে না। উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার, কাজেই অধুনা প্রচলিত তোষামোদ খোসামোদ এবং চাটুকারিতার একান্ত অভাব আছে। দেশের ও সমাজের দুর্ভাগ্য এবং অন্তর্ভূত অভাব প্রকাশ করাই ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সে উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইলেই যথেষ্ট।

এই ক্ষুদ্র নগণ্য পুস্তক পাঠ করিয়া দেশহিতৈষী গণনীয় মহোদয়গণের দৃষ্টির কণামাত্রও যদি দুর্ভাগ্য সমাজের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলেই লেখক কৃতার্থ হইবে; তাহার অধিক সে আশা করে না,—আকাঙ্ক্ষাও রাখে না।

বঙ্গের মহামান্য জমিদার মহোদয়গণ! স্বদেশের দুর্দশাপূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আমি আপনাদের সম্মুখীন করিতে সাহসী হইলাম। আপনারা ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া যদি আমার বাসনাপূর্ণ ও সমাজের দুর্দশা মোচন করিতে আপনাদের মহামূল্য সময়ের কিয়দংশমাত্র ব্যয় করিতে কৃপণতা না করেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব। উপরেই বলিয়াছি, ইহার অধিক আর আমার কোন আশা নাই, আর কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও রাখি না! নিবেদন ইতি—

কলিকাতা
চৈত্র—১৩২০ সাল

গ্রন্থকারস্য

বাঙ্গলার জমিদার

হেতুবাদ

কবি কল্পনার অতীত, চিরসুখ শান্তিময়, প্রকৃতির পুণ্য লীলাভূমি ধরিত্রীর পীযূষপূরিত বক্ষে আমাদের বঙ্গদেশ। সুজলা সুফলা শস্য-সম্পদ-শালী বলিয়া এ দেশকে শত সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। অতীতের শত অত্যাচার, সহস্র উৎপীড়ন, বহু বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি হইয়াও বঙ্গভূমি এখন পর্যন্ত যে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে ইহাই আমাদের পক্ষে শ্লাঘনীয়। এমন পুণ্যময় দেশে জন্মিয়া—বাঙ্গালী নামে পরিচিত হইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

এই বঙ্গে বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কর্ম্মস্মৃতি নানাপ্রকারে এখনও ক্ষীণ রেখার মত আজও এ দেশে বর্তমান রহিয়াছে। সে স্মৃতিতে কত শত সু বা কু কীর্ত্তির সুখ দুঃখের কাহিনী বিজড়িত হইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সে অনুশীলন ঐতিহাসিক গবেষণার অন্তর্গত, সুতরাং এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভের প্রাক্কালে, অবিচার অত্যাচার হইতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া যখন দেশের অস্থি মজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছিল, তৎকাল হইতে খ্রিস্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষকাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যেমনই থাকুক বাহ্যিক আবরণটা ঠিক সমভাবেই ছিল। দীর্ঘকাল অশান্তি ভোগের পর দেশবাসীগণ ইংরেজ শাসনের সুশীতল ছায়ায় বেশ একটু আবেশে সুখ স্বচ্ছন্দে আরাম সুখ ভোগ করিতেছিলেন; তাদৃশ সুখ শান্তির সময়ে পাশ্চাত্যের অবাধ বাণিজ্যের প্রবল ঘাত প্রতিঘাতে, দৈব দুর্বিপাকে. অভাবের টানে বঙ্গের বহিরাবরণ অপসৃত হইয়া তাহার অন্তঃসার শূন্য কঙ্কালসার শুষ্ক দেহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বলিলে নিতান্ত অন্যায় বলা হয় না।

প্রবাস প্রত্যাগত অতি বড় নিকট আত্মীয়, হঠাৎ আধি ব্যাধি গ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় গৃহাগত হইলে, আত্মীয় স্বজনের মনে যেমন একটা অব্যক্ত আতঙ্ক, আশঙ্কা ও উদ্বেগ উপস্থিত হয়; অপ্রত্যাশিতভাবে দেশবাসীর নিকট তেমনই ভাবে বঙ্গদেশের এই ভয়াবহ শোচনীয় দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়াছে। সমগ্র দেশবাসী সদ্য-চকিত-নিদ্রোত্থিতের ন্যায় এই অতর্কিত বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে, এবং লক্ষ্যহীন দিশাহারা হইয়া কেবলই ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে; কি যে করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

ব্যাধি উৎকট, নিরাময়ের ঔষধ স্থির হইতেছে না। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, কৃষি ও বাণিজ্য ইত্যাদি নানাবিধ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া দেশকে রক্ষা করিবার জন্য দেশবাসীগণ আপনাদের বুদ্ধি ও শক্তি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বিভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকগণের বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবস্থার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও ফল বিপর্যয় দৃষ্ট হইতেছে। বর্তমান সময়ে কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্তব্য এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিলে শুভ ফল ফলিবে বাস্তবিক তাহা নিরুপণ করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জননী জন্মভূমির কল্যাণ সাধনে সকলেই প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ধনী দরিদ্র, মূর্খপণ্ডিত, ধার্মিক বা ধর্মজ্ঞানহীন সকলেই এখানে সমস্বার্থে বিজড়িত; উদ্দেশ্য এক, সুতরাং পরস্পরের অধিকার সমান। এ কর্মক্ষেত্রে কাহাকেও কেহ উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না, পারাও উচিত নহে;—প্রত্যেকেই যুক্তি ও কর্মদ্বারা স্বীয়মত সমর্থন করিবার অধিকারী এরূপ চেষ্টা অস্বাভাবিক নহে—বরং বিশেষ প্রশংসনীয়।

জগতের প্রত্যেক দেশের এবং জাতির ভিত্তিতেই একটি আদর্শ সম্প্রদায় আছে, উচ্চ আদর্শ ব্যতীত কোন জাতি বা ব্যক্তি কখন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আমাদের বঙ্গদেশেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না; দীর্ঘকাল হইতে আমাদের সমাজ এবং জাতির সম্মুখে আদর্শরূপে দাঁড়াইয়া জমিদার সম্প্রদায় জনসাধারণের কর্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছিলেন। আজও পর্যন্ত দেশবাসীগণ তাহাদিগকেই আদর্শস্থলে রাখিয়া—তাহাদেরই দৃষ্টান্তের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া চলিতেছে; সুতরাং দেশের বা সমাজের কোন বিষয় আলোচনা করিতে গেলে স্বতঃই জমিদার সম্প্রদায়ের নাম আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে।

জমিদার—বাঙ্গলার আদর্শ, রক্ষক এবং পালক সুতরাং তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া দেশের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হইতে পারেনা; কারণ তাহাদের উন্নতি অবনতির সহিত দেশের সকল উন্নতি অবনতি সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার কোন পরিবর্তন-নিবর্তন অথবা সংযোগ-বিয়োগ করিতে হইলে সেই সূত্র হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে; কাজেই ন্যায়-অন্যায়, অভাব অভিযোগ ইত্যাদি সেই মূল স্থান হইতেই আরম্ভ করিবার আবশ্যক হইয়াছে এবং বিচার স্থলে সেই সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকারের উপায়ও নির্দেশ করা গিয়াছে।

জমিদারগণ—দেশের নেতা: তাহাদের উন্নতি অবনতির সহিত দেশের তাবৎ উন্নতি অবনতি প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং জমিদারগণের পূর্বে এবং বর্তমান অবস্থার আলোচনা করা অতীব কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় জমিদারি-স্টেটগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইয়াছে।

ধনে মানে ও অগ্রসম্মতায় বাঙ্গলার জমিদার দেশের ও সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। জনসাধারণ সকল সময়ে সর্ববিষয়ে তাহাদের মুখাপেক্ষী; সুতরাং জমিদারকে দেশের মেরুদণ্ড ধরিয়া লইয়া তাহাদেরই নিকটে সমস্ত অভাব অভিযোগের বিজ্ঞাপন ও কর্তব্যবোধে তৎপ্রতিকারের উপায় নির্দেশ করা হইতেছে। জাতি এবং সমাজের দুর্দশা অধুনা চরম সীমায় পৌছিয়াছে, ইহা অস্বীকার্য হইতে পারে না। ব্যক্তিগত

ভাবে একথা বলিবার ক্ষমতা বা অধিকার আমার নাই, কিন্তু সমাজ ও জাতির হিসাবে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই প্রাকৃতিক স্বাধীন ক্ষমতা পাইয়া নিজ ক্ষুদ্রজ্ঞান অনুযায়ী মত প্রকাশ করিতে আমি এক্ষেত্রে সাহসী হইয়াছি; এবং স্বীয় মত সমর্থনার্থ প্রকৃত সত্য ও তাহার অনুকূলে ক্ষুদ্র যুক্তি প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শাস্ত্রে পরের কাছে ঘরের কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে, কিন্তু কথা হইতেছে প্রকৃত পক্ষে আমি পরের কাছে ঘরের কথা প্রকাশ করিয়াছি কি না; প্রথম তাহাই বিবেচ্য ও বিচার্য।

যাহা বক্তব্য তাহা দেশবাসী জমিদারগণের নিকটেই বলা হইয়াছে। জমিদারগণ আমাদের পর নহেন বরং অতি বড় আপনার,—আমাদের সর্বস্ব; সুতরাং এতদ্বারা কোন মতেই শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করা হয় নাই। উল্লিখিত হেতুবাদে বিধি নিষেধের শাসন কদাচ আমাকে দায়ী করিতে পারিবে না।

বিধিনিষেধ উপেক্ষা করিবার দাবি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াও কিন্তু আমি নিজেকে একেবারে নিরপরাধ মনে করিতে পারিতেছি না; কারণ নীতিবাক্যের অনুগমন অনুসরণ করিতে অক্ষম হইয়াছি। "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যম্ প্রিয়ম্" এই মহাজন বাক্যকে উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যে কার্যগতিকে অগত্যা কিঞ্চিৎ দূরে রাখিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ সত্য গোপন করিলেই বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, বক্তব্যের অসম্পূর্ণতা পুস্তকের উদ্দেশ্যে বাধা জন্মে; ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না।

পক্ষান্তরে সত্য প্রকাশ করিতে যাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে সম্প্রদায় বিশেষের উপর নানাভাবে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে কটাক্ষ করিতে হইয়াছে; তবে সেরূপ কটাক্ষ সন্ধানে কোনও রূপ মিথ্যা বা অসঙ্গত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই এইমাত্র ভরসা।

ধনী, মানী, জ্ঞানী সকলকেই সমাজের মধ্যে থাকিয়াই চলিতে হয়, সমাজে দশের সুখ দুঃখে নিজ সুখ জড়াইয়া না লইলে সংসার হইতে নিজেকে জোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হয়। ইহজগত শুধু আত্ম সুখভোগের স্থান নহে; আত্ম সুখভোগই যদি এ সংসারের একমাত্র লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে মানুষের কর্তব্যেতিহাসের সাজ সরঞ্জাম সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত। বিশ্বস্রষ্টা মনুষ্যকে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া নিতান্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; স্বেচ্ছায় কোন দিক্ দিয়া যাইবার উপায় রাখেন নাই; যে দিক দিয়া যাওয়া যায়, সেই দিকেই কর্তব্যের কঠোর ঝঞ্ঝাবাত, কর্মের গভীর পরিখা। বিজ্ঞান দর্শনাদি ব্যবহারিক শাস্ত্রের সহস্র উন্নতি-সাধন করিয়া কেহ কখন কর্তব্য রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না; একথা মহাজন বাক্য সম অখণ্ডনীয়; সুতরাং সেরূপ চেষ্টা বৃথা! প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করিলে আজ হউক, কাল হউক, কিম্বা দশ দিন পরেই হউক, কর্মকর্তাকে অবশ্যই অনুশোচনা করিতে হইবে,—সুতরাং কোনরূপে ন্যায়-নীতির উল্লঙ্ঘন করা কদাপি কর্তব্য নহে।

যে কোন কারণেই হউক, দেশ বা সমাজের উপর নেতৃত্ব অথবা কর্তৃত্ব করিবার অধিকার পাওয়া সৌভাগ্যের পরিচায়ক, তদপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। নেতা এবং কর্তার পদমর্যানুরূপ কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। শত সহস্র ব্যক্তি যাহাদের ইঙ্গিতে উঠে

বসে, মরে বাঁচে—জাতির এবং সমাজের উত্থান পতন, জীবন মরণ যাহাদের কার্য কারণের উপর নির্ভর করে, সে দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া চলা সমাজপতিগণের একান্ত উচিত এবং স্বীয় অযাচিত প্রাপ্ত-শক্তি-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রত্যেক কার্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। ব্যতিক্রম ব্যবহারে নিন্দাভাজন ও অবজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনাই অধিক, ইহা বলাই বাহুল্য।

দশের সমালোচনাকে উপেক্ষা করিয়া ও মতকে পদদলিত করিয়া,—আত্মম্ভরিতায় ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া চলিলে, নেতা কর্তাদের পদমর্যাদা কদাপি অটুট থাকিতে পারে না। দশের মত পদদলিত করিয়া, কে কবে, কোথায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিয়াছে? পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে, সম্প্রদায় এবং জাতীয় উত্থান পতনের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে ইতিহাস ও পুরাণে এইরূপই প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস যখন এমন উজ্জ্বল সাক্ষী প্রদান করিতেছে; তখন একই পতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়া, একই আইন শাসনের অধীনে থাকিয়া, অতি সামান্য দুই একটি ক্ষুদ্র সুবিধা অধিকার বশে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া এতাধিক অহঙ্কারী ও উশৃঙ্খল হওয়া সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে কদাপি যুক্তিসঙ্গত হয় না।

সম্প্রদায় বিশেষের উপর অত্যধিক কটাক্ষ করায়, সমাজের নিকট অবশ্যই নিজেকে নিন্দুক সাজিতে হইয়াছে, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। যে সকল কারণে এই গর্হিত কার্য জ্ঞাতসারেও করিতে হইয়াছে, তাহার একটি ক্ষুদ্র কৈফিয়ৎ এখানে প্রদান না করিলে চলিতেছে না, আত্মরক্ষা করাই সর্বপ্রথম কর্তব্য।

উচ্ছ্বাসাধিক্যে আব্দারের মাত্রাটা কিছু অধিক হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। লোকে আপনার জনের কাছেই আব্দার করিয়া থাকে, আমাদের আপনার জন বঙ্গের জমিদারগণ, —এই জন্য আলোচনা প্রসঙ্গে আব্দারের মুখে কোন বিষয়ে এতটুকু বিবেচনাও করা হয় নাই—একটুকুও বাদ দেওয়া হয় নাই।

ভুক্তভোগী না হইলে পৃথক্ পৃথক্ সমাজের প্রাকৃত অবস্থা বর্ণন একরূপ অসম্ভব। এই হেতুবাদে এবং জমিদারগণকে আত্মীয়, বন্ধু ও মুরুব্বী এবং আদর্শ মানিয়া লইয়া, সমাজের বর্তমান অবস্থার যথাযথ স্বরূপ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তবে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; শ্লাঘাকে দূরে রাখিয়া সাহসপূর্বক এ কথা অবশ্য বলিব। জমিদার মহোদয়গণ, যদি বর্ণিত প্রসঙ্গকে কেবল সাম্প্রদায়িক সমালোচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া লেখককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে এ দীনের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হইবে। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা কোন প্রকারেই সমালোচনা নহে,—তবে সাম্প্রদায়িক আলোচনা বটে।

অযথা ব্যয়াধিক্য, অন্য প্রকার আয়ের উপায় উদ্ভাবনে নিশ্চেষ্টতা, ক্রম বিভাগ এবং উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে জমিদারি স্টেটগুলির যে কি ভীষণ অবস্থা উপস্থিত

হইয়াছে, তাহা ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। বর্তমান অবস্থায় জমিদারগণের আপন আপন অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় খুব কম হইয়া পড়িয়াছে; আড়ম্বর, বিলাসস্পৃহা, অলসতা এবং বিবিধ ব্যসন সম্মুখে অগ্রবর্তী হইয়া তাহাদিগকে কর্তব্য বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বকালের ন্যায় এখন জমিদারদিগের হিতৈষী বন্ধু, কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্তমান সময়ে স্টেট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ, অন্যায় অসঙ্গতের অনুমোদন করিয়া, জমিদারগণের বিপদ ঘণীভূত করিয়া তুলিয়াছে। কর্মচারী, বন্ধু ও আশ্রিতজনের কর্তব্য,—পালক এবং আশ্রয়দাতার হিতসাধন করা, তাহার অন্যায় এবং ভুল দেখাইয়া দেওয়া। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মানুষ যতই কেন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান হউন না;—ভুল ভ্রান্তির হাত কাহারই এড়াইবার উপায় নাই; মতিভ্রম সকলেরই হয়, —আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াই থাকে। এরূপ দুঃসময়ে শুভানুধ্যায়ীদিগের যাহা কর্তব্য, তাহা ন্যায়সঙ্গত রূপে পালন না করিলে অত্যন্ত অন্যায় ও নিতান্ত অসঙ্গত কার্য হয়। বর্তমান সময়ে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত ভাবে কাজ হইতেছে।

যখন কোন জমিদার ভ্রান্ত-ধারণা ও মোহের বশবর্তী হইয়া অন্যায় অসঙ্গত কার্য দ্বারা আপনাকে নানারূপে বিপন্ন করিয়া তোলেন, তৎকালে বন্ধু, তথা কথিত হিতৈষী (!) কর্মচারীগণ, পালক ও আশ্রয়দাতা জমিদারের কৃত ভুল কার্যকেও, উত্তম উত্তম বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া উহার ভ্রান্তি মোহ শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকেন, এবং অন্যায় অসঙ্গতের অযথা সমর্থন করিয়া, স্টেটের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। যাঁহারা ঐরূপ কার্য করেন সত্যই কি তাহারা হিতাকাঙ্ক্ষী?

দেশে আজকাল স্বার্থপর চাটুকারের সংখ্যাই অধিক; জমিদারদিগের নায়েব, দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ কর্মচারী পর্যন্ত এখন এই ঘৃণিত পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছেন। অনুচর, কর্মচারীদিগের, জমিদারের অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করবার ক্ষমতার আদৌ অভাব ঘটিয়াছে; কাজেই কোন স্টেটের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। বিবেচনা ও উপযুক্ত নির্বাচন অভাব ইহার অন্যতম কারণ বলিলে দোষ হয় না। শ্রেষ্ঠ পদাভিষিক্ত কর্মচারীগণকেও সামান্য স্বার্থহানীর আশঙ্কায় নিতান্ত অসঙ্গত কার্য সকলকে এমন অম্লান বদনে অনুমোদন করিতে দেখা যায়; ইহা নিতান্ত লজ্জাকর ব্যাপার। কেবল লজ্জাকর কেন,—যারপর নাই ঘৃণার কথা। এই সকল শুভানুধ্যায়ী পুরুষগণ জমিদারদিগের ব্রণ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। একটু চেষ্টা করিলেই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। অতঃপর যাহাতে কোন প্রকার অন্যায় অসঙ্গত কার্য ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অযথা অনুমোদিত না হয়, জমিদারগণের তাহা বিবেচনা করিয়া লইবার আবশ্যক হইয়াছে। সময় থাকিতে চেষ্টা না করিলে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদেরই ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক।

অন্যায় এবং ভ্রান্তি বুঝাইয়া দেখাইয়া দেওয়াই বন্ধু, আত্মীয় এবং কর্মচারীদিগের কর্তব্য। না বুঝাইয়া দিলে মানুষ স্বকৃত ভ্রম সহজে বুঝিতে পারে না; আর এই ভুল-ভ্রান্তি, বুঝিতে ও দেখিতে না পারিয়াই বঙ্গের জমিদারগণ ক্রমাগত একটার পর আর একটা,

তাহার পর আবার নতুন একটা ভুল করিয়া বসিতেছেন; ফলে তাহাতে স্টেট সকলের সমূহ ক্ষতি হইতেছে; —সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও সর্বনাশ ঘটিতেছে। স্বীয় আভিজাত্য, মানসম্ভ্রম এবং অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে, প্রত্যেক জমিদারকেই তথাকথিত কর্মচারী ও বন্ধুগণের চাটুকারিতা হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইবে, তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে হইবে। মিথ্যা বিলাসিতা হইতে আপনাকে তফাতে রাখিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। আবর্জনা দূর করিয়া তৎসঙ্গে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণকে স্টেটের কার্যভার প্রদান করা আবশ্যক। এখন এইরূপ করিবারই আবশ্যক হইয়াছে। কেবল তোষামোদ খোসামোদের বশীভূত হইলে চলিবে না; নিজের হিসাব ষোলআনা বুঝিয়া লইতে হইবে, অপর পক্ষে অর্থনীতির আলোচনা এবং নিজ অবস্থার সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়া চলিতে হইবে।

উল্লিখিত বিষয় সকলের আলোচনা করিতে যাইয়া লেখককে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সমাজ বিশেষের উপর গায়ে পড়িয়া স্বকৃত মোড়লের ন্যায় কথা বলিতে হইয়াছে। কি করা যায়;—বিপদ যখন মাথার উপর বোঝা হইয়া চাপিয়া পড়িয়াছে, তখন আর চুপ করিয়া থাকা কখনই সঙ্গত নহে; পেট ভরিয়া খাইলে যদি লক্ষ্মী ছাড়েন—তবে নাচার। যখন আধপেটা খাইয়াও সচলা কমলাকে যখন অচলা করিয়া রাখিতে পারা গেল না, তখন আর ভয় করিয়া চলিলে কি হইবে।

স্থূল কথা, বর্তমান সময়ে যে একটা অদল বদল আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যাহারা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্, তাহারা কদাচ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ সকল বিষয়েই কিছু কিছু পরিবর্তন নিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং আশা করা যায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে বাঙ্গলার জমিদারগণ এ সময়ে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, আপনাদের ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া চলিবেন,—এ আশা দুরাশা নহে, এবং জমিদারগণ অবশ্যই নিজের এবং সমাজের কল্যাণ-কামনায় জড়তা পরিত্যাগপূর্বক আপন আপন স্টেটের উন্নতি কল্পে স্বীয় কর্তব্যশক্তি নিয়োগ করিয়া পতনের মুখ হইতে স্টেটগুলিকে সামলাইয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

আশা বৈতরণী,—আশার ছায়ার মুখের প্রতি আকুল নেত্রে তাকাইয়া—মানুষ অসাধ্য-সাধন করে, সাধনে জয়লাভ করিয়া কর্মবীর নামে খ্যাত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশকে এবং সমাজকে উন্নত করে। পূর্বকালে আমাদের যথেষ্ট সৌভাগ্য ছিল; যদিও আমরা সে কাল আর ফিরিয়া পাইব না,—সে দিন আর ফিরিয়া আসিবে না;—তথাপি হতাশ হইয়া নীরবে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কখনই কর্তব্য নয়। কর্মের দ্বারা যতটা সম্ভব, আবশ্যক মত নিজেকে, সমাজকে, সংসারকে গড়িয়া পিটিয়া নিজের মত করিয়া লইতে চেষ্টা পাইতে হইবে,—আর এরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত। আমাদের কর্মশক্তি একেবারে, এককালে বিলুপ্ত হয় নাই; পূর্বস্মৃতি লয় পায় নাই,—ইচ্ছাশক্তি এখনও বর্তমান আছে, সুতরাং এ সময়ে কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় দাঁড়াইলে, জমিদারি-স্টেটগুলির অবস্থা পুনরায় উন্নতির দিকে ফিরিতে পারে বলিয়াই বিশ্বাস।

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে বিঘূর্ণিত হইয়া, নিজের ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ভুগিয়া

ও বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের স্টেটের অবস্থা নিগূঢ় সন্ধানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ লইয়া, যে সামান্য জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছি এবং সহস্রাধিক পল্লীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা দ্বারা যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশ করিলাম। মিথ্যা একবর্ণও বলা হয় নাই,—যাহা প্রকৃত তাহাই আলোচিত হইয়াছে। ভৌতিক-কল্পনা-মৌলিকতা সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও লেখক, যে দেশের গণ্যমান্য প্রবীণ প্রাচীন জমিদারদিগের পর্যায়ে নিজস্থানে নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, তাহা অত্যন্ত গর্হিত ও ধৃষ্টতা হইলেও ক্ষমনীয়। যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ছোট বড় হইবার জন্যই চিরকাল লালায়িত। ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া লওয়াই মহত্ব সুতরাং মহতের নিকট এবম্প্রকার আব্দার অনুচিত হইলেও অসমুচিত হয় নাই বলিয়া মনে করিয়া লইলে বিশেষ দোষের হইবে না।

ভাষার মর্যাদা রক্ষার ক্ষমতার দীনতা ও শব্দ সংযোজন প্রণালীর অঙ্গহীনতায় স্থানে স্থানে আমার মনোগত ভাব প্রকাশক উক্তি প্রয়োগ কিছু কঠোর ও কষ্টসাধ্য হইয়াছে, অবশ্য আমি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য।

যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা হিংসা দ্বেষ বা অসূয়া কলুষিত নহে; প্রকৃত অভাব বিবৃত করিতে যাইয়া কার্য পরম্পরায় যেন কিছু বিরুদ্ধভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া লইলে ভাল হয়। আলোক, অন্ধকার, পাপপুণ্য এবং সত্যমিথ্যায় আকাশ পাতাল প্রভেদ, অথচ ঐ তিনের সম্বন্ধ পরস্পরে অতি নিকট; এমন কি একের অভাবে অন্যের অস্তিত্বই উপলব্ধি হইতে পারে না। একের দোষগুণ বিচার করিবার সময়ে অপরকেও ডাকিয়া আনিতে হয়; না ডাকিলেও—কাহার প্রতীক্ষা না করিয়া সে আপনি অজ্ঞাতভাবে, বিনা আহবানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে।

যে চিত্র অঙ্কিত্ করিবার বাসনা ছিল, তাহা বোধ হয় পারিলাম না, ভাষার দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিয়াছি বলিয়াও বিশ্বাস নাই। নিজের শত সহস্র দীনতা বুঝিতে পারিয়াও, কেন যে এমন অসমসাহসিক কার্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহা ভাব এবং ভাষার দ্বারা বুঝান দুষ্কর, তবে কেবলমাত্র আশা, ভবিষ্যতে কোন শক্তিশালী লেখক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি এরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন।

সুধী সমাজ এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর পুস্তক হইতে যদি কিছু সত্য বাহির করিয়া লইয়া ক্বচিৎ দোষাবলীর প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দেশকে এবং সমাজকে পতনের মুখ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই লেখক কৃতকৃতার্থ হইবে।

পরিশেষে দেশের ধনী, মানী ও জ্ঞানী জমিদারগণের নিকট, জ্ঞানকৃত এই উদ্ভট ধৃষ্টতার জন্য করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ভরসা আছে আমার আদর্শ মুরুব্বিগণ দীনের সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আপনাদিগের চিরমহত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন; ইহাই শেষ প্রার্থনা।

বঙ্গের জমিদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

লক্ষ্মীর বরপুত্র, দেশের আশা, দশের আশ্রয় বাঙ্গলার জমিদার। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় প্রজাগণের মধ্যে বঙ্গের জমিদারগণ ধনে, মানে, গৌরবে এবং রাজসম্ভ্রম লাভের অধিকারে বর্তমান সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া আছেন। আলোচ্য বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, এই সর্বসম্ভ্রমাধিকারী ও সর্বসুখভোগী জমিদার সম্প্রদায় কবে কোথা হইতে কেমন করিয়া উদ্ভূত হইলেন। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অলোচনা আবশ্যক; অতএব সর্বাগ্রে তাহাই আমাদিগকে করিতে হইতেছে।

হিন্দুরাজত্বকালে ভারতে রজতাদি ধাতুমুদ্রার সমধিক প্রচলন ছিল না, তবে সুবর্ণ মুদ্রা প্রচলনের কথা জানিতে পারা যায়। তাহা রাজভাণ্ডারেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রজার নিকট ভূমিরাজস্ব, উৎপন্ন শস্য হইতেই গ্রহণ করা হইত। মুসলমান রাজত্বের প্রথমাবস্থায় সেই নিয়মের কোন অন্যথা হয় নাই। দেশের পূর্ব প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই কর গৃহীত হইত। খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শের শাহের রাজত্বকালে রৌপ্য মুদ্রার অধিকতর প্রচলন আরব্ধ হয়। শের শাহ "তঙ্কা" নাম দিয়া রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও ঐ সময়ে তঙ্কা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণ প্রজাগণ তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইত না, তাহারা রাজকর পূর্বরীতি অনুসারে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দ্বারাই প্রদান করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গিরদারগণ এবং অন্যান্য সামন্ত রাজগণ রাজকোষে যে রাজস্ব ও নজরানা প্রদান করিতেন, তাহাতে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যতঙ্কা উভয়ই একত্র মিশ্রিত থাকিত, রাজসরকারের অল্প বেতনের কর্মচারী, সৈন্য সিপাহি এবং সামান্য সামান্য চাকর নফরদিগের বেতন (তন্‌খা) এই রৌপ্য তঙ্কা হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; উচ্চ বেতনের মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতির বেতনাদি স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারায় পদত্ত হইত।

মোগল রাজত্বের গৌরবরবি সম্রাট আকবর বাদশাহের সময়ে, খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে রৌপ্য মুদ্রা ও তাম্র মুদ্রার বহুল প্রচলন আরম্ভ হয়। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও কৃষি প্রজারা ভূমির কর ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দ্বারা প্রদান করিত। কেবল কাশ্মীর ও বঙ্গদেশের রাজস্ব মুদ্রা দ্বারায় আদায় হইবার নিয়ম পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের এতাধিক রাজ্য নিজের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন যে, তৎপূর্বে অপর কোন বাদশাহ তত বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। আকবরের অধিকারে রাজ্য বিস্তৃতির সহিত রাজ্যের তাবৎ কার্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন কর সংগ্রহের পক্ষেও বিবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সেই সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া সুশৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত সমগ্ররাজ্যের কার্যাবলী একত্রিত না রাখিয়া রাজকার্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়; প্রত্যেক বিভাগে এক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মনোনীত করিয়া, তাহার

হস্তেই পূর্ণ কর্তৃত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা তোডরমল রাজস্ব বিভাগের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অর্থনীতিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী কার্যকুশল কর্মচারী রাজা তোডরমল রাজস্ব সচিবনামে অভিহিত হন। রাজা তোডরমল রাজস্ব সচিব হইয়া রাজ্যবাসী প্রজাবর্গের উচিতমত কর ধার্য বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত জমি জরিপ করাইয়া, পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক জমাবন্দি প্রস্তুতের বিধান করেন। জমি জরিপ করিবার প্রণালী গৌড় বাদশাহ সেকেন্দর শাহের রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত হইলেও এতদ্দেশে উহা বিস্তৃতি লাভ করে নাই। এতাধিক বিস্তৃত রাজ্যের জমা নির্ধারণ করিবার সময়ে রাজস্ব সচিব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, শস্যদ্বারা তাদৃশ সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কর সংগৃহীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব; অতএব শস্যের পরিবর্তে মুদ্রাদ্বারা কর গ্রহণ করিবার কল্পনা তাহার মনে উদিত হয়; সেই কল্পনা কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত তিনি রাজ্যের ভিন্নভিন্ন স্থানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া যে সকল স্থানের ভূমির কর শস্যের পরিবর্তে মুদ্রাদ্বারা গ্রহণ সম্ভব পর হইতে পারে, সেই সকল স্থানে ঐরূপ ব্যবস্থা প্রচলন করিয়া দেন। কিছুদিন সেই নিয়মে কর গৃহীত হইবার পর, রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, প্রতিবৎসর প্রজার জমা নির্ধারণ করিয়া কর সংগ্রহ করা দুষ্কর, তাহাতে অসুবিধা বিস্তর, সেই সকল অসুবিধা পরিহার করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবিধার নিমিত্ত তিনি স্থলবিশেষে প্রজার জমা দশ বৎসর এবং উনিশ বৎসর মেয়াদে একবিধ জমা বাহাল রাখিবার ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন। ইহাতে রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীগণের এবং সাধারণ প্রজা লোকের, সকল পক্ষেরই বিশেষ উপকার হইয়াছিল।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজা তোডরমল কর্তৃক এ দেশের রাজস্ব বিভাগের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়, সেই সকল পরিবর্তনে অবশ্য শুভফল ফলিয়াছিল, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম অংশে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে দিল্লি সিংহাসনের অধীনস্থ ভূখণ্ডসমূহের প্রজারা নানা পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। মুসলমান রাজত্বের প্রথমাবধি জায়গিরদার নামে এক শ্রেণির উল্লেখ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, আওয়াবদার, কেল্লাদার, থানাদার ইত্যাদি পর্যায়ে বহুবিধ শ্রেষ্ঠ প্রজার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। সাধারণ প্রজার উপর তাহার যথার্থ ভূম্যধিকারীর ন্যায় প্রভূত্ব করিবার অধিকারী ছিলেন এ কথা মিথ্যা নহে।

যদিও জমিদার নামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উল্লেখ সে সময়ে কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না; তথাপি আকবরের রাজত্বকালে, যে সময় হইতে ভূমির কর শস্যের পরিবর্তে মুদ্রার দ্বারা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় নিরুপক মেয়াদে একবিধ প্রকারে কর গ্রহণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল; সেই সময়কে যদি জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। বাস্তবিক সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে আধুনিক জমিদারের ন্যায় কোন বিশেষ সম্প্রদায় যে ছিল না অর্থাৎ কেবল কর প্রদান করিয়া নির্বিবাদে সুখ স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করিতে কেহ অধিকারী ছিলেন না, ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারে যাইতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যাবস্থায় বঙ্গদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের আধিক্য দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই বিপ্লবসম্ভূত কারণ হইতে দেশে যে মহা অনর্থের সূচনা হয়; রাজা প্রজা সকলেই তাহাতে

শঙ্কিত হইয়াছিলেন; সেই সময়ে বঙ্গদেশে রাষ্ট্রীয় ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়; সেই পরিবর্তনের কালে জমিদার সম্প্রদায়ের প্রথম পত্তন, এরূপ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কিন্তু তৎকালে জমিদারদিগের স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, এবং তাহারা জমিদার নামে অভিহিত না হইয়া অনেকেই রাজা নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই জন্যই অস্মদ্দেশের প্রজা সাধারণ এখনও জমিদারকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

এই সময়ে বঙ্গদেশে দিল্লি সিংহাসনের অধীন সীমান্ত রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। উত্তর পূর্বে আসাম, পূর্বদক্ষিণে চট্টগ্রাম প্রদেশ এবং দক্ষিণ পশ্চিম উড়িষ্যা এই সীমান্তর্গত সমতল ভূমিখণ্ড তৎকালে বঙ্গদেশ নামে কথিত হইত। চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন; ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতি সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই, সৈন্যসামন্তাদিসহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া গৃহস্থদিগের উপর অশেষ প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত এবং অগ্নি সংযোগদ্বারা লঙ্কাকাণ্ড করিতেও বিরত থাকিত না। এই সকল ক্ষুদ্র বিপ্লব বঙ্গদেশে ঘটিতে থাকিলেও ইহা দিল্লির রাজসিংহাসনকেও বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু প্রতিকারের উপায় ছিল না। বহু শত ক্রোশ দূরস্থিত সিংহাসন হইতে এই জল জঙ্গলপূর্ণ নিত্য উৎপীড়িত প্রদেশকে, দুরন্ত লুণ্ঠনকারীদিগের অত্যচার হইতে রক্ষা করা সুসাধ্য ছিল না। লুণ্ঠনকারীগণের দৌরাত্ম্য নিতান্ত অসহ্য হইলে সম্রাট ভাণ্ডার হইতে জলের ন্যায় অর্থরাশি ব্যয় করিয়া, ধারাবাহিক অভিযানের পর বহু সহস্র সৈন্য সহায়ে দেশকে শত্রু কবল মুক্ত করা হইত; লৌকিক ভাষায় তাহাকে শান্তি বলা যাইত; কিন্তু সে শান্তি অতি অল্পক্ষণ স্থায়িনী। কেননা বৈরীপক্ষ পরাজিত হইয়া দেশ ছাড়িয়া একেবারে চলিয়া যাইত না, অদূরস্থ জঙ্গল মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিত, সম্রাটের বিজয়ী সৈন্যগর রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যাইবার পর দিনই লুণ্ঠনকারীগণ গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া, আবার নিজমূর্তি ধারণপূর্বক পূর্ববৎ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া দিত। এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া দিল্লিশ্বর সেই সময়ে দেশবাসীগণের সুখ সুবিধার জন্য বঙ্গদেশের বর্ধিষ্ণু ও শক্তিশালী অধিবাসীগণকে সৈন্য সামন্তাদি রাখিয়া স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা ও জনসাধারণের শান্তিরক্ষার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, যাহারা এই স্বাধীন অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না।

যাহারা সম্রাট প্রদত্ত ক্ষমতা পাইয়া দেশে কতকটা শান্তি স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছিলেন, তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াও আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিতে পারেন নাই। সম্রাট ও প্রধান প্রধান সচিব বিশেষের স্বার্থের অন্তরায় হওয়াতে পাছে তাহাদিগকে তাহাদের কোপ নয়নে পড়িতে হয়, সেই ভয়ে সর্বদাই তাহাদিগকে শঙ্কিত থাকিতে হইত; তদ্রূপ আশঙ্কার লক্ষণ উপস্থিত হইলে সম্রাট দরবারে আপনাদের পক্ষ সমর্থনার্থ ভূম্যধিকারীগণ প্রত্যেকে সম্রাট দরবারে এক এক জন উকিল নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল উকিল রাখিয়াই তাহারা চিত্ত সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই; —সম্রাট ও সচিবগণকে তাহাদের অনুকূলে প্রসন্ন রাখিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অর্থ ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রদান করিতেন; একথা মিথ্যা নহে। বর্তমান জমিদার এবং

সেই সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজার পার্থক্য অনেক, ইহা নানা প্রকারেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং একই পর্যায়ে উভয়ের স্থান নির্দেশ করিতে যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত হয়। তবে আমরা জমিদারের পূর্বরূপ বলিয়া এই সকল রাজোপাধিযুক্ত সম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া লইতে পারি।

পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম দরবারে আমরা যে সকল জমিদারের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহারাও দরবারে আপন আপন পক্ষ সমর্থনার্থে উকিল নিযুক্ত রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাদের শক্তি ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা অনেক খর্ব হইয়া পড়িয়াছিল। রাষ্ট্র বিপ্লবাবসানে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনের ফলেই যে সেইরূপ ক্ষমতার খর্বতা ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খাঁ ও শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার দরবারে ঐরূপ বিষদন্তহীন জমিদারগণের প্রভাব প্রতিপত্তি নিতান্ত কম ছিল না, ইতিহাস পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। পূর্ব স্বাধীনতার বিলোপ ঘটিলেও. শেষ নবাবের সংক্ষিপ্ত শাসনকালে জমিদারগণের প্রভাব নবাব দরবারে যে সমধিত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের ইতিহাস তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ। সে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের সমালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ভূম্যধিকারীগণ ঐরূপ স্বাধীনতা পাইয়া যথাযথ সময়ে সম্রাট দরবারে কেবল নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিয়া সর্বপ্রকারে পূর্ণ আধিপত্য করিবার অধিকারী লইয়াছিলেন। অনেকে এই রাজোপাধিযুক্ত ভূম্যধিকারীগণকে "জমিদার" পর্যায়ে গণনা করিতে অভিলাষী হন। এরূপ অভিলাষ নিতান্ত প্রযুক্তিপূর্ণ, কারণ "জমিদার" সংজ্ঞা প্রদান করিলে ঐ সকল স্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজাদিগের পদ মর্যাদা জ্ঞাতসারে ক্ষুণ্ণ করা হয়, এ কথা বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় না, সেই কারণে আমরা এরূপ প্রস্তাবের পক্ষপাতি নহি। যখন বেশ পরিষ্কার জানিতে পারা গিয়াছে যে, রাজাগণ আবশ্যক মতে ইচ্ছানুসারে আইন প্রণয়ন, বিচার ব্যবস্থা ও সৈন্য সামন্তগণ নিয়োগ করিয়া স্ব স্ব অধিকারস্থ প্রজাপুঞ্জের সর্ত ও শান্তি রক্ষার ক্ষমতা ধারণ করিয়াছিলেন; তখন ইহাদিগকে জমিদার সংজ্ঞা প্রদান করিবার বিধিসঙ্গত কারণ আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। ঐ সকল রাজারা এখনকার অধিকাংশ জমিদারের ন্যায় কেবল কর সংগ্রাহক, আলস্য পরায়ণ, সঞ্চিত অর্থ বিনাশী ও বিলাসী ছিলেন না; নিশ্চিন্তে সুখ ভোগে কালহরণের অবসর তাহাদের ভাগ্যে ঘটিত না, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে।

অতঃপর বঙ্গদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের আরম্ভ। মুসলমান রাজত্বকালে কর সংগ্রাহক জমিদার না থাকিলেও (খ্রিস্টিয় ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে) সেই সময়ে যাহারা অর্ধ স্বাধীনতা পাইয়া প্রজা সাধারণের উপর প্রভুত্ব চালাইতে ক্ষমতাবান্ হইয়াছিলেন পরবর্তী কালে তাহাদের পতনাবস্থাকে উহার মূল সূত্র ধরিয়া লইলে ইতিহাসের অমর্যাদা করা হয় না। স্বাধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতিগণ কালক্রমে ক্ষমতাহীন হইয়া এখন করসংগ্রাহক জমিদার রূপে পরিণত হইয়াছেন, একথা বলিবার কারণের অভাব নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুসলমান রাজত্বকালে জমিদারের স্বাধীনতা অধিকতর ভাবে রক্ষিত হইয়াও রাজ্যের সহিত তাহাদের সামান্য মাত্রও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু

ইংরেজ রাজশক্তির সহিত ক্ষমতাহীন করসংগ্রাহক জমিদারের সম্বন্ধ এমনই ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন মতেই একে অন্যকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না;—ত্যাগ করিবার উপায়ও নাই। একরূপ বলিতে গেলে, বঙ্গ জমিদারের সহায়তায় বঙ্গে তথা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিকাশ, সুতরাং বর্তমান জমিদার এবং গবর্নমেণ্টের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতা বেশি হইবার পক্ষে কিছু আশ্চর্য হয় নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের সময় হইতেই এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভবও এই সময় হইতে সুতরাং জমিদারের স্বত্ব স্বামিত্ব এবং অবস্থার আলোচনা করিতে হইলে ব্রিটিশ রাজনীতির আরম্ভ কাল হইতে করা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এজন্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রাথমিক কার্যকলাপ, মতামত এবং মন্তব্যাদির অনুশীলন ধারাবাহিক রূপে করিবার আবশ্যক হইতেছে। উদ্দেশ্য—জমিদারের সৃষ্টির ইতিহাস সংগ্রহ করা, সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় তাবৎ কার্যকলাপের আলোচনা করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লওয়া যাইতেছে। এতদধিক আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

মুসলমান রাজত্বের অবসানের পর দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে দেশবাসীগণ নির্মম ভাবে নিগৃহীত হইতেছিল। চুরি ডাকাতি লুণ্ঠন ইত্যাদি উপসর্গ হইতে ধন মান প্রাণ রক্ষা এক রূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হইয়াছিল। এমন অত্যাচার অরাজকতা বঙ্গের ভাগ্যে নূতন না হইলেও পুরাতনের পুনরভিনয়ের আশঙ্কায় সে বিপদে নিস্তার লাভার্থ—দেশবাসীগণ মানুষের শেষ সম্বল অসময়ের এবং অসহায়ের সহায় বিপদভঞ্জন মধুসূদন নাম জপ করিতেছিল। দেশের অবস্থা কি ঘটিয়াছিল?—রাষ্ট্র বিপ্লবের পরে এবং রাজশক্তি পরিবর্তনের সময়ে সর্বত্র যাহা ঘটিয়া থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গে তাহাই ঘটিয়াছিল। এমন বিষম দুঃসময়ে দেশবাসীগণের আর্থিক অবস্থা এবং মানসিক ভাব কি প্রকার হয়, ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। যাহাই হউক, এই দুর্দিনে ইংরেজসেবিত শান্তির সুশীতল ছায়া ত্রস্থ ও ভীত চকিত দেশবাসীকে ক্রমে আশ্বস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল; এ কাহিনী সর্বজন বিদিত।"

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর কাল নানাবিধ অশান্তি ভোগের পর ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে দেশের আপামর সাধারণ কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল। সে সকল আলোচনার স্থল ইহা নহে, সুতরাং পূর্বেতিহাস ত্যাগ করিয়া ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে আমাদিগকে প্রয়োজনীয় তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে।

ইংরেজ বঙ্গরাজ্য অধিকার করিবার পর প্রথমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন, যাবতীয় রাজকার্য তাহাদের কর্তৃত্বেই পরিচালিত হইতেছিল। ইংলণ্ডস্থ (Board of Director) বোর্ড-অব-ডাইরেক্টরগণের আদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সমস্ত কার্য নির্বাহ করিতে হইত। রাজ্য স্থাপনের পর বোর্ড অব ডাইরেক্টারগণ বঙ্গদেশের সমুদয় কার্য পরিচালন করিবার জন্য গবর্নর দরবারে সুপ্রিম কাউন্সিল (Supreme Council) নামে একটি সভা গঠন করিয়া দেন। সুপ্রিম কাউন্সিল বোর্ড-অব-ডাইরেকটারগণের অনুমতি ক্রমে এ এদেশের সকল প্রকার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিবার অধিকারী ছিলেন।

বঙ্গরাজ্য ইংরেজ করতল গত হইবার পর দুই বৎসর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজ্যের

রাজত্বের দিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ পান নাই। তারপর একটা মোটামুটি হিসাব ধরিয়া রাজস্ব নির্ধারণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই সময়ে ভূমি রাজস্ব গ্রহণ করিবার কোন বিশেষ নিয়ম না থাকায় নিতান্ত অনিশ্চিত নিয়মে কর সংগ্রহ করা হইতেছিল। কার্যের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন রাজস্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না, ইহা প্রসিদ্ধ কথা; অধিকাংশ স্থলেই ব্যক্তিগত হিসাবে রাজস্ব গ্রহণ করা হইতেছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়তের সহায়তায়, প্রজাগণের জমির পরিমাণ অনুসারে প্রতি বৎসর জমা নির্ধারণ করিয়া লওয়া হইত। এক বৎসর কাল ধরিয়া ঐ জমা আদায় করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। থানাদারগণ অধীন জনপদের রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রিয় তহশীলদারের নিকট জমা দিতে বাধ্য ছিলেন, তহশীলদারগণ থানাদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব লইয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। রাজস্ব এই ভাবে সংগ্রহ হইত। পঞ্চায়তের সহায়তায় প্রতি বৎসর জমা নির্ধারণ করিবার বিধি দ্বারা একদিকে যেমন প্রজা সাধারণের উপর অযথা অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছিল, অপরদিকে তেমনি যথাযথ ভাবে রাজস্ব আদায়ের পক্ষেও ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে বৎসর বৎসর নূতন করিয়া কর ধার্য করিতে বহু ব্যয় এবং সময়ক্ষেপ হইতেছিল, সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক রাজস্ব বিভাগে বিশৃঙ্খলার জঞ্জাল পরিপূর্ণ হইয়াছিল একথা মিথ্যা নহে।

যখন এইরূপ বিশৃঙ্খলায় ও অব্যবস্থায় সকল বিষয়েই গবর্নমেণ্টকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল, সেই সময়ে সুপ্রিম কাউন্সিলে বঙ্গের বিষয়ের শৃঙ্খলা বিধানের ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিবার আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তদানীন্তন সুপ্রিম কাউন্সিলের মিনিট বুকে এ কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে—

The great question of land revenue first opened to us.

(Supreme Council)

"ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত গুরুতর প্রস্তাব সর্বাগ্রেই আমাদের আলোচ্য।"

সুপ্রিম কাউন্সিলে রাজস্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব এতদিন উপস্থিত হয় নাই, এবং তৎসংক্রান্ত কোন কার্যেও কাউন্সিল হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাউন্সিল সৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় গবর্নরের শাসন বিষয়েই কেবল সহায়তা করিতেছিল। বলিতে গেলে এ দেশের রাজস্ব বিষয়ে ইংরেজ গবর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ ইহাই প্রথম।

এইবার সুপ্রিম কাউন্সিল প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে দেশের রাজস্ব বিভাগের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য উপযুক্ত উপায় অবধারণে ব্রতী হইলেন। রাজস্ব বিষয়ক প্রস্তাব কাউন্সিলে, উপস্থিত হইলে সভ্যগণের মধ্যে প্রথম নানারূপ গোলযোগ আরম্ভ হয়, পরিশেষে তর্কবিতর্কের দ্বারা তখনকার মত একটা সাময়িক বন্দোবস্তের ব্যবস্থা অবধারণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত ভাবে রাজস্ব সংগ্রহ অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত ছিল না। যে সময়ে কাউন্সিলে রাজস্ব-বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয়, তৎকালে কথা উঠিল যে, ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব গ্রহণের প্রথা যদি রহিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি প্রণালীতে কর গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিলে রাজ্যের এবং রাজস্ব বিভাগের সুবিধা হইবে? বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর; অতএব কাউন্সিল হঠাৎ কোন মীমাংসায় উপনীত না হইয়া দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক রাজস্ব নীতির তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন

বলিয়া জানিতে পারা যায়। এরূপ করা অন্যায় হয় নাই, বরং সমীচীন হইয়াছিল, তাহাতে কাউন্সিল সে সময়ে কোন নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতে বহুপ্রকার অনির্দিষ্ট প্রণালীতে কর গ্রহণ করা হইত। যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে রাজস্ব বিভাগে "পোদ্দার, আওয়াবদার, কেল্লাদার, থানাদার" ইত্যাদি অনেক প্রকার নাম পাওয়া গিয়াছিল, আবার বঙ্গদেশেও সেই সময়ে জমিদার নামে অভিহিত একটি অভিজাত সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। এই সকল তথ্য অবগত হইয়া কাউন্সিল সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কারণ তাহারা যে আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরিণামে সে আশা পূর্ণ হয় নাই। কোন কোন মহাত্মা জমিদার অর্থে একটা বিকৃত ভাবপ্রকাশক মন্তব্য প্রকাশ করেন। অসমীচীন হইলেও তাহার নমুনা এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

The word Zaminder, generally rendered land holder, is a relative and indifinite term; and does no more necessary signify an owner of land than the word poddar signifies an owner of moneo under his charge, or an Aubdar, the owner of the province which he governs, or, in millitary language, the owner of the company of sepoys belongs to, or Kelladar, the proprietor of fort he defends, or, Thanadar, the owner of the police post he has charge of.

(The Zamindery settlement of Bengal. Appen, IV, Part I.P.P.27.)

অর্থাৎ ঃ—জমিদার শব্দ প্রয়োগ করিলে সাধারণতঃ ভূম্যধিকারী বুঝায়, ইহা অনিশ্চিত বোধক; জমির দখলিকার বুঝাইতে পারে কিন্তু যথার্থপক্ষে স্বত্ত্বাধিকারী মালিক, এরূপ নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ পাওয়া যায় না। জমিদার শব্দে জমির স্বত্ত্বাধিকারী, নির্বিরোধে এমন অর্থ বুঝায় না;—যথাঃ—পোদ্দারের জিম্বায় যে সকল টাকা থাকে, পোদ্দার সেই সকল টাকার মালিক কিম্বা অধিকারী ইহা যেমন বুঝায় না, সেইরূপ জমিদারকেও ভূমির মালিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না;—প্রদেশের শাসনকর্তাকে আওয়াবদার বলা হয়, বস্তুতঃ আওয়াবদার কিন্তু সে প্রদেশের মালিক অথবা অধিকারী নহে;—সামরিক ভাষায় সিপাহি দলের কর্তাকে সেনাদলের মালিক বলা যাইতে পারে না:—কেল্লাদার যে কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, সে কেল্লার স্বত্ত্বাধিকারী হইতে পারে না;—থানাদার কথাটাও তদ্রূপ;—পুলিশ থানার প্রহরীগণের পরিচালকেরাই থানাদার, থানা অথবা পুলিশ সৈন্যের মালিক সেই থানাদার, কদাচ ইহা বুঝায় না।

বহু পরিশ্রম, সময়, অর্থব্যয় এবং দীর্ঘ অনুসন্ধানের দ্বারা এতদ্দেশের অতীত রাজস্ব বিষয়ক তথ্য যাহা সংগৃহীত করা হইয়াছিল, তদ্বারা কাউন্সিলের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অনুশীলনের ফলে যাহা জানিতে পারা গিয়াছিল, তাহাতে রাজস্ব বিভাগ নানা ভাগে বিভক্ত থাকার বিষয় জানিতে পারা যায়। ইহার কোনটাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, এজন্য সে সময়ে রাজস্ব বিভাগের পরিবর্তন অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের রাজস্ব সে সময়ে ১২৯ লক্ষ টাকা (সিক্কা) ধার্য ছিল। রাজস্ব বিভাগেব বিশৃঙ্খলতার জন্য এই কর সংগ্রহ করিতে উহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইত; এই সময়ে রাজস্ব বিভাগে কেবল দেশীয় কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন।

রাজস্ব বিভাগের পরিবর্তন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় নির্ণয় করিতে না পারায়, সুপ্রিম কাউন্সিল সে সময়ে দেশের প্রজা সাধারণের আভ্যন্তরীণ সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার আশায়, রাজস্ব বিভাগে ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করিতে মনস্থ করেন এবং দেশীয় উচ্চপদাভিষিক্ত রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদিগের স্থলে গবর্নমেণ্টের আফিস হইতে ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করিয়া পাঠান; নবনিয়োজিত কর্মচারীগণ সুপারভাইজার নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মন্তব্যে প্রকাশ আছে ঃ—

Supervisors were appointed among the company officers instead of natives. (The Permanent settlement of Bengal.)

অর্থাৎ দেশীয় কর্মচারীদিগের পরিবর্তে কোম্পানির কর্মচারীগণের মধ্য হইতে সুপারভাইজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইব বঙ্গদেশের গবর্নর নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। তাহার শাসনকালেই উপরোক্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন সঙ্কল্পিত হয়, কিন্তু তিনি উহা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে পতদ্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন। তৎপর ওয়ারেণ হেস্টিংস সাহেব গবর্নর পদে মনোনীত হইয়া লর্ড ক্লাইবের পদাভিষিক্ত হন। ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব বঙ্গের গবর্নর পদ গ্রহণ করিয়া প্রথমেই লর্ড ক্লাইবের প্রস্তাবিত সুপারভাইজার পদে লোক মনোনীত করিয়া প্রেরণ করেন এবং বঙ্গদেশে জেলা বিভাগ করিয়া প্রত্যেক জেলায় পৃথক পৃথক সুপারভাইজার নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

এরূপ বন্দোবস্ত করায় রাজস্ব বিষয়ে সাময়িক একটা সুবিধা হইয়া থাকিলেও রাজস্ব বিভাগ অন্যপ্রকার দোষে দূষিত হইয়াছিল, এক অসুবিধা দূর করিতে যাইয়া অপর প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া রাজস্ব বিভাগকে কলুষিত করিয়াছিল; মন্তব্য পাঠে সেইরূপ জানিতে পারা যায় ঃ—

The revenue administration, which we found in force on first assuming the Government of Bengal, was vicious and corrupt in the extreme.
(The Permanent Settlement of Bengal P.P.5.).

বঙ্গদেশের শাসন ভার গ্রহণের প্রথম অবস্থায় রাজস্ব বিভাগের কার্য প্রণালী যেরূপ দেখা গিয়াছিল, তাহা অতীব দূষিত ও কলুষিত।

রাজস্ব বিভাগে ইউরোপীয় কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই; কারণ সে সময়ে কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকল কর্মচারীই অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলেন। যে যেদিক দিয়া পারিতেছিলেন, বিবেকশূন্য হইয়া ন্যায় অন্যায় বিবিধ প্রকারে নিজ নিজ পকেট পূর্ণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। দরিদ্র প্রজার সুখ দুঃখ বুঝিয়া চলিবার অবসর কাহারও ছিল না। একথা পরবর্তীকালে বিলাতে ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের বিচার প্রসঙ্গে জানিতে পারা গিয়াছে। এই ইউরোপীয় সুপারভাইজারগণ যে জমিদারদিগকে নানা প্রকারে নিগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালীয় দপ্তরে লিখিত আছে।

The revenue collector over reached the land holders.
(The Permanent Settlement of Bengal P.P.5)

রাজস্ব বিভাগের কলেক্টরেরা ভূস্বামীগণকে ভুলাইয়া প্রতারিত করিতেন।

ইহার উপর আমাদের টিকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে রাজস্ব বিভাগের পরিবর্তন ব্যপদেশে জেলা বিভাগ করা হয়; এবং পূর্ব প্রচলিত রাজস্ব সংগ্রহের

নিয়ম উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেক মৌজায় পঞ্চায়েতদিগের সাহায্যে কর নির্ধারণপূর্বক সমগ্র মৌজার রাজস্ব সেই গ্রামের অথবা তন্নিকটবর্তী স্থানের বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এক বৎসর মেয়াদে জিম্মা করিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে রাজস্ব বিভাগ হইতে থানাদার ও সরকার প্রভৃতি আদায়কারী পদসমূহের বিলোপ ঘটে।

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্গদেশের ভূমিকর প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে রাজকোষে জমা দিবার জন্য দেশের বিশিষ্ট লোকের সহিত প্রথম মেয়াদী বন্দোবস্ত করা হয়। যাহাদিগের সহিত এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, তাহারাই যে বঙ্গদেশের জমিদার সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক, একথা অস্বীকার করা যায় না। গবর্নমেন্টের রাজস্ব যাহাদিগের হস্তে মেয়াদী সর্তে দেওয়া হইয়াছিল, তাহারাই যে দেশের গণ্যমান্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাহাও মন্তব্যাদি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়।

The actual payment of the revenue to the collecting officers of Government was in the hands of a few responsible parties, known as Zamindars, or landholders, who looked to the cultivators for the means of meeting the Government demands. (The permanent settlement of Bengal)

জমিদার নামে অভিহিত, কতিপয় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে গবর্নমেন্টের নিয়োজিত কালেক্টারের হস্তে রাজস্ব সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহারা গবর্নমেন্টের রাজস্ব সরবরাহের জন্য কৃষক প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতেন।

যাহারা গবর্নমেন্টের রাজস্ব মেয়াদা বন্দোবস্তে গ্রহণ কারয়াাছলেন, পূবে তাহাাদগকে (Landlords) ভূস্বামী বলা হইয়াছে, এক্ষণে উপরোক্ত মন্তব্যে "ভূস্বামীর" পরিবর্তে তাহাদিগকে "জমিদার" বলিয়া উল্লেখ করা হইল। কাউন্সিল যাহাদিগকে ভূম্যধিকারী বা জমিদার নামে অভিহিত করিয়া ভূমিকর সংগ্রহের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারা যে, সে পদ ও তদুপযুক্ত ক্ষমতা পাইবার অনুপযুক্ত ছিলেন না, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। দেশ ও দশের নিকট জমিদারগণের মানমর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, প্রজাসাধারণ যে বহু প্রকারে তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিত, সে প্রমাণেরও অভাব দেখা যায় না। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখনও নবোদ্ভূত জমিদারের শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি কম ছিল না। অভাব অভিযোগে, আপদে বিপদে এবং দায়ে দৈন্যে দেশের জনসাধারণকে আভিজাত্যের শরণাপন্ন হইয়া চলা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কৃষক প্রজা এবং জমিদারের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাব তখনও বর্তমানের ন্যায় বা ততোধিক বিজড়িত ছিল। অতীতের ইতিহাসে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সুপ্রিম কাউন্সেল এই আভিজাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায় ভূমি রাজস্ব মেয়াদী বন্দোবস্তে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া যে বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই মন্তব্যানুযায়ী ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ায় প্রজা সাধারণের আর্থিক ও কৃষিকার্যের প্রভূত কল্যাণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখন মেয়াদী বন্দোবস্তের প্রথম প্রচার হয়, তখন কৃষককুল কর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং জমির স্বত্ব লোপের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ক্রমাগত অবিচার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাহারা নূতন কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন দেখিলেই আতঙ্কিত হইয়া পড়িত;

হতভাগ্যদের এ আশঙ্কা নিতান্ত অলীক ছিল না। যাহাই হউক, সুপ্রিম কাউন্সিল কৃষক প্রজাদিগের এই বিচলিত ভাব জানিতে পারিয়া, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগষ্ট তারিখে সর্বসাধারণের উপর একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাহাতে প্রচার করা হয় যেঃ—

The improvement of the lands, the content of the riot, the extention and relief of trade, the increase and encouragement of any useful manufacture of production of the soil, and the general benifit and happiness of the province in every consideration. * * *

(Proceeding of select Committee)
16. 8. 1769.

ভূমির উন্নতি, প্রজারা সন্তোষ বিধান, ব্যবসার বিস্তারে সহায়তা, ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদি হইতে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র প্রস্তুতকরণে উৎসাহ প্রদান এবং প্রত্যেক প্রকারে দেশের সুখ সুবিধার উন্নতি বিধানার্থ ইহা করা হইয়াছে।

প্রজাগণ যেরূপ শঙ্কিত হইয়াছিল, এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ায় তাহাদের সে অলীক আতঙ্ক বিদূরিত হইয়া গেল। বিভিন্ন করগ্রাহীর তত্ত্বাবধানে আসায় তাহাদের খাজানা ইত্যাদি আদায় সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

গবর্নমেন্টের রাজস্ব নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যস্থতায় গ্রহণ করিবার বিধি প্রবর্তন হওয়ায় অনেক সুবিধার আশা থাকিলেও কয়েকজন রাজপুরুষ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন; যাহারা প্রতিবাদী ছিলেন, বঙ্গের গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবও তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আপত্তিকারীদিগের কথা গ্রাহ্য হয় নাই, কারণ রাজস্ব বিষয়ে প্রতিবাদকারীগণের মন্তব্য প্রকাশ করিবার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না; কেবল সুপ্রিম কাউন্সিল এই বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া পরিশেষে বিরুদ্ধ পক্ষকেও সুপ্রিম কাউন্সিলের ব্যবস্থা সমর্থন করিতে হইয়াছিলেন।

যখন অপর পক্ষ আপত্তি উত্থাপন করেন, তখন রাজস্ব বিধানের উন্নতি বিধায়িনী ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণ রাজস্ব বিভাগে নববিধান প্রবর্তনের আবশ্যকতা, উপকারিতা ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া স্বীয় মত সমর্থনার্থ যে সুন্দর সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট তারিখে লিখিত হইয়া, ১৭ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত হয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উক্ত মন্তব্যের অংশ বিশেষ নিয়ে প্রকাশ করে গেল ঃ—

16th August, 1769

Our object is not increase of rents, or the accumulation of demands, but solely by fixing such as are legal explaining and abolishing such as are frudulent an unauthorised, not only to redress the ryots present grievences but to secure him from all further invasions of his property.

(Zamindery settlement of Bengal)Chap. I.P.I.

কর বা প্রাপ্য বৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে যাহা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, তাহাই নির্ধারণ করা এবং যাহা অত্যধিক ও অসঙ্গতভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহারও উচ্ছেদ সাধন করা মাত্র। রায়তদিগের বর্তমান অসুবিধা দূর করাই কেবল মাত্র উদ্দেশ্য নহে, তাহাদের সম্পত্তি ভবিষ্যতে কি প্রকারে অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা।

প্রথমে প্রজার অবস্থা এবং রাজস্ব গ্রহণের ব্যবস্থা যে কিরূপ দূষিত ও কলুষিত ছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। রাজস্ব বিভাগের বিশৃঙ্খলতা বিদূরিত করিয়া প্রজাদিগকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এবং কৃষির উন্নতি সাধন জন্য, সুপ্রিম কাউন্সিল গঠিত সিলেক্ট কমিটি, বহুবিধ অনুসন্ধান ও অনুশীলন দ্বারায় যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা যে অতীব ন্যায়সঙ্গত এবং প্রজাহিতকর হইয়াছিল, তাহা বিচক্ষণ নীতিজ্ঞ মাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সিলেক্ট কমিটি, উদার মতাবলম্বী দূরদর্শী রাজপুরুষগণ দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। তাহারা রাজস্ব বিধানের যে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাহার ফলেই বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদার সম্প্রদায়ের অধিকার আধিপত্য অধিকতররূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

সিলেক্ট কমিটির উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই, বরং তদ্দ্বারা রাজস্ব বিভাগের ও প্রজাসাধারণের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। সে সময়ে এরূপ ব্যবস্থা প্রচলন না করিলে দেশের অবস্থা যে কি ভীষণ হইত এবং রাজস্ব বিভাগে যে কি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিত, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

বহুবিধ আপত্তি ও নানারূপ তর্কবিতর্কের পর ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে রাজস্বের প্রথম মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বৎসরের পর দেখা গেল যে, নব প্রবর্তিত বিধানের ফলে নিয়মিত ভাবে কর আদায় হইল, কর গ্রহণে কোন অসুবিধা ঘটিল না। সিলেক্ট কমিটির প্রবর্তিত কার্যে রাজস্বের উন্নতি সাধিত হওয়ায় সুপ্রিম কাউন্সিল অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া কমিটির সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের জন্য পূর্ব বন্দোবস্ত গৃহীতাদিগের সহিত পুনরায় এক বৎসর মেয়াদে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহাই রাজস্বের দ্বিতীয় বন্দোবস্ত।

দীর্ঘকাল বহু প্রকার অশান্তি ভোগের পর ইংরেজের নব প্রতিষ্ঠিত উদারনীতির শাসনাধীনে আসায় বঙ্গদেশে আবার শান্তির শীতল বাতাস বহিল; দেশবাসীগণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িল। কিন্তু হায়! দৈব যাহার প্রতিকূল, অজ্ঞাত অভিসম্পাত যাহাদিগকে তুষানলের ন্যায় ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে শান্তি সুখের আশা আকাশকুসুমের ন্যায় নিষ্ফল। চিন্তাই সুখ;—ফল ভোগের আশা বিড়ম্বনামাত্র। তাহাই হইল—১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি ঘটিল, কৃষক ভূমি কর্ষণ করিতে পারিল না, শূন্য মাঠ ধূ ধূ করিতে লাগিল, দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল. প্রজার দুর্দশার একশেষ হইল। প্রজারা প্রথমে হাল গরু বেচিল, ঘরবাড়ী বাঁধা দিল, সঙ্গতিপন্ন লোকেরা তৈজস পত্র বেচিল, ধারকর্জ করিল. পরিশেষে যখন ধার মিলিল না, তখন কুলস্ত্রীদিগের অলঙ্কার পত্র বেচিয়া কিনিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। যখন সব ফুরাইল, তখন অনাহারে, অর্ধাহারে ঘাস পাতা খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পাইল; মহামারী সুযোগ ত্যাগ করিল না, বন্ধুর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্ন করিয়া দিয়া গেল। এইরূপে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রত্যাবস্মৃতি ইতিহাসে স্থান পাইল।

প্রজার নিকট কপর্দক কর আদায় করা গেল না, সুতরাং জমিদারের মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল। গবর্নমেন্টের নিকট হইতে তাহারা যে মেয়াদী কর বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যথাসময়ে দিতে না পারায় তাহাদের উপর ক্রমে জুলুম তাগাদা আরম্ভ হইল,

নিরুপায় হইয়া জমিদারগণ অত্যধিক সুদে মহাজনের নিকট হইতে ঋণ করিয়া প্রায় সমুদয় কর রাজকোষে প্রদান করিলেন। এমন দুরবস্থায় পড়িয়াও জমিদারগণ ১১৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাবদ দিয়াছিলেন।

বঙ্গের গবর্নর সাহেব মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন; জমিদারগণ দুর্ভিক্ষজনিত দুর্দশাপন্ন হইয়া যথাসময়ে নির্দিষ্ট কর দিতে না পারায় ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব এই সুযোগে স্বীয় মত সমর্থনার্থ জমিদারগণকে অকর্মণ্য ও চুক্তিভঙ্গকারী উল্লেখে মন্তব্য প্রকাশপূর্বক একটি রিপোর্ট বিলাতে কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণের নিকট প্রেরণ করেন।

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বঙ্গ রাজ্যের মালিকে হইলেও দেশের শাসন ও বিচার কার্য নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া রাজস্ব বিভাগ মুর্শিদাবাদের নায়েব দেওয়ানের জিম্বায় রাখিয়াছিলেন এবং তাহার নিকট হইতে বার্ষিক নির্দিষ্ট রাজস্ব গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন, সুতরাং বঙ্গদেশে নায়েব দেওয়ানের নামেই রাজস্ব আদায় হইতেছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায়, রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য মুর্শিদাবাদের নায়েব দেওয়ান গবর্নমেণ্টকে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত রাজস্ব যথাসময়ে প্রদান করিতে সক্ষম হন নাই। এই দৈব প্রতিকূলতার অপরাধ উপলক্ষ করিয়া এবং এ শুভ সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব বিলাতে কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণের নিকট নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা-খাঁর উপর অকর্মণ্যতার দোষারোপ করিয়া মন্তব্য প্রেরণ করেন। রাজ্যেশ্বর হইয়া রাজস্ব পরের হাতে রাখা নীতিবিরুদ্ধ এবং এরূপ ব্যবস্থায় গবর্নমেণ্টের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অধিক, একথা গবর্নর সাহেব বেশ অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, কিছু ক্ষতি না হইতেছিল তাহাও নহে। রাজনীতির হিসাবে এ মন্তব্য অসমীচীন হয় নাই।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চদশ বর্ষকাল রাজ্যহারা হইয়াও মুর্শিদাবাদের মস্নদে বসিয়া মুসলমান ভূপতি নিজ নামে বঙ্গদেশের কর গ্রহণ করিতেছিলেন। রাজস্ব গ্রহণের অধিকার থাকিলেও কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীন ক্ষমতা প্রকাশের অধিকারেও তিনি নিতান্ত বঞ্চিত ছিলেন, এমন দুর্ভাগ্য বোধ হয় আর কোন মুসলমান নরপতির অদৃষ্টে ঘটে নাই। সামান্য পনর বৎসরে কত নবাব বাঙ্গালার মস্নদে বসিলেন উঠিলেন, সে সংখ্যা নির্ণয় করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, তবে যাহারা ২।৪ মাসের জন্য সিংহাসনে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাহাদিগকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া চলিতে হইত। যে কোন কারণে এই সকল নবাবের বহাল বরখাস্তের ক্ষমতা কোম্পানির হস্তে ছিল এবং কোম্পানি এ ক্ষমতার যে বহু সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন।

বঙ্গের গবর্নর যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, বিলাতের কোর্ট-অব-ডাইরেকটরগণ ঐ রিপোর্ট অনুসারে বঙ্গের রাজস্ব আপনাদিগের সম্পূর্ণ অধীনে আনিবার উদ্দেশ্যে নায়েব দেওয়ান নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ানি হইতে অপসারিত করিবার আদেশ মঞ্জুর করেন। সেই আদেশ পত্র ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে তারিখে এতদ্দেশে পৌঁছিলে কালবিলম্ব না করিয়া ১১ মে তারিখে বঙ্গের গবর্নর সাহেব, কোর্ট-অব-ডাইরেকটরগণের আদেশ পত্র প্রচারপূর্বক নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ানি

হইতে বরখাস্ত করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রকাশ্য রূপে গ্রহণ করেন। যে আদেশ পত্র দ্বারা এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

The Court of Directors had been pleased to divest the Nawab Mahammad Reza Khan of his station Naib Dewan, and had determined to stand forth publicly themselves in the charactor of Dewan.

(The permanent settlement of Bengal)

"কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণ বঙ্গ বেহার উডিষ্যার নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ানি হইতে অপসারিত করিয়া প্রকাশভাবে নিজেরাই দেওয়ানি পদ গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হন।"

ইংরাজ জাতির বিশেষত্ব এই যে, সঙ্কল্প স্থির হইলে তাহা কার্যে পরিণত করিতে কাল বিলম্ব হয় না; এ কার্যেও তাহাই হইল। আদেশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই মহম্মদ রেজা খাঁর নবাবী শেষ হইল। ইংরেজের অনুগ্রহেই তিনি কয়েক দিনের জন্য বাঙ্গালার মস্‌নদে বসিতে পারিয়াছিলেন, আবার তাহাদের হুকুমেই সিংহাসন হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে নামিতে বাধ্য হইলেন, ইহাতে আপত্তি করিবার তাহার কিছুই ছিল না। এইখানে বঙ্গরঙ্গের আর এক অঙ্ক শেষ হইল।

মুসলমান রাজত্বের যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের পূর্ণবিকাশ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি পদ গ্রহণ করিলেন, রাজস্ব বিভাগ সম্পূর্ণরূপে সুপ্রিম কাউন্সিলের অধীন হইল। দেওয়ানি পদ গ্রহণান্তর কাউন্সিল রাজস্বের উন্নতি বিধান উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ মনোযোগী হইয়া রাজস্ব বিভাগের সুবিধার্থ পূর্ব নিযুক্ত সুপারভাইজার পদ উঠাইয়া দিয়া, কিছু বিচার ও শাসন ক্ষমতা সহ প্রত্যেক জেলায় কালেকটর নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে তারিখে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়, মিনিট বুক পাঠে ইহাই জানিতে পারা যায়।

Collectors was appointed instead of suppervisor for revenue.

(The permanent Settlement of Bengal)

রাজস্ব বিভাগের সুপারভাইজারের পরিবর্তে কালেকটর নিযুক্ত হইয়াছিল।

এইরূপ বিবিধ প্রকার পরিবর্তনে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ চলিয়া গেল। গত ৭০ খ্রিস্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও গবর্নমেণ্টের রাজস্ব বন্দোবস্তের কল্যাণে প্রজাদিগের বহু সুবিধা হওয়ায় তাহারা অনেকটা শান্তি লাভ করিয়াছিল। আর এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব বিভাগের শৃঙ্খলা বিধান হওয়ায় সুপ্রিম কাউন্সিল মেয়াদী বন্দোবস্তের সময় বৃদ্ধি করিয়া দিতে মনস্থ করেন; এ কথা কোর্ট-অব-ডাইরেকটরগণকেও লিখিয়া জানান হয়। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সুপ্রিম কাউন্সিল রাজস্ব বিভাগের উন্নতি ও প্রজার সুখ স্বচ্ছলতা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সে প্রণালী সমর্থন করিতে বোর্ড-অব-ডাইরেকটরগণ একটুও দ্বিধা বোধ করিলেন না এবং কাউন্সিলের রিপোর্ট অনুসারে পাঁচ বৎসর মেয়াদে রাজস্ব বন্দোবস্ত—করিয়া দিবার ক্ষমতা বোর্ড মঞ্জুর করিলেন। এই মঞ্জুরী পত্র ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমে বঙ্গদেশে পৌঁছে। সুপ্রিম কাউন্সিল অতঃপর ১০ এপ্রিল তারিখে বঙ্গদেশের ভূমি রাজস্ব পাঁচ বৎসরের মেয়াদে পূর্ব বন্দোবস্তগ্রহণকারী জমিদারদিগকে প্রদান করেন।

যে সময়ে এই বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়, তৎকালে বঙ্গের গবর্নর সাহেব এবং তাহার কতিপয় সহচর রাজপুরুষ ইহার বিরুদ্ধবাদী হন। স্বীয় মত সমর্থন করিতে গিয়া তাহারা যে সকল কারণ প্রদর্শন করেন, সে সকলের উল্লেখ নানা কারণে নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যক্ত হইল। মোটের উপর তাহারা এ বিধানের পক্ষপাতি ছিলেন না ইহা সত্য। কিন্তু সুখের বিষয়, গবর্নর সাহেবের ক্ষমতা রাজস্ব বিভাগের উপর ন্যস্ত না থাকায় তাহাদের কোন আপত্তি কার্যকরী হয় নাই,

এক্ষণে তাহার আপত্তি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় গবর্নর বাহাদুর জেদের বশবর্তী হইয়া ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের রাজস্বের হিসাব উল্লেখ করতঃ এবং মেয়াদী বন্দোবস্তগ্রহণকারী জমিদার ও দেশের প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে অলীক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া বিলাতের বোর্ডে প্রেরণ করেন। তাহার মন্তব্যের কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্ত করা যাইতেছে ঃ—

Under the settlement the majority of the Zamindars were impoverished, the condition of a large proportion of the ryots were bad.

The Zamindari settlement of Bengal Appen. XXII. P.P. 14

"সেটেলমেন্টের দরুণ অধিকাংশ জমিদার দরিদ্র হইয়াছে এবং প্রায় সকল প্রজার অবস্থাই খারাপ হইয়াছে।"

গবর্নর সাহেব রাজস্বের নূতন বন্দোবস্তকেই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। গত দুর্ভিক্ষের প্রকোপে যে দেশবাসীর দুর্দশা ঘটিয়াছে এবং তাহারা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও প্রকাশ করেন নাই। তাহার এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার কারণ বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রাজনীতি নিহিত ছিল কি না তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তবে তাহার এ সকল মন্তব্যে বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই, ইহা সকলেই জানেন।

বহু বাধাবিঘ্ন ও বাদপ্রতিবাদ অতিক্রম করিয়া রাজস্ব বিভাগের আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ আরম্ভ হইল। কোর্ট-অব-ডাইরেক্টরগণ স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস (Sir Philip Francis) সাহেবকে সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। (The Zamindari Settlement of Bengal. Appen. IV page 1) তিনি ১৯ অক্টোবর তারিখে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। তিনি একজন উদার মতাবলম্বী, স্বাধীনচেতা ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। এজন্য বঙ্গীয় রাজপুরুষদিগের সহিত তাহার সৌহার্দ ঘটে নাই। সে সময়ে বঙ্গদেশে যে সকল রাজপুরুষ ছিলেন, তাহারা অধিকাংশ স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন। সুতরাং এই নবাগত রাজপুরুষের সহিত অনেকের মতানৈক্য হইল, এমন কি গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের সহিতও তাহার মত মিল হইল না; অধিকন্তু উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধভাব কখনই তিরোহিত হয় নাই। ইহার ফলে রাজপুরুষদিগের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। ইহার বিষয় নানা প্রকারেই অবগত হইতে পারা যায়।

ক্রমে দুই বৎসর গত হইল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের প্রদত্ত পাঁচ বৎসরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে রাজস্ব বিষয়ের একটা নূতন ব্যবস্থা করিবার মতলবে, পুনঃ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে গবর্নর সাহেব "রাজস্ব তত্ত্ব সংগ্রহ" পূর্বক রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিয়া মিঃ এন্ডারসন (Mr. Anderson), মিঃ ক্রফেট (Mr. Crofets), মিঃ বগ্‌ল্‌ (Mr. Boggle) নামক তিন জন রাজপুরুষকে উক্ত কমিটির সদস্য

মনোনীত করেন এবং মফঃস্বলের তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন দেশীয় কর্মচারীকে নিয়োজিত করেন। স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেব এই কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হইলেও মতানৈক্য থাকায় তাহার উপর এই কমিটির কার্যের কোন কর্তৃত্বভার অর্পণ করা হয় নাই। এই কমিটি গঠিত হইবার পর ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল তারিখে কমিটির সদস্যগণ রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কার্যে প্রবৃত্ত হন। ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, কেবল রাজস্ব বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল।

For the sole express purpose of Collecting such accounts and information as have reference to the business of the office. (The permanent Settlement of Bengal)

কেবলমাত্র রাজস্ব বিভাগের কার্য সংক্রান্ত হিসাব ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্যই রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন।

যদিও স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসকে তফাতে রাখিয়া কমিটি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ফিলিপ সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, রাজস্ব বিষয়ের উন্নতি সাধনের উপায় তিনি সর্বদাই চিন্তা করিতেছিলেন এবং যখন যাহা উপযুক্ত মনে করিতেন, তাহাই মিনিট বুকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এ সময়ে তিনি মিনিট বুকে যে মন্তব্য লিখিয়া রাখেন, তাহাতে লেখা আছে ঃ—

"The rate of assessment per beegha should be fixed for ever upon the land, no matter, who might be the occupant."

(The permanent settlement of Bengal)

যে ব্যক্তিই জমির দখলীকার হউন না কেন, প্রতি বিঘা জমির উপর চিরস্থায়ী কর ধার্য করিতে হইবে।

স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেব বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ অর্থনীতিজ্ঞ রাজপুরুষ ছিলেন। তাহার মন্তব্য এবং রিপোর্ট কখনও নিষ্ফল হয় নাই, এ মন্তব্যও বৃথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। এতদ্দেশের রাজস্ব বিষয়ে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং উন্নতি হইয়াছে, তাহা ফ্রান্সিস সাহেবের মস্তিষ্ক-প্রসূত; তবে তাহার যাহা মন্তব্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত না হইলেও অংশ বিশেষের দ্বারায় এ দেশের এবং গবর্নমেণ্টের মহোপকার সাধিত হইয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। স্থায়ী কালের দ্বারা রাজস্বের উন্নতি ঘটিবে, প্রজার সুখ সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে, এ কল্পনা তাহারই নিজস্ব এবং এ মন্তব্য তিনিই প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। তাহার উদ্ভাবিত প্রণালীর অংশ বিশেষ বিধিবদ্ধ হইয়াই বঙ্গদেশের প্রজা সাধারণের যে উপকার হইয়াছে, জগতের কুত্রাপি সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। না জানি, ফ্রান্সিস সাহেবের সমগ্র প্রস্তাব গৃহীত হইলে এতদ্দেশের আরও কত উন্নতি কত সুবিধা দেখিতে পাওয়া যাইত।

এই সময়ে সুপ্রিম কাউন্সিল সাময়িক মেয়াদী বন্দোবস্ত দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হওয়ায় এই বন্দোবস্ত বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার জন্য কোর্ট-অব-ডাইরেকটরগণকে অনুরোধ করত ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নবেম্বর তারিখে একটি মন্তব্য প্রেরণ করেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ করা হয় যে, এরূপ বন্দেবস্ত দ্বারা সকল দিকেই বিশেষ সুবিধা ঘটিবে। এই মন্তব্য যাইবার পর অনুসন্ধান কমিটি রাজস্ব বিষয়ে কার্যারম্ভ করিলে গবর্নর সাহেব সদস্যগণকে

তাহার মতানুযায়ী রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নানা প্রকার উপদেশাদি দিতেন। কারণ তিনি জানিতেন, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেব এবিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন আর তাহার যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যাদি অকাট্য, সুতরাং যাহাতে কমিটীর সদস্যগণ সেই মতের দিকে না ঝুঁকিয়া পড়েন, তজ্জন্য সর্বদাই তাহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কমিটির সদস্যগণকে তিনি ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নবেম্বর তারিখে যে নোট প্রদান করেন, তাহাতে লেখা আছে—

"Many other points of enquiry will also be useful to secure to the ryots the permanent and indispute possession of their lands, and to guard them against arbitrary exactions." (The permanent Settlement of Bengal)

"অনুসন্ধান সংক্রান্ত অপরাপর বিষয়গুলি, রাইয়তদিগের চিরস্থায়ী এবং অবিসম্বাদিত জমির স্বত্ব লাভের পক্ষে ও যথেচ্ছা নির্ধারিত কর আদায় করতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিশেষ অনুকূল হইবে।"

পাঁচ বৎসর মেয়াদের কাল পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। কমিটি শীঘ্র শীঘ্র রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া দাখিল কবিরার জন্য তাড়াতাড়ি কাজ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজপুরুষদিগের মধ্যে দলাদলি থাকায় হঠাৎ কিছু করিয়া উঠা কঠিন হইল। সময় কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া রহিল না, ভাবিতে চিন্তেতে পাঁচ বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এদেশ হইতে কোন রিপোর্ট না পৌঁছায় বিলাতের বোর্ড কোন আদেশ দিতে পারিলেন না; এদিকে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা কি করা হইবে, তাহাও স্থির হইল না; সুতরাং সাময়িক কার্য সুবিধার্থে পুনরায় এক বৎসরের মেয়াদে জমিদারদিগের সহিত রাজস্ব বন্দোবস্ত দেওয়া হইল। গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব জমিদারদিগের পক্ষাবলম্বী ছিলেন না, তিনি এই সময়ে এক চাল চালিয়া লইলেন। জমিদারগণকে এক বৎসরের চুক্তিতে পাট্টা প্রদানকালে একটি নূতন সর্ত বসাইয়া দিলেন, তাহাতে প্রকাশ রহিল—

They shall be liable to be disposed and their Zamindarees, or portion of them, shall be sold to make up the dificiency.

(The permanent Settlement of Bengal)

বাকি রাজস্ব পূরণের জন্য তাহাদিগকে স্বত্ত্ব চ্যুত করা হইবে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক জমিদারি বিক্রীত হইবে।

এরূপ সর্তে পাট্টা গ্রহণে জমিদারগণ আপত্তি করায় কমিটি তাহা গবর্নরকে জ্ঞাপন করেন; এতদুত্তরে গবর্নর সাহেব বলিলেন, এরূপ সর্ত লিখিয়া না দিলে জমিদারগণ যথাসময়ে কর প্রদানে অবহেলা করিতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে পূর্বে তাহারা এরূপ করিয়াছেন। গবর্নমেন্ট বিনা জামিনে যাহাদিগের হস্তে রাজ্যের তাবৎ রাজস্ব জিম্বা দিতেছেন, তাহাদিগকে বন্ধনে রাখা কর্তব্য, অতএব এরূপ সর্ত থাকা একান্ত আবশ্যক, বিশেষতঃ বাকি রাজস্বের জন্যই এই সর্ত লিখিত হইয়াছে। সুতরাং জমিদারগণের ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। অতঃপর জমিদারগণ নানাদিক বিবেচনা করিয়া গবর্নমেন্টের এই সর্তে পাট্টা গ্রহণে বাধ্য হইলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদান না করিলে বাকি রাজস্বের জন্য জমিদারি বিক্রয় হইবার নিয়ম এই সময় হইতে আরম্ভ হয়; ইহার পূর্বে বাকি রাজস্বের জন্য সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় হইবার নিয়ম ছিল না। এই বিধি উত্তরকালে সূর্যাস্ত আইনে পরিণত হইয়াছে।

গবর্নর ওয়ারেণ হেস্টিংস সাহেব জমিদারের অধীনে প্রজাগণকে ও রাজস্বকে ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতি ছিলেন না, তাহা বহু প্রকারে জানিতে পারা যায়; কিন্তু তিনিও জমিদার এবং জমিদারি শব্দ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহার মন্তব্যের বহু স্থানেই ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে। ভবিষ্যৎকালে ভূমির সহিত জমিদারের স্বত্ব নির্ণয় সময়ে এতদ্বারা ভূম্যধিকারীগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

ইহার পর ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই তারিখে সুপ্রিম কাউন্সিল "Plan of settlement in revenue Constitution" রাজস্ব বিধান ব্যবস্থার যে মতলব করেন, তাহাতে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা হয় যে—

For the temporary purpose of introducing another more permanent mode by an easy and gradual change, by which effects too sudden an innovation might be evaded. (The permanent Settlement of Bengal P. 12)

চিরস্থায়ী নিয়মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সহজ ও ক্রম পরিবর্তনের দ্বারা সাময়িক প্রবর্তনের ফল এই হইবে যে, এতদ্বারা হঠাৎ এক অভিনব পরিবর্তন ঘটিবে।

কাউন্সিলের উদ্দেশ্য প্রথম হইতে যাহা ছিল, ক্রমে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্যই এই সকল মন্তব্যের অবতারণা হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবশ্যকতা নানা কারণে কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ বেহার প্রদেশে এই সময়ে যে (firming) ফারমিং প্রথার প্রচলন ছিল, তদ্বারা কৃষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায় তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়াছিল এবং কৃষি কার্যেরও অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা অপ্রকাশ নাই। বেহারের তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ টমাস ল সাহেব ইহা বুঝিতে পারিয়া অতৎ সম্বন্ধে সুপ্রিম কাউন্সিলে রিপোর্ট করেন।

Dated the 4th Oct. 1778

The mocrrury (permanent) System founds on a permanent basis the future security, prosperity and happiness of the natives, and ensures stability. A long and painful observation of the evils of the firming system, which have dwindled great families into the Commonalty dininished rich caltivation and exhusted the Country; and a subsiquent war, which has not only drained the resources of public credit, but the hards of individuals have induced me to reflect upon the subject.

(The permanent Settlement of Bengal)

তারিখ ৪ অক্টোবর, ১৭৭৮

মোকররী প্রণালী চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া প্রজাগণের ভাবী নিরাপদ, উন্নতি এবং সুখ স্বচ্ছন্দের কারণ হইয়াছে। ফারমিং প্রণালীর বহুকাল ব্যাপী যন্ত্রণাদায়ক ক্রিয়াকলাপে আমাকে এই বিষয়ে সবিশেষ চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছে, কারণ এই কদর্য প্রণালী বড় বড় পরিবারবর্গকে ধ্বংস করিয়া সাধারণে পরিণত করিয়াছে, এই প্রণালী লাভজনক বড় বড় কৃষিকার্য হ্রাস করিয়াছে এবং দেশকে নিঃস্ব করিয়াছে। তৎপর পরবর্তী যুদ্ধে যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটিয়াছে। যুদ্ধে যে কেবল গবর্নমেন্টের প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, প্রজা সাধারণেরও রাশি রাশি অর্থ ইহাতে নিঃশেষিত হইয়াছে।

ফারমিং প্রণালী দ্বারা দেশের জাতির ও ব্যক্তিগত সকল প্রকারেই ক্ষতি হইয়াছিল।

নির্দিষ্ট বঙ্গভূমির রাজস্ব প্রথমে এক বৎসর এবং পরে পাঁচ বৎসর মেয়াদের চুক্তি দেওয়ায় প্রজার আর্থিক এবং কৃষিকার্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল জানিতে পারিয়া বেহারের কালেক্টর সাহেব ঐ প্রদেশে এই ব্যবস্থা চালাইবার জন্য উৎসুক হন এবং তদুদ্দেশ্যেই মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহার এই মন্তব্য সুপ্রিম কাউন্সিলের ব্যবস্থার সহায়তা করিয়াছিল।

সুপ্রিম কাউন্সিলের উপর বিবিধ কার্যের ভার অর্পিত ছিল, কাজেই রাজস্ববিভাগের সমুদয় কার্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা অসুবিধাজনক হওয়ায় কাউন্সিল রাজস্ব বিভাগের কার্য পরিচালন করিবার জন্য একটি পৃথক বোর্ড গঠিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে রাজস্ব বিভাগের জন্য রেভিনিউ বোর্ড (Revenue Board) স্থাপন করিবার মতলব স্থির হইয়া ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে চারিজন মেম্বর সহ বোর্ড গঠিত হয় এবং মিঃ এণ্ডারসন, স্যর জন সোর, মিঃ চাটার্স ও মিঃ ক্রফ্‌টস এই চারিজন প্রথম রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর মনোনীত হন।

বোর্ড গঠিত হইলে মেম্বরগণ গবর্নমেন্টের রাজস্ববিভাগ সম্পূর্ণ আপনাদিগের আয়ত্তাধীনে আনিয়া, উক্ত বিভাগের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া রাজস্বের উন্নতিবিধানে মনোযোগ প্রদান করেন। তাহারা সর্বপ্রথম নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ তারিখে মন্তব্য লিখিত হইয়াছিল।

1. The ammount of the Settlement and the form of it.

2. The ammount of the assessment must depend on the capacity of the different district.

১। কি প্রকারে কত রাজস্ব স্থির করা হইবে।

২। বিভিন্ন জেলার অবস্থানুসারে কর ধার্য করা হইবে।

উল্লিখিত মন্তব্যদ্বয় বোর্ডের প্রথম মূল সূত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, অবশ্য এই দুই সূত্র যে অত্যন্ত সমীচীন হইয়াছিল এবং দেশ কাল পাত্রানুযায়ী ব্যবস্থা হইতে সকল দিকে সুবিধা ঘটিয়াছিল এ কথা বলাই বাহুল্য।

মন্তব্যানুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া রেভিনিউ বোর্ড রাজস্ব সংগ্রহ সম্বন্ধে বিবেচনা দ্বারা যখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তিল তিল করিয়া সমগ্র দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব এবং বহু ব্যয় সাধ্য, একটা নির্দিষ্ট মধ্যস্থলবর্তী সম্প্রদায় হইতে উহা গ্রহণ করিতে পারিলে সকল দিকেই মঙ্গলজনক হইতে পারে, এ কল্পনা তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলে বোর্ডের সভ্যগণ যে মন্তব্যে উপনীত হন, তাহাতে প্রকাশ করা হয়।

Which appears to the Commitee the most convinient and secure for the Government, and the best for the ryots and Country, is in general, to leave the lands with the Zaminders, making the settlement with them.

বোর্ডের মতে গবর্নমেন্টের পক্ষে এ সুযোগ উত্তম, পক্ষান্তরে জমিদারের সহিত জমির বন্দোবস্ত করিয়া দিলে দেশের এবং প্রজার উপকার হইবে।

এ সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী হইয়াছিল। পূর্ববর্তী সুপ্রিম কাউন্সিলের রাজস্ব বিষয়ক মন্তব্যের সহিত বোর্ডের বর্তমান মন্তব্যের সামঞ্জস্য সম্যক্ প্রকারে সংরক্ষিত। দেশ এবং কৃষকদের অবস্থানুসারে এরূপ করিবারই আবশ্যক হইয়াছিল, সাময়িক অবস্থার আলোচনা

করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তাবিতভাবে ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিলে রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ একরূপ অসম্ভব হইত এবং দেশের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িত, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

রেভিনিউ বোর্ডের এবম্প্রকার মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব নিতান্ত অসন্তুষ্ট হন, তিনি প্রথমাবধিই জমিদার নামের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, সুতরাং তিনি এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া জমিদারগণের উপর তীব্র কটাক্ষ করতঃ এক রিপোর্ট বিলাতের বোর্ড-অব-ডাইরেক্টরগণের নিকট প্রেরণ করেন, তাহাতে প্রকাশ করা হয়—

"Which ought to preclude the Zaminders, are their gross mismanagement, oppression, or incapacity.

জমিদারগণের বেবন্দোবস্ত, অত্যাচার এবং অক্ষমতার জন্য তাহাদের পথাবরোধ করা অতীব কর্তব্য।

বোর্ডের মন্তব্যের প্রতিবাদ করা সহজ সাধ্য ছিল না, কারণ তাহার সদস্যগণ স্বেচ্ছাচারী কি অনভিজ্ঞ ছিলেন না এবং কেবল কল্পনামূলে কি একদর্শী হইয়া তাহারা কিছু করেন নাই, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সম্যক সন্ধান লইয়া কর্তব্যবোধে তাহারা উপায় নির্দেশপূর্বক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; সুতরাং গবর্নর সাহেব সেদিকে দন্তস্ফুট করিতে না পারিয়া তাহার সকল ক্রোধ জমিদারের উপর প্রকাশ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা মনে করা অসঙ্গত হয় না। বোর্ড যখন জমিদারের উপর জমির কর্তৃত্ব প্রদান করিতে মনস্থ করেন, সে সময়ে জমিদারের শক্তি, ক্ষমতা বা অস্তিত্ব কতটুকু বর্তমান ছিল, তাহাই প্রথম বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। মেয়াদী ভাবে রাজস্ব সাময়িক বন্দোবস্ত করিয়া দিলেও গবর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে জমিদারের ক্ষমতা, ভূমি কি করের উপর সামান্য মাত্রও অর্পিত হয় নাই। জমিদারগণ যে মেয়াদী বন্দোবস্ত পাইয়াছিলেন তাহাই সুপ্রিম কাউন্সিল নিজেদের কার্যসিদ্ধির আশায় প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং গবর্নর সাহেবের জমিদারগণের বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার কারণ খুঁজিয়া নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহাই হউক, গবর্নর সাহেব জমিদারদিগের বিপক্ষে যত প্রকার রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহাতে জমিদারগণের প্রাথমিক কালে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

বিলাতে বোর্ড-অব-ডাইরেকটরগণ বঙ্গদেশের ভূমি, প্রজা ও কর ইত্যাদি সম্বন্ধে একরূপ অন্ধকারে ছিলেন। এখানকার রাজপুরুষগণ যে সকল রিপোর্ট প্রেরণ করিতেন, সম্পূর্ণভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে কেল কার্য করিতে হইত। এমতাবস্থায় ভাল মন্দ বিচার করিয়া লইয়া কাজ করা কত কঠিন হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। তারপর আবার বঙ্গদেশের রাজপুরুষদিগের মধ্যে দুইটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধ ভাব লইয়া কর্মক্ষেত্রে থাকায় রিপোর্ট ইত্যাদিও ঠিক বিপরীত ভাবে যাইতেছিল, সুতরাং বোর্ড-অব-ডাইরেকটরগণকে যে সময়ে সময়ে প্রহেলিকায় পড়িতে হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এইরূপ গোলযোগে পড়িয়াই ডাইরেকটরগণ পাঁচ বৎসর মেয়াদের রাজস্ব কাল শেষ হইয়া গেলেও যথাসময়ে পরবর্তী সময়ের জন্য কোন বিশেষ আদেশ দিতে পারেন নাই এবং পুনঃপুনঃ এদেশের রাজপুরুষগণকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক চলিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে খাস গবর্নমেণ্টের দল, সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রত্যেক কার্যের প্রতিবাদী হইয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথামোক্ত দল প্রতিবাদ ব্যতীত কোন বিষয়ের নূতন কিছু করেন নাই।

বিলাতে উভয় পক্ষের মন্তব্যাদি প্রেরিত হইত, সুতরাং হোম গবর্নমেন্টকে উভয় পক্ষের মতামত অনুশীলন দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে হইয়াছিল। এই সকল গোলযোগের সময় মিঃ ডন্‌ডাস্ সাহেব পার্লিয়ামেন্টে বঙ্গের রাজস্ব সম্বন্ধে একটি বিল পেশ করেন, কিন্তু বঙ্গদেশের রাজপুরুষদিগের মতদ্বৈধতার জন্য উহার আলোচনা স্থগিত থাকে। তারপর যখন বঙ্গের রেভিনিউ বোর্ড হইতে রিপোর্ট বোর্ডে পৌঁছে, তখন পার্লিয়ামেন্টের অন্যতম সদস্য মিঃ সি, জে, ফক্স সাহেব বঙ্গের সমুদয় রিপোর্ট অনুশীলন করিয়া ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব সম্বন্ধীয় একটি বিলের পাণ্ডুলিপি হাউস-অব-কমন্সে (House of Commons) পেশ করেন। এই বিল বঙ্গের বোর্ড-অব-রেভিনিউ প্রস্তাবিত রাজস্ব বিধানের রূপান্তর মাত্র, সুতরাং বিলাতে রেভিনিউ বোর্ডের মন্তব্য ও রিপোর্ট সকল যে সমাদৃত এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ফক্স সাহেবের বিলে যে সকল প্রস্তাব ছিল, তন্মধ্যে নিম্নে একটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

The project of declaring the Zaminders and the managers of the land revenue hereditery proprietors of the land, and the tax fixed and invariable was adopted. *(The permanent Settlement of Bengal)*

"জমিদার এবং ভূমিরাজস্বের ম্যানেজারদিগকে বংশানুক্রমে ভূমির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিবার জন্য নির্দিষ্ট রাজস্ব ধার্য করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।"

মিঃ ফক্স প্রথমাবধি এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার মন্তব্যাদি হইতে ইহাই জানিতে পারা যায়।

সুপ্রিম কাউন্সিল এবং রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের রিপোর্ট পাঠে তন্মতাবলম্বী হইয়া মিঃ ডণ্ডস্ সাহেব পার্লিয়ামেন্টে যে বিল পেশ করিয়াছিলেন, তাহা নানা কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মহাসভার অন্যতম সদস্য মিঃ ফক্সের এই বিল পেশ হওয়ার পূর্বে উপস্থাপিত ডণ্ডস সাহেবের পরিত্যক্ত বিল বিশেষ পুষ্টিলাভ করে; সুতরাং উভয় বিলের উদ্দেশ্য এক হওয়ায় বঙ্গে রেভিনিউ বোর্ডের প্রস্তাবের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার ফলাফল পরে প্রকাশিত হইবে।

বাদ প্রতিবাদ সকল কাজেই হয়, উল্লিখিত বিল দুইটি উপস্থিত হইলে নামমাত্র কয়েকজন সদস্য উহার প্রতিবাদ করিয়া প্রাগুক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। যে দিন এই তর্ক মহাসভায় উপস্থিত হয়, সেই দিন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিশারদ বিখ্যাত বক্তা মিঃ ডবলিউ পিট্স সাহেব ফক্স সাহেবের মতানুকূল্যে আর একটি বিল উপস্থিত করেন। ইহা "ইণ্ডিয়া পিট্স বিল্" নামে খ্যাত। মিঃ পিট্স স্বীয় বিল সমর্থনার্থ ১৭৮৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

Another object of investigation and an object of considerable delegacy, was the pretension and titles of the landholders to the lands at present in their possessions in adjustment of this particular, much caution must be adopt, and means found that word answer the ends of substantial justice, without going in the length of rigid right, because he was convinced, and every man at all conversant with Indian affairs must be convinced, that indiscriminate restitution would be as bad as indiscriminate confiscation.

"বর্তমান সময়ে জমিদারের অধীনে ও দখলে যে ভূমি আছে, তাহাতে তাহাদের কি স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহার অনুসন্ধান করাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা মীমাংসা করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এবং অধিক দূর না যাইয়াও এই মূল সূত্র হইতে উহার প্রকৃত স্বত্ব জানিতে পারা যাইবে। কারণ জমিদার এবং ভারত অভিজ্ঞ মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, বিনা বিচারে কোন অধিকার প্রদান করা বা কোন ন্যায্য অধিকার বাজেয়াপ্ত করা দুইই তুল্যরূপ দূষণীয়।"

জমিদারগণ বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রথমাবস্থা হইতে ক্রমে তিন চারিবার চুক্তি গ্রহণপূর্বক ভূমির উপর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত না করাই নীতিজ্ঞ পিট্‌স সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। প্রতিবাদকারী সদস্যগণ পিট্‌স্ সাহেবের এই উক্তির খণ্ডন করিতে পারেন নাই, সুতরাং হাউস-অব-কমন্‌সে বিল গৃহীত হয়।

অতঃপর ১৩ আগস্ট তারিখে পুনরায় পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশন কালে মিঃ পিট্‌স সাহেব তাহার প্রস্তাবিত বিল নিম্নলিখিতভাবে পাশ করাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

The Zaminders who had been displaced were to be restored, and their situation, as much as possible, rendered permanent, though nothing was said about their hereditary rights, or a tax incapable augmcntion.

(The permanent Settlement of Bengal.)

"যে সমস্ত জমিদার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহা তাহারা ফিরিয়া পাইবেন; তাহাদের বংশানুক্রমিক অধিকার অথবা কর বৃদ্ধির সম্বন্ধে কিছু বলা না হইলেও যতদূর সম্ভব তাহাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী করা হইল।"

এই বিল পাশ হওয়ায় জমির উপর জমিদারের স্বত্ব বিশেষ ভাবে নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল। রাজস্ব সম্বন্ধে কোন কথার এখনও মীমাংসা হইল না, কারণ বঙ্গের রাজস্ব সম্বন্ধে দুই প্রকার রিপোর্ট হোম গবর্নমেন্টের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। স্যর জন সোর ও স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসপ্রমুখ রাজপুরুষগণ জমি জমার স্থায়ী বন্দোবস্তের অনুকূলে এবং তদানীন্তন গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসপ্রমুখ রাজপুরুষগণ ঠিক উহার প্রতিকূলে রিপোর্ট প্রদান করিয়া বোর্ডের ডাইরেক্টারগণকে বিষম গোলযোগে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইতে বোর্ডের বিশেষ অসুবিধা ঘটে, কারণ স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেবগণের মন্তব্য জমিদার এবং প্রজার সাপক্ষে থাকিলেও গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের মন্তব্যে লেখা ছিল—

"The majority of the Zaminders are indebt, and that money-lenders are the only class who have benifitted by the permanent Settlement."

(The permanent Settlement of Bengal chap I.P.P. 5.)

"প্রায় সকল জমিদারই ঋণগ্রস্ত এবং কেবল মাত্র (উত্তমর্ণ) মহাজন সকল এই স্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা লাভবান্ হইয়াছেন।"

গবর্নর সাহেবের মতে স্থায়ী করের বন্দোবস্তের দ্বারাই জমিদারের অবস্থা হীন হইয়াছে, একথা নিতান্ত মিথ্যাও নহে; কারণ তাহারা যদি ভূমিকর মেয়াদী বন্দোবস্তে গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে যখন দেশ ছারখারে গিয়াছিল, তখন দায়ে পড়িয়া তাগাদার চোটে অবমানের ভয়ে (কারণ পূর্বভাব তখনও

দুর হয় নাই) জমিদারগণকে অপরিমিত সুদ স্বীকার করিয়া গবর্নমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদান করিতে হইত না এবং তাহাদের অবস্থাও হীন হইত না। যদি সেই দুঃসময়ে ঋণ করিয়া গবর্নমেণ্টের রাজস্ব সরবরাহ করা জমিদারদিগের অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সে অপরাধ খণ্ডন করিবার কোন উপায় নাই। যাহাই হউক, উল্লিখিত সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া গবর্নর সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, জমিদারগণের তাহা বিস্মৃত হইবার কোন কারণ নাই।

জমিদারগণ কেন ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, স্থায়ী বন্দোবস্তের অসুবিধা কি? এ সকল কথা পরিষ্কার লেখা থাকিলে, বোর্ডকে অযথা গণ্ডগোলে পড়িতে হইত না আর বোধ হয়, গবর্নর সাহেবের মন্তব্যও প্রত্যাখ্যাত হইত না, কিন্তু তিনি কখন সেরূপ কোন কারণ কোন মন্তব্যে প্রকাশ করেন নাই—বোধ হয়, তিনি তাহার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করেন নাই। ফলে বোর্ডের ডাইরেক্টরগণ গবর্নর বাহাদুরের মন্তব্য গ্রাহ্য না করিয়া, সুপ্রিম কাউন্সিল —এবং রেভিনিউ বোর্ডের মতেব উপর নির্ভর করিয়া ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রল তারিখে দুইখানি আদেশ পত্র প্রেরণ করেন। উহার একখানি খাস বোর্ডের, অপর খানি সিলেক্ট কমিটি হইতে লিখিত হয়।

"To the Government of Bengal.

It is entirely our wish that the natives (Ryots or Subjects) may be encouraged to persue the occupation of trade and agriculture by the secure enjoyment of the profits of their industry; and that the Zaminders and ryots may not be harassed by increasing debts, either public or private, occasioned by the increased demands of Government."

Report Select Committee P.P. 158.

"বঙ্গীয় গবর্নমেণ্ট সমীপে—

আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, দেশবাসীগণকে (রায়ত ও প্রজাগণকে) তাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থদ্বারা ব্যবসা ও কৃষিকার্যে উৎসাহিত করা হউক। আর জমিদার এবং প্রজাগণ যেন কোন কারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া উৎপীড়িত না হয়।"

অপর মন্তব্যখানির অংশ ঃ—

From the Board of Directors

To the Government of Bengal,

We have entered into an examination of our extensive record on the subject of the revenues of Bengal, from a wish to adopt some permanent system compatible situation of the Company, and the ease of the inhabitants. *(Report, Select Committee.)*

"কোম্পানির যোগ্য অবস্থায় দেশবাসীর সুবিধার জন্য চিরস্থায়ী পদ্ধতি প্রচলন করিবার ইচ্ছায় আমরা বঙ্গদেশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিস্তৃত দপ্তর তদন্ত করিয়াছি ইত্যাদি।"

পরিশেষে প্রকাশ ছিল ঃ—

To Settle and establish upon principles of moderation and Justice, according to the laws and consitution of India, the permanent rules by which their tributes, rents, and services shall be in future rendered and paid to the said united company by the said Rajas. Zaminders, Polygers, Talookdars, and other native landholders.

"ভারতের নিয়ম এবং অবস্থানুসারে পরিমিত হারে খাজনা খরচা ও কর চিরস্থায়ী নির্দেশ দ্বারা রাজা, জমিদার, তালুকদার ও বন্দোবস্তগ্রহণকারীগণ এবং ভবিষ্যতে যাহারা ভূম্যধিকারী হইবেন, তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করিলে তাহারা সম্মিলিত কোম্পানিতে কর ও খাজনা প্রদান করিবেন।"

প্রত্যেকের স্বার্থ এবং সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়েই যে, এই সকল মন্তব্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা এই সকল পত্রাবলীতে বিশেষরূপে প্রকাশিত আছে। বহু দূর দেশে অবস্থান করিয়া একটা অজ্ঞাত জাতি এবং দেশের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা যে, কত কঠিন সমস্যা, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন ব্যাপার। বহু মতভেদের মধ্যে পড়িয়া পক্ষপাতিত্ব ও সত্য মিথ্যার প্রহেলিকাচ্ছন্ন হইয়াও যে, বোর্ডের ডাইরেক্টরগণ একটা প্রকৃষ্ট পথ নির্দেশ করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, হোম গবর্নমেন্টের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। এরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে না পারিলে গবর্নমেন্ট ও দেশবাসী উভয়কে দীর্ঘকাল বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর সকল দিক বিশেষ ; ভাবে বিবেচনা করিয়া বোর্ড পুনরায় ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের শেষে আর একটি মন্তব্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন, তাহাতে প্রকাশ থাকে ঃ—

That the Settlement of the land revenue should in all practicable cases, be made with the zaminders, and that the settlement after approval of them, should be permanent only so far that it should not be alterable by the Government of India, in any case, nor even by the Court of Directors, except in some urgent and peculiar case.

(The Zamindaree Settlement of Bengal. Append. IV. P.P.I.)

"সকল স্থলেই জমিদারের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং ঐ বন্দোবস্তটি অনুমোদিত হইবার পর উহাকে চিরস্থায়ী করিয়া দেওয়া হইবে। ভারত গবর্নমেন্ট দ্বারা উহা কোনমতেই পরিবর্তিত হইবে না, এমন কি, বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত কোর্ট-অব-ডাইরেকটারগণও উহার পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।"

সে সময়ে ইংলণ্ডে প্রজাসাধারণের সুখ সুবিধা করিয়া দিয়া রাজস্ব বন্দোবস্ত করিবার পক্ষপাতী লোকের অভাব ছিল না। বোর্ড-অব-ডাইরেক্টরগণ যখন উল্লিখিত পত্র প্রেরণ করেন, তখন পার্লিয়ামেন্টের জনৈক উদারমতাবলম্বী সভ্য নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশ করেন ঃ—

Consideration of our interest with the happiness of the natives, and security of the landholders, more rationally than any imperfect collection of an exaggarated jumma (assessment) to be enforced with security and vexation. *(The Permanent Settlement of Bengal.)*

"অনুচিত কঠোরতাপূর্বক বিরক্তিজনক অসম্পূর্ণ জমা ধার্য করিয়া আদায় করা অপেক্ষা দেশবাসীর সুখ সুবিধার সহিত ভূম্যধিকারীগণকে রক্ষা করিয়া আমাদের স্বার্থের আলোচনা বিশেষ বিবেচনাপূর্বক করা উচিত।"

বিজেতা জাতির উপর বিজিত জাতির এবম্বিধ উদারতা প্রদর্শন ইংরেজ জাতির পক্ষেই শোভনীয়; বলিতে কি, এই গুণেই ইংরেজ পৃথিবীর উপর আপন অস্তিত্ব এবং আধিপত্য সমধিকরূপে বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। আজ

ভারতবাসী যে বিভিন্ন জাতির সমষ্টি হইয়াও নিরুপদ্রবে পরস্পরে বন্ধুভাবে বসবাস করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার মূলেও এই উদারতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিলাতে যখন ভারতের রাজস্ব বিষয়ক নানা প্রকার বাক্ বিতণ্ডা চলিতেছিল, সেই সময়ে বোর্ডের ডাইরেকটরগণ লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুরকে ভারতের গবর্নর জেনারেল মনোনীত করিয়া রাজস্ব সম্বন্ধে বহুবিধ কর্তব্যের উপদেশ দিয়া ভারতে প্রেরণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর স্বাধীনচেতা ও উদারনীতিক ব্যক্তি ছিলেন। বিলাতে ভারত সম্বন্ধে যে সকল বাদানুবাদ চলিতেছিল এবং মেম্বর ও ডাইরেকটারগণের অন্তরে এতদ্দেশ সম্বন্ধে যে মনোভাব জাগিয়েছিল, তাহাও তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর "সোয়ালো" নামক জাহাজে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। যে জাহাজে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর যাত্রা করেন, সেই জাহাজে স্যর জন সোর সাহেবও ভারতে আসিতেছিলেন। জাহাজে দীর্ঘকাল একত্র বাসের সময়ে উভয়ের মধ্যে বেশ প্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল, পরবর্তী সময়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল। স্যর জন সোর বাহাদুর ইতিপূর্বে বঙ্গদেশে কাউন্সিলের সদস্যরূপে কিছুদিন বাস করিয়া কার্যোপলক্ষে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন, ইহা তাহার দ্বিতীয়বার ভারতাগমন। ভারত তথা বঙ্গদেশের একজন পুরাতন বিশেষজ্ঞ রাজপুরুষকে সহযাত্রী পাইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুরের পক্ষে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ ঘটিয়াছিল। পূর্বেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, স্যর জন সোর বাহাদুর বঙ্গীয় কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর ফ্রান্সিস সাহেবের সহিত এক মতাবলম্বী ছিলেন, কারণ উভয়ের রাজনীতি অভিমত একই প্রকার ছিল। অস্মদেশের চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রবর্তক বলিলে ঐতিহাসিকগণের নিকট এই দুই জন উদারহৃদয় রাজপুরুষের নাম সর্বাগ্রে গৃহীত হইবে। যাহাই হউক, লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর স্যর জন সোর সাহেবের নিকট ভারতের রাজনৈতিক সম্বন্ধে যে সকল কর্তব্যাকর্তব্য অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আমরা তাহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমধিক পক্ষপাতী রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। জাহাজে আগমন কালে স্যর জন সোর সাহেব লর্ড বাহাদুরকে বঙ্গদেশের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবশ্যকতা এবং উপযোগিতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এ কথা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রসিদ্ধি হইয়া আছে।

নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের নিকট হইতে দেশের কার্যভার গ্রহণ করিলে, বঙ্গের বাদসাহী পরিত্যাগ করিয়া হেস্টিংস সাহেব ক্ষুণ্ণ মনে বিলাত যাত্রা করেন। বাঙ্গলার বুকের উপর হইতে পাষাণ নামিয়া গেল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর কার্যভার গ্রহণ করায় রাজনীতি বিভাগে একটা অভাবনীয় পরিবর্তন সংঘটন হইল। হেস্টিংস সাহেবের সময়ে রাজপুরুষদিগের মধ্যে যে একটা দলাদলি চলিতেছিল, এইখানে তাহার পরিসমাপ্তি হইল। হেস্টিংস সাহেব বাঙ্গলার গবর্নর ছিলেন; লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর গবর্নর জেনারেল হইলেন। লর্ড বাহাদুর কার্যভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই রাজস্ব বিভাগের আমূল পরিবর্তন সাধনে মনোযোগ প্রদান করেন। স্যর জন সোর, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসপ্রমুখ রাজপুরুষগণ তাহার এই কার্যে সর্বান্তঃকরণে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ ইহারা সকলেই এক মতাবলম্বী ছিলেন।

পূর্বে সাময়িকভাবে রাজস্বের যে সকল বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা এবং পূর্ব প্রবর্তিত পাঁচ বৎসর মেয়াদে রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রদানের ফলে দেশের কি উপকার বা অপকার হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য গবর্নর জেনারেল বাহাদুর বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। এতদুত্তরে বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণ মেয়াদী বন্দোবস্তের দ্বারা যে, দেশবাসীর অনেক সুবিধা হইয়াছে এবং গবর্নমেণ্ট রাজস্ব সংগ্রহের পথ সহজ হইয়াছে তাহাই জ্ঞাপন করেন।

ঠিক এই সময়ে মেয়াদী বন্দোবস্ত গৃহিতাদিগের একটি বিশেষ অসুবিধার প্রতি গবর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

জমিদার গবর্নমেণ্ট রাজকোষে রাজস্ব প্রদান করিতেন, তালুকদারগণও জমিদারের মারফৎ দিয়া রাজস্ব প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন। রাজার নিকট কর আদায় হউক না হউক, জমিদারগণকে নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত রাজস্ব রাজকোষে জমা দিতেই হইত। যথাসময়ে নির্ধারিত রাজস্ব সরবরাহ করিতে না পারিলে জমিদারি বাজেয়াপ্ত অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে তাহা নিলাম বিক্রয় হইবার নিয়ম চলিত ছিল। কিন্তু প্রজার নিকট যথাসময়ে খাজনা আদায় না হইলে তাহার প্রতিকারের বিশেষ কোন নিয়ম প্রচলিত না থাকায় জমিদার ও তালুকদারগণের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। এমন কি, এই অব্যবস্থার দরুণ ভূম্যধিকারীগণকে ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বিভিন্ন জেলার কালেক্টারগণের রিপোর্টে ইহা জ্ঞাত হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাহাদুর জমিদারদিগের রক্ষার জন্য, বাকি রাজস্ব আদায়ের পূর্বে প্রচলিত নিয়ম রদ করিয়া বৎসরে একবার মাত্র নিলাম বিক্রয়ের বিধান বিধিবদ্ধ করেন। উহা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ আইন নামে প্রসিদ্ধ।

That the sales of land for arrears of revenue, should not take place until the end of the year. (Act VII of 1789)

"বাকি পড়া রাজস্বের জন্য ভূমি, বৎসরের শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীলাম বিক্রয় হইবে না।"

বাকি পড়া রাজস্ব আদায়ের বিধান এই প্রকারে পরিবর্তন হওয়ায়, বন্দোবস্তগৃহিতা-গণের অনেক সুবিধা হয়। জমিদারগণ অযথা ঋণদায় হইতে কতক রক্ষা পান এবং ইহাতে তাহাদের অবস্থারও কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল।

অতঃপর গবর্নর জেনারেল বাহাদুর সাধারণ প্রজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। জমিদারগণের প্রতি তাহার যে দৃষ্টি ছিল, প্রজা সাধারণের প্রতিও তদ্রূপ ছিল। প্রজাগণ যাহাতে অত্যাচারিত কি উৎপীড়িত না হয় এবং জমিদারগণ যাহাতে সহজে খাজনা আদায় করিতে পারেন, তদ্রূপ একটি বিধান প্রচার করেন এবং সেই বিধান দ্বারা জমিদার খাজনা আদায়ে সুবিধা পাইবে কি না তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক জেলার কালেক্টারগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান ঃ—

Are the existing regulation calculated to unable zamindars to obtain payments from the ryots without affording them ready means of oppression.

"বর্তমান আইনগুলি কি তাহাদের প্রতি প্রযুজ্য হইতে পারে যাহাতে তাহারা প্রজার নিকট হইতে বিনা অত্যাচারে খাজনা আদায় করিতে পারেন?"

এতদুত্তরে বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণ যে মত প্রকাশ করেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার দুই একটি নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

Mr. Ricketts. Collector, Tirhoot.

The regulations are well adopted for the purposes intended.

Mr. Elphinstone. Collector, Saran.

The regulations are perfectly well calculated for the purposes intended.

Mr. Cowell. Collector, Birbhoom.

The existing regulations are most favourable for realising the rents from the under farmers and ryots, and in general are acknowledged to be so by the zaminders and other description of landholders.

Mr. Wright, Collector, Rangpur.

The regulations which have been issued for the benifit of the landholders have answered the purposes intended.

Mr. Seaton. Collector, Krishnagar.

The power vested by the regulations in the Zaminders, and other proprietors, holding land immediately of government, are fully adequate to enable them to collect their rents from their under-farmers and ryots.

এতদধিক নিষ্প্রয়োজন। উল্লিখিত মতামত কয়েকটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঐ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ায় সকল দিকেই সুবিধা হইয়াছিল।

ক্রমে রিপোর্ট সকল উদ্ধৃত করিয়া জমিদারের স্বত্বাধিকার প্রমাণ করিয়াছি। ভূম্যধিকারী কখন বা জমিদার, আবার স্থল বিশেষে তাহাদের অধীন বন্দোবস্তগ্রাহী ব্যক্তিকে তালুকদার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গবর্নর জেনারেল বাহাদুর এই তালুকদারদিগের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। রাজস্বের প্রাথমিক সময় হইতে তালুকদারগণ জমিদারের মধ্যস্থতায় গবর্নমেণ্টে রাজস্ব সরবরাহ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তালুকদারগণ জমিদারের অধীন থাকিলেও দখলীয় জোতে তাহাদের স্বাধীন ক্ষমতা জমিদারের ন্যায় ছিল। বরাবর গবর্নমেণ্টে রাজস্ব প্রদান করিবার ব্যবস্থা না থাকাতেই তাহারা জমিদারের অধীন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বর্তমান পত্তনিদারগণ ভূমিতে যে স্বত্বে স্বত্ববান, তালুকদারগণও সেইরূপ ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তালুকদার দিগের প্রাথমিক অবস্থার রূপান্তর বর্ধমানরাজ প্রবর্তিত পত্তনী বন্দোবস্ত। এজন্যই বোধ হয়, বঙ্গদেশের পত্তনিদারগণ তালুকদার নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। একই স্বত্বাধিকারের অধিকারী বলিয়া গবর্নর জেনেরাল বাহাদুর স্যর জন সোর সাহেবের পরামর্শ ক্রমে তালুকদার দিগকে জমিদারের অধীনতাপাশ মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন। এতদ্বারা তালুকদারদিগকে জমিদারের ন্যায় রাজস্ব প্রদানের স্বাধীন ক্ষমতা ও অধিকার পৃথক ভাবে প্রদত্ত হয়।

3rd Feb. 1790.

With respect to the talukdars, I would have wished that they had been separated entirely from the authority of the zaminders, and that they had been allowed to remit the public revenue assessed upon their lands immediately to the officer of government, instead of paying it through

zaminder to whose jurisdiction they are subjected.

Proposition of Mr. Shore. Article 16.

The Zamindery Settlement of Bengal. Appen XVII P. 53

"তালুকদারদিগকে জমিদারের কর্তৃত্বাধীন হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা গেল। জমিদারের অধিকারে তাহাদের ভূমি কর যাহা নির্ধারিত ছিল এবং যাহা তাহারা জমিদারের মধ্যস্থতায় প্রদান করিত, তাহা একমাত্র গবর্নমেণ্ট কর্মচারীর নিকট পাঠাইবার জন্য অনুমতি দেওয়া গেল।"

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনী দ্বারা তালুকদারদিগকে জমিদার হইতে পৃথক করা হইলে জমিদারগণ আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, তালুকদারগণ যদি তাহাদের দেয় কর, গবর্নমেণ্ট রাজকোষে পৃথক ও স্বাধীন ভাবে প্রদান করে, তবে তাহাদিগকে অযথা বেশি রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে। ইহা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত আপত্তি বলিয়া সকৌন্সিল গবর্নর জেনারেল তালুকদারদিগের নির্দিষ্ট পরিমাণ কর জমিদারের রাজস্ব হইতে বাদ দিয়া দিলেন এবং তালুকদারগণ পৃথক্‌ভাবে তাহাদের দেয় কর রাজকোষে দিতে আদিষ্ট হইলেন। এইরূপে জমিদার এবং তালুকদারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

জানিতে পারা গিয়াছে যে, স্যর জন সোর সাহেব, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জমিদার এবং তালুকদারদিগকে পৃথক ভাবেই উল্লেখ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, জমিদারের অধীনতা হইতে তালুকদারকে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই স্থিরীকৃত হইতেছিল।

বঙ্গদেশে এই তালুকদারের সংখ্যা খুব বেশি নহে। অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং বেহারে জমিদার অপেক্ষা তালুকদারের সংখ্যাই অধিক। বঙ্গদেশে যে দুই দশজন তালুকদার ছিলেন, তাহাদের তালুক কালক্রমে বাঙ্গালার জমিদারদিগের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং এখন তাহা জমিদারি নামে পরিচিত হইতেছে, তবে কালেক্টরীতে খাজনা দাখিলের সময়ে খাজানার চালানে যে সকলকে এখনও তালুক উল্লেখে রাজস্ব প্রদান করা হয়। বঙ্গদেশের জেলাসমূহের মধ্যে ময়মনসিংহ, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া ও মুরশিদাবাদ এই কয়টি জেলাতেই উক্ত প্রকার তালুকের সংখ্যা বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য জেলাসমূহে তালুকের সংখ্যা কম।

অতঃপর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বোর্ডের ডাইরেক্টারগণ বঙ্গীয় গবর্নমেণ্ট প্রেরিত স্থায়ীকর বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করতঃ গবর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাহাদুরকে বঙ্গদেশের ভূমি রাজস্ব, জমিদার ও তালুকদারগণের সহিত বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারসূত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। সেই অনুমতি পত্র ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এতেদ্দেশে উপস্থিত হয়।

স্থায়ীকর বন্দোবস্তের অনুমতি বঙ্গদেশে পৌঁছিল, কিন্তু ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজস্ব, যাহা দশ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সময় মাত্র তিন বৎসর অতীত হইল, এখনও তাহার মেয়াদ সাত বৎসর রহিয়াছে, এই অজুহাতে কাউন্সিলের দুজন সভ্য স্থায়ী করের বন্দোবস্ত দশশালা বন্দোবস্ত মেয়াদ অন্তে প্রচারিত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এ প্রস্তাব সঙ্গত হইলেও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ তাহা সমর্থন করিলেন না। তাহারা বলিলেন, যে স্বত্ব প্রদান করা আছে, তাহা মেয়াদী মাত্র, সুতরাং তদ্বারা

বংশানুক্রমিক চিরস্থায়ীকর বন্দোবস্তে বাধা পড়িতে পারে না। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিলে অন্যপ্রকার ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইতে পারে, এজন্য উচিত কার্যে বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। গবর্নর জেনারেল বাহাদুর ইহা যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন এবং সত্বর ঐ বন্দোবস্ত কার্যে পরিণত করিবার জন্য কাউন্সিলকে অনুমতি প্রদান করেন। এক মেয়াদের কাল অতীত হওয়ার পূর্বে স্থায়ীকর বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার জন্য পরবর্তী সময়ে রাজপুরুষদিগের নিকট লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাহাদুরকে অশেষ গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে এবং আজও পর্যন্ত অনেক নীতিজ্ঞানাভিমানী ইংরেজের নিকট তাহাকে ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা বহু বিশেষণে বিশেষিত হইতে হইতেছে। এমন কি, কেহ কেহ তাহাকে "সিপাহী রাজনীতিক" বলিয়াও উপহাস করিয়াছেন। কারণ তিনি এ দেশে আসিবার পূর্বে কিছুদিন সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার প্রতি একদেশদর্শিতার দোষারোপ নিত্যই হইতেছে। কিন্তু তিনি অজ্ঞই হউন আর অবিবেচকই হউন, এক কথায় কোটি কোটি বঙ্গবাসীর নিকট তিনি পূজ্য হইয়া আছেন, সুতরাং আমাদের পক্ষে এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক।

সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে, সকৌন্সিল গবর্নর জেনেরল মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিশ বাহাদুর নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনী দ্বারা বঙ্গদেশের $\frac{৭}{৮}$ অংশ, বেহার প্রদেশের $\frac{৩}{৫}$ অংশ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বেনারস বিভাগ ও অযোধ্যা বিভাগ, কটক ব্যতীত উড়িষ্যা দেশের সমুদয় স্থানে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের কিয়দংশ স্থানে স্থায়ী কর বন্দোবস্ত প্রদান করেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উক্ত বিজ্ঞাপনী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

The Marquis of Cornwallis, Knight of the most noble order of the Garter, Governor-General in Council, now notifies of all Zaminders, independent Talookdars, and other actual properietors of land in the provinces of Bengal, Behar and Orissa, that he has been empowered by the Honourable Court of Directors for the affairs of the East India Company, to declare the Jumma, which has been or may be assessed upon their lands under the Regulations, above mentioned, fixed for ever. The Governor-General in Council accordingly declares to the Zaminders, independent Talukdars, and other actual properietors of land, with or on behalf of whom, a Settlement has been completed, that at the expiration of the term of the settlement, no alteration will be made in the assessment which they have respectively engaged to pay, but that they, and their heirs and lawful successors will be allowed to hold their estates at such assessment for ever.

Regulation I of 1793, Art II and III passed on 1st May, 1793.

"সকৌন্সিল গবর্নর জেনেরাল মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিশ বাহাদুর এই বিজ্ঞাপনী দ্বারা বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সমুদয় জমিদার, জমিদার হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত তালুকদার এবং অপরাপর ভূম্যধিকারীগণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক মহামান্য বোর্ডের ডাইরেক্টরগণের দ্বারা জমির জমা, যাহা তাহাদের উপর নির্ধারিত হইয়াছে ও হইবে, তাহা চিরকালের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিতে তিনি ক্ষমবান্ হইয়াছেন। সকৌন্সিল গবর্নর জেনারেল এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, জমিদার, পূর্ব কথিত

তালুকদার ও অপর ভূম্যধিকারীগণকে অথবা তাহাদের পক্ষে যাহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে জানাইতেছেন যে, পূর্ব প্রদত্ত বন্দোবস্ত সকল শেষ হইলেও পুনরায় তৎসমুদয় জমি এবং জমার কোন পরিবর্তন না করিয়া পূর্ববৎ স্থির রাখা হইবে। তাহারা ও তাহাদের উত্তরাধিকারীগণকে সেই সকল বিষয় সম্পত্তিতেও পূর্ব প্রবর্তিত বন্দোবস্ত চিরকাল স্থির রাখা হইবে।"

এখন জমিদার এবং তালুকদারের স্বত্বাধিকার পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু বিজ্ঞাপনীতে যে ভূম্যধিকারীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহারা কে? পরবর্তী কালে স্থায়ী কর বন্দোবস্তের বিরুদ্ধবাদী দল তাহা লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থ লইয়া কোন মতান্তর দেখিতেছি না; কারণ গবর্নর জেনারেল বাহাদুর সম-সময়ে যে সকল বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন, তাহা দেখিলেই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না, তিনি অপর বিজ্ঞাপনীতে ভূম্যধিকারী শব্দে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে ঐ আপত্তি খণ্ডন জন্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে ঃ—

That only those who paid Revenue to Government were the actual prorietors of the land.

(The permanent Settlement of Bengal. Appen XVIII Chap. I. P. 19)

"যাঁহারা গবর্নমেণ্টে রাজস্ব প্রদান করেন, তাহারাই জমির প্রকৃত মালিক।"

ভূমি শূন্য ভূম্যধিকারী হইতে পারে না। ভূমির অধিকারী হইলে তাহার করও দিতে হয়। গবর্নমেণ্টের রাজস্ব ভূম্যধিকারী যোগাইয়া থাকেন। সাধারণ প্রজার সহিত গবর্নমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাজস্ব মেয়াদী বন্দোবস্তের সূচনা হইতেই লোপ পাইয়াছে। প্রজা যে ভূমির মালিক, ইহা পরবর্তী সময়ে কোন মতেই প্রকাশ পাইতে পারে না। কষ্ট কল্পনা দ্বারা শব্দার্থ লইয়া গোলযোগ সৃষ্টিকারীগণ, বাহাদুরী ফলাইবার মানসেই ভূমির স্বত্বাধিকারী লইয়া একটা মিথ্যা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, ভূম্যধিকারীগণ ভূমির অধিকারী এ কথা স্বীকার করিলে অধীনস্থ করদাতা প্রজার তাহাতে এমন কি ক্ষতির কারণ হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। তবে নানা জনের নানা মত দেখা যাইতেছে, সুতরাং সে তর্কের মীমাংসা বোধ হয় কোন কালেই হইতে পারিবে না। কাজেই আমরা ক্ষান্ত থাকিলাম।

এই সময়ে অপর একটি রেগুলেসন দ্বারা তালুকদারগণের স্বত্ত্ব স্থির করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে দশশালা প্রবর্তনকালের ধার্য জমা স্থির রাখিবার ব্যবস্থা বিবৃত হইয়াছে।

The Revenue payable by such dependent Talukdars as wer exempted from any increase of assessment at the forming of the decennial Settlement, in virtue of the prohibition continued in clause 1. sec. 51. Regulation VIII, 1793, is declared fixed for ever, and their lands are accordingly to be rated at such fixed assessment in all divisions of the estate in which their Talooks are included.

(Regulation XLIV of 1793 Sec. VII)

স্থায়ী কর বন্দোবস্ত প্রদান কালে জমিদার এবং তালুকদারগণকে একই প্রকার সর্ত্তে ভূমির উপর অধিকার প্রদত্ত হয়। জমিদারের অধীন থাকিবার সময়ে তাহাদের নাম তালুকদার ছিল বলিয়া এখনও সেই নামই রহিয়া গেল, কিন্তু অধিকারের কোন তারতম্য হইল না, নাম মাত্র প্রভেদ রহিল। ভবিষ্যতে জমিদার শব্দের অর্থ লইয়া উভয়ের মধ্যে

অধিকারের তারতম্য উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় উল্লিখিত বিধান প্রবর্তনের দ্বারা তালুকদারের স্বত্বাধিকার পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহার পর ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভূমির মালিক শব্দে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে, তাহাও স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ—

Every proprietor of land (which term, whenever it occurs in any regulation) is to be considered, to include Zaminders, independent Talukdars and all actual proprietors of land, who pay the revenue assessed upon their estates ımmediately to the Government etc.

(Bengal Regulation III 1794. Sec. 2)

ভূমির মালিক বা ভূম্যধিকারী বলিলে জমিদার, তালুকদার (যাহারা গবর্নমেণ্টে রাজস্ব প্রদান করে) এবং যে সকল ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে নিয়মিত রূপে গবর্নমেণ্টে রাজস্ব প্রদান করে, সেই সকল ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে, তাহা উক্ত বিধান প্রণয়ন দ্বারা নিরাকৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ভূমির মালিক—কে, তাহা বুঝিতে আর কষ্টকল্পনার আশ্রয়ের আবশ্যকতা রহিল না। এক বিধানে সকল গোল মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তৎকালীন গবর্নমেণ্ট দপ্তর অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাহাদুর এইরূপে বঙ্গদেশের ভূমির কর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করিয়া দিয়া দেশের সমূহ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, পক্ষান্তরে গবর্নমেণ্টের রাজস্ব সংগ্রহের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা করিয়া লইয়াছেন; তাহার এই উদারনীতির কল্যাণে বঙ্গদেশের জনসাধারণের যে কি মহদুপকাব সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাষায় বা ভাবে প্রকাশ করিা অসম্ভব। এই রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনে ইংরেজজাতির ন্যায় ও কর্তব্যপ্রিয়তার দুন্দুভি জগতে যে, কি প্রকার নিনাদিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষিত সমাজে অপরিজ্ঞাত নাই। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের মূলভিত্তি এই জনহিতকর স্থায়ীকর ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থা দ্বারাই ইংরেজ, ভারতবাসীর হৃদয়ের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছেন, একথা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানকালে ৯১৪৫৮ খানি তৌজিতে ২১৬২৪৯১৯ টাকা রাজস্ব ধার্য করা হয় এবং অনির্দিষ্ট জমার ৩০০১ খানি তৌজিতে ১৫০৭০০১ টাকা রাজস্ব ধার্য করা হইয়াছিল। ক্রম বিভাগের ফলে নির্দিষ্ট জমার তৌজির সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। স্বায়ীকর বন্দোবস্তের সময়ে গবর্নমেণ্ট, আদায়ী জমার শতকরা ৯০ টাকা সরকারে রাজস্ব লইয়া অবশিষ্ট শতকরা ১০ টাকা মাত্র জমিদারকে লাভ হিসাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তদানীন্তন গবর্নর জেনারেলের স্থায়ীকর বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে, এখন অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু দেশের সাময়িক অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে এই বন্দোবস্তে গবর্নর জেনারেলের কোনই দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। গবর্নমেণ্ট যদি সে সময়ে সমুদয় রাজস্ব খাস আদায়ের ব্যবস্থায় রাখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজকোষের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িত। তিল তিল করিয়া রাজস্ব আদায় করা বহু ব্যয় সাধ্য হইত। এস্থলে অনাদায়, অস্থায়ীখরচা ইত্যাদি বাবদে রাজস্বের দশমাংশ জমিদারকে ছাড়িয়া দেওয়া কখনই অধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বঙ্গদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার মোটামুটি ক্ষুদ্র ইতিহাস দিয়া এখানে এ অধ্যায় শেষ করা গেল।

জমিদার ও প্রজা

বঙ্গীয় জমিদার ও জমিদারির কথা একরূপ বলা হইল, এক্ষণে প্রজার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে। প্রজার বিবরণ কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে জমিদারের কাহিনি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রজা—জমিদারের মূলধন। প্রজাই জমিদারের সর্বস্ব।

ভারতের অন্য কোন প্রদেশের প্রজার সহিত বাঙ্গলার প্রজার তুলনা হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের প্রজার সহিত জমিদারের সম্বন্ধ সাময়িক ভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য রক্ষিত, কিন্তু বাঙ্গলার প্রজা ও জমিদারের সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। স্থায়ী কর বন্দোবস্তের কল্যাণে ভূমির উপর জমিদারের বংশানুক্রমিক অপরিবর্তনীয় স্বত্বাধিকার নির্ণীত হওয়ায়, এবং প্রজার অধিকৃত ভূমি হইতে বিশেষ কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত অধিকার লোপের বিধান না থাকায়; জমিদারের সহিত প্রজার সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। চিরস্থায়ী কর ব্যবস্থার ফলেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সুন্দর সুখকর ভাব সংরক্ষিত হইয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে।

জমিদার, গবর্নমেণ্টকে নির্দিষ্ট কর সরবরাহ করিয়া, নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের মালিক হইয়াছেন; আর অন্য দিকে প্রজা, জমিদারের নিকট ঐ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের খণ্ডিত অংশ জমা ধার্য করিয়া লইয়া স্বেচ্ছামত চাষ আবাদ করতঃ তাহা ভোগদখল করিতেছে। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হইবে যে, প্রজার সহিত জমিদারের সম্বন্ধ, কেবল জমির খাজনা লইয়া,—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি তাই? জমি জমার সম্বন্ধ ব্যতীত জমিদারের সহিত কি প্রজার আর কোনই সম্বন্ধ, কি বাধ্যবাধকতা নাই? পক্ষপাত দুষ্ট তর্কের নিকট ইহার উত্তর চলিতে পারে না; তবে বিশেষ চিন্তাপূর্বক এ কথার মীমাংসা করিতে গেলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, জমিদারের সহিত প্রজার সম্বন্ধ খুব নিকট এবং অত্যন্ত জটিল। পরস্পরের মধ্যে বাধ্যবাধকতা এত বেশি যে, একের উন্নতি অবনতির সহিত অপরের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

এ সম্বন্ধ নূতন হইয়াছে এবং ইংরেজরাজের ন্যায়নিষ্ঠার কল্যাণে, এই বঙ্গদেশে এবং সামান্য ভাবে অন্য দুই একস্থানে জমিদার ও প্রজার এই অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কেন হইয়াছে, এবং কোন্ কার্যের ফলে হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে বক্তব্য বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কাজেই সামান্য ভাবে সে তথ্যের আভাস দেওয়া যাইতেছে। ভারতে অথবা জগতের অন্য কোথাও প্রজা এবং রাজার মধ্যস্থলে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানকারী ও ভূমির মালিক বলিয়া পৃথক কোন সম্প্রদায় নাই বা ছিল না। মুসলমান রাজত্বকালে এতদ্দেশে প্রজাই ছিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত স্থানের উপর স্বাধীন ক্ষমতাশালী রাজা বা দেশনায়ক ছিলেন। ইংরেজরাজ প্রবর্তিত রাজস্বের নব বিধানে প্রজার উপর যে জমিদাররূপ একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহারা দেশের জনসাধারণের সহিত সমপর্যায়ে আইন শাসনের অধীন হইয়াও, পূর্ববর্তী সময়ের স্বাধীন রাজাদের অপেক্ষা অনেকাংশে নিরাপদে ও সুখে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

উদারনীতিজ্ঞ ইংরেজ রাজত্বে, সর্বজনীন সম অধিকারের মধ্যে একদিক দিয়া প্রজা, জমিদারের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাসাধারণের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতির কারণ হয় নাই; বরং তাহারা নিরাপদে নিরুপদ্রবে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

প্রজা, অজন্মা বশত অথবা অন্য কারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত যথা সময়ে ও জমিদারের খাজানা দিতে না পারিলেও তাহার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন আবাদী জমি হঠাৎ তাহার হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে খাস গবর্নমেণ্টকেও অজন্মা বা কোন দৈব দুর্যোগের জন্য রাজস্ব আদায়ের কোন বেগ পাইতে হয় না, বিপদে আপদে দুই কুল রক্ষা করিবার জন্য মাতব্বর মধ্যস্থ জমিদার শ্রেণি মাথা পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই কারণে গবর্নমেণ্টকে এবং প্রজাকে জমিদারের উপর অনেক কার্যেই অবলম্বন স্বরূপ নির্ভর করিতে হইয়াছে।

বিচার ও শাসনে জমিদার অন্যান্য প্রজার ন্যায় সমপর্যায়ে থাকিলেও দেশ, সমাজ এবং গবর্নমেণ্টের মঙ্গলামঙ্গলের সোনা রূপার কাঠি হইয়া আছেন। গবর্নমেণ্টের সকল বিষয়ে না হউক, অন্ততঃ কতক বিষয়ে, জমিদার তাহাদের সহায়তা করিতেছেন, প্রজা সাধারণ মুহূর্তও জমিদারের আশ্রয় ব্যতীত এইরূপ সুযোগ সুবিধা লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবশ্য একথা স্বীকার করিবেন।

এদেশে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট যখন রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যপদেশে, নানা চিন্তার পর চিরস্থায়ী কর প্রথা প্রচলিত করেন, তখন দেশের উন্নতি, কৃষক প্রজার উন্নতি এবং রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধা সহায়তার জন্যই জমিদারকে অপরিবর্তনীয় ভাবে ভূমির উপর বংশানুক্রমিক স্বত্বাধিকার দিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে, সুতরাং দেশ বা সমাজের উন্নতি অবনতি যে জমিদারদিগের প্রত্যেক কার্য-কলানের উপর নির্ভর করে, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য বেশি দূর যাইবার আবশ্যক হইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণানুসন্ধান করিলেই সমুদয় বিষয় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে।

গবর্নমেণ্ট যে আশা করিয়া চিরস্থায়ী কর ধার্য করিয়াছিলেন, প্রথম সময়ে তদ্দ্বারা প্রজাসাধারণের বহু উপকার এবং গবর্নমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। দেশে কৃষি কার্যের উন্নতি, ভূমির পরিমাণ বিস্তৃতি এবং প্রজামণ্ডলীর নির্দিষ্ট কর্ষিত জমি বিশেষ কারণ ব্যতীত অপরিবর্তনীয় ভাবে স্থির থাকায় দেশের বহু বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া শান্তি বিরাজিত হইয়াছে। কালক্রমে কর্ষিত ভূমির ক্রমোন্নতির ফলে বঙ্গদেশে শান্তির ছায়া পড়িয়াছে।

নির্দিষ্ট কর দিয়া ভূমির উপর অধিকার পাইবার পর, জমিদার, কৃষি এবং ভূমির উন্নতির জন্য যথাযথ ভাবে পূর্ব প্রতিশ্রুত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই জন্য শীঘ্র শীঘ্র প্রজার উন্নতি হইয়াছে। জমিদারের কর্তব্যপ্রিয়তায় প্রজাগণ জমিদারের নিতান্ত বাধ্যানুগত হইয়া পড়িয়াছিল। জমিদারের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া প্রজাগণ মালিক জমিদারকে আইন আদালত মানিয়া লইয়াছিল, এমনকি, ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং তাহাদের উপর স্বর্গীয় আশীর্বাদ বর্ষিত আছে, ইহাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। জমিদারগণ মনপ্রাণ দিয়া প্রজার অভাব দূর করিবার জন্য সর্বদা নিযুক্ত ছিলেন। ইহার ফলে দেশের এবং সমাজের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় মধুর ভাব-উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশকে শান্তির ক্রোড়ে নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হয় নাই।

দীর্ঘকাল এইভাবে কাটিয়া যাইবার পর জমিদার ও প্রজার মধ্যে ভাব বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন, মধুরভাব, ক্রমে ক্রমে যেন প্রহেলিকাবৎ দূর হইয়া যাইতেছে। ঐ যে উভয়ের জীবন মরণের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ, যাহাকে নিতান্ত জোর করিয়া টানিয়া ছিড়িবার জন্য, কি যেন একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, কিন্তু সেই যে পূর্ব ভাবের একতা বন্ধন, যাহা দুই সম্প্রদায়কে বহু বিপরীত পার্থক্যের মধ্যেও প্রীতি প্রফুল্লতার অদৃশ্য তার দিয়া কর্তব্যের দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছিল, তাহারই ফলে আজ আসুরিক বল প্রয়োগ করিয়া বহু চেষ্টাতেও উভয়কে পৃথক করা যাইতেছে না। এক জনকে ত্যাগ করা আর এক জনের পক্ষে যেন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ইহা সহজেই দেখিতে পাইতেছেন।

কতকগুলি অবান্তর কারণে জমিদার এবং প্রজার মধ্যে এখন বিরুদ্ধ ভাব জাগিয়াছে। ইহার পরিণাম যে কোন পক্ষেরই শুভকর হইবে না, তাহা বেশ বলিতে পারা যায়। কিন্তু কথা হইতেছে যে, কি কারণে এই অশুভকর ভাব বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে এবং কি উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহারই কারণানুসন্ধান করা জমিদারদিগের সর্বতোভাবেই কর্তব্য।

কেহ বলেন— প্রজা পক্ষের দোষ;—প্রজা কোন মতেই এখন আর জমিদারের সামান্য অধীনতাও স্বীকার করিতে চাহে না; আবার কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে জমিদারদিগের অবিমৃষ্যকারিতাই এই অকল্যাণকর ভাবের স্রষ্টা। আত্মবিস্মৃতি এবং অদূরদর্শিতাকেই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া কথিত হইতেছে। সুধী সমাজের মতে, জমিদারগণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন, অত্যন্ত বিলাসী এবং অমিতব্যয়ী হইয়া পড়ায় ও স্বেচ্ছাচারিতা, আলস্যপ্রিয়তা প্রভৃতি বিকৃতভাবের পথিক হওয়া প্রযুক্ত, প্রজার আবেদন নিবেদনের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন; এখন আর প্রজাগণ জমিদারের নিকট অভাব অভিযোগ উপস্থিত করিয়া উৎপীড়ন ব্যতীত আর কোন প্রতিকার পাইতেছে না বলিয়াই নাকি দেশ ও সমাজ ধ্বংসের এই সূত্র উপস্থিত হইয়াছে।

সাধারণ ভাবে এই বিপ্লবের কারণ জমিদারগণকে বলা যাইতে পারে। যেহেতু এখন আর জমিদারদিগের কর্তব্যপ্রিয়তা, সহৃদয়তা, সমাজ রক্ষায় চেষ্টা, ধর্ম বিস্তারে সাহায্য দান, অতিথি সৎকার, বিদ্বানের সমাদর প্রভৃতি হিতকর অনুষ্ঠানগুলির প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই, প্রজাপালন ও তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার চেষ্টাতেও নিতান্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতেছে, নিশ্চেষ্টতা, কর্তব্যে অবহেলা প্রভৃতি দ্বারা জমিদারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্ব ক্রমে বিনাশ করা হইতেছে। প্রজার সহস্র কাতর প্রার্থনা এখন জমিদারদিগের কর্ণে সহজে প্রবেশ করিতে চায় না; অত্যাচারে জর্জরিত কি উৎপীড়নে সর্বস্বান্ত প্রজারা, আকুল প্রার্থনা এখন জমিদারের নিকট ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইতেছে। উল্লিখিত কারণ সমূহও যে এই ভাব বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ, তাহা আর অধিক করিয়া প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইতেছে না।

এতদ্ব্যতীত জমিদারগণ নিজ বিষয় সম্পত্তি দেখা একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছেন! যিনি খুব দেখেন, তিনি রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় কর্তব্য শেষ করিয়া থাকেন। ইহার উপর আর কোন বিচার বিবেচনাই নাই। আত্মীয় স্বজন, প্রাচীন মুরব্বী, বন্ধু, পুরাতন কর্মচারিগণ এখন ঘৃণিত ভাবে উপেক্ষিত হইতেছেন; সংসারে এখন "ফ্রেণ্ড" এবং

কতকগুলি খোসামুদে প্রশংসাপত্রধারী ব্যক্তি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া অযথা প্রভুত্ব প্রকাশপূর্বক অহমিকার দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। এই সমস্ত নিতান্ত অন্যায় ও অত্যন্ত গর্হিত কার্যের দ্বারা জমিদারগণ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। কর্মচারী প্রজার উপর অযথা উৎপীড়ন করিতেছে, ফলে জমিদার প্রজার বিরাগভাজন হইতেছেন, এতদ্দ্বারা সমাজ এবং দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। আত্মাভিমানি জমিদারগণকে একথা বুঝাইয়া দেওয়াও কঠিন হইয়াছে।

প্রজার অভিযোগের প্রতিকার কথা জমিদারেরই কর্তব্য,—গবর্নমেণ্টের নহে। প্রজার ইষ্টানিষ্টের দ্বারা গবর্নমেণ্ট অপেক্ষা জমিদারের আশঙ্কা ও ক্ষতির কারণই অধিক একথা জমিদারগণের স্মরণ রাখা উচিত। চিরস্থায়ী করগৃহীতাদিগের তৎকালীয় মন্তব্যসমূহ মনে রাখিয়া চলা কর্তব্য। যদি তাহারা গবর্নমেণ্টের বাঞ্ছিত ও আদিষ্ট কার্যগুলি সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হন, তবে স্থায়ী কর বন্দোবস্তের অধিকার স্থায়ী থাকা সম্ভবপর কি না, তাহা কি বিবেচনা করিয়া দেখা জমিদারদিগের উচিত নহে?

অতঃপর প্রজাদিগের প্রতি যাহাতে সদয় ব্যবহার করা হয়, তাহাদের উপর কোন প্রকারে উৎপীড়ন না হয় এবং ন্যায়সঙ্গত রূপে তাহাদের অভাব অভিযোগগুলির প্রতিকার চেষ্টা করা হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করাই জমিদারদিগের উচিত। নচেৎ ভবিষ্যতে তাহাদিগকে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, এ কথা জমিদারগণ যদি আজও না বুঝিয়া থাকেন, তবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইবে “নিয়তি কে ন বাধ্যতে”।

জমিদারের সংসার

জমিদারের সংসার এক বিরাট ব্যাপার! রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও গার্হস্থ্যনীতি প্রত্যেকটিই এখানে সমভাবে রক্ষিত। বাঙ্গালা দেশে জমিদারের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। জমিদারকে দূরে রাখিয়া এদেশে রাজা রাজকার্য করিতে পারেন না, সমাজপতি সমাজ চালাইতে পারেন না, ধর্মবেত্তাগণ, জমিদারের সহায়তা ব্যতীত ধর্মকার্য করিতেও অক্ষম। যে কার্যে জমিদারের সংশ্রব নাই বঙ্গদেশে যে কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

দীর্ঘকাল হইতে জমিদারগণ কর্তব্যপ্রিয়তা ও পরোপকার দ্বারা দেশ এবং সমাজের উপর প্রভূত প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বর্তমান সময়ে জমিদারগণ পূর্ববিধি ব্যবস্থার প্রতিকূলে চলিয়া নিজেদের অবনতি ঘটাইয়াছেন। জমিদারগণ পল্লীবাসী ছিলেন, স্বীয় আবাস স্থলে দিঘি সরোবর, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি জনহিতকর কার্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়া নিজেদের কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কালের কুটীল গতিতে এখন বিপরীত ভাব উপস্থিত হইয়াছে। জমিদারগণ প্রসিদ্ধ আবাসস্থল পরিত্যাগপূর্বক বিলাসিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। পিতৃ পিতামহ প্রতিষ্ঠিত অট্টালিকা, মন্দির, তড়াগ প্রভৃতি যত্নের অভাবে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে। দরিদ্র প্রজাদিগের বহু কষ্টার্জিত অর্থ সহরের শোভা বর্ধনে অকাতরে ব্যয়িত হইতেছে; আর জমিদারের পিতৃ পিতামহের স্মৃতি পল্লীর দিঘি তড়াগ মজিয়া যাইতেছে, ক্বচিৎ কোথাও শেষ স্মৃতি দাম ও দলে এবং বন্য তরুলতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া সামান্য অপরিষ্কৃত জল উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। পথ ঘাট মেরামত অভাবে গমনাগমনের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে, এখন সুন্দর ও মূল্যবান হর্ম্যরাজি মেরামত অভাবে ভগ্নদশায় উপস্থিত হইয়া প্রাচীন স্মৃতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; প্রাসাদের উচ্চ চূড়ায়,—যেখানে লোহিত পতাকা সান্ধ্যসমীরণে পত পত রবে উড্ডীয়মান থাকিয়া সৌভাগ্যপরিচয় প্রদান করিত, তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে, সমুচ্চ নহবতখানায়, যেখানে প্রহরে প্রহরে সাময়িক রাগ রাগিণীর সুললিত স্বর লহরী দিগন্ত আনন্দ মুখরিত করিত, তাহা আজ কাল পেচকের আবাস স্থানে পরিণত হইয়াছে; আর সেই পবিত্র ধর্ম মন্দির, যেখানে সায়ং সন্ধ্যায় মাঙ্গলিক শঙ্খ ঘণ্টার গম্ভীর শব্দ পরম মঙ্গলময় বিভূর পবিত্রতা স্মরণ করাইয়া মানবের সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ে সজীবতা আনয়ন করিত, আজ সেখানে নীরবতা প্রকৃতির ভীষণতা সপ্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন কোন নির্দিষ্ট সময়ে সামান্য ভাবে ক্ষীণ শব্দ উপস্থিত হইয়া তাহার অতীত অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে মাত্র। কে জানে, কবে ঐ শেষ টুকুও বা লুপ্ত হইয়া যায়।

এমনি করিয়া বাঙ্গলার জমিদারগণ তাহাদের অতীত স্মৃতিসমূহ লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। আত্মহত্যা আর কাহাকে বলে? ইহা কি আত্মহত্যা নহে?

জমিদার সংসার বিপন্নের আশ্রয় স্থান এবং দুষ্টের দমন স্থান ছিল। যে স্থানে ক্ষুধাতুর

অন্ন পাইত, বিপন্ন অভয় পাইত, আশ্রিত আশ্রয় পাইত, দুস্থ আত্মীয় স্বজন সমাদরে গৃহীত হইত, হায়! আজ সেখানে অতিথি প্রত্যাখ্যাত, আত্মীয় বিতাড়িত, প্রার্থী প্রহৃত হইবার স্থান হইয়াছে। দেব, দ্বিজ, গুরু অনাদৃত হইতেছে। পরোপকার পাপ কার্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালার জমিদারগণ পিতৃ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত শুভ অনুষ্ঠানগুলির বিলোপ ঘটাইতেছেন।

সাহায্য সহানুভূতি অভাবে দেশের শিল্পকলা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। দেশে শাস্ত্র চর্চা উঠিয়া যাইতেছে, পুরাণকাহিনী বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হইবার পথে চলিয়াছে। এ সকল কেহ যে বুঝিতে না পারিতেছেন তাহাও নহে, তবুও যেন জোর করিয়া সমুদয় নষ্ট করা হইতেছে। সংসারের লক্ষ্মী শ্রী মলিন হইয়াছে—সর্বত্রই যেন নাই নাই, এই অভাবের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আনন্দ নিকেতন নিরানন্দের আবাস স্থলে পরিণত হইয়াছে। দেশের দুর্ভাগ্য যে, এমন সোনার সংসারে রাক্ষসী লীলা ধেই ধেই নাচিয়া বেড়াইতেছে। হায়! বাঙ্গালার জমিদার! তুমি জানিয়া শুনিয়া সুখের ঘরে স্বেচ্ছায় আগুণ জ্বালাইয়া দিতেছ। নিজে মজিতেছ, দেশকে মজাইতেছ, সোনার বাঙ্গলাকে শ্মশানে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছ; দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না।

জমিদারি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারগণকে স্বীয় ভূমির বন্দোবস্ত এবং কর আদায়ের জন্য একটি দপ্তর খুলিতে হইয়াছিল, ইহাই জমিদারি সেরেস্তা। জমিদারি সেরেস্তা পরিচালনা করিবার জন্য কতকগুলি কর্মচারী আবশ্যক। সমুদয় কর্মচারীর কার্য পর্যবেক্ষণ ও জমিদারির আদায় তহশীল ব্যবস্থাদির জন্য যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রদান কর্মচারী থাকেন, তাহাকে পূর্বে "দেওয়ান" উপাধি দেওয়া হইয়াছিল, এখন কোন কোন স্থলে তাহা ম্যানেজার নামে অভিহিত হইতেছে।

ভূমির মালিক জমিদার, কিন্তু দেওয়ান মহাশয় জমিদারির সর্বময় কর্তা। জমিদার ও প্রজার উন্নতি অবনতি এই দেওয়ানের কর্তব্যনিষ্ঠার উপর নির্ভর করিত, এখনও কিঞ্চিৎ পরিমাণে করে। জমিদারি জমিদারের হাতে আসিবার পরবর্তী সময়ে, জমিদার মহোদয়গণ অভিজ্ঞ দেওয়ানের কার্যকারিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গবর্নমেণ্ট-আদায়ী জমার শতকরা ৯০৲ টাকা রাজস্ব বাঁধিয়া লইয়া মাত্র ১০৲ টাকা জমিদারকে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছিলেন। জমিদারকে প্রথমে এই ১০৲ টাকা লভ্যাংশ লইয়াই সমুদর রাজস্ব সংগ্রহপূর্বক যথানির্দিষ্ট খাজনা নির্ধারিত সময়ে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে হইত। প্রজার নিকট নিয়মিত সময়ে খাজনা, সকল সময়ে আদায় হওয়া সম্ভবপর ছিল না, এখনও নাই; কিন্তু তাই বলিয়া গবর্নমেণ্টের বাঁধা রাজস্ব মুহূর্তও বাকি রাখা যাইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় প্রথম প্রথম জমিদারদিগকে যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। এই উৎকৃষ্ট অথচ ভয়ানক ব্যবস্থার ফলে চিরস্থায়ী কর বন্দোবস্তের পর পর সময়ে যে কত মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে সদর রাজস্বের চাপে পথের ভিখারি হইতে হইয়াছিল, তাহার হিসাব করা যায় না। প্রজার নিকট নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্য খাজনা অনাদায় প্রযুক্ত, কালেক্টরিতে সদর মাল গুজারী দাখিল করিবার সময়ে, অনেক জমিদারকে পরিবার পরিজনের অলঙ্কার পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হইত, এমন কাহিনিও শুনিতে পাওয়া যায়। এই ভীষণ পরীক্ষার সময়ে জমিদারের "দেওয়ান" জমির জমা কি উপায়ে বৃদ্ধি হইতে পারে, কোন্ ভূমির হার কি পরিমাণ লইলে প্রজার ক্ষতি হইবে না, প্রভৃতি বিশেষ পর্যবেক্ষণপূর্বক বিবেচনা করিয়া জমিদারকে আশু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভূমির অবস্থা বিবেচনায় বাঁধ বাঁধিয়া জল সঞ্চয়, নালা কাটিয়া জল নিকাশের পথ সম্প্রসারণ এবং স্থান বিশেষে জঙ্গলাকীর্ণ বন সাফ করাইয়া আবাদী জমির আয়তন বৃদ্ধিপূর্বক জমিদারির আয়, ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিলেন। "দেওয়ান" মহাশয়ের উল্লিখিতরূপ চেষ্টা যত্ন না থাকিলে বাঙ্গালার জমিদারি সমধিক আদরের এবং লোভনীয় বস্তু হইত কিনা তাহা সন্দেহস্থল।

দেওয়ান মহাশয় বহুদর্শী কর্মকুশলী ও কূটনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। জমিদারগণ ন্যায়নিষ্ঠ সুচতুর বুদ্ধিমান এবং সদ্বংশজাত, ধীর গম্ভীর স্বভাব বিশিষ্ট লোককেই এই সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিতেন। গবর্নমেণ্টের নিকটেও দেওয়ান মহাশয়েরা বিশেষভাবে

সমাদৃত হইতেন। দেশের জনসাধারণের নিকট তাহারা কিরূপ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আজও "দেওয়ান বাড়ি", "দেওয়ান পাড়া" প্রমাণ দিতেছে।

প্রথমাবস্থায় জমিদার, স্টেটের প্রধান কর্মচারী দেওয়ান মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহাদের পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য করিতেন না, এমন কি কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে স্থানান্তর গমনের আবশ্যক হইলেও তাহাদের মত না লইয়া যাইতেন না। এক কথায় জমিদার মহাশয় দেওয়ানের মতবিরুদ্ধ কোন কার্যই করিতেন না। জমিদারের জমিদারি হইতে সাংসারিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কার্যের সহিতই দেওয়ান মহাশয়ের সাশ্রব দুশ্ছেদ্যভাবে রক্ষিত ছিল। জমিদারির উন্নতি অবনতি, জমিদারের ভাল মন্দ সমস্তই দেওয়ানের কার্য তৎপরতার উপর নির্ভর করিত।

দেওয়ানের পদের দায়িত্ব অত্যধিক থাকায়, যাহার তাহার পক্ষে এই পদ প্রাপ্তি সম্ভবপর হইত না। এই পদে লোক নির্বাচনকালে বংশ, জাতি, কুল এবং কর্ম তৎপরতার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। আত্মীয় বন্ধু উপদেষ্টা মাতব্বর ও হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের পরামর্শ ক্রমে লোক নির্বাচিত হইত। জমিদার স্টেটের মালিক হইলেও কখন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, উল্লিখিত কারণে নিতান্ত উপযুক্ত ব্যক্তি না হইলে এই বিষম দায়িত্বপূর্ণ পদে কেহ নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। এইজন্য প্রধান কর্মচারীদিগের দ্বারা জমিদারের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

যতদিন জমিদারগণ পূর্বোক্ত নিয়মে স্টেটের কর্যাদি চালাইতেছিলেন, ততদিন কোন জমিদারকে কখন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। কুক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাব জমিদারদিগকে আচ্ছন্ন করিল, ফলে তাহারা কর্তব্য বিচ্যুত হইলেন, ভাব গেল, ভাষার অনাদর হইল, বিবেচনার ত্রুটি ঘটিল, বিচার থাকিল না, উপযুক্ত পাত্রে ক্ষমতা ন্যস্ত হইল না, কর্তব্যের পথ পরিত্যক্ত হইল, স্বেচ্ছাচারিতা বাড়িল, উপদেষ্টার স্থানে চাটুকার মোসাহেবদিগের অধিকার জন্মিল, ফলে অব্যবস্থায় জমিদারি স্টেটে অরাজকতা উপস্থিত হইল। নিজের অবস্থা, আয় বিবেচিত হইল না—ব্যয় বাড়িল, অভাব ঘটিল কাজেই ঋণ করিতে হইল। বিলাসিতার স্রোত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, শেষে পল্লীবাস্তু বাসের অযোগ্য বোধে পরিত্যক্ত হইল, ধর্মের ভাব গেল সুতরাং সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইল। এইরূপে বহুদিনের সঞ্চিত সুখপূর্ণ বৃহৎ, সংসার ক্রমে ধ্বংসের মুখে উপস্থিত হইয়াছে। হায়! যে সকল সংসারের সহিত নানা ভাবে শত সহস্র ব্যক্তির সুখ দুঃখ বিজড়িত ছিল, নিতান্ত নির্মম নিষ্ঠুরের ন্যায় সেগুলিকে কঠোরতার সহিত ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালার জমিদারি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইলেও বর্তমান জমিদারদিগের তাহার প্রতি কিছুমাত্র মায়া মমতা দেখা যায় না, তাহার ভাল মন্দের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। এখন বোধ হয় অধিকাংশ জমিদার নিজেদের অবস্থার এবং অতীত স্মৃতির কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা করেন না। কাহারও বা সময়াভাব ঘটিয়াছে, আবার কাহারও যে বুঝিবার শক্তির অভাব না ঘটিয়াছে, সে কথাও বলা যায় না। অভাবের তাড়নায় এখন অধিকাংশ জমিদারকে সর্বদা বিব্রত থাকিতে হয়, অপরিমিত ব্যয়ের কল্যাণে জমিদারি স্টেট এখন "করিভুক্ত কপিত্থবৎ" হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল সংসারে সর্বদা দীয়তাং ভুজ্যতাং রব ছিল, এখন সেখানে সর্বদা 'নাই' 'নাই' দাও দাও শব্দে সংসারের অভাব প্রকাশ করিয়া দিতেছে। কালের গতি বিচিত্র বটে!

জমিদারগণ এখন প্রবাসী হইয়া পড়িয়াছেন, নিজের জীবিকা অর্জনের একমাত্র সম্বল জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার অবসরও হয় না। তার পর উপযুক্ত কর্মক্ষম বক্তির উপর কার্যভার অর্পিত না থাকায় এবং আয়ের অধিক ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় জমিদারগণকে অশেষ চিন্তায় পড়িতে হইয়াছে। অপাত্রে কার্য ভার ন্যস্ত থাকায় এবং কার্য তৎপরতার অভাবে স্টেটের অবনতি ঘটিয়াছে। জমিদারগণ এখন বলিয়া থাকেন, উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। একথা সত্য কি মিথ্যা তাহা বিবেচ্য ও বিচার্য।

পরনিন্দা ও পরচর্চা যত সহজ এবং মুখরোচক এখন আর কিছুই নহে। বর্তমান বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদিগকে একটু পরচর্চা করিতে হইতেছে। কর্মক্ষম উপযুক্ত লোক অভাবে জমিদারি স্টেট সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে না ইহা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু বাস্তব পক্ষে সত্য সত্যই সেরূপ লোকাভাব ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। এই প্রকাণ্ড জমিদার প্লাবিত দেশে যে, জমিদারি কার্যপটু লোকের অভাব ঘটিয়াছে, একথা সহজে স্বীকার করা যায় না। সকলেই উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। প্রত্যেক কার্যেই উচ্চশিক্ষিত লোকের সমাগম দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই হইয়াছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে প্রত্যেক কার্যেই উপযুক্ত হইবে, তাহার তো প্রকৃষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ী ইউরোপীয়গণ কর্মক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিতের আদর করেন না। তাহারা স্পষ্টই বলিয়া থাকেন We don't want M. A. B. A. we want money maker এ কথার মূল্য আছে। এম এ, বি এ, হইলেই যে তিনি অর্থোপার্জনে অথবা সংসারক্ষেত্রে বিশেষ কৃতী হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইলেই যে মানুষ শিক্ষিত হয়, আর তাহা না হইলেই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, এ কথা স্বীকার করা যায় না। বর্তমান সময়ে সাধারণ ভাবে যাহাকে শিক্ষা বলা যায়, তাহা বাস্তবিক শিক্ষা কি না, এক পক্ষ এখন সেই কথাই বলিতেছেন। কতকগুলি কারণে বর্তমান উচ্চ শিক্ষাভিমানিদিগের কার্যকলাপ ও আচার ব্যবহার দেশবাসীর আতঙ্কের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অনাবশ্যক হইলেও কারণ বিশেষে এ অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে হইল।

অস্বীকার করা যায় না যে, জমিদারি সেরেস্তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যে কারণে এই সংখ্যাহীনতা তাহার কিঞ্চিৎ আভাব দেওয়া যাইতেছে।

বর্তমান উচ্চ শিক্ষিতের পক্ষে নানা কারণে জমিদারি কার্যে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অপর পক্ষে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি জমিদারি সেরেস্তায় প্রবেশ করিতেও বড় চেষ্টা করেন না। জমিদারগণ প্রত্যক্ষ ভাবে চেষ্টা করিয়াও আবশ্যক মত শিক্ষিত লোক আমদানি করিতে পারেন নাই। কেন যে উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় এদিকে আসিতে চাহেন না তাহার কারণ বুঝিয়া উঠা খুব কঠিন নহে। গবর্নমেণ্ট আফিস ও বণিক দপ্তরে নির্দিষ্ট কার্যের সময় বাঁধিয়া দেওয়া আছে, জমিদারি সেরেস্তায় সেরূপ বাঁধাবাঁধি কার্যাকাল নির্দেশ করা নাই, অপিচ জমিদারি কার্যে নির্দিষ্ট স্থান এবং ফরম বাঁধা কাজেরও অভাব আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু শিক্ষা প্রদানকালে শিক্ষার্থীদিগকে পাখীর বুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে মাত্র। স্বাধীন বুদ্ধিতে কোন কাজ করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয় না। জমিদারি কার্য বাঁধা বুলিতে চলিতে পারে না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে একই কার্য, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্থানুসরণ করিয়া লইতে হয়।

বর্তমান উচ্চ শিক্ষিতদিগের পক্ষে সেরূপ কার্য নিতান্ত বিরক্তিকর বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। তারপর শিক্ষার্থীগণ বাল্যকাল হইতে কতকগুলি পাশ্চাত্যভাব অনুসরণ করিয়া তাহা স্বভাবের সহিত এমন সংযুক্ত করিয়া লইয়াছেন যে, তৎসমুদয় পরিত্যাগ তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারি কার্যে ঐ সকল চাল চলন কোন মতেই চলিতে পারে না। উল্লিখিত কারণসমূহ জমিদারি সেরেস্তায় উচ্চ শিক্ষিতের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জমিদারগণ শিক্ষিত লোকের অভাবে যে আক্ষেপ করেন, তাহার সমাধান, উপস্থিত সময়ে হওয়া দুষ্কর। যাহাই হউক অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় ফল নাই।

উচ্চ শিক্ষিত না হইলেও, জমিদারি সেরেস্তায় উপযুক্ত কার্যক্ষম ব্যক্তির অভাব কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। এখন যে অভাবের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আংশিকভাবে সত্য হইলেও জমিদারগণ মনোযোগ করিলে, সহজেই সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারেন। যথোপযুক্ত লোকাভাবে যে জমিদারি স্টেটের অবনতি হইতেছে ইহা খুব সত্য কথা, কিন্তু আমরা লোকাভাব অপেক্ষা মনোযোগের ত্রুটিকেই ইহার প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া মনে করি। স্বেচ্ছাচারিতা, বিবেচনার অভাব এবং পক্ষপাতিতা দোষে সকল কার্য পণ্ড হইয়া যাইতেছে। স্বেচ্ছাচারী হইলে কোন কার্যে শৃঙ্খলা থাকে না, পক্ষপাতিত্বে অনুপযুক্ত লোকের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইয়া থাকে মাত্র; বিবেচনার অভাব ঘটিলে উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়া দেয়।

স্টেটে কর্মচারী নিয়োগকালে আজকাল যে পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশযোগ্য নহে। যাহার ফলে জমিদারি কার্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে স্টেটে প্রার্থী হওয়া এবং তাহাতে সাফল্য লাভ করা একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়ে। নির্বাচনক্ষেত্রে প্রশংসাপত্র বাহুল্যের প্রাবল্যে এবং সুপারিশের বলে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি দুরূহ কর্মভার অর্পিত হয়। প্রশংসাপত্রের সহিত উপযুক্ততার কি প্রমাণ থাকে তাহা কিন্তু বুঝিয়া ওঠা যায় না। অনুপযুক্ত ব্যক্তিই নিজের উপযুক্ততা প্রমাণে সচেষ্ট হইয়া থাকেন, এই সহজ কথাটি আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ জমিদারগণ যে বুঝিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য। কার্যে উপযুক্ত ব্যক্তি একাধিক প্রশংসাপত্র কোথায় পাইবে? তাহারা স্বীয় কর্মের দ্বারায় প্রশংসিত হইয়া থাকেন, প্রশংসাপত্রের প্রার্থী হওয়া তাহারা আবশ্যক মনে করেন না। ইহার উপর আবার আজকাল জামিনের তলপ আছে। নায়েবী এবং খাজাঞ্চীর পদে জামিনের আবশ্যক হইতে পারে। ম্যানেজার, মুনসী, ইনস্পেক্টর পদে জামিন দিবার বা লইবার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রধান কর্মচারীকে জামিনে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার দ্বারা কাজ আদায় করিয়া লইবার চেষ্টার মত বাতুলতা আর কি হইতে পারে জমিদারের দেওয়ান মহাশয় বিষয় কার্যে খোদ জমিদার অপেক্ষা কিছু কম বুদ্ধি রাখেন না। তবে মালিক জমিদারের কর্মচারী বহাল বরখাস্তের অধিকার সকল সময়েই আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

এখন উপযুক্ত ব্যক্তি জমিদারের নিকট সমাদর পান না—কারণ তাহার প্রশংসাপত্র অথবা সুপারিশপত্র নাই; অন্যদিকে জমিদার নিজেও উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া লইতে পারেন না, এই দুই কারণে জমিদারি স্টেটে কার্যক্ষম ব্যক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এ দোষ জমিদারের, অপরের নহে। নিজের জমিদারি পরিচালনের লোক নির্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা যদি জমিদারের না থাকে, তবে সেজন্য দায়ী হইবে কে? উপযুক্ত ব্যক্তির স্টেটে প্রবেশের পথ সরল বা দুরূহ করিয়া রাখার হাত জমিদারের নিজের হাতে। আবশ্যক মতে তিনি কর্তব্যপরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করিতে পারেন। তাহাতে কেহ বাধা দিবার নাই।

জমিদারি সেরেস্তায় প্রধান কার্যকারক নিয়োগ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে হইতেছে। সাধারণত এক্ষণে তিন শ্রেণির লোককে জমিদারি সেরেস্তার প্রধান কার্যকারক পদে নিযুক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে ১ম আইন ব্যবসায়ী (Lawyer), ২য় অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী (Retired officer) এবং তৃতীয় সুপারিশ ও প্রশংসাপত্র সংগ্রহকারী ব্যক্তি। উপরোক্ত তিন শ্রেণির কোন্ ব্যক্তির দ্বারা জমিদারি কার্য কিরূপভাবে পরিচালিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, ক্রমে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা প্রমাণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আইন ব্যবসায়ীদিগের সম্বন্ধে কথা হইতেছে যে, তাহারা উচ্চ শিক্ষিত এবং ব্যবহারশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও, দুরূহ জমিদারি কার্যে তাহাদের অভিজ্ঞতা কি পরিমাণ থাকিতে পারে তাহাই বিবেচ্য। দেখিতে পাওয়া যায়, তথা কথিত উচ্চ শিক্ষিতগণের সাংসারিক জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। স্কুল কলেজে সাংসারিক জ্ঞানের চর্চা হয় না। স্তূপীকৃত পুস্তকাবলী কণ্ঠস্থ করিবার পরই সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া কার্যে সফলতা লাভ কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। উচ্চ শিক্ষা দ্বারা কেরাণির কাজ ভালরূপে চলিতে পারে, পরন্তু জমিদারি দপ্তরে লেখাপড়ার কাজ থাকিলেও স্বাধীন বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আবশ্যকতা সর্বাপেক্ষা অধিক।

জমিদারি সেরেস্তা গবর্নমেন্টের রাজস্ব বিভাগের অংশবিশেষ। ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও গার্হস্থ্যনীতির পূর্ণ সমাবেশ আছে। এক কথায় ইহা জমিদারের সংসার পূর্ণ গৃহস্থালী। প্রজা, কর্মচারী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবাসীর অভাব পূরণ, তাহাদের অন্নের সংস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ধর্মকার্য পর্যন্ত জমিদারের সাহায্যে সম্পন্ন হইবার কথা। এই বিশাল গুরুকার্যভার সম্পন্ন করা সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য বিশেষ পারদর্শী সুচতুর কর্মক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত জমিদার সংসারে কেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না।

পুস্তকগত বিদ্যা দ্বারা সাংসারিক কার্যে সাফল্য লাভ দুরূহ ব্যাপার। যে কার্যে সর্বদা সত্য মিথ্যা, স্বার্থ ও অর্থ লইয়া অবিরত ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে, সেখানে সংসারের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান লইয়া, অজ্ঞাত জলধিরাশির ভীষণ উত্তালতরঙ্গে স্থির থাকা এবং গন্তব্য পথ স্থির রাখা কি সহজসাধ্য কার্য? এ সকল কথা তো আছেই, তারপর জমিদারি কার্যে নিযুক্ত হইয়া আইনজ্ঞ কার্যকারক যদি সর্বদা সর্বত্র আইন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই স্টেটকে হাঁফাইয়া উঠিতে হয়, অপিচ প্রজার প্রতিও কঠোর ব্যবহার হইয়া পড়ে। বেআইনী কার্য কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেক কার্যেই আইন প্রয়োগও বাঞ্ছনীয় নহে। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, যেখানে যে পরিমাণ আবশ্যক, সেই পরিমাণ আইন বিধানে কার্য করাই যুক্তিসঙ্গত। সকল দিক রক্ষা করিয়া কার্য সম্পাদন করাই সাংসারিক লোকের কার্য।

অনেক স্থানেই নাচার দুঃস্থ প্রজার খাজনা দুই চারি বৎসরও বাকি পড়িয়া যায়। জমিদার কিস্তি খেলাপের জন্য আদালত অবলম্বন করিয়া প্রজার খাজনা আদায় করিতে অধিকারী থাকিলেও, প্রজার অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলে নালিশ না করিয়া, ধীরে ধীরে প্রজার বাকি খাজনা শোধ করিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু আইনজ্ঞ ব্যক্তি স্টেটের প্রধান কার্যকারক হইলে, তাহার নিকট এ সকল বিবেচনা স্থান পাইতে পারে না। আইনত কাজ করিতে হইবে বলিয়া প্রত্যেক কিস্তি অন্তে অনাদায়ী খাজনার জন্য সমস্ত প্রজার নামেই নালিশ করা সঙ্গত হইতে পারে না। ইহা যে নিতান্ত গর্হিত কার্য তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। যে দুঃস্থ প্রজা সামান্য দেয় খাজনা বৎসরে দিতে পারে না, তাহার পক্ষে আদালত খরচা প্রভৃতি চাপাইয়া এককালে জাহান্নমে দেওয়া হয় মাত্র। পক্ষান্তরে সামান্য ১০্ টাকা বাকি খাজানা আদায়ের জন্য জমিদারকেও মোকর্দমার তদ্বির ইত্যাদির জন্য পাওনাধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আইন সঙ্গত হইলেও জমিদারের পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এরূপ মোকর্দমা করা উচিত। আইনের পথ ধরিয়া চলিলে দরিদ্র প্রজার সর্বনাশ করা হয়। প্রজা, সাধ্য পক্ষে খাজনা বাকি রাখে না, অক্ষমতা প্রযুক্ত বাকি পড়িলে তজ্জন্য প্রজা জমিদারের নিকট স্বীয় দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তামাদির ভয়ে বাকি খাজনার জন্য নালিশ করা জমিদারের আবশ্যক, কিন্তু সকল সময়ে এই বিধির অনুসরণ করাও উচিত হয় না। বিবেচনা করা উচিত যে, প্রজা দুরবস্থায় পড়িয়া খাজনা দিতে না পারিয়া বাকি রাখিয়াছে, সুযোগ পাইলে সে উহা পরিশোধ করিবে। প্রজা তামাদির হিসাব করে না, ঋণ শোধ করা আবশ্যক এ কথা তাহারা বেশ জানে। সুতরাং আইনজ্ঞ কর্মচারীগণ এই সকল কথা বিবেচনা না করিয়া আইনের বিধান অনুযায়ী সকল স্থানেই কাজ করিতে থাকিলে, প্রজার সর্বনাশ করা হয়, পক্ষান্তরে জমিদারের ভবিষ্যৎ ক্ষতির কারণ জন্মান হইয়া থাকে। সংসারের আইন, বিচারালয়ের আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, একথা সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন। তারপর জমিদারিতে নানা অবস্থার প্রজা থাকে, কোন প্রজা সহায়হীন বিধবা, কোনটি নাবালক, আবার অন্ধ আতুর প্রজা যে নাই, তাহাও নহে, এমতাবস্থায় বিশেষ বিবেচনা না করিয়া আইন মোতাবেক সকলের বাকি খাজানা আদায় করিতে গেলে, সংসারে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? জমিদার কেবল প্রজার করগ্রাহক নহেন,—তাহাদের প্রতিপালক, এবং উপদেষ্টা বন্ধুও বটেন। (Fresh) নূতন আইনজ্ঞ কর্মচারীর নিকট এ সকল কথার কোন মূল্য নাই, অধিকাংশ স্থলেই সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

জমিদারি স্টেটের উপস্থিত অবস্থা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে এমনই রক্ষা নাই, তার উপর মামলা মোকর্দমার সংখ্যা স্বেচ্ছায় বাড়াইয়া লইলে, সোনায় সোহাগার মিলন হইবে; একথা বলাই বাহুল্য।

আইন ব্যবসায়ী প্রধান কর্মচারী পদে সমাসীন হইলে, স্টেটে অযথা মামলা মোকর্দমা বৃদ্ধি পায়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহাদের সম্বন্ধে শেষ কথা হইতেছে যে, যে সকল আইন ব্যবসায়ী জমিদারি স্টেটে কার্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাহারা শৈশব হইতে যৌবনান্ত পর্যন্ত শরীর পাত এবং পিতৃ অর্থ ধ্বংস করিয়া আইন জ্ঞানের সার্টিফিকেট গ্রহণান্তর স্বাধীন জীবিকা অর্জনের জন্য আদালত গৃহের এদিক ওদিক ঘুরিয়া রিক্তহস্তে প্রত্যহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শত চেষ্টাতেও নিজ কৃতিত্বে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না এবং বহু অর্থ নষ্ট করিয়া শিক্ষা পাইয়াও নিজের উদরান্ন সংস্থান করিতে পারেন না, পেটের দায়ে স্বার্থের লোভে সেই সকল আইন ব্যবসায়ী পরিণামে জমিদারের স্বন্ধে ভর করিয়া থাকেন। যিনি স্বীয় বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান প্রভৃতি স্বাধীন ভাবে চালাইতে পারেন, তিনি কেন আইন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না? যিনি জীবনের প্রথম লক্ষ্যেই বিচ্যুত হন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিমাণ স্থির করিয়া লওয়া কঠিন হয় না।

আইন ব্যবসায়ী স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগপূর্বক জমিদারি কার্যে নিযুক্ত হইয়া, সময় সময় যে সকল বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করেন, তাহা ভদ্র সমাজে প্রকাশের যোগ্যও নহে।

সম্প্রতি রাজসাহী জেলার কোন বিখ্যাত জমিদার স্টেটে একজন আইন ব্যবসায়ী কর্মচারী যে কাণ্ড ঘটাইয়াছেন, তাহা বোধ হয়, কাহারও অজ্ঞাত নাই।

উল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য অনেকের মতে আইন ব্যবসায়ী লোককে জমিদারি স্টেটের প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, আজ কাল জমিদার মহাশয়দিগের আইন ব্যবসায়ী লোককে স্টেটের কর্ণধার করিবার আগ্রহ কিছু বেশি প্রকাশ পাইতেছে, ইহা যে পতনের আর একটি বিশেষ কারণ হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইবার আমরা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কথা বলিব। সাধারণতঃ সব জজ, ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও মুন্‌সেফগণ পেন্সন লইয়া অবসরকালে জমিদারি স্টেটে কার্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। আইন ব্যবসায়ীগণ সংসারানভিজ্ঞ হইলেও কর্মক্ষেত্রে, দেখিয়া ঠেকিয়া দুই দশ বৎসরে, কেহ কেহ অল্প সময়েও কর্মোপযোগী হইতে পারেন; কিন্তু হায়! অবসরপ্রাপ্ত অর্থলোলুপ প্রভুদিগের নিকট সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। জীবনের শেষ মুহূর্তে, মানুষের কর্মশক্তির যখন একান্ত অভাব ঘটে, উদ্যম উৎসাহ চলিয়া যায়, জড়তাপ্রযুক্ত পীড়িত হইয়া যখন দৈনিক কার্য গুজরাণ করিয়া উঠিতে পারেন না, সদাশয় গবর্নমেণ্ট সেই সময়ে পেন্সন দিয়া ইহাদিগকে কার্য হইতে বিদায় দিয়া থাকেন; গবর্নমেণ্ট স্বতঃপরত হইয়া শেষ জীবনে বিশ্রাম লাভার্থ বিদায় দিলেও প্রথমে প্রায় কোন গবর্নমেণ্ট কর্মচারী এক কথায় অবসর গ্রহণ করিতে চাহেন না। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া স্বীয় কর্মশক্তি সপ্রমাণ করিয়া, কার্যকাল বৃদ্ধি করিয়া লইয়া থাকেন। অনেকে এইরূপে দুই তিন বার কার্যকাল বাড়াইয়া লইবার পর, গবর্নমেণ্ট যখন কোন মতেই আর কার্যে রাখেন না, সেই সময়ে ইহারা পেন্সন লইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

এই বৃদ্ধ বয়সে যখন সর্বদা আত্মবিস্মৃতি, আলস্য, জড়তা ইত্যাদি উপস্থিত হয়, সর্বদা কি হয়, কি হয় চিন্তায় ভয়, আশঙ্কা ও উদ্বিগ্নে চিত্ত উদ্বেলিত হইতে থাকে, সেই চরম সময়েও যাহারা অর্থলোভে কর্মপ্রার্থী হইয়া পরের কাছে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকেন, তখন সে অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া সাধারণের মনে যে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কেবল কাঞ্চনের লোভেই যে এরূপ করা হয়, তাহা বুঝিতে কি আর বাকি থাকে? এই সকল জড়স্থবিরকে কার্য ভার প্রদান করিলে, সে কার্য কিরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা বুঝিযা লওয়া কঠিন নহে। ইহাদিগকে অবস্থা বিশেষে অকর্মণ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কোন স্টেটের কর্তৃত্ব পাইলে সেই স্টেটের সরঞ্জামী (Establishment) খরচ এত বৃদ্ধি পায় যে, স্টেটের পক্ষে তাহা অসহনীয় হইয়া পড়ে। পাঁচখানি তক্তপোষে যে কার্য চলিত, সেখানে ৫০ খানি চেয়ার, ২০ খানি টেবিল না হইলে কাজ চলে না। রং বেরংয়ের ফিতা, হরকছম খাতা ও ফাইল না হইলে জমিদারি যেন উড়িয়া যায়, এইত গেল সাধারণ কথা;—তার পর ঘণ্টা হিসাব ধরিয়া কর্তব্য শেষ হওয়ার প্রথা প্রচলিত করায়, প্রজা সাধারণের পক্ষে আবেদন নিবেদনের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। সময় বিশেষে রিপোর্টের ফাইল যাতায়াত করিতে করিতে দরিদ্র প্রজার শস্য জমিতে মাটি হইয়া যায়। প্রকৃতি তো তাহাদের হুকুমে অথবা নিয়মাবদ্ধে (System) বসিয়া থাকিবে না? এইরূপ বিসদৃশ ঘটনাবলী দ্বারা স্টেটের এবং প্রজার উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইয়া থাকে।

একদিক দিয়া এরূপ নিয়োগ ব্যবস্থায় প্রজা ও জমিদারের ক্ষতির কারণ হয়, অন্য

দিকে সমাজের প্রতিও ততোধিক উপেক্ষা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহারা গবর্নমেণ্টের পেন্সন ভোগী, তাহারা দাসত্ব দ্বারা আজীবন অর্থোপার্জন করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং শেষে বৃত্তিভোগী হইয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহাদের উপর অত্যধিক অনুগ্রহ বর্ষণ করিবার আবশ্যকতা সমাজরক্ষক জমিদারদিগের কিছুমাত্র দেখা যায় না। সকল দিক দিয়া একই ব্যক্তির উপর অত্যধিক দয়া প্রকাশ অন্যান্য প্রার্থীর প্রতি অবিচারের কারণ হয়। বিশেষতঃ জমিদারি সেরাস্তায় নিযুক্ত দীর্ঘকালের কর্মচারীদিগের প্রতি এতদ্দ্বারা নিতান্ত নিগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এ সকল কথা কি বিবেচনা সাপেক্ষ নহে? ইহাই কি বিচার?

আর এক কথা বলিতে হইতেছে। যখন কোন ব্যক্তিকে, তিনি উপযুক্তই হউন, কি অনুপযুক্তই হউন, যাহাকে বয়োবৃদ্ধ এবং কার্যে অশক্ত জ্ঞানে, অন্য কার্য হইতে অবসর প্রদান করেন, তাহার পর সেই ব্যক্তিকে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করা বুদ্ধিমান এবং বিবেচকের কার্য কি না, এই কথাটি ভাবিয়া দেখিতে জমিদার মহাশয়গণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। এসম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলিতে ইচ্ছা নাই।

উপরে দুই প্রকার কর্মপ্রার্থীর কথা বলা হইয়াছে, এখন আর এক শ্রেণির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। দেশে এখন গুণের আদর কমিয়াছে, চাটুকারিতার প্রসার বাড়িয়াছে। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তোষামোদপ্রিয় হইয়াছেন। প্রত্যেক কার্যে এখন সার্টিফিকেট আবশ্যক হইতেছে, কর্মের প্রশংসা অনাদৃত হইলেও, খোষামোদের দল পুঞ্জিকৃত উচ্চ প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতঃ জমিদারদিগকে প্রতারিত করিয়া, উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম পূর্বক জমিদারি কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। প্রশংসাপত্রদাতাগণ অনেক স্থলে প্রশংসিত ব্যক্তিকে না দেখিয়াও তাহার রূপ গুণের অশেষবিধ গুণপণার কথা লিখিয়া দিয়া থাকেন; একথা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই। যাহাই হউক, সার্টিফিকেট সংগ্রহকারীদিগের আর কোন বিশেষ গুণ না থাকিলেও, তাহাদের পরের মনস্তুষ্টি করিবার শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই সকল ব্যক্তি যে সকল স্টেটে প্রধান কার্যকারক পদে নিয়োজিত হইয়া থাকেন, অচিরেই যে তৎসমুদয় স্টেটের অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া পড়ে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে এখন বিরল নহে।

জমিদারগণ জানিয়া শুনিয়া কেন যে, এইরূপ অপদার্থ লোককে গুরুতর কার্যভার প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। যে স্টেটে এই সকল চাটুকার ধূর্তের প্রাধান্য হয়, সেখানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদের প্রাধান্যের প্রথম কার্য "আত্মকলহ" সৃষ্টি করা। আত্মীয় বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদিগকে দূরে সরাইয়া রাখা প্রভুদিগের অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়ে। নচেৎ স্বকার্য সাধনে বাধা জন্মিতে পারে—সর্বদা তাহাদের এই আশঙ্কা। তারপর প্রাচীন হিতাকাঙ্ক্ষী কর্মচারীদিগের অপসারণ করিয়া সেই সকল পদে প্রভুর পোঁ ধরা দলের পুষ্টি সাধন করা অন্যতম কার্য। বহুকালের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর, ভোগ উত্তর পীরপাল প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া এবং আশ্রিত দুঃস্থ আত্মীয় বা প্রাচীন হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের মাসিক ভাতা উঠাইয়া দিয়া স্টেটের আয় বৃদ্ধি দেখাইবার আকাঙ্ক্ষা এই প্রভুদিগের অত্যন্ত বলবতী। দেবসেবা, অতিথি সৎকারে হস্তক্ষেপ শীঘ্র না হইলেও তাহার ব্যয় সঙ্কোচ করিতে ইহারা কিছুমাত্র ইতঃস্তত করেন না। নিন্দা বা দোষ কীর্তন হইলেও এই সত্য কথাগুলি না বলিয়া থাকা যায় না।

এই সমস্ত আলোচনা বিস্তৃতভাবে করিতে গেলে অনেকের নিকট ইহা বিরক্তিজনক হইবে এজন্য সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য শেষ করা গেল। অসঙ্গত এবং অন্যায় কার্যগুলি প্রকাশ করাই কর্তব্য বিবেচিত হইয়াছে ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভরসা করি এদিকে সকলেরই কর্তব্য দৃষ্টি পড়িবে।

বাঙ্গলার জমিদারের বর্তমান অবস্থা দেশবাসীর নিকট অপ্রকাশ নাই; তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্যের হিসাবও দেশবাসীর নিকট আছে। সুতরাং তাহাদের অতীত এবং বর্তমান ব্যবহার প্রণালীর কথা গোপন রাখা সম্ভবপর নহে। যে সকল স্টেটে দশ বৎসর পূর্বে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা বাহিরের কাজে খরচ হইত না, এখন সেই স্টেটেই লক্ষ টাকা নানা বাজে কাজে ব্যয়িত হইতেছে। যদিও দেশ বা দশের হিতার্থে অর্থব্যয় করা জমিদারের অবশ্য কর্তব্য কার্য, কিন্তু হঠাৎ অর্থ-সংখ্যা সহস্র হইতে লক্ষে পরিণত হওয়া কি অস্বাভাবিক নহে? "ভাল্লুকের হাতে খন্তা" দিবার ন্যায় যার তার হাতে স্টেটের গুরুভার ন্যস্ত করার ফলে এই সমস্ত অবিবেচনার কার্য ঘটিয়া থাকে। অনভিজ্ঞ ও অনুপযুক্ত ব্যক্তি নবাবী চাল চালিয়া এবং গৌরীসেনের অর্থের ন্যায় প্রভুর অর্থ যথাতথা দান করিয়া নিজের কর্তব্য এবং উপযুক্ততার প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইবেন ইহা কিছু আশ্চর্যের কথা নহে; তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবারও কিছু নাই। তবে জমিদারদিগের কার্য কারণ দেখিয়া যুগপৎ হাসি কান্না উপস্থিত হয়। আমাদের আদর্শ জমিদারগণ এমন মতিচ্ছন্ন ও মোহান্ধ যে, মায়াবীগণ তাহাদিগকে ভেল্‌কী দেখাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছে, নাচাইতেছে তাহা কোন মতেই তাহারা বুঝিতে পারেন না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? এখনও কি জমিদারদিগের এদিকে জ্ঞানদৃষ্টি পতিত হইবে না?

জমিদারির অবনতি পথ বন্ধ করিতে হইলে সত্বর সতর্ক হওয়া কর্তব্য। গুণের আদর, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, স্বীয় অবস্থার অনুরূপ ব্যয়ের হিসাব স্থির করিয়া চলা এবং পিতৃপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত কার্যাদির অনুসরণ করা জমিদারদিগের অবশ্যকর্তব্য। জমিদারি বংশানুক্রমকি অপরিবর্তনীয় বস্তু বলিয়া সুমেরুর ন্যায় অটল অচল পদার্থ নহে। উপেক্ষায় সুখের মুলোচ্ছেদ কখনই প্রশংসার কথা নহে। জমিদারি যাহাতে অব্যাহত থাকে, কোনরূপে কোন দিক দিয়া ক্ষতি না হয় সেইরূপ বন্দোবস্তে ব্যয় নির্ধারণ করা উচিত। জমিদারি বালকের খেলনা অথবা অসমাদরের বস্তু নহে। অনুরোধে উপরোধে অথবা মিথ্যা তোষামোদে মুগ্ধ হইয়া জমিদারির কার্যভার অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর অর্পণ করা অনুচিত। এ কথা সর্বদা মনে থাকা কর্তব্য।

জমিদারি সেরেস্তার প্রধান কার্যকারক যেমন অভিজ্ঞ হওয়া চাই, তেমনি জাতিকুলেও উন্নত হওয়া উচিত। জমিদার বংশোদ্ভব ব্যক্তির দ্বারা এই-কার্য সর্বাপেক্ষা ভাল চলিতে পারে। যাহারা আবাল্য প্রজা দেখিয়া আসিতেছে, প্রজার সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহারা যে জমিদারি কার্যে বিশেষ পটু হইবে তাহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি?

যে কোন দিন জমিদারি জানে না, প্রজা কি চেনে না, প্রজার সহিত কখন ব্যবহার করে নাই, তাহার পক্ষে কোন স্টেট পরিচালন কখনই সহজসাধ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ তাহাদের হাতে স্টেটের কর্তৃত্বভার দিলে প্রজার যে কি দুর্দশা ঘটে, তাহাদের প্রভুত্বের তাড়নায় অধীনস্থ ব্যক্তির যে কি ভীষণ কষ্ট হয়, তাহাও বিবেচ্য।

প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহে পালন ও শাসন করিতে হয়, উপদেশ দিয়া অন্যান্য পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হয়। প্রজার সুখ দুঃখ বুঝিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারে যত্নবান হওয়া সহৃদয় প্রজাপালক জমিদারের কর্তব্য। এইজন্য জমিদারির উচ্চ পদে লোক

নিযুক্ত করিবার সময়ে তাহার জাতি কুল ও বংশের বিচার করা উচিত। ক্ষুদ্রের নিকট বৃহৎ আশা দুরাশা মাত্র। গবর্নমেন্ট পর্যন্ত জাতি কুল এবং বংশের পরিচয় লইয়া লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু আজ কাল জমিদারগণ সে পথে যাইতেছেন না। উচ্চ ভাবাপন্ন না হইলে মানুষ কর্তব্যপ্রিয় হইতে পারে না এবং কর্তব্যপ্রিয় না হইলে মানুষ দশের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিশাইয়া চলিতে পারে না। সংসার শুধু আত্মসুখ ভোগের স্থান নহে। এখানে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ না করিলে দশের উপর প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়া চলা কঠিন।

এই সমস্ত কারণে মাননীয় জমিদার মহোদয়দিগকে ভবিষ্যতে বিশেষ বিবেচনা পূর্বক কর্মচারী মনোনয়ন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। উপযুক্ত ব্যক্তির আদরে সকলে সন্তুষ্ট হইয়াই থাকে। অনুপযুক্ত ব্যক্তির আদর কখনোই সুখকর হয় না, একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

ন্যায়তঃ ধর্মতঃ দুঃস্থ জমিদারদিগকেই জমিদারির প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত করা উচিত। এরূপ ব্যবস্থায় অনেক উপকার হইতে পারে। এক দিকে স্বসমাজস্থ দুর্ভাগ্য ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হইবে, অন্য দিকে জমিদারি এবং প্রজার মর্ম অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে। পরন্তু স্টেটের পক্ষে এরূপ কার্যকারক নিযুক্তিতে তাহার বহু সুবিধা ঘটিবে একথা বলাই বাহুল্য। পুত্রহীন ব্যক্তি যেমন সন্তানের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি জমিদারি এবং প্রজার মর্মও বুঝিতে পারে না, সুতরাং এরূপ বিষয় সম্পত্তিশূন্য ব্যক্তির প্রতি স্টেটের দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার অর্পণ কখনই মঙ্গলজনক হইতে পারে না। এই সামান্য কথা বুঝাইবার জন্য অধিক চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

জমিদার সম্প্রদায় বঙ্গদেশের মেরুদণ্ড হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি অত্যন্ত কম। স্ব স্ব প্রাধান্য এই প্রবল শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অতীতের অশিক্ষার যুগে, যে পরিমাণ একতা, একপ্রাণতা ছিল, আজ এই সুশিক্ষার যুগে তাহাও দেখা যাইতেছে না। ইহা জমিদারদিগের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে একথা স্পষ্ট বলিলে কোন দোষের হয় না। সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং সম্মান বোধ না থাকায় জমিদারের অবনতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। কালের কুটিল চক্রে অনেক প্রাচীন জমিদার নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে, কিন্তু সেদিকে কখন কোন জমিদারকে সামান্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতেও দেখা যায় না।

আপনার ভাল পাগলেও বোঝে, সামান্য কুলিদিগের সাম্প্রদায়িক আত্মসম্মান বোধ আছে, সেইটুকু রক্ষা করিবার জন্য সময় বিশেষে তাহারা নিত্য অন্ন সংস্থানের কার্যও বন্ধ রাখিয়া থাকে, কিন্তু দেশের শ্রেষ্ঠ গৌরব জমিদারদিগের তাহার একাংশও নাই। জমিদারগণ গবর্নমেন্টের মন্ত্রী সভায় মন্ত্রণা দেন, শাসন পরিষদের সভ্য হন, সামাজিক কার্যে মাতব্বরী করিতে যান, এত জটিল মন্ত্রণায় তাহাদের বুদ্ধি খেলে, আর স্বসমাজের সামান্য কার্যে চোখ পড়ে না ইহাই আশ্চর্য। ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র বলিয়া স্বীয় সমাজের ছোট ছোট জমিদারকে উপেক্ষা করা কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক? ভাইয়ের দীনতা, তাহার ভিক্ষা যদি আর এক ভাইয়ের লজ্জা এবং দুঃখের কারণ না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, একতা, ভ্রাতৃভাব, সম্প্রদায় প্রভৃতি শব্দ কেবল ভাষার অলঙ্কার মাত্র, ফলতঃ তাহার কোন মূল্য নাই।

বঙ্গদেশে দুঃস্থ জমিদারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হইয়াছে এবং ক্রমে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধিই পাইতেছে। এই সকল হতভাগ্য পরিবারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রধান জমিদারগণের অবশ্যকর্তব্য। বঙ্গদেশে নানা ভাবে বহু সম্প্রদায় বর্তমান রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই সাম্প্রদায়িক একটা সহানুভূতি আছে। দুঃস্থ ব্যক্তির জীবিকার্জনের পথ সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন জমিদার কোন কারণে অবস্থাহীন হইলে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। গবর্নমেণ্ট জমিদারের নিকট সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা ষোল আনা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যস্থতায় সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া লয়েন, কিন্তু বিপদ্‌কালে এই উপকারী হিতকামী সম্প্রদায়ের প্রতি কোন প্রকার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না। কিছুদিন পূর্বে দুঃস্থ জমিদারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশক কয়েকটি নির্দিষ্ট কার্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল, কালক্রমে ও দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন সে পথও বন্ধ করা হইয়াছে। রাজানুগ্রহের আর কোন আশা নাই, তবে এখন একমাত্র ভরসা বর্তমান জমিদারগণ। কিন্তু সে আশাও দুরাশা। দরিদ্রতা ভ্রাতৃভাবের অভাব ঘটাইয়াছে। সৌভাগ্যবস্থায় যে সম্মানিত ছিল, আদরের ছিল, দুর্ভাগ্যের সময়ে তাহাকে সেই অনুপাতে উপেক্ষা করা হইতেছে।

জমিদার সন্তানগণ বাল্যাবধি অন্য কোন কার্য শিক্ষা করে না, শিক্ষার সুযোগও পায় না; কাজেই অবস্থান্তর কালে সংসারে অস্তিত্ব রক্ষা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। উহারা না পারে ব্যবসা করিতে, না পারে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিতে, না পারে দাসত্ববৃত্তির পথে যাইতে। তাহাদের জ্ঞান কেবল জমিদারি কার্যে সীমাবদ্ধ; যদি অদৃষ্টক্রমে কেহ সেরূপ সুযোগ পায়, তবে দুঃখে কষ্টে যেমন করিয়া হউক সংসার চালাইয়া লয়। সকলের ভাগ্যে সেরূপ সুযোগ ঘটে না। যাহারা এই অবস্থায় পড়ে তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হয়, ইহা সকলেরই চোখে পড়ে, জমিদারেরাও দেখেন, জানেন কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার টান না থাকায় সে দৃষ্টিতে কোন ফল হয় না, বরং বিদ্রূপ কটাক্ষে, উপেক্ষায় তাহাকে আরও মর্মাহত করা হয়। এমন নিষ্ঠুর নির্মম ব্যবহার কখনই মনুষ্যোচিত নহে।

পূর্বকথিত কারণ পরম্পরায় জমিদার সম্প্রদায়ের কর্তব্যদৃষ্টি দুঃস্থ স্ব সমাজের প্রতি পতিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই জমিদারগণ স্ব সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন, আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারেন। এ কার্যে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতির কারণ কিছুই নাই। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ যাহা করা কর্তব্য, যদি তাহা নিজের কোন ক্ষতি না করিয়া সম্পন্ন করা যায়, তবে তাহা না করাই দোষের। অতঃপর জমিদারি সেরেস্তায় দুঃস্থ জমিদাববংশের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

সমাজ এবং সম্প্রদায়ের নিকট মানুষ অনেক আশা রাখে। সম্পদ্‌কালে বন্ধুর অভাব হয় না, বিপদ্‌কালে আপন পর হইয়া যায়। সাম্প্রদায়িক সম্মান জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট দুঃস্থ দরিদ্র আত্মীয় কখনই উপেক্ষিত হয় না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় জমিদারগণ অবশ্যই স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রতি অধিক কৃপা প্রদর্শন করিবেন এ আশা করা এই উন্নতির যুগে কখনই অসঙ্গত হয় না।

ক্রম বিভাগ

জমিদারের অবনতির যতগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে ক্রম বিভাগ বিধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রম বিভাগ ব্যবস্থা আইনসম্মত হইলেও জমিদারের অবস্থা এই বিধানের ফলে ক্রমেই হীন হইয়া পড়িতেছে এ কথা বলাই বাহুল্য। এখন বৃহৎ জমিদারি স্টেট আর দেখা যাইতেছে না। প্রায় সমস্ত বৃহৎ জমিদারিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। নড়াইল রায় বাবুদিগের জমিদারি, টাকির মুন্সী বাবুদিগের জমিদারি, শোভাবাজার রাজস্টেট, বিখ্যাত ঠাকুর স্টেট প্রভৃতি বৃহৎ জমিদারি এই ক্রম বিভাগ বিধানের ফলে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ঐ সকল প্রসিদ্ধ জমিদারি ব্যতীতও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের সহস্র সহস্র জমিদারি কোথাও পরমাণুতে পরিণত হইয়াছে, কোথাও বা এককালে বিলোপ হইয়া গিয়াছে এ সংবাদ কাহারও অবিদিত নহে।

গবর্নমেণ্টের রেভিনিউ বোর্ডের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, প্রতি বৎসর তিনশত বা ততোধিক নম্বর জমিদারি বিভক্তের মোকর্দমা বিচারালয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত কালেক্টরিতে যে প্রতি বৎসর সহস্রাধিক হিসাব পৃথক করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই মারাত্মক বিধান জমিদারের শোচনীয় পরিণাম ঘটাইতেছে।

যদিও গবর্নমেণ্ট এদেশের ধর্মানুশাসনের অনুবর্তী হইয়া বৈষয়িক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মতে দায়াধিকার প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু তাহা যে দেশের পাত্র এবং কালানুমোদিত হয় নাই, বিশেষতঃ তদ্দ্বারা দেশের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের উপকার না হইয়া অপকারই হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায়। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি জাতির বাস। মুসলমানের ফারাজ এবং হিন্দুর দায়ভাগ উত্তরাধিকার বিধি এসম্বন্ধে যে অনুশাসন দিয়াছে তাহা অবশ্য গ্রহণীয় এবং পালনীয় হইলেও দেশের বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার্থ উহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন নিবর্তন করিয়া লওয়া প্রথমেই কর্তব্য ছিল। হিন্দু জাতির উত্তরাধিকার আইন জীমূত বাহনের দায়ভাগ মতে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলে চলিতেছে, বঙ্গদেশের কতক অংশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাজ্ঞবল্কের মিতাক্ষরার অনুশাসনের মতে উত্তরাধিকার ও স্বত্বাধিকার নির্ণীত হইতেছে। মুসলমান জাতির কোন ভিন্ন ব্যবস্থা নাই, তাহারা একমাত্র ফারাজ অনুসারেই বিষয় বিভক্ত করিয়া লইতেছেন।

ইউরোপের সাধারণ অধিবাসী এবং আভিজাত্যের বৈষয়িক আইন সম্পূর্ণ পৃথক। সে দেশে অভিজাত বংশে বিষয় সম্পত্তি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠাধিকার বিধির দ্বারা এই ধ্বংসকর ব্যবস্থার গতিরুদ্ধ করা আছে। ইংরেজ আমাদের রাজা, ইংলণ্ডের নীতি এখন আমাদের আদর্শ, আমাদের অনেক আইন এখন ইংলণ্ডের নজির অনুসরণ করিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের আভিজাত্যের রক্ষার্থ

ইউরোপের কোন বিধান গ্রহণ করা হইতেছে না। কিছুদিন পূর্বে এদেশে এক প্রকার জ্যেষ্ঠাধিকার বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা দেশের যে বিশেষ কিছু উপকার হইতে পারে তাহা মনে হয় না, কারণ তাহা কার্যে পরিণত করিতে যাওয়া সকল সময়ে সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে, সুতরাং সে আইনের দ্বারা আভিজাত্যের কোন উপকার হইবার প্রত্যাশা নাই। ক্রম বিভাগের দ্বারা যে কেবল বাঙ্গালার জমিদারের অস্তিত্বই লোপ পাইতেছে তাহাই নহে, জমিদারির পতনের সহিত দেশের বহু দুর্দশা উপস্থিত হইতেছে। ক্রম বিভাগের কল্যাণে বঙ্গ জমিদারের অবস্থা এমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, সে নিজেই আত্মরক্ষায় অপারগ। দেশ এবং দশের প্রতি তাহার যথেষ্ট কর্তব্যবোধ থাকিলেও, সে তাহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। জমিদার এতদিন পল্লী সমূহের পানীয়ের অভাব পূরণার্থ জলাশয় প্রদান করিয়াছেন, পল্লীতে শিক্ষার বিস্তার, পীড়িতের চিকিৎসার ব্যবস্থা, এবং বিপন্নদেশবাসীকে নানাভাবে সাহায্য দিয়া তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে দৈবদুর্বিপাকে উৎপীড়িত দেশবাসীর দুঃখকাহিনী প্রকাশের জন্য, মিলিতভাবে জনসঙ্ঘের ক্রন্দন আবশ্যক হয় নাই, অভাব অভিযোগের প্রতিকার কল্পে আবশ্যকীয় অর্থের জন্য ভিক্ষার ঝুলি বহিতে হয় নাই, জমিদার স্বীয় বাসস্থানের নিকটবর্তী স্থানের সমুদয় অভাব নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়া, যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিয়াছেন; কিন্তু এখন কি ঘটিয়াছে? সামান্য একটি জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারের জন্য সভা সমিতি করিতে হইতেছে, জগতের কাছে নিজেদের দৈন্যতা জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষাং দেহি বলিয়া দীন ভাবে হাত পাতিতে হইতেছে, গবর্নমেন্টের নিকট নানাভাবে অভাব পূরণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া উত্ত্যক্ত করা হইতেছে, ইহা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গবাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই লজ্জার কথা। গবর্নমেণ্টকেও এজন্য যে বিব্রত হইতে না হইতেছে তাহাও নহে। জমিদারগণ যদি পূর্ববৎ ভাল অবস্থায় থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি আজ দেশবাসীকে এমন করিয়া নির্লজ্জ ভাবে জগতের সম্মুখে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইত? দেশের বর্তমান দুর্দশা যে, বাঙ্গলার জমিদারের অবনতির সহিত উপস্থিত হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য।

শুধু ইহাই নহে, এই ক্রম বিভাগের ফলে দেশের উন্নতি পথেও যথেষ্ট বাধা জন্মিয়াছে। কিঞ্চিৎ পৈতৃক বিষয়ের আশায় জমিদারদিগের বংশধরগণ নিষ্কর্মা হইয়া যাইতেছেন। দেশে কর্মহীন লোক সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, কখনই ইহা মঙ্গলজনক হইতেছে না। জমিদারপুত্রগণ বিষয় সম্পত্তির অংশের আশায নিজেকে সংসারের জড় পদার্থে পরিণত করিয়াছেন, জগতে তাহাদের যে কিছু কর্ম আছে, তাহারা যে দেশেরই মানুষ, দেশ যে তাহাদের কাছে কিছু আশা রাখে, সমাজ যে তাহাদের ভরসা করে, এ সকল কথা কদাপি তাহাদের মনে স্থান পায় না। কোন কার্যে মনোযোগ ত দেওয়াই হয় না, পরন্তু একটা প্রকাণ্ড ভূসম্পত্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ধ্বংস করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কে এমন ভাবে পুষ্টি লাভ করিতে থাকে যে, পরিণামে তাহা হইতে বহুবিধ বীভৎস অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়া সংসারে মহা অশান্তি উৎপাদন করিয়া তুলিতেছে। যতক্ষণ না তাহাদের সঞ্চিত চিন্তাগুলি সংসারকে ভাঙিয়া চুরমার করিতে না পারে, ততদিন তাহারা কোন মতেই যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না।

যাঁহারা অভাবগ্রস্ত তাহারা তো নিজেকে লইয়াই বিব্রত, উদারান্ন সংস্থানেই সর্বদা ব্যস্ত, তাহারা দেশ বা দশের জন্য কখন কি করিবে? তাহাদের কাছে দেশবাসী বিশেষ কিছু আশাও করিতে পারে না। যাহারা ধনী, অর্থশালী সর্বদা উদরান্নের জন্য যাহাদিগকে চিন্তা করিতে হয় না, তাহারা ইচ্ছা করিলে সামান্য চেষ্টাতেই অনেক কিছু করিতে পারেন, কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র; কারণ যাহারা ভাঙিবার জন্যই ব্যস্ত, বৃহৎকে ক্ষুদ্র করিতে সর্বদা চেষ্টিত, তাহাদের নিকট দেশের আশা বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্রম বিভাগ পদ্ধতি এইরূপে দেশের উন্নতির অন্তরায়ে দাঁড়াইয়া সকল দিকে বিশৃঙ্খলা আনিতেছে।

যে বিধানের ফলে দেশের প্রত্যেক কার্যে এইরূপ ক্ষতি হইতেছে, সে বিধানের পরিবর্তন যে একান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। জমিদার নিজে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলেই হইবে না, পরন্তু গবর্নমেন্টকেও জমিদারগণের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। নচেৎ তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণাম দেশের পক্ষে আশানুরূপ মঙ্গলজনক হইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে কেবল দেশবাসীরই উপকার হইয়াছে, তাহাও নহে—এতদ্দ্বারা গবর্নমেন্টেরও যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। গবর্নমেন্ট রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থার আশাতেই এই বন্দোবস্ত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং জমিদারের স্থায়ীত্বের চেষ্টায় বিরত থাকা কাহারই সঙ্গত নহে।

জমিদারপ্লাবিত বঙ্গদেশের পল্লীসমূহ জমিদারগণের সুব্যবস্থায় আনন্দ মুখরিত ছিল। আজ জমিদারদিগের অধঃপতনের সহিত বঙ্গপল্লীর সুখসূর্য ধীরে ধীরে অস্তাচলে গমন করিতেছে। যদি দেশকে রক্ষা করা, দশের শান্তি প্রদান এবং জনসাধারণের উন্নতি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার জমিদারের উন্নতি চেষ্টা সর্বপ্রথম আবশ্যক। বুনিয়াদ মজবুত না রাখিতে পারিলে উপরিস্থ চাকচিক্য রক্ষার সাময়িক ব্যবস্থায় দেশের কোনই উপ্পকার হইবে না।

জমিদারগণের অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম উপায় ক্রম বিভাগ পদ্ধতির বিলোপ সাধন। অবশ্য এ পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বহু তর্ক এবং আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। দেশবাসীর প্রথম এবং প্রধান আপত্তি যে, দেশের প্রচলিত দায়ভাগ বা ফারাজের মত উপেক্ষা করা ধর্ম এবং ন্যায় বিরুদ্ধ হইবে, দ্বিতীয়তঃ ন্যায্য স্বত্বাধিকার ত্যাগে সাধারণের সম্মতি সহজে পাওয়া যাইবে না। ইহা স্বীকার্য হইলেও দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থার পরিবর্তন যে আবশ্যক ইহাও ত অস্বীকার্য হইতে পারে না।

উল্লিখিত প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে তর্কের মীমাংসা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে দেশকালপাত্র ভেদে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান মিত্ররাজগণের উত্তরাধিকার বিধান সাধারণ দায়াধিকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন মিত্ররাজগণের বিষয় সম্পত্তিতে অন্যান্য পুত্রগণের কোন অধিকার নাই। স্টেটের অবস্থানুসারে অন্যান্য পুত্রগণ সাধারণ ভাবে ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী মাত্র। বাঙ্গলার জমিদারের অবস্থা অধিকাংশ করদ মিত্ররাজের অপেক্ষা উন্নত। মিত্ররাজগণের বার্ষিক আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি; বিশেষতঃ তাহাদের অস্তিত্বের উপর দেশের সর্বসাধারণের বিশেষ কিছু নির্ভর করে না। বাঙ্গলার জমিদার স্বাধীনতা হীন হইলেও গবর্নমেন্টের সহিত সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতায় মিত্ররাজগণ অপেক্ষা কোন অংশেই অনাদরনীয় নহেন। সুতরাং মিত্ররাজগণের ন্যায় বাঙ্গলার জমিদারের উত্তরাধিকার আইন বিধিবদ্ধ হওয়া ন্যায়সঙ্গত। দায়ভাগ অথবা ফারাজ অনুসারে পূর্বে যে আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণের প্রতি প্রযুজ্য রাখিয়া আভিজাত্যের জন্য পৃথকভাবে জ্যেষ্ঠাধিকার আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দিলে দেশের এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। হিন্দু মিত্ররাজগণ যদি দায়ভাগের অথবা মুসলমান নরপতিগণ ফারাজের নিয়ম না রাখিয়া জ্যেষ্ঠাধিকার আইন প্রচলিত করিয়া লওয়ায় কোন দোষের কারণ না হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গলার জমিদার সে বিধানের প্রবর্তন কিরলেই বা এমন বিশেষ কি অন্যায় কার্য হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

যাহারা উত্তরাধিকার বিধানকে ধর্মের অংশ জ্ঞানে উহার কোন পরিবর্তনে আপত্তি করিবেন, তাহারা পৃথিবীর স্বাধীন এবং করদ রাজগণের এতাদৃশ ব্যবস্থাকে কি অব্যবস্থা ও অধর্মজনক কার্য বলিতে চাহেন? কখনই তাহা বলা যাইতে পারে না। রাজা ও রাজ্যের সহিত, প্রজা এবং কর্ষিত ভূমির ব্যবস্থা কখনই একরূপ হইতে পারে না। আবাহমান কাল হইতে জগতের সর্বত্র এই বিসদৃশ বিধান চলিয়া আসিতেছে। সমষ্টি শক্তি, যাহার উপর দেশ এবং দশের অস্তিত্ব ও সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তাহার ধ্বংস ব্যবস্থা কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। সুতরাং বাঙ্গলার জমিদারের উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন ধর্ম ও ন্যায় বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আর এক কথা, হিন্দুশাস্ত্রের বিধান সম্যক্‌রূপ মানিতে গেলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পিতৃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায্য মালিক বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জ্যেষ্ঠ পুত্রের পর অপরাপর পুত্রগণ কামজ পুত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রকে সম্পত্তির মালিক বলিয়া স্বীকার করিলে শাস্ত্র বাক্য অমান্য করাই হয়।

পূর্ব প্রচলিত বিধানের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অনেক ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী আপত্তি করিতে পারেন। প্রচলিত বিধান অনুসারে তাহাদের আপত্তি করিবার আইনসঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু যাহারা আপত্তিকারী তাহারা যদি একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন যে, যদি পূর্ব হইতে জমিদারের উপর জ্যেষ্ঠাধিকার আইন বিধিবদ্ধ হইয়া আসিত, তাহা হইলে আজ তাহাদের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারিত? বিবেচনার ত্রুটিতে অথবা ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাবে যদি একটা ভুল হইয়া থাকে, তবে কি তাহা সংশোধন হওয়া উচিত নহে? এরূপ পরিবর্তন নিত্যই হইতেছে। জমিদার এবং প্রজার স্বত্বাধিকার ক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে কি জমিদারের স্বত্বের কোন ব্যাঘাৎ হয় নাই? যদি তাহাতে সকলে মৌনসম্মতি দিয়া থাকেন, তবে এ ব্যবস্থাই বা স্বীকৃত হইতে কি বাধা আছে। বাস্তব পক্ষে দেশ ও সমাজের কল্যাণার্থ আভিজাত্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের আবশ্যকতা আছেই, সুতরাং তাহার রক্ষা কল্পে যাহা কিছু করা আবশ্যক তাহাতে আপত্তি উপস্থিত হইলেও সে আপত্তিকে উপেক্ষা করাই সঙ্গত মনে করা যায়।

উত্তরাধিকারীদিগের আপত্তি আইনসঙ্গত হইলেও তাহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া লইয়া, সেই জীবন কোন মতে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তারপর যে বংশধর থাকিবে, তাহার পক্ষে ঐ বিষয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা

সম্ভবপর হইবে কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা কি তাহাদের উচিত নহে? সমাজ বা দেশের চিন্তা বর্তমান লইয়া চলিতে পারে না—ভবিষ্যতের অবস্থা বিবেচনা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ জমিদারি ক্রম বিভাগের বিরুদ্ধে মত প্রদান করিবেন ইহা বলাই বাহুল্য। সামান্য স্বার্থের জন্য ন্যায় কখনই উপেক্ষিত হইতে পারে না।

ইংরেজ শাসনের প্রাক্কালে যখন দেশে আইন ব্যবস্থা সমুদয় ক্রমে প্রচলিত হইতেছিল, সেই সময়ে যদি জমিদারদিগের বিষয় সম্পত্তি ক্রম বিভাগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া জ্যেষ্ঠাধিকার বিধানের অন্তঃর্গত হইত; তাহা হইলে বর্তমান সময়ের উত্তরাধিকারীদিগের নিশ্চয়ই আপত্তির কোন কারণ থাকিত না। উত্তরাধিকার আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া লইলে উপস্থিত একটা আপত্তি উত্থাপিত হইবে সত্য, কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিলে কোন ক্ষতি না হইয়া এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতে দেশ এবং সমাজের যে উপকার হইবে, তাহার তুলনায় আপত্তির মূল্য অতি সামান্য।

দেশে নিত্য কত নূতন বিধান প্রবর্তিত হইতেছে, কত প্রচলিত বিধানের বিলোপ ঘটিতেছে; এই নিমিত্ত সাময়িক ভাবে একটা আপত্তি উপস্থিত হইয়া আবার পরক্ষণেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে। জমিদারি ক্রম বিভাগ পদ্ধতি উঠাইয়া দিলে, সেইরূপ সাময়িক ভাবে একটা আপত্তি উত্থাপন ব্যতীত আর কিছুই হইবে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ক্রম বিভাগ আইন আভিজাত্যের কেবল দুর্বলতা ঘটাইয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না। ক্রম বিভাগের পরে প্রায় অধিক জমিদারকেই অভাবের জন্য ঋণগ্রস্ত হইতে হইতেছে এবং কিছুদিন মধ্যেই ঋণ এবং সুদের দায়ে অনেক সম্পত্তি বিকাইয়া যাইতেছে। এই বিধানের পরিবর্তন ঘটিলে, ইহার সহিত আর একটি এমন আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইবে যে, যাহার ফলে জমিদারি হস্তান্তরিত হইবার আশঙ্কা লোপ পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গবর্নমেণ্ট জমিদারকে বন্দোবস্ত দিয়াছেন, কিন্তু তাহা স্থায়ী রাখিবার কোন উপায় করিয়া দেন নাই। যখন তখন যে কোন দেনার দায়ে জমিদারি বিক্রীত হইবার বিধান থাকার জন্য জমিদারির বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে। জমিদারগণ পৈতৃক জমিদারি উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। স্বকৃত বা স্বোপার্জিত জমিদারি কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু পৈতৃক জমিদারির মালিক জমিদার নিজের নির্বুদ্ধিতা অথবা স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা অধিকাংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছেন, এই অন্যায় কার্যে বাধা দিবার শক্তি কাহারও নাই, এমন কি, ঐ জমিদারের পরবর্তী উত্তরাধিকারী পুত্র পর্যন্ত পিতার যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতেও আইনমতে অক্ষম। এরূপ আইন যে নিতান্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত তাহার প্রতিবাদ কেহ কখনও করেন নাই। পৈতৃক সম্পত্তি যে কোন প্রকারেই হউক দান বিক্রয় বা ধ্বংস করিবার অধিকার প্রদান কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। বিষয় সম্পত্তি ধ্বংস করিবার জন্য কেহ কাহাকেও কোন সম্পত্তি দিয়া যান না, কিন্তু বর্তমান আইন আদালত এরূপ অসঙ্গত কার্যেও সম্মতি দিয়াছেন। কোন বিষয়ের মালিক পরবর্তী উত্তরাধিকারের জন্য যে উইল বা চরম পত্র করিয়া যান, আজ কাল তাহার প্রত্যেকটি আইনত গ্রাহ্য হইতেছে না। কেহ তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির ভবিষ্যৎ পরিচালন

পদ্ধতি বা তাহার স্থায়িত্বের উপায় পরিষ্কাররূপে নির্দেশ করিয়া গেলেও তাহা উপেক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গলায় জমিদারগণকে এইরূপে ভবিষ্যৎ নানা প্রকার অন্ধকারময় করিয়া রাখা হইয়াছে। যদি জমিদারের ধ্বংস সাধন দেশবাসী এবং গবর্নমেণ্টের অবশ্যকর্তব্য হইয়া থাকে, তবে তাহার কোন উপায় নাই।

জমিদারিতে জ্যেষ্ঠাধিকার আইন প্রচলিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের ঋণদায়ের জন্য যাহাতে জমিদারি নিলাম বিক্রয় না হইতে পারে, সেইরূপ বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া একান্ত কর্তব্য। নচেৎ ইচ্ছাকৃত ঋণদায়ে বর্তমান জমিদারিগুলি যে শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাজন জমিদারকে ঋণ দিয়া তাহার জমিদারি গ্রাস করিবার জন্যই চেষ্টিত থাকে, এইরূপে অনেক জমিদারকে নিঃস্ব হইতে হইয়াছে। মহাজন সুদ পাইবার অধিকারী বটে, কিন্তু জমিদারি লইবার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহার থাকিতে পারে না। English Law কাহারও কোন বিষয় তাহার মালিককে এবং তাহার ভবিষ্যৎ বংশীয়কে নিরাশ করিয়া মহাজনকে স্বত্বাধিকার প্রদান করে না। মহাজনের আসল ঋণ এবং তাহার ন্যায্য সুদ যতদিন সম্পত্তি হইতে ওয়াশীল হইতে পারে, ততদিন বিষয় মহাজনের অধীনে দিতে আইন বা আদালত ক্ষমবান্ হইয়া থাকেন, এক জনের পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি আর একজনকে প্রদান করা নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সাধারণ জ্ঞানে ইহাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আইনের কুটতর্ক সরল পথ ছাড়িয়া বক্র পথে যাইয়া সমাজে বাস্তবিক একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দিয়াছে।

বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ঋণ ব্যতীত অন্য ঋণের জন্য জমিদারি বিক্রয় না হইবার বিধান থাকিলে দেশের জমিদারিগুলি রক্ষা পাইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে স্বেচ্ছাচারিতা, অহমিকা, আলস্যের হাত হইতে তাহারাও রক্ষা পাইতে পারেন, কারণ অভাব মানুষকে উপায়ের পথ নির্দেশ করিয়া দিয়া থাকে। সম্পত্তিবান্ ব্যক্তি অভাবে পড়িলেই ঋণ লইয়া নিজের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন, সে ঋণ যদি সহজ প্রাপ্য না হয়, তাহা হইলে জমিদারদিগের স্বেচ্ছাচারিতা কমিয়া যাইবে। ইহাতে দেশ ও জমিদার উভয় পক্ষেরই উপকার হইবে।

উত্তরাধিকার বিধানের ফলে জমিদারদিগের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যাহারা এইরূপে বিষয় বিহীন হইতেছেন তাহারা পেটের দায়ে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন। আভিজাত্য সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা নিশ্চিতই লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু ইহা দেখিয়া শুনিযা কাহারও চৈতন্য হইতেছে না। আশা করা যায়, অতঃপর প্রত্যেক জমিদার স্বীয় সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা করিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগের সমাধান করিয়া লইতে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন।

ক্রম বিভাগ বিধানের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। জমিদারগণ সম্পত্তি লিমিটেড কোম্পানি করিয়া লইলেও জমিদারি এই ব্যবস্থায় কখনই বিভাগ হইতে পারিবে না। জমিদারির শক্তি সমষ্টিভাবে রক্ষিত হইলেও জমিদারদিগের উপকার হইবে। ক্রম বিভাগের পরে জমিদারের সরঞ্জামী অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া যায় তাহাও ক্ষতিজনক। লিমিটেড ভাবে সম্পত্তি পরিচালিত হইলে জমিদারিতে বহু লোক প্রতিপালিত হইতে

পারে। জমিদারগণ নিজেরাই এই ব্যবস্থা করিতে পারেন। মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানি, লিমিটেড ভাবে পরিচালিত হইয়া শক্তিশালী হইয়া আছে। হাটখোলার দত্ত বাবুদের কিয়দংশ জমিদারি, লিমিটেড বন্দোবস্তে পরিচালিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা সম্পত্তির শক্তি অব্যাহত আছে। এ ব্যবস্থা করিতে জমিদারদিগের কোন আপত্তি হইতে পারে না। নিজের আত্মরক্ষার চেষ্টা না থাকিলে অন্যে বলিয়া কহিয়া কি করিবে? দেখা যাউক, জমিদারগণ আত্মরক্ষার কি চেষ্টা করেন।

পরিশেষে গবর্নমেন্ট সমীপেও নিবেদন যে, এদেশে তাহাদের প্রথমাবস্থায়, দেশ এবং জমিদারের উন্নতি কামনায় তাহারা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার স্থায়ীত্বের জন্য জমিদার সম্প্রদায়ের অবনতির কারণ কয়েকটি বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া, ন্যায্য বিধান প্রণয়ন দ্বারা তাহাদের অবনতির পথ হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করুন, নচেৎ তাহাদের প্রবর্তিত মঙ্গলজনক ব্যবস্থাটী অচিরেই লুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। গবর্নমেণ্টের অনুগ্রহ দৃষ্টি ভিন্ন পতনোন্মুখ বাঙ্গলার জমিদারের অস্তিত্ব রক্ষার আর উপায় নাই সুতরাং জমিদারদিগের অস্তিত্ব এখন গবর্নমেণ্টের ন্যায়-বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি।

দত্তক গ্রহণ

জমিদার অপুত্রক হইলে দত্তক পুত্র লইয়া থাকেন। ইহা ধর্মসঙ্গত কার্য। কার্যতায় দত্তক গ্রহণের শাস্ত্রানুমোদিত বিধান এখন প্রতিপালিত হইতেছে না। দত্তক বিধানে নিকট-আত্মীয় পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। পূর্বে এই নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হইত। নিকট আত্মীয় না থাকিলে জ্ঞাতি পুত্র, অভাবে সমাজস্থ ব্যক্তির পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করা হইত। কিন্তু আজকাল জমিদারগণ সে বিধানকে উপেক্ষা করিয়া, অতি নিম্ন ঘরের বিষয়বিত্তহীন ব্যক্তির সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রীয় বিধান যথেচ্ছাচারিতায় রক্ষিত হইতেছে না। প্রত্যেকটি শাস্ত্র বিধানেরই বিশেষ কারণ আছে। সে সকল উপেক্ষা করিলে তাহা হইতে সুফল না হইয়া কুফলের সৃষ্টিই হইয়া থাকে।

এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে জমিদার অপুত্রক হইলে, তাহার বিষয় উপভোগ করিবার জন্য আত্মীয় বা সমাজস্থ ব্যক্তির পুত্রকে দত্তক পাইবার সম্ভাবনা স্বত্ত্বেও একটা অজ্ঞাত কুলশীল ও বিষয়বিত্তহীন ব্যক্তির পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতেছেন। ইহার ভবিষ্যৎ ফল এই হইতেছে যে, সেই দত্তক পুত্র বিষয়ের মালীক পদে অভিষিক্ত হইয়া উশৃঙ্খল ও অব্যাবস্থিত হইয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র সম্পত্তি ধ্বংস করিয়া দিতেছে। ইহা যে দত্তকের দোষ, তাহা নহে—তাহার জন্ম এবং বংশগত প্রবৃত্তি এবং স্বভাব তাহাকে কর্তব্যপথ বিমুখ এবং বিষয় সম্পত্তিতে অমনোযোগী করিতেছে, প্রকৃতিই তাহাকে সেই পথে চালিত করিয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেকেরই দত্তক গ্রহণের সময়, গৃহিত পুত্রের বংশ ও আভিজাত্য বিবেচনা করিয়া দত্তক গ্রহণ করা আবশ্যক। নিকট আত্মীয় অথবা সমাজস্থা ব্যক্তির পুত্র ব্যতীত, যে কোন বংশ হইতেই দত্তক গ্রহণ, কোন মতেই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না।

দত্তক পুত্র রাখিয়া তাহাকে সমুদয় বিষয় সম্পত্তি যথেচ্ছ ভাবে উপভোগ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়াও উচিত নহে। বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দত্তক পুত্রকে না দিয়া তাহার ভোগের জন্য বার্ষিক ১২ হাজার টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি দেশহিত কার্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া নিশ্চয়ই বিচক্ষণতার পরিচায়ক, এরূপ ব্যবস্থায় আপত্তি করিবার মালিকের কোন কারণ দেখা যায় না। পিণ্ড প্রদানার্থ এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই শস্ত্রানুসারে দত্তক পুত্র রাখা হয়। যাহাকে দত্তক রাখা যায়, তাহার পক্ষে মাসিক সহস্র মুদ্রা দিলে কম দেওয়া হয় না। অবশিষ্ট সম্পত্তি যদি জনহিত কার্যের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সম্পত্তি ধ্বংস করিবার কোন উপায় দত্তকের হাতে থাকে না। এরূপ করিলে দত্তকপুত্র সংযতভাবে চলিতে বাধ্য থাকিতে পারে।

পাশ্চাত্যের ধনী সম্প্রদায় অপুত্রক অবস্থাতেও আজ কাল অনেকেই দত্তক গ্রহণ করেন না, তাহাদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে দান করিয়া থাকেন। যাঁহারা দত্তক রাখেন প্রায়ই তাহারা দত্তককে সমুদয় বিষয় উপভোগ করিতে না দিয়া, তাহার জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত উপায় রাখিয়া অবশিষ্ট বিষয় সাধারণের উপকারার্থ প্রদান

করিতেছেন। ইহাতে দুই দিক রক্ষা হইতেছে। এক দিকে দত্তক রাখাও হইতেছে, অপর দিকে দেশ এবং সমাজকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য দান করা হইতেছে। প্রত্যেক দত্তক গৃহিতা যদি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান তাহা হইলে দেশের বহু অভাব দূর হইতে পারে।

একটা প্রকাণ্ড বিষয়, পথের লোককে ধরিয়া উপভোগ করিবার জন্য দিয়া যাওয়া অপেক্ষা, দেশের হিতকর কতকগুলি কাজে সম্পত্তির আয় দান করিয়া যাওয়া নিশ্চয়ই শ্লাঘার কথা। অপিচ ইহাতে ন্যায় এবং ধর্মের কার্যও করা হয়। জমিদারদিগের এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দত্তক রক্ষা করা ও বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া সর্বতোভাবেই কর্তব্য।

জমিদারের আয় বৃদ্ধির উপায়

জমিদারের অবনতির আর এক কারণ, নির্দিষ্ট কর ব্যতীত অন্য প্রকার আয়ের চেষ্টা না করা। ভূমির নির্দিষ্ট কর বৃদ্ধি করিবার আর উপায় নাই। জমির জমা প্রায় সকল স্থলেই পরিমাণ মত বৃদ্ধি করিয়া লওয়া হইয়াছে। কাজেই এখন আর তাহার উপর কোন চেষ্টা চলিতে পারে না।

জমিদারের আয় নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহার ব্যয়, ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। জমিদারি ক্রম বিভাগের দ্বারা বহু ভাগে বিভক্ত হওয়ায় আয় কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু ব্যয় না কমিয়া বাড়িতেছে। এদিকে আয়ের উপায়ও কিছু মাত্র করা হইতেছে না। জমিদারগণ স্টেটের সরঞ্জামী নানা প্রকারে অনেক বাড়াইয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহার দ্বারা স্টেটের কোন উপকার হয় নাই। কোন স্টেটেই কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ কর্মচারী নাই। সেরূপ কর্মচারী স্টেটে থাকিলে প্রজাগণ কৃষি বিষয়ে অনেক উপদেশ পাইত, নূতন তথ্য জানিতে পারিলে তাহারা মূল্যবান্ কৃষি দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিত, কর্ষিত ভূমিতে কিঞ্চিৎ অধিক শস্য উৎপন্ন করিতে পারিলে, তাহারা জমির খাজনা অবশ্যই কিছু বেশি দিতে কষ্ট বোধ করিত না।

জমিদারগণের কৃষিতত্ত্ববিদ্ কর্মচারী রাখিয়া প্রজাদিগকে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্যের উপদেশ দেওয়া আবশ্যকর্তব্য ছিল। এরূপ করিলে প্রজার নিকট জমির খাজানা কিছু বেশি পাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। নচেৎ জমির খাজনার হার আর বৃদ্ধির কোন আশা করা যায় না। যদি জমির উৎপন্ন পূর্ববৎ স্থির থাকে, তবে প্রজা কেনই বা জমা বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজী হইবে? আর জমিদারই বা কোন্ হিসাবে জমা বৃদ্ধি চাহিবেন?

জমিদারগণ কেবল মাত্র জমিদারির নির্দিষ্ট করের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছেন। কোন জমিদারের বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি এবং চারি পুত্র থাকিলে, বর্তমান আইন অনুসারে সম্পত্তি ভাগ হইয়া প্রত্যেকে চারি হাজার টাকার সম্পত্তির অধিকারী হইবে, ইহা জানাই যাইতেছে। কিন্তু মূল মালিক পুত্রদিগের ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিতে পারিয়াও, তাহাদিগকে পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন না, অথবা তাহাদিগকে অন্য কোন আয়ের পথ অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দেন না, অথবা নিজেও অন্য কোন প্রকার আয়ের পথ ধরিতে চেষ্টা করেন না, এমতাবস্থায় জমিদারের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হওয়াই স্বাভাবিক।

দেশে ক্ষুদ্র জমিদারের সংখ্যাই অধিক, তাহারা প্রত্যেকেই সামান্য বিষয় সম্পত্তি লইয়া সন্তুষ্ট আছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে জীবিকার্জনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায় "এই সামান্য কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, তাই দেখা হয়"। জমিদারের যেন অন্য কার্য করিতে নাই, এইরূপ একটা ভাব তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই নিশ্চেষ্ট ভাব জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষে ভয়ানক অমঙ্গলজনক হইয়া পড়িয়াছে। অর্থ ব্যতীত এ সংসারের কোন কার্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। নির্দিষ্ট কোন আয় থাকিলেও প্রত্যেকেরই

অন্য প্রকার আয়ের চেষ্টা করা কি কর্তব্য নহে?

কৃষি এবং বাণিজ্য ব্যতীত অর্থাগম হইতে পারে না। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ। প্রকৃতির প্রাকৃতিক অনুগ্রহে এদেশে কৃষিকার্য যত সহজসাধ্য, জগতের কুত্রাপি আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে, দেশের মধ্যে একটিও বড় কৃষি ক্ষেত্র নাই। কৃষকগণ স্বীয় জীবিকার্জনের জন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করে, তদ্দ্বারা দেশের অন্নাভাব মোচন হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা দেশে অর্থাগম হওয়া সম্ভবপর নহে। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ভার গবর্নমেণ্ট জমিদারের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষেই তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। জমিদারগণ ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে দেশে বৃহৎ উন্নত প্রণালীর কৃষি ক্ষেত্রের বিস্তার করিতে পারেন, অবশ্য এ কার্য করিতে কিছু অর্থ ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গলার জমিদার আলস্যপ্রিয়, সুতরাং যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা স্বত্বেও জমিদারগণ এই আয়কর কার্যে মনোযোগী হইতেছেন না। বঙ্গদেশে জমিদার ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে ব্যবসায় হিসাবে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করা সম্ভবপর নহে। জমিদারগণ আলস্য ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হইলে সকল দিকেই উপকার হইতে পারে।

সুন্দরবন ব্যতীত খাস বঙ্গদেশে পতিত ভূমি খুব কম আছে, তাহা হইলেও জমিদারির অন্তঃর্গত জলাভূমিসমূহ, বনভূমি প্রভৃতি যাহা এখনও প্রজার জমার অন্তর্গত হয় নাই, সেই সকল ভূমিতে শস্য এবং ফলবান বৃক্ষের আবাদ সহজেই করা যাইতে পারে। জলাশয়সমূহ পরিষ্কার করিয়া লইলে তাহা হইতেও জলকর হিসাবে কিছু আয় বাড়িতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচ রকমে সমষ্টিভাবে আয় বৃদ্ধি করিয়া লওয়া অসম্ভব কার্য নহে। অতএব জমিদারগণ এই সকল কার্যে অবশ্য মনোযোগী হইতে পারেন।

কৃষিকার্য ব্যতীত ব্যবসায় ক্ষেত্রেও জমিদারগণের যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে। জমিদারদিগের নিজ নিজ জমিদারিতে যে সকল ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রজাদিগের নিকট উচিত বাজার মূল্যে সেই সকল দ্রব্য লইয়া, কলিকাতা অথবা অন্য যে স্থানে, যে শস্য অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, সেই স্থানে তাহা পাঠাইয়া বিক্রয় করিলে নিশ্চয়ই লাভবান হওয়া যায়। জমিদারগণ অল্প মূলধনেই এই কার্য করিতে পারেন। বাহিরের ব্যবসায়ীর পক্ষে যেখানে ১০ হাজার টাকা মূলধনের আবশ্যক, জমিদারের পক্ষে সেখানে দুই হাজার টাকা মূলধনই যথেষ্ট হইতে পারে। নিজের জমিদারি এবং প্রজার উৎপাদিত শস্য অল্প সময়ের জন্য বাকি হিসাবে লওয়া কঠিন নহে। প্রজাগণ উৎপাদিত শস্য মহাজনের নিকট বিক্রয় করে; তাহারা কায়দায় ফেলিয়া প্রজাকে বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম মূল্য দেয়, ওজন করিবার সময় চল্তি মাপ অপেক্ষা বেশি গ্রহণ করে, তাহাতে প্রজার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। জমিদার নিজে এই কার্যে লিপ্ত হইলে প্রজার ঐরূপ ক্ষতি হইতে পারে না এবং তাহারা ন্যায্য মূল্য পাইয়া উপকৃত হইতে পারে।

কৃষি উৎপন্ন পণ্যের খরিদ বিক্রয়ে লোকসানের আশঙ্কা খুব কম, জমিদারগণ এইরূপ ব্যবসায়ে কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না এ কথা বেশ বলা যায়; অবশ্য একটু তত্ত্বাবধান আবশ্যক। আয়ত্তাধীন কার্যে, সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও তাহাতে উপেক্ষা করা কাহারও কর্তব্য নহে। যদিও জমিদারগণ ব্যবসায় কার্যে অভিজ্ঞ নহেন, তথাপিও কার্যক্ষেত্রে কর্তব্য ও আবশ্যক বিবেচনা উপস্থিত হইলে, সামান্য চেষ্টাতেই কার্য চালাইয়া লইতে পারেন।

আলস্য ত্যাগ এবং পরিশ্রম করিলে কার্যে সফলতা লাভ না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, কর্তব্য জ্ঞানে কাজ আরম্ভ করিলে এক রকমে চলিয়া যায়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অর্থশালী হইয়া জমিদারি খরিদ করিলে, তাহারা তাহাতে ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধিই করিয়া লয় এবং তাহাতে বেশি লাভবান হইয়া থাকেন, ইহা সকল স্থানেই দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলার প্রাচীন জমিদারদিগের কিন্তু সেদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই।

ওয়াটসন কোম্পানির জমিদারি বঙ্গদেশে বিস্তৃত এবং বিখ্যাত। এখন উহা মেদিনীপুর জমিদারি সিণ্ডিকেট নামে পরিচিত। কলিকাতার এণ্ড্রুইয়েলো কোম্পানি ঐ সম্পত্তির ম্যানেজিং এজেন্ট। প্রকাণ্ড জমিদারি, বহু লক্ষ টাকা আদায়, কিন্তু ইউরোপীয় বণিকগণ জমিদারির খাজনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে নানা প্রকার শস্যাদি বাজার মূল্যে খরিদ করিয়া ব্যবসায়ের দ্বারাও লাভবান্ হইতেছেন। পূর্বকালের নীলকরগণ জমিদারি ইজারা লইয়া যে ভাবে ব্যবসায়ের কার্য চালাইত, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রজার পক্ষে সে ব্যবস্থা দুর্বিসহ হইলেও তাহারা জমিদারের লাভের কৃষিকার্য করিতে বাধ্য হইত, এজন্য অত্যাচারও সহ্য করিত। জমিদারের প্রভূত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই অত্যাচার হইত। দেশীয় জমিদার কোন বিষয়ে লাভবান না হইয়াও অত্যাচারী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, ইহা দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছু নহে। বেহার প্রদেশে নীল এবং ইক্ষুর চাষে প্রজাকে বাধ্য করিয়া জমিদার আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছেন। আর বাঙ্গলার জমিদার কেবল দুর্নামের পশরা মাথায় লইয়া কাল কাটাইতেছেন।

জমিদারগণ আর এক রকমেও জমিদারি হইতে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারেন। বাঙ্গলার প্রজাগণ দরিদ্র, মহাজনের সহায়তা ভিন্ন তাহারা কোন কৃষিই উৎপন্ন করিতে পারে না। মহাজন টাকায় মাসিক চার আনা হইতে দুই আনা সুদে কৃষককে টাকা ধার দিয়া যথেষ্ট লাভবান হয় এবং প্রজার কষ্টার্জিত সমুদয় অর্থ শোষণ করিয়া থাকে। এজন্য কৃষকের অবস্থা ক্রমেই হীন হইয়া পড়িতেছে। জমিদারগণ যদি স্বীয় জমিদারিতে, নিজেরা প্রজাকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লাভবান্ হইতে পারেন। প্রজাগণ এখন মহাজনের নিকট হইতে যে ভাবে টাকা কর্জ করে, তাহাতে তাহাদের দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু জমিদার নিজে প্রজাকে মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হারে সুদ লইয়া টাকা কর্জ দিলে প্রজা রক্ষা পায়, জমিদারেরও লাভ হয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, জমিদারের পক্ষে সুদের ব্যবসা এখন অসম্ভব হইয়াছে, কারণ জমিদারগণ প্রায় সকলেই আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত। কিন্তু জমিদারের এই ঋণ শোধের উপায় ত কিছু করা হইতেছে না, আর করিবার উপায়ও কিছু নাই। আয়ের বেশি ব্যয়ের দরুণ ঋণ হইয়াছে, আয় বৃদ্ধি করিতে না পারিলে কখনই সে ঋণ পরিশোধ হইতে পারে না। দিন দিন সুদ বাড়িয়া আসলকে ছাপাইয়া যাইতেছে। সম্পত্তি বিক্রয় ব্যতীত আর কি উপায়ে ঋণ পরিশোধ হইবে? আয়ের উপায় উদ্ভাবন অত্যাবশ্যক হইয়াছে। জমিদারি স্থির রাখিতে হইলে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। মাসিক শতকরা ।।০ আনা সুদে জমিদার ঋণ পাইতে পারেন, জমিদারের এখন সেইরূপে টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রজার নিকট শতকরা ১৲ হারে টাকা কর্জ দিলে, তদ্দ্বারা একটা উপায়ের পথ হইতে পারে। অবস্থা বিবেচনায় উপস্থিত এইরূপ করিবার আবশ্যক হইতেছে। যদিও ঋণকৃত অর্থের দ্বারা এরূপ আয়ের চেষ্টা সর্ববাদিসম্মত হইতে পারে না, কিন্তু সময় অনুসারে এ ব্যবস্থা না করিয়াই বা উপায় কি? জমিদারি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার পূর্বে আপদ্‌কাল বিবেচনায় ঝুঁকির

মধ্যে যাওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদির সাহায্য ব্যতীত জমিদারের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় দেখা যায় না। আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় অমিতব্যয়ী জমিদারের পক্ষে আশঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। স্বকৃত ব্যাধির প্রতিকার কষ্টসাধ্য কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিবেচনায় এই আশঙ্কাজনক কার্যেও হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইয়াছে, কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারা যে কেবল জমিদারের উপস্থিত আয় মাত্র বৃদ্ধি হইবে তাহাই নহে, পরন্তু জমিদারের বংশধরগণ এক একটা কার্যের কর্তৃত্ব লইয়া জড়তা এবং আলস্যের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন ও এই কার্য ব্যপদেশে কতকগুলি লোকের অন্নের সংস্থান হইবে, ইহাও কম উপকারের কথা নহে।

জমিদার এবং প্রজার সম্বন্ধ এখন কেবল খাজনার আদান প্রদানে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। জমিদারগণ উল্লিখিত কার্যে লিপ্ত হইলে প্রজার সহিত আবার তাহাদের বাধ্য বাধকতা বাড়িয়া যাইবে, পরস্পরের আয় বাড়িবে, অভাব দূর হইবে। জমিদার ও প্রজার মিলিত শক্তি দেশের বহু দুর্দশার মূল উৎপাটন করিয়া নিজেদের আত্মরক্ষার পথ সাফ্ করিয়া লইতে পারিবে।

জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সের জমিদারগণ খাজানা লইয়া সন্তুষ্ট আছেন, কিন্তু বৈদেশিক মূলধন সেখানকার ভূমি হইতে প্রভূত অর্থলাভ করিতেছে। চায়ের আবাদ বিশেষ লাভজনক। জমিদারগণ ঐ কার্যে বহু অর্থ নিয়োজিত করিতে পারেন। ঐ সকল ভূমির জমিদারগণের পক্ষে এ কার্য খুব সহজসাধ্য।

সময় এখনও আছে, পথও দেখা যাইতেছে, চেষ্টা করিলে এই দুঃসময়েও দেশের লোক আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে। এই শুভ যোগ, উৎকৃষ্ট উপায়, সহজ পন্থা ত্যাগ করিলে জমিদারের পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইবে এবং প্রজার অবস্থা যে আরও কত শোচনীয় হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া কার্য করা দেশের আভিজাত্য সম্প্রদায়ের অবশ্যকর্তব্য।

জমিদার সভা

বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, এই উন্নতির যুগে জগত নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ, সমাজ কর্ম প্রাবল্যে সঞ্জীবিত হইয়াছে। ব্যবসায়ী ব্যবসায় বিস্তৃত করিয়া, কৃষকগণ কৃষির উন্নতি দ্বারা, বিষয়ী ব্যক্তিগণ সম্পত্তির সম্পদে জগতে আপন আপন প্রভুত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছেন। বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশিত হইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনে নিয়ত লিপ্ত রহিয়াছে। সমাজ আজ কর্মদ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া লইয়াছে। সমাজের প্রত্যেক বিচ্ছন্ন শক্তি, একত্রিত সঙ্ঘশক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছে। কালের প্রাকৃতিক গতি এইরূপে জগতের সকলকে নিজ নিজ স্বার্থে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশের অনুকরণ করিয়া প্রাচীন ভারত আজ সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য সেইরূপ সঙ্ঘশক্তি গঠিত করিয়া লইয়াছে এবং তাহারই ফলে ব্যবসায়িদিগের ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, মহাজন সভা, অভিজাত্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, জমিদারদিগের ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পুরাতন। বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের কিছুকাল পরে যখন গবর্নমেন্ট দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন, তার কিছুদিন পরেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সৃষ্টি। জমিদার এবং দেশবাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়া অ্যাসোসিয়েশন অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তখন যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন, তাহারা স্বাধীন ভাবে এবং কর্তব্য পথে থাকিয়া দেশের অনেক অভাব অভিযোগের সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। চৌকিদারি কর, আয় কর প্রভৃতির বিরুদ্ধে দেশবাসীর অভিমত নির্ভীকতার সহিত গবর্নমেণ্ট সমীপে পেশ করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাবে উহা আভিজাত্যের শক্তিসঙ্ঘ হইয়াও দেশের সকল বিষয়ে আলোচনা করা অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্য ছিল। তারপর নানা কারণে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি। সে ইতিহাস এখানে অনাবশ্যক। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন কেবল জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গলার জমিদারের শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট, সুতরাং তাহাদের পৃথক্ সঙ্ঘের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে সকল উদ্দেশ্য লইয়া ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি হইয়াছে, কার্যতায় অ্যাসোসিয়েশন সে পথে যাইতে পারে নাই, ইহাই সাধারণের মত।

প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যেভাবে কার্য করিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসাজনক, এখনও তাহার সে প্রতিষ্ঠা লোপ পায় নাই। চৌকিদারী টেক্স এবং আয়কর প্রবর্তিত হইবার সময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন দেশবাসীব করভার লাঘবের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে পর্য্যন্ত আপত্তি করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক কাজে তাহারা কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। কাহারও মুখ চাহিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন চলিত না। তারপর কতক কারণে মতদ্বৈধ হওয়ায় ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এই অ্যাসোসিয়েশন এযাবৎ তেমন বিশেষ কোন কার্য করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। যাঁহারা উহার পরিচালক এবং কার্যনির্বাহক, তাহারা ব্যক্তিগতভাবে কার্য করিতেছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অ্যাসোসিয়েশনের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত, কর্তব্য অসীম এবং তাহার শক্তিও যথেষ্ট, কিন্তু কেবল কথায় এবং লেখায় উহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

বর্তমান সময়ে অ্যাসোসিয়েশন যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে বোঝা যায়, ঐ সঙ্ঘ সাধারণ জমিদারের সহিত সংশ্রবশূন্য। অ্যাসোসিয়েশন কয়েকজন নির্দিষ্ট জমিদারের ইচ্ছার উপর পরিচালিত হইতেছে। বঙ্গদেশে জমিদারের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া, তাহাদের মতামত লইয়া বা সকলের অভিমত অনুসারে অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত হইতেছে না। উপাধিধারী জমিদার ব্যতীত বঙ্গদেশে বহু জমিদার আছেন, কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন তাহাদিগকে গণনার মধ্যে আনয়ন করেন নাই। বোধ হয় উপাধিধারী জমিদারগণ উপাধিবিহীন জমিদারদিগকে অভিজাত শ্রেণিতে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বা লজ্জিত। শক্তি সঙ্ঘের পক্ষে ইহা নিতান্ত নিন্দনীয়। উপাধিধারী জমিদারগণ কাকের ময়ূরত্ব প্রাপ্তির মত, সুতরাং তাহাদের পক্ষে সাধারণ জমিদারগণকে উপেক্ষা করায় আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। যদিও এ উক্তি শ্রুতিকটু হইতেছে, কিন্তু উপায় কি, আশঙ্কায় সাধারণ মত ব্যক্ত না করিয়া থাকা যায় না।

গবর্নমেণ্ট জমিদারের সম্বন্ধে যখন কোন নূতন আইন বিধানের প্রবর্তন করেন, অথবা কোন আইনের পরিবর্তন করেন, তাহার ভাল মন্দ শুধু উপাধিধারী জমিদারদিগের প্রতিই প্রযোজ্য হয় না, দেশের ছোট বড় সকল জমিদারের উপরই সমভাবে তাহা আরোপিত হইয়া থাকে এবং বড় জমিদারের ন্যায় ছোট জমিদারগণকেও তদ্দরুণ লাভ লোকসানের ভাগী হইতে হয়। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন জমিদারদিগের কেন্দ্রশক্তি বলিয়া পরিচিত, সুতরাং আবশ্যক মতে গবর্নমেণ্ট, জমিদার বা জমিদারি সম্বন্ধীয় কার্যে তাঁহারই মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আর জমিদার সভা ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন, সমগ্র দেশের জমিদারের ভাল মন্দের জন্য দায়ী। অ্যাসোসিয়েশন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিবেচনা না করিয়া কোন অভিমত ব্যক্ত করিতে পারে না, কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন সমুদয় জমিদারের মতামত না লইয়া যে সকল স্বাধীন অভিমত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, সেরূপ অভিমত যে সর্ববাদীসম্মত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

অ্যাসোসিয়েশন ছোট ছোট জমিদারকে গণনায় আনেন নাই সত্য, কিন্তু তাহারা এসোসিয়েশনের কার্যের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। লাভ এবং লোকসানের ভাগী কোন অভিমতের ক্ষমতাযুক্ত না হইলে, তাহার ক্ষতির কারণ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ছোট জমিদারদিগকে অ্যাসোসিয়েশনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া না লওয়ায় তাহার শক্তিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মফঃস্বলের অধিকাংশ জমিদার ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সংবাদই জানেন না। অ্যাসোসিয়েশনের কার্য, তাহার উপকারিতা ও আবশ্যকতা সমস্ত জমিদারকে জানাইয়া, সকলকে একমতে কার্য করিবার জন্য আহ্বান করা উচিত। জমিদারদিগের ভোট নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া, প্রতি বৎসর প্রত্যেক মহকুমা ও জেলা হইতে প্রতিনিধি নির্বাচনপূর্বক ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কলেবর পুষ্ট করিয়া লইলে তাহার শক্তি অনেক বৃদ্ধি হইতে পারে। সেরূপ না করিয়া বারওয়ারী ভাবে অত্যাবশ্যকীয় সঙ্ঘটি অদূরদর্শিতায় নিজের কর্তব্যে অবহেলা করিতেছে মাত্র।

দেশের সভা সমিতিতে বহু লোকের সমাগম হয়! বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়, কিন্তু জমিদারপ্লাবিত বঙ্গদেশে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকের সংবাদ কেহ জানিতে পারে না, অর্থাভাবে তাহার নির্দিষ্ট গৃহ হইল না, এমনই দুর্দশা! বাঙ্গলা দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্ঘ জমিদারসভার দুরবস্থার কারণ নির্দেশ করা কঠিন। যাহারা নিত্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা, বিলাসিতায় অপব্যয়ে নষ্ট করিতে ইতঃস্তত করেন না, তাহাদের সভার একখানি গৃহ কি নির্মাণ হইতে পারে না? ইহা কি পুচ্ছধারী জমিদারগণের লজ্জা এবং নিন্দার কথা নহে? গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভায় নির্দিষ্ট সময়ের স্থান পাইবার জন্য জমিদারদিগের কত আগ্রহ, কত উৎসাহ, কত চেষ্টা; আর তাহাদেরই নিজস্ব, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে জমিদারের সমাগম হয় না। শুনিতে পাওয়া যায় লোকাভাবে অধিবেশন সময় সময় স্থগিত হইয়াও থাকে।

বাঙ্গালা দেশে এমন জমিদার কি কেহ নাই, যিনি জমিদারের এই লজ্জা ও অসাড়তা দূর করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সকল অভাবের সমাধানপূর্বক এখনও জমিদারগণের কর্তব্যদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন? যদি কেহ নিঃস্বার্থভাবে ও কর্তব্যবোধে এই শুভ কার্যে মনোযোগী হন, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যায়, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন বঙ্গদেশের সমস্ত সাম্প্রদায়ীকসঙ্ঘ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতে পারিবে এবং তাহার কার্যে দেশ ও দশের, অধিকন্তু গবর্নমেন্টের অশেষ উপকার হইবে।

পথকর যখন প্রথম প্রবর্তিত হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়াছিল। ভারত সচিব সেই আন্দোলনের শক্তি বুঝিয়া ঐ কর, অস্থায়ী স্বীকার করিয়া সাধারণের উপকারের জন্য সাময়িক ভাবে প্রবর্তিত করেন। প্রথমে টাকায় দুই পয়সা মাত্র কর ধার্য হইয়াছিল; তার পর ক্রমে ক্রমে পথকরের দায় সম্পূর্ণভাবে জমিদারের মাথার উপর চাপিয়া পড়িল, কেহ কথা বলিল না, কোন আপত্তি করিল না। কয়েক বৎসর পর ঐ করের পরিমাণ দুই পয়সা স্থলে, এক আনা হিসাবে আদায় হইতে লাগিল এবং তাহাও নিরাপত্যে দেওয়া হইতেছে। প্রজার নিকট পথকর আদায় হউক কি না হউক, জমিদার তাহার জন্য দায়ী হইয়াছেন, বাকি করের জন্য জমিদাবি নিলাম বিক্রয় হইতেছে। ইহার প্রতিকারেরও চেষ্টা হয় নাই; গবর্নমেন্টের নিকট ইহার বিরুদ্ধে কোন বিশেষ আপত্তিই হয় নাই। কেই বা জানাইবে? বাঙ্গলার জমিদারগণ প্রাণহীন কর্তব্যহীন, সে অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। ঘরে শুইয়া নিজেকে সম্রাট মনে করে। কি পরিতাপ, কি লজ্জার কথা! অনেকে বলিতে পারেন, এ কার্যে প্রতিবাদ করিতে গেলে জমিদারকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে কথা বলিতে হয়। রাজানুগৃহীত রাজভক্ত জমিদারের পক্ষে সেরূপ কার্য করাও সঙ্গত নহে। একথা কিন্তু স্বীকার করা যায় না। কারণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট প্রজাতন্ত্রমূলক আইনে প্রতিষ্ঠিত। অভিযোগ ও আপত্তি জানাইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা যাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহারা কখনই ন্যায়সঙ্গত আপত্তিতে অন্যায় বলিতে পারেন না এবং কখন সেরূপ বলেন নাই।

গবর্নমেন্ট জোরপূর্বক পথকর আদায় করিতেছেন না; দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং প্রধান প্রধান জমিদারদিগের মত লইয়াই পথকর প্রবর্তিত হইয়াছে। তবে দুঃখের কথা, আমাদের দেশের বড় জমিদারগণ ছোটদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাদের মতামত না লইয়াই মোড়লের মত কর দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। সেজন্য গবর্নমেন্টকেও দোষী

করা যায় না। যখন কোন কর, কি জমিদারি সম্বন্ধে কোন নূতন বিধানের আবশ্যক হয়, তখন গবর্নমেণ্ট দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। দেশের প্রধানদিগের কর্তব্য যে, সমুদয় সম্প্রদায়ের মতামত সংগ্রহ করিয়া তাহাই প্রকাশ করা, কিন্তু কার্যতায় তাহা হয় না। দেশপ্রধানগণ খয়ের খাঁ হইবার জন্য আপনি মোড়ল সাজিয়া, যা ইচ্ছা তাহাই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, সে সময়ে কাহারও অপেক্ষা করা হয় না। সে মত প্রকাশের জন্য যে আরও দশ জনকে দায়ী হইতে হয়, এই সাধারণ জ্ঞান আমাদের দেশের প্রধান জমিদারদিগের নাই, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। পথকরের মতামত প্রকাশ কালে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল।

উপস্থিত প্রজাসত্ব হস্তান্তরের অভিমত সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটনা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বঙ্গদেশের জমিদারদিগের স্বার্থানুকূলে হইলেও অধিকাংশ ব্যক্তির সমবেত যুক্তি তর্কের দ্বারা মীমাংসিত মত নহে, ইহা ধ্রুব সত্য। প্রত্যেক কার্যেই যদি এইরূপ হইতে পারে, তাহা হইলে দেশের জমিদার সাধারণের পক্ষে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনকে সার্বজনীন জমিদার সভা বলিয়া কোনমতেই স্বীকৃত হইতে পারে না। কখন কোন পরামর্শ করা হইবে না, মতামত লওয়া হইবে না, অথচ একটা সার্বজনীন অভিমত প্রকাশ করা হইবে, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত। বোধ হয়, এইজন্য রঙ্গপুর জেলায় একটি পৃথক জমিদার সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে যে আরও হইবে তাহা শুনা যাইতেছে। যদি মফঃস্বলের প্রত্যেক স্থানে এইরূপ হইতে থাকে, তাহা হইলে কালে যে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাধান্য লোপ পাইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই সকল কারণে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্য রীতিমত পরিচালনেব চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক জেলায় অ্যাসোসিয়েশনের শাখাসভা স্থাপন করিয়া, প্রত্যেক শাখাসভা হইতে ভোট দ্বারা মেম্বর নির্বাচন করিয়া লওয়া অ্যাসোসিয়েশনের কর্তব্য এবং প্রতি বৎসর সমগ্র বঙ্গদেশের জমিদারদিগের একটি বিশেষ অবস্থান আলোচনা করা কর্তব্য। নচেৎ কেবল নাম মাত্র অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারাতে কার্য হইবে না।

চেম্বার অব কমার্স, প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির অস্তিত্ব কেবল কাগজে কলমে রক্ষিত হয় না। আবশ্যক মতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন যাহা করা আবশ্যক তাহা তাহারা করিতেছেন। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্বও শুধু কাগজে কলমে ঠিক থাকিলে চলিবে না, তাহারাও স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হওয়া চাই। জমিদার এবং জমিদারির স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা চেষ্টা যত্ন আবশ্যক। জমিদারি কেন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, জমিদারের অবস্থা কেন হীন হইতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে জমিদারগণের উন্নতি হইতে পারে, তাহার কারণানুসন্ধান ও তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করাও দরকার। যে সকল জমিদার উশৃঙ্খলায় বা মামলা মোকর্দমায় উৎসন্ন যাইতেছে, অব্যবস্থায় ও বে-হিসাবীর দরুণ যে স্টেট অধঃপাতে যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া ও অবস্থা বুঝাইয়া সৎপথে আনিবার চেষ্টা করাও সাম্প্রদায়িকভাবে আবশ্য কর্তব্য নয় কি?

অবস্থান্তরিত, জমিদার সন্তানগণের জীবিকা অর্জনের উপায়, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা জমিদার সঙ্ঘেরই কর্তব্য কার্য। জমিদারগণ যাহাতে ঋণে ডুবিয়া না যায়, মহাজনের দুরভিসন্ধিতে কোন জমিদারি যাহাতে হস্তান্তরিত না হইতে পারে, সে সকলের উপায়

নির্দেশ করাও আবশ্য কর্তব্য কার্য। যদি এই সকল কার্য ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন হইতে করা হয়, তবে তাহার শক্তি ক্ষমতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, দেশের উপর কর্তৃত্ব থাকিবে এবং গবর্নমেণ্টের নিকট তাহার মতামত সমাদৃত হইবে, নচেৎ বাহ্যাড়ম্বরে কোন ফল হইবে না।

দেশের মধ্যে উপস্থিত যে অশান্তি উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, গবর্নমেণ্ট বহু ব্যয় বাহুল্যে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু এই বিস্তৃত জনবহুল দেশের পক্ষে সে চেষ্টায় বিশেষ উপকার হইতেছে না। রাজস্বের অর্থ যাহা দ্বারা নানা প্রকার জনহিতকর কার্য হইতে পারিত, সেই অর্থ অনর্থক শান্তিরক্ষা ব্যপদেশে ব্যায়িত হইতেছে। জমিদারগণ চেষ্টা এবং যত্ন করিলে এতদ্‌পেক্ষা অল্প ব্যয়ে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। দেশের প্রতি পল্লিতে গবর্নমেণ্টের একজন মাত্র চৌকিদার থাকে, তাহার জ্ঞান বুদ্ধিও সামান্য সুতরাং তাহার রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ যে কার্য করে, তাহাতে সকল তথ্য সংগৃহীত হওয়াও সম্ভবপর হয় না, অপিচ অনেক সময় সে কার্যের ফলে প্রজা সাধারণের অসন্তোষের কারণই জন্মিয়া থাকে। গবর্নমেণ্টের পক্ষে তাহার প্রতিকার কঠিন। জমিদারের পাইক গোমস্তা সকল গ্রামেই আছে, জমিদার নিজ নিজ কর্মচারীদিগের দ্বার গবর্নমেণ্টের শান্তিরক্ষা কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। উভয় পক্ষের সাহায্যে অল্প ব্যয়ে যে শাসন কার্যের সুবিধা হইতে পারে, নিশ্চেষ্টতার জন্য তাহাতে বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন কেন যে এই অবশ্যকর্তব্য কার্যে মনোযোগী হইতেছেন না তাহা বোঝা যায় না।

কৃষি প্রধান বঙ্গদেশের কৃষকগণকে কোন প্রকার উন্নতি কৃষিতথ্যের ও নবাবিষ্কৃত প্রণালীর উপদেশ প্রদান করা হইতেছে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণ অনুসারে জমিদারগণেরই এই কার্য করা উচিত। দেশের জলকষ্ট নিবারণ, শিক্ষার প্রসারণ প্রভৃতি কার্যগুলির প্রতি জমিদারের দৃষ্টি না থাকা অত্যন্ত অসঙ্গত হইতেছে। জমিদারের স্বার্থ এবং প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা কি অ্যাসোসিয়েশন কর্তব্য মনে করেন না? যদি নিজেদের অভাব অভিযোগের কোন প্রতিকার চেষ্টা করা না হয়, স্বার্থের অনুকূলে মত প্রকাশ করা অনাবশ্যক বিবেচিত হয়, তবে কি কেবল "আমরাও আছি" ইহাই জানাইবার জন্য ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? অতঃপর সমাজের স্বার্থ এবং প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই যত্ন ও চেষ্টা করিবেন, এ আশা করা অসঙ্গত হইবে না। শীঘ্রই অ্যাসোসিয়েশনের একটি গৃহ হইবে এ আশাও দুরাশা নহে। জমিদারগণের প্রত্যেকটি অভাব এবং পতনের কারণগুলির সমাধান করিবার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের চেষ্টা আবশ্যক। জমিদার সম্প্রদায়ের মান সম্ভ্রম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, গবর্নমেণ্ট দেশের প্রত্যেক কার্যেই যাহাতে জমিদার সভার মতামত অনুসারে চলিতে বাধ্য থাকেন, কার্য এবং কৃতিত্বের দ্বারা সেইরূপ ভাবে জমিদার সভা পরিচালিত হইলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।

পরিশেষে জমিদারদিগের মুখপত্র স্বরূপ একখানি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক জানাইয়া, অভিবাদনপূর্বক এই বাঙ্গলার জমিদারেব আলোচনা সমাপ্ত করা হইল।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৪২-১৯০০

বাংলার জমিদার
ও
জমিদারি

"বাঙ্গালার ইতিহাস-নবাবী আমল", "মধ্যযুগে বাঙ্গালা" এবং
"সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা সংকলন।

জমিদারি বন্দোবস্ত

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বহুতর খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রবল প্রতাপ পাল রাজগণের অধিকারেও সমগ্র বঙ্গে বহুতর সামন্ত নরপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামপাল এইরূপ চতুর্দশ সামন্ত রাজের সহায়তায় কৈবর্ত বিদ্রোহীর কবল হইতে পিতৃ রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন।[১] আটবিক ও প্রত্যন্ত ভাগের সামন্ত দল তখনও অর্ধ স্বাধীনভাবে ভূমি ভোগ করিতেন ইহা সহজেই অনুমেয়। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন প্রথমে দক্ষিণ রাঢ়ের সামন্ত রাজের উচ্ছেদের পরে তাহারই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেন বংশ সমগ্র বঙ্গে প্রভুত্ব স্থাপন করিলেও 'নিখিল চক্রতিলক' রূপে স্বীকৃত হইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। ক্ষুদ্র সামন্ত রাজগণ অধীনতা মাত্র স্বীকার করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে স্বাধীন ভাবেই ব্যবহার করিতেন। দক্ষিণে তাম্রলিপ্তিতে ময়ূর রাজবংশের বিলোপে কৈবর্ত সামন্তবর্গের উদ্ভব হইয়াছিল। এই মেদিনীপুরের সীমার মধ্যেই প্রবাদ ও কাব্যবর্ণিত লাউসেন রাজার অভ্যুদয়। লাউসেনের গৌড়েশ্বর পাল-রাজের পক্ষ হইয়া কামরূপ বিজয় এবং বর্ধমান ও বীরভূমির গোপবংশীয় ইছাই ঘোষের উচ্ছেদ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই গৃহীত হয়।[২] প্রাচীন ঢেকুর বর্তমান সেন পাহাড়ীর নিকটবর্তী ত্রিষষ্টিগড় বা শ্যামারূপার গড় এবং অজয় তীরে এখনও দণ্ডায়মান ইছাই ঘোষের দেউল গোপরাজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মেদিনীপুরে ময়নাগড় এখনও লাউসেনের স্মৃতি বহন করিতেছে। সেন রাজবংশের সময়ে বীরভূমির সেনভূমে ও পঞ্চকোট শেখর ভূমে বিভিন্ন সামন্তবর্গ বর্তমান ছিলেন। পাঠান সর্দারগণ বহুদিনের যুদ্ধ বিগ্রহের পরে বীরভূমির পশ্চিমাংশ জয় করেন; প্রধান নগর 'নগর' অবশ্য পাঠান-বন্যার প্রথম বেগেই ভাসিয়া গিয়াছিল। বর্ধমান মঙ্গলকোটের হিন্দু সামন্তরাজ পাঠানের প্রভাব সহ্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু বিষ্ণুপুর বা পঞ্চকোট কোন কালেই পাঠানের পদানত হয় নাই। দক্ষিণে সুন্দরবন ও সাগরদ্বীপের পার্শ্ববর্তী ভূভাগ নামে মাত্র অধিকৃত হইয়া পুনরায় হিন্দু ও মুসলমান ভূস্বামীর হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। পূর্বে ত্রিপুর রাজ পাঠানের অধীনতা স্বীকার দূরে থাকুক, সময়ে পাঠানের অধিকৃত নিম্নভূমি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছেন। কামরূপ ও কামতার স্বাধীন রাজার সহিত পাঠানের যুদ্ধ কলহ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। আহোমগণ পরে কামরূপের পূর্বাংশ জয় করিল; মোঘল সেনাপতির অভিযান বিফল হইল, ইহাও দেখা গেল।

কোচ রাজবংশ স্থাপয়িতা বিশ্বসিংহের বীর পুত্র শুক্লধ্বজ বা চিলরায়ের সহিত সোলেমান্ কররানীর পাঠান সেনার সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামী বুরঞ্জী বলিতেছে যে বন্দিভূত শুক্লধ্বজ সুলতানের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুক স্বরূপ বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, সেরপুর, গয়াবাড়ি ও দশকহানিয়া প্রাপ্ত হন।[৩] শুক্লধ্বজের

পরলোকান্তে তাহার ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পূর্বাংশ কোচহজো নামে কথিত হইত। পূর্বভাগে বর্তমান রঙ্পুর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির কিয়দংশ ছিল। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে গৃহবিবাদে বিব্রত হইয়া নৃপতি লক্ষ্মীনারায়ণ যখন সুবাদার ইসলাম্ খাঁর শরণাগত হইয়াছিলেন, তখনই কোচবিহার রাজ্য প্রকৃত পক্ষে মোঘলের আয়ত্ত হইল; রাজা করদ হইয়া পড়িলেন। মীর জুমলা এবং সায়েস্তা খাঁর সময়ে কোচবিহারের অধীনতা শৃঙ্খল আরও একটু শক্ত করিয়া বাঁধা হইলেও মোঘলেরা আভ্যন্তরীণ রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

দেশের অভ্যন্তরেও রাজস্ব আদায় কার্যে পাঠান রাজ সম্পূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ করেন নাই; স্থানে স্থানে শাসন এবং শান্তি রক্ষার নিমিত্ত যে সমস্ত জায়গিরদার ছিলেন তাহারাও এই ব্যাপারে হিন্দুর উপর নির্ভর করিতেন। এই নিমিত্তই পাঠান অধিকার কালে আমরা বহুতর হিন্দু ভূস্বামী ও অধিকারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। বরেন্দ্র ভূমে সেকালে অনেক প্রবল ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন। শুদ্ধ ভাতুরিয়ার ভূস্বামী গণেশ গৌড়ে বাদশা হইয়া সেকালের হিন্দু জমিদারের প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন, এমন নহে। তাহেরপুরের প্রাচীন রাজবংশ প্রভৃতি পাঠান আমলেই প্রবল প্রতাপে ভূমি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। গৌড় অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের কথা বৈষ্ণব কবির বর্ণনায় পাইতেছি। সেই চরিতামৃতেই মধ্যবঙ্গে সপ্তগ্রামের জমিদার বার লক্ষের অধিপতি হিরণ্য ও গোবর্ধন নামক কায়স্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ আছে। ভূরশুটের ভূস্বামী ও সমুদ্রগড়ের ব্রাহ্মণ রাজা অর্ধ স্বাধীন মতোই ছিলেন। সেকালের জমিদারবর্গের অনেকেরই গড়বন্দী বাটী ছিল; তাহারা দেশীয় বিদেশীয় সৈন্যসামন্ত রাখিতেন, বিচার কার্যের অধিকাংশ ভার তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল।

মোঘল অধিকারের অব্যবহিত পূর্বে প্রধান ভূস্বামীরা ভুঁইয়া নামে প্রসিদ্ধ হন। বার ভুঁইয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য, রামচন্দ্র বা কেদার রায়ের মতো ইশা খাঁ প্রভৃতি মুসলমান প্রধান ভুঁইয়া হইয়া উঠিয়াছেন। ইহারা পাঠানের সহিত মোঘলের যুদ্ধ কলহের সুযোগে স্বাধীন হইবার কল্পনা আঁটিয়া কিয়ৎকাল প্রবল মোঘল পক্ষকে বাধা দিয়া, ফলে নূতন জমিদারের সৃষ্টি করিয়া গেলেন। বঙ্গদেশকে মোঘলের অধীনতা শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইতে হইল।

উপরে সংক্ষেপে যাহা বিবৃত হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে আফগান্ পাঠানদিগের অধিকারে সমগ্র বঙ্গভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। প্রথম পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারম্বার বিফল মনোরথ হইয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের শতাধিক বৎসর পরেও পূর্ববঙ্গে সেনবংশীয় রাজা শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালেও গৌড়ের স্বাধীন পাঠান রাজ্য সমস্ত বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই।[৪] প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরকাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সেখানে ইস্লামের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিতেই সক্ষম হয় নাই। পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলভূমি পঞ্চকোট ও বিষ্ণুপুর স্বাধীন ছিল। দক্ষিণ পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের কথা দূরে থাকুক, মেদিনীপুরের কিয়দংশ ও হিজ্‌লী বহু কাল উড়িষ্যার হিন্দু রাজার অধিকারভুক্ত ছিল পাঠান শাসনের শেষ দশায় সুলেমান কররানীর সময়ে কালাপাহাড়ের কৃতিত্বে উড়িষ্যার সহিত এই ভূভাগ পাঠান অধিকারে আসিয়াছিল। পূর্বভাগে ত্রিপুরা মণিপুরের কথা

ছাড়িয়া দিয়া বর্তমান ভুলুয়া এবং চট্টগ্রামেও পাঠান শাসন রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই বিবাদী ভূমি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে মোগলের আয়ত্ত হয়। শ্রীহট্টের কিয়দংশ ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে পাঠানের অধিকৃত হইলেও ত্রিপুরা, কাছাড়, জয়ন্তী প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। উত্তরে রঙ্পুরের উত্তর ভাগের কামতা রাজ্য পাঠান রাজ্যভুক্ত হইলেও কোচ রাজারা পার্শ্ববর্তী ভূভাগ বহু কাল দখল করিয়াছেন। প্রাথমিক পাঠান যুগে বঙ্গবিজেতা মুসলমান সামন্তবর্গ বিজিত ভূভাগের নানা স্থানে জায়গির স্বরূপে অনেক স্থান পাইয়া দেশ শাসনে সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যন্ত ভাগ রক্ষা করা তাহাদের অসাধ্য ছিল।

পাঠান রাজের অধিকৃত বাঙ্গলার সীমা নির্দেশ করিতে হইলে অধ্যাপক ব্লকমানের কথায় নিম্নলিখিত রূপে করা যায়। পশ্চিম সীমায় গঙ্গার দক্ষিণ ভাগে তেলিয়াগড়ি হইতে রাজমহলের দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া দামোদর ও বরাকর নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট দিয়া বর্তমান বীরভূমির মধ্যভাগ হইয়া এক রেখা কল্পনা কর। এই রেখা বর্ধমানে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বর্তমান হুগলি জেলার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া রূপনারায়ণের মুখে মণ্ডল ঘাট পর্যন্ত আসিলেই পাঠান-বঙ্গের পশ্চিম সীমা নিরূপিত হইল। পূর্ণিয়া জেলার উত্তর সীমা হইয়া বর্তমান নেপাল তরাই-এর দক্ষিণ দিয়া কোচবিহারের নিম্নভূমি লইয়া ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্বে ভিতরবন্দের উত্তর পর্যন্ত এবং পরবর্তীকালে খোন্তাঘাট হইয়া গৌহাটী পর্যন্ত উত্তর সীমা। বর্তমান ময়মনসিংহের মধ্যদেশ দিয়া কিঞ্চিৎ পূর্বাভিমুখে শ্রীহট্ট হইয়া ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিম হইয়া পূর্ব সীমান্তরেখা। এই সীমার মধ্যেও সর্বত্র সর্বতোভাগে মুসলমান রাজ শাসনদণ্ড পরিচালনার সুবিধা পান নাই: হিন্দু জমিদারবর্গ স্থানে স্থানে অবসর পাইলেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রধান জমিদারগণ পাঠান আমলে অর্ধ স্বাধীনভাবেই রাজস্ব আদায় ও বিচার আচার করিতেন। আকবর শার বঙ্গ-বিজয়ের পর হইতে মোগল অধিকারে জমিদারবর্গের স্কন্ধে অধীনতা শৃঙ্খল ক্রমশ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়া আসিয়াছে। পাঠান আমলের অর্ধ স্বাধীন ভৌমিকের সহিত মোগল অধিকারের জমিদারের অনেক প্রভেদ। সেকালের সরকারি চৌধুরীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া পরবর্তী জমিদারির উৎপত্তি।

রাজস্ব আদায়

গৌড়ের পাঠান রাজগণের অধিকারে বাঙ্গলা দেশে ভূমির কর কি প্রণালীতে আদায় হইত, তাহার যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায় না। হিন্দু রাজত্বের শেষ অবস্থায় প্রধান রাজার অধীনে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন দেখা যায়। পাঠানেরা বাঙ্গলা অধিকার করিলে সীমান্ত ভাগের হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকে তাহাদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই; আবার কাহারও রাজ্যের কিয়দংশ পাঠান রাজ্যভুক্ত হইলেও তাহারা সুবিধা পাইলেই উহা পুনরায় অধিকারের চেষ্টা করিতেন। দেশের মধ্যভাগে এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে মুসলমান জায়গিরদার এবং থানাদারগণের কর্তৃত্বাধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদায়কারী জমিদার নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু তখনও তাহাদের জমিদার উপাধি হয় নাই। তখন চৌধুরী বা ক্রোরী (১ কোটি দাম রাজস্ব আদায়কারি) উপাধিধারী আদায়কারী ছিলেন। কোনো কোনো স্থলে এইরূপ রাজনিযুক্ত চৌধুরী বা অধিকারী উপাধির আদায়কারী জমিদার ক্ষুদ্র

রাজার মত প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেন। দৃষ্টান্ত স্থলে উত্তরবঙ্গের সাতগড়া এবং তাহেরপুরের জমিদার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজধানী গৌড় বঙ্গের এক প্রান্তে স্থাপিত হওয়ায় এবং সেকালে চলাচলের নানা অসুবিধা থাকায় পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের রাজস্ব আদায়ের ভার এইরূপ আদায়কারী জমিদারবর্গের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ইহারা নিজ অধিকারে ভূমির সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া শেষে ভুঁইয়া (ভৌমিক) নামে অভিহিত হন।

আসল জমা তুমার

আফগানগণকে নির্জিত করিয়া বঙ্গবিজয়ের পরে আকবর বাদশার আদেশে রাজা টোডরমল অন্যান্য প্রদেশের মতো বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত কার্যে প্রবৃত্ত হন। শের শা'র রাজস্ব বন্দোবস্তের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্তের কাগজ প্রস্তুত করেন। এই কাগজের নাম হইল 'আসল জমা তুমার'। ইহাতে সমগ্র বঙ্গের খাল্সা ভূমির রাজস্ব ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা এবং জায়গির ভূমির রাজস্ব ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা মোট ১,০৬,৯৩,২৬০ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। রাজকর্মচারিগণের ব্যয় নির্বাহার্থ যে জমির আয় নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই জায়গির জমা এবং অবশিষ্ট যে আয় রাজকোষে আসিবে তাহাকে খাল্সা জমা বলিত। এই রাজস্ব বন্দোবস্তে সমগ্র বঙ্গ কতকগুলি সরকার বা বৃহৎ বিভাগে এবং প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। কতকগুলি মৌজা বা গ্রাম লইয়া এক পরগণা এবং অনেক পরগণা লইয়া এক সরকার গঠিত হইয়াছিল। অনেক পরগণা পূর্বাবধি ছিল। টোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ ১৯ সরকার এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। সংক্ষেপে সরকারগুলির অবস্থান, ইহাদের পরগণা সংখ্যা ও জমা নির্দেশ করা যাইতেছে। প্রথমে খাল্সা জমির বিবরণ দেওয়া হইল :

(১) **সরকার জিন্নেতাবাদ বা গৌড় :** বর্তমান মালদহ জেলায় গঙ্গার পূর্বোত্তর সমগ্র ভূভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। ৬৬ পরগণায় এই সরকারের খাল্সা জমা ৪,৭১,১৭৪ টাকা।

(২) **সরকার পূর্ণিয়া :** কুশী নদীর পূর্বভাগে বর্তমান পূর্ণিয়া জেলার কতক অংশ। ৯ পরগণায় জমা ১,৬০,২১৯ টাকা।

(৩) **সরকার তাজপুর :** পূর্ণিয়ার পূর্ব প্রান্তের ভূভাগ লইয়া ইহা গঠিত; পরগণা সংখ্যা ২৯ এবং জমা ১,৬২,০৯৬ টাকা।

(৪) **সরকার পিঁজরা :** হাবেলী বা কয়েকটি খাস পরগণা লইয়া দিনাজপুর জেলায় ইহা অবস্থিত ছিল। ২১ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১,৪৫,০৮১ টাকা নির্দিষ্ট ছিল।

(৫) **সরকার ঘোড়াঘাট :** কোচবিহারের সীমার দক্ষিণে, তিস্রা হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বর্তমান রঙ্‌পুর জেলা লইয়া এই সরকার গঠিত হইয়াছিল। ৮৪ পরগণায় জমা ২,০৯, ৫৭৭ টাকা।

(৬) **সরকার বার্বেকাবাদ :** সরকার জিন্নেতাবাদের দক্ষিণে পদ্মা নদীর উভয় তীর ব্যাপিয়া বর্তমান রাজসাহী জেলার অধিকাংশ লইয়া এই সরকার গঠিত। পরগণা সংখ্যা ৩৮ এবং জমা ৪,৩৬,২৮৮ টাকা।

(৭) **সরকার বাজুহা :** বার্বেকাবাদ হইতে পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র পারে শ্রীহট্টের সীমা পর্যন্ত ঢাকা জেলা লইয়া গঠিত। ৩২ পরগণায় ইহার সদর জমা ৯,৮৭,৯২১ টাকা।

(৮) **সরকার সিলেট :** কাছারের প্রান্ত পর্যন্ত বর্তমান শ্রীহট্ট। ৮ পরগণায় ইহার সদর জমা ১,৬৭,০৪০ টাকা।

(৯) **সরকার সোনারগাঁ :** বর্তমান বিক্রমপুর হইতে মেঘনার পূর্বতীর ব্যাপিয়া শ্রীহট্টের দক্ষিণ ও ত্রিপুরার পশ্চিম পর্যন্ত ভূভাগ লইয়া গঠিত। ৫২ পরগণায় জমা ২,৫৮, ২৮৩ টাকা।

(১০) **সরকার ফতেহাবাদ :** সোনারগাঁর দক্ষিণ হইতে সমুদ্রকূল পর্যন্ত এবং সন্দ্বীপ, শাহবাজপুর প্রভৃতি দ্বীপ লইয়া গঠিত। ৩১ পরগণায় ইহার সদর জমা ১,৯৯,২৩৯ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

(১১) **সরকার চাটগাঁ :** ফতেহাবাদের দক্ষিণ পূর্ব এবং ত্রিপুরার দক্ষিণ হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগ। চট্টগ্রাম তখন সম্পূর্ণরূপে মোঘলের আয়ত্ত হয় নাই। কেবল ৭টি পরগণায় ইহার জমা ২,৮৫,৬০৭ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

(১২) **সরকার ওড়ম্বর :** শাকরীগলি হইতে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ লইয়া ভাগীরথীর অপর পারে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত চুনাখালি পরগণা পর্যন্ত এই সরকার বিস্তৃত ছিল। ইহার মধ্যে টাঁড়া ও রাজমহল স্থাপিত থাকায় ইহাকে সরকার টাঁড়া বা রাজমহলও বলা হইত। ৫২ পরগণায় ইহার জমা ৬,০১,৯৮৫ টাকা।

(১৩) **শরিফাবাদ :** ওড়ম্বরের দক্ষিণ হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমে বর্ধমান পরগণা পর্যন্ত ভূভাগ। ইহাতে ২৬ পরগণা এবং জমা ৫,৬২,২১৮ টাকা।

(১৪) **সেলিমাবাদ :** ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত। ইহাতে ৩১ পরগণার জমা ৪,৪০,৭৪৯ টাকা।

(১৫) **মাদারণ :** বীরভূমি হইতে দামোদর ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থলে মণ্ডলঘাট পর্যন্ত, পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের সীমা এবং দক্ষিণে সুন্দরবনের নিকট পর্যন্ত এই ভূভাগ। পরগণা সংখ্যা ১৬, জমা ২,৩৫,৮৮৫ টাকা।

(১৬) **সাতগাঁ :** উত্তরে পলাশী পরগণা হইতে ভাগীরথীর উভয় তীর ব্যাপিয়া স্থাপিত। বন্দর সপ্তগ্রাম ও হুগলি জেলা ইহার অন্তর্গত। ৪৩ পরগণায় ইহার সদর জমা ৪, ১৮,১১৮ টাকা।

(১৭) **সরকার মামুদাবাদ বা ভূষণা :** সরকার সাতগাঁর পূর্বদিকে ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ভূভাগ। বর্তমান নদীয়া ও যশোরের অধিকাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ৮৮ পরগণায় ইহার সদর রাজস্ব ২,৯০,২৫৬ টাকা।

(১৮) **সরকার খলিফাতাবাদ :** সরকার মামুদাবাদের দক্ষিণ সুন্দরবন পর্যন্ত, বর্তমান খুলনা ও প্রাচীন যশোর ইহার অন্তর্গত। ৩৫ পরগণায় জমা ১,৩৫,০৫৩ টাকা।

(১৯) সরকার বাকলা : খলিফাতাবাদের পূর্বে পদ্মার পশ্চিম তীরের বদ্বীপ, সমুদ্রকূল পর্যন্ত নিম্নভূমি। ৪ পরগণায় ইহার সদর জমা ১,৭৮,২৬৬ টাকা।

সমগ্র বঙ্গদেশ এই ১৯ সরকারে ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ইহার খাল্‌সা ভূমির রাজস্বের পরিমাণ ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা হইয়াছিল, পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিভাগের মধ্যে আখ্‌তা বা জায়গির ভূমি বিক্ষিপ্ত ছিল। তাহার পৃথক রাজস্ব ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা স্থির হইয়াছিল। এই সমস্ত জায়গির ভূমি প্রত্যন্ত ভাগে বা অপেক্ষাকৃত বেবন্দবস্ত

ভূভাগেই স্থাপিত ছিল। ফৌজদার, সেনানী ও অন্যান্য রাজকর্মচারিবর্গের ব্যয়ের জন্য ইহা নির্দিষ্ট থাকায় ইহাদের উন্নতির জন্য রাজ কর্মচারীদিগের যত্ন থাকিবে এই কল্পনা ছিল।

শাজাহানের রাজত্বকালে সুলতান সুজা বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া টোডরমলের বন্দোবস্ত সংশোধন করেন। তাহার সময়ে বাঙ্গলার উত্তরাংশে কতকগুলি স্থান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং সুবা উড়িষ্যা হইতে তিনি কতকটা খারিজ করিয়া লন। এই বর্ধিত ভূভাগের রাজস্বের সহিত টাকশাল প্রভৃতির আয় যোগ করিয়া তিনি অতিরিক্ত ১৫টি সরকারে ৩০৭ পরগণায় রাজস্ব ১৪,৩৫,৫৯৩ টাকা নির্দিষ্ট করেন। ইহা ব্যতীত তিনি টোডরমলের নির্দিষ্ট জমার উপর ৯.৮৭,১৬২ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ঐ বর্ধিত আয় ৩৬১ অতিরিক্ত পরগণা বা মহালে বিভক্ত করেন। এইরূপ সুজার সময়ে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত বন্দোবস্তে বাঙ্গলা দেশ অতিরিক্ত ১৫ সরকার ও ৬৬৮ পরগণায় বিভক্ত হইয়া সদর জমা ২৪,২২, ৭৫৫ টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। নিম্নে এই ১৫টি সরকারের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :

(২০) **কিস্‌মৎ গোয়ালপাড়া :** তমলুক ও আর দুইটি পরগণা লইয়া এই বিভাগ; ইহা একটি সরকারের অংশমাত্র। ৩ পরগণায় ইহার সদর জমা ১,১৪,৬০৯ টাকা।

(২১) **কিস্‌মৎ মালজেঠিয়া :** গোয়ালপাড়ার মতো ইহাও কয়টি পরগণার সমষ্টি। নিমক মহাল সহ হিজলি, জালামুঠা, মহিষাদল প্রভৃতি পরগণা ইহার অন্তর্গত। ১৭ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১,৮৯,৪৩২ টাকা।

(২২) **মজকুরী কিসমৎ :** বালেশ্বরের নিকটবর্তী বালসী প্রভৃতি কয়টি ক্ষুদ্র পরগণা লইয়া এই মজকুরী কিস্‌মৎ পত্তন হয়। ৪ পরগণায় ইহার জমা ২৫,২৮৫ টাকা।

(২৩) **জলেশ্বর :** সুবা উড়িষ্যার মধ্যে সরকার জলেশ্বরে যে সমস্ত হাবেলী বা খাস পরগণা ছিল, তাহা বাঙ্গলায় খারিজ করিয়া লইয়া এই নূতন জলেশ্বরের সৃষ্টি হয়। ৭ পরগণায় ইহার রাজস্ব ৫৩,৯০১ টাকা।

(২৪) **সরকার রমনা :** সুবর্ণরেখা নদীর অপর পারে ৩টি মাত্র পরগণায় এই ক্ষুদ্র সরকার, জমা ২৩,২৭২ টাকা।

(২৫) **বস্তা :** বন্দর জলেশ্বরের নিকট হইতে নীলগিরি পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্যন্ত স্থান লইয়া কিসমৎ বস্তা; ইহাও উড়িষ্যার খারিজি মহাল লইয়া গঠিত। ৪ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১২,৪২২ টাকা।

(২৬) **কোচবিহার :** কোচবিহার রাজের নিকট হইতে অধিকৃত তাহার রাজ্যের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভূভাগ। রঙ্গপুরের উত্তরাংশ ও কুণ্ডী প্রভৃতি পরগণা লইয়া এই সরকার গঠিত হয়। ইহাতে ২৪৬ পরগণায় সদর জমা ৩,২৭,৭৯৪ টাকা।

(২৭) **বাঙ্গালভূম :** রঙ্‌পুর ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থিত; ইহাও পূর্বে কোচবিহার রাজের অধীন ছিল। বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ নামক দুই প্রসিদ্ধ পরগণায় ইহা গঠিত। ২ পরগণায় ১,৩৭,৭২৮ টাকা জমা ধার্য হয়।

(২৮) **দক্ষিণ কোল :** ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে কড়াইবাড়ি প্রভৃতি পরগণা ইহার অন্তর্ভুত। ৩ পরগণায় জমা ২৭,৮২১ টাকা।

(২৯) **ধুবড়ী :** আসামের দিকে গোয়ালপাড়া পর্যন্ত ২ পরগণায় জমা ৬১২৬ টাকা।

(৩০) **উত্তর কোল ও কামরূপ :** ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ও উত্তর তীরে, ভুটানের নিচে আসামের প্রান্তে খোন্তাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। ৩ পরগণায় জমা ৩১,৪৫১ টাকা।

(৩১) **উদয়পুর :** ত্রিপুর রাজের নিকট অধিকৃত ভূভাগ। ৪ পরগণায় জমা ৯৯,৮৬০ টাকা।

(৩২) **মোরাদখানি :** সুন্দরবনে আবাদের উপযুক্ত ভূভাগ। ৪ পরগণায় জমা ৮,৪৫৪ টাকা।

(৩৩) **পেস্কস্ :** বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে বিষ্ণুপুর পঞ্চকোট প্রভৃতি ঝাড়খণ্ড অর্থাৎ ছোটনাগপুরের রাজারা মোগল সম্রাটকে বার্ষিক কিছু নজরানা পেস্কস দিতে স্বীকৃত হন। এই আয় সুজার সময় হইতে সরকার পেস্কস্ নাম পায়। ৫ মহালে এই পেস্কসের আয় ৫৯,১৪৬ টাকা।

(৩৪) **দার-উল জার্ব অর্থাৎ টাকশাল :** পেস্কসের মতো টাকশালের আয়কে এক স্বতন্ত্র সরকার বলিয়া ধরা হইয়াছিল; ঢাকা ও রাজমহলে দুই টাকশালে ২ মহাল ধরিয়া তাহার আয় ৩,২১,৩২২ টাকা জমা নির্দিষ্ট হয়।

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে সুলতান সুজার বন্দোবস্তের অতিরিক্ত সরকারগুলির মধ্যে ১৩টি ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে হইলেও টোডরমলের বিভাগের মতো বৃহৎ নহে। শেষ দুইটি অর্থাৎ পেস্কস ও টাকলালের আয়কে সরকার রূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সুজা জায়গির জমায় হস্তার্পণ করেন নাই, খালসা বিভাগেই কোন কালে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় হয় নাই, জায়গির বিভাগের ত কথাই নাই। যাহা হউক, সুজার সংশোধিত ব্যবস্থার পরে সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪ সরকার ও ১৩৫০ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল এবং উহার সদর জমা ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা নির্দিষ্ট ছিল।

পাঠান শাসনকালে যে সমস্ত ভূমি সরকারের খাসে আসিয়াছিল, তাহার রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত চৌধুরী এবং ক্রোরী নামধেয় হিন্দু কর্মচারি নিয়োজিত হইতেন। কথঞ্চিৎ কোন স্থলে দক্ষ মুসলমান ক্রোরী চৌধুরীও ছিলেন। হিন্দুরা বিশেষত বাঙ্গালি কায়স্থগণ বহুকাল হইতে রাজস্ব কার্যে অভিজ্ঞ থাকায় তাহাদেরই উপর এই ভার অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল।[৫] বরেন্দ্রভূমিতে ব্রাহ্মণ জমিদারেরাই প্রবল ছিলেন; কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে কায়স্থ জমিদার অধিক ছিল বলিয়া আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে জমিদারগণ প্রায়ই কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন। টোডরমলের বন্দোবস্তের পরে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী চৌধুরীগণও জমিদারে পরিণত হইয়া অর্ধ স্বাধীন রাজা বা জমিদারের মত স্বীয় দরবার, কর্মচারি ও সেনা নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। একালের প্রধান জমিদার গোষ্ঠীর মধ্যে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় মোঘলের বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরে বাঙ্গলায় আসেন এবং তাহার পুত্র বাবুরায় বর্ধমান ও সমীপবর্তী তিন পরগণার (মহালের) চৌধুরীর কার্যে নিয়োজিত হন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরবর্তী বর্ধমান অধিপতিরা রাজা উপাধি লাভ করেন। দিনাজপুরে আকবরশা'র রাজ্যের শেষ ভাগে বিষ্ণু দত্ত নামক কায়স্থ সন্তান প্রাদেশিক কানুনগো ছিলেন। শাজাহানের রাজত্ব কালে তাহার পুত্র শ্রীমন্ত চৌধুরী দিনাজপুরের জমিদারি প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্ত শ্রীমন্তের দৌহিত্র বংশই দিনাজপুরের রাজা। কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দও কানুনগো

দপ্তরে কার্য করিতেন। পরে রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে সাত বৎসরের মধ্যে ভবানন্দ উখড়া প্রভৃতি অনেক পরগণার জমিদারি পাইয়াছিলেন। বর্তমান যশোর চাঁচড়ায় বংশের পূর্বপুরুষ মনোহর রায়ও প্রতাপাদিত্যের উচ্ছেদের সময় জমিদারি পান। মানসিংহের কুণ্ডী প্রভৃতি জমিদারিও এই সময়ে বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। বর্ধমান, কুণ্ডী এবং কৃষ্ণনগরে নূতন জমিদারের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে যে কায়স্থ জমিদারদ্বয়ের বিদ্রোহ দমনের পর কিয়ৎকাল সহকারি মনোহর ভিন্ন অন্য কোনো কায়স্থ বড়ো জমিদারি পান নাই।

শের শাহের ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় পরিদর্শনের এবং প্রজাবর্গের স্বত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতি পরগণায় সরকারি আমিন, শিকদার ও কারকুন নিযুক্ত হইবার নিয়ম ছিল। রাজপথে বা নিজ নিজ অধিকারে চুরি রাহাজানি প্রভৃতি নিমিত্ত এই সময় হইতে চৌধুরী ও গ্রাম্য মণ্ডলদিগকে দায়ি করা হইত।(৬) জমিদারি বন্দোবস্তের হিসাব রক্ষার জন্য কানুনগো নিয়োগ পাঠান আমলেই প্রবর্তিত হয়। আকবরী ব্যবস্থার শেষে পরগণা কানুনগোর উপরে একজন প্রধান কানুন্‌গো নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহালের বন্দোবস্ত পর্যবেক্ষণের জন্য ডিহিদার থাকিতেন; ইহারা প্রজারক্ষার ভার পাইলেও সময়ে সময়ে চৌধুরী ও জমিদারের উৎকোচের লোভে 'ভক্ষক' হইয়া দাঁড়াইতেন।(৭) পাঠান আমলে জমিদারেরা সনন্দ পাইতেন কি না জানা যায় না; মোঘল অধিকারের জমিদারি সনন্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকবর শা'র সনন্দ দেখা যায় না; ভবানন্দের মানসিংহ দত্ত জাহাঙ্গীরের সনন্দ এবং শাজাহানের নামাঙ্কিত কয়েকখানি জমিদারি সনন্দ অদ্যাপি আছে।

জমিদারি সনন্দে মহালের সীমা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্ধনের চেষ্টা করিয়া যাহাতে দেয় রাজকর রীতিমত আদায় এবং সরকারে দাখিল হয় তাহা জমিদারের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে রাজপথ সংস্কার, প্রজাপালন এবং দুষ্টের দমনও জমিদারের কার্য ছিল। নূতন জমিদারির সনন্দ প্রাপ্তির সঙ্গে জমিদারকে এক জামিন নামা ও মুচল্‌কা কবুলতী লিখিয়া দিয়া সনন্দের নিয়ম পালনে অঙ্গীকার করিতে হইত। যথেচ্ছ জমিদারি উচ্ছেদ মুসলমান রাজের আইন সঙ্গত ক্ষমতা হইলেও দেশাচার মতে কোনও জমিদারের লোকান্তরের পর তাহার উত্তরাধিকারীই ঐ জমিদারি পাইতেন। বিদ্রোহ বা রাজকর আদায় দানে চিরশৈথিল্য উৎখাত হইবার কারণ হইত।(৮) বিক্রয়াদি দ্বারা জমিদারি হস্তান্তরের প্রয়োজন হইলে মোঘল সুবাদারের অনুমতি লইতে হইত।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিজেতা পাঠান সামন্তবর্গকে তাহাদের সেনাদল রক্ষার ব্যয় স্বরূপ জায়গির ভূমি দেওয়া হইয়াছিল। এই সমস্ত জায়গিরদার, থানাদার ও ডিহিদার যে সকল স্থানে রাজকর আদায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। কোথাও বশীভূত প্রাচীন হিন্দু ভূস্বামী বংশের লোকের হস্তেই এই ভার দিয়া আদায় রীতিমত হইতেছে কি না, দেখিয়া লইয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন; ক্বচিৎ কোন জায়গিরদার একার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জায়গিরের এক প্রাচীন সনন্দে দেখা যায়,(৯) পূর্বতন আদায়কারি ও রায়তদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় লইয়া জায়গিরদার প্রজাবর্গকে সুশাসনে রাখিবেন। এই সনন্দ প্রাচীন পাঠান আমলের নহে,

কারণ কানুনগো নিয়োগ পরবর্তী মুসলমান রাজের ব্যবস্থা। আভ্যন্তরিক শাসন বা বিচারকার্যে জায়গিরদার হস্তার্পণ করিতেন না। গ্রামিক ও মণ্ডল প্রভৃতির হস্তেই এই সমস্ত কার্য ন্যস্ত ছিল। শান্তি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত এই জায়গিরদার বা থানাদার দ্বারা সময়ে সময়ে অত্যাচার অনাচার হওয়ায় প্রজাবর্গের মধ্যে অশান্তি উৎপাদিত হইত। কিন্তু প্রথম যুগের পাঠান সামন্তবর্গ দিল্লির রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়ায় অনেক সময়ে যুদ্ধ কলহে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই নিমিত্ত হিন্দু চৌধুরী ও প্রজাবর্গের সহিত সদ্ভাবে থাকাই তাহাদের স্বার্থ ছিল। ক্রমে তাহাদের সহিত লোকের রাজা প্রজা সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া আইসে; এবং স্থায়িভাবে এদেশে বসতি করায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তারের চেষ্টাও ইহাদের মধ্যে অনেকেই করিতেন। মুসলমান থানাদার ও ডিহিদারের সাময়িক অসদাচরণের কথা কাব্যাদিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এই শ্রেণির অত্যাচার সাধারণ ছিল না।

জায়গিরদারের অধীনে যে সকল চৌধুরী বা জমিদার ছিলেন, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট ভূস্বামীদিগের সাধারণ অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেকালের জমিদার বর্তমানের মত ভূমিতে স্বত্ববিশিষ্ট ভূম্যধিকারী না হইলেও দেশীয় প্রথা মতে পুরুষানুক্রমে আদায়কারী হওয়ায় ক্রমে মধ্য স্বত্বাধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জমিদারদিগের আদায় কার্যে সহায়তা করার জন্য সেকালে গ্রামে গ্রামে পাটোয়ারি এবং মণ্ডপ বা মির্ধা থাকিতেন। মোগল আমলের প্রথমে রাজস্ব বন্দোবস্ত সুস্থির হইয়া গেলে এই পাটোয়ারিগণ মহালের নিরিখ বন্দি মতে নূতন প্রজা বন্দোবস্ত এবং আদায় করিয়া আসিতন। মণ্ডল আদায় কার্যে সহায়তা করিতেন। অনেক স্থলে গ্রামের দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিবাদের মীমাংসার ভার তাহাদেরই হস্তে ছিল। বড় মোকদ্দমা জমিদার বা থানাদার ফৌজদারের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিত মাত্র। জমিদার কোন অত্যাচার করিলে রাজকীয় কর্মচারির নিকট আবেদন অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়া প্রজার অনুগত থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। স্বায়ত্ত-শাসন মণ্ডল পঞ্চায়েতের কল্যাণে তখন পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী ছিল। দেশীয় জমিদারের হস্তে উৎপীড়ন সেকালে সাধারণ ছিল না। ধর্মানুমোদিত কার্যে তখন ছোট বড় সকলেরই মত ছিল। হিন্দু জমিদারেরা আপন কুটুম্ব, প্রিয় ভৃত্য এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া প্রতিপালন করিতেন। চৈতন্যচরিতের কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল :

পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥
হিরণ্য গোবর্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন, ধার্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্তী করে দোঁহার ভ্রাতৃ ব্যবহার॥

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

সেই গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস। এই রঘুনাথ দাস শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে শান্তিপুর আসিয়া নিভৃতে বিষয় ত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে তখন "মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাশক্ত হৈয়া"—ইত্যাদি কথায় উপদেশ দিয়া, বাটী প্রত্যাগমনের পরামর্শ দেন। সপ্তগ্রামের জমিদারদ্বয়ের ধর্মপ্রবণতা ও সদাচার সেকালের অন্য হিন্দু জমিদার বংশেও দুষ্প্রাপ্য ছিল না। ধর্মার্থে দান, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকর্ম তখনকার আর্য হিন্দু সমাজে অবশ্য কর্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। ব্রাহ্মণের বাসের বাটী নিষ্কর ছিল। হিন্দু জমিদার স্বয়ং কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলে দেবোত্তর নিষ্কর জমি নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত। তাহাদের অধিকার মধ্যে গ্রাম দেবতার পূজাদি নির্বাহ হওয়ার নিমিত্তও নিষ্কর ভূমি দেওয়া থাকিত। হিন্দু জমিদারের মুসলমান প্রজার ধর্মার্থে এবং মুসলমান জমিদারের হিন্দু দেব-সেবার জন্য ভূমিদান ও অসাধারণ ছিল না; এই কারণেই বাঙ্গলায় দেবোত্তর ও পীরোত্তর জমির পরিমাণ ক্রমে অধিক হইয়া উঠায় দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জমিদারের কর্মচারিরা সাধারণত নিষ্কর কোথাও বা অতি সামান্য কর বিশিষ্ট ভূমি ভোগ করিতেন; এবং উত্তরাধিকার ক্রমে দখলে থাকায় ইহা তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। চৌকিদার প্রভৃতির নিষ্কর চাকরান জমি ছিল।

মুসলমান রাজের প্রধান কর্মচারিরা সময়ে সময়ে জমিদারকে বিপন্ন করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে—

> হেন কালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
> সপ্তগ্রাম মুলুকের সেই হয়ত চৌধুরী॥
> হিরণ্য দাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া।[১০]
> তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া।
> বার লক্ষ দেয় রাজায় সাধে বিশ লক্ষ॥
> সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥
> রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল,
> হিরণ্যদাস পলাইল, রঘুনাথে বান্ধিল॥

রঘুনাথ সেই ম্লেচ্ছকে যে ভাবেই হোক বশ করিয়া পিতার সহিত গোল মিটাইয়া দেন, মুসলমান কর্মচারী যে জমিদা'র বা ইজারাদারকে সহজেই গোলে ফেলিতে পারিত, এ কথা উদ্ধৃত উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়। তবে জমিদারের প্রদত্ত উপহারে সকল কালের রাজকর্মচারিই শান্ত মূর্তি পরিগ্রহ করেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

পাঠান অধিকারের সামান্য আদায়কারী বা চৌধুরীর বংশানুক্রমে কার্য করায় প্রবল জমিদার রূপে পরিণত হওয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বরেন্দ্র বা অন্যস্থানের প্রাচীন প্রভাবশালী ভূস্বামীদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে নিজ নিজ কৃতকার্যের দোষে বা রাজপুরুষগণের অকৃপায় সম্ভ্রমের সহিত সম্পত্তিও হারাইয়াছিলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের যে কয়েক জন অর্ধস্বাধীন ভৌমিক মোগলের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে গেলেন, তাঁহারা রাজ্য হারাইলেও যাহারা সুবাদারদিগের সুনজরে পড়িয়া জমিদারি পাইলেন তাঁহারা ক্রমে বড় জমিদারে পরিণত হইতে লাগিলেন, গড়বন্দি বাটী ফৌজ প্রভৃতি উপযুক্ত উপকরণ তাঁহাদিগকে দুই তিন পুরুষের মধ্যেই পূর্বতন ভূস্বামীদিকের মত

প্রভাবশালী করিয়া তুলিল। মোগল অধিকারে রাজকীয় সনন্দে রীতিমত কর আদায় এবং তাহা সরকারে দাখিল করা ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখা জমিদারের প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও দুষ্টের দমন প্রভৃতি আভ্যন্তরিক শাসন ও বিচারের ভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত থাকায় প্রধান জমিদারেরা ক্রমশ প্রকৃত পক্ষে রাজা হইয়া উঠিলেন। জমিদারি উচ্ছেদ মুসলমান রাজের আইনসঙ্গত হইলেও বারাম্বার রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতা এবং বিদ্রোহই কেবল উচ্ছেদের কারণ হইত; নিলামের ব্যবস্থা ছিল না। এই সমস্ত কারণে মোগল অধিকারের জমিদার ক্রমে স্বত্ব বিশিষ্ট ভূস্বামী হইয়া উঠেন।

মুসলমান অধিকারে বাঙ্গালি হিন্দু প্রজার স্বত্ব ও অধিকার কিরূপ ছিল এই বিষয় লইয়া ইংরেজ অধিকারের প্রথম আমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় অনেক জল্পনা কল্পনা ও লেখালেখি হইয়াছে। হিন্দু রাজত্বকালে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব ছিল এবং গ্রামাধিকারী প্রভৃতি রাজকীয় আদায়কারীরা পরবর্তী কালের ভূম্যধিকারীর মত ছিলেন না। পাঠান অধিকারে নানা শ্রেণির মধ্যে স্বত্বাধিকারী ভূস্বামী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রজার স্বত্ব ক্রমে সঙ্কুচিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের প্রজাগণ পুরুষ পরম্পরায় একই স্থানে বাস করিয়া উত্তরাধিকার ক্রমে নিজ জমিতে দখলি স্বত্ব ভোগ করিত। পাঠান অধিকারে রায়তের অধিকারের কথা জানা যায় না। মোঘল রাজের বন্দোবস্তের সময়ে পরগণা ওয়ারী নিরিখবন্দি প্রস্তুত হইয়াছিল। ভূমির নিরিখ বা রাজস্বের হার নানা রূপ ছিল। 'নিরিখবন্দি' অর্থে গ্রামের বা পরগণার জমির বিঘা প্রতি ধার্য করের হিসাব রেজিস্টার। গ্রাম্য পাটোয়ারি এইরূপ নিরিখবন্দি অনুসারে ধার্য রাজকর আদায় করিতেন; কোন প্রজা জমি ইস্তফা করিলে অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করাও তাহার কার্য ছিল। গ্রাম্য জমাবন্দি তাহার হস্তে থাকিত। তিনি পারিশ্রমিক স্বরূপ চাকরান সম্পত্তি ভোগ করিতেন এবং রায়তদের নিকট তহরী ও পার্বণী পাইতেন। মোঘল রাজের পক্ষ হইতে পরগণা নিরিখবন্দি এবং জমিদার ইজারাদারের কার্য পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত পরগণা কানুনগো থাকিতেন। প্রাদেশিক প্রধান কানুনগো সমগ্র জমিদারি বন্দোবস্তের কাগজ রাখিতেন; নূতন বন্দোবস্তে তাহার দপ্তরে খারিজ দাখিল করিয়া লইতে হইত। এই কারণে প্রধান কানুনগো প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। এখনও মুর্শিদাবাদের পরপারে প্রধান কানুনগো বংশের বাটী আছে। পূর্বে জমিদারেরা পার্বণী বা অতিরিক্ত কর আদায় করিতেন না। পরবর্তীকালে সরকার হইতে মাথট নামে আবওয়াব্ আদায় আরম্ভ হওয়ায় তাহারাও প্রজার নিকট বাজে আদায় প্রচলন করেন। শস্যের মূল্য অল্প হওয়ায় চাষী প্রজার অবস্থা সেকালে সচ্ছল ছিল না; কিন্তু সুখ ভোগের উপকরণ না জুটিলেও উদরান্নের জন্য কাহারও কষ্ট ছিল না।

তথ্যসূত্র

১. রাম চরিত—সন্ধ্যাকর নন্দী (As. Soc).

২. আমরা প্রাচীন পঞ্জিকায় কলির রাজ-চক্রবর্তী নামের শেষে লাউসেন নামের নির্দেশ দেখিয়াছি। তিব্বতীয় পণ্ডিত তারনাথের গ্রন্থে যে লবসেনের উল্লেখ আছে, তিনি এই লাউসেন হইতে পারেন।

৩. Gait's History of Assam.

৪. আমার নবাবী আমলের ইতিহাসেও এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এবং এই স্থানে তাহার অনেক উদ্ধৃত হইল।

৫. পাল রাজগণের সময়েও ব্রাহ্মণের মত কায়স্থেরাও 'বিষয়ব্যবস্থায়' অভিজ্ঞ বলিয়া 'মহত্তর, দশগ্রামিকাদি' কার্যে নিযুক্ত হইতেন, (ধর্মপালের খালিমপুর লিপি)। পরবর্তীকালেও বহুতর কায়স্থ সন্তানের এই সমস্ত কার্যে নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কানুনগোর কার্য ত কায়স্থের একচেটিয়া মতই হইয়াছিল।

৬. Tarikh-i Firojshahi.

৭. কবিকঙ্কণের ডিহিদার 'মামুদ শরীফ' ইহার দৃষ্টান্ত।

৮. আমার নবাবী আমলের ইতিহাস হইতে এই অংশ গৃহীত।

৯. জায়গিরের সনন্দের অনুবাদ। "এই খ্যাতাপন্ন সর্বজন মাননীয় আদেশপত্র দ্বারা আজ্ঞা দেওয়া হইতেছে যে অভিজাতবর্গের মধ্যে কুসুমস্বরূপ অমুকের দখলী .... পরগণায় ভিন্ন ভিন্ন জমির উপস্বত্ব .... টাকা বর্তমান বর্ষের প্রথম ফসল হইতে রাজকর্মচারিগণের মধ্যে সবিশেষ অনুগৃহীত ..... কে জায়গীর স্বরূপে প্রদত্ত হইতেছে। চৌধুরী, কানুনগো, প্রজা বা যে কাহারও এই ভূমির সহিত কোনো সম্বন্ধ আছে তাহারা যেন ইহাকে জায়গিরদার বলিয়াই স্বীকার করে এবং তাহাকে বা তাহার কর্মচারিকে দেয় রাজস্ব আদায় দেয়। বাকি রাজকর পূর্ব অধিকারীকে দিতে হইবে। ইহাতে যেন কোনোরূপ বিঘ্ন না হয় এবং আদেশমত কার্য নিষ্পন্ন হয়"—নবাবী আমলের ইতিহাসে উদ্ধৃত।

১০. ঠিকা মোক্তা কথা অদ্যাপি জমিদারি সেরেস্তায় প্রচলিত। চৈতন্য চরিতের টীকায় ব্রজবাসী গোস্বামী মহাশয় 'মোক্তা' মানে ছল বুঝিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

জমিদারি বন্দোবস্ত ঃ ২

আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী জমিদার নামে কথিত এক শ্রেণির ভূম্যধিকারী রহিয়াছেন। কিন্তু ভারতের অন্য কোথাও ঠিক এ ভাবের ব্যবস্থা নাই দেখিয়া, জমিদার শ্রেণির উৎপত্তি বিষয়ে নানা মতের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন কালের অবস্থা আলোচনা করিতে হইলে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজত্বের সময়ে রাজ-গ্রাহ্য ষষ্ঠাংশ কর দেশভেদে গ্রামপতি, প্রধান, দেশমুখ্য প্রভৃতি নামের রাজকর্মচারিবর্গের দ্বারা আদায় করা হইত। পৌরাণিক যুগে সমগ্র ভারত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রাদেশিক রাজন্যবর্গ যখন কোন পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট পরাজিত হইয়া তাহার শাসনাধীন হইতেন, তৎকালে তাহারা কোথাও বা বিজেতা রাজার করদ হইয়া পড়িতেন, কুত্রাপি কেবল অধীনতা মাত্র স্বীকার করিয়াই অব্যাহতি পাইতেন। বিজেতা রাজচক্রবর্তী বা মণ্ডলেশ্বর ভূপতি, বশ্যতা স্বীকার করিলে ক্ষুদ্র রাজগণের প্রায়ই উচ্ছেদ করিতেন না। এইরূপে বঙ্গের প্রত্যন্ত ভাগে অনেক খণ্ডরাজ্য গঠিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগে বিজেতা পাঠানেরা বাঙ্গলার সীমান্তভাগের রাজগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত বা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই; দেশের অভ্যন্তরেও অনেক স্থলে রাজস্ব আদায়কারী চৌধুরী (চতুর্ধুরীণ) দিগকে উৎখাত করেন নাই। বিজেতা পাঠানরাজ ও সামন্তবর্গ যখন দিল্লিশ্বরের অধীনতা হইতে শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধাদি কার্যে ব্যাপৃত হইলেন, তখন হিন্দু রাজা ও প্রধান-বর্গের সহানুভূতি লাভ করিবার প্রয়াস পাওয়া তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল। এই কারণে অনেক সময়ে গৌড়ের বাদশা কোন সীমান্তভাগের হিন্দু রাজাকে পরাভূত করিলেও তাহাকে শাসনাধীন করিয়া তাহারাই সাহায্যে রাজস্ব আদায় করা সুযুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়াছেন এবং প্রধান প্রধান আদায়কারী চৌধুরীদিগের ক্ষমতা লোপ করিবার উদ্যোগ করেন নাই। গৌড়ের মুসলমান নরপতিগণ যে কেবল দূর দেশেই এই ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন এরূপ নহে; নিজ গৌড়ের পার্শ্ববর্তী স্থানেও হিন্দুরা রাজস্ব আদায় করিতেন। ভাতুড়ে বা দিনাজপুরের রাজা গণেশ, তাহেরপুরের কংসনারায়ণ, হোসেন্ শার প্রতিপালক ‘গৌড় অধিকারী’ (গৌড়ের ভূস্বামী বা রাজস্ব আদায়কারী) সুবুদ্ধি রায় প্রভৃতি সাধারণের পরিচিত—হিন্দু ভূম্যধিকারীর দৃষ্টান্তে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তবে পাঠান রাজত্বের সময়ে দেশের নানাস্থানে মুসলমান সামন্তবর্গকে সৈন্য রাখিবার ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমি প্রদত্ত হইত; এইরূপে বাঙ্গলায় মুসলমান জায়গিরদারের উৎপত্তি হয়। জায়গিরের প্রাচীন সনন্দে দৃষ্ট হয় যে, পূর্বতন আদায়কারীদিগের ও রায়ৎগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় লইয়া জায়গিরদার প্রজাবর্গকে সুশাসনে রাখিবেন, এই নির্দেশ আছে।

পরবর্তী কালে বঙ্গদেশে ভৌমিক নামধারী ভূস্বামী বা জমিদারবর্গের উল্লেখ দেখা যায়। পাঠান রাজত্বের চিরস্থায়ী বিপ্লবের সুযোগে পূর্বকথিত চৌধুরিগণের অনেকে বলশালী

হইয়া নিজ নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিয়া শেষে অর্ধস্বাধীন ভূস্বামীর ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করেন। কেহ বা অবসর পাইলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেন। রাজা গণেশ গৌড়ের রাজদণ্ডই কাড়িয়া লইয়াছিলেন; কংসনারায়ণ প্রভৃতি কেহ কেহ গৌড়েশ্বর বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। গৌড়ের বাদশা প্রবল হইলে, ভৌমিকগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া অগত্যা 'ভালমানুষ' হইতেন। যাহা হউক, এই ভৌমিকগণ সরকারের নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া নির্বিবাদে রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। গৌড়াধিপ অপেক্ষা ইহাদের সঙ্গেই প্রজার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের সেনাদল ও দুর্গ ছিল; পূর্ববঙ্গের অনেক ভৌমিকের রণতরীও থাকিত। ইহাদের কল্যাণে সীমান্তভাগের স্বাধীন রাজগণের কবল হইতে দেশ রক্ষা হইত; মগ ফিরিঙ্গি প্রভৃতি পরবর্তী কালের দস্যুদলের আক্রমণ নিবারণেও ইহারা যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। শান্তি রক্ষা ভিন্ন বিচার বিতরণ ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যবস্থা ইহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। সাধারণতঃ উত্তরাধিকার ক্রমেই ইহাদের বংশাবলী এই সমস্ত ক্ষমতা লাভ করিতেন; গৌড়ের মুসলমান রাজা এইরূপ অধিকার স্বীকার করিয়া পরোয়ানা জারি করিতেন মাত্র। অবাধ্য ভৌমিকের উচ্ছেদ করিতে পারিলে, অন্যকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইত; আবার অনেক স্থলে রাজার এইরূপ কার্য দেশের লোকের সাহায্যেই সম্পন্ন করা হইত। পাঠান রাজত্বের শেষদিকে বাঙ্গলা দেশে বার জন প্রধান ভৌমিক থাকায় বাঙ্গলা দেশ 'বার ভুঁইয়ার মুলুক' বলিয়া খ্যাত হয়।[১] আকবর-নামার 'ভাটি' অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গেই বার ভুঁইয়া ছিল বলিয়া নির্দেশ আছে। আকবর শাহের বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে যশোহরের স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্য, স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং ঢাকা অঞ্চলে ঈশা খাঁ প্রভৃতি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন বলিয়া অনেকে এই সময়েই ভৌমিকের আবির্ভাব এইরূপ নির্দেশ করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। বাস্তবিক দেশীয় লোকপ্রবাদে এবং সাহিত্যে গৌড়ের মুসলমান ভূপতির সভায় ভুঁইয়াদের অধিষ্ঠান চিরদিন চলিয়া আসিয়াছিল দেখা যায়। ভৌমিকেরা কালক্রমে নিজ অধিকারের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের সৃষ্টি করেন। এইরূপে মোঘল অধিকার কালে বাঙ্গলায় ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদার অনেক দৃষ্ট হয়। আকবরের বঙ্গবিজয়ের পরে কয়েক বৎসরে অর্ধ স্বাধীন ভুঁইয়াগণ উৎখাত হওয়ায় দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র জমিদারবর্গই থাকিয়া যান।

রাজা ও জমিদার। ভৌমিকগণ ব্যতীত পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর, ময়ুরভঞ্জ এবং ত্রিপুরা, আসাম, কুচবিহার প্রভৃতি বঙ্গের সীমান্তপ্রদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজারা যখন মুসলমান রাজের নিকট পরাভূত হইতেন, তখন তাহারা কিঞ্চিৎ উপঢৌকন, কখনও বা কিছু নজর পেস্‌কস্ অথবা সামান্য কর দান স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইতেন।... পাঠান আমলে ইহাদের কেহ বা আধুনিক মিত্ররাজের মত ব্যবহার করিতেন, কেহ বা এতই বলশালী ছিলেন যে, কখনই অধীনতা স্বীকার করেন নাই। মোঘল অধিকার কালে রাজ্যবিস্তারের সময়ে কোন প্রত্যন্ত হিন্দু ভূপতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, কোথাও বা বশ্যতা স্বীকার মাত্রেই কার্য শেষ হইয়াছে, কোথাও বা সামান্য কর দানেই যথেষ্ট হইয়াছে। অনেক সময়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবেন বলিয়া নজর পেস্‌কস্ দিয়াই তাহারা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। দেশের মধ্যভাগের ভৌমিকেরা অনেক সময়ে এই সমস্ত স্বাধীন রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন. পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহাদের অধীন চৌধুরী বা

তালুকদারবর্গও ক্রমে অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড় রাজার অনুকরণে দরবার, দুর্গ ও সেনাদলের প্রতিষ্ঠা করিয়া লোক দৃষ্টিতে রাজা হইয়া পড়িয়াছেন। শান্তিরক্ষা ও বিচার ভার জমিদারের হস্তেই ন্যস্ত থাকায় তাহাদের এই সুবিধা ঘটিয়াছিল। আকবর বাদশাহের সময় হইতে পূর্বতন মুসলমান জায়গিরদারের উচ্ছেদ হইবার পরে হিন্দু জমিদারবর্গের সুবিধা আরও বর্ধিত হয়। কিন্তু মোঘলশাসনে পূর্বতন পাঠান আমলের দুর্বলতা ছিল না। বাদশাহী সুবাদারের প্রবল প্রতাপে জমিদারবর্গ অধিকতর আয়ত্ত হইয়া পড়িলেন। আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, বিচার বিতরণ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনের ভার পূর্বমত তাহাদের হস্তে থাকিলেও তাহারা এবং প্রজাবর্গ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে 'এ বড় বিষম ঠাঁই'— এখানে পূর্বকালের মত লীলাখেলা চলিবে না। জমিদারকে যথাসময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে, এই রাজস্ব বর্ধিত হইতেও পারে। উত্তরাধিকারক্রমে জমিদারি থাকিতে পারে, কিন্তু নূতন সনন্দ লইতে হইবে; সুবাদার প্রসন্ন না থাকিলে, জমিদারি অন্যের হস্তে যাইবে। রাজস্বদানে ক্রমাগত ত্রুটি দেখাইলে, সরকারি আমিল্ বা ইজারাদার আসিয়া জমিদারির খাজানা আদায় করিবে; সুবাদার দয়া করিয়া এরূপ স্থলে জমিদারের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য যদি 'নান্‌কর' মঞ্জুর করেন, তাহাই যথেষ্ট অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মোঘল অধিকারের শেষ দিকে বাঙ্গলার জমিদারবর্গকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে :—

(১) **প্রাচীনকালের স্বাধীন বা করদ হিন্দুরাজগণ :** ইহারা মুসলমান শাসনের চূড়ান্ত বৃদ্ধির দশায় কোথাও স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে কোথাও বা আংশিক অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। সীমান্তভাগেই ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ রাজ্যের কিয়দংশ মুসলমান-রাজেব অধিকৃত ইহা স্বীকার করিয়া তাহার জন্য সামান্য কর দিতেন— যেমন ত্রিপুরা, পঞ্চকোট। আবার কেহ কেহ নজর পেস্‌কস্ মাত্র দিয়া অধীনতা স্বীকার করিতেন মাত্র; ইহাদের নিকট রীতিমত রাজস্ব আদায় হইত না। নামেমাত্র অধীন হইলেও ইহারা স্বরাষ্ট্রে স্বাধীন রাজার মত ব্যবহার করিতেন।

(২) **হিন্দু বা মুসলমান সামন্তগণ :** দেশের প্রান্তভাগে বা রাজধানী হইতে দূরদেশেই ইহাদের আবির্ভব। প্রতাপশালী সুবাদারের শাসনে ইহারা রীতিমত রাজস্ব প্রদানে বাধ্য হইতেন; কিন্তু সুবিধা পাইলে সরকারকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের অবসর ত্যাগ করিতেন না। আভ্যন্তরীণ শাসন ও বিচার ইহাদেরই হস্তে ছিল।

(৩) **পূর্বতন রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী, তালুকদার এবং অন্য অর্থশালী ব্যক্তিগণ,** যাহারা অন্যের জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া লইতেন—তাহাদের সকলকে এই শ্রেণির অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। ইহারাও ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

নিম্নে প্রদত্ত মুর্শিদ্‌কুলি খাঁর জমিদারি বন্দোবস্তের বিশেষ বিবরণে উল্লিখিত কথাগুলি পরিস্ফুট হইবে। ... মুর্শিদ্‌কুলি খাঁ ১৭২২ খ্রি: অব্দে (১১২৮ বাং, ১১৩৫ হি:) সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করিয়া সেইগুলিকে ২৫টি জমিদারি ও ১৩ জায়গিরে বন্দোবস্ত করেন। তাহার এই বন্দোবস্তের কাগজের প্রসিদ্ধ নাম 'জমা কামেল্ তুমারী'।

নবাব সুজা খাঁর সময়ে কুলি খাঁর নির্দিষ্ট রাজস্বের মধ্যে ৪২,৬২৫ টাকা মাত্র নাজাই বাদ যায়; তৎপরে সুজা খাঁ স্বয়ং ১৯ লক্ষ টাকারও অধিক নূতন আব্‌ওয়াব স্থাপন করিয়া উক্ত বন্দোবস্ত পাকা করেন,... এই জমিদারি বন্দোবস্ত পরবর্তী বন্দোবস্তগুলির, এমন কি দশ সালা বন্দোবস্তেরও ভিত্তি স্বরূপ; এই কারণে বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহা বিশেষ রূপে আলোচ্য। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, বাঙ্গলা দেশের জমিদারেরা অনেক স্থলেই উত্তরাধিকার ক্রমে জমিদারি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। অবশ্য মুসলমান রাজা জমিদারি দানের ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিয়া নূতন সনন্দ দিতেন। ... নিম্নে সংক্ষেপে জমিদারি বন্দোবস্ত বর্ণিত হইল।

১ম ত্রিপুরা : ত্রিপুরার হিন্দু নরপতিগণ প্রাচীন কাল হইতে স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। পাঠান রাজগণ ত্রিপুরা-রাজের মধ্যে দন্তস্ফুট করিতে পারেন নাই। আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধ কার্যে হীনবল হওয়ায় পরে তাহারা মোঘল সম্রাটের নিকট কিয়ৎপরিমাণে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। শাজাহানের সুবাদারী আমলে ত্রিপুরারাজ্যের নিম্নভূমির কিয়দংশ মোঘলের অধীন হইয়া ৪ পরগণায় সরকার উদয়পুর নামে অভিহিত হইয়াছিল। মুর্শিদ্‌কুলি খাঁর সময়ে ত্রিপুরা-রাজ রামমাণিক্য বশ্যতা স্বীকার করিলে উক্ত চারি পরগণায় নামে মাত্র এক জমা ধার্য করা হয়। সুজা খাঁর সময়ে রামমাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্যের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে হস্তী ধৃত করিয়া দিবার ব্যয় বলিয়া ৪৫ হাজার টাকা বাদ দিয়া, মূল ৪ পরগণাকে ২৪ পরগণায় বিভক্ত করিয়া চাক্‌লে রোসেনাবাদ নামে নিম্ন ত্রিপুরার রাজস্ব ৪৭,৯৯৩ টাকা স্থির হয়। ...নবাবী আমলে সময়ে সময়ে কিছু পেস্‌কস্ ভিন্ন অন্য কোন রাজকর ত্রিপুরা হইতে কদাচিৎ আদায় হইত। মীরকাসেমের বন্দোবস্তের কৈফিয়তে ৯৬,৭৫৮ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

২য় পঞ্চকোট : পঞ্চকোট বা পাচেটের ক্ষত্রিয় রাজপুত রাজারা বহুপূর্ব কাল হইতে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিলেন। মুসলমান অধিকারে ইহারা কখনও বাঙ্গলার কখনও বা বিহারের সীমান্তভাগের অর্ধ স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মোঘল অধিকারে ইহারা অধীনতামাত্র স্বীকার করিয়া সামান্য পেসক্‌স্ বা নজরাণা দিতে সম্মত হইয়া অব্যাহতি পান। সীমান্তভাগ রক্ষার সুবিধা বলিয়াই হউক বা মল্লভূমির অধিবাসিবর্গের বীর্যবত্তার জন্যই হউক, মুসলমান সুবাদারগণ পঞ্চকোট লইয়া বড় একটা নাড়াচাড়া করেন নাই। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে পঞ্চকোটের রাজার সহিত পেস্‌কসের নতুন বন্দোবস্ত হয়। পাচেট ও শেরগড় এই দুই পরগণায় নির্দিষ্ট পেস্‌কস্ ১৮,২০৩ টাকা মাত্র ছিল। মীর কাসেমের সংশোধিত বন্দোবস্তে ইহার উপর ৩,৩২৩ টাকা আব্‌ওয়াব্ চাপিয়াছিল।

৩য় বিষ্ণুপুর : বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজবংশ পঞ্চকোটের মত বা তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া কথিত হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে, অষ্টম শতাব্দীতে রাজপুত ক্ষত্রিয় বংশীয় আদি মল্ল রঘুনাথ এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার সময় হইতে ৫৫ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর-রাজবীর হাম্বীরের সময়ে বৃন্দাবন হইতে আগত বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অপহরণ এবং পরে শ্রীনিবাস আচার্যের উপদেশে রাজার বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের কথা সাধারণের পরিচিত। আকবর শাহের বঙ্গবিজয়ের অনেক

পরে বিষ্ণুপুরের রাজারা মোঘলের নিকট নামেমাত্র বশ্যতা স্বীকার করেন! এবং শা সুজার সুবাদারি আমলে সামান্য পেস্‌কস্‌ নির্দিষ্ট হয়। মুর্শিদ্‌কুলি খাঁর সময়ে পরম ভাগবত রাজা গোপাল সিংহের সহিত প্রথম জমিদারি বন্দোবস্ত হয়। বিষ্ণুপুর ও সেরপুর এই দুই পরগণায় রাজস্ব ১,৭৯,৮০৩ টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মীর কাসেমের বন্দোবস্তে ইহার উপর ২০,০৭৯ টাকা আব্‌ওয়াব স্বরূপে বর্ধিত হয়। কিন্তু এই রাজস্ব কোম্পানির প্রথম আমল পর্যন্ত রীতিমত আদায় হয় নাই।...

৪ **বর্ধমান :** বাঙ্গলার জমিদারি সমূহের মধ্যে বর্ধমান পূর্বাপর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কপুর ক্ষত্রিয় বংশীয় আবু রায় নামক ভাগ্যবান ব্যক্তি পঞ্জাব অঞ্চল হইতে বঙ্গে আগমন করিয়া বর্ধমানের নিকটবর্তী ভূভাগের চৌধুরী বা রাজস্ব সংগ্রাহকের কার্য প্রাপ্ত হন। তাহার পুত্র বাবু রায় বর্ধমান ব্যতীত আরও তিন পরগণার জমিদারি লাভ করেন। বাবু রায়ের পৌত্র কৃষ্ণরাম রায় জমিদারির আয়তন বর্ধিত করিয়া বর্ধমানের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তাহার সময়ে শোভা সিংহের বিদ্রোহের ... শেষে তৎপুত্র জগৎরাম আজিমুশ্বানের নিকট বিদ্রোহী তালুকদারের ভূসম্পত্তি ব্যতীত আরও কয়েকটি মহাল প্রাপ্ত হন। জগৎরামের পুত্র অন্বর্থ নামা রাজা কীর্তিচন্দ্রের কীর্তি গৌরব সমগ্র বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছিল। বর্ধমান চাকলার অধিকাংশ হুগলির মধ্যে ভূরশুট প্রভৃতি এবং মুর্শিদাবাদ চাকলার মনোহর শাহী প্রভৃতি লইয়া তাহার সুবিস্তৃত জমিদারি—একটি রীতিমত রাজ্যের ন্যায় হইয়াছিল। মুর্শিদ্‌কুলি খাঁর বন্দোবস্তে ১৭২২ খ্রি: অব্দে রাজা কীর্তিচন্দ্রের সহিত ৫৭ পরগণায় ২০,৪৭,৫০৬ টাকা রাজস্ব স্থির হয়। বর্ধমান-রাজের অধিকৃত ভূভাগে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ইক্ষু, তুলা, রেশম প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যের ও অন্যরূপ ব্যবসায়ের কথা সেকালের ইংরেজ লেখকগণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মীর কাসেম্‌ যৎকালে বর্ধমানের রাজস্ব ইংরেজ কোম্পানির হস্তে অর্পণ করেন, তখন করবৃদ্ধি, আবওয়াব, কেফায়ৎ প্রভৃতি লইয়া মোট রাজস্ব ৩২,২৬,৯৩৪ টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

৫ **দিনাজপুর :** বর্তমান দিনাজপুর-রাজের জমিদারির অধিকাংশ লোকপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশের অধিকৃত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। দিনাজপুরের বর্তমান রাজবংশের উৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপে কথিত হইয়া থাকে। আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষভাবে বিষ্ণুদত্ত নামক উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ প্রাদেশিক কানুন্‌গো হইয়া দিনাজপুরে বাস করেন। তাহার পুত্র শ্রীমন্ত চৌধুরী শাজাহানের রাজ্যকালে শা সুজার নিকট হইতে দিনাজপুরের জমিদারি লাভ করেন। শ্রীমন্ত ইহা ব্যতীত দিনাজপুরের অনেক দেবোত্তর সম্পত্তিও জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত আছে। শ্রীমন্তের পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় বর্তমান বর্ধমান জেলার কুলাই গ্রামের ঘোষ-বংশীয় শুকদেব তাহার দৌহিত্র বলিয়া সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। বর্তমান মহারাজ এই শুকদেবের বংশধর। শুকদেবের পুত্র প্রাণনাথ হাবেলি পিঁজরার-আরঙ্গাবাদ প্রভৃতি অনেক জমিদারি লাভ করিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রাণনাথ দিনাজপুর কান্তনগরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন এবং তাহার দত্তক পুত্র রাজা রামনাথের সময়ে তাহা শেষ হয়। রাজা রামনাথ প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া দেশ মধ্যে এক প্রবাদ ছিল যে, তিনি প্রাচীন বাণ রাজার প্রাসাদের

ধ্বংসাবশেষ হইতে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত বিপুল ধন ভাণ্ডার পাইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষেত্রস্বামী ও পুত্রচতুষ্টয়ের গল্পের মত তাহার অর্থ মৃত্তিকা হইতেই উদ্ভূত—জমিদারির সুব্যবস্থাজনিত বোধ হয়। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা অনেক সময়ে তাহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেন। তাহার জমিদারির আয়তনের তুলনায় রাজস্ব অতি অল্প ছিল; শস্য সম্পত্তিতে এ রাজ্য লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ভূমি হইয়াছিল। সমুদয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাজা বিপুল অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাহার দান দেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যথাসময়ে রাজস্ব আদায় দেওয়ায় তাহার জমিদারিতে কখনও সরকারি আমিল্ বা ক্রোক সাঁজোয়ালের পদার্পণ ঘটে নাই। মুর্শিদকুলি খাঁর বন্দোবস্তে দিনাজপুর জমিদারিতে ৮৯ পরগণায় ৪,৬২,৯৬৪ টাকা মাত্রা রাজস্ব নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মীরকাসেমের বন্দেবস্তে রাজস্ব চতুর্গুণেরও অধিক বর্ধিত হইয়া—১৮,২০,৭৮০ টাকা হয়।

৬ **নবদ্বীপ :** স্বনামখ্যাত বন্দ্যবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ ভবানন্দ মজুমদার, এই বিখ্যাত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার সময়ে রাজা মানসিংহের সহায়তা করিয়া ভবানন্দ ক্রমে ক্রমে নদীয়া উখড়া প্রভৃতি ২০ পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হন। ভবানন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা রঘুরাম মুর্শিদকুলী খাঁর পক্ষে উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, ...। তাহার সময়ে নদীয়ার জমিদারির আয়তন আরও বর্ধিত হয়। সুবিখ্যাত মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পুত্র। নবদ্বীপ-সমাজপতি ব্রাহ্মণ বংশীয় কৃষ্ণনগরের রাজারা লোকের নিকট বড়ই সম্মানিত হয়। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ হইয়া ১০,৯৮,৩৭৯ টাকা হইয়াছিল।

৭ **রাজসাহী বা নাটোর :** রাজসাহী বা নাটোর জমিদারির উৎপত্তির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজা রামজীবনের নামে এই জমিদারির নতুন বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে ১৩৯ পরগণায় জায়গির বাদে ১৬,৯৬,০৮৭ টাকা জমা নির্ধারিত হইয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ, ভূষণা ও ঘোড়াঘাট এই তিন চাকলা ব্যাপিয়া রাজসাহী জমিদারি বিস্তৃতি ছিল। নিজ 'রাজসাহী' মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে,—এইটিই প্রধান বলিয়া সমগ্র নাটোর জমিদারির নাম রাজসাহী হয়। রাণী ভবানীর সময়ে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'রাজসাহী' প্রকৃতপক্ষে একটি রাজ্যের মত হইয়া উঠে। তখন রাজমহল হইতে বগুড়া পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ছিল। বর্তমান বীরভূমির পূর্বাংশ, মুর্শিদাবাদের উত্তর পূর্বভাগ, জেলা রাজসাহী বগুড়া পাবনার অধিকাংশ, মালদহের পূর্বভাগ এবং যশোহরের ও নদীয়ার উত্তরপূর্বাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। বাণিজ্য ও শস্য সম্পদে তখন রাজসাহী জমিদারিই বঙ্গে সর্বপ্রধান। রাজধানী শহর মুর্শিদাবাদ, চুনাখালী, কাশিমবাজার, ভগবানগোলা, গোদাগাড়ি, বোয়ালিয়া, কুমারখালি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান এই রাজসাহীর মধ্যেই ছিল। মীর্কাসেমের বন্দোবস্তে ইহার রাজস্ব দ্বিগুণের উপর বর্ধিত হইয়া ৩৫,৫৩,৪৮৫ টাকায় উঠিয়াছিল। তখন জমিদারির আয়তন ভিতরবন্দ বাহিরবন্দ প্রভৃতি যোগে কিছু বাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু রাজস্ব সে অনুপাতে বর্ধিত হয় নাই।

৮ **বীরভূমি :** পাঠান রাজত্বকালে বীরভূমিতেও অর্ধস্বাধীন এক হিন্দু রাজবংশ ছিলেন। নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। মোঘল পাঠান বিপ্লবের সমকালে এই হিন্দু রাজাদিগের

কর্মচারী আসদ্উল্লা এবং জোনাদ্ খাঁ নামক ভ্রাতৃদ্বয় প্রবল হইয়া বীরভূমি হস্তগত করেন। মোঘল অধিকারের প্রথম অবস্থায় জোনাদের পুত্র রাজা রণমস্ত খাঁ সীমান্ত রক্ষার ভার পাইয়া বীরভূমি একপ্রকার জায়গির স্বরূপেই ভোগ করেন। শা সুজার বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্ধারিত হইলেও তাহা রীতিমত আদায় হইত না। রণমস্ত খাঁর পৌত্র সাধুশীল আসদুল্লার সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্ত হয়। বর্তমান মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ এবং বীরভূম, সেনভূম, ভূরকুণ্ড প্রভৃতি এই জমিদারির অন্তর্ভূত এবং ইহাই বাঙ্গলার প্রধান মুসলমান জমিদারি ছিল। ২২ পরগণায় ইহার সদর জমা ৩,৬৬,৫০৯ টাকা ধার্য হয়। মীর্কাসেমের সময়ে বীরভূমির রাজা বিদ্রোহী হন; তখন রাজস্ব বর্ধিত হইয়া ১৩,৪২,১৪৩ টাকা করা হইয়াছিল।

৯ ইউসুফপুর বা যশোহর : উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় ভবেশ্বর রায় ও তৎপুত্র মহাতপ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করিয়া বর্তমান যশোরের মধ্যে সৈদপুর প্রভৃতি জমিদারি প্রাপ্ত হন। মহাতপের পৌত্র মনোহর রায় ইউসুফ্পুর প্রভৃতি জমিদারি পাইয়া রাজা বলিয়া পরিচিত হন (১৬৯৬ খ্রি:)। তাহার পুত্র কৃষ্ণরামের সহিত মুর্শিদ্কুলি খাঁর বন্দোবস্তে ২৩ পরগণার ১,৮৭,৭৫৪ টাকা জমা ধার্য হয়। ইহার বংশাবলী এখনও যশোহর চাঁচড়ার রাজা বলিয়া পরিচত। সে কালে ইহাদের জমিদারি যশোরের অর্ধাংশ এবং বর্ধমান, খুলনা ও ২৪ পরগণার কিয়দংশ লইয়া বিস্তৃত ছিল। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে ইহাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ৪,১৬,৩১৮ টাকা হইয়া উঠে।

১০ লস্করপুর বা পুঁটিয়া : বৎসাচার্য বা বৎসরাচার্য নামক সুপণ্ডিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মুসলমান রাজসরকারের সহায়তা করিয়া প্রথমে লস্করপুর বা পুঁটিয়া জমিদারি প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত আছে। কেহ কেহ বলেন, গিয়াসুদ্দীন্ তোগ্লকের সময়ে বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করিয়া বৎসরাচার্য লস্করপুর লাভ করেন। কিন্তু তিনি সংসারে বীতস্পৃত বলিয়া তাহার পুত্র পীতাম্বরই জমিদার হন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, পীতাম্বর হইতে চতুর্থ পুরুষে রাজা দর্পনারায়ণ মুর্শিদকুলির সময়ে বর্তমান। এই কারণে পীতাম্বরের পুঁটিয়া লাভ মোঘল পাঠান বিপ্লবেই ঘটা সম্ভব বলিয়া ইতিপূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। (উৎসাহ-১৩০৫)। পীতাম্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দরাম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু আনন্দরামের জ্যেষ্ঠ সহোদর রতিকান্তের সময় হইতে পুঁটিয়ার জমিদারেরা দেশে পূজনীয় বলিয়া ঠাকুর উপাধিতেই পরিচিত হইয়া আসিতেছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর বন্দোবস্তে ঠাকুর অনুপনারায়ণের সহিত ১৫ পরগণার বার্ষিক ১,২৫,৫১৬ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত হয়। তখন বর্তমান রাজসাহী জেলার তৃতীয়াংশ এই জমিদারির অন্তর্গত ছিল। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে জমা ২,২০,৭১০ টাকায় পরিণত হয়। পরবর্তী কালে পুঁটিয়ার রাজারা আরও অনেক জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া লন।

১১ রুকন্পুর বা কানুন্গোই জমিদারি : প্রথম কানুন্গো ভগবান রায়ের ভ্রাতা বঙ্গ বিনোদের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র হরিনারায়ণকে আরঙ্জেবের আদেশে অর্ধাংশ কানুন্গোই ফরমান্ প্রদত্ত হইয়াছিল (১০৯০ হি: ১৬৭৯ খ্রি:)।[২] ইহারা বাদশাহ দরবার হইতে 'বঙ্গাধিকারী' পদবী লাভ করিয়াছিলেন। মুর্শিদ্কুলি খাঁর অনুগ্রহে কানুন্গো দর্পনারায়ণের সময় হইতে ইহাদের জমিদারি বর্ধিত হইয়া শেষে শিবনারায়ণের সময়ে

মুর্শিদকুলি খাঁর বন্দোবস্তে ৬২ পরগণার রাজস্ব ২,৪২,৯৪৩ টাকা নির্দিষ্ট হয়। ইহাদের জমিদারিতে বর্তমান মালদহের মধ্যে শেরশাহাবাদ, রুকন্‌পুর, বর্ধমানের মধ্যে মণ্ডলঘাট, আরঙ্গাবাদ এবং ঘোড়াঘাট চাক্‌লার মধ্যে বার্বেকপুর, ভূষণার মধ্যে জাহাঙ্গীরাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে দৃষ্ট হয় যে, মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে যখন যে জমিদারির নতুন বন্দোবস্ত হইয়াছে, দর্পনারায়ণ ও শিবনারায়ণ তাহার কিয়দংশ স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। বন্দোবস্তের কাগজ পত্র সমস্তই তাহাদের হস্তে থাকিত, পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহাদের এই জমিদারির কর অল্প ও লাভ অধিক ছিল। মীরকাসেমও ইহাতে ৭৩,৯৬৮ টাকা মাত্র বৃদ্ধি করেন।

১২ ফতেসিংহ : রাজা মানসিংহের সময়ে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-বংশীয় সবিতা রায় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এই ফতেসিংহ জমিদারি লাভ করেন। এই বংশের ঘনশ্যাম রায়ের পুত্র জগৎ কালু প্রভৃতি শোভা সিংহের বিদ্রোহ সময়ে রহিম খাঁর দলে যোগদান করেন বলিয়া একবার জমিদারি হইতে ইহারা বঞ্চিত হন। পরে মুর্শিদ্‌কুলি খাঁর অনুগ্রহে অতি কষ্টে উহা পুনপ্রাপ্ত হন। এই সময়ে সবিতা রায়ের বংশধর আনন্দচন্দ্র নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে ঐ বংশের অন্যতম বৈদ্যনাথের ভগিনীপতি সূর্যমণি চৌধুরী ফতেসিংহ জমিদারি প্রাপ্ত হন। এই সূর্যমণি বাঘডাঙা বংশের স্থাপয়িতা এবং সবিতা রায়ের বংশধরগণ জেমোর রাজা বলিয়া পরিচিত। স্থানীয় লোকে ইহাদিগকে ভূমিহর ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ইহাদের অনেক সৎকীর্তি আছে এবং প্রাচীন ফতেসিংহের জমিদার বলিয়া ইহারা সম্মানিত। মুর্শিদ্‌কুলির বন্দোবস্তে সূর্যমণির পুত্র হরিপ্রসাদের সহিত ১১ পরগণায় ১৮, ৬২১ টাকা জমা ধার্য হয়। অতঃপর এই জমিদারি পুনরায় জেমো ও বাঘডাঙার বংশের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। নাজাই বাদে ইহার রাজস্ব পরে ১,৩৭,২৯১ টাকা হয়; মীরকাসেমের আব্‌ওয়াব্‌ ১২,১০৩ টাকা মাত্র চাপিয়াছিল।

১৩ মহমুদশাহী-ভূষণা : কথিত আছে যে বর্তমান নলডাঙা রাজবংশের আদিপুরুষ বিষ্ণুদেব হাজরা বাদশাহী সৈন্যের রসদ-সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় ৫ খানি গ্রামের জমিদারি লাভ করেন। তাহার বংশের শ্রীমন্ত রায় মহমুদশাহীর জমিদারি প্রাপ্ত হন। রাজা সীতারাম রায় প্রবল হইয়া এই ভূভাগের অধিকাংশ গ্রহণ করেন। তাহার উচ্ছেদের পর নল্‌দী প্রভৃতি ভূষণার উৎকৃষ্ট অংশ রাজসাহী জমিদারির অন্তর্ভুত হয়। অবশিষ্ট ভাগ নলডাঙ্গা বংশের রাজা রামদেবের সহিত বন্দোবস্ত হয়। জায়গির বাদে ২৯ পরগণায় ১,১০,৬৩৩ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। সংশোধিত বন্দোবস্তে জমা আরও বর্ধিত হয়। অবশেষে মীরকাসেমের আব্‌ওয়াব্‌ প্রভৃতিতে ১,১৮,১৮৮ টাকা বাড়িয়া রাজা কৃষ্ণদেবের সময়ে সদর জমা ২,৭৩,৪৩৪ টাকা হইয়াছিল।

১৪ ইদ্রাকপুর (ঘোড়াঘাট) : চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ইদ্রাক্‌পুর বা আরঙ্গাবাদ জমিদারি অনেক দিন হইতে এক বারেন্দ্র কায়স্থ বংশের অধিকৃত ছিল বলিয়া কথিত হয়। প্রবাদ আছে যে, জমিদার ভগবান্‌ নির্বোধ থাকায় তাহার দেওয়ান ভগবান্‌ কৌশল করিয়া ঢাকা হইতে নিজ নামে ঐ জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া লন। শেষে জমিদার ২ আনা ও দেওয়ান ৭ আনা অংশ পান। ঐ দেওয়ানের অংশ পরে দিনাজপুরের রাজাদিগের অধিকারে আইসে। রাজার অংশের ৫ আনা মধুসিংহ নামক এক ব্যক্তি পরে দখল করিয়া

লন। অবশেষে ভগবানের পৌত্র রঘুনাথ ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে আরঙ্গজেব বাদশাহের ফর্মান পাইয়া জমিদারি উদ্ধার করেন। পোলাদশী, কুন্তী, সেরপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা এই জমিদারি অন্তর্ভুত ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর বন্দোবস্তে এই বংশের বিশ্বনাথের সহিত ৬০ পরগণায় ৮১,৯৭৫ টাকা খালসা রাজস্ব নির্ধারিত হয়। ইহা ব্যতীত এই জমিদারির মধ্যে জায়গির বিভাগের রাজস্ব ২১,৪৬০ টাকা ছিল। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে ইহার উপর ৭৪,৮৯১ টাকা আব্ওয়াব্ প্রভৃতি চাপিয়া মোট রাজস্ব ১,৮৩,৩২১ টাকা হইয়া পড়ে।

১৫ জালালপুর প্রভৃতি : চাক্‌লে জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকার সমগ্র খাল্‌সা ভূমি এবং ভূষণা ও ঘোড়াঘাটের সামান্য অংশ লইয়া এই জমিদারি বিভাগ গঠিত হয়। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারিতে বিভক্ত ছিল। বর্তমান ত্রিপুরার সরাইল পরগণা ইহারই অন্তর্গত। জায়গির বাদ দিয়া এই বিভাগের সমগ্র খাল্‌সা ভূমির ১৫৫ পরগণায় ৮,৯৯,৭৯০ টাকা জমা ধার্য হইয়াছিল।

১৬ সেরপুর পূর্ণিয়া : পূর্ণিয়া অঞ্চলের জায়গির বাদে অবশিষ্ট ভাগ দুইটি প্রধান পরগণার নামে সেরপুর, ধরম্‌পুর জমিদারির পত্তন হয়। এই জমিদারি সে সময়ে ফৌজদার সইফ্ খাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল। ১৩ পরগণায় রাজস্ব ৯৮,৬৬৪ টাকা। মীরকাসেমের সময়ে জমা বিশ গুণ বর্ধিত হইয়া ২০,৯৮,৭১১ টাকা রাজস্ব স্থির হয়।

১৭ কলিকাতা জমিদারি : কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূভাগ লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের সহিত ২৭ পরগণায় ২,২২,৯৫৮ টাকায় এই জমিদারি বিভাগ বন্দোবস্ত হয়। হুগলির ফৌজদার সমস্ত রাজস্ব আদায় লইতেন। ইংরেজ কোম্পানি ক্রমশ ইহার মধ্যে ২৪টি পরগণা হস্তগত করিয়া বর্তমান জেলার নামকরণ করেন। মীরকাসেম্ হস্তান্তর করিবার সময়ে ইহার রাজস্ব ৫,৫৫,০৩৬ টাকা দেখাইয়া দেন।

১৮ ফকিরকুণ্ডী রঙ্‌পুর : চাকলে ঘোড়াঘাটের সমুদয় উত্তরভাগ অর্থাৎ কোচবিহারের দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এবং সরকার বাজুহার মধ্যস্থিত কুণ্ডী প্রভৃতি পরগণা লইয়া এই ফকীরকুণ্ডীর সৃষ্টি। ইহাই পরে রঙ্‌পুর জেলায় পরিণত হয়। ইহাতেও অনেক ক্ষুদ্র তালুক ছিল। ৯০,৫৪৮ টাকা জায়গির বাদে ২৪৪ পরগণায় ইহার রাজস্ব ২,৩৯,১২৩ টাকা নির্দিষ্ট হয়। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে বর্ধিত জমা ৬,৩৭,৬৩২ হইয়াছিল।

১৯ কাঁকজোল রাজমহল : রাজমহলের সমীপবর্তী কাঁকজোল প্রভৃতি পরগণা লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক তালুকে বিভক্ত এই কাঁকজোল জমিদারি গঠিত হইয়াছিল। জারগগির বাদে ১০ পরগণায় ইহার রাজস্ব ৭৪,৩১৭ টাকা নির্দিষ্ট হয়। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে জমা বহুতর বর্ধিত হইয়া ৩,৭৭,৪৪৭ টাকায় পরিণত হইয়াছিল।

২০ তমোলুক (মহিষাদল) : উড়িষ্যা হইতে খারিজী সরকার গোয়ালপাড়া এবং মহিষাদল, জালামুঠা, সুজামুঠা প্রভৃতি পরগণা লইয়া এই জমিদারি গঠিত হয়। হিজলির সমগ্র খাল্‌সা ভূমি এবং নিমক মহালও ইহার অন্তর্ভুত ছিল। তমোলুক্ পূর্বকালে প্রাচীন এক রাজবংশের অধিকারে ছিল। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জনার্দন উপাধ্যায় প্রথমে মহিষাদল জমিদারি প্রাপ্ত হন্ বলিয়া কথিত হয়। জনার্দন হইতে পঞ্চম পুরুষ আনন্দলাল নিঃসন্তান বলিয়া তাহার দূরবর্তী উত্তরাধিকারী গুরুপ্রসাদ গর্গ মহিষাদল জমিদারির অধিকারী হন। আনন্দলালের পিতা শুকলাল বা শুকদেবের সহিত মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর বন্দোবস্তে ১৬ পরগণায় ১,৮৫,৭৬৫ টাকা জমা ধার্য হয়। পরে কিছু বাড়িয়া শেষে

কাসেম্‌আলির বন্দোবস্তের সময়ে রাজস্ব ৮,৩৬,৮৭৪ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। সে সময়ে এই জমিদারি পাঁচ প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক্‌ জমিদার ও তালুকদারের হস্তে ছিল।

২১ শ্রীহট্ট : চাক্‌লা শ্রীহট্টের জায়গির জমা বাদে ক্ষুদ্র তালুকদারের সহিত ৩৬ পরগণায় এই জমিদারিতে ৭০,০১৬ টাকা জমা ধার্য হয়। সরাইল পরগণা ইহার অন্তর্গত নহে[৩]। ক্রমশঃ জমা বর্ধিত হইয়া মীরকাসেমের সময়ে রাজস্ব ৪,৮৫,৬১৪ টাকা হইয়া পড়ে। ইহা লইয়া বর্তমান শ্রীহট্ট জেলার উৎপত্তি।

২২ ইস্‌লামাবাদ বা চট্টগ্রাম : আরঙ্গজেবের সময়ে সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অঞ্চল রীতিমত মোঘলের শাসনাধীন করেন। এই সময় অবধি চট্টগ্রাম ইস্‌লামাবাদ নামে অভিহিত হয়। মুর্শিদ্‌কুলি খাঁ ইহাকে স্বতন্ত্র এক চাকলা করেন. কিন্তু ইহার সমস্তই তিনি জায়গিরের জন্য দিয়া রাখিয়াছিলেন। খাল্‌সা সেরেস্তায় ইহার রাজস্ব জমা-হইত না। জায়গির জমায় এই রাজস্ব প্রদর্শিত হইবে। মীরকাসেম ইংরেজ কোম্পানিকে চট্টগ্রাম দিবার সময়ে ইহার রাজস্ব ৩,৩৫,১৩৫ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

২৩ সুহেস্ত ও খোস্তাঘাট : চাক্‌লা বন্দর বালেশ্বরের অন্তর্ভুত সুহেস্ত প্রভৃতি পরগণা ও চাক্‌লা কড়ইবাড়ির অন্তর্গত খোস্তাঘাট এই দুই জমিদারি এক সঙ্গে এক বন্দোবস্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৮ পরগণায় ইহার সদর জমা—১,২৯৪৫০ টাকা; তন্মধ্যে বালেশ্বরের ৯২,৮৭৫ টাকা।

২৪ মজকুরী তালুক : উল্লিখিত জমিদারি বিভাগগুলি ব্যতীত সমগ্র বাঙ্গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারি ও তালুকদারি মহাল লইয়া ২১টি তালুককে মজ্‌কুরী তালুক নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) বহরুল— সরকার শরীফাবাদের মধ্যে এই জমিদারির ১৩ পরগণায় ২,৪১,৩৯৭ টাকা জমা ধার্য হয়। ১১৩৫ সালে সুজা খাঁর সময়ে এই জমিদারি রামকৃষ্ণ নামক ব্যক্তির হস্তে ছিল; পরে ইহার অধিকাংশ রাজসাহী জমিদারির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

(২) মণ্ডলঘাট—সরকার সাতগাঁ চাক্‌লা বর্ধমানের অন্তর্গত। এই জমিদারিতে কুলি খাঁর বন্দোবস্তে পদ্মনাভের নামে ৫ পরগণায় ১,৪৬,২৬১ টাকা জমা ধার্য ছিল। পরে ইহা বর্ধমানরাজের অধিকার আইসে।

(৩) আর্ষা—ইহাও সাতগাঁর মধ্যে, রঘুদেবের জমিদারির অন্তর্ভুত; শেষে ইহাও বর্ধমানের সহিত মিশিয়া যায়। ১১ পরগণায় জমা ১,২৫,৩৫১ টাকা।

(৪) চুণাখালি—ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ শহর অবস্থিত ছিল। ইহার কিয়দংশ নবাবের খাস তালুক হয়, অপরাংশ রাজসাহী জমিদারির অন্তর্ভুত হইয়া যায়। ৩ পরগণায় রাজস্ব ৯৫,৪০৭ টাকা ছিল।

(৫) আসদ্‌ নগর ও মহলন্দী দিগর—মুর্শিদাবাদের মধ্যস্থিত এই জমিদারির কিয়দংশ রাজসাহীর অধীন হয়। অবশিষ্টাংশ ৩ পরগণায় ৬০,৭৯৮ টাকায় বন্দোবস্ত হয়।

(৬) জাহাঙ্গীপুর দিগর—চাক্‌লে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ছিল। এই জমিদারি দিনাজপুর মহাদেবপুরের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের অধিকারে বহুদিন হইতে আছে। কথিত আছে, এই বংশের নয়নচাঁদ চৌধুরী জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট ইহা লাভ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর বন্দোবস্ত সময়ে রাম দেবের সহিত ১১ পরগণায় ইহার সদর জমা

৬৪,২৪৯ টাকা ধার্য হইয়াছিল। পরে এই জমিদারি উক্ত বংশীয় তিন জনের মধ্যে বিভক্ত হয় এবং মীরকাসেমের বন্দোবস্তে ১,১৯,০৪০ টাকা রাজস্ব নিরূপিত হয়।

(৭) আতিয়া, কাগমারী, বড়বাজু, হোসেনশাহী ইত্যাদি চাক্‌লা ঘোড়াঘাটের অন্তর্ভুত এই তালুকগুলি ১০ পরগণায় ৬৭,৮৮৩ টাকায় বন্দোবস্ত হয়। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে প্রধানতঃ ৪ জন মুসলমান তালুকদারের অধীনতায় ইহার জমা ১,১০,০৪১ টাকা হইয়াছিল।

(৮) শালবাড়ি—সরকার বাজুহার অন্তর্গত (বর্তমান দিনাজপুরে) এই প্রসিদ্ধ পরগণার রাজস্ব ৫৭,৪২১ টাকা ধার্য হয়। পরে ইহা বিভিন্ন তালুকদারের অধিকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। মীরকাসেমের সময়ে ইহার সহিত বার্বেক্‌পুর মসিদা প্রভৃতি পরগণা মিলাইয়া সদর জমা ১,৬৬,৪৭৭ টাকা হইয়াছিল।

(৯) তাহেরপুর, বার্বেক্‌পুর ও মসিয়া এই তিন পরগণা ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের সহিত ৫৫,৭৯১ টাকা জমায় বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তাহেরপুর তৎকালে বিখ্যাত রাজা কংসনারায়ণের বংশধরগণের হস্তে ছিল; পরবর্তী কালে তাহাদের দৌহিত্র বর্তমান বংশ ঐ জমিদারির অধিকারী হইয়াছেন। বার্বেক্‌পুর পরে বর্তমান দুবলহাটি রাজবংশের অধিকারে ছিল।

(১০) চাঁদলাই প্রভৃতি ক্ষুদ্র মহাল—মুর্শিদাবাদ, আকবর নগর, ঘোড়াঘাট ও জাহাঙ্গীর-নগর এই চারি চাক্‌লায় প্রক্ষিপ্ত। নবাব সরকারের একজন প্রধান হিন্দু কর্মচারীকে এই ২৪ তালুক ও ৭ পরগণা ৫৫,৭২৯ টাকা জমায় প্রদত্ত হয়। পরে ইহা সত্রাজিৎ ও ভোলানাথ এই দুইজনের মধ্যে বার আনা ও সিকি এই দুই অংশে বিভক্ত হয়।

(১১) পাতিলাদহ ও কুণ্ডী—চাক্‌লা ঘোড়াঘাটের মধ্যে এই দুই তালুক ৭ পরগণায় ৬৭,৬৩২ টাকায় বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শেষে ইহার অধিকাংশ রাজসাহী জমিদারির অন্তর্গত হয়।

(১২) সন্তোষ প্রভৃতি— ঘোড়াঘাটের মধ্যস্থিত (বর্তমান ময়মনসিংহ) এই বন্দোবস্তে ২ পরগণায় ৯৪,৮০৭ টাকা জমা ধার্য হয়। তখন রঘুনাথ নামে এক ব্যক্তি ইহাদের অধিকারী ছিলেন। পরে ইহা দিনাজপুর ও রঙ্‌পুর জমিদারর অন্তর্ভুক্ত হয়।

(১৩) আলাপ সিং ও মমিন্ সি্—দুই পরগণা এই বন্দোবস্তের সময়ে ৭৫,৭৫৫ টাকা জমায় টিকরার মহম্মদ মেহন্দীর নামে লেখা দেখা যায়।

(১৪) সাতশইকা—(সপ্তশতী ব্রাহ্মণের নিবাস জন্য প্রাচীন নাম সপ্তশতিকা)—ইহা বর্তমান বর্ধমান জেলার পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। এখানকার হিন্দু জমিদার মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে এই বংশের একরাম চৌধুরীর সহিত ৩ পরগণায় ৫১,১৬৭ টাকা জমা ধার্য হয়। পরবর্তীকালে জমিদারি হস্তচ্যুত হইলেও ইহারা এখনও সমুদ্রগড়ের রাজা বলিয়া পরিচিত।

(১৫) মহম্মদ আমিনপুর—এই জমিদারি বর্ধমান ও হুগলি জেলায় ভাগীরথী তীরে কলিকাতার অপর পার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার জমিদার উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশ পাটুলীর রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন; পরে ইহারা ভিন্ন হইয়া বাঁশবেড়িয়া ও শেওড়াফুলীতে বাস করেন। ১৪ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১,৪০,০৪৬ টাকা ধার্য হয়।

মীরকাসেমের বন্দোবস্তে বর্ধিত রাজস্ব ৩,২৬,৭৪৭ টাকা হইয়াছিল।

(১৬) পাত্তাস, করদিহা ও ফতেজঙ্গপুর—চাক্‌লা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত। নয় পরগণায় জমা ১০০,৮৭৮ টাকা ধার্য হয়। প্রথমে ইহা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জমিদারি ছিল, শেষে দিনাজপুর রাজের জমিদারিতে মিশিয়া যায়।

(১৭) পুখুয়িা ও জাফরশাহী এই দুই মহাল সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। ৫ পরগণায় এই জমিদারির সদর জমা ৫৪,৫১৯ টাকা নির্দিষ্ট হয়। পরে প্রথমটি রাজসাহী ও দ্বিতীয়টি জালালপুর জমিদারির মধ্যে পড়ে।

(১৮) মাইহাটি—সরকার সাতগাঁর মধ্যস্থিত। ইহা সীতারাম নামক ব্যক্তির সহিত ১৫ পরগণায় ২৮,৮৩১ টাকায় বন্দোবস্ত হয়।

(১৯) হুজুরি তালুকদারান্—উক্ত জমিদারিগুলি ব্যতীত ৯৮ জন ক্ষুদ্র তালুকদার খাল্‌সা সেরেস্তায় স্বয়ং রাজস্ব দান করিতেন, তাহাদিগকে হুজুরি তালুকদার বলা হইত। এই সমস্ত ক্ষুদ্র তালুকের অধিকাংশ চাক্‌লা মুর্শিদাবাদ ও সাতগাঁর মধ্যে ছিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র তালুককে ২ পরগণা ধরিয়া লইয়া ৯৫,৮৫৫ টাকা জমা ধার্য হইয়াছিল।

(২০) আকবরনগর বা রাজমহলের সায়রাৎ অর্থাৎ শুল্ক প্রভৃতি লইয়া ২ পরগণা ধরিয়া ৫৪,৪৩২ টাকা জমা ধার্য হয় এবং শেষে ইহা কাঁকজোল জমিদারির অন্তর্গত হইয়াছিল।

(২১) অন্যান্য ক্ষুদ্র মহাল—সমগ্র বাঙ্গলায় যে সকল পরগণার অংশ বা মৌজা উল্লিখিত জমিদারিগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকে এক সঙ্গে ৮ পরগণা ধরিয়া লইয়া মোট ৪৮,৯৯২ টাকা জমা ধার্য হয়। এইরূপে সমস্ত মজকুরী মহালের ১৩৬ পরগণা ও ৭,৮৫,২০১ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল।

(২২) সায়রাৎ মহাল (শুল্ক প্রভৃতি)।

(ক) চুণাখালি—১১৩০ সালে মুর্শিদাবাদ ও উপকণ্ঠ নগর (কাশিমবাজার প্রভৃতি) সমূহের আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের মাশুল ও হাটবাজার প্রভৃতির কর। (এই পরগণার ভূমি রাজস্ব নহে)—৩,১১,৬০৩ টাকা।

(খ) বখ্‌সবন্দর বা হুগলি। (৩৭ খানি গঞ্জ ও বাজারের রাজস্ব ও নানাপ্রকার মাশুল ও কর প্রভৃতি—মোট ৩,৪২,৭০৮ টাকা। ইহা হইতে পূর্ব নির্দিষ্ট কলিকাতার আয় ৪৪,৭৬৭ টাকা বাদ দিয়া—২,৯৭,৯৪১ টাকা।

(গ) দার উল্ জার্ব[৪]—মুর্শিদাবাদের টাকশালের আয় ৩,০৪,১০৩্

মোট সায়ের রাজস্ব ৯,১৩,৬৪৭ টাকা

বাং ১১৩৫ সালের সমগ্র খাল্‌সা ও সায়েব জমা—২৫ জমিদারি বিভাগে, মোট ১২৫৬ পরগণায় ১,০৯,১৮,০৮৪্ টাকা।

জায়গির জমা। সেকালে বঙ্গের নানাস্থানে ভূমি নির্দেশ করিয়া তাহার আয় হইতে নাজিম, দেওয়ান্ ও সৈন্যবিভাগের ব্যয় নির্বাহ হইত।

(১ম) সরকার আলি—সুবাদারের স্বীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য জায়গির; চাক্‌লা ঢাকা ও হিজ্‌লির মধ্যেই ইহার অর্ধাংশ, অবশিষ্ট ভাগ যশোহর, রাজসাহী, কৃষ্ণনগর ও দিনাজপুরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল। বাদশাহ সেরেস্তায় এই জায়গিরের উৎপন্ন (রেক্‌মী

জমা) ১৬,০৫,৬৯৩ টাকা লেখা থাকিলেও, বর্তমান বন্দোবস্তে অন্যান্য জমিদারির মত আয় ধরিয়া, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের নির্দিষ্ট জমা—৬০ পরগণায় ১০,৭০,৪৬৫ টাকা ছিল।

(২য়) বন্দেওয়ালা দর্‌গা[৫] বাদশাহী দেওয়ানের জায়গির। বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ পরগণা প্রভৃতি। বাদশাহী সেরেস্তায় জমা ২,৯২,৫০০ টাকা। কিন্তু মোট ২০ পরগণায়—১,৪৬,২৫০ টাকা মাত্র নির্দিষ্ট ছিল।

(৩য়) জায়গির আমির্-উল্-উমরা বক্সী (বাদশাহের প্রধান সেনাপতি)। এই সময়ে বাদশাহী সেনাপতি সম্‌সামউদ্দৌলা খান্‌দৌরান্। বাঙ্গলায় প্রতিনিধি দ্বারা তাহার জায়গিরের আয় আদায় হইত। বাদশাহী সেরেস্তায় জমা ৩,৩৭,৫০০ টাকা। এই জায়গির ভূভাগ ঢাকা, শ্রীহট্ট ও আসামের দিকে প্রান্তভাগে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেনাপতির লোকে জায়গির প্রাপ্তির কার্য, প্রত্যন্ত ভাগ রক্ষাদি করিয়া ভোগ করিতে বাধ্য হইবে, এই অভিপ্রায় ছিল। ১৮ পরগণা ২,২৫,০০০ টাকা।

(৪) জায়গির ফৌজদারান্।

(ক) ঢাকার নায়েব নাজিমের (প্রতিনিধি শাসনকর্তার) জায়গির।

রেক্‌মী জমা ২,৪০,৭৫০ টাকা।
১১ পরগণা ১,০০,১৪৫ টাকা।

(খ) শ্রীহট্ট অঞ্চলের ফৌজদার (সমসের খাঁ) ও অন্য চারিজন সীমান্ত-রক্ষকের জায়গির। রেক্‌মী জমা ৪,৩০,০০০
৪৮ পরগণা ১,৭৯,১৬৬

(গ) পূর্ণিয়ার ফৌজদার (সইফ্ খাঁ) ৯ পরগণা ১,৮০,১৬৬

(ঘ) ঘোড়াঘাট ফৌজদারি—(মন্‌সুর খাঁ) ৩ পরগণা ১৬,৬৬৬

(ঙ) রাজমহল ও তেলিয়াগড়ির ফৌজদার (সুজা খাঁর সময়ে আলিবর্দি খাঁ)
৪ পরগণা ১৬,৬৬৬

বৃহৎ ফৌজদারী সমষ্টি (ঠিক ভুল) ৭৫ পরগণা ৪,৯২,৮০০

(৫) মন্‌সব্‌দারান্ (সেনানীগণের জন্য)। এই মন্‌সবদারগণ সাধারণতও পাঁচশত সেনার নায়ক হইয়াও হাজারী নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের নিজের ও নির্দিষ্ট সৈন্যদলের বেতন স্বরূপ অনেক জায়গির নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

এগুলি প্রত্যন্তভাগে প্রধানতঃ শ্রীহট্ট, ঢাকা, হিজ্‌লি ও রাজমহলের মধ্যে স্থাপিত ছিল। প্রান্তদেশরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। ২০ পরগণা ১,১০,৮৫২ টাকা

(৬) জমিদারান্—ত্রিপুরা, মাকোয়া, সুসঙ্গ,[৬] তেলিয়াগড়ি এই চারি জন সীমান্তভাগের জমিদারের জায়গির। ২ পরগণা ৪৯,৭৫০ টাকা

(৭) মদৎ-মাশ (ধর্মার্থে দেয় জায়গির) বর্ধমান ও রাজমহলের স্থানে স্থানে এবং হুগলি পেঁড়োর মস্‌জিদের নিমিত্ত— ৭ পরগণা ২৫,৬৬৫ টাকা

(৮) শালিয়ানাদারান্ (বাৎসরিক বৃত্তির জন্য)
(শ্রীহট্টে কয়েকজন তালুকদার প্রভৃতির) ৯ পরগণা ২৫,৯২৭ টাকা

(৯) ইনাম্ আল্‌তম্‌গা (উত্তরাধিকারিক্রমে ভোগ জন্য পুরস্কারের জায়গির) দুই জন শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবিকে দত্ত ১ পরগণা ২,১২৭ টাকা

(১০) রুজিআন্‌দারান্, জনৈক মোল্লাকে প্রদত্ত লস্করপুরের অন্তর্গত এক সামান্য তালুক ৩৩৭৲ টাকা

ক্ষুদ্র জায়গির সমষ্টি ৩৯ পরগণা ২,১৪৭,১৮ টাকা

(১১) আম্‌লে নাওয়ারা,—নৌসৈন্যবিভাগ ও তাহার জায়গির।

ইহা উপকূলভাগ ও নদীমুখে মগ ফিরিঙ্গি প্রভৃতি জলদস্যুগণের উপদ্রব-নিবারাণার্থ প্রথমে স্থাপিত হয়। বর্ণিত সময়ে ৯২৩ জন ফিরিঙ্গি বা পর্তুগিজ নাবিক এই বিভাগে নিযুক্ত ছিল। ৭৬৮ খানি সজ্জিত সশস্ত্র তরণী থাকিত; ইহার মাসিক ব্যয় ২৯,২৮২৲ টাকা। এই ব্যয় এবং নূতন নৌকা প্রস্তুতাদির ব্যয়ের নিমিত্ত বাৎসরিক ৮,৪৩,৪৫২৲ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। ঢাকা এবং শ্রীহট্ট চাক্‌লায় ইহার জায়গির ভূমির ব্যবস্থা ছিল; ঢাকার মধ্যেই ইহার $\frac{৪}{৫}$ অংশ। এই টাকার মধ্যে ৫০ হাজারেরও কিছু অধিক প্রত্যন্তদেশের জমিদার প্রভৃতির নিকট পেস্‌কসরূপে আদায় হইত। ইহা পূর্বলিখিত বন্দোবস্তের বহির্ভুত।

৫৫ পরগণা ৭,৭৮,৯৫৪৲ টাকা

(১২) আম্‌লে আসাম,—পূর্বভাগের (বিশেষতঃ আসামের দিকে) সীমারক্ষার এবং নদীতরের ও উপকূলভাগের বন্দর প্রভৃতি শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেনানিবাস, সৈনিক ও প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্য 'আম্‌লে আসাম' নামে এই জায়গিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ঢাকা প্রদেশে স্থাপিত ২৮২০ জন রক্ষকের জন্য ১৩ পরগণায় ১,৩৫,০৬০ টাকা, ইস্‌লামাবাদ বা চট্টগ্রামের ৩৫২২ জনের নিমিত্ত ১১৭ কিস্‌মতে ১,৫০,২৫১ টাকা, রাঙামাটি বা কামরূপ অঞ্চলের ১৪৭৮ জনের জন্য ৪ পরগণায় ৬৩,৪৪৫ টাকা ও শ্রীহট্টের ২৮২ জনের জন্য ৪ পরগণায় ১০,৮২৪ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত ছিল। মোট ৮১১২ জন সৈনিকের জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৩৮ পরগণার নির্দিষ্ট রাজস্ব—৩,৫৯,১৮০৲ টাকা

(১৩) খেদা-আফিল্ (হস্তী ধরিবার জন্য)। সরকারি কার্যে যে সমস্ত হস্তীর আবশ্যক হইত, তাহা সেকালে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের আরণ্যভূমি হইতে ধৃত করা হইত। এই হাতি ধরার খরচের জন্য ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে 'খেদা-আ-ফিল্' জায়গির নির্দিষ্ট ছিল। তাহার জন্য নিরূপিত রাজস্ব— ৪০,১০১৲ টাকা

খাল্‌সা ও সায়রাৎ সমষ্টি—	১২৫৬	পরগণা	১,০৯,১৮,০৮৪ টাকা
জায়গির প্রভৃতি—	২১২	,,	২১,৪৯,২৪২৲ টাকা
সৈন্য বিভাগাদি—	১৯২	,,	১১,৭৮,২৩৫৲ টাকা

সুজা খাঁর সংশোধিত হিসাবে— ১৬৬০ পরগণায় ১,৪২,৪৫,৫৬১৲ টাকা

বাদ নাজাই ৪২,৬২৫৲ টাকা

মুর্শিদ্‌কুলি খাঁর জমা কামেল্‌তুমারী— ১,৪২,৮৮,১৪৬ টাকা

আব্‌ওয়াব্ খাস্‌নবিশী। পূর্বে নির্দেশ করা গিয়াছে, মুর্শিদ্‌কুলি খাঁ জমিদারি বন্দোবস্তের পরে একটি 'আব্‌ওয়াব্' অর্থাৎ অতিরিক্ত কর স্থাপন করেন। তাহার নাম 'আব্‌ওয়াব্ খাসনবিশী'। খাস্ অর্থাৎ নিজ সরকারের খাল্‌সা সেরেস্তার প্রধান কর্মচারী ও

মুতসুদ্দীদিগের পার্বণী লইয়া প্রথমে ইহার উৎপত্তি হয়। রাজস্বের উপরে পড়তা করিয়া সামান্য এক নজরানা ধরিয়া লওয়া হইত। ইহা এবং বাদশাহী নজরানা লইয়া মোট খাস্‌নবিশী— ২,৫৮,৮৫৭ টাকা

১ নজরানা মোকররী : সুজা খাঁ নবাবী ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্বের উপরে অন্য চারি প্রকার আব্‌ওয়াব বৃদ্ধি করিয়া ১৯,১৪,০৯৫্ টাকা আয় করিয়াছিলেন। জমিদারের কর বর্ধিত হইলে, অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ যে প্রজাবর্গের স্কন্ধে চাপে, ইহা বুঝিতে বোধ হয় কাহারও কষ্ট হইবে না। সুজাউদ্দীনের প্রথম কর নজরানা মোকররী অর্থাৎ স্থায়ী নজরানা। সমগ্র খাল্‌সা জমার উপর শতকরা প্রায় ৬৷৷০ টাকা অনুপাতে নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহার পরিমাণ ৬,৪৮,০৪০ টাকা হয়। সুজার দ্বিতীয় আব্‌ওয়াবের নাম জার মাথট্‌; মাথট্‌ শব্দের বর্তমান অর্থ হারাহারি বা অনুপাত অনুসারে দেয় আল্‌গা খাজনা। চারিটি পৃথক বিষয়ের জন্য এই কর স্থাপন করা হয়। ১।—নজর পুণ্যাহ—প্রতিবর্ষে নবাব দরবারে পুণ্যাহের সময়ে নিজ নিজ জমিদারি স্থির থাকিল ইহা জানাইবার জন্য এই করের ব্যবস্থা। ২।—বয় খেলাৎ—ঐ পুণ্যাহের দিন জমিদারবর্গকে নিজ জমিদারিতে স্থির রাখার চিহ্ন স্বরূপ যে খেলাৎ বা উপহার প্রদত্ত হইত, তাহার মূল্যস্বরূপ এই কর। ৩।—পোস্তাবন্দি— নবাবী কেল্লার সম্মুখে ও লালবাগে ভাগীরথীতীরে পোস্তা বাঁধিবার ব্যয় বলিয়া এই কর নির্দিষ্ট হয়। ৪।—রসুম নেজারৎ—মফঃস্বল হইতে রাজস্ব আনিবার নিমিত্ত নাজির পদাতিক প্রভৃতির খরচার জন্য এই কর। মোট ৪ দফায়—১,৫২,৭৮৬্ টাকা। মাথট্‌ ফিল্‌খানা—সরকারি ফিল্‌খানা বা হস্তিশালার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত এই কর স্থাপিত হয়। কানুনগোর রুকন্‌পুর জমিদারি, জালাল্‌পুর, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, পূর্ণিয়া রাজমহল, বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট—এই সকল জমিদারি ব্যতীত অন্য সমস্ত জমিদারের নিকট হইতে পড়তা করিয়া এই মাথট্‌ আদায় হইত। মোট—৩,২২,৬৩১ টাকা।

(৪) আবওয়াব ফৌজদারি—সুজা খাঁ স্বয়ং যেমন উক্তরূপ কর বৃদ্ধি করেন, তাহার আদেশে নানা স্থানের ফৌজদারেরাও কিছু কিছু কর স্থাপন করিয়া আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। স্থানবিশেষে এই ফৌজদারি আব্‌ওয়াবের তারতম্য হইয়াছিল।

(১) পূর্ণিয়া প্রভৃতির আবওয়াব (ক) পূর্ণিয়া ২,৮৩,০২৭্ টাকা (খ) শ্রীহট্ট— ১,৫৯,৫৩৫্ টাকা। (গ) ত্রিপুরা—১,৮৪,৭৫১্ টাকা (ঘ) নিখাস্‌ বা মুর্শিদাবাদ শহরে পশ্বাদি বিক্রয়ের জন্য কর ১১,৬৭৯ টাকা (ঙ) থানাজাৎ— বাঙ্গলার যে যে স্থানে সেনানিবাস বা প্রহরী নিবাস ছিল, সেগুলিকে সে সময়ে থানা বলিত। সে সকল স্থানের বাজার প্রভৃতি হইতে অনেক শুল্ক আদায় হইত। সুজা খাঁর সময় হইতে এই সকল স্থানের আয় সরকারে গৃহীত হওয়ার নিয়ম হয়। থানাদারী আব্‌ওয়াবের মধ্যে কাটোয়া হইতে ৪৮, ০০০ টাকা, রাঙামাটি হইতে হাতি ধরার খরচা সমেত ২৪,০০০্, ভূষণায় নল্‌দী হইতে ২৪,০২৫্ মহমুদশাহী হইতে ১০,৮৬০্ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র থানা হইতে ৮,৮৪৩্ টাকা—মোট ১,১৫,৭২৮্ টাকা আদায় হইত। প্রথম ফৌজদারি আবওয়াবের সমষ্টি ৭,৫৪, ৭২০্ টাকা।

(২) ঘোড়াঘাটের আব্‌ওয়াব ফৌজদারি—১৯,২৭৯ টাকা মাত্র ছিল।

(৩) মুর্শিদাবাদের ফৌজদারি আব্‌ওয়াব্—১৬,৬৩৯। এইরূপে সমগ্র ফৌজদারি আবওয়াবের সমষ্টি—৭,৯০,৬৩৮ টাকা।

ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মুর্শিদ্‌কুলি খাঁর এবং সুজা খাঁর বর্ধিত আব্‌ওয়াব মিলিয়া ২১,৭২,৯৫২ টাকা কর বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলিবর্দি খাঁর সময়ে চৌথ মারাঠা, নজরানা মন্‌সুরগঞ্জ প্রভৃতিতে ২২,২৫,৫৫৪ টাকা কর বৃদ্ধি হয়,...

অতঃপর মীরকাসেম্‌ কিরূপে রাজস্ববৃদ্ধি করেন, নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :

(প্রথম) কেফায়ৎ হস্তবুদ্‌ (জমাবেশী)

(১) বীরভূমির জমিদার আসদ্‌ জমান্‌ খাঁকে উৎখাত করিয়া সমগ্র বীরভূমি জমিদারি হইতে নানা উপায়ে উৎপন্ন রাজস্ব বৃদ্ধি— ৮,৯৬,২৭৫ টাকা।

(২) দিনাজপুর জমিদারি হইতে অন্যান্য আব্‌ওয়াব ভিন্ন রাজকরের উপর যে বৃদ্ধি নির্দিষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ— ৫,৭৬,৩২৪

মোট কেফায়ৎ হস্তবুদ্‌— ১৪,৭২,৫৯৯ টাকা

(দ্বিতীয়) কেফায়ৎ ফৌজদারান্‌ (ফৌজদারি রাজকর হইতে গৃহীত)

(১) পূর্ণিয়া--১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতিষ্ঠিত জায়গিরদার সইফ্‌ খাঁর লোকান্তরের পর আলিবর্দি খাঁ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সইদ্‌ আহম্মদকে এই ফৌজদারির আয় প্রদান করেন। সইফ্‌ খাঁ এবং সইদ্‌ আহম্মদের শাসনে এই সুবিস্তীর্ণ জায়গির বিভাগে পার্শ্ববর্তী ভূভাগ ক্রমশও সংলগ্ন হইয়া ইহার আয় সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। খাদেম্‌ হোসেনের উচ্ছেদের পরেও পূর্ণিয়া হইতে রাজকর আদায়ের সুব্যবস্থা সাধন হইয়া উঠে নাই। মীরকাসেম্‌ এক্ষণে ইহার সমগ্র রাজস্ব খাল্‌সা সেরেস্তায় আনিলেন।

জমা পরিমাণ— ১৫,২৩,৭২৫

(২) ঢাকা জালাল্‌পুর,—আলিবর্দি খাঁর সময়ে ঢাকা প্রদেশে এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ নোয়াজিস্‌ মহম্মদের ব্যয় নির্বাহার্থ প্রদত্ত হয়। মীরজাফর খাঁর সময়ে রাজা রাজবল্লভের হস্ত দিয়া এই আয়ের কিয়দংশমাত্র নবাব সরকারে পৌঁছিত। এক্ষণে রাজবল্লভ পাটনার নবাবী প্রাপ্তির আশায় ঢাকা বিভাগের সমগ্র আয় দেখাইয়া দিলেন। ঢাকার সরকারি ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া যে লাভ থাকে, তাহার পরিমাণ—

১২,০১,৩১৫ টাকা

(৩) রঙ্‌পুর ও কোচবিহারের সীমান্তপ্রদেশ পর্যন্ত জঙ্গলমহালের স্থানগুলি কয়েকজন সীমান্তরক্ষক ফৌজদার রাজকোষে যৎসামান্য করমাত্র প্রদান করিয়া ভোগ করিতেন। এক্ষণে এই সমস্ত আয় খাল্‌সা-দপ্তরে জমা হইয়া যে লাভ দাঁড়াইল, তাহার পরিমাণ—

১,৫১,৪৯৮ টাকা

(৪) রাজমহল বা কাঁকজোল ফৌজদারির অধীনে যে খাল্‌সা ও ফৌজদারি জমা ছিল, তাহার উপরে বর্ধিত রাজকর— ৪২,৭৫৭ টাকা

(৫) চট্টগ্রাম এবং বর্ধমানপ্রদেশ কোম্পানিকে প্রদত্ত হইলেও ইহা চিরদিনের মত দেওয়া হইল, মীরকাসেম্‌ এরূপ বিবেচনা করেন নাই। অন্যান্য জায়গিরদারকে প্রদত্ত ভূমির ন্যায়, কোম্পানির সৈন্য সাহায্য প্রয়োজন না হইলেই, সুবিধামত ইহা পুনরায় গৃহীত হইবে, এইরূপ কল্পনা ছিল। এই কারণে এই বিভাগত্রয় সরকারি কাগজে এবং কানুন্‌গো দপ্তরে এই ভাবে ফৌজদারি-বিভাগে পরিবর্তিত হইয়াছিল। আদায় না হইলেও ইহাতে যে বৃদ্ধির সম্ভাবনা কাগজে প্রদর্শিত হইল, তাহার পরিমাণ— ২,৯৬,০০০ টাকা

মোট ফৌজদারি আয় বৃদ্ধি,— ৩২,১৫,২৯৫ টাকা

(তৃতীয়) সায়রাৎ (শুল্কাদি) বিভাগে বর্ধিত জমা।

(১) চুণাখালি (মুর্শিদাবাদের প্রধান শুল্ক অফিস) ২,৩১,৭৯৩ টাকা

(২) নবাবগঞ্জ (মহানন্দা এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এই শুল্ক আদায়ের স্থান) ১,১৮,৭৯৩ টাকা

(৩) অসাদ্‌নগর (মুর্শিদাবাদ শহরের শুল্কবৃদ্ধি জমা) ৭০,৭৮৭ টাকা

(৪) ভাণ্ডারদহ (মুর্শিদাবাদের উত্তরপূর্ব পার্শ্ব হইতে ভাগীরথীর একটি শাখা নির্গত হইয়া জলঙ্গীর সহিত মিলিত হইত। ইহার তীরে[৭] এই শুল্ক আদায়ের স্থান) ২৭,৬০১ টাকা

(৫) আজিমগঞ্জ (দুম্‌কল) কল্‌কলী তীরে ৬,৪০১ টাকা

(৬) চক্‌-চাঁদনী (মুর্শিদাবাদের বাজার) ৩,৫৬০ টাকা

মোট সায়রাৎ— ৪,৫৮,৯৪৪ টাকা

(চতুর্থ) তৌজির্‌ জায়গির-দারান্‌—নির্ধারিত জায়গির-মহলের বর্ধিত রাজস্ব।

(১) জায়গির সরকার আলি—সুবাদারের জায়গির। মীরজাফর খাঁর সময় পর্যন্ত এই সুবাদারি জায়গিরের অধিকাংশ তৎকালের রাজসাহী ও নদীয়া জমিদারির অন্তর্ভুত ছিল। এই সমস্ত মহাল হইতে বিশেষতঃ রাজসাহীর ভাতুড়িয়া প্রভৃতি পরগণার হস্তবুদ বহুল-পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া মীরকাসেম্‌ খাঁ এই দুই জমিদারি এবং আর কয়েকটি লাভজনক জমিদারি হইতে এই সরকারি জায়গির খারিজ করিয়া, বরং আরও কিঞ্চিৎ অধিক রাজস্ব দেখাইয়া, ইহা অন্যান্য স্থানে পরিবর্তিত করিলেন। এইরূপে রাজসাহী , নদীয়া এবং ঢাকার কয়েকটি স্থান হইতে সরকারি জায়গির বিনিময়ে খাল্‌সা-সেরেস্তায় যে রাজস্ব বৃদ্ধি হইল, তাহার পরিমাণ,— ১৫,৩১,২৩৫ টাকা

(২) বন্দেওয়ালা দর্‌গা—(বাদশাহী দেওয়ানের জায়গির)

প্রথমোক্ত জায়গিরের মত অন্য জমিদারিতে পরিবর্তিত করিয়া এই জায়গির ভূভাগে যে রাজকর বর্ধিত হইল, তাহা— ২,১৮,৬৭৪ টাকা

(৩) আমির উল্‌-উমরা—বাদশাহী সেনাপতির নিমিত্ত পূর্বনির্দিষ্ট জায়গির হইতে লাভ হইল,— ১৫,৩৮১ টাকা

(৪) আম্‌লে আসাম (সীমান্ত-রক্ষক থানাদার প্রভৃতির জায়গির) হইতে নব-বন্দোবস্তে লাভ হইল,— ১,১৫,৭২৪ টাকা

জায়গিরের উপস্বত্ব বৃদ্ধি ১৮,৮১,০১৪ টাকা

(পঞ্চম) সেরফ সিক্কা,—উক্ত কয়েক প্রকারে বর্ধিত আয় ভিন্ন রাজস্বের উপর টাকার বাট্টাস্বরূপে প্রতি টাকায় দুই পয়সা করিয়া যে নূতন আব্‌ওয়াব্‌ স্থাপিত হইল তাহার আয়,— ৪,৫৩,৪৮৮ টাকা

মীর্‌কাসেমের সমগ্র বৃদ্ধি, মোট— ৭৪,৮১,৩৪০ টাকা

মীর্‌কাসেমের বন্দোবস্তে জায়গির-বিভাগ নিম্নলিখিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ইহাতেও নয় লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিল,—

(১) জায়গির সরকার আলি,—মীর্‌জাফর খাঁ রাজ্যচ্যুত হইলেও প্রথমতঃ তাহারই নামে সুবাদারি চলিতেছিল। মীর্‌কাসেম ডেপুটি নবাব ছিলেন এবং বাদশাহের নিকট দেওয়ানি সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যচ্যুতির পর হইতে নবাবী জায়গিরের উপস্বত্ব মীর্‌জাফর ভোগ করিবেন, ইহাই নির্দিষ্ট ছিল। অবশ্য এই অবস্থায় জায়গিরের সমগ্র আয়

রীতিমত আদায় লওয়া তাহার পক্ষে কিরূপ সাধ্য ছিল, তাহা বিবেচ্য। অন্যান্য মহালে পরিবর্তন করিয়া এই জায়গিরে যে আয় প্রদর্শিত হইল, তাহার পরিমাণ,—

১১,৫২,৮৭৯ টাকা

(২) গবর্ণর লর্ড ক্লাইব,—কোম্পানির কলিকাতা জমিদারির উপস্বত্ব—

২,২২,৯৫৮ টাকা

(৩) বাদশাহী দেওয়ানের (এক্ষণে স্বয়ং মীরকাসেম্) জায়গির,—২,৩৮,৯৯২ টাকা

(৪) জায়গির বক্সীয়ান্ আজম্ (প্রধান সেনাপতিগণ)

বাদশাহী সেনাপতির জায়গিরের পরিবর্তে এক্ষণে বাঙ্গলার প্রধান সেনাপতিগণের জায়গির; ১,০৮৫,৩০ টাকা

(৫) নাজিম্‌উদ্দৌলা—(মীরজাফর খাঁর তাৎকালিক জ্যেষ্ঠ পুত্র)—৪,৫৮,৩১২ টাকা

(৬) সইফ্‌উদ্দৌলা—মীর্‌জাফরের দ্বিতীয় পুত্র ২,৯৮,৫৬৭ টাকা

(৭) জমিদারান্—প্রত্যন্ত ও পার্বত্যপ্রদেশের সীমান্তরক্ষক জমিদার (সুসঙ্গ প্রভৃতি)

৫২,৩২২ টাকা

(৮) মদৎ মাশ—(ধর্মার্থে দেয় জায়গির) ৪৯,৭৪৩ টাকা

(৯) মসরুৎ থানাজাৎ (থানাদার প্রভৃতির এবং অন্যান্য বৃত্তি)—

আক্‌বরনগর (রাজমহল) তেলিয়াগড়ি ১৬,৬৬৬ টাকা

মহম্মদ্ হোসেন—সংগ্রামগড় ৮,৭৩৩ টাকা

মুতসুদ্দীন্ খাল্‌সা (রাজস্ববিভাগের কর্মচারী) ৭,২৯১ টাকা

রাজা যুগলকিশোর (বাদশাহ-দরবারে উকিল) ৩,৬৪৫ টাকা

মহম্মদ আসরফ্ খাঁ— ফৌজদার যশোর ৪,১৬৬ টাকা

হোসেন্ রেজা খাঁ— ফৌজদার ভূষণা ৩,৩৩৩ টাকা

নাওয়ারা, তোপখানা, টাকশাল, দাঘ্ প্রভৃতির দারোগা ও আমিল্‌গণ—

১৭,২৩৭ টাকা

(১০) পাই বাকি—অর্থাৎ পূর্ব আমলের নির্দিষ্ট জায়গিব জমা হইতে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিল (আম্‌লে নাওয়ারা প্রভৃতি বিভাগের অবশিষ্ট)— ৯,০৭,১৭৩ টাকা

সমগ্র জায়গির পরিমাণ ৩৫,৫৪,৭১৮ টাকা

এইরূপে মীরকাসেমের সময়ে বাঙ্গলার রাজস্ব ১,১০,৩৬,০৫৮ টাকা বর্ধিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট খাজনা রীতিমত আদায় হইত না। কিন্তু কাসেম আলির কঠোর শাসনে সেরূপ হইবার উপায় ছিল না। এই বন্দোবস্তের উপরে মহম্মদ রেজা খাঁর কৃপা-কটাক্ষপাত হইয়া বাঙ্গলার রাজস্বের চরম বৃদ্ধি ঘটে। .. বিহারের বন্দোবস্তেও মীরকাসেম্ অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। দেশের ভূমির কর এবং জমিদার ও রায়তের অবস্থাই বর্তমানে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে; সেই কারণে নবাবী আমলের জমিদারি বন্দোবস্তের বিবরণ এত বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইল। একালের অনেক জমিদার এই বন্দোবস্তের নির্দিষ্ট জমিদারি ভোগ করিতেছেন; তাহাদের পক্ষেও ইহা দেখিবার বিষয়। সে কালের জমিদার ও রায়তের অবস্থা পরে বর্ণিত হইল।

তথ্যসূত্র

১. অনেকে 'বার ভুঁইয়ার' বিবরণে যে সমস্ত ভৌমিকের নাম দেন, তাহারা সম-সাময়িক নহেন।

২. আকবরের ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের বন্দোবস্ত হইতে হরিনারায়ণের সনন্দ প্রাপ্তির কাল প্রায় শতবর্ষ বলিয়া ভগবানের প্রথম কানুন্গো নিযুক্ত হওয়ার কথায় কিছু সন্দেহ হয়। কিন্তু হরিনারায়ণের বৃদ্ধ দশায় এই সনদপ্রাপ্তি হয় ধরিয়া লইয়া কানুন্গো বংশের চিরাগত প্রবাদ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়; বিনোদ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হইতে পারেন এবং তাহার মৃত্যুর পরে কিছুকাল কানুন্গো পদ বিভাগ গোলযোগে গিয়া অবশেষে হরিনারায়ণ উক্ত ফর্মান্ প্রাপ্ত হন; এরূপও হইতে পারে। হরিনারায়ণের কীর্তি কাটোয়ার নিকটবর্তী তাহাদের প্রাচীন বাসস্থান খাজুরডিহির প্রকাণ্ড হরিসাগর দিঘি এবং হরিপুব গ্রাম। পরগণা আরঙ্গাবাদ ও বিনোদনগর (কড়ুই) বঙ্গাধিকারী বংশের প্রাচীন জমিদারি। আরঙ্গাবাদের মধ্যে তাহাদের পূর্ব বাসস্থান খাজুরডিহী এবং বর্তমান লেখকের জন্মভূমি দুর্গাগ্রাম অবস্থিত। বঙ্গাধিকারীর দায়াদ 'রায় মহাশয়' বংশ পরে বহুদিন ধরিয়া এই দুই জমিদারি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে পূর্ব কথিত বৈষ্ণবদিগের বিচারের দলিলে দর্পনারায়ণ মজুমদার বলিয়া স্বাক্ষর আছে; কিন্তু ইহাদের রায় মহাশয় উপাধি নবাবদিগেরও স্বীকৃত।

৩. **Fifth Report Grant —p. 322.**

৪. দার = গৃহ। জার্ব—মুদ্রা।

৫. দরগা = গৃহ। বাদশাহী ঘরের নিয়োজিত দেওয়ান। গ্রান্ট সাহেবের বিবরণীর মুদ্রিত পুস্তকে 'বর্গা' ভ্রমমাত্র।

৬. সুসঙ্গ দুর্গাপুর। প্রাচীন কাল হইতে গারো পর্বতের পাদদেশে সুসঙ্গ পরগণা এই ব্রাহ্মণরাজবংশের অধিকারে রহিয়াছে। মোঘলরাজত্বের প্রথম অবস্থায় মুসলমান শাসনকর্তৃগণের ইহাদের উপর কোনরূপ অধিকার ছিল না। মালিক রঘুনাথ বাদশাহী সৈন্যের সাহায্যে গারো দমন করিয়া, করস্বরূপ প্রথমে এদেশজাত অগুরু কাষ্ঠ (আগর) প্রদান করেন। রঘুনাথের পৌত্র রামজীবন সিংহ প্রথমে জমিদার বলিয়া বাদশাহী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র সমাজে সুসঙ্গরাজেরা 'উদয়াচল' এবং তাহেরপুরের রাজারা 'অস্তাচল' আখ্যা পাইয়াছিলেন।

৭. বর্তমান ভাণ্ডারদেহের বিলে এই নদীব তৎকালের বিস্তৃতি অনুমিত হয়।

মুর্শিদকুলি খাঁ ও বঙ্গের জমিদার

স্রোতস্বতী পদ্মাবতীর বিপুল জলরাশি যাহার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত, সেই সুজল-সুফল বিস্তীর্ণ জনপদই রাজসাহী বলিয়া পরিচিত। এই রাজসাহী নামের বুৎপত্তি কি? উৎপত্তি কোথায়,– একথা, একালে লোকে বড় একটা মনে করেন না।[১] অপিচ; মনে উঠিলেও দেশীয় রাজাকুলের (জমিদারবর্গের) অধ্যুষিত ভূমি তাহাদের বাসস্থল বলিয়াই এই আখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবিয়া, অনেকেরই সেই কৌতূহল 'উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে' ভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া যায়।

বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরপ্রান্তে সাঁওতাল পরগণার পাকুড় উপবিভাগে প্রাচীন রাজসাহী পরগণা অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারিগণ রাজসাহী জমিদারি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। লুপ লাইনে মুরারই রেল স্টেশনের পশ্চিমাংশে দেবীনগর নামক স্থান অদ্যাপি বর্তমান; এই দেবীনগর প্রাচীন রাজসাহীর রাজধানী ছিল। অদ্যাপি এই অঞ্চলে বীরকিটী, দমদমা ও নারায়ণগড় প্রভৃতি স্থানে দুর্গভিত্তির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে।[২] মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে পূর্বতন ভূস্বামীবংশীয় রাজা উদয়নারায়ণ রাজসাহী প্রভৃতি পরগণার অধিপতি ছিলেন।[৩] সেকালের জমিদারগণ কর প্রদান ভিন্ন অন্য কোন কার্যেই স্বাতন্ত্র্য হারান নাই। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে মুসলমানরাজ বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতেন না, যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে। প্রত্যন্তভাগে সাঁওতাল পরগণার এই অংশ যে তৎকালে অধিকতর বেবন্দোবস্তী ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়নারায়ণের দক্ষতা ও কর্মকুশলতায় সবিশেষ প্রীত হইয়া, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাহার হস্তে পার্শ্ববর্তী ভূভাগের সুব্যবস্থার ও রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। বন্দোবস্ত ও আদায় কার্যের সহায়তার জন্য গোলাম মহম্মদ ও কালু জমাদার নামে দুইজন সৈনিকের অধীনে দুই শত অশ্বারোহী সৈন্যও স্থাপিত হয়। রাজা উদয়নারায়ণ অচিরকালমধ্যেই স্বীয় অধিকারে সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশস্বী হইলেন। তখন তাহার হৃদয়ে নবাব-সরকারের অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদনের তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠিল। উক্ত দুইজন সামন্তকে বশীভূত করিতে তাহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। বলসঞ্চয় ও দুর্গাদি নির্মাণ কার্যেও রাজা অমনোযোগী ছিলেন না। যথাকালে উদয়নারায়ণের কল্পনা মুর্শিদকুলির কর্ণগোচর হইল। তিনি বিদ্রোহ দমনের জন্য স্বীয় প্রিয় সেনানী মহম্মদ জান ও লাহরীমল্লের[৪] অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুণ্ডমালার প্রান্তরে উভয় পক্ষের যুদ্ধে গোলাম মহম্মদ নিহত হইলে, উদয়নারায়ণ সপরিবারে বন্দিভূত হন।[৫] বিদ্রোহী জমিদারের উচ্ছেদ সাধনের পর, নবাব বিস্তীর্ণ রাজসাহী জমিদারি প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে প্রদান করেন।

স্বনামধন্য নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন বাল্যে পুঁটিয়ার ভূস্বামী ঠাকুর দর্পনারায়ণের অনুগ্রহে পালিত ও শিক্ষিত হন। তাহার পিতা কামদেব পুঁটিয়া সরকারে বারইহাটি গ্রামের তহশীলদার ছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই অসামান্য প্রতিভাশালী

ব্রাহ্মণ কুমার কালে বাঙ্গলার নবাব-দরবারে অত্যুচ্ছ পদে আরূঢ় হন। সৌভাগ্য ও স্বাভাবিক প্রতিভা তাহাকে সামান্য অবস্থা হইতে এত উচ্চে উন্নীত করিয়াছিল বলিয়া, তাহার নামের সহিত এক অপরূপ প্রবাদ সংযুক্ত রহিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের অভাবনীয় উন্নতি দেখিলে, সাধারণে তাহার একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা না দিয়া নিশ্চিন্ত হয় না। জনশ্রুতি, রঘুনন্দনকে বাল্যকালে পুঁটিয়ার বাটিতে দেবপূজার পুষ্পচয়নে নিয়োজিত করিতেছে। একদিন দৃষ্ট হইল, আতপতাপক্লিষ্ট বালক পুষ্পোদ্যানের বৃক্ষতলে নিদ্রিত, এমন সময়ে (উপকথার প্রসিদ্ধ ভাবী রাজগণের নিয়মমত) এক কালসর্প তাহার মস্তকের উপর ফণাবিস্তার করিয়া সূর্যরশ্মি প্রতিহত করিতেছে। রাজা দর্পনারায়ণ সংবাদ শুনিয়া, রঘুনন্দনকে নিকটে আনাইয়া বলিলেন, "তুমি রাজা হইবে, কিন্তু দেখ বাপু, আমার বংশের কাহারও নিকট হইতে লস্করপুর (পুঁটিয়া জমিদারি) যেন কাড়িয়া লইও না।" দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক কখনই এরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করে নাই। আশ্রয়দাতা প্রতিপালক ভূস্বামীর নিকট সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং ঐ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই বর্তমান রাজসাহী জেলার অধিকাংশ নিজ হস্তে আসিলেও, পুঁটিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ কর্মচারীর পুত্র পুষ্পচয়নে নিযুক্ত হইবেন কেন, জিজ্ঞাসা করিলে গল্প জমাট বাঁধে না!

জনশ্রুতি যাহাই হউক, দর্পনারায়ণ ভবিষ্যতে রঘুনন্দনের প্রতিভা ও দক্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে নবাব-দরবারে স্বীয় উকিল-স্বরূপে স্থাপন করেন। রঘুনন্দনও নিজগুণে অনতিবিলম্বে দরবারে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠেন। ক্রমশঃ তিনি স্বীয় প্রভুর স্বনামা মিত্র, প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণের দেওয়ান বা নায়েব কানুনগো হন। এই সময়েই মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। পূর্বেই নির্দিষ্ট হইয়াছে, মুর্শিদকুলি প্রধান কানুনগো প্রভৃতির পরামর্শেই মুর্শিদাবাদে রাজধানীর স্থান মনোনীত করেন। সুবিখ্যাত রাজস্ববিৎ মহাপ্রাজ্ঞ টোডরমল মোঘল-কুলতিকুলক আকবর বাদশাহের আদেশে যৎকালে মোঘলাধিকৃত সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব বন্দোবস্তকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে কথিত ব্যবস্থায় সাহায্যের নিমিত্ত তিনি দশজন প্রধান কানুনগো নিযুক্ত করেন।[৬] এই প্রধান কানুনগোগণ পূর্বকাল হইতে নিয়োজিত পরগণা-কানুনগোদিগের নিকট হইতে জমির আয়, উৎপাদিকাশক্তি প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণী সংগ্রহ করিয়া যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেন, তদ্দৃষ্টে টোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কানুনগো-প্রেরিত বিবরণই তখন বন্দোবস্তের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল। তখন পাঠানবিপ্লবে সমস্ত বঙ্গ বিপর্যস্ত; জমির মাপ ও তৎসংসৃষ্ট কার্যাদি নির্বাহ করা অসাধ্য ছিল। রাজস্ব বন্দোবস্তের পরে এই প্রধান কানুনগো সমগ্র প্রদেশের ভূসম্পত্তির সাধারণ রেজিস্ট্রার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি রাজধানীতে বাস করিতেন। দেওয়ানি অফিসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল; কারণ, সমগ্র দেশের সবিস্তার জমাবন্দি তাহারই নিকট থাকিল। প্রাদেশিক রাজকর্মচারিবর্গের অব্যাহত ক্ষমতা এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে ইহাদের দ্বারা সংযত হইবার উপায়বিধান হইল। সদর রাজস্বের উপরে শতকরা আট আনা কানুনগোর 'রসুম নির্দিষ্ট' ছিল।[৭] বাদশা আরঙ্‌জেবের কুটনীতিকৌশলে এই প্রধান কানুনগোর কার্য পরিণামে দ্বিধাবিভক্ত হয় (১০৯০ হি:, ১৬৭৯ খ্রি:)। কিন্তু দ্বিতীয় কানুনগো বাদশাহী ফর্মান লাভ

করিয়াও কিয়ৎকাল কার্যে অধিকার পান নাই। শেষে সুবাদারের মধ্যস্থতায় তাহাকে কানুনগো-রসুমের ছয় আনা অংশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রস্তাবিত সময়ে প্রথম কানুনগো-বংশীয় দর্পনারায়ণ ও দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণ বর্তমান ছিলেন।[৮] দেশীয় প্রবাদ এই যে, মুর্শিদাবাদে আগমনের পরে বর্ষশেষে বাদশাহের নিকট দাখিল করিবার জন্য নিকাশী কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ (তৎকালে করতালব খাঁ) কানুনগোদ্বয়কে উহাতে সহী করিবার অনুরোধ করেন। কানুনগোর মোহর দস্তখৎ না থাকিলে এইরূপ হিসাব নিকাশের কাগজ বাদশাহের দরবারে গ্রাহ্য হইত না। প্রথম কানুনগো দর্পনারায়ণ বলিয়া বসিলেন, কানুনগো রসুম বাবদ তিন লক্ষ টাকা না পাইলে দস্তখৎ করিব না। দেওয়ান, সম্রাট-সকাশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার করিলেও, তিনি সম্মত হইলেন না। দেওয়ানের তখন ঐ টাকা দিবার সাধ্য ছিল না। আরঙ্জেবের দরবারে দস্তুর উল-আমলের ঘুণাক্ষরে ত্রুটি হইবার উপায় নাই; সুতরাং দেওয়ান বড়ই বিপন্ন হইলেন। এই অবস্থায় রঘুনন্দনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, নানা প্রলোভনে তাহার দ্বারা নিকাশী কাগজে কানুনগোর মোহর দিয়া লইলেন। এই উপায়ে কার্যসিদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া, প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য মুর্শিদকুলি খাঁ রঘুনন্দনের উন্নতির পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া দেন। এই অবধি তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। বলাবাহুল্য, এটি প্রবাদমাত্র।

অজ্ঞাতনামা মুসলমান গ্রন্থকার দর্পনারায়ণ ও কুলি খাঁ সম্বন্ধে যে জনশ্রুতির উল্লেখ করেন, তাহা এই;—[৯] ভবিষ্যতে এক লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলেও দর্পনারায়ণ নিকাশী কাগজে সহি করিলেন না। দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণ কোনরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া না লইয়াই দস্তখত করিলেন। প্রথম কানুনগোর দস্তখতের অপেক্ষা না করিয়া এবং সুলতান আজিমুশ্বানের অসন্তুষ্টিতে অনুমাত্রও বিচলিত না হইয়া, মুর্শিদকুলি উপঢৌকন পেস্‌কস্‌সহ দক্ষিণাপথে বাদশাহ-সমীপে যাত্রা করিলেন। বর্ধিত রাজকর; জায়গিরের উপস্বত্ব হইতে উদ্বৃত্ত টাকা হুন্ডিযোগে তথায় উপস্থিত করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের হিসাবও হুজুরে পেশ করা হইল। বাদশাহ তাহার কার্যকুশলতায় অধিকতর প্রীত হইয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট খেলাৎ, মুর্শিদকুলি খাঁ পদবী ও দেওয়ানি সহ বঙ্গ-বিহারের সুবাদারী পদ অর্পণ করিলেন।[১০]

এই প্রবাদের উপসংহারে নির্দেশ রহিয়াছে,—'দর্পনারায়ণ নিকাশী কাগজে দস্তখৎ করিতে অসম্মত হওয়ায়, মুর্শিদকুলি তাহার উপর জাতক্রোধ হন। কোনও উপায়ে প্রতিশোধ লইবার কল্পনা তিনি চিরকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সদর কানুনগো বাদশাহ নিয়োজিত উচ্চশ্রেণির কর্মচারী, সম্পূর্ণরূপে সুবাদারের ক্ষমতার বহির্ভূত। কোন বিশেষ দোষপ্রদর্শন না করিয়া এরূপ ব্যক্তিকে নিহত করিলে বিভ্রাট ঘটিবে, এই ভয়ই ছিল; সুতরাং পাকেপ্রকারে তাহাকে জড়ীভূত করাই কুলি খাঁর উদ্দেশ্য হইয়াছিল। রাজস্ববিভাগের কার্যে দর্পনারায়ণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অতঃপর মুর্শিদকুলি রাজস্ব সম্বন্ধে গুরুতর কার্যে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ব্যবহারে দর্পনারায়ণের আর কোনরূপ সন্দেহ বা উদ্বেগের কারণ রহিল না। ক্রমে মুর্শিদকুলির অভীপ্সিত অবসর আসিয়া উপস্থিত হইল। খাল্‌সা দেওয়ান ভূপতি রায়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র গোলাপ রায় রাজস্বকার্যে অনভিজ্ঞ বলিয়া,[১১] দর্পনারায়ণকে উক্ত

পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল। অপরিণামদর্শী কানুনগো নিঃসংকোচে চাকরি স্বীকার করিলেন ও রাজস্ব বিভাগের সর্বময়কর্তা হইয়া রাজকরের উন্নতিসাধনের জন্য সমধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। মুর্শিদকুলি শ্যেনদৃষ্টিতে তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; সুবিধা পাইলেই ধরিয়া বসিবেন, এই তাহার অভিপ্রায়। বঙ্গের সমগ্র মহলের আয়-ব্যয় দর্পনারায়ণের নখদর্পণে ছিল। সর্বপ্রযত্নে বন্দোবস্ত করিয়া, আদায়ের ব্যয়লাঘব প্রভৃতি উপায়ে তিনি অল্পকাল মধ্যেই বাঙ্গলার রাজস্ব এক কোটি ত্রিশ লক্ষ হইতে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু জমিদারবর্গের নান্‌কর[১২] প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিয়া ও রাজকোষে অভূতপূর্বরূপে রাজকরের আমদানি দেখাইয়া, তিনি অনেকের বিদ্বেষভাজণ হইলেন। কুলি খাঁ এই প্রকৃত অবসর বুঝিয়া, তহবিল তছরূপ প্রভৃতি প্রসঙ্গে হিসাব-নিকাশ পরিদর্শনচ্ছলে তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কথিত আছে, কারাগারে আহার্য না দিয়া তাহার প্রাণ সংহার করা হয়।[১৩] দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শিবনারায়ণকে কানুনগো রসুমের দশ আনা অংশ প্রদত্ত হয়; সুতরাং যিনি কাগজে সহি করিয়াছিলেন, সেই জয়নারায়ণের ছয় আনা মাত্র রহিয়া গেল।[১৪]

উল্লিখিত উভয় প্রবাদের যথাযত বিচার করিয়া, সত্য নির্ধারণ করিতে হইবে। নাটোর বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষের 'জাল' অপবাদের মোচন হইলে সকলেই সুখী হইবেন। এখানে মুর্শিদকুলি খাঁও অল্প অপরাধী নহেন। বহুপূর্বে রাজসাহীর প্রবাদ অবলম্বনে স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[১৫] কেহ কেহ বলেন, তিনি বিপক্ষের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। মহামানী দর্পনারায়ণের কারাবাসে মৃত্যুর কাহিনী বঙ্গাধিকারী কানুনগো বংশের কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই। মুর্শিদকুলির সবিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বলিয়া, প্রিয়সহচর সুদক্ষ রঘুনন্দনের বিশেষ সাহায্যে, প্রসিদ্ধ রাজস্ববিৎ দর্পনারায়ণ কিছুকাল অবৈতনিকভাবে রাজস্ব সচিবের কার্য সম্পাদন করিয়া, মুর্শিদকুলির সুবিখ্যাত রাজস্ব বন্দোবস্তের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজস্বের উন্নতিসাধনে গুণগ্রাহী নবাব মুর্শিদকুলির সমধিক প্রীত হইবারই কথা। অজ্ঞাতনামা লেখকের প্রবাদে আস্থাস্থাপন করিতে হইলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুপুত্র, বাদশাহের অন্যতম প্রধান কর্মচারী হওয়াও পিতৃহন্তার নিকট দুই আনা রসুমের উৎকোচ লাভ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে। দর্পনারাযণের পিতার সময়েই যে কারণে কানুনগো রসুমের ন্যূনাধিক্য হয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।[১৬] ১১৩৭ হি: অব্দে (১৭২৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে) বাদশাহ মহম্মদ শার রাজত্বের সপ্তম বর্ষে শিবনারায়ণ কানুনগো সনন্দ প্রাপ্ত হন।[১৭] ইহার পূর্ববর্ষে দর্পনারায়ণের মৃত্যুকাল কল্পনা করিলে, ন্যূনাধিক বর্ষদ্বয় পরেই কুলি খাঁরও পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, একালে কুলি খাঁর অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। কানুনগো দর্পনারায়ণকে নিহত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, অন্যরূপে তাহা সুসাধ্য ছিল কিনা, তাহাও বিচার্য। পক্ষান্তরে, রঘুনন্দনের অভাবনীয় উন্নতি ও মুর্শিদকুলির অত্যধিক প্রীতি আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া লোকে এই জনশ্রুতির সৃষ্টি করিয়াছে কিনা, তাহাও চিন্তনীয়। এই সমস্ত কারণে উভয় প্রবাদের কোনটিই গ্রহণ করা নিরাপদ মনে হয় না।

১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে রঘুনন্দনকে প্রধান মুতঃসুদ্ধি ও সায়রাৎ বিভাগের ইজারাদার স্বরূপে দেখিতে পাই।[১৮] পরে দেওয়ানি বিভাগে সুদক্ষতা দেখাইয়া এবং কুলি খাঁর জমিদারি

বন্দোবস্তে সহায়তা করিয়া তিনি নবাবের অনুগ্রহ লাভ করেন। মুর্শিদকুলির শাসনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে সকল জমিদারি বিদ্রোহী ও অযোগ্য জমিদারগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেক প্রধান জমিদারি রঘুনন্দন ক্রমশঃ তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামজীবন ও তৎপুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১ম) মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ানি আমলে পরগনা বাণগাছির চৌধুরী গণেশরাম ও ভগবতীচরণ বারংবার রাজস্ব-আদায়দানে শৈথিল্য করায়, রঘুনন্দন এই জমিদারি রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। (১১১৩ সাল, ১৭০৬ খ্রি:)।

(২য়) অতঃপর বাং ১১১৭ সালে (১৭১০ খ্রি:) আধুনিক রাজসাহী জেলার অন্যতম প্রধানও প্রাচীন পরগণা ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার রামকৃষ্ণের[১৯] বিধবা পত্নী শর্বানীদেবীর মৃত্যু হইলে একমাত্র উত্তরাধিকারী রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম কার্যে অসমর্থ বলিয়া এই বিস্তীর্ণ জমিদারির কার্যভার সেকালের একমাত্র সমর্থ রঘুনন্দনের হস্তে পড়িল। ভ্রাতা রামজীবন ও তৎপুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদের নামে এই বন্দোবস্ত হইল। ১৭১১ খ্রি: (১১২৩ হি:) অব্দে প্রদত্ত বাদশাহ শাহ আলম্ বাহাদুর শার দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত এক সনন্দ অদ্যাপি নাটোরের বাটিতে দৃষ্ট হয়।[২০] প্রবাদ এই যে, সাঁজোয়াল মহম্মদের (নাজির আহম্মদের?) অত্যাচারে শর্বানী দেবী আত্মহত্যা করেন।

(৩য়) প্রাচীন রাজসাহী জমিদারি প্রাপ্তির কারণ পূর্বেই নির্দেশ করা গিয়াছে। নাটোর রাজবাটিতে রক্ষিত সুলতানাবাদ পরগণার এক প্রাচীন সনন্দের অস্পষ্ট প্রতিলিপি হইতে অবগত হইয়া যায়, উদয়নারায়ণের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সাহেবরাম ও চাঁদসিংহ এই পরগণার জমিদারি পাইয়াছিলেন। বিদ্রোহ অপরাধে রাজসাহী পরগণা হস্তচ্যুত হইলেও, পার্শ্ববর্তী সুলতানাবাদ উদয়নারায়ণের বংশধরগণকেই প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে ইহাও অবশ্য কোন অজ্ঞাত কারণে রঘুনন্দিনী মেলে মিশিয়া যায়। অতঃপর, নাটোর রাজবাটির বৃত্তিভোগ করিয়া উদয়নারায়ণের বংশধরগণের জীবনধারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজসাহী জমিদারি নাটোর বংশের হস্তচ্যুত হইলেও, তাহারা কিছুকাল ইংরেজ কালেক্টরগণের নিকট হইতে বৃত্তিলাভ করিয়াছেন, রাজসাহী কালেক্টরির কাগজপত্রে ইহা দৃষ্ট হয়।

(৪র্থ) অতঃপর ভূষণা মহম্মদপুরের স্বনামখ্যাত সীতারাম রায়ের উচ্ছেদ সাধনের পর, রঘুনন্দন ভূষণা-রাজ্যেরও সিংহযোগ্য অংশ গ্রহণ করিলেন।

সীতারামের ইতিহাসও বাঙ্গালির ভাগ্যদোষে অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মত এখানেও বিভিন্নভাবে কথিত জনশ্রুতি ভিন্ন নিশ্চিতরূপে কোন কথা জানিবার উপায় নাই।[২১] তারিখ বাঙ্গালার অজ্ঞাতনামা লেখক মুসলমানী প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। একমাত্র তাহাকে অবলম্বন করা কুত্রাপি নিরাপদ নহে, পূর্বেই দেখা গিয়াছে। নানা মতের সামঞ্জস্য করিয়া যাহা কিছু ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা যায়, নিম্নে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ যখন দুর্বল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে শোভাসিংহকে বলসঞ্চয়ের অবসর প্রদান করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গে এক প্রতিভাশালী তেজস্বী কায়স্থ সন্তান বিশৃঙ্খলার সুযোগে ধীরে ধীরে স্বাধীন

হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন। চাক্‌লে ভূষণায় মধুমতী নদীতীরে হরিহরনগর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে বিশ্বাসবংশে সীতারামের জন্ম। স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি সামান্য মৌজা সীতারামের পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি। সেকালে ভূষণা-অঞ্চলে রীতিমত রাজকর আদায় হইত না। কর্মঠ বলিয়া সীতারাম নবাব সরকার হইতে পার্শ্ববর্তী ভূভাগের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হন। প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ সাহসের বলে ক্রমশঃ তিনি সমগ্র মহম্মদাবাদ পরগণার ভূস্বামী হইয়া উঠিলেন। ইব্রাহিম খাঁর উপেক্ষায় ও তাহার উপযুক্ত সহকারী যশোহরের পূর্বকথিত কৃতী ফৌজদার নুরউল্লার নির্বুদ্ধিতায় সীতারামের অদম্য সাহস ও অতুল অধ্যবসায়ের সাময়িক বাধা প্রদানের কোনই উপায়বিধান হয় নাই। চাক্‌লে ভূষণা নদীবহুল স্থান, পদ্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখা প্রাকৃতিক গড়খাতের মত ইহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। দক্ষিণে সুন্দরবনের তাৎকালিক দুর্ভেদ্য জঙ্গল ইহাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে সীতারামের স্বাধীনতালাভের কল্পনা দীর্ঘকাল ধরিয়া লতাপল্লব বিস্তারের সুবিধা পাইয়াছিল। সেকালের বঙ্গবাসী আত্মরক্ষার জন্য লাঠি, তরবারির ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং একদল উপযুক্ত যুদ্ধব্যবসায়ী লোক সংগ্রহে সীতারাম রায়কে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় নাই। গড়খাতবেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানে সীতারাম যে রাজভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, মাগুরা উপরিভাগের সাত ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে মহম্মদপুরে তাহার প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে।

মুসলমান অধিকারে হিন্দু ভূস্বামীগণ মধ্যে গড়খাত নির্মাণ করিয়া রাজপুরী রক্ষার ব্যবস্থা অসাধারণ নহে; এ কারণে সীতারামের গড়বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ কাহারও ঈর্ষাকষায়িত দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। রীতিমত রাজকর প্রদান করিলে ভূস্বামীর সহস্র দোষ উপেক্ষিত রহিয়া যাইত। সীতারাম দুর্গনির্মাণ ও নগরপত্তন করিলেন। এই মৃন্ময় দুর্গ চতুষ্কোণ; বহির্বেষ্টনের পরিমাণ ক্রোশাধিক হইবে। দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে গড়খাত। বর্তমানে ইহার উত্তর ও পূর্ব পরিখা শুষ্ক ভূমিতে পরিণত; কিন্তু পশ্চিম ও দক্ষিণ পরিখা এখনও জলপূর্ণ থাকে। দক্ষিণপূর্ব কোণে তোরণদ্বারের সম্মুখে রামসাগর নামক এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, প্রকারান্তরে এই পার্শ্বে অন্যতম গড়খাতের কার্যসাধন করিয়াছে। দুর্গমধ্যে ও পার্শ্বে সুখসাগর প্রভৃতি আরও কয়েকটি জলাশয় খাদিত হইয়াছিল। দুর্গনির্মাণের পরে, নানা স্থান হইতে শিল্পী ও শ্রমজীবী ব্যবসায়ী আনাইয়া প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করাইবারও ব্যবস্থা হইল। পৃথক পৃথক জাতির বাস জন্য সীতারাম স্বতন্ত্র স্থান শৃঙ্খলাক্রমে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপে সীতারামের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী ক্রমশঃ একটি নগরে পরিণত হইল।

সীতারামের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরগুলির ফলকলিপি হইতে তাহার সময় নির্দিষ্ট হইতেছে।[২২] মন্দিরগুলির নির্মাণকাল হইতে অনুমিত হইবে, শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানীর স্থাপন পর্যন্ত, সীতারাম নগরপত্তন ও দেবমন্দির প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা লইয়া ব্যাপৃত। মুর্শিদকুলি খাঁ নূতন নগর স্থাপন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহের প্রতিনিধি বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দূরে বিহারের মধ্যে চলিয়া গেলেন। এই সময়েই সীতারামের আশালতা পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইবার অবসর পাইল। সীতারাম বাদশাহ-সরকারে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করিলেন। নুরউল্লার পরে দিল্লি হইতে সৈয়দ আবুতোরাপ যশোহর প্রদেশের

ফৌজদার হইয়া আসিলেন। আবুতোরাপ আজিমুশ্বানের প্রিয়পাত্র, বাদশাহ বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ। মুসলমান লেখকের মতে বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্যদক্ষতায় তৎকালে তাহার মত লোক অল্পই ছিল। তিনি মুর্শিদকুলির অনুগ্রহ প্রার্থনা দূরে থাকুক, বরং তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলিতেন। কিন্তু ফৌজদার মহোদয় আভিজাত্য-গৌরবে বলবান হইলেই কার্যসিদ্ধি হয় না; তাহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল, তাহাতে রীতিমত বেতন দিবার শক্তির অভাবে তদ্দারা কার্যপ্রাপ্তির বড় বেশি সম্ভাবনা ছিল না। সীতারাম এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া, নিরুদ্বেগে স্বীয় বলবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সময়ে মোগলাধিকার আক্রমণ করিয়া, পার্শ্বস্থ জনপদসমূহে ভীতির সঞ্চার করিতে দিয়াছিলেন।

তারিখ্ বাঙ্গলার লেখকের ভাষায়, "জঙ্গল, খাল, বিল প্রভৃতির আশ্রয়ে থাকিয়া সীতারাম বাদশাহের কর্মকর্তৃগণকে গ্রাহ্য করিতেন না, এবং নিজ জমিদারির সীমার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেন না। তাহার অনেক তীরন্দাজ ও বর্ষাধারী রায়বংশী সিপাহি থাকায় ফৌজদার ও থানাদারের লোকজনের সহিত সর্বদাই হাঙ্গামা বাধিত। তিনি উহাদিগকে দখল দিতেন না, অন্যান্য পার্শ্ববর্তী তালুকদারের সম্পত্তিও লুণ্ঠন করিতেন। সৈন্যসংখ্যা অত্যল্প হওয়ায়, মীর আবুতোরাপ এই দুর্দান্ত জমিদারকে দমন করিতে অক্ষম হইলেন। পরিশেষে সাহায্য জন্য অগত্যা নবাব মুর্শিদকুলির নিকট প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু নবাব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মীর সাহেব সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলে, তিনি শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জঙ্গলভূমির আশ্রয় লইতেন, তীর তরবারযোগে যুদ্ধ করিয়া ফৌজদারি সৈন্যগণকে 'হয়রান' করিতেন। প্রকাশ্যস্থানে সম্মুখযুদ্ধ দিতেন না; ফৌজদারি সৈন্যবল বেশি দেখিলে, গভীর বনভূমি ও নদী মধ্যে আশ্রয় লইতেন। সৈন্যগণ উহা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিত। তিনিও পরক্ষণেই বাহির হইয়া লুণ্ঠনে ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন করিতেন। কেহই তাহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি কখন কাহারও হস্তে পড়িতেন না। পরিশেষে আবুতোরাপ তাহার দমনের জন্য পীর খাঁ নামক সেনানীর অধীনে দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। সীতারাম সংবাদ পাইয়া, গুপ্তস্থানে এই ভাবে কতকগুলি অনুচর রাখিয়া দেন, যাহাতে তাহারা সহসা আক্রমণ করিয়া সসৈন্যে পীর খাঁকে নিপাত করিতে পারে। এই সময়ে আবুতোরাপ সানুচর মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি সীতারামের অধিকারের নিকটে উপস্থিত হইলে, পীর খাঁ আসিয়াছে মনে করিয়া, সীতারাম তাহার সশস্ত্র সৈন্যগণকে অতর্কিতভাবে সবেগে আক্রমণের আদেশ দিলেন। আবুতোরাপ অসতর্ক ছিলেন, সহসা বনভূমি হইতে সীতারামের দল তাহার উপর নিপতিত হইল। 'আমি আবুতোরাপ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও, তাহার ভ্রুক্ষেপ করিল না; কারণ, তাহাকে কেহই চিনিত না। রায়বংশের বর্ষার আঘাত ত্বরায় তাহাকে অশ্ব হইতে ভূমিতে পাতিত করিল; ফৌজদার নিহত হইলেন। সীতারাম সম্মুখে আসিযা রক্তাক্ত কলেবর ফৌজদারকে ধরাশায়ী দেখিয়া, শিরে করাঘাত ও নানারূপ আক্ষেপ করিলেন। অনুচরবর্গকে বলিলেন, 'পীর খাঁর পরিবর্তে এই মহাত্মাকে কেন নিহত করিলে? মুর্শিদকুলি এখনই ভীষণ প্রতিশোধ লইবেন, তোমাদের ও আমার জীবন্তে খাল খিঁচিয়া দিবেন ও সমস্ত মহম্মদাবাদ ছারখার করিবেন। ভবিতব্য যাহা ছিল, ঘটিয়াছে, আর উপায় নাই।' লোকে ফৌজদারের মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া গিয়া ভূষণায় সমাহিত করিল।

"আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ বাদশাহের আক্রোশের ভয়ে থরহরি কম্পমান হইলেন।[২৩] স্বীয় শ্যালীপতি বখস আলি খাঁকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, সসৈন্যে সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। জমিদারগণের উপর ভয় দেখাইয়া, কড়া হুকুম জারি হইল,—যেন তাহারা কোনদিক্ দিয়া সীতারামকে বাহির হইতে না দেন। যাহার জমিদারির সীমা দিয়া সীতারাম পলাতক হইবেন, তাহার জমিদারি উচ্ছেদ ও তাহাকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হইবে, এই আদেশ প্রচারিত হইল। জমিদারবর্গ বাদশাহের আদেশ অপেক্ষা কুলি খাঁর আদেশ অধিক মান্য করিতেন; তাহারা তটস্থ হইয়া চতুর্দিক হইতে সদলবলে সীতারামের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিলেন, বখস আলী সীতারামকে সপরিবারে কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করিলেন। নবাবের অদেশে তাহার মুখ চর্মাবৃত করিয়া মুর্শিদাবাদের পূর্বপার্শ্বে ঢাকা ও মহম্মদাবাদ যাইবার রাস্তায় তাহাকে শূলে আরোপিত করা হইল। অন্যান্য জমিদারকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ঐ মৃতদেহ নিকটস্থ বৃক্ষে লটকান হইল, এবং অপরাধীর রক্ত ভূমিতে না পড়ে, এ জন্য নিম্নে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। সীতারামের পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন মহম্মদাবাদে কারারুদ্ধ করা হইল।[২৪] ভূষণা জমিদারি রামজীবনকে প্রদত্ত হইল, এবং সীতারামের সমগ্র অস্থাবর সম্পত্তি সরকারে (খাসনবিশীতে) বাজেয়াপ্ত হইল। তাহার সমুলোৎপাটনের পর, সরকারি সংবাদপত্রযোগে এই ব্যাপার বাদশাহের গোচর করা হইল।"

দেশীয় প্রবাদ এই যে, সীতারামের শাসনের নিমিত্ত নবাব মুর্শিদকুলি যখন আয়োজন করেন, সেই সময়ে রঘুনন্দনের পরামর্শেই জমিদারবর্গের উপর সীতারামকে আবদ্ধ করিবার ভারার্পণ করা হয়। নাটোর রাজবাটির প্রতিভাশালী নবীন কর্মচারী দয়ারাম নাটোরের জমিদারি ফৌজ লইয়া পশ্চিমদ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মেনা হাতী নামক সীতারামের এক বরবপু অমানুষিক বলশালী সেনাপতি ছিলেন। দয়ারামের নির্দয় কৌশলে প্রত্যুষে কুজ্ঝটিকার সুযোগে মেনা হাতী নিহত হইলেন।[২৫] সেনাপতির মৃত্যুতে সীতারাম নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এ দিকে সংগ্রাম সিংহের অধীনে সুবাদারী সৈন্যদল সীতারামের রাজ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে চতুর্দিকে জমিদারি ও সুবাদারি সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সীতারাম সপরিবারে বন্দিভূত হইলেন। কথিত আছে, বীরবর সীতারাম শূল দণ্ডে প্রাণনাশের আদেশ শুনিয়া মুর্শিদাবাদ কারাগারে বিষাক্ত দ্রব্য চুষিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পরে সীতারামের মত বীরধর্মা লোক প্রায় দৃষ্ট হয় না। তিনি স্বীয় ভুজবলে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন, এই জন্য অনেক স্বজাতিপ্রাণ দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাহাকে কিঞ্চিৎ উচ্চাসন দিবার অনুকূলে। সীতারামের প্রতিভা ও সুদক্ষতা সর্ববাদী সম্মত। সেকালে মোঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া সফলকাম হওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার ছিল। এই কারণেই সীতারামের কল্পনা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু তিনি দেশের লোককে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পারেন নাই। দেশীয় জমিদারবর্গও তাহার বিরুদ্ধে একযোগে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, দেখা যায়। ফলকথা, সীতারামের অভ্যুত্থান ব্যক্তিগত, ইহা জাতীয় অভ্যুত্থান নহে।

সীতারামের অধিকৃত জমিদারির অধিকাংশ নাটোর বংশের ও কিয়দংশ নলডাঙার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[২৬] প্রেমনারায়ণ নামে সীতারামের এক পুত্রের দৈন্যদশায় জীবনযাপন

ও সীতারামের পরিবারবর্গের পরে নলডাঙার জমিদারের বৃত্তিভোগ করিবার কথা প্রচলিত আছে।

রামজীবনের পঞ্চম ও শেষ জমিদারি প্রাপ্তির ইতিহাস এইরূপ;—সরকার মহম্মদাবাদের (বর্তমান নদীয়া ও যশোহরের অধিকাংশ) অন্তর্গত টুঙ্গি স্বরূপপুরের জমিদার সুজাৎ খাঁ ও নিজাবৎ খাঁ বড়ই দুরন্ত ছিলেন। ইহারা পার্শ্ববর্তী স্থানে উপদ্রব করিতেন। একবার নবাব সরকারে চালানী ৬০ হাজার টাকা রাজস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ হুগলির ফৌজদার আসানউল্লার উপর উহাদের দমনের ভার দিলেন। ফৌজদার মৃগয়া উপলক্ষে ঐ অঞ্চলে গিয়া অতর্কিতভাবে উহাদিগকে বন্দিভূত করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। নবাব তাহাদিগকে চিরকারাবাস দণ্ড দিয়া জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিয়া রামজীবনকে অর্পণ করেন।

এইরূপে অত্যল্প কাল মধ্যেই সমগ্র বাঙ্গলার প্রায় পঞ্চমাংশ রঘুনন্দনের উদ্যোগে রাজসাহী (নাটের) জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হইল। এই অতিবৃদ্ধির কথাব সঙ্গে 'রঘুনন্দিনী বাড়' প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে। একালে রাজসাহী জমিদারি আয়তনে বঙ্গের সর্বপ্রধান জমিদারি ছিল; ইহার তদানীন্তন পরিমাণফল ১২ হাজার বর্গমাইলেরও অধিক। বর্তমান মুর্শিদাবাদের উত্তর-পশ্চিমাংশ, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা ও ফরিদপুরের প্রায় সমগ্র ভাগ, রঙ্‌পুর ও যশোহরের প্রায় অর্ধাংশ লইয়া এই সুবিস্তীর্ণ জমিদারি গঠিত হইল। রঘুনন্দনের কল্যাণে কুলি খাঁর বন্দোবস্তে ইহার দেয় রাজস্বও অন্য জমিদারির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল।

এই সমস্ত কারণে নাটোর রাজবংশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে এক পুরুষেই বাঙ্গলায় বিখ্যাত হইয়া উঠেন। রঘুনন্দন নবাব সরকারের একজন প্রধান কর্মচারী, শেষে কিয়ৎকাল খালসা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই এই প্রতিপত্তির বৃদ্ধি।[২৭] রঘুনন্দন ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে, নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। রামজীবনের পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ; ইতিহাসের 'কালুকুঙর'; ইনিও ১১৩১ সালে (১৭২৪ খ্রি.) নিঃসন্তান পরলোকগত হন। পুণ্যশ্লোক রানী ভবানী রামজীবনের পোষ্যপুত্র রামকান্তের পত্নী।

রঘুনন্দনের জমিদারি প্রাপ্তির উপলক্ষে জমিদার বিপ্লবের যে বিবরণ উল্লিখিত হইল তাহাতে সেকালের জমিদারের ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে অনুমিত হইতে পারে। নবাবী আমলে জমিদার ও প্রজার স্বত্ব এবং অধিকার অন্যত্র আলোচিত হইবে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সুবাদারি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবধি নব বন্দোবস্তে সমধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। নিম্নে পূর্বতন ব্যবস্থার সামান্যমাত্র নির্দেশ করিয়া আমরা কুলিখাঁর বন্দোবস্তের বিবরণী দিলাম।

আসল তুমার জমা

রাজা টোডরমলের সুবিখ্যাত বন্দোবস্তে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা ২৪ সরকার[২৮] (১) ও ৭৮৭ পরগণায় বিভক্ত দেখা যায়। এই সময়ে যে আসল জমা-তুমার প্রস্তুত হয়, তাহাতে রাজস্বের পরিমাণ ১৪৯৬১৪৮২ টাকা ১৫ আনা ৭ পাই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্ববর্তী পাঠান আমলের কাগজপত্রই এই বন্দোবস্তের ভিত্তিস্বরূপ। জায়গির সমেত সমগ্র বঙ্গে ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় রাজস্ব ১০৬৯৩১৫২ টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বাদশা শাজাহানের রাজ্যকালে উত্তরপূর্ব ভাগের কয়েকটি প্রত্যন্ত প্রদেশও

আংশিকভাবে মোঘলের আয়ত্ত হয়, এজন্য শা সুজার শাসন সময়ে উড়িষ্যাসহ ৩৪ সরকারে বিভক্ত বর্ধিতায়তন বাঙ্গলার রাজকর ১৩১১৫৯০৭ টাকা স্থির হয়। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় বন্দোবস্তে আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণ লিখিত রূপে ধার্য হওয়ায়, আয়তন বৃদ্ধি সত্ত্বেও আয়ের হ্রাস দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই সংশোধিত রাজস্ব বন্দোবস্তে নির্ধারিত জমাও কিয়ৎপরিমাণে কাগজের ব্যবস্থামাত্রই ছিল; কোন কালেই আংশিকভাবে ভিন্ন সম্পূর্ণ রাজকর আদায় হয় নাই।

মুর্শিদকুলি খাঁ যে সময়ে দেওয়ান হইয়া আসেন, তখন বাঙ্গলা সম্পূর্ণরূপে বেবন্দোবস্ত। বিদ্রোহাদিতে দেশ এক প্রকার বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গলার আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ একালে এতই অল্প হইয়া পড়িয়াছিল যে, সৈন্যাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য অন্য সুবা হইতে টাকা আনাইতে হইত।[২৯] মুর্শিদকুলি খাঁ পূর্বব্যবস্থার আমূল সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইলেন; যথাবিধি ব্যবস্থার জন্যই মনস্বী আরঙ্জেব তাহাকে বঙ্গে প্রেরণ করেন। দেওয়ানির প্রথম বর্ষেই কুলি খাঁ বাঙ্গলার রাজস্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, অথচ দেশের অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। মুর্শিদকুলি খাঁও তখন দেওয়ানমাত্র, হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত হয় নাই; সুতরাং দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও নির্দিষ্ট রাজস্ব যথাসম্ভব আদায় করাই তখন তাহার সাধ্য ছিল। সুবাদারিপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি পূর্ব সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার উপায় বিধান করিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে এই সময়ে প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ ও রঘুনন্দন তাহার যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাহাদের হস্তে খাল্‌সা-সেরেস্তার (রাজস্ব বিভাগের) ভার অর্পিত হওয়াতেই কুলি খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্ত সুচারুরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল।

ইতপূর্বেই বাদশাহের সম্মতি অনুসারে মুর্শিদকুলি খাঁ সুবাদার ও অন্যান্য প্রধান কর্মচারী ভিন্ন অন্য সকলের জায়গির বাঙ্গলা হইতে খারিজ্‌ করিয়া, উড়িষ্যায় নির্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রান্তদেশস্থ অর্ধস্বাধীন রাজা ও জমিদারগণকে তাহাদের নিজ নিজ অধিকারের অশাসিত ভূভাগের বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করা হইল; উদ্দেশ্য যে, রাজস্বের ভাগ্যে যাহাই হউক, ঐ সমস্ত স্থানের যথাসম্ভব হিসাব পাইয়া প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবেন। আভ্যন্তরীণ জমিদারবর্গের মধ্যে যাহারা বন্দোবস্ত কার্যে সম্পূর্ণ উৎসাহ প্রকাশ ও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাহাদিগকে বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ভার দিয়া, সরকার হইতে সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া, এই বিষয়ে সাহায্য করা হইল। অনায়ত্ত জমিদারগণকে কৌশলে, কুত্রাপি বা বলপ্রয়োগে, কিয়ৎকাল মুর্শিদাবাদে নজরবন্দি[৩০] রাখিয়া, বিশ্বাসী ও কর্মঠ আমিল্‌গণের দ্বারা সমগ্র ভূভাগে এককালে জরিপ জমাবন্দি করিবার ব্যবস্থা হইল। অনেক অবাধ্য কৌশলী জমিদার স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে বন্দোবস্ত কার্যে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিয়াই, এই কঠোর ব্যবস্থা। এরূপ জমিদারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নান্‌কর আয় নির্ধারিত হইল। মহালে মহালে ভূমি মাপ ও তৎসাময়িক কার্য চলিতে লাগিল। প্রজার অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে জমিপত্তনেরও ব্যবস্থা করা হইল। দুঃস্থ প্রজাবর্গকে তাগাবী অর্থ সাহায্য দিয়া, সর্বপ্রযত্নে ভূমির উৎকর্ষ সাধন হইতে লাগিল।[৩১] এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই বন্দোবস্ত কার্য শেষ হইলে, জমিদারগণকে ব্যবহারের ইতরবিশেষ অনুসারে ক্রমশ স্বপদে প্রতিরোপিত করা হইল। মৃত বা নিতান্ত অসাধ্যসাধন ধূর্ত জমিদারগণকে উৎখাত করিয়া, নতুন লোকের সহিত জমিদারি বন্দোবস্ত হইল।[৩২] সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্বের সমূহ উন্নতিই হইল। এইরূপে বন্দোবস্ত কার্য শেষ

করিয়া, মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে (বাং ১১২৮, হি: ১১৩৫) যে কাগজ প্রস্তুত করাইলেন, তাহার নাম 'জমা কামেল্ তুমারী'। এই 'পাকা' বন্দোবস্তই পরবর্তী বন্দোবস্ত সমূহের ভিত্তিস্বরূপ। বঙ্গে পূর্বতন সরকারগুলিকে এক্ষণে ত্রয়োদশ চাক্‌লা বা বিভাগে পুনর্বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক চাক্‌লায় এক একজন ফৌজদার ও তাহার অধীনে আমিল প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্যের নব ব্যবস্থা হইল। পরগণার সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হইয়া ১৬৬০ হইল; অবশ্য পূর্বের অনেক বৃহৎ পরগণাও এক্ষণে বিভক্ত হইয়াছিল। জায়গির জমা সহ সমগ্র রাজস্ব ১৪২৮৮১৮৬ টাকা নির্দিষ্ট হইল।

কথিত ১৩টি চাক্‌লার মধ্যে বন্দর বালেশ্বর ও হিজ্‌লি উড়িষ্যার সীমা হইতে বাঙ্গলায় খারিজ করিয়া লওয়া হয়। তদ্ভিন্ন পদ্মা ও ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, সপ্তগ্রাম (বা হুগলি), যশোহর, ভূষণা এই পাঁচটি, অবশিষ্ট ছয়টি,—আকবরনগর, (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, করইবাড়ি, জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট, ও ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) প্রধানত পদ্মার পূর্বপার্শ্বে স্থাপিত। রাজমহলের কিয়দংশ মাত্র গঙ্গার পশ্চিম পারে। এই ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত বঙ্গের রাজকর তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত ২৫টি জমিদারি বিভাগে (এহ্‌তিমাম্‌বন্দি) বন্দোবস্ত হয়। পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে (বাং ১১৩৫ সাল) এই বন্দোবস্ত পাকা হইয়া সুমার বা গোসোয়ারা প্রস্তুত হইয়াছিল।[৩৩]

ভূমির রাজস্ব ব্যতীত অন্যরূপ করের পারসি নাম আব্‌ওয়াব্। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে একমাত্র আবওয়াব্ খাসনবিসী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজস্বের উপরে এই সামান্য নজরানা লওয়া হইত। খাল্‌সা (রাজস্ব) সেরেস্তার খাসনবীস ও মুতসুদ্দীগণের পার্বণী লইয়াই ইহার উৎপত্তি। এইটি এবং বাদশাহ সরকারে প্রেরিত বার্ষিক নজরানা বাবদ মোট ২৫৮৪৫৭ টাকা সমগ্র বঙ্গের ভূসম্পত্তির উপরে পড়তা করিয়া আদায় হইত। আবওয়াব্ কিরূপে ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, অন্যত্র তাহা প্রদর্শিত হইবে।

বর্ণিত জমিদারি বন্দোবস্তই মুর্শিদকুলি খাঁর কীর্তিস্তম্ভ, আবার ইহাতেই তাহার কলঙ্কপ্রবাদ। তারিখ বাঙ্গালার লেখকের প্রচারিত জনশ্রুতিই ইহার ভিত্তি। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর ন্যায়পরায়ণতা, কার্যকুশলতা, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, পূর্বেই দৃষ্ট হইয়াছে। তাহার মতে শায়েস্তা খাঁর পরে সমগ্র হিন্দুস্থানে কুলি খাঁর মত সুবিজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। এইরূপ নির্দেশের পরেও, জমিদার-পীড়নের ভয়ানক অপবাদ হইতে তিনি মুর্শিদকুলিকে মুক্তি দেন নাই। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ তাহার সত্যনিষ্ঠার গুণানুকীর্তন করিয়াছেন।[৩৪] সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহ না করিলেও, দুঃখের বিষয় এবং স্বীকার্য যে, লেখক মহোদয়ের লেখনী যেরূপ ওজস্বিনী, সত্য নির্ধারণের প্রয়াস তত দূর বলবৎ দেখা যায় না। তিনি তাহার সমকালে[৩৫] যেখানে যে প্রবাদ শ্রবণ করিয়াছেন, অকাতরে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত ঘটনার সহিত মিশাইয়া, সুন্দর লিপিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। ঘটনার পৌর্বাপর্যজ্ঞান অবশ্য এরূপ গ্রন্থে আশা করা যায় না।[৩৬] অবাস্তব ঘটনা, অতিপ্রাকৃত বা অমানুষ ব্যাপারও ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই।[৩৭] গ্রন্থকার নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ জনশ্রুতি ও বিরুদ্ধভাবের উক্তির একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে কেহই তাহার যথাযথ সমালোচনার প্রয়াস পান নাই।

সৌভাগ্যের বিষয়, জমিদারি বন্দোবস্তের কাগজপত্র অদ্যাপি বর্তমান। দেখা গিয়াছে, জমিদারি বন্দোবস্তে বীরভূমি ভিন্ন প্রধান জমিদারি মাত্রেই হিন্দু জমিদার। অন্যত্র মুসলমান

তালুকদারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; সমগ্র বঙ্গের এক আনা অংশমাত্র মুসলমান ভূস্বামীর হস্তে স্থাপিত ছিল। বিদ্রোহী হিন্দু জমিদারের উচ্ছেদের পরে, পুনরায় হিন্দুর প্রতিই এই ভার অর্পিত হইয়াছে। অজ্ঞাতনামা লেখক ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া, স্বকোপলকল্পিত একটি মতের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মুর্শিদ্‌কুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ে বাঙ্গালি হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহাকেই নিযুক্ত করিতেন না; কেন না, হিন্দুগণ ভীরুস্বভাব, শাস্তির ভয়ে শীঘ্রই নিজ নিজ দুষ্কৃতি প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। তাহাদের দ্বারা রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল না। হিন্দু জমিদার ও আদায়কারী আমিল্‌গণকে এই প্রশংসাপত্র দিবার সময়ে, গ্রন্থকার সম্ভবতঃ নিজের বর্ণিত শোভাসিংহ, উদয়নারায়ণ বা সীতারামের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। একালের সাধারণ বাঙ্গালি হিন্দুর স্বভাব যাহাই হউক, সেকালের জমিদারবর্গ যে নিতান্ত 'ভালমানুষ' ছিলেন, ইহা সপ্রমাণ করা কষ্টকর।[৩৮] দেশবাসীগণের অধিকাংশই যে হিন্দু, এবং তাহারা রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্যে পূবাপর নিয়োজিত থাকিয়া অধিকতর বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতা দেখাইয়াছেন, ইহা স্বীকার করা লেখকের উচিত ছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধে জমিদার পীড়নের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ এই যে, বন্দোবস্ত সময়ে ও তৎপরে তিনি জমিদারগণকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। ইতিপূর্বে বঙ্গের জমিদারগণের অনেকেই বিপ্লবের সুবিধায় রাজকর আদায় দানের পদ্ধতি একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ ও সীতারাম অথবা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণরামের অবস্থা কয়েকটি বৃহৎ দৃষ্টান্তমাত্র। অনেক ক্ষুদ্র জমিদারও অবসর পাইলে মোগল শাসনকর্তাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে বিরত হইতেন না। বঙ্গের রাজকর এ জন্য এতই হ্রাস হয় যে, অর্থের জন্য অন্যত্র সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইত। বাদশাহ আরঙজেব এই ব্যবস্থার পঙ্কোদ্ধারের জন্যই রাজস্ববিৎ মুর্শিদকুলি খাঁকে বঙ্গে প্রেরণ করেন, পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কুলি খাঁও এই আবর্জনারাশি পরিষ্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সুবাদারি ও দেওয়ানি উভয় ক্ষমতা স্বহস্তে পাইয়াই তিনি রীতিমত ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় অল্পাধিক অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী। সেকালের চক্ষে দেখিলে, অবাধ্য জমিদারগণকে কিয়ৎকাল কারারুদ্ধ বা নজরবন্দি রাখা বড় বেশি দোষের বিবেচিত হইবে না। প্রকৃতিপুঞ্জের ও ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া, রাজকোষে প্রাপ্য কর রীতিমত আদায় করার জন্যই এই ভাবে ব্যবহার হইয়াছিল। মুসলমান লেখক স্বয়ং তাহা প্রকারতঃ নির্দেশ করিয়াছেন। বর্তমানে কেডাস্ট্রাল সার্ভে প্রজাবর্গের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিতেছে ভাবিয়া, এক শ্রেণির লোকে যেমন ইহার বিরুদ্ধে এ কালের একমাত্র সম্বল চিৎকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছেন, তদাদীন্তন দুরন্ত জমিদারবর্গ সেকালের মত করিয়া এই বন্দোবস্তের বাধা-প্রদানে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

বাকি খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারগণকে কারারুদ্ধ করা অথবা রাজধানীতে নজরবন্দি রাখা নবাবী আমলের আইনের ব্যবস্থা। নম্রস্বভাব সুজাউদ্দীন বা সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক আলিবর্দি খাঁর সময়েও এই জন্য জমিদারগণের কারাবাস ঘটিয়াছে।[৩৯] পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনকর্তৃগণের সময়েও এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং চিরাগত মুসলমানী প্রথামত অবাধ্য বা রাজস্ব আদায়দানে অশক্ত জমিদারবর্গকে বন্দিভাবে রাখিয়া, মুর্শিদকুলি খাঁ যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। অজ্ঞাতনামা ইতিহাস লেখক অন্যত্র নির্দেশ করিয়াছেন, 'রাজস্বদানে অশক্ত জমিদারগণকে সপরিবারে মুসলমান করা

হইত'। অথচ এরূপ একজন জমিদারেরও উল্লেখ দেখা যায় না। প্রকৃত হইলে, অন্ততঃ সীতারাম ও উদয়নারায়ণের পরিবারবর্গের দৃষ্টান্তটাও মিলিত। ভ্রান্তধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত মুসলমান গ্রন্থকার মুর্শিদকুলি খাঁকে যেখানে স্বীয় মানদণ্ডে আদর্শ মুসলমান করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই স্থানেই তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। তিনি বলেন, "হিন্দু জমিদারবর্গের পালকিতে চড়া নিষিদ্ধ ছিল, তাহারা কেবল সোজা বাঁশ দেওয়া চৌপালা ব্যবহার করিতে পাইতেন। হিন্দু জমিদার বা কর্মচারীবর্গ নবাবের সমক্ষে আসনে উপবেশন করিতে পাইতেন না। ক্ষুদ্র জমিদারগণের দরবারে প্রবেশ নিষেধ ছিল। নবাবের সমক্ষে পরস্পরকে কেহ অভিবাদন করিতে পাইত না, এবং এই সমস্ত নিয়মাবলীর রেখামাত্র ভঙ্গ হইলে, তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেওয়া হইত।" পরক্ষণেই একনিশ্বাসে 'তাহার জগৎপ্রসিদ্ধ অপক্ষপাতবিচারে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রজা পর্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া তাহার নিকটে অভিযোগ জ্ঞাপন করিত', ইত্যাদিও আছে। তবেই দেখা গেল, যেখানে হিন্দু, সেইখানেই কুলি খাঁর না হউক, গ্রন্থকারের বিচার বিভ্রাট। মুর্শিদকুলি খাঁর প্রধান রাজস্ব সচিব হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেক উচ্চপদে হিন্দু কর্মচারী ছিলেন। দেখা যায়। লাহরীমল প্রভৃতি হিন্দু সেনাপতি ছিলেন; রাজা রঘুরামের বীরত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া পুরস্কারস্বরূপ তাহার পিতার কারামোচন ও জমিদারি প্রদানও কুলি খাঁর কার্য।[৪০] হিন্দু কর্মচারী, হিন্দু জমিদার, সর্বত্র হিন্দুগণে বেষ্টিত হইয়া, শুদ্ধ হিন্দুর প্রতিই এই কঠোর ব্যবস্থা কিরূপে সঙ্গত হয়? দুঃখের বিষয়, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাও লেখক স্বীয় উক্তির সমর্থন করেন নাই। এক্ষেত্রে তদানীন্তন হিন্দুমাত্রেই নিতান্ত কাপুরুষতা স্বীকার না করিলে, লেখক মহোদয়ের কথায় 'ডিটো' দেওয়া যায় না।

দেখা গেল, রাজস্বের নিমিত্তই মুর্শিদকুলি খাঁর সুনাম বা দুর্নাম; বাঙ্গলায় রাজস্ব বন্দোবস্তের সহিত চিরদিন তাহার নাম সংযুক্ত থাকিবে। এ দেশের ইংরেজ বণিকগণও রাজকরের জন্যই তাহার প্রতিকূল। নবাবের বিশেষ অপরাধ, রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়া, কোম্পানির অবশ্যপোষ্য কর্মচারীগণের স্বাধীন ব্যবসায় অব্যাহত রাখেন নাই: টাকশালে বিনা ব্যয়ে কোম্পানির মুদ্রা প্রস্তুত করিতে দিলেন না; কলিকাতার পার্শ্বে ইংরেজ বণিকের সুবিধা ও বলসঞ্চয়ের সাহায্যার্থে জমিদারিগুলিও গ্রহণ করিতে দেন নাই। অসহ্য অত্যাচার! বাদশা ফররোখ্‌শেরের সনন্দের[৪১] নির্দেশমতে সমস্ত কার্য করিতে কুলি খাঁ অস্বীকৃত হইলে, কাশিমবাজারের ইংরেজগণ পুনরায় নবাব দরবারে সাক্ষাৎ করিয়া তর্কবিতর্ক করিলেন। তাহাদের লিখিত পত্রে তাহাদেরই উদ্ধতভাব প্রকাশের পর, নবাব যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে তাহারা যে অভিমতই প্রকাশ করুন, অন্যে তাহাকে এক মিষ্টভাষী গম্ভীর শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন।[৪২]

জমিদারি বন্দোবস্তের সময় কর্মচারিদিগের দ্বারা যে অত্যাচার ঘটিয়াছিল, জনশ্রুতি তাহাকে অতিরঞ্জিত করিয়াছে। যাহারা মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে জমিদারবর্গের সাময়িক উচ্ছেদের জন্য অনুযোগ করিতে চান, তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত, সে বিদ্রোহী হইলে বা নিয়মিত রাজস্ব আদায় দানে ত্রুটি হইলেই, কুলি খাঁ অন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যথেচ্ছ নতুন জমিদার প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। নবাবী আমলে জমিদারবর্গ যে এই ভাবেই ব্যবহৃত হইতেন, মুসলমানরাজের ইচ্ছার উপর জমিদারিপ্রাপ্তি নির্ভর করিত, তাহা রেভিনিউ বোর্ডে রক্ষিত রাজা নবকৃষ্ণের এক আবেদনপত্রে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে।[৪৩] ইহাতে পরবর্তী

নবাবগণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। মুর্শিদকুলি খাঁ জমিদারবর্গের স্বায়ত্তশাসনের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

এই সমস্ত কথিত অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা 'বৈকুণ্ঠ'। অজ্ঞাতনামা লেখক বলেন, "নবাবের দৌহিত্রীপতি সৈয়ত রজী খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া, বাকি কর আদায়ের জন্য জমিদার ও আমিল্‌গণের উৎপীড়নের নানাবিধ নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। অহঙ্কার ও নিষ্ঠুরতার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। জমিদারগণকে ঢিলা পায়জামা পরাইয়া, তন্মধ্যে বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাহাকেও লবণ মিশ্রিত মহিষ দুগ্ধ পান করাইয়া উদরাময়ে মৃতপ্রায় করিবার ব্যবস্থা করিতেন।[৪৪] তাহার প্রধান কীর্তি 'বৈকুণ্ঠ'। প্রবাদ এই[৪৫] যে, মনুষ্য সমান একটি খাদ প্রস্তুত করাইয়া, নানাবিধ অকথ্য পুতিগন্ধময় পদার্থে তাহা পূর্ণ করা হইয়াছিল। হিন্দুগণের প্রতি উপহাসচ্ছলে এই নরককুণ্ডের নাম 'বৈকুণ্ঠ' রাখিয়া, রাজস্বপ্রদানে অশক্ত জমিদারগণ ও আমিল্‌গণের প্রতি এই বৈকুণ্ঠবাসের আদেশ হইত। নানা প্রকার অত্যাচারের পরে তাহাদিগকে এই হ্রদে প্রক্ষেপ করিয়া টানিয়া আনার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে রাজকরের এক পয়সাও বাকি পড়িত না।' এখানে সূচনায় জনশ্রুতি বলিয়া আরম্ভ। পরবর্তী লেখকগণ ইহাই অবলম্বন করিলেও 'প্রবাদ' বলিয়া উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন! কোম্পানির রাজস্বসচিব গ্রান্ট গ্লাড-উইনের অনুবাদ পাঠের সুবিধা সত্ত্বেও, মুর্শিদাবাদের জনপ্রবাদ অনুসারে মুর্শিদকুলি খাঁর স্কন্ধে ইহার পিতৃত্ব আরোপ করিয়াছেন।[৪৬] কিন্তু তিনি নির্দেশ করেন, বাস্তবিক 'বৈকুণ্ঠ' প্রেরণ ঘটিত না। ভয়প্রদর্শন করিয়া রাজস্ব আদায় ও ভবিষ্যতে ত্রুটি না হয়, ইহাই লক্ষ্য ছিল। ইহাতে দেখা যায়, বৈকুণ্ঠের প্রবাদ অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের সমসাময়িক লোকমুখেই বিভিন্নভাবে কথিত হইয়াছে।[৪৭]

এক্ষণে জমিদারপীড়নে রজী খাঁর কি পরিমাণে অবসর ছিল, দেখা যাউক। মুর্শিদকুলির শাসনের প্রথম হইতেই সৈয়দ একরাম খাঁ তাহার দেওয়ান। এ সময়ে ভূপতি রায় রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে শেষাদিকেও একরাম খাঁকে নিযুক্ত দেখিতে পাই।[৪৮] অতঃপর রজী খাঁর মৃত্যুর পর, নবাব দৌহিত্র বালক সরফরাজ খাঁর নামে দিল্লিশ্বর ফররোখ্‌শেবের নিকট হইতে বাদশাহী দেওয়ানের সনন্দ আনাইয়া লন। সরকারি জায়গির ভোগই দৌহিত্রের কার্য। এই সময় হইতে খাল্‌সা সেরেস্তার (রাজস্ব বিভাগের) পূর্ণ ভার হিন্দু দেওয়ানের হস্তে অর্পিত হয়। ভূপতি রায়ের পর, কানুনগো দর্পনারায়ণ ও রঘুনন্দন যথাক্রমে এই বিভাগের কর্মচারী। ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে ফররোখ্‌শেবের মৃত্যু হয়। তর্কস্থলে রজী খাঁর অপরাধ স্বীকার করিলেও দেখা যায়, ভগবান তাহাকে দীর্ঘকাল অত্যাচার করিবার সুযোগ দেন নাই। নাজির আহম্মদ নামক ক্রোক সাঁজোয়াল বন্দোবস্তের সময়ে অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

উপরে যাহা নির্দেশ করা হইল, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে, জমিদারি বন্দোবস্তের সমকালে ও পরে রাজস্ব-আদায়ের নিমিত্ত মুর্শিদকুলি খাঁ যে দৃঢ়ব্রত শাসননীতি অবলম্বন করেন, তাহা উত্তরকালে জনশ্রুতিমুখে ভীষণ অত্যাচারের ভাবে দেখা দিয়াছে। কঠোর ন্যায়পর কয়জন লোক সংসারে যশঃ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন? যিনি অন্যায়াচরণের জন্য স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা স্বয়ং প্রদান করিয়া, জগতে রোমীয় ব্রুটসের

দ্বিতীয় চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার হস্তে রাজস্বের ক্ষতির জন্য জমিদারগণের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের যে অসদ্ব্যবহার হয় নাই, ইহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ বিচার না করিয়াই সমগ্র জনশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন।[৪৯]

তথ্যসূত্র

১. ঐতিহাসিকগণ এই বুৎপত্তির বিচার না করিয়াছেন, এমত নহে। পরন্তু তর্কবিতর্কে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পণ্ডিতপ্রবর ব্লকম্যান ইঙ্গিত করিয়াছেন, 'উত্তরবঙ্গের স্বাধীন নরপতি কংসের (গণেশ) সহিত রাজসাহী নাম সংযুক্ত করা যাইতে পারে। 'শাহী রাজা' অর্থাৎ হিন্দুরাজার মুসলমান সিংহাসনে অধিরোহণ তাহার দৃষ্টান্তেই দেখা যায়। রাজা কংস সম্বন্ধে ব্লকম্যানের অন্যান্য ভ্রান্তসিদ্ধান্ত এ স্থলে উল্লেখ অনাবশ্যক। মি· বেভারিজ এই যুক্তিতে আপত্তি করিয়া বলেন, রাজসাহী নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আইন-আকবরীতে রাজসাহী পরগণার নাম নাই। প্রাচীন রাজসাহী পরগণা ভাগীরথীর পশ্চিমপার্শ্বে রাজা কংসের রাজ্য হইতে বহু দূরে। অতঃপর বিভারিজ নির্দেশ করিয়াছেন, যে বীরভূমির 'রাজা' উপাধিধারী মুসলমান রাজগণের নামে রাজসাহীর উৎপত্তি সম্ভবপর। কিন্তু বীরভূমির জমিদারগণের স্কন্ধে 'শাহী রাজা' আখ্যা কিরূপে সংযোজিত হইতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। তাহাদের শ্রীবৃদ্ধির দশাযও প্রত্যন্ত ক্ষুদ্র রাজ্য ভিন্ন অন্য নামে বীরভূমি অভিহিত পারে না। ব্লকম্যান ও বেভারিজ সাহেবের নির্দিষ্ট পন্থায় অন্যরূপে আমরা রাজসাহীর বুৎপত্তি নির্দেশ করিতে পারি। মহারাজ মানসিংহ আগমহলের সৌষ্ঠবসাধন করিয়া, রাজমহল নাম দিয়া এখানে রাজধানী ও দুর্গাদি স্থাপন করেন। প্রাচীন রাজসাহী পরগণা রাজমহলের অনতিদূরে; এই কারণে 'সাহী রাজ' মানসিংহের নামেই রাজসাহীর উৎপত্তি, এই নির্দেশ সঙ্গত। বাদশাহ আকবরের সময়ে রাজসাহীর অস্তিত্ব ছিল না, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর সুলতান সুজার দ্বারা পার্শ্ববর্তী সুলতানাবাদ পরগণার নামকরণ সম্ভবপর। বেভারিজ সাহেবও পরে বলিয়াছেন, মানসিংহের নামে 'রাজসাহী' এবং নিকটস্থ পরগণা কুমারপ্রতাপও এইরূপে মানসিংহের ভ্রাতা কুমার প্রতাপ সিংহের নামে হওয়া সম্ভব।

২. মুরারই হইতে ঠিক পশ্চিমে, মহেশপুরের পূর্ব-দক্ষিণে বীরকিটি গ্রাম। কেহ কেহ ইহাকে সাধুভাষায় 'বীরক্ষিতি' বলিতে চান। ক্ষিতীশবংশাবলীতে বীরকাটি আছে। বীরকিটি হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে দেবীনগর। ইহার নিকট হইতে সমসূত্রে দমদমা, বীরকিটি ও নারায়ণগড়ের গড়খাতের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। বীরকিটির গড়টি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ভিত্তি উচ্চস্থানে স্থাপিত ও খাতগুলি গভীর। এখনও এখানে রাজার সম্পত্তি নিহিত আছে বলিয়া, গ্রামবাসিগণ অনেক স্থলে গর্ত কাটিয়া অর্থের সন্ধান করে। বৃহৎ গড়টি মুর্শিদাবাদ যাইবার সদর দপ্তর রাস্তার সম্মুখে এক উন্নত ভূমির উপর স্থাপিত। ইহার নিকটে যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। জনপ্রবাদ, এখানেই রাজার সেনানিবাস ছিল। নাম 'মুড়মুড়ে ডাঙা' বা মুণ্ডমালা। বীরকিটির নিকটে এখনও লোকে দগ্ধ মৃৎকন্দুক, প্রস্তরবর্তুল প্রভৃতি পাইয়া থাকে।

৩. উদয়নারায়ণের রাজদত্ত 'রায়' ও 'লালা' উপাধি ছিল। তাহার শ্বশুর বংশীয় মুর্শিদাবাদ গণকর নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় সম্প্রতি উদয়নারায়ণ সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

৪. মুসলমান গ্রন্থকার কেবল মহম্মদ জানের নামোল্লেখ করেন। তাহার সমসাময়িক ক্ষিতীশবংশাবলীর উক্তি তাহার কথা অপেক্ষা অল্প প্রামাণিক নহে বলিয়া, আমরা তাহাও গ্রহণ করিলাম। বিনামা গ্রন্থকার নির্দেশ করিয়াছেন, "প্রেরিত জমাদারদ্বয় (গোলাম মহম্মদ ও কালু) উদ্ধতভাবে প্রাপ্য বেতনের দাবি করিয়া হাঙ্গামা উপস্থিত করিলে, তাহাদের শাসন জন্য উক্ত সৈন্যদল প্রেরিত হয়।" পরবর্তী লেখকগণ ইহাই অবলম্বন করায় সত্যনির্ধারণ করিতে পারেন নাই। কেহ বা লিখিয়াছে, "হাঙ্গামার কারণ নির্ণয় না করিয়াই কুলী খাঁ সৈন্য প্রেরণ করেন।" দেশীয় কৃষক, বিদ্রোহের সমর্থন করিতেছে; ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের মতে লাহরীমল্লের সহিত কৃষ্ণনগরের যুবরাজ বীরপ্রবর রঘুরাম যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাহারই অমোঘ শরসন্ধানে 'আলি মহম্মদ' নিহত হন। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র নাটোর রাজবাটির প্রবাদ অবলম্বন লিখিয়াছেন "উদিতনারায়ণ নবাবের কর্মচারিগণের উৎপীড়নে বিদ্রোহী হইয়া সদলে সুলতানাবাদের পার্বত্যপ্রদেশে প্রস্থান করেন। রঘুনন্দন তাহাকে ধৃত করিয়া রাজসাহী জমিদারি পুরস্কার প্রাপ্ত হন।" সম্ভবতঃ নাটোর বংশের জমিদারি প্রাপ্তির পরে এই শেষোক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

৫. অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের মতে উদয়নারায়ণ দেবীনগরের নিকটবর্তী হ্রদে হেংস সরোবরে নৌকারোহনে সপরিবারে প্রাণ বিসর্জন করেন। 'বলপ্রয়োগে মুসলমান করা হইবে ভাবিয়া, রাজার দেশে দেশে ভ্রমণের' কাহিনীর কোনও মূল্য নাই। পূর্ব কথিত নবপ্রকাশিত বিবরণে উদয় নারায়ণের মুর্শিদাবাদে বন্দি অবস্থায় থাকার উল্লেখ আছে। রাজসাহী হইতে উচ্ছেদ করা হইলেও সুল্‌তানাবাদ পরগণার জমিদারি কিছুদিন উদয়নারায়ণের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেওয়া হইয়াছিল।

৬. আইন-ই-আকবরী (প্রথম খণ্ড)।

৭. কানুন্‌গোর কার্যবিবরণ 'নবাবী আমলের বিধিব্যবস্থা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহাদের সম্বন্ধে সাধারণের নানারূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। আমরা ১৩০২ সালে 'সৎসঙ্গ' মাসিক পত্রে বঙ্গাধিকারী কানুনগো সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করি।

৮. উভয় কানুনগো-বংশই কায়স্থ এবং দুই পক্ষের 'নারায়ণ' সংযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া, অনেকে ইহারা একবংশীয় বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। দর্পনারায়ণ প্রথম প্রধান কানুনগো ভগবান রায় হইতে তৃতীয় পুরুষ। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবী কেল্লার সম্মুখে ভাগীরথীর অপর পারে ডাহাপাড়ায় বাস করিতেন। দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণ কিয়দ্দুরে ভট্টবাটিতে বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। উভয়েই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হইলেও ডাহাপাড়ার রায়বংশ খাজুরডিহির মিত্র ও ভট্টবাটির বংশ কান্দির সিংহ। ভাগ্যচক্রেব ভয়াবহ পরিবর্তনে সমগ্র বঙ্গের ভূসম্পত্তির রেজিস্ট্রার প্রথম প্রধান কানুনগোর বংশধর প্রতাপনারায়ণ বর্তমানে রূরাল সব্ রেজিস্ট্রার।

৯. ইনি প্রবাদ বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবর্তী গ্রন্থকারগণ গল্পভাগ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত কথার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

১০. এই সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁর সুবাদারি প্রাপ্তি ঘটে নাই, পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

১১ একালে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী পেস্কার নামে অভিহিত হইতেন। মুর্শিদকুলি দেওয়ান খাল্‌সা শরিফ৷ আখ্যা দেন।

১২. জমিদারির আয় ব্যতীত পরিবার পোষণের জন্য অনেক জমিদারের নিষ্কর ভূসম্পত্তি থাকিত। এইরূপ বৃত্তির আয় নানকর বলিয়া কথিত হইত।

১৩. রিয়াজ-গ্রন্থকার এখানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া লিখিয়াছেন, "সর্বপ্রকার শারীরিক সুখভোগ হইতে বঞ্চিত করায়, ক্রমশঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তাহার মৃত্যু সংঘটন হয়।" ইহা অজ্ঞাতনামা লেখকের উক্তির ভাষান্তর মাত্র।

১৪. তারিখ্ বাঙ্গলা।

১৫. Cal. Review, The Rajas of Rajshahi.

১৬. কোম্পানির সেরেস্তাদার গ্রান্ট-সাহেব তাহার রাজস্ব বিবরণীতে ভ্রমপূর্বক নির্দেশ করিয়াছেন, "শিবনারায়ণের অংশ রসুম অল্প হওয়ায় তাহাকে রুকুনপুর জমিদারি প্রদত্ত হয়।" (Fifth Report). তিনি অবশ্য দর্পনারায়ণের কারাবাসে মৃত্যুর কোন উল্লেখ করেন নাই। রুকুনপুর জমিদারি প্রথম কানুন্‌গোর ছিল।

১৭. দর্পনারায়নের পিতা হরিনারায়ণের নামে পূর্বকথিত ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে কানুনগো কার্যবিভাগের সনন্দ ও শিবনারায়ণের সনন্দ অদ্যাপি বঙ্গাধিকারী কানুন্‌গো বাটিতে রহিয়াছে। পরিশিষ্টে প্রথম ফর্মানের অনুবাদ প্রদত্ত হইবে।

১৮. উইলসন সাহেবের নতুন গ্রন্থে প্রকাশিত রেকর্ড হইতে এই নতুন তথ্য পাওয়া যাইতেছে। ইনি যে নাটোরের রঘুনন্দন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

১৯. রামকৃষ্ণ প্রাচীন সাঁন্তোলের রাজা। অত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সম্মিলিনস্থানে সাঁতোল অবস্থিত ছিল। বিদ্যোৎসাহিতা ও পুণ্যকীর্তির জন্য রামকৃষ্ণ সুবিখ্যাত ছিলেন। নাটোর রাজবাটীতে রক্ষিত এক প্রাচীন সনন্দে দৃষ্ট হয় ১১১৬ হি: (১৭০৪ খ্রি:) অব্দে বাদশাহ আরঙ্‌জেব এই বলরামের নামে ২৫৩২৪৬ টাকা রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে ভাতুড়িয়া দিগরের জমিদারি প্রদান করিতেছেন। বক্ষ্যমান সনন্দের ইয়াদ্‌দস্তে লিখিত আছে, "১১১৫ হি: সালে সুবা বাঙ্গলার দেওয়ান মুর্শিদকুলির আবেদনে প্রকাশ যে, চাক্‌লা ঘোড়াঘাটের ভাতুড়িয়া ও গুয়রহের জমিদার শর্বাণী দেবীর দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস হওয়ায় কার্য পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম; তাহার স্বামী পূর্বে এই মহালের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, মহালের গোমস্তাগণ এক্ষণে তাহার আদেশ মান্য করে না; অনেক রাজস্ব বাকি ও লুটপাট হইতেছে। দরখাস্তকারী (বলরাম) বাকি খাজনা পেস্‌কস সহ আদায় দিয়া সনন্দপ্রাপ্তির আশা করে। আদেশ হইল যে, সমস্ত বিষয় দেখিয়া শুনিয়া উহার নামে সনদ দেওয়া হয়।"

২০. শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত নাটোর রাজবাটির সনন্দগুলির কয়েকখানি বিকৃত প্রতিলিপি হইতে সুবিজ্ঞ পারসি ভাষাবিদ্গণের সাহায্যে মর্মোদ্ধার করা হইয়াছে। নিম্নে ভাতুড়িয়া সনন্দের অনুবাদ প্রদত্ত হইল; ইহাতে রঘুনন্দনের জমিদারি প্রাপ্তির বিবরণ পরিস্ফুট হইবে।

"মহামান্য দস্তখতী সনন্দের বিবরণ এই যে সন ৫ জুলুস্ (রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ) ১১ শাবান বাদশাহ সরকারের হিতকারী সম্মানভাজন সুচরিত্র অনুগ্রহপাত্র বীর মুর্শিদকুলি খাঁ হুজুরে প্রার্থনা করেন যে, 'ভাতুড়িয়া পরগণার (যাহা বঙ্গদেশের কর্মচারিগণের তন্খার জন্য নির্দিষ্ট আছে) জমিদারি কার্যের নিতান্ত অব্যবস্থা ঘটিয়াছে, তথাকার জমিদার শ্রীমতী শর্বাণী দর্শন ও শ্রবণশক্তিবিহীনা ও কার্য পরিচালনে অক্ষম ছিলেন। সম্প্রতি তাহার নিঃসন্তান পরলোগপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাহার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম বৃদ্ধ হওয়ায়, তাহার দর্শন ও শ্রবণ শক্তি হ্রাস হইয়াছে। তিনি নিঃসন্তান, তাহার দ্বারা জমিদারি কার্য নির্বাহ হয় না। এজন্য অধীন (কুলি খাঁ) শর্বাণীর মৃত্যুর পরে জমিদারি কার্যে সম্পূর্ণ কুশল রামজীবন ও কালু কোঁয়ারকে মহালের সুশাসন ও উন্নতিবিধান জন্য ঐ জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। ভরসা যে, হুজুরের সম্মতিক্রমে দস্তখতী সনন্দ দেওয়া হইবে।' এই আবেদন গ্রাহ্য করা হইল। এক্ষণে কর্তব্য যে বর্তমান ও ভাবী কারোরিয়ান ও মুতসুদ্দীগণ এই আদেশ অনুসারে উক্ত প্রশংসিত ব্যক্তিদ্বয়কে এই জমিদারির ভারপ্রাপ্ত জানিবেন। যথাসময়ে রাজকর আদায়-দান ও প্রজাবর্গের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাহারা সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। রীতি ও আইনবিরুদ্ধ কোন নতুন কর বা নিয়ম সংস্থাপন করিবেন না, এবং মহালের উন্নতিপক্ষে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।" পৃষ্ঠে ইয়াদদস্তেও এই মর্মে নির্দেশ আছে। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, ১১১৭ সালে রামকৃষ্ণের পরলোকান্তে রাণী শর্বাণীর নামে জমিদারি বন্দোবস্ত ছিল; রঘুনন্দনই কার্যনির্বাহ করিতেন। পরে শর্বানীর মৃত্যু হইলে রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত হয়।" এখানে শর্বাণীর মৃত্যুকাল রামকৃষ্ণে অর্পিত। বলরামকে পূর্ববর্তী লেখকগণও দখল দেন নাই। মৈত্র মহাশয় সনন্দগুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না।

২১. সীতারাম সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি সম্বলিত ইতিহাস মি. ওয়েস্টল্যান্ডের যশোহরের বিবরণীতে প্রদত্ত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ লেখকগণের ইহাই অবলম্বন। সম্প্রতি এই বিষয়ে আরও অনেক প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে।

২২. West Land's Jessore and Bengal Monuments. দশভুজা মন্দিরের,—

মহীভুজরসক্ষৌণীশাকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীসীতারামরায়েণ ** মন্দিরং।

এই নির্দেশ হইতে ১৬২১ শক বা ১৬৯৯-১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে,—

লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে
নির্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেন মন্দিরম্।

১৬২৫ শক হইতে ১৬২৬ শক এবং দুর্গবহিঃস্থ কানাইনগরের কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের শিলালিপি হইতে দৃষ্টি হয়।

বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী
শ্রীমদ্বিশ্বাসভাযোদ্ভবকুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ॥

মহী = ১, ভূজ = ২, রস = ৬, ক্ষৌণী = পৃথিবী = ১, অঙ্কস্য বামাগতিঃ বলিয়া ইহাতে ১৬২১ শক, এইরূপে, তর্ক = দর্শন = ৬, অক্ষি = ২, রস = ৬, ভূত = ১ হইতে ১৬২৬ শক, এবং বাণ = ৫, দ্বন্দ্ব = ২, অঙ্গ = ৬, চন্দ্র = ১, হইতে ১৬২৫ শক দৃষ্ট হয়।

২৩. বিনামা গ্রন্থকার এই ব্যাপার আরঙ্জেবের সময়ে ঘটে মনে করিয়া কুলি খাঁর ভয়ের কারণ অনুমান করিয়াছেন।

২৪. স্টুয়ার্ট সীতারামের পরিবারবর্গকে দাসরূপে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এই সঙ্গে বাদশাহসকাশে 'জবাবদিহি' করিবার সময়ে কুলি খাঁ স্বকীয় ব্যবহার অনুকূলভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই উক্তি অনুগ্রহপূর্বক যোগ দিয়াছেন।

২৫. এই দয়ারাম রায়ই বিখ্যাত দিঘাপতিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে দয়ারাম গুপ্তভাবে মেনা হাতিকে নিহত করেন। জনশ্রুতি আরও বেশি দূর গিয়াছে। শুলবিদ্ধ হইলেও মেনা হাতির মৃত্যু হইল না,

তখন তিনি স্বয়ং স্বীয় মৃত্যুসন্ধান বলিয়া দিলেন। তাহার কুম্ভকর্ণের মত প্রকাণ্ড মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া নবাব-সদনে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। নবাব তো তাহা দেখিয়া নির্বাক, পরে আক্ষেপ করিয়া (সম্ভবতঃ আবুতোরাপের মৃত্যুতে সীতারামের খেদোক্তির জবাবে) বলিলেন, 'হায় হায়, এমন মহাবীরকে জীবিত ধৃত না করিয়া নিহত করিলে?' তখন পুনরায় সেই ভীমমুণ্ড ভূষণায় প্রেরিত হইল। সীতারাম (?) সেই মুণ্ড দুর্গ মধ্যে সমাহিত করিলেন; ইত্যাদি। এখনও লোকে ঐ সমাধিস্থান দেখাইয়া দেয়। সীতারামের উচ্ছেদের পর দয়ারাম কৃষ্ণজীর বিগ্রহ আনিয়া দিঘাপতিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব-দত্ত সীতারামের অস্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ দিঘাপতিয়ায় আছে বলিয়া প্রকাশ।

২৬. নাটোর বাটির ফররোখ্‌শের দত্ত ভূষণার বাদশাহী সনন্দে (হি: ১১১৯, খ্রি: ১৭১৬) তারিখ আছে। ভাতুড়িয়া ও রাজসাহীর সনন্দও এই সময়ের। বাঙ্গলার সুবাদার জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া প্রচলিত প্রথানুসারে বাদশাহী সনন্দ অবসর মত আনাইয়া দিতেন। সীতারামের মৃত্যুর দুই এক বর্ষ পরে সনন্দ দান ধরিলে ভ্রম না হওয়াই সম্ভব। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে সীতারামের অন্তর্ধানের প্রচলিত প্রবাদও ঠিক হইতে পারে। ভূষণার সনন্দে "বিমজ্জির্ম তপশীল বেশি জমা ও পেস্‌কস প্রদান স্বীকারে ভূষণার 'খারিজা' জমিদারি রামজীবনকে প্রদত্ত হইল,"—এইমাত্র নির্দেশ আছে। সীতারামের কোনও উল্লেখই নাই।

২৭. রঘুনন্দনের রায়রায়ান্‌ উপাধি-প্রাপ্তির প্রবাদ আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে খাল্‌সা দেওয়ান রায়রায়ান্‌ উপাধি পাইতেন বলিয়াই তাহার উপর এই আখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে কি না, বলা যায় না। কোম্পানির সেরেস্তাদার মিঃ গ্রান্ট সুবিস্তীর্ণ রাজসাহী জমিদারি একজন পৌরোহিত্যব্যবসায়ী বিষয়ানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণসন্তানকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন। সাহেব মহোদয় সম্ভবতঃ জানিতেন না, কথিত চাল্‌কলা-ভোজী ব্রাহ্মণসন্তান রঘুনন্দনের পদতলে আসন পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইলেও অনেক রাজস্ব সচিব আপনাকে ধন্য মনে করিতেন।

২৮. সরকার, বর্তমান জেলার পূর্বতন ব্যবস্থা। বাঙ্গলার জিন্নেতাবাদ (গৌড়) ট্যাড়া, ফতেবাদ, মহম্মদাবাদ, বাক্‌লা, খলিফাতাবাদ, পূর্ণিয়া, তাজপুর, ঘোড়াঘাট, পিঞ্জরা, বাজুহা, সোনারগাঁ, সিলট, চট্টগ্রাম, শরীফাবাদ, সুলেমানাবাদ, সাতগাঁ ও মাদারণ, এই উনিশটি, এবং উড়িষ্যার জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলঙ্গদণ্ডপৎ ও রাজমহেন্দ্রী, এই পাঁচটি সরকার। (আইন-আকবরী, দ্বিতীয় খণ্ড)।

২৯. তারিখ্‌ বাঙ্গালা।

৩০. মুসলমান লেখকের 'কারারুদ্ধ' কথায় ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপার কঠোরতর করিয়া লইয়াছেন। মুতাক্ষরীণের উক্তি ক্ষিতীশবংশাবলী ও দেশীয় জনশ্রুতির নির্দেশসহ মিলাইয়া দেখিলে জমিদারগণকে মুর্শিদাবাদ শহরের নিজ নিজ আবাসবাটিতে নজরবন্দি রাখিবার কথাই বিশ্বাস হয়।

৩১. তারিখ্‌ বাঙ্গালা।

৩২. এই অভিনব জমিদার শ্রেণির অনেকেই হয় সরকারি কর্মচারী নয় অর্থশালী, বর্ধিষ্ণু লোক। অনেকে কুলি খাঁর সময়েই এই শ্রেণির উৎপত্তি নির্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চিরদিনই এই ভাবে এই শ্রেণির লোকের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। 'মুর্শিদকুলি স্বীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ইচ্ছামত জমিদারবর্গকে উৎখাত করেন,' এই উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে।

৩৩. Grant's Analysis. মিঃ গ্রান্ট প্রধান কানুনগোর সেরেস্তা হইতে জমিদারি বন্দোবস্তের কাগজ পান; ইতিপূর্বে ফ্রান্সিস্‌ সাহেবও ঐ উপায়ে ১১৮২ সালের ৬ মাঘ (১৭৭৬ জানুয়ারি) এই কাগজের একখণ্ড নকল পাইয়া স্বীয় বিখ্যাত মিনিট্‌ লিপিবদ্ধ করেন। পরিশিষ্টে জমা কামেল্‌ তুমারীর বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৩৪. গ্রাডউইন, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি।

৩৫. ভান্সিটার্ট সাহেবের আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থমুখে ভান্সিটার্ট বন্দনায় বাণভট্টের লেখনীও ধিকৃত হইতে পারে। সেই সময়ে Asiatic Miscelliny তে প্রকাশিত মন্তব্য ভূমিকায় প্রদত্ত হইল।

৩৬. ইহার মতে জব চার্ণকের হাঙ্গামা হইতে অস্টেণ্ড কোম্পানির সহিত কলহ ব্যাপার পর্যন্ত কুলি খাঁর শাসন সময়ে সংঘটিত হয়।

৩৭. মুর্শিদকুলি খাঁ সইফী মন্ত্রে লড়াই ফতে করেন। রসিদ খাঁর সহিত যুদ্ধে মন্ত্রসাধন করিয়া নবাব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; লোকে দেখিল, স্বর্গ হইতে যোদ্ধৃগণ নীলবর্ণ পোষাক পরিধানে অবতীর্ণ হইয়া সাহায্য করিতেছে।

৩৮. কৃষ্ণনগরবাজ কৃষ্ণরামের সসৈন্যে যশোহরপ্রদেশ আক্রমণ ও রাজস্বদান রহিত করিবার কথা

ক্ষিতীশবংশাবলীতে দ্রষ্টব্য। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সেকালের জমিদারের অধিকার ও কার্যবর্ণনায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

৩৯. সুজাউদ্দিনের সময়ে বন্দিভূত সাবর্ণ চৌধুরীর সম্পূর্ণ একটি খাসি-ভক্ষণে কাবামুক্তির কথা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। আলিবর্দি খাঁর সময়ে স্বয়ং কৃষ্ণনগররাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাকি রাজস্ব ও নজরানার জন্য কারারুদ্ধ হন। (বাং ক্ষিতীশবংশাবলী ৯৮ পৃ:)

৪০. ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত।

৪১. ফররোখশেরের প্রচারিত সমস্ত ফরমানগুলি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পার্লিয়ামেন্টের প্রথম কমিটির বিবরণীতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যের বিবরণ পরে বর্ণিত হইল।

৪২ ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ নবেম্বর তারিখের লিখিত কাশিমবাজার হইতে প্রেরিত পত্র। "জাফর খাঁর সহিত তর্ক বিতর্কের সময়, মি. ফিকের উত্তেজনাপূর্ণ প্রকৃত উত্তরে সভাস্থ সমস্ত লোকে চকিত হইল, কেহ কেহ ভয়সূচক ভাবে কানাঘুসা করিতে লাগিল। নবাব কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে পান আনাইয়া কয়েকটি মিষ্ট কথায় আমাদিগকে বিদায় দিলেন। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় জানিও তোমাদের শত্রু হইব না, যাহা করা যাইতে পারে দেখিব।' নবাব যাহাদের সহিত আর কথা কহিতে চান না, তাহাদিগকে এইরূপ মিষ্ট কথার ছলে বিদায় দেওয়াই তাহার নিয়ম।

Auber's Rise and Progress of the British in India P. 22.

৪৩. Raja Nava Kissen's petition to the Council of Revenue D. Fort William 1777 (Revenue Board)। ইহাতে আলিবর্দি খাঁর সময়ে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রকে সেলিমাবাদ, মানিকচাঁদকে আরজা, রাজবল্লভকে বুজরগউমেদপুর, এইরূপে দানের কথা ও তৎপরে কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, পরবর্তীকালের অনেক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা বিনয় কৃষ্ণ ইহার অখণ্ড প্রতিলিপি আমাকে দিয়াছিলেন।

৪৪. অন্যত্রও এই প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহার অস্বাভাবিকত্ব বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য। বিড়ালপুরিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সেকালের গুরুমহাশয়দিগের গল্পে শোনা যায়; লেখক বা রজী খাঁ সেরূপ পাঠশালে শিক্ষিত হইতেও পারেন।

৪৫. অজ্ঞাতনামা লেখক প্রবাদ ('গোয়েন্দ') বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ এই ভাগটুকু গ্রহণ করেন নাই।

৪৬ নিজামত রেকর্ড প্রভৃতিতে প্রকাশ মি. গ্রান্ট ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ হইতে মুর্শিদাবাদে প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলে কার্য করিতেন।

৪৭ মুর্শিদাবাদ শহরের পলাণ্ডুভোজী নিম্নশ্রেণির লোকের বাটির পার্শ্বে বর্তমানেও 'বৈকুণ্ঠের' অভাব নাই। উপহাসচ্ছলে এরূপ স্থান লক্ষ্য হইতে পারে। বৈকুণ্ঠের স্থান নির্ধারণের মুর্শিদাবাদ প্রবাসী লেখকের পরিহাসরসিক কোন বন্ধু মুর্শিদাবাদের নবাবী কেল্লার দক্ষিণদ্বারে ইহার কাল্পনিক স্থান নির্দেশ করেন। 'সৎসঙ্গ' পত্রিকায় ইহার উল্লেখ করিয়া আমরাই অনেককে সশরীরে 'বৈকুণ্ঠ' লইয়া যাইবার পথপ্রদর্শক হইয়া পড়িয়াছি। ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ অনেকে সন্ধান করিয়া ইহার কোন তথ্য জানিতে পারেন নাই।

৪৮. উল্লিখিত ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাশিমবাজারের ইংরেজ প্রতিভু দেওয়ান একরাম খাঁর সমক্ষে নবাবের সহিত দেখা করেন। (Auber P. 21)

৫৯. মুর্শিদাবাদের প্রথম ইতিহাস লেখক ইউসুফ আলি খাঁ, সুজা খাঁ আলিবর্দির, সমসাময়িক। পূর্ববর্তীকালের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া, তিনি কেবল সরফরাজ ও আলিবর্দি খাঁর সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মুতাক্ষরীণ লেখকেরও এই অংশের ইতিহাসে উক্ত বিবরণীই প্রধান অবলম্বন। মুতাক্ষরীণকার ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন অজ্ঞাতনামা লেখকের উক্তি ও পরবর্তী প্রবাদ অবলম্বনে কুলী খাঁর সময়ের জমিদারগণের অত্যাচার সম্বন্ধে কালী কলম খরচ করাই অন্যায় এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া সাদীর 'বয়েদ' তুলিয়াছেন, কিন্তু আলিবর্দিকৃত বিহারের অত্যাচার বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। অন্যত্র মুর্শিদকুলির প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা ও তজ্জন্য বাদশাহ দরবারে প্রতিপত্তির কথা নির্দেশ করিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। এ সম্বন্ধে সমগ্র প্রবাদ বিশ্বাস করিলে তিনি বিস্তৃত ইতিহাস দিতেও পারিতেন। মা-আসির-উল-উমারার' দ্বিতীয় গ্রন্থকার 'তারিখ্ বাঙ্গলা' দেখিয়াছেন, স্পষ্টই বোধ হয়।

জমিদার ও মগ ফিরিঙ্গি

মোগল পাঠান বিপ্লবের সময়ে পূর্ববঙ্গ এবং সুন্দরবন অঞ্চল বার ভুঁইয়ার মুলুক নামে অভিহিত হইয়াছিল। ফার্নাণ্ডেজ ডুজারিক প্রমুখ পর্তুগিজ জেসুইট পাদরীদিগের লিখিত বিবরণীতে বার ভুঁইয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে প্রধান রাজার অধীন আট বা বার জন সামন্তকে লইয়া একটি মণ্ডল গঠিত হইত [১]। কালে হয়ত বার জন সামন্ত থাকার প্রথাই প্রচলিত হইয়াছিল। পাল রাজগণের শাসন সময়ে বাঙ্গলায় এইরূপ বার ভুঁইয়া ছিল, তাহার প্রমাণ ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়[২]। তৎপরবর্তীকালের এই বার ভুঁইয়ার কথা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় বিশেষ ফল নাই। মোঘল আক্রমণের সমকালেই জেসুইট্ পাদরীরা এদেশে আসিয়া নিম্নবঙ্গে রাজার তুল্য ক্ষমতাশালী দ্বাদশ ভৌমিকের অস্তিত্ব লক্ষ করিয়াছেন; পার্চাসের ভ্রমণবৃত্তেও ঐরূপ কথা আছে। পর্তুগিজ পাদরীরা লিখিয়াছেন, ভুঁইয়াদের মধ্যে তিন জন হিন্দু, অবশিষ্ট মুসলমান; শ্রীপুর, বাক্‌লা (চন্দ্রদ্বীপ) ও চণ্ডিক্যান্—এই তিনের অধিপতি হিন্দু ভুঁইয়া। চণ্ডিক্যান্ লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইলেও পূর্বে চাঁদ খাঁর জায়গীর ছিল বলিয়া সুন্দরবন অঞ্চলই বিদেশী পর্যটকের বিকৃত উচ্চারণে ঐ নাম পাইয়াছে, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ডুজারিক লিখিয়াছেন—'মোঘলেরা ইহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেও ইহারা আবার স্বাধীন হইয়াছে। ইহারাই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যাধিপতি; কিন্তু ভুঁইয়া নামে অভিহিত। সমস্ত পাঠান ও বাঙ্গালীরা ইহাদের অধীনতা স্বীকার করে'। [৩]

জেসুইট্, পাদরীরা সোনারগাঁ অঞ্চলের পূর্ব কথিত ইশা খাঁকেই প্রধান ভুঁইয়া বলিয়াছেন; অন্য মুসলমান ভুঁইয়ার নাম পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, ইশা খাঁ'র পিতা রাজপুত বংশীয় হিন্দু। বাল্যে ইহারা দুই সহোদরে দাস স্বরূপে বিক্রিত হইয়া বিদেশে নীত হন এবং পরে ইহার মাতুল ইহাকে বাঙ্গলায় লইয়া আছেন। ইশা নিজ প্রতিভা বলে ক্রমে সুবর্ণগ্রাম খিজিরপুরের জমিদারি লাভ করেন। মোগল-পাঠান বিপ্লবের কালে অন্য জমিদারদিগকে আয়ত্ত করিয়া তিনি সমগ্র ভাটি বা পূর্ববঙ্গের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। খিজিরপুরের মধ্যে কাটরাপুর তাহার রাজধানী ছিল।[৪]। মাসুম খাঁ কাবুলী ইহার আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। খাঁজাহানের সময়ে ইশা নামে মাত্র মোঘলের প্রভুশক্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। মোঘল সেনানীগণের বিদ্রোহাচরণে সুবিধা পাইয়া তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবহার আরম্ভ করেন। কোচবিহার রাজ পর্যন্ত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাহার অধিকারে জলজঙ্গল অধিক থাকায় সহজে শত্রুপক্ষ তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত না। কথিত আছে যে পার্শ্ববর্তী বিক্রমপুর শ্রীপুরের চাঁদ রায়ের (কোন মতে কেদার রায়ের) বিধবা কন্যা সোনামণিকে বল ও কৌশলে আনাইয়া ইশা খাঁ তাহাকে বিবাহ করেন। এই চাঁদ ও কেদার রায়

শ্রীপুরের ভুঁইয়া। চাঁদ রায় এই অপমানের পরে ইশা খাঁ'কে নির্যাতন করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষোভে কালগ্রাসে নিপতিত হন। ইশা খাঁর মৃত্যুর পরে সোনাবিবি মগদিগের আক্রমণ হইতে দেশ ও আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, এই প্রবাদও চলিত আছে।

শ্রীপুরের কেদার রায়ও দুর্ধর্ষ ভৌমিক ছিলেন। বিক্রমপুরের চতুর্দিকে বহুতর নদী থাকায় বিপ্লবের অবকাশে শক্তি সঞ্চয় ও স্বাধীনতা অবলম্বন অনেকটা সহজও ছিল। ইশা খাঁর অধিকার আক্রমণ ব্যাপারে নিষ্ফল হইলেও কেদার রায়ের পক্ষে সে সময়ের সুবিধায় মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন করা কঠিন হয় নাই। তাহার অনেক কোষা রণতরী ছিল। নৌসৈন্য চালনার জন্য তিনি অনেক পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া তখন গোলযোগ চলিতেছিল। মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া প্রচারিত হইলেও আরাকানের মগ ও পর্তুগিজ ফিরিঙ্গির মধ্যে উহার স্বামিত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব হইত। কেদার রায় এই সুযোগে সন্দ্বীপ নিজ অধিকারে আনয়নের উদ্যোগ করিলেন। কার্ভালো নামক পর্তুগিজের অধীনে অনেক রণতরী পাঠাইয়া কেদার রায় একবার সন্দ্বীপ দখল করিলেন। কিন্তু কার্ভালো অচিরে মগ ও মোঘলদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে বঙ্গোপসাগরের পর্তুগিজ দলপতি মাটুম্‌ চারিশত সৈন্য সঙ্গে আনিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন। কেদার রায় পর্তুগিজদের হস্তেই সন্দ্বীপের ভার দিলেন। এই সময়ে চট্টগ্রাম হইতে সমগ্র বঙ্গোপসাগরের মুখে পর্তুগীজের প্রাধান্য বিস্তার দেখিয়া আরাকান রাজ তাহাদের দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি পর্তুগীজের বিরুদ্ধে কামানযুক্ত বড়ো জাহাজ ব্যতীত দেড় শত ত্রিংশৎ ক্ষেপণীযুক্ত রণতরী পাঠাইলে কেদার রায় উহাদের সাহায্যার্থে একশত কোষা প্রেরণ করিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পরে পর্তুগীজেরা জয়ী হইল। বিপক্ষের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করিয়া লইল (১৬০২ খৃঃ)[৫]। আরাকান রাজ এই পরাভবে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বহুসংখ্যক রণতরী[৬] পাঠাইলে পর্তুগীজেরা অল্প সংখ্যক নৌকা ও লোক সাহায্যে সেবারেও জয়লাভ করে। অনেক মগ নিহত হয় এবং তাহাদের ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়। জয়লাভ হইলেও রণতরী সকল বিনষ্টপ্রায় হওয়ায় এবং ঝড়ের ভয়ে পর্তুগিজ সেনাপতি কার্ভালো ৩০ খানি নৌকাসহ শ্রীপুরে কেদার রায়ের আশ্রয়ে আসিলেন। অবশিষ্ট পর্তুগিজেরা বাক্‌লা, চণ্ডীকানে গেল। সন্দ্বীপ মগেরা অধিকার করিয়া লইল।

এই সময়ে রাজা মানসিংহ নিম্ন বঙ্গের জমিদারবর্গকে আয়ত্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ভুঁইয়াদের মধ্যে পরস্পরে বিদ্বেষ ভাব ছিল এবং গৃহচ্ছিদ্র জানাইবার লোকেরও অভাব ছিল না। কেদার রায় বিক্রমপুর অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য নৌসেনাপতি মন্দা রায়ের অধীনে মোঘল রাজের একশত খানি কোষা রণতরী প্রেরিত হইল। মেঘনা বক্ষে এক ঘোরতর জলযুদ্ধে কার্ভালোর নায়কতায় সমর কুশল কেদার রায়ের জয় হইল; মন্দা রায় নিহত হইলেন[৭]। কার্ভালো অতঃপর গোলিন বন্দরে (হুগলিতে) উপস্থিত হইয়া সেখানে এক মোঘল দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। পার্চাস্‌ লিখিয়াছেন, কার্ভালোর নামে বাঙ্গলায় লোকের এতই

আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, এক সময়ে একজন ৫০ খানি রণপোতের অধ্যক্ষ মগ সেনাপতি স্বপ্নে কার্ভালো আক্রমণ করিয়াছে ভাবিয়া লোকজনকে বিব্রত করিয়া তুলেন। আরাকান রাজ ইহা শুনিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। যাহা হউক, মোঘল ও মগের ভয়ে কার্ভালো নানাস্থানে পলাইয়া শেষে যশোরে প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় লয়। মগেরা এই সময়ে সন্দ্বীপ ও বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ঐ অঞ্চলে ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। আরাকান রাজ যাহাতে তাহার অধিকার আক্রমণ না করেন, এই উদ্দেশ্যে এবং হয়তো তাহার অনুরোধ ক্রমেই প্রতাপাদিত্য কার্ভালোকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করেন। ফিরিঙ্গি দস্যু হইলেও সেই বীর পুরুষকে আশ্রয় দিয়া নিহত করা নির্দয়তা ও কাপুরুষতার কার্য সন্দেহ নাই।

পাঠান দলপতি ওসমান খাঁকে দমন করিবার নিমিত্ত পূর্ববঙ্গে আসিয়া রাজা মানসিংহ কেদার রায়কে পরাস্ত করেন। জয়পুরে আবিষ্কৃত বংশাবলী ও বিবরণী হইতে জানা যায় যে কেদার রায়কে পরাভূত করিয়া রাজা মানসিংহ তাহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এবং তাহার কুলদেবতা শিলা দেবীকে জয়পুরে লইয়া যান[৮]। এই সময়ে কেদার রায় মানসিংহের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেও পরে তিনি আরাকান রাজের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। [৯] মগেরা নিম্নবঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়া বিক্রমপুর আক্রমণ করিলে কেদার তাহাদের পক্ষই অবলম্বন করেন। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে মগগণকে পরাভূত করিয়া রাজা মানসিংহ কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে কেদার রায়ের পাঁচশত রণতরী ছিল। মোগল সেনানী কিলমক্ আক্রমণ করিতে আসিয়া শ্রীপুরে কেদার রায়ের বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। রাজা মানসিংহ তাহার সাহায্যার্থ অন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। প্রবল যুদ্ধের পর কেদার রায় আহত হইয়া বন্দিভূত হইলেন; তাহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া যাওয়ার কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয়।[১০]

চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর সোনারগাঁ হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে পদ্মার তৎকালবর্তী এক শাখা কালীগঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। তৎপরে পদ্মাবতীর প্রবল প্রবাহ যোগে ঐ নদী ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া শ্রীপুর প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া প্রবাহিত হয়। চাঁদ কেদার রায়ের সমগ্র কীর্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে বলিয়া উহার নাম এখন কীর্তিনাশা হইয়াছে। কেদার রায় বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন; কেদারপুর নামক গ্রাম এখনও তাহার নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজবাড়ির প্রসিদ্ধ মঠ এখন এই রায় বংশের প্রধান কীর্তিস্তম্ভ। সেকালের জমিদারবর্গের ত কথাই নাই, সাধারণ ভদ্রলোকেও কুস্তি, তীরচালনা প্রভৃতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। পাঠান আমলে বাঙলায় পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্তশাসন ছিল, ...। জমিদারবর্গকে নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানে লিপ্ত হইতে হইত। মোঘল পাঠান বিপ্লবে আত্মরক্ষার জন্যও বল প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠান আমলে অর্ধস্বাধীন থাকায় জমিদারবর্গ সহজে মোঘলের করায়ত্ত হইতে প্রস্তুত হন নাই। কিন্তু কেদার রায় বা প্রতাপাদিত্যের চেষ্টিত বাঙালি জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তির উদ্যম নহে। ব্যক্তিগত প্রয়াস সমবেত চেষ্টার অভাবে বিফল হইয়াছিল। বঙ্গে বীরধর্মা লোকের অভাবে 'এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে' হইয়া কেদার রায়ের বীরত্ব ও কীর্তি কাহিনী নানাভাবে পল্লবিত হইয়াছে।[১১]

ভারতচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় যাহার কীর্তি গাথা উজ্জ্বলতর রূপে চিত্রিত হইয়াছে[১২] সেই বঙ্গীয় বীর প্রতাপাদিত্যের কাহিনীর ঐতিহাসিক ভাগ নিম্নে বিবৃত হইতেছে। প্রতাপাদিত্যের পূর্ব পুরুষেরা সপ্তগ্রামে কানুন্‌গো সেরেস্তায় কার্য করিতেন। তাহার পিতা শ্রীহরি ও খুল্লতাত জানকী বল্লভ সুলেমান কররাণীর রাজত্ব কালে গৌড় বাদশা সরকারে কার্য করিয়া যশস্বী হইয়া উঠেন। সমবয়স্ক বলিয়া দায়ুদ খাঁ'র সহিত শ্রীহরির যথেষ্ট সদ্ভাব হয়, এবং রাজা হইয়া দায়ুদ শ্রীহরিকে উচ্চতর পদে উন্নীত করে। কতলু খাঁ ও শ্রীহরির পরামর্শেই দায়ুদ নিজ প্রধানমন্ত্রী লোদী খাঁকে নিহত করেন[১৩], সেই অবধি শ্রীহরির প্রতিপত্তি আরও বর্ধিত হয়, এবং তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করেন, এই সমস্ত কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুন্দরবন অঞ্চলের ভৌমিক চাঁদ খাঁ নিঃসন্তান মারা যাওয়ায় শ্রীহরি দায়ুদের নিকট ঐ জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং পীঠস্থান যশোর ঈশ্বরীপুরে আবাসস্থান মনোনীত করেন। বাদশাহের সহিত যুদ্ধে দায়ুদের পাটনা হইতে পলায়নের সময়ে শ্রীহরি তাহার সমস্ত ধনরত্ন অনেক নৌকাপূর্ণ করিয়াছিলেন। এই ধনসম্পত্তি যথাসময়ে যশোরের বাটীতে আইসে। দায়ুদের ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে এই অর্থ আর প্রত্যর্পিত হওয়ার সুবিধা ঘটে নাই, বলাই বাহুল্য। যশোরের চতুঃপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ শ্রীহরির করতলগত হইলে তাহারা উভয় ভ্রাতায় নগর পত্তন ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। মোঘলের সহিত যুদ্ধে দায়ুদের পতনের পরে অবশ্য তিনি বিপন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু কথিত আছে যে রাজা টোডরমল বঙ্গের ব্যবস্থা করিতে আসিলে ইহারা অনেক সরকারি কাগজপত্র দিয়া তাহার সহায়তা করেন; তজ্জন্য রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের প্রার্থনা মতে নির্দিষ্ট রাজকর স্বীকারে যশোহর জমিদারি ইহাদের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

শ্রীহরির পুত্র প্রতাপ বাল্যকালে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎকাল প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যায়াম ও অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায় তাহার 'হঠকর্মে সদামতি, হঠ হঠ সদগতি' হইয়াছিল। বন্য জন্তু শিকার প্রভৃতি শক্তির পরিচায়ক কার্যে তিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রবাদ আছে যে এই হঠকারী যুবককে কিঞ্চিৎ শান্ত করিবার বাসনায় তাহার খুড়া বসন্ত রায়ের পরামর্শ ক্রমে তাহার পিতা প্রতাপকে কিছুদিন আগরায় বাদশা দরবারে প্রেরণ করেন, কারণ মোঘল রাজধানীর ঐশ্বর্য দেখিলে প্রতাপ আপন শক্তির লঘুতা অনুভব করিবে। এই প্রবাদে আরও গল্প যোগ হইয়াছে যে প্রতাপ তথা হইতে নিজের নামে জমিদারি পত্তনের ফর্মান আনিয়াছিলেন।[১৪] প্রতাপাদিত্য চরিত রচয়িতা রাম রাম বসু 'যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে' বলিয়া আরম্ভ করিয়া প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ মূলক বিবরণী দিয়াছেন, এখানে তাহার আলোচনার স্থান নাই, নিখিল বাবু সে কার্য যথেষ্ট করিয়াছেন। এই সকল গল্প হইতে বুঝা যায় যে প্রতাপ কোপন স্বভাব ছিলেন এবং খুল্লতাত বসন্ত রায়ের উপর তাহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। পিতার জীবিতকালেই তিনি পৃথকভাবে থাকিবার ইচ্ছায় যশোরের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে ধুমঘাট নামক পল্লিতে এক নগর পত্তন করেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রকে দশ আনা ও ভ্রাতাকে ছয় আনা বিষয়ের অংশ দিয়ে যান।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরে ধুমঘাটে মহা ধুমধামে প্রতাপাদিত্যের গৃহ প্রবেশ ও

অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। বসু মহাশয়ের নির্দেশ মতে অন্নপ্রাশনের সময় 'প্রতাপাদিত্য' নামকরণ হয়। ... নূতন নগরে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতাপ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইবার কল্পনা করেন। বিপ্লবের সময়ে পাঠান সর্দারদের মত ভুঁইয়া জমিদারেরাও সহজে মোঘলের অধীনতা স্বীকার করে নাই। বল সঞ্চয় করিয়া সাগর দ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী স্থান অধিকার করিতে প্রতাপাদিত্যের বিলম্ব হয় নাই। ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলেও সুবাদার আজিম খাঁর সময়ে প্রতাপের সহিত মোঘল সৈন্যের সংঘর্ষ হইয়াছিল, বোধ হয়। প্রতাপাদিত্য চরিত্রে লিখিত আছে, আবরম্ খাঁ নামে পাঁচ হাজারী মন্‌সবদার প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া নিহত হন। ইব্রাহিম খাঁ নামক সেনানী আজিম খাঁর সময়ে বাঙ্গলায় কার্য করিয়াছিলেন।[১৫] পাঁচ হাজারী বা নিহত না হউন, হয়তো তিনি প্রতাপের দমনে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বর্তমান যশোর চাঁচড়ার রাজাদিগের প্রাচীন কাগজপত্র হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাহাদের বংশের স্থাপয়িতা ভবেশ্বর রায় প্রতাপের বিরুদ্ধে আজিম খাঁর সহায়তা করায় আজিম সৈয়দপুর প্রভৃতি চারিটি পরগণা প্রতাপের রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভবেশ্বরকে প্রদান করেন।[১৬] সম্ভবত আজিম খাঁ স্বয়ং স্বদলে অগ্রসর হইলে প্রতাপ অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঘটক কারিকায় জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রেরিত সেনাপতি—"আজিমং মাতয়ামাস' ইত্যাদি উক্তি ঐ জাতীয় গ্রন্থের মূল্য জ্ঞাপন করিতেছে!

মোঘলের সহিত সংঘর্ষে নিজের দুর্বলতা অনুভব করিয়া প্রতাপাদিত্য কিছুকাল বল সঞ্চয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করাইয়া তিনি পর্তুগিজ সেনানীর অধীনে এক দল গোলন্দাজ সৈন্য শিক্ষিত করাইয়াছিলেন। রাজ্যরক্ষার জন্য সাগরের দিকে তাহার নৌসৈন্যও ছিল। নৌবল অধিক না থাকায় আরাকান রাজের সহিত মিত্রতা রক্ষার জন্য তিনি পর্তুগিজ নাবিক কার্ভালোকে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করেন, পূর্বেই বলা হইয়াছে। যখন পূর্ববঙ্গে মোঘল পাঠানে হাঙ্গামা চলিতেছিল, এবং শাহবাজ খাঁ ও পরে মানসিংহের সেনাদল যখন ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, সেই সময়ে প্রতাপ সৈন্যবল বর্ধিত করিতেছিলেন। খুড়া বসন্ত রায় সম্ভবত প্রতাপের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসের প্রতিকূল ছিলেন। যে কারণেই হউক, প্রতাপের বিদ্বেষ ক্রমশ বর্ধিত হইয়া তাহাকে কাপুরুষোচিত নৃশংস পিতৃব্য হত্যাকাণ্ডে প্রণোদিত করিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে বসন্ত রায়ের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিবসে পুরী প্রবেশ করিয়া প্রতাপ নিরস্ত্র পাইয়া তাহাকে তরবারির আঘাতে নিহত করেন। বসন্ত রায়ের দুই পুত্রও নিহত হন; কনিষ্ঠ নাবালক কচু রায় [১৭] বাঁচিয়া গিয়া বাদশাহ দরবারে অভিযোগ করেন। বসন্ত রায়কে সবংশে নিহত করার পরে একেশ্বর হইয়া প্রতাপ উত্তরোত্তর বল বৃদ্ধি করিতেছিলেন। অন্নদামঙ্গলে "বায়ান্ন হাজার যার ঢালী" এবং 'যোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি' আছে; সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলী উহাতে ৫১ হাজার ধনুর্ধারী যোগ করিয়াছে। বহুতর সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া প্রতাপ এখন প্রকাশ্যভাবে মোঘলের অধীনতা অস্বীকার করিলেন। রাজ্য বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় এই সময়ে পাষাণ হৃদয় প্রতাপ স্বীয় নাবালক জামাতা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার কল্পনা করেন; প্রতাপের পুত্র কন্যার কৌশলে রামচন্দ্র রক্ষা পান। রাম রাম বসুর মতে বসন্ত রায়ের বাটী হইতেই

দ্রুতগামী নৌকারোহণে রামচন্দ্র পলায়ন করেন, এবং বসন্ত রায়ের সহযোগে এই কার্য হইয়াছে ভাবিয়া প্রতাপ তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করেন। যে ভাবেই হউক, কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত প্রতাপ ঘৃণিত হন ও সেই অবধিই তাহার অধঃপতন আরম্ভ হয়। প্রতাপ প্রথম অবস্থায় সচ্চরিত্র, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন এই প্রবাদ বসু মহাশয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেবীভক্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; যশোরেশ্বরীর মন্দির সংস্কার করাইয়া পূজার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। স্বয়ং সাধক ছিলেন, ইষ্টদেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন—একথা প্রবাদ সমর্থন করে। ভারতচন্দ্র এই জন্যই 'বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর' লিখিয়া প্রতাপকে অমর করিয়াছেন। প্রতাপের দান শক্তির প্রবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া পাটরানী দানের গল্পকেও আশ্রয় দিয়াছে। রাজোচিত নানা গুণ সমন্বিত হইয়াও অহঙ্কার ও নির্দয়তার নিমিত্ত প্রতাপ স্বীয় অধঃপতনের পথ প্রস্তুত করেন। এক স্ত্রীলোকের স্তনচ্ছেদের গল্পও চলিত আছে, এবং সেই জন্যই 'বিমুখী অভয়া' [১৮] কথায় যশোরেশ্বরী ছাড়িয়া গিয়া মন্দির সহিত দক্ষিণ হইতে পশ্চিমে মুখ ফিরাইয়াছিলেন, এই প্রবাদ রচনা হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রতাপের কাল পূর্ণ হইয়া আসিলে মানসিংহ ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের নিয়োগে পুনরায় বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্ভবত মানসিংহের প্রস্থানের পরে ১৬০৪ হইতেই প্রতাপ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া চন্দ্রদ্বীপ অধিকার ও বসন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ড সমাধা করেন এবং দেশের অনেক লোকে তাহার প্রতিকূল হয়। মানসিংহ রাজমহলে ফিরিয়া আসিলেই সম্ভবত কচু রায় তাহার শরণাপন্ন হন; তখনকার দিনে বালকের বাদশা দরবার আগরা গমন সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কচু রায়কে মানসিংহ 'যশোরজিৎ' উপাধি দেওয়ার প্রবাদ তাহাকে যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাইয়াছে, এমন কি কচু রায় স্বয়ং যুদ্ধে মহাবল প্রতাপের হস্তচ্ছেদ পর্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছে! মানসিংহ রাজমহল হইতে যশোর অভিমুখে 'বাইশী লস্কর সঙ্গে' [১৯] অগ্রসর হইলেন। তাহাকে বর্ধমান জেলার বড়ো রাস্তা দিয়াই আসিতে হইয়াছিল; কবি ভারতচন্দ্র এই অবকাশে "বিদ্যা সুন্দরের কথা, প্রসঙ্গ তো শুনিল সেখানে'—লিখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের স্থাপয়িতা ভবানন্দ মজুমদার সে সময়ে কানুন্‌গো সেরেস্তার কার্য করিতেন এবং বাগোয়ান্ প্রভৃতি মৌজার তালুকদার ছিলেন। মানসিংহের পূর্বস্থলী নদীয়ার পথে গমন সময়ে ভবানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাদশাহী সৈন্যের রসদের সুব্যবস্থার সাহায্য করায় মানসিংহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অন্নদামঙ্গল এবং নদীয়া রাজের ক্ষিতিশবংশাবলী এই সুযোগে রাজাকে ভবানন্দের নিবাস খড়েপার বাগোয়ানে লইয়া গিয়া সপ্তাহব্যাপী ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফেলিয়াছেন। অন্নদামঙ্গল অন্নদার মায়ায় এবং বংশাবলী গোবিন্দ এবং লক্ষ্মীর বিবাহ ব্যবস্থার ব্যপদেশে ভবানন্দের ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য জমাইয়া মানসিংহের লস্করের আহার পর্যন্ত সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন! যে উপায়েই হউক, ভবানন্দ মানসিংহকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন তাহাব্র সন্দেহ নাই। কারণ রাজা মানসিংহ এই সময়ে ভবানন্দকে কয়েকটি জমিদারি দিয়াছিলেন। দেওয়ান কার্তিকেয় রায় তাঁহার ক্ষিতীশ বংশাবলীতে লিখিয়াছেন—"রাজা মানসিংহ ভবানন্দকে প্রথমে মহৎপুর প্রভৃতি যে কয়েক পরগণা দেন, তাহার ফরমান রাজবাটীতে

আছে—ফরমানের তারিখ ১০১৫ হিঃ" (১৬০৬ খ্রিঃ)। ভবানন্দ তৎপরে উখড়া প্রভৃতি পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ নদিয়া রাজবংশের উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে কচু রায় যশোরজিৎ উপাধির সহিত ঐ জমিদারিও পাইয়াছিলেন।

মানসিংহ সসৈন্যে যশোরের নিকটবর্তী হইলে ধূমঘাটের নিকটবর্তী মৌতলার গড়ের সম্মুখে প্রতাপাদিত্যের সৈন্য দলের সহিত রাজপুত ও মোগলসেনার এক তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। সেকালের বাঙ্গালি যুদ্ধ কার্যে অনভ্যস্ত ছিল না। ঢাল তরবার হয় হস্তি তো প্রতাপের যথেষ্ট ছিল; রুডা নামক পর্তুগিজের অধীনে গোলন্দাজ সৈন্যও শিক্ষিত হইয়াছিল। বাঙ্গালি সেনাপতি দ্বারা চালিত হইয়া বঙ্গীয় সৈন্য মোগল দলকে ত্রস্ত করিয়াছিল। যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জনসিংহ নিহত ও জগৎ সিংহ আহত হন।[২০]। প্রতাপাদিত্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত ও বন্দিভূত হইলেন। কথিত আছে যে আহত প্রতাপকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া বাদশাহের নিকট পাঠান হইয়াছিল; পথিমধ্যে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায় বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বাঙ্গালির নিকট তাহাদের স্মৃতি চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে সন্দেহ নাই। মোঘল পাঠান বিপ্লব সময়ে প্রধান বাঙ্গালি ভূঁইয়াগণ একযোগে কার্য করিলে হয়ত সফলকাম হইতেন। অন্তত মোঘল দলের অধিনায়কগণ ইহাদের পক্ষে অনুকূল ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। প্রাচীন জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ সাধন ঘটিয়া প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসনের মূলে কুঠারাঘাত হইত না। কিন্তু সেকালের ভূঁইয়ারা দেশের কথা ভাবিতে পারেন নাই। গোলযোগের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসই বলবৎ ছিল। সেই কারণেই মহাবল মোঘলের সম্মুখে তাহারা তৃণের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গলা দেশ ও জাতি নূতন বন্ধনে দৃঢ়তর আবদ্ধ হইয়া পাঠান আমলের অর্ধ স্বাধীনভাবও হারাইয়াছিল। প্রকৃত বীর বা দেশনায়কের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, প্রতাপাদিত্যে তাহার কিছুই ছিল না। তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য খুল্লতাত বসন্ত রায়কে স্বহস্তে এবং আশ্রয় ভিক্ষার্থী কার্ভালোকে ঘাতক দ্বারা ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়াছেন; প্রবাদে বিশ্বাস করিতে হইলে স্ত্রীলোকের স্তনচ্ছেদ করাইয়াছেন। দাতা ছিলেন বা ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন না, এই গুণে অমানুষিক নির্দয়তা উপেক্ষিত হইতে পারে না। বীরধর্ম ও কাপুরুষতায় অনেক প্রভেদ। বাঙ্গালির মধ্যে আদর্শ বীরের অভাবেই আমরা প্রতাপাদিত্যে সন্তুষ্ট থাকি।

মোঘল পাঠান বিপ্লবের অবকাশে অন্যান্য জমিদারেরাও সুবিধামত রাজ্য বৃদ্ধির ও স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যশোরের পূর্ব ভাগে ভূষণার জমিদার মুকুন্দ রায় প্রথমে মোঘলের অধীনতা স্বীকার করিয়া পরে মোঘল সেনানীদিগের বিদ্রোহের সুযোগে নিকটবর্তী ফতেয়াবাদ জমিদারিও অধিকার করিয়া লন। অতঃপর মোঘল সৈন্য তাহাকে উৎখাত করে। পাঠান আমলে প্রত্যন্ত ভাগে বিষ্ণুপুরের রাজারা অর্ধ স্বাধীন মত ছিলেন। কতলু খাঁর সহিত মানসিংহের যুদ্ধের সময় বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর পাঠানের দিকে যোগ দিয়াছিলেন এবং বিপন্ন জগৎসিংহকে রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুর লইয়া যান,...। মানসিংহের সহিত পাঠানের সন্ধি স্থাপিত হইলে হাম্বীর মোঘলের বশ্যতা স্বীকার

করিয়াছিলেন; সেইজন্যই পাঠানেরা পরে আবার বিষ্ণুপুর অঞ্চলেও উৎপাত করে। এই রাজা বীর হাম্বীরই শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে স্বপক্ষের লোকজনের দ্বারা ধন রত্ন মনে করিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল অপহরণ করেন। শেষে শ্রীনিবাস রাজধানীতে গিয়া ধর্মোপদেশ দানে দস্যু রাজাকে শিষ্য করিয়া গ্রন্থ ফিরিয়া পান এবং বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। ভুলুয়ার ভুঁইয়া লক্ষ্মণমাণিক্য পূর্বে ত্রিপুরার রাজার অধীন ছিলেন। মোঘল অধিকারে তাহার জমিদারি লইয়া অনেক বিভ্রাট হয়। ঘটকদের গ্রন্থে তাহার চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের হস্তে পরাজয় ও শেষে হত্যার কথা পাওয়া যায়।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রেরও নানা ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়াছিল। উপযুক্ত শ্বশুর প্রতাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ৬৪ দাঁড় দ্রুতগামী নৌকা যোগে তিনি আপন রাজধানীতে পলায়ন করেন। তাহার যৌবনাবস্থায় চন্দ্রদ্বীপ ও বাক্‌লা লইয়া অনেক গোলযোগ হইয়াছিল। তাহার পিতার সময়ে মুনেম খাঁর অন্যতম সেনানী মুরাদ খাঁ ফতেবাদ বাকলা প্রভৃতি মোঘলের অধিকার ভুক্ত করেন।(২১) ফার্নাণ্ডেজ প্রভৃতি জেসুইট পাদরীরা রামচন্দ্রের বাল্যাবস্থায় বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়াছিলেন। অতঃপর আরাকানের মগেরা বাক্‌লা ও চন্দ্রদ্বীপের অধিকাংশ অধিকার করিয়া লয়। রামচন্দ্র নিজ জমিদারির উত্তরাংশ পরে পুনরুদ্ধার করিলেও দক্ষিণ ভাগে বাক্‌লা বহুকাল ধরিয়া মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুর ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়ে।

বাণিজ্য ব্যবসায়ী পর্তুগিজও বাঙ্গলায় বিপ্লবের সুযোগে জলদস্যু রূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিপ্লবকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিল। কার্ভালো ও মাটুস্ প্রভৃতি পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি নেতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পর্তুগিজ ব্যবসায়ী কোম্পানির দল ছাড়িয়া বঙ্গোপসাগরে দস্যুবৃত্তি ও দুর্বৃত্ত জমিদারদিগের অধীনে সৈনিক বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। পর্তুগিজ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুর অত্যাচার পরেও কিছুকাল চলিয়াছিল। শাজাহানের রাজত্বকালে হুগলি হইতে পর্তুগিজগণ তাড়িত হইলে পর বঙ্গে পর্তুগিজের উৎপাত শেষ হয়। পর্তুগিজ ফিরিঙ্গির উৎপাত নিবৃত্তি হইলেও পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে অনেক দিন ধরিয়া আরাকানবাসী মগের অত্যাচার চলিয়াছিল। এখনও 'মগের মুলুক' প্রবাদ মগের অনাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মোগল শাসনকর্তা ফিরিঙ্গি ও মগের উৎপাত নিবারণের সুবিধার জন্যই রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন; কিন্তু এই সমস্ত উৎপাত অত্যাচারের নিবৃত্তির পর সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

মোঘল পাঠান মগ ফিরিঙ্গির ক্রীড়াভূমি হইয়া সমগ্র বাঙ্গলাদেশ চল্লিশ বৎসর কাল উপদ্রুত হইয়াছিল। মোঘলরাজ সহজে বঙ্গভূমির অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। সেকালের বাঙ্গালি নিতান্ত নির্জীব ছিল না। পাঠান ও জমিদার কিম্বা প্রধান জমিদারবর্গ এক যোগে কার্য করিলে হয়তো ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত, কিন্তু সমবেত চেষ্টা এক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল। সকলেই নিজের স্বার্থকে বড়ো করিয়া দেখিতেছিল। দেশাত্মবোধ তখন দেখা দেয় নাই; কখনও দিবে কিনা, তাহাই চিন্তার বিষয়।

তথ্যসূত্র

১. মনু সংহিতা—৭ম অধ্যায়।

২. 'বারভুঞা বসে আছে বুকে দিয়া ঢাল' মাণিক গাঙ্গুলী। 'গজপৃষ্ঠে নৃপতি বেষ্টিত বারভূঞা। —ঘনরাম।

৩. প্রতাপাদিত্য—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়।

৪. Akbarnama = Elliot vol. vi. আকবর নামা'য় ১২ জন জমিদারকে ঈশা খাঁ নিজ অধীন করেন' লেখা আছে। জেসুইট পাদরীরা কাটরাপুরের স্থানে 'কত্রাভু' করিয়াছেন।

৫. Purchas, Pilgrims—4th Part, Book. V.

৬. পর্তুগিজ বিবরণীতে ইহার সংখ্যা সহস্র এবং নিজেদের ৬০ মাত্র আছে।

৭. Carvalius staid at Siripur.... with Cadry lord of the place, where he was suddenly assaulted with one hundred Cosses sent by Manisinha. Governor of the Mogal, who having subjected that tract to his master, sent forth his navie aginst Cadry, Mandary a man famous in those parts being admiral : where after a bloody fight Mandary was slain, De Carvalius carried away the honour. From thence recovering of a wound in the late fight he went to Goln ; where he won a castle of the Mogors kept by foure hundred men & c. & c Purchas Pilgrims Part IV. Bork V.

৮. শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়ের উদ্ধৃত 'জয়পুর বংশাবলী'—নিখিল নাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্যে' এ বিষয় সম্পূর্ণ আলোচিত হইয়াছে। শিলাদেবীকে জয়পুর লইয়া যাওয়া কেদার রায়ের দ্বিতীয় বার পরাভব ও মৃত্যুর পরে হওয়াই সম্ভব। শিলাদেবী (শল্লাদেবী) এখনও প্রাচীন আমেরের রাজধানীতে স্থাপিত আছেন। তাঁহার পুরোহিত বাঙ্গালী; দেবীর নিকট প্রত্যহ এক ছাগ বলি হয়।

৯. He (Magh Raja) succeeded by this wiles in bringing over Kaid Rai, the Zemindar of Bikrampur who had been forcible reduced by Mansingh—Elliot's India—vol vi

১০. Inayat Ulla's Ikmila—Akbarnama—Elliot's History of India—vol vi.

১১. প্রবাদ বলে যে কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধারম্ভের পূর্বে মানসিংহ তাঁহাকে এই পত্র লেখেন :

ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি যাও পলায়ী,
হয় গজ নর নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি,
বিষম সমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি।

উত্তরে কেদার রায় লিখিয়া পাঠাইলেন :

ভিনত্তি নিত্যং কবিরাজ কুম্ভং,
বিভর্তি বেগং পবনাতিরেকং,
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে,
তথাপি সিংহঃ পশুরের নান্যঃ।

মানসিংহের সংস্কৃতে কুলায় নাই বলিয়া হিন্দির আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

১২. যশোর নগরধাম, প্রতাপাদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ ইত্যাদি।

১৩. Tabakat Akbari—Elliot's India—vol v.

১৪. প্রতাপ আদিত্য চরিত রচয়িতা রাম রাম বসু লিখিয়াছেন, সুরসিক আকবব বাদশার জিজ্ঞাসিত 'শ্বেত ভুতঙ্গিনী জাত চলিহেঁ' সমস্যার পূরণ করিয়া প্রতাপ দরবারে সম্মানিত হন এবং কৌশলে নিজ নামে ফর্মান্ করাইয়া লন।—সমস্যার পূরণ এইরূপ অদ্ভুত ভাষায়া—

সো বর কামিনী নীর নাহারতি, রিত ভালি হেঁ।
চির মচরকে গচপর বাবিকে, ধারেছ চল্ল চলি হেঁ।
রায় বেচারি আপন মনসে, উপমা ওচারি হেঁ,
কেছুঈ্ মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী জাত চলি হেঁ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ইহার অর্থ করেন, সেই শ্রেষ্ঠ কামিনী জলে স্নান করিতেছে, এ রীতি ভালো বটে ; তাহার পর ঘাটের উপর বস্ত্রখানি নিঙ্গড়াইয়া পুষ্করণীর ধারে চলিয়াছে; রায় বেচারা আপন মনে বিচার করিয়া এই উপমা স্থির করিল যেন মূর্তিমতী শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলিয়া যাইতেছে। প্রতাপাদিত্য—রায়।

১৫. Blochman—Ain-i-Akbari—P. 403.

১৬. West land's Jessore.

১৭. "তার বেটা কচু রায়, রানি বাঁচাইল তায়, জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল"—ভারতচন্দ্র। ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতে "একঃ শিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্চী বনে রক্ষিতঃ" আছে, সেই জন্যই নাম কচু রায়, এই প্রবাদ হইয়াছে। ইহার প্রকৃত নাম রাঘব।

১৮. শিলাময়ী নামে, ছিলা তার ধামে, অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিল রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি ॥— ভারতচন্দ্র

কালীমাতা সুপ্রসন্না হইয়া কন্যাভাবে প্রতাপের গৃহে ছিলেন। তাঁর দুর্ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া শেষে কন্যারূপে তাঁহার নিকটে গিয়া 'বাবা তবে আমি আসি' বলায় প্রতাপ দূর দূর বাক্যে তাঁহাকে বিদায় করিয়াছিলেন—ইত্যাদি।

১৯. 'বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচু রায় লয়ে রঙ্গে মানসিংহ বাঙ্গলা আইল' অন্নদামঙ্গল। যশোরের প্রবাদ এই বাইশী লস্কর লইয়াও নাড়চাড়া করিয়াছে। গল্প উঠিয়াছে, মানসিংহের যুদ্ধে আগমনের পূর্বে বাদশা ক্রমে ২২ জন ওমরা প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য সকলেই নিহত হন; তাঁহাদের কবর এখন পর্যন্ত দেখাইয়া থাকে।

২০. নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্যে উদ্ধৃত 'জয়পুর বংশাবলী'। এই পুস্তকে প্রতাপের ১৩ শত হাতি এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল, লিখিত আছে।

২১. Blochmann's Ain-i-Akbari.

জমা কামেল্ তুমারী

শিরোনামে পাঠকের বিভীষিকা-উৎপাদনের ভয়ে প্রথমেই বলা ভাল, বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বঙ্গের জমিদারি প্রথা। এই জমিদারি প্রথার দোষ গুণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন। আপাততঃ, দেশের ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বা জমিদার ও প্রজার স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে ব্যবহারবিদের বিবাদাস্পদ বিষয়ের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এ ক্ষেত্রে দোষগুণের সমালোচনাও আমরা করিব না। মোটের উপর ধরিতে গেলে বিজাতীয় শাসনে বর্তমান জমিদারি প্রথা যে প্রভূত কল্যাণকরী, অর্থনীতির সাধারণ সূত্রজ্ঞেরাও তাহা স্বীকার করিবেন। এই জমিদারি প্রথার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

জমিদারি প্রথার মূল অন্বেষণে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনুসংহিতায় দেখা যায়;—

> গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
> বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥ (মনু।৭।১১৫)

"রাজা দেশের সুশাসন জন্য গ্রামাধিপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিবেন।" পরবর্তী শ্লোকে গ্রামে 'চৌর্য্যাদিনিবারণে অক্ষম হইলে, গ্রামপতি দশাধিপপতিকে, দশপতি শতাধিপকে, ইত্যাদি ক্রমে জানাইবেন; অর্থাৎ, রাজকীয় কার্যে উচ্চাধিপের আদেশের অপেক্ষা করিবেন, এইরূপ নির্দেশ আছে। পরে ইহাদের বৃত্তি সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতিদিন প্রজাগণ রাজাকে যে অন্নপানাদি দিবে, তাহা গ্রামাধিপের প্রাপ্য। পদের তারতম্য অনুসারে জীবিকার জন্য ভূমি প্রাপ্তিরও বিধান আছে; দশপতি দুইখানি হলপ্রবাহোপযোগী ভূমি, বিংশতীশ পাঁচখানি, শতপতি একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ও সহস্রপতি বৃহৎ গ্রাম পাইবেন (মনু; সপ্তম অধ্যায়; ১১৮) ইহা হইতে অনুমিত হইবে, ভূসম্পত্তিবিষয়ক সমস্ত ব্যবস্থাই ইহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মহারাষ্ট্র দেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, বলা যাইতে পারে, এক্ষণে মুসলমান অধিকারের অব্যবহিত পূর্বে বাঙ্গলায় এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ছিল, দেখিতে হইবে। প্রিন্সেস প্রমুখ মহোদয়গণের প্রকাশিত সেনবংশীয় ভূপতিগণের তাম্রশাসনপত্রে লিখিত আছে :—"সমুপগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্র রাজামত্য....বিদিত মস্তু (বা—মতমস্তু) ভবতাং" [১] অর্থাৎ, উপস্থিত রাজ রাজন্য রাজ্ঞী... প্রভৃতি আপনারা জ্ঞাত হউন (যে আমি এই ভূমি অমুককে দান করিলাম)। এক্ষণে উক্ত গ্রামপতিগণকে পরবর্তী কালের মণ্ডলের পিতামহস্বরূপ নির্দেশ করিলেও, শতপতি, সহস্রপতি প্রভৃতি হইতে এইরূপ ক্ষুদ্র রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অসঙ্কোচে নির্দেশ করা যাইতে পারে। কথিত রাজন্যগণের অনেকেই অবশ্য পূর্ববর্তী স্বাধীন রাজগণের বংশধর, কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাচীন স্বাধীন রাজগণের আবার এই দেশপতিগণ হইতেই

উৎপত্তি। পূর্বকালে সমগ্র ভারতেই এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই প্রাদেশিক ক্ষুদ্র রাজগণ যখন এক জন পরাক্রান্ত নৃপতি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া তাহার শাসনাধীনে আসিতেন, তখন তাহারা কোথাও বা বিজেতা রাজার করদ হইয়া পড়িতেন, কোথাও বা কেবল অধীনতা স্বীকার করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন। বিজেতা রাজা চক্রবর্তী বা মণ্ডলেশ্বর নামে পরিচিত হইতেন। বিজিত ক্ষুদ্র রাজগণের উচ্ছেদ হিন্দুধর্ম বা স্বভাবের অনুমোদিত নহে। ইহা সুযুক্তিরও বিরোধী; সেই জন্যই বিচার ও রাজকর আদায় প্রভৃতি কার্য এইরূপ বিজিত ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের হস্তে ছিল। পরবর্তী পাঠান নৃপতিগণও এই শ্রেণির ভূম্যধিকারিবর্গকে বিতাড়িত করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন নাই। স্থলবিশেষে আবার ঐরূপ উচ্ছেদ একেবারে অসম্ভব ছিল। জেতা পাঠানগণ দেশীয়গণের তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য, সুতরাং নিজ শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য তাহাদিগকে প্রায় সর্বদাই যোদ্ধবেশে রাজধানীর সমীপস্থ প্রদেশেই আবদ্ধ থাকিতে হইত। প্রতাপবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই দূরস্থ প্রদেশে বাস বা রীতিমত অধিকারবৃদ্ধির সুবিধা বহুকাল ঘটিয়া উঠে নাই। সেই জন্য প্রাচীন রাজগণকে আংশিকরূপে শাসনাধীনে আনিয়া তাহাদের দ্বারাই রাজস্ব আদান প্রভৃতির সুবিধা হইয়াছিল। সম্পূর্ণ আয়ত্ত ভূভাগে কথঞ্চিৎ কোন হিন্দু ভূম্যধিকারীর নিঃসন্তান পরলোক হইলে সুবিধামত মুসলমান জায়গিরদার প্রবেশ করান হইতেছিল মাত্র। অনেক স্থলে মুসলমান জায়গিরদারের অধীনে হিন্দু জমিদারই বিচারবিতরণ ও রাজস্ব আদায় প্রভৃতি রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে এ কালে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে মুসলমান রাজ, বা তাহার জায়গিরদার কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজার প্রাপ্য অংশ সময়ে পৌঁছাইয়া দিলেই হিন্দু ভূস্বামীর নিষ্কৃতি;—ইহাও সুশৃঙ্খলায় নির্বাহ হইত না; সে কথা আমরা পরে বলিব।

এই সময়ে বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ সম্ভব, প্রাচীন কাল হইতেই রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী ভূস্বামীগণ 'ভৌমিক' নামে অভিহিত হইতেন। ভাষা কথায় ইহাদিগকে 'ভুইয়াঁ' বলিত। কিম্বদন্তী এই যে, সমগ্র বঙ্গ এককালে বার ভুঁইয়ার মুলুক বলিয়া পরিচিত ছিল। কেহ কেহ বলেন,—ভাগীরথী ও পদ্মাদির মধ্যবর্তী গঙ্গার ব-দ্বীপ-ভাগেই 'দ্বাদশ ভৌমিক' নামে খ্যাত ভূস্বামীগণ বর্তমান ছিলেন। [২] কিন্তু এরূপ অনুমানের বিশেষ কোন কারণ নাই। বৌটন বাউস্ সাহেব বলে, [৩] "আকবরের সময়ে বঙ্গদেশ দ্বাদশ জন ভুঁইয়ার অধীন ছিল; তন্মধ্যে পাঁচ জন দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন।" ডাঃ ওয়াইজ্ বলে, [৪] "মুসলমান ইতিহাসের একস্থানের উল্লেখ ও কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, এই ভৌমিকগণ অন্যনিরপেক্ষ অর্ধস্বাধীন ভূস্বামী ছিলেন। ইহারা উত্তরাধিকারক্রমে ভূসম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেন। ইহাদের সৈন্য, রণতরী,—কাহারও বা দুর্গাদি ছিল। অনেকাংশে তাহারা জায়গিরদার ও চাকলাদারগণের সদৃশ ছিলেন। তাঁহাদের অধীনে চৌধুরীগণ। ওয়াইজ পাঁচ জন ভৌমিকের বিবরণ দিয়াছেন। কেহ কেহ দ্বাদশ ভৌমিকের নামও করিয়াছেন,—কিন্তু সেগুলি সমসাময়িক নহে, সুতরাং তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অনেকে আবার আকবরের পূর্ববর্তী জমিদার-প্রধানগণকেই ভৌমিক বলিয়াছেন। যাহা হউক, এই ভৌমিক বা হিন্দু জমিদারগণ যে মুসলমানদের অধীনে অর্ধস্বাধীন করদমাত্র ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে,

স্যর জর্জ ক্যাম্বেল্ প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণের মত এই যে, যখন মুসলমানের প্রবল প্রতাপ, সে সময়ে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী ভূস্বামীর অস্তিত্বই ছিল না। রাজকীয় ক্ষমতার হ্রাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের উৎপত্তি—এই তাহাদের মত; অরাজক অবস্থায় দিল্লীশ্বরের প্রতাপ যখন নামেমাত্র বর্তমান ছিল, সেই সময়ে আবার প্রাচীন হিন্দুপ্রথামত সামান্য সামান্য ভূস্বামীর উদয় হয়,—এই সমস্ত রাজগণ ও সামন্তবর্গ হইতে বর্তমান জমিদারের উৎপত্তি। মুসলমান আমলের রাজস্ব-আদায়কারী ক্রোরী প্রভৃতি কর্মচারী হইতে পরবর্তী জমিদারশ্রেণির উৎপত্তি হইয়াছে, অনেকে এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।[৫] এই শ্রেণির লেখক তার্কিকগণের ভ্রম এই যে, তাহারা অন্য দেশের বা ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাগের মুসলমানী বন্দোবস্তের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে চান। বাঙ্গলায় মুসলমান রাজ পূর্বপ্রথারই অনুসরণ করেন, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা ভিন্ন গত্যন্তরও ছিল না।

দেশীয় ইতিহাসে সম্রাট্ আলাউদ্দিন ও ফিরোজ শাহর রাজ্যকালে জমিদারি বন্দোবস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময়ে জমিদারগণকে ‘চৌধুরী’ নামেই পরিচিত দেখিয়া অনুমান হয়, প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজগণ তখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খ্যাতনামা সের শাহ, রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্তে সুশৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য প্রতি পরগণায় এক এক জন রাজকীয় আমিন, শিকদার, কারকুণ প্রভৃতি নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতেই এ দেশের ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় মুসলমানরাজ সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তার্পণ করেন, দেখা যায়। যাহাতে চৌধুরী, মণ্ডল বা রাজকীয় আমিন প্রভৃতি প্রজার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতে না পারেন, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। রাজপথে বা নিজ নিজ অধিকার মধ্যে চুরি, রাহাজানী প্রভৃতি নিবারণ জন্য এই সময় হইতেই প্রথম জমিদারগণকে মুসলমানরাজের নিকট জবাব্দিহি করিতে হইল।[৬] স্বনামখ্যাত আদর্শ নৃপতি আকবর শাহের সময় হইতে বঙ্গের জমিদারি বন্দোবস্তের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই বাঙ্গলায় দিল্লীশ্বরের প্রতাপ বদ্ধমূল হয়; সুতরাং জমিদারগণের সহিত তখন হইতেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কানুনগো ও ক্রোরী প্রভৃতি রাজকর্মচারীর দ্বারা জমিদারবর্গের একাধিপত্যের সঙ্কোচও এই সময় হইতে আরব্ধ। সুপ্রসিদ্ধ আইন-আকবরী প্রণেতা মহাত্মা আবুল ফজল লিখিয়াছেন, বঙ্গের জমিদারগণ প্রায়ই কায়স্থ। তাহাদের সৈন্যবল দেখিয়া তাহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সহজেই অনুমিত হয়।[৭] এই সময়ের অন্বর্থনামা, বঙ্গজকায়স্থকুলগৌরব, ‘যশোর-নগরধাম’ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নাম বাঙ্গলায় কে না জানে? এইরূপ রাজা ও ভৌমিক ভিন্ন, আসাম, ত্রিপুরা কুচবিহার, বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন রাজগণের বিবরণও পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ বা পরবর্তী মুসলমান শাসনকর্তৃগণ কর্তৃক অর্ধপরাজিত হইয়া আধুনিক করদ বা মিত্ররাজ্যের ন্যায় আংশিকভাবে মোঘল শাসনের অধীন হন; কেহ বা এতই বলশালী ছিলেন যে, তাহারা কখনই সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কোথাও বা বহিঃশত্রুর আগমন হইতে প্রত্যন্ত দেশ রক্ষার জন্য ইহাদের এই স্বাধীনতার বাধা দেওয়া মুসলমানরাজ উচিত বোধ করেন নাই। আভ্যন্তরীণ

কোন কোন রাজা ও স্বীয় বাহুবলে সময়ে সময়ে স্বাধীন ব্যবহার আরম্ভ করিতেন। এইরূপ অর্ধস্বাধীন রাজবর্গের স্বকীয় দরবার ছিল, সৈন্যবল বা সৈন্যসংগ্রহ করিবার ক্ষমতাও প্রচুর ছিল। রাজ্য মধ্যে প্রজাবর্গের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার, ইহারা স্বয়ং, বা নিয়োজিত কর্মচারী দ্বারা, নির্বাহ করিতেন। এবং হিন্দুস্বভাবসুলভ ব্যবহার অনুসারে, এই সমস্ত অধিকারও তাহারা উত্তরাধিকারক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেন। এ পর্যন্ত যাহা দেখা গেল, তাহাতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, উল্লিখিত বঙ্গীয় জমিদারবর্গের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ করা বড় সহজ নহে। ইহাদের মধ্যে নানা শ্রেণির ক্রমবিভাগ, স্বত্ব ও স্বাধীনতা দেখা যায়। পার্বতীয় বা দূরস্থ প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজগণ মুসলমানের সৈন্যবলে ত্রস্ত হইয়া সময়ে যৎকিঞ্চিৎ কর, কোথাও বা উপহারমাত্র প্রদান করিতেন। অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজারা বা সীমান্তরক্ষক সামন্তেরা নিজ নিজ সাহস ও বিক্রম অনুসারে দেয় রাজস্ব যথাসাধ্য অল্প করিবার প্রয়াস পাইতেন। কেবল আভ্যন্তরীণ সামান্য ভূম্যধিকারবর্গই নিয়মের অধীন ছিলেন। কিন্তু ইহাদেরও একালের 'মহারাজা' অপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে সমগ্র বঙ্গ কখনই প্রকৃতপ্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। মুসলমান অধিকারস্থাপনের শত বর্ষ মধ্যেই (চতুর্দশ শতাব্দী) বঙ্গীয় মুসলমান নৃপতিগণ দিল্লির অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন। তখনও পূর্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজ বংশধর বিরাজ করিতেছিলেন। সুতরাং সে সময়ে প্রত্যন্ত ও আভ্যন্তরীণ সামন্ত ও রাজগণের সহিত সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া রাজ্যশাসন মুসলমানরাজের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা ও দিল্লিশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য, ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতাই সম্পূর্ণ কার্যকর হইত। অধিকন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া একবংশীয় মুসলমান রাজগণের সিংহাসনে স্থির থাকিবার অবকাশ ঘটে নাই। ক্রমাগত বিপ্লবের কালে দেশীয় অধীন রাজগণের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা ছিল না। এইরূপ বিপ্লবের অবকাশেই একবার উত্তরাঞ্চলের রাজা গণেশ (কংস?) যবনের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে সক্ষম হন। কিন্তু নানা কারণে (বকল সাহেবের মত সমীচীন হউক বা না হউক) হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির সমবেত চেষ্টা বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং এ হিন্দু-অভ্যুত্থান অচিরেই ধূলিসাৎ হইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ মোঘল পাঠানের ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়ে; এখন দুই দলই দেশীয় জমিদারগণের সাহায্যলাভের জন্য লালায়িত। সুতরাং এই সুযোগে ইহাদের পুনরুত্থানের কিছু সুবিধাই হইল, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের মত কেহ কেহ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইলেও, মোঘল সম্রাটের বিপুল বলের বিরুদ্ধে তাহাদের সেই সামান্য চেষ্টা বিফল হইল। অধিকন্তু মোঘলকুলতিলক আদর্শ নৃপতি আকবর শাহ হিন্দু সেনাপতিগণের সাহায্যেই দেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং জমিদারবর্গের প্রতিকূলশক্তি দিল্লিশ্বরের প্রভাব ও কৌশলজালে সংযত হইয়া রহিল। এই সমস্ত কারণেই অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙ্গলায় রাজস্ব-বন্দোবস্ত সুশৃঙ্খলায় নির্বাহিত হয় নাই। জমি-মাপের তো কথাই নাই, পূর্ববর্তী কাগজ দেখিয়া যে 'আসল জমা তুমারী' প্রস্তুত হয়, সে অনুসারেও রাজস্ব আদায় হয় নাই। চারি শত বর্ষের পর আবার দিল্লিশ্বরের জয়পতাকা

উড়িল বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশ মোঘলের অধীন হইল না। জমিদারগণ সুবিধা পাইলেই গলবদ্ধ রজ্জু উন্মোচন করিবার অবসর ত্যাগ করিতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গভূমি সর্বদাই অন্তর্জাতীয় বিরোধে বিক্ষুব্ধ হইতেছিল। পরাজিত পাঠানগণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বারম্বার প্রয়াস পাইতে লাগিল, মগ প্রভৃতি বহিঃশত্রুর হস্ত হইতেও দেশ সর্বথা নিরাপদ ছিল না। এই অবকাশে প্রত্যন্ত সামন্তগণের কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্র জমিদারগণও সময়ে সময়ে আবদার আপত্তি আরম্ভ করিতেন; মোঘল শাসনকর্তাদিগকে সর্বদাই ত্রস্ত থাকিতে হইত। অতঃপর সাজাহানের শেষ দশায় তাঁহার কৃতী পুত্রগণ সিংহাসন লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। তখন সাসুজা বাঙ্গালার শাসনকর্তা। সুতরাং এই গৃহবিবাদের তরঙ্গ এখানেও প্রসারিত হইয়াছিল।

আরঙ্জেব ভারতের রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার পর সাম্রাজ্যের সর্বত্রই একটা শৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। স্বকীয় কূটনীতির পরিচালনায় আরঙ্জেব যখন যুগব্যাপী দাক্ষিণাত্যযুদ্ধে পিতৃপিতামহের সঞ্চিত প্রচুর অর্থ সহ সমীচীন রাজনীতি রসাতলে দিয়া রাজ্যের প্রত্যেক শিরা পর্যন্ত শোষণ করিতেছিলেন, সেই সুযোগে প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির সর্বত্রই বিদ্রোহ বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। বর্ধমানের একজন সামান্য তালুকদার শোভা সিংহ বঙ্গে বিদ্রোহের নায়ক,—অতি কষ্টে বিদ্রোহ দমিত হইল; কিন্তু দেখা গেল, সর্বত্রই অশান্তি ও অব্যবস্থা বিদ্যমান। এই জন্যই আরঙ্জেব সুবিখ্যাত রাজস্বতত্ত্বজ্ঞ মুর্শিদকুলি খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া, ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলায় পাঠান। আকবরের সময় হইতেই রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রভৃতির জন্য সুবাদারের সহকারীরূপে দেওয়ান-নিয়োগের প্রথা চলিয়া আসিতেছিল।[৮] কূটনীতিজ্ঞ আরঙ্জেব এই দুইটি পদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করিয়া পরস্পরের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে সংযত করার ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্বে নিজ পৌত্র আজিমশ্বানকে শান্তিস্থাপন জন্য সুবাদার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এক্ষণে সুব্যবস্থা জন্য মুর্শিদকুলি প্রেরিত হইলেন। এই মহাত্মা দাক্ষিণাত্যনিবাসী কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বংশধর। বাল্যে মুসলমান বণিকের ক্রীতদাসরূপে পারস্যদেশে লালিত হন; পরে দেশে প্রত্যাগত হইয়া নিজ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে হায়দরাবাদের দেওয়ানি পদে উন্নীত হন। রাজস্ববিষয়ে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা নিবন্ধন ইনি অচিরেই গুণগ্রাহী আরঙ্জেবের অনুরাগভাজন হয়েন। বঙ্গে আসিলে সাহজাদা আজিমশ্বান নূতন দেওয়ানের প্রতিপাত্তিবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইলেন। প্রবাদ এই যে, মুর্শিদের প্রাণবধের জন্য কয়েক জন সৈনিক পুরুষ যুবরাজের ইঙ্গিতে পথিমধ্যে বেতনপ্রার্থনাচ্ছলে হাঙ্গামা উপস্থিত করে।[৯] যাহা হউক, অতঃপর ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ আপন অফিস ঢাকা হইতে উঠাইয়া মুকসুদাবাদে লইয়া আসেন;—পরে তাঁহার নাম-অনুসারে নগরের নাম মুর্শিদাবাদ হয়। মুর্শিদাবাদ বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত; এখান হইতে চতুর্দিকের বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধানের বিশেষ সুবিধা; এই জন্য প্রধান প্রধান জমিদার ও কানুনগোগণের পরামর্শে তিনি এই স্থানটিই মনোনীত করেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বঙ্গের রাজস্ব বন্দোবস্তেও এতদিন বড়ই গোল ছিল। একে ত বঙ্গভূমি অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর, রাজধানী হইতে বহুদূরে বলিয়া ভাল লোক

দিল্লী হইতে এ অঞ্চলে আসিতেই স্বীকৃত হইতেন না, তাহাতে আবার এইরূপ অশাসিত বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশই জায়গিরদারগণের মধ্যে বিভক্ত ছিল, এজন্য সরকারি রাজস্ব এতই অল্প হইয়া পড়ে যে, অন্য সুবা হইতে টাকা আনিয়া এখানে সৈন্যাদির ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত। এই সমস্ত কারণেই কুলিখাঁর ন্যায় একজন সুধিজ্ঞ রাজস্বসচিবের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং তিনিও আশানুরূপ ফল দেখাইয়াছিলেন।

রাজা তোডরমলের সুবিখ্যাত বন্দোবস্তে বঙ্গভূমি (উড়িষ্যা ব্যতীত) ১৯টি সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হয়। এই সময়ে যে আসল জমা তুমারী প্রস্তুত হয়, তাহাতে সমগ্র রাজস্ব (জায়গির সমেত) ১০৬৯৩১৫২ টাকা নির্দিষ্ট হয়। বাদশাহ সাজাহানের রাজ্যকালে উত্তরপূর্বের কয়টি প্রত্যন্ত প্রদেশ আংশিকভাবে মোঘলের আয়ত্ত হয়, উড়িষ্যায় বন্দোবস্তও এ সময়েই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ছিল; তজ্জন্য সাহ সুজার শাসনকালে উড়িষ্যা সমেত বর্ধিতায়তন বাঙ্গলার রাজস্ব ১৩১১১৫৯০৭ টাকা স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই টাকা অনেক পরিমাণে কাগজেই ছিল, কোন কালেই সমস্ত আদায় হয় নাই। মুর্শিদকুলি খাঁ পূর্ব ব্যবস্থার আমূল সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রথম দেওয়ানি আমলে, তিনি বাঙ্গলার রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ অথচ সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী আমিনগণকে প্রত্যেক পরগণার রাজস্ব আদায় করিবার জন্য নিয়োজিত করেন। কিন্তু ইহাতেও ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হন নাই। রীতিমত জরিপ জমাবন্দি করিবার প্রয়োজন, কিন্তু দেশের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং তিনি নিজেও তখন দেওয়ানমাত্র। সুতরাং প্রথমে দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। অতঃপর সুবাদার ও দেওয়ানি পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব সঙ্কল্প কার্যে, পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইতিপূর্বেই বাদসাহের সম্মতিক্রমে, সুবাদারের ও প্রধান কর্মচারী দুই এক জনের ভিন্ন সকলের অপর সমস্ত জায়গির ভূমি বাঙ্গলা হইতে উড়িষ্যায় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রান্তদেশস্থ জমিদারগণকে তাহাদের নিজ নিজ অধিকারে অশাসিত ভূভাগের সম্পূর্ণ বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, এ সকল স্থানেয় রাজস্বের ভাগ্যে যাহাই হউক, অন্ততঃ একটা হিসাব পাইয়া অবস্থা জ্ঞাত হইবেন। আভ্যন্তরীণ জমিদারবর্গের মধ্যে যাহারা এই বন্দোবস্তে সম্পূর্ণ উৎসাহপ্রকাশ ও সাহায্য করিলেন, তাহাদিগকে ঐ কার্যের সম্পূর্ণ ভার দিয়া সরকার হইতে সহকারী কর্মচারী নিয়োগ করিয়া সেই বন্দোবস্তের সাহায্য করিলেন। যে সমস্ত জমিদার অনায়ত্ত ছিলেন, তাহাদিগকে কৌশলে কিছু দিনের জন্য মুর্শিদাবাদে নজরবন্দি রাখিয়াছিলেন, তাহাদের স্থানে বিশ্বাসী ও কর্মঠ হিন্দু বা মুসলমান আমিন নিযুক্ত করিয়া, সমগ্র ভূভাগে এককালে নূতন বন্দোবস্ত করিবার উপায় বিধান করিলেন। জমিদারবর্গ উপস্থিত থাকিলে এ কার্যে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন, এ জন্যই এই কঠোর ব্যবস্থা। জমিদারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য আপাততঃ নান্‌কর (ভরণপোষণার্থ দত্ত) জমি দেওয়া হইল। প্রত্যেক মহাল জরিপ করিয়া রীতিমত জমাবন্দি-কাগজ প্রস্তুত হইল। প্রজাবর্গের অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে জমি পত্তনের ব্যবস্থা হইল। দরিদ্র প্রজাগণকে তাগাবী অর্থসাহায্য দিয়া ভূমির উৎকর্ষসাধন চলিতে লাগিল।

এইরূপে অত্যল্পকালেই সমস্ত বন্দোবস্ত সুস্থির হইয়া গেলে, অবাধ্য জমিদারগণকে

ব্যবহারের ইতরবিশেষ অনুসারে ক্রমশঃ স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। কাহারও জমিদারির আয়তন বর্ধিত হইল; মৃত বা নিতান্ত অসাধ্যশাসন ধূর্ত জমিদারগণকে উৎখাত করিয়া তাহাদের স্থানে নূতন লোকের সহিত বন্দোবস্ত হইল। এই অভিনব জমিদারশ্রেণির অনেকেই হয় সরকারি কর্মচারী—নয় বর্ধিষ্ণু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। এই শ্রেণির উৎপত্তি অবশ্য পূর্বাবধিই হইয়া আসিতেছিল। দুই চারি জন ইংরেজ লেখক যে এই সময়েই নূতন জমিদারশ্রেণির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা তাহাদের স্বকপোলকল্পিত অনুমানমাত্র। (১০) মুর্শিদকুলি খাঁ নিজের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ইচ্ছামত জমিদারগণকে উৎখাত করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা ধৃষ্টতামাত্র। ...

মুর্শিদকুলি খাঁ এইরূপে সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া যে কাগজ প্রস্তুত করান, তাহার নাম 'জমা কামেল্ তুমারী'। এই পাকা বন্দোবস্তই পরবর্তী জমিদারি বন্দোবস্ত সকলের ভিত্তিস্বরূপ। রাজা তোড়রমলের আসল জমা তুমারীতে বাঙ্গলা ১৯টি সরকার বা জেলায় বিভক্ত হইয়াছিল, পূর্বেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে তেরটি চাকলা বা বিভাগে সমস্ত দেশ পুনর্বিভক্ত হইল। ইহার মধ্যে চাকলা হিজ্‌লি ও বন্দর বালেশ্বর, উড়িষ্যা হইতে গৃহীত। সপ্তগ্রাম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও ভূষণা, এই পাঁচটি পদ্মার পশ্চিমভাগে, এবং অবশিষ্ট আকবর-নগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কারাবাড়ী, জাহাঙ্গীর-নগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট ও ইস্‌লামাবাদ (চট্টগ্রাম), এই ছয়টি পদ্মার উত্তর ও পূর্বপার্শ্বে। সরকার ও পরগণাগুলির পূর্ব নামই ঠিক থাকিল, এবং এইরূপে সমগ্র বঙ্গে ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় ১৪২৮৮১৮৬ টাকা সদর জমা নির্দিষ্ট হইল। এখানে দেখা উচিত, অধিকারবৃদ্ধির জন্যই এই রাজস্ববৃদ্ধি; নতুবা পূর্বের সহিত তুলনায় জমিদারবর্গের দেয় রাজস্ব বর্ধিত হয় নাই। তবে এই সময় হইতে সমগ্র রাজস্ব কাগজেই শেষ না হইয়া প্রকৃতপক্ষে যাহাতে আদায় পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা হইল, মনে রাখা উচিত, এ সময়ে জমিদারগণ কর্তৃক প্রজার দেয় রাজস্বের অযথাবৃদ্ধির উপায় ছিল না। পরগণা কানুনগোগণের কাগজে প্রত্যেক পরগণার হার নির্দিষ্ট ছিল। এই বন্দোবস্ত শেষ হইলে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে জমিদারগণের সহিত বন্দোবস্তে যে এহতিমামবন্দি প্রস্তুত হয়, এবং যাহা ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে (বাং ১১৩৫ সালে) সুজাউদ্দীনের সময়ে পাকা হয়, কোম্পানির সেরেস্তাদার গ্রান্ট সাহেব ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাহার রাজস্ববিষয়ক বিবরণীতে তাহার বিবরণ দিয়াছেন। গ্রন্ট মহোদয় রাজস্বসম্বন্ধীয় কাগজপত্র সদর কানুনগোগণের দপ্তর হইতে তাহাদের কর্মচারিগণের সাহায্যে প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্বে খ্যাতনামা ফিলিপ ফ্রান্সিস্ সাহেবও ঐ উপায়ে কাগজ পাইয়া নিজ রাজস্ববিষয়ক মন্তব্য লেখেন। স্যর জন শোর মহোদয়ও এ সমুদয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণীর প্রধান আলোচ্য বিষয়ের ঐক্য আছে। (১১) সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক। আমরা এই সকল অবলম্বনে সংক্ষেপে প্রধান জমিদারি কয়টির উল্লেখ করিব। জমিদার বংশগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাসবর্ণন বর্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। সংক্ষেপে ইহাদের পূর্ব বিবরণ দিয়া, কুলি খাঁর বন্দোবস্তেরই সবিশেষ উল্লেখ করা হইবে।

এ পর্যন্ত মুসলমান শাসনকালে জমিদারি প্রথার যে ইতিহাস বর্ণিত হইল, তাহাতে দৃষ্ট

হইবে যে, বঙ্গের জমিদারগণকে নিম্নলিখিত চারি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রাচীন স্বাধীন ও করদ রাজগণ;—যাহারা মুসলমান শাসনের চূড়ান্ত বৃদ্ধির দশায় কোথাও স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে, কোথাও বা আংশিক অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিতেন। প্রত্যন্ত প্রদেশেই ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহারা অধীন হইয়াও স্বরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তে স্বাধীন রাজার মতই ব্যবহার করিতেন।

২। হিন্দু বা মুসলমান সামন্তগণ;—যাহারা বিপ্লবের অবস্থায় সুবিধা পাইয়া কোন স্থানে স্থায়িভাবে দখল করিতেন। মুসলমানরাজও ভয়মৈত্রতায় তাহাদিগকে বড় বেশি নাড়াচাড়া দিতেন না। ইহারাও প্রথম শ্রেণির রাজগণের ন্যায় স্বকীয় অধিকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই থাকিতেন। প্রভাবশালী রাজার রাজত্বকালে রীতিমত রাজকর আদায় দিতেন, এবং সুবিধা পাইলেই অঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শনের অবসর ছাড়িতেন না।

৩। রাজস্ব-আদায়কারী আমিনগণ;—যাহারা মুসলমান অধীনে দুই এক পুরুষ কোথাও সাধারণ জমিদারগণের নিকট, কোথাও কোন নাবালক বা মৃত জমিদারের অধিকারে রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্বীয় ক্ষমতার বিস্তার বা অপব্যবহার দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণির ভূস্বামিগণের সদৃশ হইয়া উঠিতেন। সুবিধা পাইলেই হিসাবে গোল করা, বা অন্যের জমিদারি সুবিধা মত বেনামী প্রভৃতি উপায়ে হস্তগত করা, এই সমস্ত উপায় ইহাদের অস্ত্র ছিল। ইহারা উপবেশন করিবার সুবিধা পাইলে শয়নে শেষ করিতেন।

৪। অর্থশালী ব্যক্তিগণ;—যাহারা বেওয়ারিস মৃত বা ক্রমাগত রাজস্ব আদায় দানে অশক্ত জমিদারগণের জমিদারি অনেক সময়ে ইজারায় আরম্ভ করিয়া শেষে স্থায়িভাবে জমিদার হইতেন। বিদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর কারণ ভিন্ন কথার কথায় উচ্ছেদ, বা জমিদারি নিলামের সভ্য ব্যবস্থা সেকালে প্রচলিত ছিল না, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই চারি শ্রেণির জমিদারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সহজেই দৃষ্ট হইবে। অনেক ইংরেজ লেখক সমস্ত জমিদারেরই সাধারণ উৎপত্তির একটা কল্পিত কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সাধারণ নিয়ম সর্বথা অন্ধভাবে চালাইলে যে গোল হয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সনন্দ লইবার প্রথা দেখিয়া অনেকে রাজকীয় সনন্দই জমিদারের স্বত্বের ভিত্তিস্বরূপ, এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। ...এক্ষণে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গলার দুই চারিটি প্রধান জমিদারির উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

বর্ধমান;—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে আবু রায় নামক এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পঞ্জাব হইতে বঙ্গে আসিয়া বর্ধমানের চতুর্ধুরীণ পদে নিযুক্ত হন। তাহার পুত্র বাবু রায় (কৃষ্ণবাবু) বর্ধমান পরগণা ও সমীপবর্তী তিনখানি মহালের জমিদারি পাইয়াছিলেন। এই বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম; তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়ের সময়েই পূর্বকথিত চিতোর সর্দায় তালুকদার শোভাসিংহ বিদ্রোহী হইয়া বর্ধমান জমিদারি লুণ্ঠনে অগ্রসর হন। জনৈক অশান্ত আফগান সর্দার রহিম খাঁ তাহার সহিত যোগ দিলে, সমবেত বিদ্রোহী সৈন্য সদলবলে বর্ধমান আক্রমণ করে (১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে)। অসমসাহসিক রাজা কৃষ্ণরাম বিদ্রোহিগণের সহিত সম্মুখসমরে তাহার সামান্য সৈন্যদল সহ পরাস্ত ও স্বয়ং নিহত হন। বিদ্রোহীরা রাজবাটী

অধিকার করিয়া রাজপরিবারের অনেককে বন্দি করিল। রাজপুত্র জগৎরাম অনন্যোপায় হইয়া ঢাকায় সুবাদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে উল্লিখিত আছে, জগৎরাম এই সময়ে স্ত্রীবেশে পলাইয়া প্রথমে কৃষ্ণনগর-রাজের শরণাপন্ন হন। সুবিখ্যাত 'বিদ্যাসুন্দরের' অমর কবির সমসাময়িক কোন রাজ সভাসদ্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই এই ক্ষিতীশবংশাবলীর রচনা করেন। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীর বৈঠকের গাল-গল্প প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। সে যাহা হউক, বর্ধমান ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ, অনতিবিলম্বেই বিদ্রোহী সৈন্যের করকবলিত হইল। শোভা সিংহ বর্ধমান-রাজকুমারী বীরবালার পবিত্র অঙ্গে পাপহস্ত অর্পণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। অতঃপর রহিমের অধীনে বিদ্রোহী সৈন্য মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও রাজমহল পর্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অর্থশালী বণিকবর্গের পূজোপচারে সমৃদ্ধ নগর কাশিমবাজারে আর তাহাদের পদধূলি পড়িল না। সুবাদার ইব্রাহিম বিদ্রোহদমনে অশক্ত হইয়া পদচ্যুত হইলেন, কিন্তু তাহার দেশত্যাগের পূর্বেই তাহার অন্বর্থনামা পুত্র জবরদস্ত খাঁ মুর্শিদাবাদের নিকটে রহিমকে পর্যুদস্ত করেন। সাহাজাদা আজিমশ্বান বঙ্গে আসিয়া আপন পিতৃপুণ্যে ভাগ্যে ভাগ্যে বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইলেন। এখন জগৎরাম পৈতৃক জমিদারির সহিত বিদ্রোহী তালুকদারের অধিকৃত ভূসম্পত্তিও প্রাপ্ত হইলেন। রাজা কৃষ্ণরামের জমিদারি শত পরগণামাত্রে সীমাবদ্ধ ছিল; মুর্শিদকুলি খাঁর বর্তমান বন্দোবস্তে, জগৎরামের পুত্র রাজা কীর্তিচন্দ্রকে বর্ধমান চাকলার অধিকাংশ, হুগলির মধ্যে ভূরসূট ও মুর্শিদাবাদে মনোহরসাহী প্রভৃতি প্রধান জমিদারির অধিকারী দেখা যায়। ইহার অধিকাংশ ভূভাগই শস্যসমৃদ্ধির জন্য সুবিখ্যাত ছিল, সুতরাং এই অবধি বর্ধমানই বঙ্গের সর্বপ্রধান জমিদারি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। এই বন্দোবস্তে সমুদয়ে ৫৭ পরগণায় ২০৪৭৫০৬ টাকা সদরজমা নির্দিষ্ট হয়। [১১৭৮ সালের ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বন্দোবস্তে ৭৫ পরগণায় বর্ধমানের রাজস্ব ৪৩২৮৫০৯ টাকা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা ইহাতে সহজেই অনুমিত হইবে; অবশ্য বিপ্লবের সময়ে বাড়িতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছিল।]

রাজসাহী—(বা নাটোর জমিদারি);—মুর্শিদাবাদের উত্তরপশ্চিমাংশে আধুনিক পাকুড়ের নিকটবর্তী পুর্বতন সরকার উদুম্বর (উদনার) মধ্যস্থিত রাজসাহী পরগণাই আদিম রাজসাহী। (১২) মুর্শিদকুলি খাঁর রাজ্যকালে পূর্ববর্তী প্রাচীন ভূস্বামিবংশীয় রাজা উদয়নারায়ণ রাজসাহীর পার্শ্ববর্তী ভূভাগের বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য নবাব সরকার হইতে গোলাম মহম্মদ ও কালী জমাদার নামক দুই জন সেনানী দুই শত পদাতিক সহ নিযুক্ত ছিলেন। ইহারা প্রাপ্য বেতনের দাওয়া প্রভৃতি ছল করিয়া বিদ্রোহী হয়। নবাব প্রকৃত কারণ নির্ণয় না করিয়াই উপস্থিত বিদ্রোহদমন করিবার জন্য লাহরী মল্ল নামক হিন্দু সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। নাটোর-বংশের স্থাপয়িতা সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দ এই বিদ্রোহদমনে সাহায্য করেন, এইরূপ প্রবাদ। (১৩) আবার ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লাহরী মল্লের সহযোগী কৃষ্ণনগররাজ বীরপ্রবর রঘুরামের হস্তে গোলাম মহম্মদ হত হন, এইরূপ লিখিত আছে। যাহা হউক, কথিত আছে, —রাজা

উদয়নারায়ণ এই গোলযোগে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আত্মহত্যা করেন। তাহার উত্তরাধিকারী না থাকায় নবাব তদীয় বিস্তীর্ণ জমিদারি আপন প্রিয় রাজস্বসচিব ও বিশ্বস্ত অনুচর, রাজা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন (১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে)। রঘুনন্দন কামদেব নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান—পুঁটিয়ার সুবিখ্যাত রাজা দর্পনারায়ণের অনুগ্রহে কিরূপে তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে প্রতিষ্ঠাপন্ন হন, সে কথা আমরা স্থানান্তরে সংক্ষেপে বলিয়াছি। কুলিখাঁর সুনয়নে পড়িবার পরেই ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে বনগাছী নামক ক্ষুদ্র মহাল জমিদারি পান। পরে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে রাণী শর্বাণীর নিঃসন্তান লোকান্তরের পর বিস্তীর্ণ ভাতুড়িয়া জমিদারিও প্রাপ্ত হন। রঘুনন্দন নিজ কার্যদক্ষতায় গুণগ্রাহী মুর্শিদকুলির এতই শ্রদ্ধাভাজন হন যে, তিনি ভূষণার সুবিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের উচ্ছেদ সাধনের পর তাহার বিস্তীর্ণ জমিদারিরও সিংহযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর যশোহর অঞ্চলের টুন্‌কি স্বরূপপুরের দুই জন মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হইয়া নবাবের ষাটি হাজার টাকা রাজস্ব লুণ্ঠন করে—ইহাদের বিনাশের পর এই জমিদারিও রঘুনন্দনী মেলে মিলিয়া যায়। প্রবাদ এই যে, বিদ্রোহী-জমিদারদ্বয়ের ও সীতারামের দমন সময়ে রঘুনন্দন বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি রাজকর্মচারী বলিয়া এই সমগ্র জমিদারিই ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। প্রধান জমিদারি কয়টির যে সনন্দ কয়খানি এক্ষণে নাটোর রাজধানীতে আছে, তাহার তারিখ ১১২৯ হিঃ (১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ)। জমিদারি সনন্দ প্রভৃতির কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার অভিলাষ আছে।[১৪] এই অবধি রাজসাহী জমিদারি আয়তনে সর্বপ্রধান জমিদারি হইয়া উঠে; ইহার তদানীন্তন পরিমাণ বার হাজার বর্গ মাইলেরও অধিক ছিল;—অর্থাৎ, চাকলা মুর্শিদাবাদ, ঘোড়াঘাট ও মহম্মদাবাদের অধিকাংশ, বর্তমান রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর প্রায় সমস্তই এবং রঙ্‌পুরের অর্ধাংশ, তখন এই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। নানা কারণে দেয় রাজকরও অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। সর্বসমেত ১৩৯ পরগণায় এই বন্দোবস্তে ইহার সদর জমা মোট ১৬৯৬০৮৭ টাকা মাত্র নির্দিষ্ট ছিল। কোম্পানির বন্দোবস্তে দেয় রাজস্ব দ্বিগুণেও অধিক হয়।

নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর জমিদারি:—স্বনামখ্যাত ভবানন্দ মজুমদার এই সুবিখ্যাত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে ইনি ১৬০৬ হইতে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে উখড়া প্রভৃতি বিংশত্যধিক পরগণায় জমিদারি পান। ভবানন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা রঘুরাম মুর্শিদকুলি খাঁর বন্দোবস্ত সময়ে বর্তমান ছিলেন। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ বীরপুরুষ, রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে ইহার অভিযানের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এ প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও বক্ষ্যমাণ বন্দবস্তে ইহার জমিদারির আয়তন যে বর্ধিত হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সময়ে কৃষ্ণনগর জমিদারির সর্বসমেত ৭৩ পরগণার দেয় রাজস্ব ৫৯৪৮৪৬ টাকা হইয়াছিল। কোম্পানির বন্দোবস্তে ইহার গতিও অন্যের মতই হয়। দুই চারিটি লাভশূন্য মহাল দ্বারা আয়তনে বর্ধিত হইলেও, বর্ধিত রাজস্বের তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিলেও অতুক্তি হয় না। (বাং ১১৭২ সালে দেয় রাজস্ব ১০৯৭৪৫৪ টাকা হইয়া উঠে)। খ্যাতনামা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র

রঘুরামের পুত্র; তাঁহার সময়ে কৃষ্ণনগর রাজ্যের চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধি, জমিদারির আয়তন ৮৫ পরগণা হইয়া উঠে। জমিদারি অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, নদীয়া-সমাজপতি বলিয়া কৃষ্ণনগর রাজ্যের সম্মান চিরকালই অন্য কাহারও অপেক্ষা অল্প ছিল না।

দিনাজপুর বা হাবেলি সরকার পিঞ্জারা;—আকবর সাহের রাজত্বের শেষভাগে বিষ্ণুদত্তনামা জনৈক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ প্রাদেশিক কানুনগো নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুরে বাস করেন। তাহার পুত্র শ্রীমন্ত চৌধুরী সাজাহানের রাজ্যকালে সাহ সুজার বিশেষ প্রীতিভাজন হন ও দিনাজপুরের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজ্যোপাধি এবং বাদসাহের নিকট বিশিষ্ট সম্মানাদি প্রাপ্ত হন। মুর্শিদকুলি খাঁর এই বন্দোবস্ত সময়ে রাজা রামনাথ বর্তমান ছিলেন। ইনি এক জন সুবিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। জমিদারির সুব্যবস্থা করিয়া ইনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এজন্য প্রবাদ আছে, প্রাচীন বাণরাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রস্বামী ও পুত্রচতুষ্টয়ের গল্পের মত তাহার অর্থ মৃত্তিকা হইতেই উঠে। নিজ জমিদারির আভ্যন্তরীণ সমস্ত বন্দোবস্ত ও বিচার প্রভৃতির ভার ইহার হস্তে স্থায়িভাবেই প্রদত্ত হয়। ইহার সুব্যবস্থাগুণে দিনাজপুর জমিদারি পূর্বপ্রথামত আমিন বা ক্রোক সাজোয়ানের হস্তে কখনও পড়ে নাই। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ অনেক সময়ে ইহার নিকট ঋণস্বরূপ অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেন, ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে ৮৯ পরগণায় ইহার সদর মালগুজারী ৪৬২৯৬৪ টাকা ছিল। ইংরেজী আমলে দ্বিগুণে উঠিয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ নিয়মের এখানে ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

উল্লিখিত চারিটি প্রধান জমিদারির প্রত্যেকেরই মুসলমানী আমলে উৎপত্তি এবং ইহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট ও ত্রিপুরায় প্রাচীন হিন্দু রাজগণের নিকট বাদসাহী পেসকশ্ স্বরূপ সামান্য কিছু গ্রহণ করা হইত। তাহারা আবার ভাল ভাল খেলাৎ ও পুরস্কার পাইতেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের স্বাধীন ব্যবহারই ছিল, কুলি খাঁর পূর্বে তাহারা ভাল করিয়া মুসলমানের আয়ত্তই হন নাই। ত্রিপুরা এই সময়েই প্রথমে কথঞ্চিৎ শাসনে আইসে। রুকনপুর কানুনগোই জমিদারি, ইউসুফ্‌পুর বা যশোহর জমিদারি, ফতে সিংহ, পুঁটিয়া, মহম্মদসাহী, ইদ্রাকপুর, এই ছয়টি প্রধান জমিদারি। অতঃপর উল্লেখযোগ্য এই কয়টিও এ আমলে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে পরিগণিত। সমস্তই হিন্দু জমিদার। ইহা ভিন্ন শ্রীহট্ট, বালেশ্বর, তমোলুক, জলামুঠা, সুজামুঠা, (মহিষাদল প্রভৃতি) কাঁকজোল (রাজমহল) ইত্যাদি স্থানের জায়গির হিন্দু জমিদারগণেরই অধীন ছিল। বৃহৎ জমিদারির মধ্যে একমাত্র বীরভূমিতে প্রাচীন মুসলমানবংশীয় জমিদার দেখা যায়; অন্যত্র ক্ষুদ্র মুসলমান জমিদারের সংখ্যাও অতি অল্প। মোটের কথায় এক আনা রকম মুসলমান জমিদারের অধীনে দেখা যায়। এই জমিদারি বন্দোবস্তই মুর্শিদকুলি খান কীর্তি, আবার ইহাতেই তাঁহার কলঙ্ক-প্রবাদ। কঠোর হস্তে রাজকর আদায়ই তাঁহার কলঙ্কের প্রধান কারণ। কয় জন কঠোর ন্যায়পর লোক সংসারে যশোলাভ করিয়াছেন?

সাহিত্য ১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ

তথ্যসূত্র

১. Journal As, Society—Vols. VII, LXV.

২. Col. Wilford. Asiatic Researches Vol. XIV. p. 451.

৩. Dissertations—Boughton Bouse.

৪. Journal As. Society, Vol XLIII. pp 197-214.

৫. Campbels' Cobden Club essay, & c.

৬. Tarikhi Firojhahi and Shershahi in Elliot's History of India—Vols. III.IV.

৭. Anie Akbari Vol II. Col. Jarret.

৮. সাধারণতঃ অনেকের সংস্কার এই যে, বাঙ্গলা অধিকারের পর রাজা টোডরমল অন্য প্রদেশের মত এখানেও জরিপ করিয়া জমাবন্দি প্রস্তুত করেন। কিন্তু এটি ভ্রমমাত্র। আইন-আকবরীতে এ বিষয়ের পরিষ্কার উল্লেখ না থাকাই এই ভ্রমের কারণ।

৯. এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অনেক কারণ আছে, এখানে তাহার সমালোচনা অসম্ভব। যে পারসি গ্রন্থ হইতে রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থকার ও স্টুয়ার্ট এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে নানা সময়ের প্রবাদ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। একজন দেওয়ানের নগদী সৈন্যের হস্তে প্রাণনাশের কথা ইংরেজ দপ্তরের কাগজে আছে। তিনি কিছুদিনের জন্য মুর্শিদকুলির স্থানে কার্য করিয়াছিলেন।—Wilson's annals of the British in Bengal.

১০. Phillip's Land Teuure—P, 128—29.

১১. Fifth Report and Harrington's Analysis.

১২. Bevarige—The Rajas of Rajshahi—proceedings of the Asiatic Society, January, 1893.

১৩. Sir John Shore's Report in Harnigton's Analysis.

১৪. সাহিত্য—মাঘ ও ফাল্গুন—১৩০২

বাংলার ইতিহাসে 'বৈকুণ্ঠ'

জমা কামেল তুমারী অর্থাৎ মুর্শিদকুলি খাঁর জমিদারি বন্দোবস্ত প্রবন্ধে দৃষ্ট হইয়াছে[১] যে, কুলি খাঁ বাঙ্গলার প্রায় সমগ্র জমিদারি হিন্দু জমিদারগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া যান। আনায়াসসাধ্য হইলেও কুত্রাপি নূতন মুসলমান জমিদারের পত্তন করেন নাই, বরং সময়ে পূর্ববর্তী মুসলমান জমিদারগণকে অবাধ্যতার জন্য উৎখাত করা হইলে, তাহাদের স্থানে হিন্দুর প্রতিষ্ঠা করেন। যে জমিদারি বন্দোবস্তের জন্যে বঙ্গীয় সুবাদারগণের মধ্যে তাহার নাম শীর্ষস্থানীয়, সেই বন্দোবস্তই আবার তাহার কলঙ্ক। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাঙ্গলার ইতিহাসের এই অংশের সমালোচনা করিব।

মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতিভা ন্যায়নিষ্ঠা ইতিহাসে একবাক্যে স্বীকৃত। যে দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান বাল্যে মুসলমান বণিকের ক্রীতদাসরূপে আরম্ভ করিয়া দিল্লির বাদসাহের অধীন সর্বোচ্চপদে আরূঢ় হন, তাহার প্রতিভা আদর্শস্থানীয়; যিনি ন্যায়বিচারের অনুরোধে স্বীয় একমাত্র পুত্রেরও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া ভারতের ইতিহাসে রোমীয় বীর চরিত্রের দ্বিতীয় অভিনয় দেখাইয়াছেন, সেরূপ এক জন ক্ষণজন্মা আদও পুরুষের নিন্দাবাদ রটনা করিবার পূর্বে একটু চিন্তার প্রয়োজন।

আজি কালি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের সমালোচনায় যে দুই এক জন বাঙ্গালী লেখক হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাহারা কেহই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস দুইখানি স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্বন্ধে পারসি ভাষায় এ পর্যন্ত যে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইখানি অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী;—

(১) ইউসুফ্ আলি খাঁর লিখিত নবাব আলিবর্দি খাঁর সময়ের ইতিহাস; অন্য নামের অভাবে আমরা ইহাকে 'তারিখ ইউসুফী' নামে অভিহিত করিয়াছি। লেখক, আলিবর্দি খাঁর সমসাময়িক মুর্শিদাবাদের অন্যতম ওমরাহ। আমরা এ পর্যন্ত একখানিমাত্র 'ইউসুফী' সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তাহাও কীটদষ্ট।

(২) এক জন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের কৃত ইতিহাস। ইহাতে মুর্শিদাবাদের স্থাপনার কিছু পূর্বে, অর্থাৎ শোভাসিংহের বিদ্রোহ হইতে সিরাজদ্দৌলার রাজ্যপ্রাপ্তি পর্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থে কোন নাম দেওয়া নাই; আমি 'তারিখ বাঙ্গলা' নামে ইহার উল্লেখ করায় দেখিতেছি, অনেকে অনুগ্রহ করিয়া ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের আদেশে এই গ্রন্থ লিখিত হয়; সুতরাং ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইহার সময় ধরা যাইতে পারে। খ্যাতনামা গ্লাডউইন্ সাহেব ১৭৮৮ সালে ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন।[২]

স্পষ্ট দেখা যায়, স্বনামখ্যাত 'সিয়ার-উল্-মুতাক্ষরীণ'-রচয়িতা সায়দ গোলাম হোসেন

উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় হইতে সাহায্য পাইয়াছেন, আলিবর্দির প্রথামাংশ-রচনায় 'তারিখ ইউসুফী'ই তাঁহার অবলম্বন; দুই এক স্থলে ইউসুফ্ খাঁর নামোল্লেখও আছে।

গোলাম হোসেন সলিমের কৃত 'রয়াজ উস্-সালাতিন' (১৭৮৬-৮৮ খ্রিঃ) গ্রন্থে, গ্রন্থকার, মুর্শিদাবাদ ইতিহাসে সিরাজের রাজ্যাধিকার পর্যন্ত উল্লিখিত অজ্ঞাতনামা লেখকের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন; একবারেই নকল করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূলগ্রন্থের ভাষার অলঙ্কার মোচন করিয়া সরল করিয়াছেন; কোনও স্থলে নিতান্ত অবিশ্বাস্য বর্ণনা ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র। সোসাইটি এখানি মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং অনুবাদ প্রকাশেরও চেষ্টা হইতেছে। এই গ্রন্থখানিও মুসলমান-অধীন বাঙ্গলার সম্পূর্ণ ইতিহাস, তবে এখানি সংগ্রহ-গ্রন্থমাত্র।

এখন মুর্শিদকুলি খাঁর চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে, উল্লিখিত ইতিহাসগুলি কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থায় লিখিত হয়, তাহা না জানিলে পাঠক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন, এরূপ ভরসা করা যায় না। প্রথমে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারকে দেখুন। ইনি গ্রন্থারম্ভে গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের এক বিস্তৃত বন্দনা দিয়াছেন। এখানে ভান্সিটার্ট সাহেব সুদীর্ঘ বিশেষণ-ঘটায় বাণভট্টের রাজা, শূদ্রক অপেক্ষা বড় কম নহেন। গ্ল্যাডউইন এই অংশের অনুবাদ দেন নাই। সময়ান্তরে আমরা ইহা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। কোম্পানির কর্মচারী প্রভুগণের সন্তুষ্টিসাধন যে লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাহা তিনি গোপন করেন নাই। "যাঁহারা অন্যের মন্দ দেখিয়া ভাল হইতে চান, বাঙ্গলা দেশের ভূতপূর্ব নাজিমগণের কার্যকলাপ তাহাদের অবগতি ও সুবিচার জন্য আমি এই ইতিহাস রচনা করিলাম।" বিশেষ দুঃখের বিষয়, লেখক মহোদয়ের লেখনী যেরূপ ওজস্বিনী, সত্যনির্ধারণের চেষ্টা তত দূর দেখা যায় না। ইনি যেখানে যাহা শুনিয়াছেন, অকাতরে তাহাই গ্রহণ করিয়া সুন্দর লিপিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। কোথাও কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রবাদের সংযোগে, কোথাও বিরুদ্ধ ভাবের কথা এক স্থানে সমাবেশ করিয়া বিষম গোল করিয়া গিয়াছেন। এক বিষয়ে ইনি ঠিক আছেন; ইনি গোঁড়া মুসলমান, কাফের হিন্দুগণের নির্যাতন বর্ণনায় লেখকের বড়ই উল্লাস। সুতরাং হিন্দু জমিদার উৎপীড়ন সম্বন্ধে ইহার অতিরঞ্জিত উক্তি বিশেষ সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। কুলি খাঁর হিন্দু জমিদার পীড়ন, হিন্দু দেবালয়ের বিনাশ, কল্পনা, হিন্দুকে মুসলমান করা ইত্যাদি অবাস্তব ঘটনা সংযোগ জন্য ইনিই দায়ী—পরবর্তী লেখকের তাহার পশ্চাৎগামী হইয়াছেন মাত্র। মুতাক্ষরীণকার, এমন কি রিয়াজ গ্রন্থকার পর্যন্ত তাহার অনেক কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় গ্রহণ করেন নাই। পূর্বতন নাজিমগণের কীর্তি ইনি সুদ সহ দেখাইয়াছেন। আলিবর্দি খাঁও এ হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এখানে আলিবর্দি ঠিক মুতাক্ষরীণে চিত্রিত আলিবর্দি নহেন। বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যাকাণ্ডে আলিবর্দি খাঁকে ভাস্কর পণ্ডিতের কথা ভিন্ন আরও দুই এক ক্ষেত্রে লিপ্ত দেখাইয়াছেন। এখানেও কাফেব হিন্দুবধে লেখকের যেন উল্লাস এবং স্ফূর্তিই দেখা যায়। মুরশিদকুলি খাঁর 'হিন্দু-বিদ্বেষ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া আপাততঃ আমরা কেবল জমিদার পীড়নেরই সমালোচনা করিব। আমাদের সৌভাগ্য যে, ইংরেজ দপ্তরের কাগজে এই সময়ের জমিদারি

বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। নতুবা লেখকের কাহিনী বাঙ্গলায় ইতিহাসের এই অংশে চিরদিনের মত এই কালিমা রাখিয়া যাইত। যেখানে প্রকৃত বস্তুর সহিত লেখকের উক্তির সামঞ্জস্য নাই, সেখানে আমরা তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য। এইরূপ, মুসলমান লেখকগণও ইহার অনেক উক্তি গ্রহণ করেন নাই।

পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, মুর্শিদাবাদের ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে ইউসুফ আলি খাঁ সর্বপ্রথম। ইনি আপন গ্রন্থের উপক্রমণিকায় স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, পূর্বতন নাজিমগণের প্রামাণিক ইতিহাস সংগ্রহ করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। অথচ ইনি মুর্শিদাবাদের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাহার পিতা এক জন উচ্চপদস্থ সৈনিক; কটক হইতে দুর্দান্ত মহারাষ্ট্র সৈন্যের সম্মুখে আলিবর্দি খাঁর সুবিখ্যাত প্রত্যাবর্তনের অন্যতম সঙ্গী; নানা রূপে রাজসংসারে সংসৃষ্ট হইয়াও ইনি সমসাময়িক ইতিহাস ভিন্ন অন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বকপোলকল্পিত ইতিহাসরচনায় অপ্রবৃত্তিই কি ইহার কারণ নহে? তবেই দেখা গেল, কুলি খাঁর বিবরণ এই সময়েই, সত্য ও মিথ্যা, এই উভয়বিধ প্রবাদে জড়ীভূত হইতে আরম্ভ হয়। আলিবর্দি খাঁর শত গুণ থাকিলেও, তিনি প্রভুপুত্রের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া ছলে বলে রাজ্য গ্রহণ করেন; সুতরাং তাহার ও তৎপারিষদবর্গের বৈঠকে পূর্ববর্তী শাসনের দোষসমূহ অতিরঞ্জিতভাবে সমালোচিত হইবারই কথা। এরূপ ব্যবহারের কারণও কিয়ৎপরিমাণে বর্তমান না ছিল, এমন নহে। ইউসুফ্ আলি খাঁ বলেন, আত্মীয় সুজা খাঁর আশ্রয় লাভ জন্য যখন আলিবর্দি দিল্লি হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌছেন, সেই সময়ে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাহার সমাদর করা দূরে থাকুক, বরং উপেক্ষাই প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে নবাগত অজ্ঞাতকুলশীল ভাগ্যমৃগয়ান্বেষণে ধাবমান মুসলমান সেনানীগণের উপর কোনও কালেই কুলি খাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। ইহারা মুসলমান রাজের বলস্বরূপ না হইয়া বরং দেশের কণ্টক, দূরদর্শী মুর্শিদের এইরূপ ধারণাই ছিল। বাঙ্গলার মুসলমান সামন্তগণের সাধারণ ব্যবহারই ইহার প্রমাণ। বর্তমান কালের রাজপুরুষগণের ন্যায়, কুলি খাঁর স্বজাতি বাৎসল্য অত্যধিক প্রবল ছিল না। বঙ্গের মুসলমান জায়গিরদারগণ চিরকালই তাহার চক্ষুঃশূল। তাহাদিগকে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করিয়া কুলি খাঁ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। উপরন্তু, চরিত্রহীনতানিবন্ধন জামাতা সুজার প্রতি তাহার বিশেষ বাৎসল্য ছিল না। তাহার সতীশিরোমণি কন্যারত্নের ভর্তাসত্ত্বেও চিরবৈধব্যপ্রায় অবস্থা সততই তাহার হৃদয়ে মুর্মুরদাহ উপস্থিত করিত। এরূপ ক্ষেত্রে জামাতার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাদর বড় একটা আশা করা যায় না। যাহা হউক, আলিবর্দি খাঁ ক্ষুণ্নমনেই মুর্শিদাবাদ হইতে উড়িষ্যায় প্রস্থান করেন। এই সকল কারণে, সুজা খাঁর বা আলিবর্দি খাঁর মুর্শিদের উপর ভাব ভক্তি বড় ভাল হওয়া সম্ভব কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, যেমন পরবর্তী বিপ্লবের পর ইংরেজী ইতিহাসে সিরাজের চরিত্র অতিরঞ্জিত হইয়া ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ আলিবর্দি খাঁর সিংহাসনগ্রহণের পর, কুলি খাঁর কঠোর ন্যায়পরতা, ভীষণ অত্যাচারের ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, খ্যাতনামা মুতাক্ষরীণ-কার এই অজ্ঞাতনামা লেখকের কথায় সম্পূর্ণ

আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই, এবং এই জন্যই এ সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন নাই। তবে তাহার সময়ে উল্লিখিত কারণপরম্পরায় মুর্শিদ কুলি খাঁর জমিদার-পীড়নের প্রবাদ বড়ই প্রবল ছিল; এ জন্য তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ অত্যাচার সম্বন্ধে কাগজ কালী খরচ করাই অন্যায়। গোলাম হোসেন খাঁ অশেষ গুণ সত্ত্বেও আলিবর্দি খাঁর বড়ই পক্ষপাতী; বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক শত্রুবধেও ইনি আলিবর্দি খাঁর দোষ দেখেন না। কিন্তু অন্যত্র নরহত্যা বা বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনে তাহার লেখনী শতমুখী। এজন্য আলিবর্দি খাঁর দরবারের মতই তাহার মত, এরূপ ধরিয়া লইলে বড় ভ্রম হয় না। যাহা হউক, যে দুই এক স্থানে প্রসঙ্গতঃ কুলি খাঁর উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানেই তাহার প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা ও রাজদরবারে প্রতিপত্তির কথা বিশেষরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কুলি খাঁর বন্দোবস্তে বেশির ভাগ হিন্দু জমিদার দেখিতে পাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার মহোদর স্বকপোলকল্পিত একটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন;—ইনি বলেন, মুর্শিদ কুলি খাঁ রাজস্ব আদায় কার্যে বাঙ্গালী হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতেন না; কেন না, হিন্দুরা শাস্তির ভয়ে শীঘ্রই আপন দুষ্কৃতি প্রকাশ করিয়া ফেলিবে ও তাহারা ভীরুস্বভাব, সুতরাং রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। হিন্দু জমিদারগণকে এই প্রশংসাপত্র দিবার সময় গ্রন্থকার সম্ভবতঃ শোভাসিংহ বা রাজা উদয়নারায়ণ ও সীতারামের বিদ্রোহ ব্যাপার একেবারেই বিস্মৃতি হইয়াছিলেন। এ কালের বাঙ্গালীর স্বভাব যাহাই হউক, সেকালে জমিদারগণ যে নিতান্ত ভালমানুষ ছিলেন, ইহা প্রমাণ করা কষ্টকর। গ্রন্থকার গোঁড়া মুসলমান; হিন্দুরাই যে বুদ্ধিমান ও কর্মকুশল ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে তাহার কষ্ট হয়। কুলি খাঁও একজন গোঁড়া মুসলমান হইয়া হিন্দু জমিদারগণের এত পক্ষপাতী ছিলেন, ইহার একটা মন-গড়া কারণ নির্দেশ না করিলে চলে কই?

এ সম্বন্ধে কোম্পানির সেরেস্তাদার গ্রান্ট মহোদয়ও একটা সমীচীন ব্যাখ্যা না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সুবিস্তীর্ণ রাজসাহী জমিদারি ক্রমশঃ এক ব্রাহ্মণসন্তানকে দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া, তিনিও উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। তাহার বক্তৃতা এই [৩] যে, মুর্শিদকুলি খাঁ জমিদারগণের বিভীষিকার জন্য বিদ্রূপ করিয়া 'বৈকুণ্ঠ' নাম রাখিয়া এক নরককুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তিনিই আবার এক জন পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী বিষয়ানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এই সর্বপ্রধান জমিদারি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু এই উচ্চশ্রেণির হিন্দুগণের প্রবঞ্চনা ও গ্রাহকতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রাজ্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, এক অদূরদর্শিনী নীতি অবলম্বন করিয়া, তাহার হস্তের এই সর্বপ্রধান দান পুরুষানুক্রমে স্থায়িভাবে থাকিবে জানিয়াও, এইরূপে দিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণনির্দেশ স্থলে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যথেচ্ছাচারিরাজন্যবর্গস্বভাবসুলভ সময়োচিত স্বার্থসাধিনী নীতিই তাহাকে এইরূপ আত্মহত্যার ব্যাপারে প্রণোদিত করিয়াছিল। পাঠক মার্জনা করিবেন, গ্রান্ট মহোদয়ের বাক্যগুলি বড়ই লম্বা, ভাবমাত্রসঙ্কলনেই রুদ্ধশ্বাস। গ্রান্ট সাহেব বোধ হয়

জানিতেন না, কথিত চালকলাভোজী ব্রাহ্মণসন্তান রঘুনন্দনের পদতলে বসিবার যোগ্য বিবেচিত হইলেও, অনেক রাজস্বসচিব আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। যে কৃষ্ণনগর রাজবংশের বিদ্যোৎসাহিতা, সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান প্রভৃতির জন্য বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ চির-ঋণী, বিধর্মী গ্রান্ট মহোদয় নিজ প্রভু বণিক কোম্পানির সামান্য রাজস্বের ক্ষতি উপলক্ষে সেই কৃষ্ণনগর-রাজদত্ত লাখেরাজ সম্বন্ধে অযথা গালিবর্ষণে সমধিক আগ্রহ দেখাইয়াছেন। [৪] তাহার মতে, এই লাখেরাজের প্রাচুর্যবশতঃই কৃষ্ণনগর-রাজের সদর রাজস্ব পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের তুলনায় অল্প হইয়াছে। তবেই স্বীকার করিতে হইল, বর্ণিত হিন্দুবিদ্বেষী মুর্শিদকুলি খাঁ এখানে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বা অযথা রাজস্ববৃদ্ধি করেন নাই। কোম্পানির আমলের বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ কি পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল, এবং বাকি করের জন্য কত শত জমিদারের সর্বনাশসাধন ঘটে, ইহা সাধারণের অবিদিত নাই। সুতরাং, তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে, কোন্ বন্দোবস্ত জমিদারগণের পক্ষে হিতকর, তাহা বিবেচিত হইবে। এই সঙ্গে ভারতের যে ভাগে এখনও স্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেগুলির বন্দোবস্তের কথা মনে রাখিলেও মন্দ হয় না।

প্রকৃত কথা, বাঙ্গলার জমিদারগণ ইতিপূর্বে বিপ্লবের সুবিধায় রীতিমত রাজকর আদায় দেওয়ার পদ্ধতি একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথম হইতেই এই আবর্জনারাশি পরিষ্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। স্পষ্ট দেখা যায়, তাঁহার বন্দোবস্ত যে অরাজক অবস্থার পরে সংঘটিত, তাহাতে যত দূর সম্ভব, অল্প জবরদস্তীতে কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বিপ্লবের পর এরূপ সুবন্দোবস্ত বড় একটা দেখা যায় না। এরূপ সময়ে অল্পাধিক অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী। সেকালের চক্ষে দেখিলে নিতান্ত দুষ্ট বিদ্রোহী জমিদারগণকে নজরবন্দি রাখিয়া বন্দোবস্ত করা বড় বেশি দোষের বোধ হইবে না। ফলতঃ, কুলি খাঁর বন্দোবস্তে অত্যাচার সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি বর্তমানে কেডাস্ট্রাল্ সার্ভে সম্বন্ধে এক শ্রেণির লোকের চীৎকারের ঠিক অনুরূপ।

বাকি খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারগণকে দেওয়ানি জেলে রাখা তৎকালে আইন ছিল। সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক, আলিবর্দি খাঁর সময়েও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে এই জন্য কারারুদ্ধ দেখা যায় [৫] সুতরাং চিরাগত মুসলমানী আইন অনুসারে, রাজস্বদানে অশক্ত অথচ অবাধ্য জমিদারগণকে কারারুদ্ধ করিয়া, কুলি খাঁ বড় বেশি অন্যায় করিয়াছেন, বোধ হয় না। এই সুসভ্য কালেও দেনার দায়ে জেলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আইনের দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কুলি খাঁ এই আইন অবস্থাবিশেষেই কার্যে পরিণত করেন। আলিবর্দি খাঁর সময়ে নজরাণার টাকার জন্যও কারাবাস দেখা যায়। অতএব এ অবস্থা সেকালের পক্ষে অসাধারণ নহে। অজ্ঞাতনামা ইতিহাসলেখক এক স্থানে বলেন, কুলি খাঁ রাজস্বদানে অশক্ত হিন্দু জমিদারগণকে সপরিবারে মুসলমান করিতেন। কিন্তু জমিদারি বন্দোবস্তে এক জনও এমন জমিদার দেখা যায় না। তবে জমিদারগণকে মুসলমানও করা হইত, এবং জমিদারি কাড়িয়া লইয়া অন্য হিন্দুজমিদারকে পুনরায় ঐ জন্যই পত্তন করা হইত, এরূপ কথা যদি বলা হয়, তাহা হইলে এ বুদ্ধির নিকট সসম্ভ্রমে

মস্তক অবনত করা ভিন্ন আর উপায় কি? মুর্শিদকুলি খাঁর প্রধান রাজস্বসচিব হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্ববিভাগের উচ্চতর কর্মচারীমাত্রই হিন্দু ছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু কর্মচারী, হিন্দু জমিদার, চতুর্দিকে হিন্দুগণে বেষ্টিত হইয়া কেবল হিন্দুর প্রতিই এই ব্যবস্থা কি করিয়া সঙ্গত হয়, লেখকই বলিতে পারেন। তিনি এক দৃষ্টান্ত দ্বারাও তাহার উক্তিসমর্থনের চেষ্টা করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে তদানীন্তন বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেই নিতান্ত কাপুরুষতা স্বীকার না করিলে, তাহার সঙ্গে 'ডিটো' দেওয়া যায় না।

এই সমস্ত কথিত অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা 'বৈকুণ্ঠে'। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বলিতেছেন, "নবাবের দৌহিত্রীপতি সইদ্ রজি খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া বাকি কর আদায়ের জন্য জমিদার ও আমিলগণের উপর উৎপীড়নের নানাপ্রকার নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। চর্মনির্মিত ঢিলা পায়জামা পরাইয়া তাহার ভিতর বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত; কাহাকেও বা লবণমিশ্রিত মহিষদুগ্ধ পান করাইয়া দেওয়া হইত, যাহাতে উদরাময় হইয়া অচিরাৎ মৃতপ্রায় হইয়া আসে। প্রবাদ এই যে, মনুষ্যসমান একটি খাদ প্রস্তুত করাইয়া নানাবিধ পূতিগন্ধময় অকথ্য পদার্থে তাহা পূর্ণ করা হইয়াছিল। (ভদ্রতার খাতিরে লেখকের সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে আমরা অসমর্থ।) হিন্দুগণের প্রতি উপহাসচ্ছলে এই নরককুণ্ডের নাম 'বৈকুণ্ঠ' রাখিয়া, রাজস্ব আদায় দানে অশক্ত জমিদার ও আমিলগণকে এই হ্রদে প্রক্ষিপ্ত করিয়া টানিয়া আনার ব্যবস্থা হয়।" স্মরণ রাখা উচিত, জমিদারগণের উপর অত্যাচারের বর্ণনা এই গ্রন্থেই প্রথম।

কিন্তু এখানেই জনশ্রুতি বলিয়া আরম্ভ। পরবর্তী দুই এক জন মুসলমান গ্রন্থকার এই উক্তি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুতাক্ষরীণে বৈকুণ্ঠের উল্লেখ নাই। রাজস্বসচিব গ্রান্ট সাহেব কুলি খাঁর স্কন্ধেই ইহার পিতৃত্বের আরোপ করেন। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, বাস্তবিক বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা হইত না। বিভীষিকা দেখাইয়া অনাদায়ী রাজস্বের সংগ্রহ ও ভবিষ্যতে ক্রটি না হয়, ইহাই লক্ষ্য ছিল। গ্রান্ট সাহেব রাজস্ববিভাগের কার্যের অনুরোধে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন: নিজামত রেকর্ড এবং মিলের ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায়, গ্রান্ট সাহেব ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ হইতে মুর্শিদাবাদের প্রভিন্সিয়াল্ কাউন্সিলের একাউন্টান্টের কার্য করিতেন। সুতরাং তিনি সমসাময়িক লোকের মুখে বৈকুণ্ঠ-ব্যাপার সবিশেষ অবগত হইয়াই রাজস্ববিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবেই দেখা গেল, রজি খাঁ হইতে বৈকুণ্ঠ কুলি খাঁর হাতে পড়া ও জমিদারমাত্রেরই বৈকুণ্ঠবাসের প্রবাদ ভয়প্রদর্শনমাত্রে পরিণত হওয়া, ঐ সময়ে ঘটিয়াছিল। ফল কথা, এক সময়ে নানা লোকে ঐ প্রবাদ নানা প্রকারে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কে, ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়। সুতরাং প্রবাদের এই রূপান্তর অবশ্যই সমসাময়িক লোকের মুখে শুনিয়াছেন। স্যর জন শোর সাহেব গ্লাড্উনের অনুবাদ দেখিয়া সেই মতই বলিয়াছেন। সুতরাং রজি খাঁ হইতে 'বৈকুণ্ঠ' স্বয়ং মুর্শিদকুলির হস্তে যাওয়া, এবং জমিদারমাত্রেরই বৈকুণ্ঠবাস হইতে ভয়প্রদর্শনমাত্রে পণিত হওয়া, ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ঘটে। গ্রন্থকার বলেন, রজি খাঁর বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করেন। এখানে একটি কথা বক্তব্য আছে। এখন জমিদার-পীড়নে রাজি খাঁর কতটুকু হাত ছিল, দেখা যাউক; এখানে মূলেই গোল বোধ

হয়। যত দূর দেখা যায়, তাহাতে সইদ রজি খাঁ দেওয়ান-ই-আলি বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা একবার 'নবাবী আমলে হিন্দু কর্মচারী' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি[৬] যে, নবাবের স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গই প্রধানমন্ত্রিত্বপদে বা প্রাইভেট সেক্রেটরীর কার্য্যে সাধারণতঃ নিযুক্ত হইতেন; কারণ, এ দুই পদেই মন্ত্রগুপ্তির বিশেষ প্রয়োজন। রাজস্ববিভাগের কার্য্যে বিশেষ বুৎপত্তির জন্য হিন্দুরাই সাধারণতঃ নিয়োজিত ছিলেন। মুর্শিদ কুলির শাসনের প্রথম বর্ষেই, অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে, সইদ ইক্‌রাম খাঁ এই পদে নিয়োজিত হন, এবং ঐ সময়েই ভূপতি রায় রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা হইয়াছিলেন। ইক্‌রাম খাঁর মৃত্যুর পর রজি খাঁ অতি সামান্য দিনমাত্র দেওয়ান ছিলেন; কারণ ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে রজি খাঁর পরলোকান্তে নবাব আপন দৌহিত্র সরফরাজকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া বাদশাহ ফেরোকসেরের নিকট হইতে উপাধি আনাইয়া দেন, ইত্যাদি কথা লেখক আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইতিহাসপাঠকমাত্রেই ইহা দেখিয়া থাকিবেন। সরফরাজ ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে বালকমাত্র; সুতরাং রাজস্ববিভাগ প্রভৃতি সমস্ত পরিদর্শনের ভার তাহার হস্তে ছিল, ইহা মনে করা অসঙ্গত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইক্‌রাম খাঁর সময় হইতে রাজস্ববিভাগে ভূপতি রায় হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু কর্মচারী দেখা যায়। কুলি খাঁর বন্দোবস্তের পর হইতে দেওয়ান খালসা অর্থাৎ 'রাজস্বসচিব' রায় রাইয়াঁ রঘুনন্দন। ইনিই নাটোরের রঘুনন্দন, কুলি খাঁর দক্ষিণ হস্ত। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদ কুলির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দ পরলোকগত হন। অতএব রাজি খাঁর জমিদার-পীড়নের অবসর কোথায়? যাহারা ছাপার লেখা ব্রহ্ম জ্ঞান করেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; অন্যে ইহা বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। আমবা ইতিপূর্বে অন্যত্র দেখাইয়াছি, (১ ১৩০২) নবাবী আমলে প্রত্যেক বিভাগে স্বতন্ত্র দেওয়ান থাকিতেন। যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে নবাবের নাতিনী-জামাতা সইদ রজী খাঁ দেওয়ান-ই-আলি বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর বন্দোবস্তের পর হইতে রঘুনন্দন খালসা দেওয়ান বা রাজস্বসচিবের কার্য্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার পরে এ পদে হিন্দুরাই নিযুক্ত হইতেন। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে কুলি খাঁ এবং রঘুনন্দন, উভয়েই পরলোকগত হন। অতএব, জমিদার-পীড়নে রজি খাঁর কতটুকু হাত ছিল, ইহা চিন্তার বিষয়। বলা বাহুল্য, খাল্‌সা দেওয়ানই রাজস্ববিভাগের কার্যের জন্য দায়ী। তর্কস্থলে যদি স্বীকার করা যায় যে, রজি খাঁ ঐরূপ কোনও অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই প্রবাদ নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা হইলেও কুলি খাঁর স্কন্ধে উহা কিরূপে আরোপিত হইতে পারে, তাহা বিশেষ বোধগম্য হয় না।

বৈকুণ্ঠের স্থাননির্ধারণের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া জিজ্ঞাসু হইলে, পরিহাসরসিক মুর্শিদাবাদবাসী আমার কোনও বন্ধু, মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাবী কিল্লার দক্ষিণ তোরণের নিকট ইহার কাল্পনিক স্থান নির্দেশ করেন। আমি এই কথা সেই পরিহাসচ্ছলেই, যমের দক্ষিণ দ্বারই উহার উপযুক্ত স্থান বলিয়া, তিন বৎসর পূর্বে 'সৎসঙ্গ' মাসিকপত্রে উল্লেখ করি। এক্ষণে দেখিতেছি, আমরাই অনেককে স্বশরীরে 'বৈকুণ্ঠে' লইয়া যাইবার প্রথম পথপ্রদর্শক হইলাম। এই স্থানই প্রকৃত 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া গৃহীত হইতে চলিল। ইতিহাসরসজ্ঞ

দেওয়ান সাহেব এ কথা লইয়া বড়ই হাস্য করিয়াছেন! তিনি বহুদিন অবধি প্রাচীন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার কোনও খোঁজ খবর পান নাই। বাস্তবিক, ব্যক্তিবিশেষের উর্বর মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্যত্র ইহার স্থান অন্বেষণ পণ্ডশ্রমমাত্র। *সাহিত্য, ১৩০৪ মাঘ*

তথ্যসূত্র

১. Journal As. Society—Vols. VII, LXV

২. এই ইতিহাসের একখানি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি শ্রদ্ধেয় বন্ধু ওয়ান ফজলে রবী খাঁ বাহাদুর সংগ্রহ করিয়া আমার হস্তে দিয়াছেন। আরও একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আমরা এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্যে ইহা মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি। গ্রন্থকার আপনার নাম দেন নাই। কিন্তু দেওয়ান সাহেব বলেন, তাহাদের অঞ্চলে লোকপরম্পরায় প্রবাদ যে, ইহা মুর্শিদাবাদের ফতেসিংহ পরগণার সুজাউদ্দীন নামক জনৈক মুন্সীর রচিত। আমাদের সংগৃহীত একখানি গ্রন্থ, জেলা বর্ধমানের অন্তঃপাতী গণ্ডগ্রাম মঙ্গলকোটের সেখ নজিবুল্লা ১১৯৪ সালের ২১ ফাল্গুন তারিখে বাবু সুখলালের জন্য নকল করেন। গ্লাডউইনের অনুবাদও ঠিক এই সময়ে প্রকাশিত হয়, দেখা যাইতেছে। এই অনূদিত গ্রন্থও এদেশে দুর্লভ। মহাত্মা বেভারিজ সাহেব বিলাত হইতে লেখককে তাহার নিজ খণ্ড পাঠাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। ১৭৮৮ সালের 'এশিয়াটিক মিস্‌লেনী'তে এই গ্রন্থ ও ইহার আনুমানিক গ্রন্থকারের বিবরণ কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এই প্রাচীন পত্রিকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয় জানাইলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

৩. Fifth Report ; New Fe, vol I. p. 260.

৪. Fifth Report ; p. 261

৫. ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত; ১০৪ পৃঃ।

৬ Stewart, 2nd Ed. p. 246

বঙ্গদেশের
ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত আইনের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সাতকড়ি হালদার

উৎসর্গ

এই পুস্তকখানি
মেদিনীপুরের জজ,
মাননীয় শ্রীযুক্ত জে. প্রাট, বি,এ,সি,এস,
ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল
সাহেব বাহাদুরের করকমলে
যথাবিহিত সম্মান সহকারে
সমর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক পূর্বাপর আইন সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় কোন ইতিহাস দৃষ্ট হয় না। এতৎ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থাকা আবশ্যক বিবেচনায় আমি ইহা লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে অতি পূর্বকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজি ভাষায় লিখিত আইন সম্যকরূপে বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে সকল সময় বিশুদ্ধ ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখা দুরূহ; এই হেতু এই পুস্তকের কোন কোন স্থলে ভাষার পরিপাট্য সম্বন্ধে ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যাহাতে সর্বসাধারণের সহজে বোধগম্য হয় কেবল সেইরূপ ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সাধারণের কোন উপকার সাধিত হইলে আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব।

গ্রন্থকার

আমাদের দেশে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন কোনমতে সহজ বলিয়া অনুমান করা যায় না। ইহার কতকগুলি বিধান ইউরোপ হইতে অনুকরণ করা হইয়াছে, ওই সকল বিধান এদেশে পূর্বে প্রচলিত না থাকায় তাহা সাধারণ লোকের সহজে বোধগম্য নহে। অপর দিকে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ সতত দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন বিধান বর্তমান আইনে স্পষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয় নাই; কেবলমাত্র দেশীয় প্রচলিত প্রথানুসারে সেই সকল বিষয় নির্ধারিত হইবে এরূপ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এইরূপ বিধানকে কোনরূপ সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত বলা যাইতে পারে না। কিন্তু বর্তমান প্রজাস্বত্ত্ব বিষয়ক আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ যেরূপ অনির্দিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা অবস্থায় ছিল তাহা সম্যক না হোক অধিক পরিমাণে বর্তমান আইনের দ্বারা যে নির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে যে বিষয়ে বর্তমান আইনকে অসম্পূর্ণ বলা যায় ও যে যে বিধান বিদেশীয় বলিয়া দৃষ্ট হয় তৎসমুদয় যথা স্থলে বর্ণিত হইবে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে পরস্পর স্বত্ব সম্বন্ধে কিরূপ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হইয়া আসিতেছে এবং বর্তমান আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে ইহা কিরূপ ছিল ও এক্ষণে কিরূপ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রধান প্রধান বিষয় বর্ণনা করা ও যাহাতে পাঠকবর্গ এতৎসম্বন্ধে পূর্বাপর সমুদয় আইন পাঠ না করিয়া থাকিলেও জমিদার এবং প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আবশ্যকীয় বিধানগুলি জানিতে পারেন এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশ করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব সময়ে প্রজাস্বত্ব কিরূপটি ছিল এবং পরে ইংরেজ রাজত্ব সময়েই বা কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

হিন্দুরাজত্ব

হিন্দুরাজত্ব সময়ে প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে কী কী বিধান ও কীরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া এক্ষণে সুকঠিন। বঙ্গদেশে আজকাল যে জমিদারশ্রেণি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎকালে এইরূপ স্বত্ববিশিষ্ট কোন শ্রেণির লোক ছিল না[১]; রাজা বা স্টেট (State) ও কৃষক শ্রেণি ছাড়া মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট কোন শ্রেণির প্রজা তখন ছিল না। তৎকালে ভূমির মালিকি স্বত্ব (যাহাকে ইংরাজিতে Proprietory Right বলে) রাজাতেই ছিল। কেহ কেহ তর্ক.করিয়া থাকেন যে মনু বলিয়া গিয়াছেন "যে ব্যক্তি জঙ্গল কাটিয়া জমি কৃষির উপযুক্ত করে জমি তাহারই হয়[২]; এজন্য কৃষকেরা জমির মালিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।" কিন্তু যখন কৃষকেরা জমিতে শস্যাদি আবাদ করিতে ত্রুটি করিলে তাহাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবার বিধান ছিল, তখন তাহাদিগকে ভূমির মালিক বলা যাইতে পারে না। এস্থলে কৃষকদিগের উক্ত জমি আবাদমাত্র করিবার স্বত্ব থাকায় উক্ত বিধান দ্বারা অনুমিত হয়।

কৃষকেরা তৎকালে স্ব স্ব ভূমিজাত উৎপন্নের নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব স্বরূপ রাজাকেই দিত। মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট কোন শ্রেণির লোককে দিত না। মনুসংহিতা হইতে পাওয়া যায় সে রাজা ধান্যদি শস্য বিষয়ক কর ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি ও পরিশ্রমের নূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া ষষ্ঠ বা অষ্টম অথবা দ্বাদশ অংশের একাংশ লইতেন[৩]। ইহাও দেখা যায় যে যুদ্ধাদি আপৎকালে রাজা ধান্যাদির চতুর্থ ভাগ পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এইরূপ বিধান ছিল[৪]। উক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য ও রাজ্য শাসন নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রামে কয়েকজন করিয়া রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। তৎকালে গ্রাম্যশাসন প্রণালী ও রাজস্ব আদায়ের জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল তাহা কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক. প্রত্যেক গ্রামের এক এক অধিপতি ছিলেন, তাহার উপর দশগ্রামের অধিপতি ও তদুপরি বিংশতি গ্রামের, শত গ্রামের ও সহস্র গ্রামের অধিপতি ছিলেন[৫]। গ্রাম্য লোকেরা, প্রতিদিন রাজাকে যে অন্নদি প্রদান করিবে তাহা এক গ্রামাধিপতি পাইবেন[৬]; দুইটি হলদ্বারা যে ভূমি কর্ষণ করা যাইতে পারে দশ গ্রামাধিপতি, তাহা পাইবেন; এবং বিংশতি গ্রামাধিপতি তাহার পাঁচ গুণ ভূমি, ও গ্রামশতাধ্যক্ষ একটি মধ্যবিধ গ্রাম, আর সহস্র গ্রামের অধিপতি একটি নগর প্রাপ্ত হইবেন এইরূপ বিধান মনুসংহিতায় পাওয়া যায়।

সচরাচর যাহা আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে অর্ধ শতাব্দীর পূর্বে গ্রাম্য প্রণালী যেরূপ ছিল, অতি পুরাকালেও তদ্রূপ ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রামে নিম্নলিখিত কর্মচারি ছিলঃ—

১। গ্রামাধিপতি মণ্ডল বা প্রধান
২। পাটওয়ারি ও কানোঙ্গ
৩। চৌকিদার
৪। পুরোহিত
৫। গুরুমহাশয়
৬। গণক

৭। কুম্ভকার
৮। সূত্রধর
৯। কর্মকার
১০। রজক
১১। নাপিত
১২। রাখাল
১৩। বৈদ্য
১৪। গায়ক
১৫। কবি

এই সকল কর্মচারিদিগের ব্যবসা তাহাদের স্ব স্ব পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল এইরূপ দেখা যাইত, এবং এখন পর্যন্ত অনেক স্থলে এইরূপ দেখা যায়। এই জন্যই এই প্রথা হিন্দু প্রথা বলিয়া অনুমিত হয়, কেন না এক ব্যবসা পুরুষানুক্রমে একবংশেই প্রচলিত থাকা হিন্দুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ও মুসলমানদিগের স্বভাববিরুদ্ধ। এইসকল কর্মচারিদিগের মধ্যে প্রথম কর্মচারি অর্থাৎ মণ্ডলের সহিত আমাদের বর্তমান রাজস্ব বিষয়ে সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ও অনাবশ্যক। তজ্জন্য সেই কর্মচারির বিষয়ই আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব। গ্রামের মধ্যে কোন প্রজা কত জমি রাখে ও তাহাকে কত রাজস্ব দিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করা, রাজার জন্য রাজস্ব আদায় করা এবং তন্নিমিত্ত প্রজাদিগের শস্যাদি পরিমাপ ও বিভাগ করান মণ্ডলদিগের কার্য ছিল। মণ্ডলগণ রাজার প্রাপ্য শস্যাদির অংশ আদায় করিয়া তাঁহাদিগের উপরিস্থ কর্মচারিদিগের নিকট পাঠাইতেন, এবং কখন কখনও বা রাজার প্রাপ্য ধান্যাদি গ্রামের মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাইতেন তাহা রাজসরকারে প্রেরণ করিতেন। মণ্ডলেরা রাজার পক্ষে এইরূপ কার্য করা হেতু তাহাদিগের স্ব স্ব ভূমির জন্য অন্যান্য প্রজা অপেক্ষা কম রাজস্ব আদায় দিতেন ও কয়েক বিঘা জমি বাগানের নিমিত্ত বিনা করে পাইতেন[৭]। মণ্ডলেরা কেবল রাজকর্মচারি ছিলেন এরূপ নহে তাহারা অপর দিকে সমুদয় গ্রামের কর্মচারি ছিলেন বলা যাইতে পারে। গ্রামের সাধারণ সকল বিষয়েই তাহারা তত্ত্বাবধান করিতেন এবং সাধারণ খরচের জন্য কোন প্রজাকে কত দিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিতেন। এই সকল কার্যের নিমিত্ত তাহারা রাজবৃত্তি ছাড়া গ্রামের প্রজাদিগের নিকট কিছু কিছু পাইতেন। এইরূপে মণ্ডলেরা তৎকালে গ্রামের নেতা ছিলেন এবং অনেক স্থলে তাহারা মুসলমানদিগের আমলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক "জমিদার" শ্রেণিভুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুরাজত্বকালে যেমন মধ্য-স্বত্ববিশিষ্ট কোন শ্রেণির প্রজা থাকা দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ বর্তমান সময়ের ন্যায় নানা প্রকার স্বত্ববিশিষ্ঠ প্রজাদিগের বিবিধ শ্রেণিও ছিল না। তৎকালে প্রজাগণ কেবল তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যথা—

১। যে সকল প্রজা গ্রামের আদিমবাসী কিম্বা আদিমবাসীর বংশজাত থাকিয়া স্ব স্ব গ্রামের জমি চাষ করিত।

২। যে সকল প্রজা আদিমবাসী কিম্বা তদ্বংশজাত ছিল না; পরে আসিয়া কোন গ্রামে বসবাস করিয়া সেই গ্রামের জমি চাষ করিত।

৩। যে সকল প্রজা নিকটবর্তী কোন গ্রামবাসী হইয়া অপর গ্রামের জমি চাষ করিত।

এই তিন শ্রেণির মধ্যে প্রথম শ্রেণির প্রজাগণকে "খোদকস্তা" ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির প্রজাগণকে "পাইকস্তা" বলিত। "পাইকস্তা" শব্দের মূল অর্থ ধরিতে গেলে ইহা কেবল তৃতীয় শ্রেণির প্রজা সম্বন্ধেই প্রকৃত পক্ষে প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় শ্রেণির প্রজাকেই "পাইকস্তা" বলিয়া অভিহিত করার প্রথা ছিল।

এক্ষণে এই তিন শ্রেণির প্রজাগণের কীরূপ স্বত্ব ছিল তৎসম্বন্ধে নিম্নে বলা যাইতেছে।

খোদকস্তা প্রজারা দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ছিল, তাহারা যতকাল জমির খাজনা দিতে থাকিত ততকাল তাহারা তাহাদিগের জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিত। এবং উক্ত জমি হইতে রাজা তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাদিগের স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য ছিল কিনা তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে জমি হস্তান্তর করার প্রথা প্রবল ছিল না, কেননা তদ্বারা বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সেই সময় প্রজার সংখ্যা কম, কিন্তু কৃষি উপযুক্ত জমি অধিক ছিল; তজ্জন্য হস্তান্তর দ্বারা বিশেষ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ লাভের সম্ভাবনা বেশি না থাকায় হস্তান্তর খুব কম ছিল। একারণ তৎসম্বন্ধে কিরূপ স্বত্ব ছিল তাহা এক্ষণে নির্ধারণ করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন সমুদায় গ্রামস্থ প্রজাবর্গের সম্মতি বিনা কোন প্রজা তাহার যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না[৮]। এই শ্রেণির প্রজাদিগের নিরিখ বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত না। তাহারা দেশের প্রচলিত হারে খাজনা দিত। কিন্তু সকলেই স্ব স্ব জমিতে কৃষিকার্য করিতে ও তাহার রাজস্ব আদায় দিতে বাধ্য ছিল, নচেৎ তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিবার[৯] কিম্বা নির্ধারিত খাজনা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দণ্ডিত করিবার বিধান ছিল[১০]। যদি রাজস্ব অনাদায়ের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্য করিতে না পারা হেতু তাহারা জমি হইতে বঞ্চিত হইত, কিম্বা যদি কোন কারণে নিজের ইচ্ছায় জমি ছাড়িয়া দিত এবং যদি এই খোদকস্তা প্রজারা বা তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ পরে কোন কালে পুনরায় ঐ সকল জমি লইতে ইচ্ছা করিত তাহা হইলে যে ব্যক্তির হস্তে ঐ জমি সেইসময়ে থাকিত তাহাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া পুনরায় তাহারা তাহা নিজ অধিকারে লইতে পারিত। ২য় শ্রেণির প্রজাদের স্বত্ব ১ম শ্রেণির প্রজাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। তাহারা রাজস্ব আদায় না দিলে কিম্বা জমিতে উপযুক্ত ধান্যাদি উপজাত না করিলে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত। কিন্তু ১ম শ্রেণির প্রজাদের ন্যায় তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদের যোত পুনরায় ফিরিয়া পাইতে পারিত না। ইহাদিগের যোত পুরুষানুক্রমে ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল কিন্তু হস্তান্তর করিবার কোন স্বত্ব তাহাদের ছিল না।

তৃতীয় শ্রেণির প্রজারা ইচ্ছাধীন প্রজা ছিল মাত্র। তাহাদিগের সহিত সাধারণত প্রত্যেক বৎসর বন্দোবস্ত করা হইত। কিন্তু কখনও কখনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত করা হইত। যদিও এই শ্রেণির প্রজাদের কোন রূপ দখলী স্বত্ব ছিল না তথাপি তাহাদিগকে শস্যাদি রোপণ ও কর্তন সময়ের মধ্যে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত না।

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুরাণী দাসী বনাম বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৩ বালাম উইকলি রিপোর্টার ১০ আইন, পৃষ্ঠা ২৯, জজ ট্রোভার সাহেবের রায় দেখ। (See judgement of Justice Trover 3 W.R. page 29. Thakooranee Dassi v Bisseswer Mookerjee).

২. "পৃথরোপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ব বিদো বিদুঃ।
স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগং।"
Manu, Chapter, IX, S 44, মনু ৯ অধ্যায় ৪৪ শ্লোক।

৩. পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।

ধান্যনামষ্ঠমোভাগঃ যষ্ঠোদ্বাদশ এব বা।।
Manu, Chapter. 7.S. 130. মনু ৭ম অধ্যায়, ১৩০ শ্লোক।

৪. "চতুর্থমাদদাণোহণি ক্ষত্রিয়ো ভাগমাপদি।
প্রজা রক্ষণ পরং শক্ত্যা কিল্বিষাৎ প্রতিমূচ্যতে।"
Manu, Chapter 10. S. 118. মনু ১০ম অধ্যায়, ১১৮ শ্লোক।

৫. "গ্রামস্যধিপতিং কুর্য্যাদ্দশ গ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ।।"

৬. "ঘানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপাণেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ।।"
Manu, Chapter 7. S. 118. মনু ৭ম অধ্যায়, ১১৯ শ্লোক।

৭. "দশীকুলন্তু ভূঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতি। পুরুং।।
Manu, Chapter, 7.S. 119. মনু ৭ম অধ্যায়, ১১৯ শ্লোক।

৮. Tagore Law Lectures of 1874-75, pp-15, To 17.

৯. El Phinstone's History of India, p. 73.

১০. ক্ষেত্রিকস্যাত্যয়ে দণ্ডো ভাগাদ্দশগুণো ভবেৎ।
ততোহর্দ্ধ দণ্ডো ভূত্যাণাং জ্ঞানাৎ ক্ষেত্রিকস্য তু।।"
Manu, Chapter, S. 243. মনু ৮ম অধ্যায়, ২৪৩ শ্লোক।

মুসলমান রাজত্ব

মুসলমান রাজত্ব সময়ে প্রথম প্রথম পূর্ব নিয়মানুসারেই রাজস্ব আদায় হইত। কিন্তু রাজ্য যত বিস্তৃত হইতে লাগিল ততই প্রত্যেক গ্রাম হইতে মণ্ডলের দ্বারা রাজস্ব আদায় করা অসুবিধা হইতে লাগিল, এজন্য কতকগুলি গ্রাম একত্রিত করিয়া কোন এক ব্যক্তির উপর রাজস্ব আদায়ের ভার কোন কোন স্থলে অর্পণ করা হইত। এই সকল ব্যক্তি রাজস্ব আদায়ের খরচা বাদে তাহাদের নির্দিষ্ট অংশ মুনাফা স্বরূপ রাখিয়া বাকি রাজস্ব স্বরূপ রাজ সরকারে পাঠাইতেন। কোন কোন স্থলে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরাজিত রাজগণ তাহাদিগের বিজিত রাজ্য সকলের রাজস্ব এইরূপে বাদশাহের নিকট পাঠাইতেন। অনেক স্থলে আবার পূর্বমত মণ্ডলেরা রাজস্ব আদায় করিতেন। এইরূপে ক্রমশ এই সকল ব্যক্তি দেশের মধ্যে ক্ষমতাবিশিষ্ট হইয়া উঠেন, এবং এইসকল ব্যক্তি হইতেই "জমিদার" শ্রেণির উৎপত্তি হয়। মুসলমান রাজত্বকালে জমিদাররা কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে জমির মালিক ছিলেন না। তাহাদিগকে মুসলমান বাদশাহেরা কখনও জমির মালিক বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করেন নাই। লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার পূর্বে তাহাদের স্বত্ব যেরূপ ছিল তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে।

তৎকালে জমিদারি স্বত্ব আজকালের মত উত্তরাধিকারী ক্রমে জমিদারগণ ভোগ দখল করিতে পারিতেন বটে কিন্তু জমিদারদিগের মৃত্যু হইলে তাহাদের ওয়ারিসগণ বাদশাহকে পেস্কাস ও নবাবকে নজরানা দিয়া সনন্দ না লইয়া জমিদারি অধিকার করিতে পারিতেন না। কিম্বা সরকারের পূর্ব অনুমতি বিনা তাহাদের জমিদারি তাহারা দান, বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। রায়ত ও অন্যান্য, প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করার ভার তাঁহাদের উপর ছিল, কিন্তু প্রতি বৎসর রায়তদিগের মালগুজারী সরকারের কর্মচারি দ্বারা ধার্য হইয়া জমিদারগণের সহিত প্রত্যেক বৎসর নূতন বন্দোবস্ত করা হইত; এবং রায়তদিগের আবাদি ফি বিঘায় যে জমা ধার্য হইত তাহা তহশীল খরচা বাদে ১১ ভাগে বিভক্ত হইয়া ১০ ভাগ সরকারে রাখিয়া ১ ভাগ জমিদারকে দেওয়া হইত। জমিদারগণ ইহাতে অস্বীকৃত হইলে তাহাদের জমিদারি সরকার হইতে খাস হইত, এবং এইরূপ খাস হইলে জমিদারকে উপরিউক্ত ১১ ভাগের ১ ভাগ কিম্বা সরকারের হুকুম মতে যে অংশ তাহার প্রাপ্য ধার্য হইত তাহা দেওয়া হইত; কিম্বা সরকারি কর্মচারি দ্বারা মালগুজারি আদায় হইত[১]। কোন কোন স্থলে জমিদারকে মুনাফার পরিবর্তে জায়গির বা আলতজগা স্বরূপ কতক নিষ্কর জমি ভোগ দখল করিতে দেওয়া হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে জমিদারগণকে স্ব স্ব জামিদারির মধ্যে সুবাদার যে সকল আবাবাদিধার্য করিতেন তাহা তোডরমলের বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে হারারি মতে প্রজাগণ হইতে আদায় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। জমিদারের মিয়াদের মধ্যে

কোন উপরি লাভ হইলে তাহা পাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহারা আয়ের প্রকৃত হিসাবে দাখিল করিতে বাধয ছিলেন[২]।

তোডরমলের বন্দোবস্ত ঃ—মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে মধ্যে মধ্যে যে সকল রাজস্ব সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল তন্মধ্যে আকবর বাদশাহের সময়ের বন্দোবস্ত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অধিককাল স্থায়ী ছিল। ইহা ইংরাজ রাজত্বের প্রাক্কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, আকবর এই বন্দোবস্তের ভার রাজা তোডরমলের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তোডরমল প্রথমত জমির পরিমাণ ঠিক করেন, পরে জমির উৎপাদিকা শক্তি বিশেষে জমি ৩ ভাগে বিভক্ত করেন। এবং এইরূপ তিন রকম জমির প্রত্যেক বিঘাতে কিরূপ শস্য কী কী পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারিত তাহা নির্ধারণ করিয়া গড়পড়তা ঠিক করিতেন এবং উক্ত গড়পড়তার $\frac{১}{৩}$ অংশ অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ রাজার প্রাপ্য বলিয়া ধার্য করিয়াছিলেন। যথা, যদি গমের জমির রাজস্ব ধার্য করিতে হইত তাহা হইলে গমের জমির উৎপাদিকা শক্তিবিশেষে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক রকমের জমির প্রতি বিঘার উৎপন্ন ধার্য করিতে হইত।

মনে কর—

গম	১ম	শ্রেণির	গমের	জমিতে	ফি	বিঘায়	১৮	মান	হইত।
”	২য়	”	”	”	”	”	১২	”	”
”	৩য়	”	”	”	”	”	৮	মান	৩৫ সের
						মোট	৩৮	মান	৩৫ সের

এই মোট সমষ্টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গড়পড়তা ধার্য হইত, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্ত ফি বিঘার গমের জমিতে ১২ মান ৩৮।।০ সের গড়পড়তা গমের উৎপন্ন ধার্য হইত। পরে ইহাকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ রাজার প্রাপ্য বলিয়া ধার্য হইত, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তে এইরূপে প্রতি বিঘাতে রাজার প্রাপ্য গম ৪ মান/ ১২।।০ সের ধার্য হইত। সেইরূপ যদি যে জমিতে তুলা জন্মে তাহার রাজস্ব ঠিক করিতে হইত তাহা হইলে প্রথমত তুলার জমির উৎপাদিকা শক্তি বিশেষে তাহা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণির এক বিঘার উৎপন্ন ধার্য করা হইত, পরে তাহাদের সমষ্টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ গড়পড়তা ঠিক হইত, ইহাকে পরে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ রাজস্ব স্বরূপ ধরা হইত। এইরূপে শস্যাদির অংশ রাজস্ব স্বরূপ নির্ধারিত হইলে তাহার দাম টাকাতে ধার্য করা হইত। কিন্তু কোন প্রজা যদি উক্ত টাকার পরিমাণ অধিক বিবেচনা করিত তাহা হইলে তাহার শস্যাদির অংশ যাহা রাজস্ব স্বরূপ ধার্য করা হইত তাহা সে শস্যাদি দ্বারা আদায় দিতে পারিত। এইরূপ বন্দোবস্ত প্রথমত প্রজাদিগের সহিত সন সন করা হইত; কিন্তু পরে ইহা অসুবিধাজনক বিবেচিত হইলে পূর্ব দশ বৎসরের গড়পড়তা হিসাবে দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করার নিয়ম হইয়াছিল[৩]। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে তোডরমলের এই বন্দোবস্ত প্রথম প্রচারিত হয়। মুসলমানদিগের সময়ে রায়তেরা যতদিন নির্ধারিত কর আদায় দিতে থাকিত ততদিন তাহাদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত না।[৪]।

পূর্বে বলা হইয়াছে মুসলমান বাদশাহের সময়ে জমিদারেরা কখনও জমির মালিক

প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন না। তাহারা কেবল রাজস্ব আদায়ের জন্য একরকম রাজকর্মচারি ছিলেন মাত্র। প্রজাদিগের উপব যে রাজস্ব রাজকর্মচারি দ্বারা ধার্য হইত তাহা হইতে জমিদারেরা তাহাদের প্রাপ্য বাদ রাখিয়া রাজকোষে বাকি সমুদায় প্রেরণ করিতেন। কিন্তু মোগল রাজত্বের শেষ অবস্থায় বাদশাহের প্রভুত্ব যখন কমিয়া আসিয়াছিল, তখন জমিদারগণ তাহাদের ইচ্ছামত রাজস্ব পাঠাইতেন এবং প্রজাদিগের নিকট নির্ধারিত রাজস্ব অপেক্ষা নানারকমে অধিক পরিমাণে কর আদায় করিতেন। এইরূপ উৎপীড়ন ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রবল হইয়া উঠে যে প্রজারা অবশেষে জমিদারকেই তাহাদের জমির মালিক বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল।

তোডরমলের নিয়মানুসারে ফি বৎসর প্রজাদিগের দেয় রাজস্বের এক হস্তবুদ প্রস্তুত হইত, এবং উক্ত হস্তবুদ দেখিয়া সরকারের সহিত জমিদারগণের রাজস্ব আদায়ের চুক্তি হইত। তোডরমলের নিয়মানুসারে যে রাজস্ব ধার্য হইত তাহাকে "আসল জমা" বলিত। কিন্তু পরে এই আসল জমার উপর প্রজাগণকে নানা রকম অতিরিক্ত আবাব দিতে হইত। জমিদারেরা অপর দিকে ক্রমে ক্রমে তাহাদের জমিদারি স্বত্ব তাহাদের অধীনে আবার ইজারা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপে জমিদারদিগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া নবাব জাফর খাঁ (অপর নাম মুরশিদকুলি খাঁ) তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারগণকে কেবল রাজকর্মচারি স্বরূপ রাখিবার চেষ্টা করেন। প্রথমত, তিনি জমিদারগণের সমুদয় লাভ সরকারে লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য জমিদারগণের উপর অধিক পরিমাণে আবাব ধার্য করেন। ইহাতে জমিদারেরা অবাধ্য হইয়া উঠিলে তিনি তাহাদিগকে নানা প্রকার উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন ও তাহাদের জমিদারি উচ্ছেদ করিয়া সমুদয় বঙ্গ সুবাকে কয়েকটি বড় বড় চাকলায় বিভক্ত করেন এবং উক্ত চাক্‌লা সমূহের রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে রাজসাহী, নদীয়া ও অন্যান্য বড় বড় জমিদারির সৃষ্টি হইয়াছিল। এবং পুরাতন জমিদার ও মণ্ডলেরা তাহাদের অধীনে কেবল অধীনস্থ তালুকদার কিম্বা অন্য মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাস্বরূপ রহিলেন। জাফর খাঁ এইরূপে জমিদারগণের ক্ষমতা অনেক নষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরে নবাব সুজা খাঁ আবার অনেক জমিদারকে তাহাদের পূর্বতন পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব সুজা খাঁর আমল হইতে ক্রমে নবাবের ক্ষমতা যত দুর্বল হইতে লাগিল জমিদারগণ ততই প্রবল হইতে লাগিলেন, এবং তাহারা পুনরায় ক্রমে ক্রমে জমিদারি উত্তরাধিকারী সূত্রে ভোগদখল করিবার ও তাহাদের অধীনে বন্দোবস্ত দিবার স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। এমনকী ক্রমে ক্রমে জমিদারেরা যাহাদিগকে তাহাদের স্বত্ব ইজারা কি অন্যরকমে বিলি করিতেন তাহারাও আবার তাহাদের অধীনে স্ব স্ব স্বত্ব অপরকে বিলি করিতে লাগিলেন। এইরূপে জমিদার ও প্রজার মধ্যে নানা প্রকার মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার উৎপত্তি হয়[৫]।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে সরকারের রাজস্ব হইতে জমিদারগণ তাহাদের প্রাপ্য মুনাফা কাটিয়া রাখিতেন, কিন্তু ইহা ছাড়া উক্ত রাজস্ব হইতে অন্যান্য অনেক প্রকার সামান্য সামান্য বিষয়ের খরচাও বাদ দেওয়ার নিয়ম ছিল; এই কেল খরচাকে "মজকুরাত" বলিত। এই সকল খরচা নানাপ্রকার ছিল, যথা-জমিদারদিগের দস্তুরাৎ,

মণ্ডল, কানোঙ্গ ও পাটোয়ারীদিগের পাওনা, পাইকান, কয়ালী, রাস্তামেরামত ও অন্যান্য দে খরচা ছিল। ইহা ব্যতীত অনেক স্থলে ধর্মসম্বন্ধীয় নানা খরচ বাদ দেওয়ারও প্রথা ছিল। যথা,—রোজিনী[৬], খয়রাত[৭], চেরাগী[৮], কুদমরুসুল[৯] ও মেহেরানি[১০] প্রভৃতি। মুসলমান নবাবেরা যখন নির্ধারিত আসল জমা অপেক্ষা অতিরিক্ত টাকা লইতে ইচ্ছা করিতেন তখন তাহারা "আসল" রাজস্ব বৃদ্ধি করিতেন না। অন্য কোন ছল করিয়া অতিরিক্ত ট্যাক্স জমিদারগণের উপর ধার্য করিতেন। এই সকল ট্যাক্সকে আবাব বলিত। এই সকল আবাব নানারকম ছিল, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় চৌথ[১১](ক), ফৌজদারি[১২](খ), বাহাদারী[১৩](গ), জেরমাথট[১৪](ঘ), ফিলখানামাথট[১৫](ঙ), আহক[১৬](চ), খাসনবিসি[১৭](ছ) ও সরিফি সিক্কা[১৮](জ) প্রধান ছিল[১৯](ঝ)।

জমিদারগণের উপর যত আবাব ধার্য হইতে লাগিল অপরদিকে তাহারা আবার রায়তগণের উপর হারাহারি মতে আবাব ধার্য করিতে লাগিলেন। আবার অনেক স্থলে জমিদারেরা তাহাদের উপর যে সকল আবার ধার্য হইত তদপেক্ষা অনেক অতিরিক্ত আবাব রায়তগণের উপর ধার্য করিতেন। নবাব জাফর খাঁর আমলে প্রথম "খাসনবিসি" বলিয়া আবাব সৃষ্ট হয়। তাহার সময় হইতে ক্রমে ক্রমে আবার সকলবর্ধিত হইতে থাকে। নবাব কাশিমালির সময়ে সর্বাপেক্ষা বেশি আবাব ধার্য হইয়াছিল। জাফর খাঁর সময়ে জমিদারগণের দেয় রাজস্ব সর্বশুদ্ধ ১, ৪২, ৮৮, ১৮৬ টাকা মাত্র ছিল। কিন্তু নবাব কাশীমালীর সময়ে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ২, ৫৬, ২৪, ২২৩ টাকা হইয়াছিল[২০]।

তথ্যসূত্র

১. ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেসনের হেতুবাদ (see preamble, Reg,. II of 1793).

২. W arington's Analysis.

৩. Elphinstone's History of India,' Book IX, Chap. III.

৪. Judgment of Justice Komp in the Great Rent case, page 83, 3 W.R. Act X (৩, উইকলি রিপোর্টার ১০ আইন ৮৩ পৃষ্ঠা)।

৫. Tagore Law Lectures, 1874-75 Chapter IV.

৬. দৈনিক দান, ৭-দান। ৮- গোরস্থানে প্রদীপ জ্বালিবার খরচ।

৯. মহম্মদের পদচিহ্ন রক্ষার নিমিত্ত খরচ।

১০. ফকিরদিগকে খাওয়াইবার খরচ।

১১. (ক) মহারাষ্ট্রেরা যখন প্রবল হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন তখন তাহারা রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবি করেন; উক্ত দাবির জন্য তাহাদিগকে মুসলমানেরা উড়িষ্যার অধিকাংশ ছাড়িয়া দেন। উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য নবাব আলিবর্দি খাঁ কর্তৃক এই আবাব ধার্য হয়।

১২. (খ) ফৌজদারি বিচার কার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য এই আবাব হয়।

১৩. (গ) রাস্তা মেরামত খরচকে "রাহাদারি" বলিত।

১৪. (ঘ) নজর পূণ্যাহ, ভায়খেলাত, পুস্তবন্দি ও রুসুমনেজারত এই চারিপ্রকার আবাবকে "জেরমাথট বলিত। জমিদারগণের বাৎসরিক বন্দোবস্তের শেষে রাজকোষসম্বন্ধীয় আমলাগণকে যে টাকা উপহার দেওয়া যাইত তাহাকে "নজর পুণ্যাহ" বলিত। জমিদারগণের জমিদারির বাৎসরিক বন্দোবস্ত সময়ে তাহাদের সম্মানার্থ যে পোষাক সুবাদার কর্তৃক দেওয়া হইত তাহার খরচ নির্বাহার্থ যে আবাব লওয়া হইত তাহাকে "ভায়খেলাত" বলিত। মুর্শিদাবাদের কেল্লা ও লালবাগের নিকট নদীর বাঁধ মেরামতের খরচ দরুন আবাবকে

"পুস্তবন্দি" বলিত। জমিদারেরা মফঃস্বল হইতে রাজস্ব রাজকোষে আনিতে হইলে যে উপহার নাজীর জমাদারকে দিতেন তৎপরিবর্তে "রুসুম নেজারত" আবার ধার্য করা হয়। ইহার হার ফি হাজার টাকার দশ আনা ছিল।

১৫. (ঙ) মফঃস্বল হইতে হাতিতে করিয়া রাজস্ব আনা হইত; হাতি সকলের খোরাকের জন্য "ফিলখানা মাথট" আবার ধার্য হয়।

১৬. (চ) শ্রীহট্ট হইতে চুন আনার ব্যয় নিবাহার্থ "আহক" আবাব ধার্য হয়। পূর্ব রাজধানী গৌড়নগর ধ্বংস করিতে ও তথা হইতে একপ্রকার মার্জিত ইষ্টক আনিবার খরচ জন্য "কিম্মত খেস্ত গৌড়" বলিয়া এক আবাব ছিল তাহাও আহকের ভিতরে ধরা হইত।

১৭. (ছ) জমিদারদিগের বাৎসরিক বন্দোবস্তের সময়ে সরকারি "একাউন্টেন্ট"কে যে উপহার দেওয়া হইত তাহাকে "খাসনাবিসি" বলিত। পরে দিল্লির বাদশাহের নিকট বাৎসরিক পর্বোপলক্ষে যে নজরানা পাঠাইতে হইত তজ্জন্য যে আবাব ধরা হইত তাহাও ইহার ভিতর ছিল।

১৮. ভিন্ন ভিন্ন টাকশালে মুদ্রা প্রস্তুত হওনের জন্য যে ক্ষতি হইত তাহা পূরণের নিমিত্ত "সরিফি সিক্কা" ধার্য হইয়াছিল।

এই সকল আবাবের মধ্যে "খাসনবিসি" জাফর খাঁ নবাবের আমলে ও "জের মাথট", "ফৌজদারি", "ফিলখানা মাথট" সুজহা খাঁ নবাবের আমলে এবং "মহারাষ্ট্রীয় চৌথ", "আহক" আলিবর্দি খাঁ নবাবের আমলে আরও "সরিফি সিক্কা" কাশীমালী নবাবের আমলে সৃষ্ট হয়।

১৯. Tagore Law Lectures, 1874-75, Chapter VI.

২০. Field's Regulations, Introduction.

২১. উড়িষ্যা দ্বারা এই সময়ে কেবল রূপনারায়ণ নদী ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে বুঝিতে হইবে। এখন যাহাকে উড়িষ্যা বলে তাহা ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ইংরেজদিগের অধিকৃত হয় নাই। Bengal Administration Report, 1872-73, Pages 83, 40.

ইংরাজ-রাজত্ব

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশে কী প্রকার ক্রমে ক্রমে আধিগত্য বিস্তার করিলেন তাহা এস্থলে বিবৃত অনাবশ্যক। তবে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট তারিখে তাহারা বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার[২১] দেওয়ানি প্রাপ্ত হন এবং তদবধি তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত প্রদেশ সমূহের কর গ্রহণকারী ভূস্বামী হইয়াছিলেন। উক্ত দেওয়ানির জন্য ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সালিয়ানা ২৬ লক্ষ টাকা দিল্লির বাদশাহকে দিতেন তদ্ভিন্ন নিজামতের খরচ নির্বাহ করিতেন। ইতিপূর্বে মুর্শিদাবাদের সুবাদার দিল্লির বাদশাহগণের দেওয়ান ও নাজিম উভয়ই ছিলেন। ইংরেজরা দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে মুর্শিদাবাদের নবাব কেবল নবাব নাজিম স্বরূপ রহিলেন। দেওয়ানি প্রাপ্তির সময়ে মীরজাফরের পুত্র নদজম্‌উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন; তাহাকে ইংরেজরা নিজামতের খচর নির্বাহার্থ সিক্কা ৫৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ১ শত ৩১ টাকা সালিয়ানা দিবার অঙ্গীকার করেন। তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮ শত ৫৪ টাকা তাহার পদমর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত অশ্বারোহী সিপাহি প্রভৃতির জন্য দেওয়া হইত। নদজমউদ্দোল্লার মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতা সয়েফউদ্দৌল্লা নবাব হন। তাঁহার সহিত মোট ৪১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৩১ টাকা ইংরেজরা দিবার চুক্তি করেন। পরে (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে) তাহার মৃত্যু হইলে তাহার নাবালক ভ্রাতা মবারকউদ্দৌলা নবাব নাজিমের পদে অভিষিক্ত হন এবং তাহার সহিত মোট ৩১ লক্ষ ৮১ হাজার ৯ শত ৯১ টাকার চুক্তি হয়। পরে (১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে) কোর্ট অফ ডিরেক্টর উক্ত টাকা আরও কমাইয়া নবাব নাজিমের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা ধার্য করেন এবং তদবধি উক্ত টাকা মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম ও তার পরিবারবর্গ বরাবর পাইয়া আসিতেছিলেন[১]। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব হইতে "নবাব আজিম" খেতাব তুলিয়া লইয়া ছিলেন। "মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর" ও "আমির-উল-ওমরা" খেতাব পাইয়াছে। এবং তদবধি তিনি গবর্নমেন্ট হইতে বার্ষিক ২৩০০০ টাকা পেনসন ও কয়েকটি জমিদারির আয় তাহার পদমর্যাদা রক্ষার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পূর্বে যে ২৬ লক্ষ টাকা দিল্লির বাদশাহকে দেওয়ানি প্রাপ্তির সময় দেওয়ার কথা হয় পরে বাদশাহ শাহ আলম মহারাষ্ট্রাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহা বন্ধ করা হয়। কিন্তু পুনরায় তাহাকে মহারাষ্ট্রাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ইংরেজ গবর্নমেন্ট ৬০,০০০ টাকা ও পরে ইহা বৃদ্ধি করিয়া ১,০০,০০০ টাকা, মাসিক পেনসন দিবার বন্দোবস্ত করেন। শাহ আলমের মৃত্যু হইলে আকবর শাহ বাদশাহ হন ও তাহার পরে বাহাদুর শাহ তাহার পদে অভিসিক্ত হন। কিন্তু তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ যোগ দেওয়ায় তাহাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নিকট মতিঝিলে নবাবের সহিত একত্রে পুণ্যাহ

দরবারে বসিয়া লর্ড ক্লাইব ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফ দেওয়ান স্বরূপ বঙ্গ, বেহার, ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রথম গ্রহণ করেন। দেওয়ানি গ্রহণের পরেই ইংরেজ গবর্নমেন্ট পূর্বতন রাজস্ব আদায়ের প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন করেন নাই। প্রথম কয়েক বৎসর পূর্বমত রাজস্ব আদায় চলিতে লাগিল। দুইজন দেশীয় নায়েব দেওয়ান (Deputy Dewan) নিযুক্ত হইয়া রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন মুর্শিদাবাদে ও অপর একজন পাটনায় স্থাপিত হইলেন। মুর্শিদাবাদের নায়েব দেওয়ানের কার্য নবাবের দরবারে ইউরোপীয় রেসিডেন্ট দ্বারা তত্ত্বাবধারিত হইত ও পাটনার নায়েব দেওয়ানের কার্য তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত অপর একজন ইউরোপীয় কর্মচারি (European chief) নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রণালীতে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের কার্য চলিতে লাগিল। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে যে সকল দেশীয় কর্মচারি রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত ছিলেন তাহাদের কর্ম তত্ত্বাবধায়নের নিমিত্ত ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক সুপারভাইজার সকল (supervisors) নিযুক্ত হন। এবং তাহাদিগের উপর ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দুইটি কাউন্সিল (Revenue Councils of Control) একটি মুর্শিদাবাদে ও একটি পাটনায় স্থাপিত হয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের ও পাটনার নায়েব দেওয়ানের পদ তুলিয়া দেওয়া হয় এবং সুপারভাইজারগণকে কলেকটর নাম দেওয়া হয় ও প্রত্যেক কলেক্টরের সহিত একজন করিয়া দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। এবং গবর্ণর, কাউন্সিলের মেম্বারগণও একটি একাউন্টেন্ট জেনারেল (Accountant General) ও কয়েকটি সহকারি (Assistants) লইয়া একটি বোর্ড অফ রেভিনিউ (Board of Revenue) কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং এই সময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় ট্রেজরি (Treasury) এবং এক্সচেকার (Exchequer) আনীত হয়।[১] (Bengal Administration Report, Pages 40 1042)।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ৫ বৎসরের জন্য রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত ইজারদারগণের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়।[১] (Field's Regulations, Introduction, page 70), ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অফ ডিরেক্টরের আদেশ মতে ইউরোপীয় কলেকটরের পদ রহিত হয় ও তৎপরিবর্তে দেশীয় দেওয়ান অর্থাৎ আমিল নিযুক্ত করা হয়। এবং তৎসঙ্গে সমুদয় বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক বিভাগের নিমিত্ত এক একটি প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল Provincial Council স্থাপিত হয়[২]। (এই তিন প্রদেশকে কলিকাতা, বর্ধমান, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও পাটনা এই ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়। Bengal Administration Report, 1872-73 p. 42;) এবং এই সকল কাউন্সিলের উপর উক্ত আমিলগণের কার্যের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত ছিল।

ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এদেশে পূর্বে কেবল বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলেন; এ কারণ দেশীয় রাজস্ব আদায়ের প্রণালী কোন শ্রেণির প্রজার কীরূপ স্বত্ব তৎসমুদয় বিশেষরূপ অবগত ছিলেন না। দেওয়ানি গ্রহণের পর এইসকল বিষয়ে তাহারা বিশেষ মনোযোগ দেন এবং যাহাতে সুচারুরূপে রাজস্ব আদায় ও সকল শ্রেণির প্রজাবর্গের উন্নতি এবং জমির মূল্য বৃদ্ধি হয় তন্নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় অবধারণ করিতে লাগিলেন।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে যে পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার মেয়াদ অতীত

হইলে উক্ত বন্দোবস্ত দ্বারা আশানুরূপ ফল না হওয়ায় তৎপরিবর্তে পুনরায় রাজস্ব আদায়ের জন্য বাৎসরিক বন্দোবস্ত করা হয় এবং এইরূপ বাৎসরিক বন্দোবস্ত কয়েক বৎসর চলিতে লাগিল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল সকল রহিত হইয়া পাঁচজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারি লইয়া কলিকাতায় একটি রেভিনিউ কমিটি (Committee of Revenue) স্থাপিত হয় ও রাজস্ব সম্বন্ধে সমুদয় কার্য এই কমিটির দ্বারা নির্বাহিত হইত। পরে ইহা অসুবিধাজনক বিবেচিত হইলে পুনরায় কলেকটরী পদ সৃষ্ট হয় এবং প্রত্যেক কলেক্টরীতে ৮ লক্ষ টাকার বেশি রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ার আদেশ ছিল না। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন সময়ে উক্ত রেভিনিউ কমিটির পরিবর্তে বোর্ড অফ্ রেভিনিউ (Board of Revenue) স্থাপিত হয়।

উপরি উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে তাহারা প্রথমত, নানাপ্রকার প্রণালী পরীক্ষাস্বরূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঘন ঘন রাজস্ব আদায়ের প্রণালী পরিবর্তন এবং অনিশ্চিত ও সময়ে সময়ে অপরিমিত রাজস্ব ধার্য হেতু রাজস্ব আদায়ের ও প্রজাবর্গের পক্ষে নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতে লাগিল।

১৭৭৫ ও ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাহার কাউন্সিলের সভ্যগণ জমিদারগণের সহিত তাহাদের জীবন কাল পর্যন্ত অথবা চিরস্থায়ীভাবে রাজস্ব ধার্য করিবার বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করেন। অবশেষে তাহাদের সহিত আজীবন বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কোর্ট অফ ডিরেক্টরের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করেন। কিন্তু কোর্ট অফ ডিরেক্টর তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন নাই। পরে পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক বোর্ড অফ কন্ট্রোল (Board of Control) স্থাপনের অব্যবহিত পরে ও লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্নর জেনারল নিযুক্ত হইয়া আসিলে পার্লিয়ামেন্টের আদেশ অনুসারে রাজা, জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য দেশীয় প্রজাবর্গের নিকট হইতে যাহাতে ন্যায় মতেও সচারুরূপে কর ও রাজস্ব আদায় হয় তৎসম্বন্ধে স্থায়ী নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার জন্য কোর্ট অফ ডিরেক্টর গবর্নর জেনারেলের নিকট হইতে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিখে বিস্তারিত রিপোর্ট চাহিয়া পত্র লিখেন। এবং উক্তপত্রে পূর্ব পূর্ব বৎসরের দেয় রাজস্ব বিবেচনা করিয়া যাহাতে জমিদারগণের উপর ন্যায্য ও পরিমিত রাজস্ব ধার্য হয় (অর্থাৎ যাহা দিতে জমিদারগণ তাহাদের অধীনস্থ প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিবার কোন অছিলানাপান) তদ্রূপ রাজস্ব ধার্যের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত ও উক্ত বন্দোবস্ত জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য করিবার আদেশ পাঠান হয়। কোর্ট অফ ডিরেক্টরের আদেশানুসারে এদেশে পূর্বাপর রাজস্ব সম্বন্ধে ও তাহা আদায়ের প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া কলেক্টর প্রভৃতি রাজ-কর্মচারীগণ রিপোর্ট দেন এবং ঐ সকল তদন্তের ফল একত্রিত করিয়া মিস্টার সোর সাহেব ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুন তারিখে একটি অতি সুন্দর মিনিট লিখিয়া গবর্নমেন্টের নিকট পাঠান। পরে বেহারের রাজস্ব সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি মিনিট ও অন্যান্য উপরোক্ত রিপোর্টাদি বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়া গবর্নর জেনারল দশশালা বন্দোবস্ত (Decennial Settlement) সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রকাশিত করেন। ইহা দ্বারা বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা দেশের তত্তৎ প্রদেশের

প্রচলিত ১৭৯৭ সালের প্রথম হইতে ১০ বৎসরের জন্য রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত ধার্য হয়। এবং ইহার সহিত ইহাও প্রচারিত হয় যে কোর্ট অফ ডিরেক্টর অনুমোদন করিলে যে রাজস্ব জমিদারগণের সহিত ধার্য করা হইল তাহা চিরকালের জন্য ধার্য থাকিবে ও তৎসম্বন্ধে পরে কোন পরিবর্তন হইবে না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের উক্ত প্রস্তাব কোর্ট অফ ডিরেক্টর অনুমোদন করিলে পর ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে দশশালা বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারগণের যে সকল দেয় রাজস্ব ধার্য হইয়াছিল সেই সকল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপে পরিণত হইল বলিয়া এক ঘোষণা-পত্র গবর্ণর জেনারল কর্তৃক প্রচারিত হয়। দশশালা বন্দোবস্তের নিয়মাবলী পরে সংশোধিত হইয়া ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ রেগুলেসন ভুক্ত হয় ও উক্ত ঘোষণা পত্র ঐ খিস্টাব্দের ১ মে তারিখের ১নং রেগুলেসন ভুক্ত হয়।[২]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা যে সকল প্রধান প্রধান স্বত্ব জমিদারগণ লাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

১। জমির মালিকিস্বত্ব (Proprietory Right) জমিদারগণকে দেওয়া হয়[ক]।

২। জমিদারগণের সহিত যে সকল রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হইল তাহা চিরকালের জন্য স্থিরতর রাখা গেল[খ]।

৩। ভূম্যধিকারীগণ নিজ ইচ্ছা ক্রমে সরকারের বিনা অনুমতিতে কোন প্রচলিত আইন বিরুদ্ধ না হইলে নিজ নিজ জমিদারি দান, বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

৪। জমিদারেরা তাহাদের জমিদারির মধ্যে তালুকদার, ইস্তমররিদার বা অন্য কোন বিশেষ পাট্টাদারগণের দখলি জমি ভিন্ন বাকি সমুদয় জমি নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন করারে পত্তন করিতে পারিবেন।[গ]

৫। নূতন আবাদ পত্তনের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব জমিদারগণকে দিতে হইবে না।[গ]

একদিকে গবর্ণমেন্ট যেমন জমিদারগণের স্বত্ব বর্ধিত করিয়াছিলেন অপর দিকে আবার যাহাতে রায়তগণের স্বত্ব বজায় থাকে ও যাহাতে তাহাদের উপর কোন অত্যাচার না হয় তৎসম্বন্ধে ও তৎকালে নানা বিধান করিয়াছিলেন। এবং ভবিষ্যতে তৎসম্বন্ধে যদি অপর কোন আইন জারি করিবার আবশ্যক হয় তাহা প্রচার করিবার ক্ষমতাও নিজ হস্তে স্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।[১]

উক্ত বিধান সমূহের প্রধান প্রধান কয়টি এই স্থলে দেওয়া গেলঃ—

১। তৎকালে আসল জমা ব্যতীত যে সকল নানাপ্রকার আবাব, মাথট বলিয়া টাকা রায়তগণের নিকট হইতে লওয়া হইত তৎসমুদয় একত্রিত করিয়া আসল জমা ধার্য করা হয়।[ক]

২। জমিদারগণ নূতন কোন আবাব কি মাথট রায়তগণের উপর ধার্য করিতে পারিবেন না ও তাহা গ্রহণ করিলে দণ্ডিত হইতে হইবে।[খ]

৩। রায়তগণকে তাহাদের জমার জমির ও খাজনার পরিমাণ কিম্বা অবস্থানুসারে

(ক) S 9 of Reg I of 1793, (খ) S.52 of Reg viii of 1793, (গ) S. 7 of Reg I of 1793.
(১) S. 8 of Reg. I of 1793, (ক) S.54 of Reg viii of 1793, (খ) S. 55 of Reg viii, 1793.

খাজনার নিরিখ এবং অন্যান্য স্বত্ব স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করতঃ জমিদারগণ পাট্টা দিবেন। এবং রায়তেরা তাহাদের স্ব স্ব জমিতে ইচ্ছানুসারে যে কোন শস্য উৎপন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু যে স্থলে শস্য অনুসারে পাট্টা বদলের দেশীয় প্রথা ছিল সে স্থলে জমিদার ইচ্ছা করিলে কি শস্য উৎপন্ন করিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া পাট্টা দিতে পারিতেন এবং ইহার সহিত অঙ্গীকর করিতে হইত যে রায়ত উক্ত শস্য চাষ না করিয়া অপর শস্য চাষ করিলে তাহার বন্দোবস্তের অবশিষ্টকালের জন্য কিম্বা তদপেক্ষা বেশি কালের জন্য নতুন বন্দোবস্ত করিবেন।[ক]

৪। কোন জমিদার পাট্টা দিতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহাকে দেওয়ানি আদালত দণ্ডিত হইতে হইত।[খ]

৫। ভূম্যধিকারীগণ শস্যের কর্তন ও বিক্রয়ের সময়ানুযায়ী খাজনার কিস্তি ধার্য করিবেন। নচেৎ তাহাদিগকে ক্ষতি পূরণের দায়ি হইতে হইবে।[গ]

৬। খোদকস্তা রায়তগণের পাট্টা তাহাদের প্রতারণার প্রমাণ বিনা জমিদারেরা রহিত করিতে পারিবেন না।[ঘ] কিম্বা তাহারা তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।[১]

দশশালা বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারগণকে দেশের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত থানাদার, কাজি, কানোঙ্গ সকল নিযুক্ত রাখিতে হইত। এবং তৎকালে শান্তি রক্ষার ভার তাহাদিগের হস্তে অর্পিত ছিল। ঐ সকল কর্মচারিদিগের ব্যয় নির্বাহার্থ জমিদারগণ কতক জমি নিষ্করে কিম্বা অন্য জমি অপেক্ষা কম হারে খাজনায় ভোগ দখল করিতেন। এই সকল জমিকে "চাকরাণ" জমি বলিত। কোন কোন স্থলে উক্তরূপ চাকরাণ জমির পরিবর্তে জমিদারগণ তাহাদের দেয় রাজস্ব হইতে উক্ত ব্যয় নির্বাহার্থ কতক মিনাহ পাইতেন। কিন্তু ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে জমিদারগণের নিকট হইতে পুলিশ সংক্রান্ত সমুদয় ভার তুলিয়া লইয়া গবর্ণমেন্ট তাহা নিজ হস্তে লইলেন এবং তদবধি পুলিশ খরচা দরুণ যে মিনাহ কিম্বা জমি জমিদারগণ পাইতেন তাহা রহিত হয়! জমিদারির উপর দশশালা বন্দোবস্ত অনুযায়ী রাজস্ব ধার্যের সময় এই সকল চাকরাণ জমির উপরও রাজস্ব ধার্য কবা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে যে সকল জমি লাখরাজ বলিয়া ধরা হইতে তাহা ভুক্ত হয় নাই। জমিদারি সম্বন্ধে রাজস্ব ধার্যের ভার বোর্ড অফ রেভিনিউর তত্ত্বাবধানে কালেক্টরগণের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহারা সাধারণ বৎসরের জমির উৎপন্নের গড়পড়তা ঠিক করিয়া তাহা হইতে রাজস্ব আদায়ের খরচা ও জমিদারগণের মালিকানা বাদ দিয়া বাকি সমুদয় গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য রাজস্ব বলিয়া ধার্য করিয়াছিলেন।[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে জমিদারেরা তাহাদের ধার্য রাজস্বের মিনাহ পাইবেন না বলিয়া বিধান করা হয় এবং রাজস্ব আদায়ের ত্রুটি করিলে তাহাদের সমুদয় জমিদারি কিম্বা তাহার কোন অংশ নিলম হইবে।[২]

অনেকে মনে করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারেবা একটা জমির সম্পূর্ণ (absolute) মালিক হইয়াছেন; কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রম। জমিদারগণ তাহাদের অধীনস্থ প্রজাবর্গের স্বত্ত্বাবদ্ধ মালিকীস্বত্ব লাভ করিয়াছেন মাত্র, অর্থাৎ তাহারা উক্ত প্রজাবর্গের স্বত্ব বজায় রাখিতে বাধ্য।[৩] জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমির একক সম্পূর্ণ মালিক

নহেন। তাহারা উক্ত বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্ণমেন্টের যে স্বত্ব জমিতে ছিল কেবলমাত্র তাহাই পাইয়াছেন অর্থাৎ রায়তগণের দখলী ফি বিঘা জমির উপজাত শস্যাদির এক নির্দিষ্ট অংশের স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন মাত্র এবং এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যতে নূতন আবাদ পত্তনের লাভের স্বত্ব পাইয়াছেন। কিন্তু খোদকস্তা প্রজাদিগের দখলী জমিতে তাহাদের দখলী স্বত্ব ছিল, কেবলমাত্র তাহাদিগকে পরগণা কিম্বা জেলার নিরিখ অনুসারে জমিদারকে খাজনা দিতে হইত।[৪] দশশালা বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগের স্বত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে কিন্তু তদ্দ্বারা রায়তি জমার সম্বন্ধীয় প্রচলিত আইনের কোন পরিবর্তন হয় নাই।[৫]

দশশালা বন্দোবস্তের সময় বঙ্গদেশে দুই শ্রেণির প্রজা ছিল অর্থাৎ খোদকস্তা ও পাইকস্তা। যাহারা নিজ গ্রামের জমি চাষ করিত তাহাদিগকে খোদকস্ত বলিত; যতদিন তাহারা তাহাদের জমির জন্য দেশীয় প্রচলিত হারে খাজনা দিতে থাকিত ততদিনে তাহাদের উক্ত জমিতে দখলি স্বত্ব থাকিত অর্থাৎ তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত না। যদিও তৎকালীন কোন আইনে দৃষ্ট হয় না, উক্ত খোদকস্তা প্রজা সকল সাধারণত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা—১ম খোদকস্তা কদিমী। ২য়, খোদকস্তা। যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বার বৎসরের অধিক পূর্ব হইতে জমি দখল করিত তাহাদিগকে "খোদকস্তা কদিমী" বলা হইত ও যাহাদিগকে দখল বার বৎসরের উর্ধ ছিল না তাহাদিগকে কেবল "খোদকস্তা" বলা হইত।[৬] কি হিন্দু কি মুসলমান আইন অনুসারে এদেশে বার বৎসরের উর্ধকালের দখলের দ্বারা (উক্ত দখল সম্বন্ধে অন্য কোন ব্যক্তির আপত্তি না থাকিলে) প্রজাদিগের দখলীস্বত্ব থাকা ধরা হইত। এমতে রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি বিক্রয় হইলেও যে সকল খোদকস্তা প্রজাদিগের দখল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্ব হইতে থাকা সাব্যস্ত হইত ঐ সকল প্রজাদের দেয় খাজনা বৃদ্ধি না হইবার ও তাহাদিগকে যোতখাস্ত না করিবার বিধান করা হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে সকল খোদকস্তা প্রজাদিগের কোন মামুলিস্বত্ব জন্মে নাই উক্ত প্রজাদিগের সম্বন্ধেও ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইনের ৬০ ধারা দ্বারা তাহাদিগের বন্দোবস্তের মেয়াদ অতীত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগের বন্দোবস্ত রহিত করিতে জমিদারেরা পারিবেন না বিধান করা হয় ও ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ আইনের ৭ ধারা অনুসারে উক্ত প্রজারা বন্দোবস্তের মেয়াদ অতীত হইলে পুনরায় পরগণার নিরিখ অনুসারে বন্দোবস্ত পাইবার স্বত্ববান হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৫৪ আইনের ৫ ধারা ও ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ আইনের ২৯ ধারা অনুসারে উক্ত প্রজারা রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি বিক্রয় হইলে খরিদদার হইতে তাহাদিগের যোত সম্বন্ধে পরগণার প্রচলিত নিরিখে পুনরায় বন্দোবস্ত লইতে পারিত। এবং উক্ত হারে বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকৃত না হইলে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত না।[৭] আর যে স্থলে রায়ত ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে পাট্টার নিরিখ সম্বন্ধে বিরোধ হইত সে স্থলে জেলার দেওয়ানি আদালত দ্বারা সমশ্রেণির জমির পরগণার নিরিখ অনুসারে নিরিখ ধার্য হইয়া উক্ত বিবাদ মীমাংসা হইত।[৮]

পাছে উত্তরকালে জমিদারেরা চিরকালের জন্য নিতান্ত কম খাজনায় জমি সকল বিলি করিয়া গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায়ের বিঘ্ন ঘটান তজ্জন্য কেবল প্রথমত, দশ বৎসরের

জন্য জমির পাট্টা দেওয়া ও উক্ত পাট্টার মেয়াদ শেষ হইলে পুনরায় দশ বৎসর পর্যন্ত পাট্টা দিতে পারিবার বিধান করা হয়।[৯] এই বিধান ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত থাকে। পরে উক্ত খ্রিস্টাব্দের ৫ আইনের দুই ধারা দ্বারা পাট্টার মেয়াদ সম্বন্ধে উক্ত বিধান তুলিয়া দেওয়া হয় এবং ইহা ধার্য করা হয় যে ভূম্যধিকারীরা যে কোন মেয়াদে পাট্টা দিতে পারিবেন। উক্ত খ্রিস্টাব্দের ১৮ আইন দ্বারা আরও স্পষ্ট বিধান হয় যে ভূম্যধিকারীরা যে কোন মেয়াদে ও ইচ্ছা করিলে চিরকালের জন্য এবং যে কোন হারে তাহারা সুবিধা বিবেচনা করিবেন সেই মেয়াদে ও সেই হারে জমি বিলি করিতে পারিবেন। কিন্তু যে সকল ভূম্যধিকারীগণের জমিতে তাহাদের কেবল নিজের জীবনকালের জন্য কিম্বা অন্য কোন নির্দিষ্টকালের জন্য স্বত্ব ছিল তাহারা তাহাদের স্বত্বের অতিরিক্তকালের জন্য কোন জমি বিলি করিবার স্বত্ববান ছিলেন না। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইনের ২ ধারা দ্বারা সে সকল পাট্টা ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ৫ আইন ও ১৮ আইনের পূর্বের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে চিরকালের নিমিত্ত কিম্বা দশ বৎসরের অতিরিক্তকালের জন্য দেওয়া হইয়াছিল তৎসমুদয় কাইমি করা হয়।

যখন উপরোক্ত পূর্বতন রেগুলেশন কেল প্রচলিত ছিল তৎসময় খোদকস্তা প্রজা সকল অন্য কোন চুক্তি জমিদারের সহিত করিয়া না থাকিলে জমিদারি রাজস্ব অনাদায়ে বা অন্য কোন কারণে হস্তান্তর হইলে নিকটস্থ সমশ্রেণি জমির নিরিখ অনুসারে কেবলমাত্র খাজনা দিতে বাধ্য ছিল এবং যতকাল তাহারা উক্ত খাজনা দিতে থাকিত ততদিন তাহারা তাহাদিগের জমি দখলে রাখিতে যত্নবান ছিল। কিন্তু ১৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ রেগুলেন যখন প্রচার করা হয় তখন ইহার ৩২ ধারা দ্বারা বিধান করা হয় যে জমিদারি রাজস্ব অনাদায়ে বিক্রিত হইলে খরিদদার "কদিমি খোদকস্তা" রায়তগণকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। উক্ত ধারায় অন্য কোন প্রজার উল্লেখ না থাকায় ইহা অনুমিত হইত যে উক্ত রেগুলেসন দ্বারা যে সকল খোদকস্তা রায়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে হইয়াছিল তাহাদিগকে উক্ত খরিদদার জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন কিম্বা তাহাদিগের নিকট দেশীয় প্রচলিত আইন ও প্রথানুসারে খাজনা দাওয়া করিতে পারিতেন। উক্ত বিধান দ্বারা আরও বিবেচনা করা হইত যে সকল শ্রেণির প্রজারাই যাহাদিগের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর উদ্ভব হইয়াছিল তাহারা ভূম্যধিকারীর সম্মতি সাপেক্ষে কেবল জমি দখল করিতে পারিত। পুনরায় আবার ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ১২ আইন ও পরে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১ আইনের দ্বারা বিধান করা হয় যে জমিদারি রাজস্ব বাকির জন্য নিলাম হইলে নিলাম খরিদদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে যে সকল "দায়" উক্ত জমিদারির সম্বন্ধে সৃষ্ট হইয়াছিল তৎসমুদয় রহিতে উক্ত জমিদারির মালিক হইতে পারিবেন এবং উক্ত খরিদদার ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ৫ রেগুলেসনের ১০ ধারা মতে নোটিশ দিয়া সকল অধঃস্থ প্রজা হইতে নিজ ইচ্ছানুসারে খাজনাবৃদ্ধি কিম্বা তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার উক্ত ক্ষমতা 'কদিমি খোদকস্তা" প্রজা সম্বন্ধে কেবল ছিল না। অর্থাৎ কদিমি খোদকস্তা প্রজা ভিন্ন আর সকল শ্রেণির প্রজাকেই উক্ত খরিদদার উচ্ছেদ করিতে পারিতেন ও তাহাদিগের খাজনা ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি করিতে পারিতেন।[১১]

পাইকস্তা প্রজা সম্বন্ধে কোন বিধান স্পষ্ট করিয়া বঙ্গদেশের কোন আইনে উল্লেখ ছিল না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় উক্ত শ্রেণির প্রজাদের মধ্যে যাহাদের পাট্টা ছিল তাহারা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইনের ৬০ ধারায় ১ম প্রকরণ অনুযায়ী তাহাদিগের পাট্টার মেয়াদ পর্যন্ত জমি দখল করিতে পারিত। পাইকস্তা প্রজাদিগের স্বত্ব তাহাদের নিজ নিজ বন্দোবস্তের চুক্তি অনুসারে শাসিত হইত এবং তাহাদের বন্দোবস্ত রহিত হইলে তাহাদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত।।[১২]

তথ্যসূত্র

১. Raja Lelanund Sing Bahadur V. The Government of Bengal Prioy Council, 6. Moore's I.A. page 101.

২. S.7 of Reg. I of 1793.

৩. The great rent case, 3 W. R. Act X. 34.

৪. Judgment of Justice Phear the Great Rent Case, 3 W.R. Act X 59.

৫. Judgment of Justice Setonkarr, the Great Rent Case, 3 W.R. Act X. 76.

৬. Judgment of Justice Trover, the Great Rent case, 3 W.R. Act. X page 34.

৭. Judgment of Justice Trover, the Great Rent Case, 3 W.R. Act X.

৮. S. 6 of Reg iv of 1794, ৬ ধারা ১৭৯৪ খ্রি: ৪ রে:।

৯. S. 2 of REg x LIV of 1793 ২ ধারা ১৭৯৩ খ্রি: ৪৪ রে:।

১০. Judgment of Justice, Trover, the Great Rent Case 3, W.R. Act X. p 37.

১১. Judgment of Justice Campbell, the Great Rent Case 3 W.R. Act X. p. 60.

১২. Judgment of Justice Trover, the Great Rent Case, 3 W.R. Act X, 38 জজ ট্রোভারের রায়, ৩ উ:রি, ১০ আইন ৩৮ পৃষ্ঠা।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইন

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধে যেরূপ আইন ও প্রথা প্রবল ছিল তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইল। কিন্তু তদ্বারা প্রজাদিগের স্বত্ব যথেষ্টরূপে রক্ষিত না হওয়া বিবেচনায় আইন ব্যবস্থাপক সভা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইন প্রচার করেন। উক্ত আইনের দ্বারা রায়তগণের পূর্বের অনিশ্চিত স্বত্ব সকল অনেকাংশে লিপিবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করিয়া দৃঢ়ীভূত হয়। উক্ত আইনের ১ম ধারা দ্বারা খোদকস্তা প্রজা সম্বন্ধে যে সকল রেগুলেসন পূর্বে করা হইয়াছিল ও ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ রেগুলেসন এবং ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ৫ রেগুলেসন দ্বারা পাট্টার নিরিখ সম্বন্ধে যে সকল বিধান করা হইয়াছিল তৎসমুদয় রহিত হয় এবং ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১ আইনের ২৬ ধারা দ্বারা রাজস্ব বাকি নিলামে খরিদ্দারগণকে প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিবার যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা পরিবর্তিত হয়। উক্ত আইনের দ্বারা যে সকল রায়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই নির্ধারিত হারে খাজনা দিয়া আসিতেছিল তাহাদিগকে ঐ হারে পাট্টা পাইবার স্বত্ব দেওয়া হইল এবং এতৎসম্বন্ধে আরও বিধান করা হয় যে, যে সকল রায়ত বিশ বৎসরাবধি একই নির্ধারিত হারে খাজনা দিতে থাকা প্রমাণ করিতে পারিবে তাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে ঐ হারে খাজনা দিতে থাকা আদালত হইতে বিপরীত প্রমাণ না হওয়াতক অনুমিত হইবে। হার যে সকল রায়তের দখলি স্বত্ব জন্মিয়াছিল তাহার কোন নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে না থাকিলেও ন্যায্য ও উপযুক্ত হারে পাট্টা পাইবার স্বত্ববান হইয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে আরও নিয়ম করা হয় যে বিপরীত প্রমাণ না হওয়াতক তাহাদিগের পূর্বের দেয় খাজনার হার ন্যায্যও উপযুক্ত হার বলিয়া অনুমিত হইবে। এবং কোন কোন প্রজা দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা তাহা নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত বিধান করা হয় যে, যে সকল রায়ত নিজে বা উত্তরাধিকারী সূত্রে ক্রমান্বয়ে বার বৎসরকাল যে সকল জমি চাষ বা আবাদ করিয়াছে তাহাদিগের ওই সকল জমিতে যতকাল তাহারা খাজনা দিতে থাকিবে ততকাল দখলী স্বত্ব থাকিবে। কিন্তু এই বিধান জমিদারদিগের খামার নিজখাত বা দিয়ার জমির সম্বন্ধে কিম্বা যে সকল জমি তাহারা কোন নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বা প্রতিসন বিলি করিবেন তৎ সম্বন্ধে খাটিবে না। কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত কোন জমি কোন নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বা সন সন অন্য কাহাকে বিলি করিলে শেষোক্ত ব্যক্তিও কোন দখলি স্বত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এবং জমিদার ও রায়তগণের মধ্যে উক্ত দখলীস্বত্ব সম্বন্ধীয় বিধানের বিপরীত কোন লিখিত চুক্তি থাকিলে তাহা উপরোক্ত বিধান দ্বারা ব্যতিক্রম হইবে না। এই আইনের দ্বারা আরও বিধান করা হয় যে যে সকল প্রজাগণের দখলি স্বত্ব জন্মে নাই তাহারা যে হারে খাজনা দিতে চুক্তি করিবে সেই হারে পাট্টা পাইবার স্বত্ববান হইবে।[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধান প্রচলিত করিবার সময় গবর্ণমেন্ট প্রজাগণের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে নতুন আইন করিবার ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত ক্ষমতা গবর্ণমেন্ট প্রজাগণের উপকরার্থে প্রথম পরিচালনা করেন। উক্ত আইনের দ্বারা পূর্বের খোদকস্তা ও পাইকস্তা

রায়তের বদলে দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট (Occupancy Ryots) ও স্বেচ্ছাধীন প্রজা (Tenants-at-will) করা হয়।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইন জারি হইবার পূর্বে খোদকস্তা রায়তগণকে বৃদ্ধি খাজনার দায় হইতে মুক্ত হইতে হইলে তাহাদিগকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে বার বৎসর হইতে একই নির্ধারিত হারে খাজনা আদায় করার প্রকৃত প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইত। কিন্তু এই আইনের দ্বারা যে সকল রায়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই হারে খাজনা দিতেছে তাহারাই বৃদ্ধি খাজনা হইতে মুক্তি পাইবে এবং তাহাদের সম্বন্ধে আরও সুবিধা করা হইয়াছিল যে তাহারা কেবল বিশ বৎসর একই হারে খাজনা আদায় দেওয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তাহাদিগকে উপরোক্ত শ্রেণির প্রজা বলিয়া গণ্য করা যাইবে। ইতিপূর্বে উক্ত শ্রেণির প্রজা ছাড়া কোন প্রজাকে খোদকস্তা বলিয়া ধরা যাইবে ও কোন কোন প্রজার বা দখলীস্বত্ব জন্মিবে তৎসম্বন্ধে অনেক সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হইত, কিন্তু ১০ আইনের দ্বারা কি খোদকস্তা কি পাইকস্তা রায়ত যাহারা ক্রমান্বয়ে বার বৎসর কাল কোন চাষ আবাদ করিয়া কোন জমি ভোগ দখল করিবে তাহারাই উক্ত জমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে বিধান করা হয়। এই বিধান এই আইনের দ্বারা প্রথম সৃষ্টি হয়। এবং বাঙলা প্রদেশের প্রজাগণের পক্ষে ইহা তাহাদিগের একটি প্রধান স্বত্ব, ইহার বিধান না হইলে যে সকল রায়তের যোত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কত শত রায়তকে তাহাদিগের যোত হইতে জমিদারকে বৃদ্ধি খাজনা দিতে অস্বীকৃত হইলে উচ্ছিন্ন হইতে হইত বলা যায় না। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনের ১৭ ধারা অনুসারে এই শ্রেণির রায়ত সম্বন্ধে জমিদারগণের খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত ধারা অনুসারে—(১) নিকটস্থ সমশ্রেণির জমির সমশ্রেণির দেয় নিরিখ অপেক্ষা খাজনার নিরিখ কম না হইলে, (২) কিম্বা রায়তগণের ব্যয় ও পরিশ্রম বিনা জমির, উৎপাদিকা শক্তি কিম্বা জমির উৎপন্নের দাম বৃদ্ধি না হইলে, (৩) কিম্বা জরিপে জমির পরিমাণ যে পরিমাণ জমির জন্য খাজনা দেওয়া হইত তাহা অপেক্ষা বেশি থাকা সাব্যস্ত না হইলে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তগণের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিত না। ১০ আইন জারি হইবার পূর্বে প্রথমে খাজনা বৃদ্ধির সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপিতে কেবল উপরোক্ত ১ ও ৩ দফার প্রস্তাব হয়। কিন্তু পরে আইন জারির সময় ২য় দফার বিধানটি আইনভুক্ত করা হয়। এই ২য় দফার বিধানটি উক্ত আইনের দ্বারা জমিদার পক্ষে নতুন সৃষ্টি হয়।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনের দ্বারা দেখা যায় যে দুইটি প্রধান বিষয় যাহা পূর্বে অনিশ্চিত ছিল তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিত আইন ভুক্ত করা হয়। ইহার একটি রায়তগণের পক্ষে ও অপরটি জমিদারগণের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। রায়তগণের পক্ষে ১২ বৎসরের ভোগদখল জনিত দখলীস্বত্ব ও জমিদারগণের পক্ষে জমির উৎপন্নের দাম বৃদ্ধি হইলে খাজনা বৃদ্ধি করিবার স্বত্ব এই দুইটি নতুন প্রধান বিধান উক্ত আইনের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়।[২] দখলীস্বত্ব কাহাকে বলে ও কোন কোন শ্রেণির প্রজা দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারে এবং কোন কোন জমির সম্বন্ধেই বা এই স্বত্ব জন্মিতে পারে আর এই স্বত্ব হস্তান্তরিত হইলেই বা কিরূপ দায়িত্ব ঘটিতে পারে তৎসম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে বলা হইবে।

এই আইনের দ্বারা যেমন যে সকল রায়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়া আসিতে থাকা প্রমাণ হইলে বৃদ্ধি খাজনার দায় হইতে মুক্ত হইবার বিধান হইয়াছিল সেইরূপ পেটাও তালুকদারেরা এবং জমিদার ও রায়তগণের মধ্যে অন্য কোন মধ্যবর্তী ও চিরস্থায়ী হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়া থাকিলে তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা

যাইবে না বিধান হইয়াছিল।[১] কিন্তু যে সকল পেটাও তালুকদাররা ও উপরিউক্ত মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়া আসে নাই তাহাদিগের খাজনা কোন স্থলে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক কোন বিধান ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনের দ্বারা করা হয় নাই।

যদি কোন জমিদার শেষোক্ত তালুকদার ও মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাগণের খাজনা বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করিতেন তবে তাঁহাকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৮ রেগুলেশনের ৫১ ধারার বিধান অনুযায়ী কার্য করিতে হইত। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ রেগুলেশনের ৫১ ধারা দ্বারা কেবল তিনটি কারণে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিত। যথা– ১। পরগণার দস্তুর থাকিলে, ২। তালুকদারের সহিত বেশি জমা তলবের চুক্তি থাকিলে; ৩। যদি পূর্বে সেই তালুকের জন্য আপন জমার কিছু কম পাইয়াছে এই নিমিত্ত সেই তালুকদারের স্থানে বেশি জমা তলব করিতে পারে ও যদি সেই তালুকদারের তালুকে তাহা দিবার জায়দাদ থাকে।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে যে সকল স্বত্ব ও দায়িত্ব উক্ত আইন অনুসারে উদ্ভব হইত তৎসমুদয় বিষয়ের মোকদ্দমা কলেক্টরের কোর্ট দ্বারা নির্বাচিত হইবার বিধান ছিল। এই সকল মোকদ্দমা পরে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইন (বেঙ্গল কাউন্সিল) দ্বারা যে যে প্রদেশে ইহা খাটিত তৎসমুদয় প্রদেশে দেওয়ানি আদালত কর্তৃক বিচার হইবার বিধান হয়।

তথ্যসূত্র

১. SS. 1, 3. 8 to Act X 1859, ১ ও ৩ হইতে ৮ ধারা ১০ আইন ১৮৫৯।

২. The Great Rent Case, See Judgment of Justice Campbell, 3 W.R. 63.

৩. S. 15, Act X of 1859.

৪. S. 23 Act X of 1859.

যে যে শ্রেণির মোকদ্দমা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনের দ্বারা কলেক্টর সাহেব কর্তৃক বিচার হইত তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। পাট্টা কি কবুলিয়ত পাইবার জন্য ও খাজনার যে পুরোপুরি ধরিয়া পাট্টা কি কবুলিয়ত করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবার মোকদ্দমা।

২। খাজনা কিম্বা যাহা লইবার অনুমতি নাই এমত কোন আবাব কি চাঁদা বেআইনি মতে জোর করিয়া লওয়া বলিয়া কিম্বা যে খাজনা দেওয়া গেল তাহার কবজ দেওয়া যায় নাই বলিয়া কিম্বা যে খাজনা দেওয়া গেল তাহার কবজ দেওয়া যায় নাই বলিয়া অথবা কয়েদ করিয়া কী অন্য প্রকারে আটক করিয়া ভয় দেখাইয়া খাজনা লওয়া গেল বলিয়া ক্ষতি পূরণের সকল মোকদ্দমা।

৩। অতিরিক্ত জমার দাওয়া হইল বলিয়া নালিশের ও খাজনা করিবার সকল দায়ির বিচার।

৪। খেরাজি কি লাখরাজ জমির নিমিত্ত কিম্বা চরানি জমির কী বনকর কি জলকর প্রভৃতির নিমিত্ত যে খাজনা বাকি পড়ে তাহার নিমিত্ত সকল মোকদ্দমা।

৫। বাকি খাজনা দেওয়া যায় নাই বলিয়া কিম্বা করারের কোন নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে রায়তকে বেদখল করা যাইতে পারে কি পাট্টা বাতিল হইতে পারে বলিয়া কোন রায়তকে বেদখল করিবার কিম্বা পাট্টা বাতিল করিবার সকল মোকদ্দমা।

৬। কোন জমার কি ইজারার কি তালুকের জমা পাইবার অধিকার যাহার থাকে সেই জন সেই জমি প্রভৃতি হইতে কোন রায়তকে কি ইজারাদারকে কি প্রজাকে বেআইনি মতে বেদখল করিলে ঐ রায়ত প্রভৃতির সেই জমির কি ইজারার তালুকের ভোগ কি দখল পুনরায় পাইবার সকল মোকদ্দমা।

৭। এই আইনমতে বাকি খাজনার দরুণ ফসলাদি ক্রোক করায় যে ক্ষমতা জমিদারগণ প্রভৃতিকে দেওয়া হয় সেই ক্ষমতা মতে কিম্বা বিশেষ বিধান অনুযায়ী ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্যকারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হয় সেই ক্ষমতা মতে তাহারা কার্য করিবার ছলে যে কোন কার্য করে সেই কার্য প্রযুক্ত সকল মোকদ্দমা।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ আইন

গবর্নমেন্টের প্রাপ্য রাজস্ব অনাদায়ে সহল নিলাম হইবার সম্বন্ধে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে আর একটি প্রধান আইন প্রচার হয়। ইহার সহিত জমিদারগণের অধীনস্থ প্রজাদিগের স্বত্ব বিষয়ক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ থাকা হেতু তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। এই আইন ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ আইন নামে প্রসিদ্ধ। রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি নীলাম হইলে খরিদ্দার ইহার পূর্বে অধীনস্থ প্রজাদিগের সম্বন্ধে কীরূপ স্বত্ব লাভ করিতেন অর্থাৎ কীরূপ প্রজাদিগকে উচ্ছেদ ও কীরূপ প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পাছে জমিদারগণ অনুপযুক্ত ও নিতান্ত কম খাজনায় তাহাদের অধীনে তালুক কিম্বা অন্য কোন পেটাও স্বত্ব সৃজন করিয়া গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিতে অক্ষম হন সেই হেতু নীলাম খরিদ্দারকে জমিদারি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যেরূপ ছিল অর্থাৎ জমিদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারি, যেরূপ স্বত্ব বিশিষ্ট ছিল সেইরূপ অবস্থায় দিবার জন্য তাহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে সকল দায় সৃজন হইয়াছে তৎসমুদয় রহিত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।[১] এই সকল বিষয় সম্বন্ধে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল তদ্বারা সময় সময় অধীনস্থ প্রজাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ আইনের দ্বারা তৎসম্বন্ধে পূর্ব আইন সকল কতক অংশে রহিত ও কতক অংশে পরিবর্তিত হয়। রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি বিক্রয় করিবার গবর্নমেন্টের ক্ষমতা পূর্বে যে সকল আইনের দ্বারা ছিল তাহা প্রজাবর্গের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল এবং প্রজাবর্গের উক্ত অসুবিধা অনেক অংশে দূর করিবার নিমিত্ত ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ আইন প্রচার হয়।[২]

উক্ত আইনের ৩৭ ধারা দ্বারা বিধান করা হয় যে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কোন জেলার অন্তর্গত সম্পূর্ণ মহল নিজ বাকির নিমিত্ত নিলাম হইলে নিলাম খরিদ্দার উক্ত মহলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে যে সকল দায় সৃষ্ট হইয়াছে তৎসমুদয় রহিত করিতে এবং অগৌণে সকল পেটাও পাট্টাদারগণকে উচ্ছেদ ও তাহাদিগের পাট্টা বাতিল করিতে পারিবেন। কিন্তু যে সকল ইস্তমরারী কি মোকররী জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই নির্দিষ্ট খাজনার হারে ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে, কিম্বা যে সকল জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে কিন্তু যাহার খাজনার পর মোকররী নহে, কিম্বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে যে সকল তালুকদারী অথবা সে প্রকার অন্য কোন জমি জমিদারগণের নিজের অধীনস্থ ভোগ হইয়া আসিতেছে ও কতক বৎসরের মিয়াদে যে ইহারা জমি সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে এবং উক্ত তালুকাদি ও ইহারা এই আইনের বিধান মতে রেজিস্টারি হইলে উক্ত সমুদয় জমির সম্বন্ধে, কিম্বা যে জমিতে বসবাটি কি কুঠি কি চিরকালের জন্য ইমারত প্রভৃতি

গাঁথা হইয়াছে ও যে জমিতে বাগান কি বিশেষ ফলের বাগান কি পুকুর কি কূপ কি খাল কি ভজনালয় কি শ্মশান কি গোরস্থান করা গিয়াছে কিম্বা যে জমিতে আকর খনন করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নীলাম খরিদদার তাঁহার উক্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন না। নিলাম খরিদদারেরা তাহাদিগের খরিদা মহল অপর কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিলে শেষোক্ত ব্যক্তি ও নিলাম খরিদের বার বৎসর মধ্যে নিলাম খরিদ্দারের উপরোক্ত ক্ষমতা সকল পরিচালনা করিতে পারিবেন।[৩] যে সকল জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে কিন্তু যাহার খাজনার হার নির্দিষ্ট নহে উক্ত জমির রায়তগণকে যদিও নিলাম খরিদ্দার উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহাদিগকে খাজনা প্রচলিত আইন অনুসারে বৃদ্ধির যোগ্য হইলে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।[৪] উপরোক্ত শেষোক্ত বর্জিত জমির খাজনাও অনুচিত থাকা প্রমাণ হইলে বৃদ্ধি করিতে পারিবে।[৫]

বাকি রাজস্বের জন্য সম্পূর্ণ মহল নিলাম না হইয়া যদি তাহার কোন অংশ নিলাম হয় তাহা হইলে নিলাম খরিদদার বাকিদার কর্তৃক যে সকল দায় সৃষ্ট হইয়াছে তাহা রহিত করিতে সক্ষম নহেন।[৬]

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেশন সকলের বিধান সমূহ অনেকাংশে প্রজাগণের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল এবং পাছে তাহাদের উপর জমিদারগণ কর্তৃক অত্যাচার হয় তাহা নিবারণের জন্য পাটোয়ারি ও কনোঙ্গ সকল নিযুক্ত করিবার বিধান করা হয়। কিন্তু পরে জমিদারগণের হস্তে "হপ্তম" ও 'পঞ্জম" রেগুলেশনের দ্বারা খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত যে সকল অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়া হয় তদ্বারা প্রজাগণের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ম রেগুলেশন ("হপ্তমজারি") দ্বারা জমিদারগণ প্রজারা খাজনা দিতে ত্রুটি করিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে পারিতেন এবং ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ৫ম রেগুলেশন (পঞ্চম) দ্বারা তাহারা প্রজাদিগের সম্পত্তি ক্রোক করিবার ক্ষমতা পান। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনের দ্বারা জমিদার ও প্রজাস্বত্ব বিষয়ক পূর্ব আইন রদ করা হয়। ইহা দ্বারা জমিদারদিগের ক্ষমতা একদিকে হ্রাস হইয়াছিল বটে কিন্তু অপরদিকে খাজনা বৃদ্ধি করিবার কারণ সকল তাহাদের সাপক্ষে পূর্বাপেক্ষা বেশি করা হয় এবং যাহাতে তাহারা শীঘ্র খাজনা আদায় করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে ডেপুটি কলেক্টর কর্তৃক সরাসরি বিচার করিবার বিধান করা হয়। কিন্তু ডেপুটি কলেক্টরেরা উক্ত বিচার কার্য সম্বন্ধে উপযুক্ত কার্যক্ষম ছিলেন না। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইনের দ্বারা খাজনা সংক্রান্ত মোকদ্দমা সমূহের বিচার দেওয়ানি আদালতে অর্পণ করা হয় । এবং সেই অবধি উক্ত মোকদ্দমা সমূহের বিচারকার্য পূর্বাপেক্ষা সচারুরূপে ও রায়তগণের স্বত্ব পূর্বপেক্ষা ভালরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইনের দ্বারা কেবল মোকদ্দমার বিচার কার্য বিবিধ সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু জমিদার ও প্রজার মধ্যে স্বত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনের ও ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইনের যে সকল ধারা পরস্পর ঐক্য ছিল তাহার একটি তালিকা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

১০/৫৯	৮/৫৯	১০/৫৯	৮/৬৯	১০/৫৯	৮/৬৯	১০/৫৯	৮/৬৯	১০/৫৯	৮/৬৯
ধারা ১...	...নাই	ধারা ১৭...	...১৮	ধারা ৬৯...	...৩২	ধারা ১০৯	নাই	ধারা ১৩০	...৮৭
" ২...	...২	" ১৮...	...১৯	" ৭০ হইতে	...নাই	" ১১১		" ১৩১	...৮৮
" ৩...	...৩	" ১৯...	...২০	" ৭৫ পর্যন্ত	...	" ১১২	...৬৮	" ১৩২	...৮৯
" ৪...	...৪	" ২০...	...২১	" ৭৬...	...৯	" ১১৩	...৬৯	" ১৩৩	...৯০
" ৫...	...৫	" ২১...	...২২	" ৭৭...	...নাই	" ১১৪	...৭০	" ১৩৪	...৯১
" ৬..	...৬	" ২২...	...২৩	" ৭৮...	...৫২	" ১১৫	...৭১	" ১৩৫	...৯২
" ৭...	...৭	" ২৩ হইতে	...নাই	" ৭৯...	...নাই	" ১১৬	...৭২	" ১৩৬	...৯৩
" ৮...	...৮	" ২৬ পর্যন্ত	...২৬	" ৮০...	...৫৫	" ১১৬	...৭৩	" ১৩৭	...৯৪
" ৯...	...৯	" ২৭...	...নাই	" ৮১...	...৫৬	" ১১৭	...৭৪	" ১৩৮	...৯৫
" ১০...	...১০	" ২৮...	...২৪	" ৮২ হইতে	...নাই	" ১১৮	...৭৫	" ১৩৯	...৯৬
" ১১...	...১১	" ২৯...	...২৭	" ৯১ পর্যন্ত	...৫৮	" ১১৯	...৭৬	" ১৪০	...নাই
" ১২...	...১২	" ৩০...	. .২৮	" ৯২...	...নাই	" ১২০	...৭৭	" ১৪১	...৯৭
" ১৩...	...১৩	" ৩১...	...২৯	" ৯৩ হইতে	৫৯ হইতে	" ১২১	...৭৮	" ১৪২	...৯৮
" ১৪...	...১৪	" ৩২...	...৩০	" ১০৪ পর্যন্ত	৬১ পর্যন্ত	" ১২২	...৭৯	" ১৪৩	...৯৯
" ১৫...	...১৫	" ৩৩...	...নাই	" ১০৫...	...	" ১২৩	...৮০	" ১৪৪	..১০১
" ১৬...	...১৬	" ৩৪ হইতে	...	" ১০৬...	...৬৩	" ১২৪	...৮১	" ১৪৫	..১০১
	...১৭	" ৬৮ পর্যন্ত	...	" ১০৭...	...নাই	" ১২৫	...৮২	" ১৪৬	
				" ১০৮...	...৬৪	" ১২৬	...৮৩	" হইতে	নাই
						" ১২৭	...৮৪		
						" ১২৮	. .৮৫	" ১৬৮	
						" ১২৯	...৮৬		

তথ্যসূত্র

১. See Judgments in the Privy Council cases of Renee Surnamoyee V. Maharajah Suttees Chandra Roy, 2W, R. 14 P.C. and A.J. Forbes V. Meer Mahomad Hossain and others, 12. B.L. Report 2/0 p.c.

২. See Judgment in the Privy Council case of Bunwari Lall Sahoo, V. Mohabeer Prosad and others, 12. B.L.R. 297.

৩. Kailas V. Jubur, 22 W.R. 29. Koyles Bashari V. Golookmoni, 10 C.L.R. 41 Justice Markby's Lecturers on Indian Law Lecture II. p. 46.

৪. Act xi 1859, S. 37. Cl. 2. (৩) Act xi, 1854, S. 37, Proviso, (৪) 12. W.R. 440; 20 W.R. 264.

৫. Bengal Administration Report 1872-73 Character of Land Tenures, page 81. See also Justice Field's Minute on the Tenancy Bill, para 85, published in the Calcutta Gazette, Oct. 15, 1884, Extra supplement,

৬. See preablem, Act viii of 1869.

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইন

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইন জারি হইবার অনেক পূর্ব হইতেই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন পরিবর্তন করিবার কথা চলিতেছিল। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনের দ্বারা প্রজাদিগের দখলিস্বত্ব ও জমিদারগণের খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিধান করা হইয়াছিল বটে কিন্তু তৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট থাকায় জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে সততই বিবাদ বিসম্বাদ হইত। তন্মধ্যে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের পাবনা জেলার ও পূর্ব বাংলার প্রজাবিদ্রোহ প্রধান। এই সকল প্রজাবিদ্রোহ দেখিয়া তৎকালীন লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর স্যর জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব জমিদার ও প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন সম্পূর্ণরূপে নির্বাচিত করিতে গবর্নমেন্টকে অবশেষে বাধ্য হইতে হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন।[১] তাহার পরে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্যর রিচার্ড টেম্পল সাহেব প্রজাগণের দখলীস্বত্ব ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে নতুন বিধান করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই তিনি কর্মত্যাগ করেন। তাহার পরবর্তী স্যর আসলি ইডেন সাহেব উক্ত প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয় লইয়া উপরস্থ রাজকর্মচারীগণের মধ্যে অনেক মতভেদের পরে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে খাজনা আইন ও তৎসম্বন্ধে নজীর সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে এক খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে উক্ত কমিশন হইতে এক খসড়া পাণ্ডুলিপিসহ একটি রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু গবর্ণমেন্ট হইতে উক্ত খসড়া সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত না হওয়ায় পুনরায় তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় খসড়া প্রস্তুত করিবার আদেশ হয়। কিন্তু তাহাও গবর্ণমেন্ট দ্বারা অনুমোদিত না হওয়ায় আর একটি খসড়া প্রস্তুত হয়। পরে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট হইতে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ তারিখে অনরেবেল ইলবার্ট সাহেব কর্তৃক আইন ব্যবস্থাপক সভায় তাহা পেশ হয়। পরে পুনরায় আর একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় এবং অবশেষে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ তারিখে বর্তমান ভূম্যধিকারী ও প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রচারিত হয়। বর্তমান আইনের দ্বারা পূর্ব আইন সম্বন্ধ কী কী প্রধান প্রধান পরিবর্তন হইয়াছে তাহা আইন ব্যবস্থাপক সভার মেম্বারগণ উক্ত আইন প্রচারকালীন বক্তৃতায় ও রিপোর্ট সকলে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। উক্ত প্রধান প্রধান পরিবর্তন সকল নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রজার শ্রেণি

এই আইনের দ্বারা প্রজাগণকে প্রথমত, তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—(ক) মধ্যস্বত্বাধিকারী ও অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারী; (খ) রায়ত, (গ) কোর্ফা রায়ত; অর্থাৎ যে প্রজারা রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে। রাযতগণকে আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—(ক) যে রায়তেরা মোকররী হারে অর্থাৎ চিরকালের নিমিত্ত

মোকররী খাজনা কিম্বা মোকররী হারে খাজনা দিয়া ভূমি ভোগ দখল করে; (খ) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত; অর্থাৎ যে সকল রায়তের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে; (গ) দখলীস্বত্ব শূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে সকল রায়তের এইরূপ দখলীস্বত্ব নাই।

পূর্বেকার আইনে এইরূপ স্পষ্ট করিয়া প্রজার শ্রেণি নির্দিষ্ট করা ছিল না।

মধ্যস্বত্বাধিকারী ও রায়তের প্রভেদ

বর্তমান আইনের দ্বারা মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজা ও রায়ত কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে। এই আইন জারি হইবার পূর্বে কোন ব্যক্তি মধ্যস্বত্বাধিকারী কিম্বা রায়ত থাকা নির্দিষ্ট করিতে হইলে বিচারপতির বিচারের উপরই কেবল নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু বর্তমান আইনের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা সম্পূর্ণ না হউক অনেক পরিমাণে তাহা নির্ধারিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত কিম্বা প্রজা বসাইয়া আবাদ করিবার উদ্দেশে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব পাইয়াছেন তাহাকে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলে। যে ব্যক্তি নিজে বা নিজের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা কিম্বা বেতনভোগী চাকর অথবা অংশীদার দ্বারা ভূমির চাষ করিবার জন্য স্বত্ব পাইয়াছেন তাহাকে রায়ত বলে। কোন ব্যক্তি মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজা কিম্বা রায়ত ইহা আদালত কর্তৃক নির্ণয় করিতে হইলে দেশাচারের প্রতি এবং যে অভিপ্রায়ে প্রথমে প্রজাস্বত্ব গৃহীত হইয়াছিল তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রজাস্বত্ব সৃষ্টির সময়ে যদি জমি রায়তগণের দখলে থাকে এবং যদি উক্ত স্বত্ব জমি খাসদখলের অর্থাৎ চাষ করিবার স্বত্ব না হইয়া কেবল রায়তগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার স্বত্ব হয় তাহা হইলে উক্ত স্বত্বকে রায়তী স্বত্ব বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি উক্ত স্বত্ব সৃষ্টিকালীন জমি কাহারও দখলে কিম্বা আবাদি না থাকে এবং যদি উক্ত স্বত্ব জমি দখল করিবার নিমিত্ত স্বত্ব হয় তাহা হইলে উক্ত স্বত্বকে রায়তীস্বত্ব বলে এবং তাহা পরে অধঃস্থ অন্য কোন ব্যক্তিকে বিলি করিলেও তাহার অন্যথা হইবে না।

বর্তমান আইনের দ্বারা আরও একটি বিধান এ সম্বন্ধে করা হয় যে যদি কোন প্রজার এক শত বিঘার উপর জমি থাকে তবে তাহাকে মধ্যস্বত্বধিকারী বলিয়া বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ধরিতে হইবে।

দখলীস্বত্ব

যদি কোন রায়ত ক্রমান্বয়ে বার বৎসরকাল একই গ্রামে রায়ত স্বরূপ জমি ভোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে ঐ গ্রামের স্থিতিবান রায়ত Settled Ryot বলা যাইবে এবং স্থিতিবান রায়ত হইয়া সে ঐ গ্রামের যে কোন জমি রায়ত স্বরূপ দখল করিবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। পূর্বের ন্যায় একই জমি বার বৎসর কাল দখল করা এক্ষণে আবশ্যক নাই। কোন একটি গ্রামের অন্তর্গত জমি কোন রায়ত বার বৎসর কাল দখল করিলে সেই গ্রামের যত জমি রায়ত স্বরূপ সে দখল করে কিম্বা ভবিষ্যতে দখল করিবে তৎসমুদয় জমিতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। পূর্বে জমিদারেরা রায়তগণকে কোন নির্দিষ্ট জমি ক্রমান্বয়ে বার বৎসর কাল পর্যন্ত ভোগ দখল করিতে না দিয়া তাহাদিগের দখলীস্বত্বের বিঘ্ন ঘটাইতেন; ইহা নিবারণের জন্য এই নতুন বিধান করা হয়। বর্তমান

আইনের পূর্বে যে কোন রায়ত যে কোন গ্রামে বার বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে কোন নির্দিষ্ট জমি ভোগ দখল করিত সেই জমিতে কেবল তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিত। কিন্তু এই আইনের দ্বারা তাহা রহিত হইয়া কেবল স্থিতিবান রায়ত, যে গ্রামে সে স্থিতিবান রায়ত হইয়াছে; সেই গ্রামের যে কোন ভূমি রায়তস্বরূপ দখল করিবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। বর্তমান আইনের ১৯ ধারা বিধান করা হয় যে এই আইন প্রচার সময় যে সকল রায়ত দখলীস্বত্ব লাভ করিয়াছে তাহাদের উক্ত স্বত্ব বজায় থাকিবে।

এই আইনের দ্বারা দখলীস্বত্ব উদ্ভব নিমিত্ত যে সকল বিধান হইয়াছে উক্ত বিধান সকল উটবন্দি রায়ত কিম্বা চর অথবা ডেরা জমির সম্বন্ধে খাটিবে না। উক্ত শ্রেণির জমির সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট জমি ক্রমান্বয়ে বার বৎসরকাল ভোগ দখল না করিলে তাহাতে কোন রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

রায়তগণের পক্ষে তাহাদিগের দখলীস্বত্ব প্রমাণ করা সুকঠিন বিধায় বর্তমান আইনে বিধান করা হয় যে রায়ত ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে মোকদ্দমায় যতক্ষণ বিপরীত প্রমাণ বা স্বীকার না হইবে ততক্ষণ রায়তকে স্থিতিবান রায়ত বলিয়া অনুমান করা হইবে। এই বিধান দ্বারা দখলীস্বত্ব প্রমাণের ভার হইতে রায়তগণ মুক্তিলাভ করিয়াছে। এক্ষণে রায়তগণের যে দখলীস্বত্ব নাই তাহা জমিদারকে প্রমাণ করিতে হইবে।

কোন ভূস্বামী বা কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী তিনি নিজে একক মালিক হউন কিম্বা তাহার কোন সরিকদার থাকুন তাহার অধীনস্থ জমিতে খরিদ সূত্রে বা অন্য কোন প্রকারে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। এবং ইজারাদারগণও তাহাদের ইজারা থাকাকালীন তাহাদের ইজারার অর্ন্তগত কোন জমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে জমিতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে তৎসম্বন্ধে পরে ভূস্বামী কি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি ইজারাদের হইলে তাহার দখলিস্বত্ব নষ্ট হইবে না।

কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন ও অন্য প্রকারের ভূমি ব্যবহার

ইতিপূর্বে রায়তেরা জমিদারের সম্মতি বিনা বৃক্ষছেদন কিম্বা কূপ বা পুষ্করিণী খনন অথবা নির্মাণ করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত, জমির মূল্যের বিশেষ হানি যাহাতে না হয় কিম্বা যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী না হয় এরূপে জমি যে কোন প্রকারে ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু দেশাচার মতে বৃক্ষ কাটিতে না পারার প্রথা থাকিলে উক্ত রায়ত বৃক্ষ কাটিতে পারিবে না। জমির উৎকর্ষসাধনের জন্য দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত ও মোকররী হারের রায়ত জমিতে কূপ, পুষ্করিণী. জলপ্রণালী বা অন্য কোন স্থায়ী উৎকর্ষ সাধন অথবা আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ও তাহাদিগের পরিবারের উপযোগী বাহিরের ঘর সমেত বাসগৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে। দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তেরাও তাহাদের নিজের যোতের উৎকর্ষ সাধনার্থে কূপ খনন করিতে পারিবে এবং আবশ্যক হইলে তাহাদের ও তাহাদের পরিবারের নিমিত্ত উপযুক্ত বাসগৃহ ও বাহিরের ঘর প্রস্তুত করিতে পারিবে। কিন্তু জমিদারের অনুমতি বিনা তাহারা অন্য কোন উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে না।

প্রজাগণের উচ্ছেদের বিষয়

কাইমি মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজা ও মোকরীর হারের রায়ত এবং তাহাদিগের ভূম্যধিকারীর মধ্যে যদি এইরূপ চুক্তি থাকে যে কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে ও উক্ত নিয়ম যদি বর্তমান আইনসঙ্গত হয় এবং সেই নিয়ম যদি তাহারা ভঙ্গ করে তাহা হইলে জমিদারগণ তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন হেতুতে তাঁহারা তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তগণকে তাহাদিগের ভূম্যধিকারীর সহিত উপরোক্ত রকমের চুক্তির কোন নিয়মভঙ্গ না করিলে অথবা জমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী হয় এইরূপে ভূমি ব্যবহার না করিলে ভূম্যধিকারীরা উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তকে জমিদারগণ নিম্নলিখিত কারণ ব্যতীত উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।—(ক) বাকি খাজনা না দিলে; (খ) জমি প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কার্যের অনুপযোগী হয় এইরূপে ভূমি ব্যবহার না করিলে অথবা বর্তমান আইনসঙ্গত কোন নিয়ম যাহা ভঙ্গ করিলে চুক্তি অনুসারে উচ্ছেদ হইতে পারে এরূপ নিয়ম ভঙ্গ না করিলে; (গ) রেজিস্ট্রারী করা পাট্টা ক্রমে ভূমির দখল লইয়া থাকিলে উক্ত পাট্টার মেয়াদ অতীত না হইলে; (ঘ) ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা দিতে অস্বীকৃত না হইলে কিম্বা ঐ খাজনা দিয়া যে মেয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান সেই মেয়াদ অতীত না হইলে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারা যাইবে না।

কোন প্রজাকে ডিক্রিজারি বিনা তাহার মধ্যস্বত্ব বা ক্ষেত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না।

পূর্বে মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজাগণের পাট্টায় খাজনা বাকি পড়িলে জমি হইতে উচ্ছেদ হইতে পারিবে এইরূপ চুক্তি থাকিলে তাহাদিগকে উক্ত খাজনা অনাদায়ে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত। কিন্তু যে সকল মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজাগণের পাট্টায় উক্তরূপ চুক্তি ছিল না তাহাদের স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য থাকিলে তাহাদিগকে বাকি খাজনার জন্য উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত না; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যস্বত্ব ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইনের ৫৯ ধারা অনুযায়ী বিক্রয় করা যাইতে পারিত। পূর্ব আইন অনুসারে সকল রায়তকেই বাকি খাজনার দরুণ উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত। বর্তমান আইনের দ্বারা কাইমি মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজা কি মোকররী হারের রায়ত অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তাহাদিগের পাট্টায় বাকি খাজনার দরুণ উচ্ছেদ করিবার চুক্তি থাকিলেও তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না। বাকি খাজনার দরুণ তাহাদিগের যোত ডিক্রিজারি ক্রমে বিক্রয় করা যাইতে পারে। কিন্তু দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত ও কোর্ফা রায়তকে এক্ষণে বাকি খাজনার জন্য উচ্ছেদ করা যাইতে পারে।

উচ্ছেদ সম্বন্ধে নোটিশ

কোন প্রজাকে জমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী করিয়াছে বলিয়া কিম্বা চুক্তির কোন নিয়মভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া উচ্ছেদ করিবার নালিশ করিতে গেলে উক্ত যে বিশেষ অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ করিয়াছে তাহা নির্দেশপূর্বক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি করিয়া নোটিশ না দিয়া নালিশ করিতে পারা যাইবে না। এবং যদি ঐ প্রজা উপযুক্ত সময়

মধ্যে ঐ ক্ষতিপূরণ করে তাহা হইলেও নালিশ চলিবে না। বর্তমান আইনে উপযুক্ত সময় কাহাকে বলে তাহা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। এইরূপ নোটিশ দেওয়ার বিধান যে কোন প্রজাকে, মধ্যস্বত্বাধিকারী কী রায়ত, উপরোক্ত দুইটি কারণে উচ্ছেদ করিতে গেলে তাহাদিগের সকলের সম্বন্ধে খাটিবে। দখলীস্বত্ব শূন্য রায়ত সম্বন্ধে আরও বিধান করা হয় যে তাহাদিগকে তাহাদের পাট্টার মেয়াদ অতীত হইয়াছে বলিয়া উচ্ছেদ করিতে গেলে তাহাদিগকে মেয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে উঠিয়া যাইবার নোটিশ দিতেই হবে। কিন্তু মেয়াদ অতীত হইয়া ছয় মাস গত হইলে উক্ত কারণে তাহাদিগের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে উক্ত রায়তগণের পাট্টা রেজিস্ট্রারী থাকিলেই এই নোটিশের বিধান খাটিবে। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে বৃদ্ধি খাজনা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া উচ্ছেদ করিতে গেলে ভূম্যধিকারী উক্ত রায়তকে বৃদ্ধি খাজনা দিবার নিমিত্ত নিয়মপত্র অগ্রে অর্পণ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না। এবং উক্ত নিয়মপত্র উক্ত রায়ত লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে তিন মাসের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে নচেৎ তাহা চলিবে না।

কোর্ফা রায়তকে তাহার লিখিত পাট্টা থাকিলে উক্ত পাট্টার মেয়াদ শেষ হইলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে কিন্তু লিখিত পাট্টা থাকিলে তাহাকে উঠিয়া যাইবার জন্য নোটিশ দিবার আবশ্যক নাই। তাহার লিখিত পাট্টা না থাকিলে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইলে তাহার উপর অন্যূন এক বৎসর পূর্বে উঠিয়া যাইবার নোটিশ দেওয়া আবশ্যক অর্থাৎ যে বৎসর তাহার উপর নোটিশ জারি করা হইবে সেই বৎসরের পরবর্তী কৃষি বৎসরের শেষ না হইলে তাহার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ চলিবে না।

খাজনা বৃদ্ধির বিষয়

প্রজাদিগের খাজনা চুক্তি অনুসারে কিম্বা মোকদ্দমা দ্বারা সাধারণত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মধ্যস্বত্বাধিকারী—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে মধ্যস্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে উক্ত মধ্যস্বত্বের খাজনা সাধারণত কেবল দুইটি কারণে বৃদ্ধি হইতে পারে। ১ম—দেশাচার থাকিলে কিম্বা যে সে নিয়মের অধীনে ঐ মধ্যস্বত্ব ভোগ হয় তদনুসারে খাজনা বৃদ্ধি করিবার স্বত্ব থাকিলে; ২য়—যদি ভূমির পরিমাণ না কমা সত্ত্বেও মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহার খাজনা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বৃদ্ধি খাজনা দিতে দায়ি হইয়া থাকেন, এবং যদি ভূমি হইতে ঐ বৃদ্ধি খাজনা তোলা যাইতে পারে তাহা হইলে ভূম্যধিকারী উক্ত মধ্যস্বত্বের খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, নচেৎ পারিবেন না। কিন্তু এই বিধান ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনভুক্ত ছিল না। যদিও এই বিধান উক্ত আইন ভুক্ত ছিল না তথাপি এই দুইটি খাজনা বৃদ্ধি করিবাব কারণ মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এই শ্রেণির প্রজাদিগের খাজনা তাহাদের সমশ্রেণির প্রজাদিগের দেশাচারনুগত হারের অপেক্ষা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। এবং যে স্থলে তদ্রুপ কোন হার নাই সে স্থলে যাহা আদালত হইতে উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা হইবে সেই পরিমাণে খাজনা বৃদ্ধি হইবে। মধ্যস্বত্বাধিকারীর মোট যত খাজনা পাওনা হয় তাহা হইতে আদায় খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য আদালত

তাহাকে দিবেন না। এবং আদালত হইতে উক্ত বৃদ্ধি খাজনার সীমা নির্ধারিত করিতে হইলে মধ্যস্বত্বধিকারী প্রথমে কীরূপ অবস্থায় জমি পাইয়াছিল ও পরে তাহাতে কোন উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকিলে তাহা প্রজার ব্যয় ও পরিশ্রম দ্বারা হইয়াছে কি না এবং ভূমির কোন অংশ উক্ত প্রজা নিজে দখলীকার থাকিলে বা কাহাকে কোন অংশ বিনা করে ভোগ দখল করিতে দিয়া থাকিলে উক্ত সমুদয় জমির সম্বন্ধে কি উপযুক্ত খাজনা হইতে পারে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আদালত উক্ত বৃদ্ধি খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিবেন।

যদি একবার খাজনা বৃদ্ধি করিলে প্রজার কষ্ট বা অসুবিধা হয় তাহা হইলে আদালত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ফি বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি করাইয়া উক্ত নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি হইবার আদেশ দিতে পারেন। আর এই শ্রেণির প্রজার খাজনা আদালত হইতে কিম্বা চুক্তি অনুসারে একবার বৃদ্ধি হইলে পনের বৎসর মধ্যে বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে খাজনা বৃদ্ধি করিবার আদেশ দেওয়ার বিধান ও একবার খাজনা বৃদ্ধি হইলে পুনরায় পনর বৎসর মধ্যে বৃদ্ধি না হইবার বিধান বর্তমান আইনের দ্বারা নতুন করা হইয়াছে।

মোকররী হারের মধ্যস্বত্বাধিকারী ও রায়ত।—যে সকল মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রায়ত তাহাদের ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময় হইতে একই নির্দিষ্ট খাজনায় বা খাজনার হারে ভোগ করিয়া আসিতেছে উক্ত ভূমির পরিমাণ মাপে পূর্বাপেক্ষা বেশি থাকা প্রমাণ না হইলে তাহাদের খাজনা বা খাজনার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে একই নির্দিষ্ট খাজনা বিশ বৎসর দিয়া আসিতে থাকা প্রমাণ হইলে যতক্ষণ বিপরীত প্রমাণ না হয় উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রায়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই হারে খাজনা দিয়া আসিতেছে বলিয়া আদালত দ্বারা অনুমিত হইবে।

দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত—দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে খাজনা দেয় তাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয় তাবৎ আদালত হইতে অনুমিত হইবে অর্থাৎ যদি উক্ত রায়তের দেয় খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত নহে বলিয়া ভূম্যধিকারী তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে চাহেন তাহা হইলে উক্ত খাজনা যে ন্যায্য ও উপযুক্ত নহে তাহা ভূম্যধিকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রজাগণের খাজনা চুক্তি অনুসারে বা মোকদ্দমা দ্বারা বৃদ্ধি হইতে পারে। চুক্তি অনুসারে এই শ্রেণির প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি হইলে উক্ত চুক্তি লিখিত ও রেজিষ্টারি হওয়া আবশ্যক এবং রায়তের পূর্ব দেয় খাজনা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হইবে না। চুক্তি অনুসারে খাজনা বৃদ্ধি হইলে চুক্তি পত্রের তারিখ অবধি ১৫ বৎসর কালের মধ্যে উক্ত খাজনা আর বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না।

কিন্তু যদি কোন রায়ত শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারের অপেক্ষা বেশি হারে বৃদ্ধি খাজনা অন্যূন তিন বৎসর কাল দিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার অব্যবহিত পরে কোন কালের নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে খাজনা দাবি করা হইলে সে উক্ত বৃদ্ধি হারে খাজনা দিতে বাধ্য হইবে। এবং যদি জমিদার কর্তৃক উৎকর্ষসাধনের জন্য উক্ত রায়ত হইতে বৃদ্ধি খাজনা দাবি করা হয় তাহা হইলে যতদিন ঐ উৎকর্ষ সাধনের ফল ভোগ করিতে থাকিবে ততদিন উক্ত রায়ত আবশ্যক হইলে শতকরা সাড়ে বারো টাকা হার

অপেক্ষা বেশি খাজনা দিতে বাধ্য হইবে। আর যদি কোন রায়ত ভূম্যধিকারীর সুবিধার নিমিত্ত বিশেষ কোন ফসল চাষ করিয়া বিশেষ কম খাজনার হারে আপনার ভূমি ভোগ করে এবং পরে, ফসল চাষ করিবার দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য সে যে ন্যায্য ও উপযুক্ত হারে খাজনার বন্দোবস্ত করিতে চাহিবে তৎসম্বন্ধে উক্ত চুক্তি উপরোক্ত বিধান দ্বারা ব্যতিক্রম হইবে না।

যদি কোন রায়ত তাহার দেয় খাজনা সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর সহিত মতভেদ হেতু তাহা নির্ধারিত করিবার নিমিত্ত ও ভবিষ্যতে মোকদ্দমা এড়াইবার জন্য কোন খাজনা দিবার চুক্তি করে তাহা হইলে উক্ত চুক্তি বৃদ্ধি খাজনার চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে না।

মোকদ্দমা দ্বারা এই শ্রেণির রায়তগণের খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে নিম্নলিখিত হেতুতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

১ম, ভূম্যধিকারী যে জমির খাজনা বৃদ্ধি করিতে চাহেন সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট জমির সম্বন্ধে সমশ্রেণির রায়তেরা সেই গ্রামে যে প্রচলিত হারে খাজনা দিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা কম খাজনা কোন রায়ত দিতে থাকিলে এবং উক্ত কম হারে তাহার ভোগ করিবার কোন উপযুক্ত কারণ না থাকিলে তাহার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে।

পূর্বকার আইন "নিকটবর্তী স্থানের" সমশ্রেণির রায়তেরা যে প্রচলিত হারে খাজনা দিত তদনুসারে খাজনা বৃদ্ধি করিবার বিধান ছিল। কিন্তু বর্তমান আইনে নিকটবর্তী স্থানের পরিবর্তে "সেই গ্রামের" উপরোক্ত শ্রেণির রায়তগণের দেয় প্রচলিত হারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আরও পূর্ব আইনে বিরোধীয় কম হারে ভোগ করিবার উপযুক্ত কারণ থাকিলে খাজনা বৃদ্ধির তারতম্য হইবে এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বিধান ছিল না। রায়তগণের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে ভূমি ভোগ করিবার কারণ অনেক থাকিতে পারে। এক্ষণে উপরোক্ত কারণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে এই বিশেষ কারণ সম্বন্ধেও তদন্ত করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে রায়তগণের জাতি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে না। তবে যদি দেশাচার অনুসারে কোন বিশেষ জাতি বিশিষ্ট রাযতেরা কম হবার জমি ভোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত প্রথা ধরিতে হইবে। এবং দেশীয় প্রথানুসারে কোন বিশেষ শ্রেণির রায়তেরা যদি অনুকূল হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকা প্রমাণ হয় তাহা হইলেও দেশাচার অনুসারে খাজনার হার নিরূপণ করিতে হইবে।

"প্রচলিত হার" কাহাকে বলে তাহা নির্ধারিত করা সুকঠিন। অধিকাংশ রায়তগণের দেয় হারকে প্রচলিত হার বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রায়তগণের দেয় খাজনার গড়পড়তা ঠিক করিয়া তাহা প্রচলিত হার বলিয়া নির্ধারণ করা অশুদ্ধ ও তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

এক্ষণে প্রচলিত হার নির্ধারিত করিতে হইলে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বে অন্যূন তিন বৎসর মধ্যে কিরূপ খাজনার হার ছিল তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং এইরূপ উক্ত হার নির্ধারিত করিয়া যদি রায়তের দেয় বিরোধীর হারের সহিত বিশেষ প্রভেদ না থাকা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

যেস্থলে আদালত হইতে স্থানীয় তদন্ত বিনা প্রচলিত হার ঠিক করা সুকঠিন বিবেচিত হইবে সে স্থলে আদালত কোন রাজস্ব কর্মচারি দ্বারা ঐ বিষয় ধার্য করিবার নিমিত্ত আদেশ দিতে পারেন। এবং তদভিপ্রায়ে কলেক্টরের নিকট আদালত হইতে রোধকারী পাঠাইতে

হইবে। আসিস্ট্যান্ট বা ডেপুটি কালেক্টরের নিম্নপদস্থ কোন রাজকর্মচারী দ্বারা এই বিষয় তদন্ত হইতে পারিবে না।

প্রচলিত হার নির্ণয় সময়ে ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ সাধন হেতু কোন খাজনা বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে উক্ত বিষয় ধরা যাইবে না। উৎকর্ষ সাধন হেতু যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা কেবল তজ্জনিত ব্যয়ের সুদের স্বরূপ মাত্র। এ কারণ যে সমুদয় জমিতে ঐরূপ উৎকর্ষসাধন হয় নাই তৎসম্বন্ধে খাজনার হার নির্ণয়কালে তাহা ধরা উচিত নহে।

২য়, যদি বর্তমান খাজনা চলিত থাকিবার সময় মধ্যে প্রধান উৎপাদয খাদ্য শস্যের স্থানীয় গড় দর বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা হইলে এই শ্রেণির রায়তের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

এই কারণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারার বিধান বর্তমান আইনে নতুন করা হইয়াছে। পূর্বে যে জমির খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইত তাহাতে যে শস্য জন্মিত তাহার দাম বৃদ্ধি হইলে খাজনা বৃদ্ধি করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ জমিতে কি শস্য উৎপন্ন হয় তাহা দেখিতে হইবে না। রায়তের ইচ্ছানুসারে যে কোন শস্য সে তাহার জমিতে উৎপন্ন করিতে পারে তজ্জন্য তাহাকে বৃদ্ধি খাজনা দিতে হইবে না।

খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতে গেলে প্রথমে নালিশের অব্যবহিত পূর্বে দশ বৎসরের উক্ত শস্যের গড় দর ঠিক করিতে হইবে। পরে অন্য দশ বৎসর যাহা আদালত উচিত বিবেচনা করিবেন সেই কালের গড় দর ঠিক করিতে হইবে। এই শেষোক্ত গড় দর অপেক্ষা পূর্বোক্ত গড় দর যাহা বেশি হইবে তাহার এক তৃতীয়াংশ প্রথম গড় দর হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা হয় তাহার সহিত শেষ গড় দরের যে অনুপাত হইবে সেই অনুপাত অনুসারে খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইবে। মনে কর, বাংলা দেশে যেখানে ধান্য প্রধান খাদ্য শস্য কোন রায়ত ২ টাকা খাজনা দিয়া আসিতেছে, ইহার খাজনা বৃদ্ধির নালিশ ১৩০১ সালে উপস্থিত করা হইল। এস্থলে প্রথমত, ১২৯১ হইতে ১৩০০ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরের ধান্যের গড় দর স্থির করিতে হইবে; মনে কর, উহা গড়ে ফি মন ৪্ টাকা হইল। পরে ইহার সহিত তুলনার জন্য আদালত ১২৮১ হইতে ১২৯০ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরের গড় দর লওয়া যেন উচিত বিবেচনা করিলেন এবং এই দশ বৎসরের গড় দর ফি মন যেন ১্ টাকা হইল। এক্ষণে দেখা যায় যে প্রথম গড় দর অপেক্ষা শেষ গড় দর ৩্ টাকা বেশি। এই ৩ টাকার এক তৃতীয়াংশ ১ টাকা প্রথম গড় দর হইতে বাদ দিতে হইবে। এক্ষণে অবশিষ্ট ৩ টাকার সহিত শেষ গড় ১ টাকার যে অনুপাত, বৃদ্ধি খাজনার সহিত বর্তমান খাজনা ২ টাকার সেই অনুপাত হইবে। অর্থাৎ বৃদ্ধি খাজনা ৬ টাকা হইবে।

প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড় দর নির্ধারণ জন্য বর্তমান আইনে ৩৯ ধারা দ্বারা গবর্ণমেন্ট হইতে খাদ্য শস্যের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবার বিধান করা হইয়াছে।

যদি গড় দর নির্ধারণ করিবার জন্য দশ বৎসর কাল ধরিয়া তাহা নির্ণয় করা সাধ্য না হয় তাহা হইলে আদালতের বিবেচনা মতে অল্পতর সময় ধরা যাইতে পারে।

এই দফায় যে খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার বিষয় লিখা হইয়াছে ইহা দ্বারা ইহা বুঝা যাইবে না যে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে কোন বৎসর ফসল কম জন্মান হেতু শস্যের দাম বৃদ্ধি হইলে তাহা খাজনা বৃদ্ধির কারণ হইবে। ইহাতে যে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার বিষয় বলা হইয়াছে তাহা সাধারণ বৎসরের মূল্য বলিয়া ধরিতে হইবে।

৩য় দফা—যদি বর্তমান খাজনা চলিত থাকিবার সময় মধ্য ভূম্যধিকারী দ্বারা উৎকর্ষ সাধন হেতু ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা হইলেও খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

পূর্ব আইনে রায়তের ব্যয় ও পরিশ্রম বিনা অন্য কোন কারণে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে বৃদ্ধি খাজনার দাবি করা যাইতে পারিত। কিন্তু বর্তমান আইনের দ্বারা ভূম্যধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষ সাধন বা স্রোতের গতি হেতু উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি না হইলে তন্মূলে খাজনা বৃদ্ধির জন্য নালিশ করা যাইতে পাবিবে না।

জমিদার কর্তৃক উৎকর্ষ সাধন হেতু ধরিয়া বৃদ্ধি খাজনা দাবি করিতে হইলে প্রথমত, উক্ত উৎকর্ষ সাধন বর্তমান আইন মতে রাজস্ব কর্মচারি দ্বারা যে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে, তাহা দেখাইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, উক্ত উৎকর্ষ সাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কী পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভব, ঐ উৎকর্ষ সাধন করিতে কী পরিমাণে ব্যয় হইয়াছে এবং তাহা কৃষি কার্যে লাগাইতে গেলে কত ব্যয়ের আবশ্যক আর ভূমির বর্তমান খাজনা কত ও ইহার আরও বেশি খাজনা দিবার শক্তি আছে কি না, এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই দফার কারণ ধরিব্বা যদি কোন বৃদ্ধি খাজনার ডিক্রি হয় তাহা হইলে পরে উক্ত রায়ত যাহার বিরুদ্ধে উক্ত ডিক্রি হইয়াছে কিম্বা তাহার পরবর্তী এবং উৎকর্ষ সাধন হইতে আনুমানিক ফল না ফলিলে কিম্বা তাহা বন্ধ হইলে উক্ত ডিক্রির সম্বন্ধে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারিবে। এইরূপ পুনর্বিচারের বিধান নতুন হইয়াছে।

৪র্থ দফা—স্রোতের গতি দ্বারা যদি ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় তাহা হইলেও খাজনা বৃদ্ধির দাবি চলিবে। এমনকী যদি নদীর স্রোত পরিবর্তন দ্বারা জমিতে জল সেচনের সুবিধা হইয়া থাকে তাহাও বৃদ্ধি খাজনার কারণ হইবে।

স্রোতের গতি দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে খাজনা বৃদ্ধি হইবার কারণ হইবে বলিয়া যে বিধান করা হইয়াছে তাহা যে সকল জমি সচরাচর বড় বড় নদীর নিকটে থাকিয়া সাধারণত তাহার উপর নদীর পলি পড়িয়া উর্বরা হয় সেই সকল জমির সম্বন্ধেই খাটিবে। কিন্তু যে সকল জমিতে হঠাৎ কোন বৎসর অতি বৃষ্টি হেতু নদীর জল বাড়িয়া বন্যা হইয়া পলি পড়িলে যদি উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় সে স্থলে এ বিধান খাটিবে না। এই বিধান অনুযায়ী খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে যদি উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি কোন কিয়ৎকালীন বা নৈমিত্তিক কারণ হেতু হওয়া বোধ হয় তাহা হইলে তদ হেতু কোন খাজনা বৃদ্ধি হইবে না। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু খাজনা বৃদ্ধি হইলে আদালত উৎপন্নের বৃদ্ধির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দিবেন না।

উপরোক্ত খাজনা বৃদ্ধির কারণ সকল থাকা সত্ত্বেও যদি আদালত খাজনা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও অসঙ্গত বিবেচনা করেন তাহা হইলে খাজনা বৃদ্ধি করিবেন না। আর বৃদ্ধি খাজনার ডিক্রি হইলে যদি উক্ত সম্পূর্ণ বৃদ্ধি খাজনা একবারে দিতে রায়তের কষ্টি এবং অসুবিধা হইবে আদালত বিবেচনা করেন তাহা হইলে উক্ত খাজনা পাঁচ বৎসরের মধ্যে ফি বৎসর অল্প অল্প বৃদ্ধি হইবার আদেশ দিতে পারেন। যদি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ তারিখের পরে খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন চুক্তি হইয়া থাকে কিম্বা শস্যরূপে দেয় খাজনা নগদান খাজনায় পরিণত হইয়া থাকে অথবা একবার কোন বৃদ্ধি খাজনার ডিক্রি হইয়া

থাকে কিম্বা বৃদ্ধি খাজনার মোকদ্দমা যদি দোষ গুণ বিবেচিত হইয়া একবার ডিসমিস হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত ঘটনা সকলের তারিখ হইতে পনের বৎসর মধ্যে প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজান দিতেছে বলিয়া কিম্বা খাদ্য শস্যের দর বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া কোন বৃদ্ধি খাজনার মোকদ্দমা করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু বৃদ্ধি খাজনার মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া দেওয়ানি কার্যবিধির বিধান মতে আদালত হইতে নতুন নালিশের অনুমতিসহ মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়া থাকিলে উক্ত মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার তারিখ হইতে পনের বৎসর গত না হইলেও পুনরায় বৃদ্ধি খাজনার মোকদ্দমা রুজু হইতে পারিবে।

কোত রায়ত শস্যরূপে যত কাল খাজনা দিতে থাকিবে ততকাল তাহার খাজনা বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু যদি উক্ত শস্যরূপে দেয় খাজনা নগদানে খাজনায় পরিণত হয় তাহা হইলে নগদান খাজনার বৃদ্ধির সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে সেই সকল বিধান এ স্থলেও খাটিবে।

দখলিস্বত্বশূন্য রায়ত—রেজিস্টারি চুক্তি বিনা কিম্বা আদালতে বৃদ্ধি খাজনার দরুণ চুক্তিপত্র দাখিল না করিয়া এই শ্রেণির রায়তদিগের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি ইহারা যে কালের নিমিত্ত ইহাদিগের নিকট খাজনা দাবি করা হয় তাহার অব্যবহিত পূর্বে তিন বৎসর কাল কোন হারে খাজনা দিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে সেই হারে খাজনা দিতে বাধ্য। এই শ্রেণির রায়তদিগের বিরুদ্ধে খাজনা বৃদ্ধির জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে সেই গ্রামের সমশ্রেণির রায়তেরা সেই প্রকার সুবিধাবিশিষ্ট জমির জন্য জন্য সচরাচের কি প্রকার খাজনা দেয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আদালত যাহা উচিত ও ন্যায্য বিবেচনা করিবেন তাহা ধার্য করিবেন, এবং আদালত হইতে এই শ্রেণির রায়তদিগের বৃদ্ধি খাজনা ধার্য হইলে তাহারা পাঁচ বৎসর কাল সেই হারে জমি ভোগ করিতে পারিবে। এস্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের বিরুদ্ধে বৃদ্ধি খাজনার মোকদ্দমায় তাহাদিগের দেয় খাজনা বিপরীত প্রমাণ না হওয়া তক ন্যায্য ও উপযুক্ত বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু এই অনুমান দখলীস্বত্বশূন্য রায়তগণের পক্ষে খাটিবে না। এই বিধানগুলি পূর্ব আইনে ছিল না।

কোর্ফা রায়ত—এই শ্রেণির রায়তগণের রেজিস্টারি পাট্টা কিম্বা চুক্তি পত্র থাকিলে ভূম্যধিকারী তাহাদিগের স্ব স্ব দেয় খাজনা অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি টাকা আদায় করিতে পারিবেন না এবং ইহাদিগের ঐরূপ কোন পাট্টা বা চুক্তিপত্র না থাকিলে শতকরা পঁচিশ ভাগের বেশি আদায় করিতে পারিবেন না। এই বিধান বর্তমান আইনে নূতন করা হইয়াছে।

বর্তমান আইনে কোন শ্রেণির প্রজার খাজনা মোকদ্দমা দ্বারা বৃদ্ধি করিতে গেলে পূর্বে তাহাদিগকে উক্ত সম্বন্ধে কোন নোটিশ দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু পূর্বেকার আইনে মোকদ্দমার পূর্বে তৎসম্বন্ধে নোটিশ দিবার আবশ্যক ছিল। বহু সংখ্যক মোকদ্দমা নোটিশ অশুদ্ধ লিখা হেতু এবং নোটিশ জারি প্রমাণ না হওয়া ধরিয়া ডিসমিস হওয়ায় বর্তমান আইনে তৎসম্বন্ধে পূর্বকার বিধান তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং দেখিতে গেলে এক্ষণে বৃদ্ধি খাজনার জন্য কোন অগ্রিম নোটিশ আবশ্যক করে না, কেননা বৎসরের প্রথমে আটমাস মধ্যে বৃদ্ধি খাজনার ডিক্রি হইলে উক্ত ডিক্রি তাহার পর বৎসরে প্রথম হইতে প্রবল গণ্য হইবে, এবং শেষ চারি মাসের মধ্যে ডিক্রি হইলে তাহা আগামি বৎসরের

পরবর্তী বৎসরের প্রথম হইতে বলবৎ হইবে।

উপরোক্ত বিধান ছাড়া যদি কোন প্রজার জমি জরিপে পূর্বকার পরিমাণ অপেক্ষা বেশি থাকা প্রমাণ হয় তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত জমির সম্বন্ধে উক্ত প্রজা বেশি খাজনা দিতে বাধ্য। কিন্তু যদি উক্ত প্রজার দখলে উক্ত জমি বহুকাল হইতে থাকিয়া আসে এবং যদি জমি বিলি করিবার সময় তাহার পরিমাণ বিশুদ্ধরূপে জরিপ না করিয়া চৌহদ্দি নির্দিষ্ট করিয়া বিলি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে যে অতিরিক্ত জমির জন্য ভূম্যধিকারী বেশি খাজনা দাবি করেন উক্ত জমি উক্ত প্রজা তাহার বন্দোবস্তের পরে তাহার যোতের অন্তর্গত করিয়া লওয়া কিম্বা পয়স্তী ক্রমে অর্থাৎ চর স্বরূপ বৃদ্ধি হওয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে তিনি বৃদ্ধি খাজনা পাইবার স্বত্ববান হইবেন না।

খাজনা কম হইবার বিষয়

এক দিকে যেমন জরিপে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে অপর দিকে আবার জরিপে পরিমাণ সিকস্তি হওয়া বা অন্য কোন কারণে কম হইলে খাজনা কম হইতে পারে। পূর্বে এই কারণ ধরিয়া কেবল দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা খাজনা কম পাইবার দাবি করিতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে সকল শ্রেণির প্রজারা এই কারণে জমা কমাইবার দাবি করিতে পারে।

উপরোক্ত কারণ ছাড়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নিম্নলিখিত দুইটি কারণেও জমা কম পাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। ১ম, যদি রায়তের বিনা দোষে বালি জমা হওয়া হেতু কিম্বা অন্য কোন কারণে জমি স্থায়ীরূপে অপকৃষ্ট হইয়া থাকে; ২য়, বর্তমান খাজনা চলিত থাকিবার সময় প্রধান উৎপাদ্য খাদ্যশস্যের গড় দর কমিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে জমা কম হইতে পারিবে। কিন্তু যদি উক্ত দর কোন বিশেষ কারণে অল্পকালের জন্য কম থাকিবে আদালত বিবেচনা করেন তাহা হইলে জমা কম হইবে না।

উপরোক্ত কারণ সকল বিনা অন্য কোন কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত জমা কম হইবার জন্য দাবি করিতে পারিবে না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে যদিও জমির পরিমাণ জরিপে কম হওয়া কারণ ব্যতীত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তগণ ছাড়া অপর শ্রেণির প্রজাগণ কী কী কারণে খাজনা কম পাইবার স্বত্ববান তাহা ভূম্যধিকারী ও প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে উল্লেখ নাই তত্রাচ তাহারা কোন উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারিলে জমা কমাইবার দাবি করিতে পারে।

হস্তান্তর

মধ্যস্বত্ব—চিরস্থায়ী-মধ্যস্বত্ব সকল বিপরীত দেশাচার না থাকিলে হস্তান্তরযোগ্য।

বর্তমান আইন জারি পূর্বে সকল চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। এজন্য কোন্ কোন্ চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য ছিল ও কোন্ কোন্ চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য ছিল না এতদ সম্বন্ধে বিচার সংক্রান্ত অনেক গোলযোগ ঘটিত। কিন্তু প্রায় সকল চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব এখনকার ন্যায় উত্তরাধিকারী সূত্রে ভোগ দখল করা যাইতে পারিত।

পূর্বে চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব সকল দান, বিক্রয় বা অন্য রকমে হস্তান্তরিত করিতে গেলে উপরিস্থ জমিদারের সেরেস্তায় রেজিস্টারি করাইতে হইত, নচেৎ উক্ত হস্তান্তর দ্বারা জমিদার বাধ্য হইতেন না; এবং সাবেক প্রজা উক্ত মধ্যস্বত্বের খাজনার জন্য দায়ি থাকিত।[১] কিন্তু এক্ষণে চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব সকল দান, বিক্রয় বা বন্ধক ক্রমে হস্তান্তরিত হইলে জমিদারের সেরেস্তায় তাহা রেজিস্টারি করিতে হইবে না।

বর্তমান আইন অনুসারে এইরূপ হস্তান্তর আইনতঃ বলবৎ করিতে গেলে উক্ত হস্তান্তর সম্বন্ধীয় লিখিত দলিল হওয়া ও তাহা রেজিস্টারি করিবার সময় রেজিস্টারির দরুণ যে ফি দেওয়া আবশ্যক তাহা ছাড়া ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত হস্তান্তরের নোটিশ জারির নিমিত্ত নির্ধারিত রুজিনা ও উক্ত মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে দেয় বাৎসরিক খাজনার উপর শতকরা ২ টাকা হিসাবে ভূম্যধিকারীর ফি বলিয়া টাকা রেজিস্টারি অফিসে দাখিল করিতে হইবে, নচেৎ উক্ত হস্তান্তর রেজিস্টারি হইবে না। এবং যেস্থলে উক্ত মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে কোন খাজনা দেওয়া না হইয়া থাকে সে স্থলে ভূম্যধিকারীর ফি বলিয়া মোট ২ টাকা দিতে হইবে।

কোন হস্তান্তর সম্বন্ধে বাৎসরিক খাজনা যাহাই হউক ভূম্যধিকারীর ফি ১ টাকা অপেক্ষা কম কিম্বা ১০০ টাকার বেশি হইবে না। হস্তান্তর সম্বন্ধে দলিল রেজিস্টারি হইলে পর রেজিস্টারিকরণের কর্মচারিকে উক্ত ভূম্যধিকারীর ফি ও হস্তান্তরের নোটিশ কলেক্টরের নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং কলেক্টর উক্ত ফি ও নোটিশ জমিদারের নিকট পাঠাইবেন।[২]

হস্তান্তরের দলিল রেজিস্টারি হইলেই ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত হস্তান্তরের নোটিশ রীতিমত জারি না হইয়া থাকিলেও উক্ত হস্তান্তর আইনতঃ প্রবল হইবে। এবং তদ্বারা ভূম্যধিকারী বাধ্য থাকিবেন।[৩] এমন কী যদি হস্তান্তর বর্তমান আইন অনুসারে রেজিস্টারি হইয়া থাকে তাহা হইলে ভূম্যধিকারী উক্ত হস্তান্তরের কোন নোটিশ পাইয়া না থাকিলেও সাবেক প্রজা তাহার পরের খাজনার জন্য দায়ি নহে।[৪] কিন্তু যদি ভূম্যধিকারীর সহিত এরূপ চুক্তি থাকে যে উপযুক্ত জামিন না দিলে উক্তরূপ হস্তান্তর প্রবল হইবে না তাহা হইলে ঐরূপ জামিন না দিয়া থাকিলে উক্ত হস্তান্তর রীতিমত রেজিস্টারি হইলেও সাবেক প্রজা খাজনার দরুণ দায়ি থাকিবে।[৫]

মধ্যস্বত্ব দান, বিক্রয় বা বন্ধক ক্রমে হস্তান্তর করিতে গেলে তাহা রেজিস্টারি করিবার সময় সেরূপ ভূম্যধিকারীর ফি ও নোটিশ জারির রতজিনা দাখিল করিতে হয় ও পরে তাহা কালেক্টরের নিকট পাঠাইতে হয় সেইরূপ আদালত কর্তৃক দেন ডিক্রিতে মধ্যস্বত্ব নিলাম হইলে কিম্বা তৎসম্বন্ধে বয়বাদ সিদ্ধ হইলে উক্ত নিলাম মঞ্জুরের ও বয়বাদ সিদ্ধের চূড়ান্ত হুকুমের পূর্বে আদালত নিলাম খরিদদার ও বন্ধক গৃহীতা হইতে উপরোক্ত মতে ভূম্যধিকারীর ফি এবং ভূম্যধিকারীর উপর তৎসম্বন্ধে নোটিশ জারি করিবার তলবনা তলব করিয়া লইবেন এবং পরে উক্ত নিলাম মঞ্জুর হইলে কিম্বা বয়বাদ সিদ্ধ হইলে উক্ত ভূম্যধিকারীর ফি ও হস্তান্তরের নোটিশ ভূম্যধিকারীকে দিবার জন্য কলেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু যদি কোন মধ্যস্বত্ব বাকি খাজনার জন্য ডিক্রি জারিতে নিলাম হয় তাহা হইলে আদালত কেবল উক্ত নিলাম সম্বন্ধে নোটিশ কলেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

এস্থলে কোন ফি আবশ্যক নাই।[৬] এতদ সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে বাকি খাজনার ডিক্রি জারিতে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নিলাম হইলে মোকদ্দমার রুজুর তারিখ হইতে নিলামের তারিখ অবধি কোন খাজনা বাকি থাকিলে তজ্জন্য সাবেক প্রজা দায়ি। নিলাম খরিদদার কিম্বা উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত দায়ি নহে।[৭]

কোন ব্যক্তি মধ্যস্বত্ব উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইতে গেলে তৎসম্বন্ধে তাহাকে নোটিশ ও ভূম্যধিকারীর ফি এবং তাহার উপর নোটিশ জারির রুজিনা কলেক্টরের নিকট পাঠাইতে হইবে, নচেৎ উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহার অধীনস্থ উক্ত মধ্যস্বত্বের প্রজাগণ হইতে মোকদ্দমা বা ক্রোক অথবা অন্য কার্যানুষ্ঠান দ্বারা খাজনা আদায় করিতে সমর্থ হইবেন না।

মোকররী হারের রায়তের স্বত্ব—এই শ্রেণির রায়তের স্বত্ব হস্তান্তর[৮] বা উত্তরাধিকারী সূত্রে ভোগ দখল বিষয়ে মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিধান পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তৎসমুদয় খাটিবে।[৯]

দখলীস্বত্ব—বর্তমান আইনে দখলীস্বত্ব হস্তান্তরিত হইতে পারিবে বলিয়া কোন স্পষ্ট বিধান করা হয় নাই। তবে দেশীয় প্রথা থাকিলে এরূপ স্বত্ব হস্তান্তর হইতে পারিবে।[১০] দখলীস্বত্ব যে স্থানীয় প্রথানুসারে হস্তান্তর করা যাইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং এতদ্ সম্বন্ধে বহুতর নজির হইয়াছে।[১১] কিন্তু এইরূপ প্রথা প্রচলিত থাকার স্পষ্ট প্রমাণ বিনা ইহা হস্তান্তরিত করা যাইতে পারিবে না।[১২]

এস্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে মধ্যস্বত্ব ও মোকররী হারের রায়তের স্বত্ব সচরাচর হস্তান্তর যোগ্য তবে যদি কোন স্থানে উক্ত স্বত্ব হস্তান্তর না করার প্রথা থাকে সেস্থলে উক্ত স্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু দখলি স্বত্ব সম্বন্ধে তাহা হস্তান্তরিত করিবার দেশীয় প্রথা না থাকিলে তাহা হস্তান্তরিত হইবে না।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার প্রথা থাকিলে এবং সে মতে হস্তান্তরিত হইলে উক্ত হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় রেজিস্টারি করিবার আবশ্যক নাই।[১৩] পূর্বকার আইন অনুসারে কোন মধ্যস্বত্ব হস্তান্তরিত হইলে তাহা জমিদারের সেরেস্তায় রেজিস্টারি করিবার বিধান ছিল। বর্তমান আইন মতে মধ্যস্বত্ব কি দখলি স্বত্ব হস্তান্তরিত হইলে উক্ত হস্তান্তর জমিদারের সেরেস্তায় রেজিস্টারি করা আবশ্যক নাই। কিন্তু মধ্যস্বত্ব হস্তান্তরিত হইলে তাহা পূর্বোল্লিখিত মতে রেজিস্টারি করা প্রয়োজন নচেৎ আইনত হস্তান্তর প্রবল হইবে না।

দখলীস্বত্ব দেশের প্রথানুসারে হস্তান্তর যোগ্য হইলেও ভূম্যধিকারীর সম্মতি না লইয়া উক্ত প্রথানুসারে হস্তান্তরিত করিলে ভূম্যধিকারীকে উক্ত হস্তান্তর সম্বন্ধে নোটিশ দেওয়া আবশ্যক এবং যতকাল ঐ নোটিশ দেওয়া না হয় ততকাল সাবেক প্রজা ও হস্তান্তর ক্রমে গৃহীতা উভয়ই উক্ত যোতের হস্তান্তরের পরের খাজনার জন্য দায়ি থাকিবে।[১৪]

বর্তমান আইনে চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব, মোকররী হারের 'রায়তের' স্বত্ব ও দখলীস্বত্বের হস্তান্তর সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রজাস্বত্বের হস্তান্তরের বিষয় কোন স্পষ্ট বিধান দৃষ্টি হয় না। কিন্তু যদি ঐরূপ প্রজাস্বত্ব দেশের প্রথানুসারে হস্তান্তর যোগ্য হয় তাহা হইলে ১৮৩ ধারায় বিধানুসারে হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু উক্ত হস্তান্তর সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীকে নোটিশ না দেওয়া হইলে সাবেক প্রজা খাজনার দরুণ দায়ি থাকিবে।[১৫]

কোন প্রজা তাহার মধ্যস্বত্বের কিম্বা যোতের কোন অংশ ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি বিনা হস্তান্তর করিতে পারিবে না।[১৬] এই বিধান পূর্বেও ছিল। কোন এজমালী প্রজাস্বত্বের খাজনা শরিকেরা পৃথক পৃথক তাহাদের অংশানুসারে দিয়া আসিয়া থাকিলেও ভূম্যধিকারী সমুদয় শরিকগণকে খাজনার জন্য দায়ি করিতে পারেন।[১৭] খাজনা গ্রহণ ও দাখিলা দেওয়া দ্বারা ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি খাজনা গ্রহণ ও দাখিলা দেওয়া দ্বারা ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি থাকা বুঝা যাইবে না।[১৮]

পূর্বে কোন প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা তাহার যোতের কোন অংশ হস্তান্তরিত করিলে ভূম্যধিকারী উক্ত যোত খাসদখল করিয়া লইতে পারিতেন।[১৯] কিন্তু বর্তমান আইন অনুসারে কোন যোত সম্পূর্ণ বা ইহার কোন অংশ ভূম্যধিকারীর বিনা সম্মতিতে হস্তান্তরিত হইলেও উক্ত হস্তান্তর জন্য ভূম্যধিকারী খাসদখলের দাবি করিতে পারিবেন না।[২০]

অধঃস্থ প্রজাবিলি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত রাজস্ব লইয়া জমিদারগণের হস্তে জমির মালিকীস্বত্বে অর্পণ করিয়া মফঃস্বলে তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত হেতু সকল প্রকার পরিশ্রম ও ব্যয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এবং অনেক জমিদার ও ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব জমিদারির ভিতর গবর্ণমেন্টের উদাহরণ অবলম্বন পূর্বক পওনী প্রভৃতি সৃজন করিয়া উক্তরূপ কষ্ট ও ব্যয় হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে পওনী সকল এত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল যে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে গবর্ণমেন্ট এই সকল মধ্যস্বত্ব আইনবদ্ধ করেন ও যাহাতে জমিদারেরা তাহাদের অধীনস্থ পওনীদারগণ হইতে সুবিধা মতে খাজনা আদায় করিতে পারেন সেই জন্য উক্ত খ্রিস্টাব্দে রেগুলেশন প্রচার করেন। গবর্ণমেন্ট যেরূপে জমিদারগণ হইতে রাজস্ব আদায় করিতে পারেন প্রায় সেইমত উক্ত রেগুলেশনের দ্বারা জমিদারেরাও পওনীদারগণ হইতে খাজনা আদায় করিবার ক্ষমতা পান। এক্ষণে বঙ্গদেশে উক্তরূপ পওনী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্ব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে যে নিতান্ত অল্প ভূমিই জমিদারগণের খাস দখলে আছে।[২১] একা বাখরগঞ্জ জেলায় অন্যুন তের শ্রেণির মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা আছে।[২২] তন্মধ্যে তালুক, ও সাততালুক, নিমত্বসাত তালুক, হাওলা, ও সাত-হাওলা, নিমহাওলা ও সাতনিমহাওলা ও কায়েম খরসা প্রধান।[২৩] সেরূপ চট্টগ্রাম জেলায় তালুক, ইতমাম ও দর ইতমাম বলিয়া মধ্যস্বত্ব প্রচলিত আছে।[২৪] মধ্যস্বত্ব সকল ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সবড়িভিসনে মধ্যস্বত্বাধিকারীকে চকদার বলে।

বর্তমান আইনের ১৭৯ ধারার দ্বারা জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত প্রদেশে তাহাদিগের অধীনে চিরস্থায়ী মোকররী বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন বলিয়া বিধান হয়। কিন্তু জমিদারগণের এই ক্ষমতা পূর্বতন রেগুলেশন দ্বারাও ছিল এবং ইহা পূর্বেই বিকৃত হইয়াছে। মধ্যস্বত্বাধিকারীরাও এই ক্ষমতা পূর্বাবধি দেশের

প্রচলিত প্রথানুসারে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন[২৫] এবং বর্তমান আইনে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইল।

দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও পূর্ব আইন অনুসারে তাহাদের অধীনে জমি আবার অন্যকে বিলি করিতে পারিত।[২৬] বর্তমান আইন অনুসারে কী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কী দখলস্বত্বশূন্য রায়ত তাহাদের অধীনে কোর্ফা বিলি করিতে পারে; কিন্তু উক্ত বিলির সম্বন্ধে তাহার উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর সম্মতি না থাকিলে তাহা রেজিস্টারি দলিলের দ্বারা হওয়া আবশ্যক নচেৎ উক্ত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রবল হইবে না। এবং উক্ত কোর্ফা বিলি ৯ বৎসরের অধিক কালের জন্যও হইতে পারিবে না।[২৭]

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে কোন প্রজা তাহার অধীনে নিজের স্বত্বের অতিরিক্ত স্বত্ব দিয়া কিম্বা নিজের মেয়াদের অতিরিক্ত কালের জন্য কোন প্রজা বিলি করিতে পারিবে না।[২৮]

খাজনা অনাদায়ে শস্যাদি ক্রোক

রায়তগণের খাজনা অনাদায়ে তাহাদের শস্যাদি ক্রোকের বিধান এদেশে পূর্বে ছিল না। ইহা ইংলণ্ড দেশের এতদ সম্বন্ধে আইন সকল হইতে অনুকরণ করা হইয়াছে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইন প্রচার হইবার পূর্বে ভূম্যধিকারীরা রায়তগণ তাহাদের দেয় খাজনা দিতে ত্রুটি করিলে কী কী ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিতেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে তন্মধ্যে পূর্বতন রেগুলেশন দ্বারা রায়তগণ খাজনা না দিলে তাহাদিগের জমির শস্য বা যে কোন উৎপন্ন কিম্বা গরু মহিষাদি অথবা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তি তাহাদিগের নিজের বাটিতে থাকুক বা অন্যের নিকট থাকুক তৎসমুদয়ে ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ভূম্যধিকারী বাকি খাজনা আদায় করিতে পারিতেন। এই ক্ষমতা তাহাদের ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইন প্রচার হইবার পূর্ব পর্যন্ত ছিল। শেষোক্ত আইনের দ্বারা উক্ত বিধান রদ হয়।[২৯] উক্ত আইনের দ্বারা যে জমির খাজনা বাকি থাকে কেবল সেই জমির শস্য বা অন্য কোন উৎপন্ন ক্রোক করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয় এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ক্রোক করিবার ক্ষমতা তাহাদিগকে দেওয়া গিয়াছিল না।[৩০] বর্তমান আইনের দ্বারা পুনরায় ভূম্যধিকারীগণের উক্ত ক্ষমতা আদালতের সাহায্য বিনা পরিচালনা করিতে না পারিবার বিধান করা হয় অর্থাৎ উক্ত ক্ষমতা এক্ষণে পরিচালনা করিতে গেলে ভূম্যধিকারীগণকে আদালত তৎসম্বন্ধে দরখাস্ত করিতে হইবে।[৩১] এস্থলে বলা আবশ্যক সে যদি এক বৎসরের অধিক কালের খাজনা বাকি থাকে কিম্বা পূর্ব বৎসরের দেয় খাজনা অপেক্ষা বেশি খাজনার নিমিত্ত দাবি করা হয় তাহা হইলে এইরূপ শস্য ক্রোক হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি পূর্ব বৎসরের দেয় খাজনা অপেক্ষা বেশি খাজনার দাবির সম্বন্ধে কোন লিখিত চুক্তি বা আদালতের কোন আদেশ থাকে তাহা হইলে এইরূপ ক্রোক হইতে পারিবে। কোন রায়ত বাকি খাজনার জন্য ভূম্যধিকারীর নিকট জামিন দিয়া থাকিলে এরূপ ক্রোক করিতে পারা যাইবে না কিম্বা উক্ত রায়ত যদি ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি অনুসারে কোর্ফা বিলি করিয়া থাকে তাহা হইলে যে অংশ উক্তরূপ কোর্ফা বিলি হইয়াছে তাহার কোন শস্য উক্ত রায়তের বাকি খাজনার দরুণ ক্রোক করা যাইতে পারিবে না। জমির উৎপন্ন ক্রোক করিয়া খাজনা আদায়ের বিধান কেবল রায়ত ও কোর্ফা রায়ত সম্বন্ধে খাটিবে।

স্বত্বের লিখন ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধান

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক যে কোন স্থানের ভূমি সম্বন্ধে জরিপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং কোন কোন স্থলে উক্ত অনুমতি না লইয়াও ইহা প্রস্তুত করিবার আদেশে দিতে পারিবেন। এই বিধান বঙ্গদেশে বর্তমান আইন দ্বারা প্রথম প্রচারিত হয়। এই বিধান দ্বারা কী প্রজা কী ভূম্যধিকারী উভয়েরই যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবার সম্ভব। যে যে স্থানে ভূম্যাধিকারী ও প্রজাগণের মধ্যে কর সংক্রান্ত বিবাদ বিসম্বাদ সতত হইয়া থাকে সেই স্থলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে। এই বিধানানুযায়ী রাজস্ব কর্মচারিকে যিনি এই বিষয়ের জন্য নিযুক্ত হইবেন কর সংক্রান্ত সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। স্বত্ব লিখন প্রস্তুত সময়ে যদি কোন প্রজার জমি জমার সম্বন্ধে আপত্তি উপস্থিত না হয় এবং উক্ত প্রজা যে জমির জন্য সে খাজনা দিয়া থাকে তদপেক্ষা বেশি বা কম জমি দখল না করে তাহা হইলে উক্ত কর্মচারি প্রজার সম্বন্ধে খাজনার কোন তারতম্য না করিয়া তাহার কাগজে তাহার জমা জমি লিখিয়া লইবেন। উত্তরকালে উক্ত দলিল আদালতে উক্ত জমি জমার সম্বন্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইবে। কিন্তু সে স্থলে জমি জমা লইয়া ভূম্যধিকারীর সহিত প্রজার তর্ক উপস্থিত হইবে কি যে স্থলে প্রজা তাহার জমার প্রকৃত জমি অপেক্ষা কম কিম্বা বেশি জমি দখল করিয়া থাকে সে স্থলে উক্ত রাজস্ব কর্মচারী দেওয়ানী আদালত যে যে প্রণালী ও সেরূপ আইন অনুসারে উক্ত বিবাদ মীমাংসা করিয়া থাকেন সেই সেই প্রণালী ও আইন অবলম্বন করিয়া উক্ত বিবাদ মীমাংসা করিবেন এবং উক্ত জমির উপযুক্ত খাজনা স্থির করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিবেন।[৩২] এবং উক্ত রাজস্বকর্মচারীর বিচার সম্বন্ধে সাধারণ দেওয়ানি আদালতের হুকুম বিরুদ্ধে যেরূপ আপিল হইয়া থাকে সেইরূপ আপিল বিশেষ জজের নিকট এবং পরে হাইকোর্টে হইবার বিধান হইয়াছে।[৩৩] এতদ্‌সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারির বিচার দেওয়ানি আদালতের বিচারের ন্যায় রেসজুডিকেটা বলিয়া গণ্য হইবে।[৩৪]

বর্তমান প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন দ্বারা ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ (বেঙ্গল কাউন্সিল) আইন রদ হওয়ায় গবর্ণমেন্টকে অন্যান্য জমিদারের ন্যায় নিজ খাসমহলে রাজস্ব নির্ণয় জন্য প্রজাদিগের সহিত খাজনার বন্দোবস্ত ও তাহাদিগের খাজনার তারতম্য করিতে হইলে এই আইনের বিধান অনুসারে কার্য করিতে হইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা বোঝা যাইবে না যে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইন জারি হইবার পূর্বে পূর্ব রেগুলেশন অনুযায়ী গবর্ণমেন্টের রাজস্ব ধার্য করিবার যে সকল ক্ষমতা ছিল তাহা বর্তমান আইন দ্বারা হ্রাস হইয়াছে।[৩৫]

যে সকল কর্মচারিরা এই বিধান অনুসারে স্বত্ব লিখন প্রস্তুত জন্য নিযুক্ত হইবেন নিকটবর্তী জমিদারগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে স্বত্বের বিচার করিবার তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই।[৩৫] কিম্বা যে জমি লাখরাজ স্বরূপ ভোগ হইয়া আসিতেছে তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া মালভুক্ত করিবার ও তৎসম্বন্ধে কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতাও তাহারা রাখেন না।[৩৬] পরস্পর নিকটবর্তী জমিদারির সীমা সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা নির্ধারণ করিবারও কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই।[৩৭] যদি কোন জমির সম্বন্ধে দুই ব্যক্তি প্রত্যেকে ইহার প্রজা বলিয়া দাবি করে তাহা হইলে সেটলমেন্ট অফিসার কর্তৃক যে ব্যক্তি

প্রজা বলিয়া ধার্য হইবে তাহার নাম জরিপি কাগজে লেখা যাইবে কিন্তু তাহার উক্ত বিচার পরে তাহাদিগের মধ্যে উক্ত জমির স্বত্ব সম্বন্ধে দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহা রেসজুডিকেটা বলিয়া গণ্য হইবে না, অর্থাৎ উক্ত জমির স্বত্ব নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় দেওয়ানি আদালতে বিচার হইতে পারে।[৩৮]

বাস্তুজমি

বঙ্গদেশে বাস্তুজমি সম্বন্ধে আইন এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত রহিয়াছে। বর্তমান প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৮২ ধারা দ্বারা বিধান করা হইয়াছে যে যদি কোন রায়ত নিজের যোতের অংশ না হইয়া বাস্তু ভূমি ভোগ করে তাহা হইলে উক্ত বাস্তু সম্বন্ধে স্বত্বাদি দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে না হইলে বর্তমান আইনের বিধান সকল তৎসম্বন্ধে খাটিবে।[৩৯]

কোন যোত বাস্তুভূমির জন্য লওয়া হইয়াছে এবং কোন যোত বা কৃষিকার্যের জন্য লওয়া হইয়াছে তাহা নির্ধারিত করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে উক্ত যোতের ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য কী। যদি বাস্তুস্বরূপ ব্যবহার করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে উক্ত যোত সম্বন্ধে খাজনা আইনের বিধান খাটিবে না। কিন্তু যদি কৃষিকার্য করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হয় এবং বাস্তু প্রস্তুত কৃষিকার্যের নিমিত্তই হইয়া থাকে তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান খাটিবে।[৪০] বাস্তুজমির খাজনা ও কৃষির জমির খাজনা পৃথক পৃথক দিয়া থাকিলেও উক্ত বাস্তু রায়তী যোতের অন্তর্গত হইলে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিধান উক্ত বাস্তু সম্বন্ধে খাটিবে।[৪১]

রায়তের কৃষি যোতের অন্তর্গত না হইলে কিম্বা দেশের প্রথা না থাকিলে বাস্তুজমিতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।[৪২] কিন্তু রায়তী জমিতে যদি কোন রায়ত গৃহনির্মাণ করে তাহা হইলে উক্ত গৃহনির্মাণ হেতু উক্ত রায়তের দখলী স্বত্ব নষ্ট হইবে না।[৪৩]

যে স্থলে কী উদ্দেশ্য জমি প্রধানত বিলি হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে স্থলে যদি কোন ব্যক্তি ভূম্যাধিকারীর সহিত গৃহনির্মাণের জন্য কোন বন্দোবস্ত না করিয়া উক্ত ভূমিতে গৃহনির্মাণ করে তাহা হইলে তাহাকে উক্ত জমি হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে।[৪৪] কিন্তু যে স্থলে কোন ব্যক্তি অনেক বৎসরাবধি ইমারত নির্মাণ করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে সে স্থলে আদালত হইতে উক্ত জমি উক্ত গৃহনির্মাণের জন্য বিলি হওয়া ও উক্ত বিলি কায়েমি বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।[৪৫]

যদি কোন ব্যক্তি কোন জমিতে ভূম্যধিকারীর অনুমতি লইয়া কোন কাচা গৃহ নির্মাণ করে এবং তাহাতে সে বহুদিবস বাস করিয়া থাকিবার পরে তাহা নিলাম হইলে উক্ত নিলাম খরিদ্দারকে উক্ত ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিতে সক্ষম নহেন এবং উক্ত জমিতে পূর্বোক্ত ব্যক্তির হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব থাকা ধরা যাইবে।[৪৬]

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে বর্তমান আইনের ১৮২ ধারার বিধান কেবল রায়তগণের বাস্তু সম্বন্ধে খাটিবে অন্য কোন শ্রেণির প্রজার সম্বন্ধে খাটিবে না।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস্তু সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে চট্টগ্রাম জেলায় দ্রোণপ্রতি দেড় কাণি জমি বিনা খাজনায় প্রজাগণের বাস্তুর জন্য পাইবার প্রথা ছিল। এখন পর্যন্ত উক্ত জেলায় তালুকদার, ইতমামদার ও কায়েমি রায়তেরা বাস্তুর নিমিত্ত কোন

খাজনা দেয় না ও তাহারা তাহাদিগের যোতের অংশ বলিয়া উক্ত বাস্তুভোগ করিয়া থাকে। যোতদারগণের উক্ত জেলায় সচরাচর তাহাদের বাস্তুর জন্য মোকররী জমা লইবার প্রথা আছে। এবং যে স্থলে বাস্তু তাহাদের কৃষির যোত হইতে পৃথক সে স্থলে বাস্তুর জন্য কিছু বেশি খাজনা ধার্য হইয়া থাকে।[৪৭]

ভাগলপুর জেলায় পূর্বে কৃষকেরা তাহাদের বাস্তুর জন্য কোন খাজনা দিত না। এবং এখন পর্যন্তও অনেক কৃষকেরা বাস্তুজমি বিনা খাজনায় দখল করিতেছে; কিন্তু কোন কোন জমিদার অধুনাতন বাস্তু জমির জন্য পৃথক খাজনা লইয়া থাকেন। যে সকল প্রজা কৃষক নহে তাহাদের বাস্তুর খাজনা তাহাদিগের জাতি ও ব্যবসা অনুসারে নির্ধারিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের বাস্তুর জন্য কোন খাজনা লওয়া হয় না। অন্যান্য শ্রমজীবি প্রজাদিগের নিকট হইতে বাস্তুর খাজনার পরিবর্তে বেগার লওয়ার প্রথা আছে, অর্থাৎ তেলি হইতে তেল, গোয়ালা হইতে ঘি এবং অন্যান্য শ্রমজীবি প্রজা হইতে তাহাদের ব্যবসার সামগ্রী কিছু কিছু করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।। মুঙ্গের জেলায়ও এইরূপ প্রথা প্রচলিত। পূর্ণিয়া জেলায় কৃষক ও সম্ভ্রান্ত রায়তগণ হইতে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ গ্রামে বাস্তুর জন্য কোন খাজনা লওয়ার প্রথা নাই। কিন্তু মালদহ জেলায় বাস্তুভূমি নিষ্করে ভোগ করা দৃষ্ট হয় না, এবং তথায় বাস্তুজমির খাজনা প্রচলিত হার অনুসারে বৃদ্ধি করিতে পরিবারও নিয়ম আছে।[৪৮]

মেদিনীপুর জেলায় কোন রায়ত তাহার যোত হইতে উচ্ছিন্ন হইলে উক্ত যোতের অন্তর্গত তাহার বাস্তুও তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু হুগলি জেলায় কোন রায়তের যোত উচ্ছিন্ন হইলে তাহাকে বাস্তু হইতে তুলিয়া না দিয়া উক্ত বাস্তুর সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বেশি খাজনা ধার্য করিয়া বন্দোবস্ত করিবার প্রথা আছে। বাঁকুড়া জেলায় বাস্তুভূমির বন্দোবস্ত সচরাচর কৃষি জমির বন্দোবস্ত হইতে পৃথক। একারণ কৃষি যোত হইতে উচ্ছিন্ন হইলে রায়তকে তাহার বাস্তু হইতে উচ্ছিন্ন হইতে হয় না। বীরভূম জেলায় ও এইরূপ প্রথা প্রচলিত। বর্ধমান জেলায় যোত উচ্ছিন্ন নিতান্ত কম হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন রায়তেরা তাহাদের বাস্তুজমি বাদ রাখিয়া তাহাদের জমি ইস্তফা দিয়া থাকে এবং উক্ত বাস্তুজমির জন্য তাহারা পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া থাকে।[৪৯]

পূর্ববাঙলা প্রদেশে যে সকল রায়তের বাস্তু তাহাদের কৃষি যোতের অন্তর্গত, তাহাদিগকে কৃষি যোত হইতে উচ্ছিন্ন হইতে হইলে বাস্তু হইতেও উচ্ছিন্ন হইতে হয়।[৫০]

এইরূপে বাস্তুজমির সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। বর্তমান আইনের দ্বারা বাস্তুজমি সম্বন্ধীয় স্বত্বাদি দেশীয় প্রচলিত প্রথানুসারে নির্বাচিত হইবার যে বিধান করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক নহে; কেন না সচরাচর দেখা যায় যে আদালতে দেশের প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি আইনত প্রমাণ করা নিতান্ত দুরূহ। বহুদর্শী ও সুবিজ্ঞ জজ ফিলড সাহেব প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধীয় তাঁহার মিনিটে বলিয়া গিয়াছেন যে দেশীয় প্রথা সম্বন্ধে প্রমাণ, তিনি যতদূর জানিতেন কেহ আদালতে উপস্থিত করিতে পারে নাই।[৫১] বাস্তুজমির সম্বন্ধে নির্দিষ্ট বিধান সকল পৃথকরূপে আইন ভুক্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

লাখেরাজ জমি

প্রাচীন দেশাচার অনুসারে এদেশে রাজার সকল প্রকার জমির কর গ্রহণ করিবার স্বত্ব আছে। একারণ রাজা স্বয়ং কিম্বা তাহার অনুমতি অনুসারে কোন রাজকীয় কর্মচারি উক্ত কর গ্রহণের স্বত্ব ত্যাগ না করিলে কেহ কোন ভূমি নিষ্করে ভোগ করিতে সক্ষম নহেন। যদি কোন ব্যক্তি রাজার কোন অনুমতি না লইয়া নিষ্করে কোন ভূমি দান করিতেন তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইত।[৫২] এদেশে পূর্বে রাজ সরকার হইতে ধর্মানুষ্ঠান কিম্বা অন্য কোন পুণ্যকার্যের উদ্দেশে অথবা কোন বাজকীয় কারণে নিষ্করে ভূমি দান করিবার প্রথা ছিল।[৫৩] কিন্তু অনেক সময়ে জমিদারেরা ও রাজকর্মচারিগণ ধর্মানুষ্ঠন বা অন্য কোন সৎকার্যের ভান করিয়া নিজের বা তাহাদের আত্মীয়স্বজনের উপকারার্থে অনেক লাখেরাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ লাখেরাজ সৃষ্টিহেতু সরকারের রাজস্বের অত্যন্ত ক্ষতি হইত। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট যখন দেওয়ানি প্রাপ্ত হন তখন এদেশে কী পরিমাণ জমি ও কোন্ কোন্ জমি লাখেরাজ ছিল তাহার কোন রেজিস্টারি ছিল না; এবং উক্তরূপে কোন রেজিস্টারি না থাকায় জমিদারগণ ও সময়ে সময়ে যে সকল রাজকর্মচারির হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল তাহারা দেওয়ানি প্রাপ্তির পূর্বের তারিখ দিয়া অনেক লাখেরাজ সনন্দ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট দেওয়ানি প্রাপ্তির পর যাহাতে কোন জমিদার বা কোন রাজকীয় কর্মচারি সরকারের বিনা অনুমতিতে কোন নতুন লাখেরাজ সৃষ্টি করিতে না পারেন তৎসম্বন্ধে সময়ে সময়ে নানা নিয়মাবলি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ দেওয়ানি প্রাপ্তির ৭ বৎসর পরে জমিদারগণ ও ইজারদারগণের সহিত গবর্নমেন্ট যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লিখা ছিল যে তাঁহারা গবর্ণমেন্টের সম্মতি বিনা কোন লাখেরাজ দান করিতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহারা গোপনে গোপনে উক্ত নিয়মভঙ্গপূর্বক লাখেরাজ সৃষ্টি করিতেন। এইরূপে লাখেরাজ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারি রাজস্বের অনিষ্ট ঘটিতে লাগিল। ইহা নিবারণের নিমিত্ত রেভিনিউ কমিটির প্রস্তাব অনুসারে দেশের সমুদয় লাখেরাজ জমি তদন্ত করিয়া এক রেজিস্টারি প্রস্তুত করণের জন্য ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে তারিখে "বাজে জমিন দপ্তর" বলিয়া গবর্নমেন্ট কর্তৃক এক অফিস সৃষ্টি হয়। এবং কোন পাখেরাজ সিদ্ধ হইবে এবং কোন লাখেরাজ অসিদ্ধ গণ্য হইবে ইহার মীমাংসার জন্য নিম্নলিখিত তিনটি বিধান করা হইয়াছিল।[৫৪] ১ম, যে সকল সনন্দ, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে হইয়াছিল এবং উক্ত সনন্দ অনুসারে উক্ত বৎসরের পূর্বে ১ বৎসর কাল জমি প্রকৃত প্রস্তাবে দখল হইয়া থাকিলে তাহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। ২য়, সনন্দ বিনা ঐরূপ দখল হইয়া থাকিলেও লাখেরাজ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। ৩য়, ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দের পরে যে সকল লাখেরাজ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মঞ্জুর না হইয়া থাকিলে অসিদ্ধ গণ্য হইবে।

পরে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে উক্ত বাজে জমিন দপ্তর উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কালেক্টরগণকে লাখেরাজ জমির সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট পাঠাইবার আদেশ হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখে লাখেরাজ জমির সম্বন্ধে কতকগুলি রেগুলেশন প্রচার হয়। এই সকল রেগুলেসনের দ্বারা ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের নিয়মাবলি বহাল রাখিয়া

আরও কতকগুলি নতুন বিধান করা হয়। যে সকল লাখেরাজ উক্ত নিয়ম প্রচার হইবার পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা উক্ত নিয়মানুসারে বাজেয়াপ্ত হইয়া তাহার উপর যদি ১০০ টাকার অধিক জমা ধার্য হইত তৎসমুদয়ে গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য বলিয়া ধরা হইত; কিন্তু যদি উক্ত জমা ১০০ টাকার কম হইত তাহা হইলে যে ইজারাদার কি জমিদারের জমিদারির অন্তর্গত উক্ত লাখেরাজ জমি থাকা সাব্যস্ত হইত সেই ইজারাদার কি জমিদার উক্ত জমা পাইতেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ সকল নিয়মাবলি প্রচলিত ছিল। পরে তাহা পরিবর্তিত হইয়া লাখেরাজ জমির সম্বন্ধে নতুন রেগুলেশন প্রচারিত হয়। এই রেগুলেশনে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের নিয়মানুসারে এক সনন্দ দ্বারা প্রাপ্ত লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া তাহার উপর ১০০ টাকার অধিক ও অনধিক জমা ধার্য অনুসারে তাহা গবর্ণমেন্টের কি জমিদারগণের প্রাপ্য ধার্য করিবার যে বিধান ছিল তাহা রহিত হইয়া তৎপরিবর্তে এই বিধান হয় যে যদি কোন এক সনন্দ দ্বারা প্রাপ্ত লাখেরাজের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক হয় তাহা গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য ও অনধিক হইলে জমিদারগণের প্রাপ্য হইবে।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে তারিখে লাখেরাজ জমির সম্বন্ধে দুইটি রেগুলেশন হয়। এই দুইটি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ও ৩৭ রেগুলেসন নামে অভিহিত। এই দুই রেগুলেশনের দ্বারা লাখেরাজ জমি প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছে; যথা, ১ম, যে সকল লাখেরাজ বাদশাহি সনন্দ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল; ২য়, যে সকল লাখেরাজ বাদশাহী সনন্দ দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই অর্থাৎ যে সকল লাখেরাজ জমিদার ও রাজকীয় কর্মচারিগণ (যাহাদের হস্তে সময়ে সময়ে রাজস্ব আদানের ভার অর্পিত হইত) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১ম শ্রেণির লাখেরাজ সম্বন্ধীয় আইন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩৭ নং রেগুলেসন ও দ্বিতীয় শ্রেণির লাখেরাজ সম্বন্ধীয় আইন উক্ত খ্রিস্টাব্দের ১৯নং রেগুলেশন ভুক্ত হয়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩৭ নং রেগুলেশন

যে সকল লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি মুসলমান বাদশাহগণ ধর্ম উদ্দেশে কি কোন পারিতোষিক স্বরূপ বা অন্য কোন কারণে দান করিয়াছিলেন সেই সকল লাখেরাজকে বাদশাহি লাখেরাজ কহে। এই শ্রেণির লাখেরাজ সমুদয়কে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা, ১ম, যে সকল লাখেরাজ কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবনকালের নিমিত্ত ভোগদখলের জন্য দেওয়া গিয়াছিল যেমন জায়গির প্রভৃতি। ২য়, যে সকল লাখেরাজ কোন নির্দিষ্টকালের জন্য না হইয়া উত্তরাধিকারি সূত্রে ভোগদখলের জন্য দেওয়া হইয়াছিল যেমন আলতগগা, আয়েমা, মদদমাস ইত্যাদি।

যে সকল বাদশাহি লাখেরাজ ইংরেজ গবর্ণমেন্টের দেওয়ানি প্রাপ্তির পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছিল সেই সকল লাখেরাজ জমিতে উক্ত লাখেরাজদারগণের প্রকৃত প্রস্তাবে দেওয়ানি প্রাপ্তির তারিখের পূর্ব হইতে ভোগদখল হইয়া আসিতে থাকা যদি সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে উক্ত লাখেরাজ বাহাল থাকিবে।[৫৪] কিন্তু যদি উক্তরূপ দখল না থাকা সাব্যস্ত হয় কিম্বা দখল থাকিলেও পরে যদি তাহা গবর্ণমেন্টের কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মচারি দ্বারা বাজেয়াপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত লাখেরাজ বহাল থাকিবে না। কিম্বা যদি লাখেরাজদারের জীবদ্দশা পর্যন্ত লাখেরাজ জমি ভোগ করিবার স্বত্ব থাকা সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে উক্ত

লাখেরাজদারের মরণান্তে তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে। আর যদি কোন বাদশাহি লাখেরাজের সনন্দ না পাওয়া যায় কিম্বা পাওয়া গেলেও তাহাতে যদি উক্ত যদি জমি মৌরসি ক্রমে কি জীবনকালের নিমিত্ত দান করা হইয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ না থাকে এবং যদি উক্ত লাখেরাজ যে নামে দেওয়া হইয়াছিল তাহা যদি দেশাচার অনুসারে মৌরসি গণ্য না হয় তাহা হইলেও উক্ত লাখেরাজ বহাল থাকিবে না।[৫৫]

যে সকল বাদশাহি লাখেরাজ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখের পর গবর্ণমেন্ট ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা যদি পরে গবর্ণমেন্ট কিম্বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন গবর্ণমেন্ট কর্মচারি মঞ্জুর না করিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত লাখেরাজ দান অসিদ্ধ গণ্য হইবে।[৫৬]

যে সকল লাখেরাজ জমি বাদশাহি সনন্দ অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বিচারক্রমে অসিদ্ধ গণ্য হইলে যে ব্যক্তি ঐ ভূমির জমিদার কি মালিক অর্থাৎ যাঁহার জমিদারি কি তালুকে উক্ত জমি থাকে তাঁহার সহিত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ আইনের বিধান অনুসারে ইস্তমরারী বন্দোবস্ত করিবার বিধান আছে।[৫৭] কিন্তু যদি উক্ত লাখেরাজদার পুরুষানুক্রমে ও বহুকালাবধি দখল করিয়া আসিতে দেখা যায় এবং সেই হেতু তাহার দখল বজায় রাখা যদি উচিত বিবেচনা হয় তাহা হইলে গবর্ণমেন্টর জেনারেল কাউন্সিল কর্তৃক তাহার সহিত উপযুক্ত করারে ঐ বাজেয়াপ্ত জমি বন্দোবস্ত হইতে পারে।[৫৮]

কোন কোন লাখেরাজগণ বাদশাহি বলিয়া গণ্য হইবে তৎসম্বন্ধে বিধান করা হইয়াছে যে দিল্লির বাদশাহ ও বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার কর্তৃক যে সকল লাখেরাজ সৃষ্ট হইয়াছে তাহাই বাদশাহি লাখেরাজ বলিয়া ধরা যাইবে। এতদ্ভিন্ন যদি কোন ব্যক্তির কোন সময়ে দেশের উপর তাহার আধিপত্য থাকা বলিয়া তাহার দত্ত সনন্দানুসারে কেহ নিস্কর ভূমি দাবি করে এবং আদালত যদি উক্ত কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তাহা হইলে গবর্ণর জেনেরেলের কাউন্সিলের মত লইয়া তাহার বিচার করিবেন।[৫৯] কিন্তু যে দেশে যিনি বাদশাহি লাখেরাজ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই দেশে যদি তাহা সৃষ্টিকালীন তাঁহার আধিপত্য না থাকা জানা যায় কিম্বা দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাহার আধিপত্য থাকাকালীন উক্ত ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে দখল প্রাপ্ত না হইয়া থাকে অথবা যদি গবর্ণমেন্ট দেশ অধিকার করিবার পূর্বে পূর্ব দেশাধিপতি দ্বারা তাহা বাজেয়াপ্ত হওয়া দেখা যায় তাহা হইলে উক্ত লাখেরাজ বহাল থাকিবে না।[৬১] এই সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা (কটক ব্যতীত) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখে এবং কটক, পটাশপুর ও তদধীনস্থ প্রদেশ সমূহ ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অধিকৃত হওয়া ধরা যাইবে।[৬২]

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯নং রেগুলেশন

এই রেগুলেসনের দ্বারা যে সকল লাখেরাজ বাদশাহি নহে তৎসমুদয় ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছে। ১ম, যে সকল লাখেরাজ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্টের পূর্বে অর্থাৎ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের দেওয়ানি প্রাপ্তির তারিখের পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, ২য়, যে সকল লাখেরাজ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট ও ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বরের মধ্যে সৃষ্ট

হইয়াছিল; ৩য়, যে সকল লাখেরাজ ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখের পরে হইয়াছিল।

১ম শ্রেণির লাখেরাজ সম্বন্ধে (যে সকল লাখেরাজ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখের পূর্বে হইয়াছিল) বিধান হয় যে তাহা যে কোন ব্যক্তি দ্বারা হইয়া থাকুক ও তাহার কোন লিখিত সনন্দ থাকুক বা না থাকুক যদি লাখেরাজদার তাহার লাখেরাজ ভূমি ভোগ দখল করিয়া আসিতে থাকা দেখা যায় এবং পরে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত গবর্ণমেন্ট কর্মচারি দ্বারা যদি উক্ত লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া গণ্য হইবে। যে যে স্থলে কোন বাজেয়াপ্তকারি কর্মচারির বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইবে সে স্থলে গবর্ণর জেনেরেল ও তাঁহার সভা কর্তৃক উক্ত বিষয় মীমাংসা করা হইবে।[৬২]

২য় শ্রেণির লাখেরাজ সম্বন্ধে (যে সকল লাখেরাজ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্টের পরে এবং ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর পূর্বে সৃষ্ট হইয়া ছিল।) বিধান হয় যে, যে সকল লাখেরাজ গবর্ণমেন্ট ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং যদি তাহা পরে গবর্ণমেন্ট কিম্বা কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত গবর্ণমেন্ট কর্মচারি কর্তৃক মঞ্জুর না হইয়া থাকে তৎসমুদয় অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।[৬৩] যদি কোন কর্মচারির উক্ত লাখেরাজ মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় তাহা হইলে উক্ত বিষয় গবর্ণর জেনারল ও তাহার সভা কর্তৃক মীমাংসিত হইবে।

প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক যে সকল লাখেরাজ ১১৭৮ বাঙলা বা ১১৭৯ ফসলী সালের পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে তৎসমুদয় সিদ্ধ গণ্য হইবে।[৬৪]

এস্থলে বলা আবশ্যক যে যদি কোন লাখেরাজ ১০ বিঘার অধিক না হয় এবং যদি উক্ত লাখেরাজের উপস্বত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে কোন দেবালয়ের উদ্দেশে বা ব্রাহ্মণ ভরণপোষণে অথবা অন্য কোন পুণযকার্য ব্যয় হয় তাহা হইলে উক্ত লাখেরাজ দেওয়ানি প্রাপ্তির পূর্বে হইয়া থাকুক কি তাহার পরে ১১৭৮ বাঙ্গালা বা ১১৭৯ ফসলী সালের অগ্রে হইয়া থাকুক তৎসমুদয় বহাল থাকিবে।[৬৫]

এই ২য় শ্রেণির লাখেরাজ জমি অসিদ্ধ গণ্য হইয়া বাজেয়াপ্ত হইলে তাহা যদি কোন এক সনন্দ দ্বারা ১০০ বিঘার অধিক জমি হয় তাহা হইলে উক্ত জমি হুজুরি তালুকের (Independent Talook) শ্রেণিতে গণ্য হইবে। এবং ইহার উপর যে রাজস্ব ধার্য হইবে তাহা গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য হইবে।[৬৬] আর যদি ইহা ১০০ বিঘার অনধিক হয় তাহা হইলে ইহা পেটাও তালুকের (Dependent Talook) শ্রেণিতে গণ্য হইবে এবং ইহার উপর যে রাজস্ব ধার্য হইবে তাহা সে জমিদারের জমিদারির অন্তর্গত এই জমি হইবে, সেই জমিদারের প্রাপ্য হইবে। এই অতিরিক্ত মুনাফার জন্য উক্ত জমিদারকে কোন অতিরিক্ত রাজস্ব গবর্ণমেন্টকে দিতে হইবে না।[৬৭]

২য় শ্রেণির লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিতে গেলে জমিদারগণকে আদালতে নালিশ করিতে হইবে।[৬৮] ৩য় শ্রেণির লাখেরাজ জমির সম্বন্ধে অর্থাৎ যে সকল লাখেরাজ ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখের পরে সৃষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিধান হয় যে উক্ত লাখেরাজ জমি ১০০ বিঘার অধিক হউক কি অনধিক হউক যদি ইহা গবর্ণর জেনারল

সাহেবের কাউন্সিলের হুকুম অনুযায়ি সৃষ্ট না হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত লাখেরাজ জমিদারগণ নিজ ইচ্ছায় আদালতের সাহায্য বিনা বাজেয়াপ্ত করিতে সক্ষম হইবেন এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে কোন অতিরিক্ত রাজস্ব গবর্ণমেন্টকে দিতে হইবে না।[৬৯] কিন্তু পরে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইনের দ্বারা জমিদারগণের এই শ্রেণির লাখেরাজ নিজে বাজেয়াপ্ত করিবার যে ক্ষমতা ছিল তাহা রহিত হইয়া বিধান হয় যে, যে সকল জমিদার এই শ্রেণির লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার ইচ্ছা করিবেন তাহাদিগকে তজন্য কলেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে এবং উক্ত দরখাস্ত অন্যান্য মোকদ্দমার ন্যায় গণ্য হইবে আর উক্ত মোকদ্দমা বাজেয়াপ্ত করিবার স্বত্ব যে তারিখ হইতে উদ্ভব হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে রুজু করিতে হইবে।[৭০] কিন্তু জমিদারেরা ইচ্ছা করিলে উপরোক্ত বিধান সত্বেও উক্ত লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের মোকদ্দমা দেওয়ানি আদালতে উপস্থিত করিতে পারেন।[৭১] এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যে যে প্রদেশে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আইন এক্ষণে প্রচলিত নাই সেই সেই প্রদেশে কলেক্টরের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের মোকদ্দমা বিচার করিবার কোন ক্ষমতা নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে কোন জমিদার কি মৌরসীদার নিজ নিজ অধিকৃত জমিতে লাখেরাজ স্বত্ব সৃষ্টি করিতে পারেন এবং উক্ত লাখেরাজ পরে উক্ত দানকর্তা স্বয়ং কি তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা তাহার নিকট হইতে খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই রেগুলেসন অনুসারে বাজেয়াপ্ত করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু উক্ত লাখেরাজ দান গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কিম্বা জমিদারি বাকি রাজস্বের জন্য নিলাম হইলে নিলাম খরিদদারের বিরুদ্ধে প্রবল থাকিবে না।[৭২]

এক্ষণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন মহলের অন্তর্গত লাখেরাজ জমির সম্বন্ধে বাজেয়াপ্তের মোকদ্দমা কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে হইলে যে তারিখে উক্ত লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।[৭৩] এই হেতু দেখা যায় যে আজ কাল বাকি রাজস্বের দরুণ নিলাম খরিদদার ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি যে সকল লাখেরাজ বহুকাল হইতে রহিয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য মোকদ্দমা করিতে সক্ষম নহেন; কেননা জমিদারগণ ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্বের যে সকল ১০০ বিঘার অনার্বক অসিদ্ধ লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার স্বত্ব পাইয়াছিলেন সেই সকল লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার স্বত্ব এবং যে সকল লাখেরাজ ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বাজেয়াপ্ত করিবার স্বত্ব তাহাদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখে উদ্ভব হওয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল লাখেরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে সৃষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধে যে তারিখে লাখেরাজদার লাখেরাজ স্বরূপ ভূমি দখল করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই তারিখ হইতে উক্ত লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার স্বত্ব উদ্ভব হওয়া ধরা যাইবে।

বাকি রাজস্ব দায়ে নিলাম খরিদ্দারগণকেও তাঁহাদিগের নিলাম সিদ্ধ হইবার তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে বাজেয়াপ্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।[৭৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মহলের অন্তর্গত ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্বের যে সকল লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট ক্ষমতা পাইয়াছিলেন

সেই সকল লাখেরাজ এক্ষণে বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না। কেননা গবর্ণমেন্টের মোকদ্দমার সম্বন্ধে ৬০ বৎসর যে তমাদিকাল ধরিবার বিধান আছে সেই বিধান অনুসারে গবর্ণমেন্টের উক্ত মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব তমাদি দ্বারা নষ্ট হইয়াছে।

যদি কোন জমিদার কোন লাখেরাজ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ রেগুলেসনের ১০ ধারা অনুযায়ী অর্থাৎ উক্ত লাখেরাজ ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখের পরে অন্যায়রূপে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য মোকদ্দমা করেন তাহা হইলে তাহাকে প্রথমে প্রমাণ করিতে হইবে যে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পরে উক্ত জমির জন্য খাজনা দেওয়া হইয়াছে কিম্বা উক্ত জমি মাল বলিয়া তাহার বন্দোবস্ত ভুক্ত হইয়াছিল এবং ইহা তিনি প্রমাণ করিতে পারিলে লাখেরাজহার উক্ত লাখেরাজ ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্বের সৃষ্ট হওয়া দেখাইতে না পারিলে উক্ত ভূমি মালভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে।[৭৫]

দরপাওনীদার তাহার পওনীর অন্তর্গত অসিদ্ধ লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিতে সক্ষম।[৭৬] কিন্তু যদি উক্ত লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের সম্বন্ধে তাহার উপরিস্থ জমিদারের স্বত্ব তমাদি দ্বারা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে তিনি উক্ত মোকদ্দমা করিবার স্বত্ববান নহেন।[৭৭]

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যে সকল লাখেরাজ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বাজেয়াপ্ত হইলে জমিদার উক্ত জমি খাস দখল করিতে সক্ষম নহেন; তিনি তৎসম্বন্ধে খাজনা পাইবার স্বত্ববান।[৭৮]

কোন জমিদার যদি কোন প্রজার জমি তাহার জমিদারির অন্তর্গত বলিয়া তৎসম্বন্ধে খাজনা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা করেন এবং যদি উক্ত প্রজা সেই জমি ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের লাখেরাজ জমি থাকাও তাহা পরে সে বাজেয়াপ্ত তালুক স্বরূপ দখলকার থাকা বলিয়া জবাব দেয় তাহা হইলে উক্ত জমি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তাঁহার জমিদারিভুক্ত ছিল এবং তজ্জন্য উক্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম এই বিষয়ের প্রমাণের ভার জমিদারের উপর হয়।[৭৯]

গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কোন লাখেরাজদারের লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইলে তাহার অধস্থ প্রজার স্বত্ব লোপ হয় না। প্রজা ইচ্ছা করিলে তাহার স্বত্ব ত্যাগ করিতে পারে কিম্বা লাখেরাজদারের উপর গবর্ণমেন্ট যে রাজস্ব ধার্য করিবেন তাহার হারাহারি অংশ তাহার পূর্ব দেয় খাজনার অতিরিক্ত খাজনার স্বরূপ দিয়া তাহার স্বত্ব বজায় রাখিতে স্বত্ববান।[৮০]

চাকরাণ-জমি

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে অনেক স্থলে জমিদারগণের হস্তে দেশের বিচার কার্যের ও শান্তিরক্ষার এবং স্থানে স্থানে বিদেশীয় শত্রুগণের বিরুদ্ধেও দেশরক্ষার ভার ছিল। তজ্জন্য তাহাদিগকে কাজি, কণোঙ্গ, সশস্ত্রপুরুষ, থানাদার, চৌকিদার, পাইক প্রভৃতি নিযুক্ত রাখিতে হইত। এই সকল কর্মচারিগণকে জমিদার নিযুক্ত করিতেন আবশ্যক হইলে বরখাস্তত করিতেন। এই সকল কর্মচারিগণ কোন কোন স্থানে তাহাদের বেতনের পরিবর্তে কম খাজনায় কিম্বা নিষ্করে কতক জমি ভোগ করিত।

জমিদারগণও কোন কোন স্থলে উপরোক্ত কর্মচারিগণের ব্যয় নির্বাহার্থে কতক জমি নিস্করে ভোগ করিতেন অর্থাৎ সেই সকল জমির উপস্বত্ব দ্বারা উক্ত ব্যয় নির্বাহিত হইত এবং তজ্জন্য সরকারকে কোন রাজস্ব দিতে হইত না। এই সকল জমিকে চাকরাণ জমি বলিত।

জমিদারগণের দ্বারা উপরোক্ত কার্য সকল সুচারুরূপে নির্বাহিত না হওয়ার তাহাদিগের নিকট হইতে গবর্ণমেন্ট পরে ঐ সকল কার্যের ভার তুলিয়া লইয়া নিজ হস্তে লইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বিধান করা হয় যে, কাজি ও কানোঙ্গদিগের জন্য জমিদারগণকে যাহা দিতে হইত তাহা তাঁহাদিগের জমিদারির ধার্য রাজস্ব অপেক্ষা অতিরিক্ত রাজস্ব স্বরূপ দাওয়া করা হইবে।[৮১] দশসালা বন্দোবস্তের সময় উপরোক্ত চাকরাণ জমি সকল দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ১ম থানাদারি জমি ও ২য়, যে সকল জমি সরকারি কর্মচারি কি অপর কোন ব্যক্তির দখল ছিল। থানাদারি জমি সকল গবর্ণমেন্ট দ্বারা পরে বাজেয়াপ্ত করিবার বিধান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে হইয়াছিল।[৮২] কিন্তু অন্যান্য চাকরাণ জমি মালজমিভূক্ত করিবার ও তাহা গবর্ণমেন্টের রাজস্বের জন্য অপর মালজমির ন্যায় দায়ি থাকিবার বিধান হয়।[৮৩]

চৌকিদারি চাকরাণ জমি শেষোক্ত চাকরাণ জমির শ্রেণিতে অন্তর্গত। যে স্থলে চৌকিদারেরা এইরূপ চাকরাণ জমি ভোগ করিয়া থাকে সেস্থলে তাহারা পুলিশ সংক্রান্ত কার্য ব্যতীত জমিদারের কি তাঁহার অধস্থ তালুকদারের (যাঁহার তালুকে উক্ত জমি হয়) আদায় উসুলের ও তৎসংক্রান্ত কার্য করিতে বাধ্য।[৮৪]

বর্তমান চৌকিদারি আইন (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৬ আইন, বেঙ্গল কাউন্সিল) অনুসারে যে গ্রামে চৌকিদারি পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইবে সেই গ্রামের চৌকিদারি চাকরাণ জমি উক্ত গ্রামের জমিদার কিম্বা তালুকদারের সহিত বন্দোবস্ত হইবে এবং উক্ত জমির জন্য যে টাকা কর স্বরূপ ধার্য হইবে তাহা আদায়কারী পঞ্চায়েতকে ফি বৎসর প্রথম দিনে যে ব্যক্তি উক্ত গ্রামের সেই সময়ে কর আদায় করিবার স্বত্ববান তাঁহাকে অগ্রিম দিতে হইবে।[৮৫] এবং উক্ত চাকরাণ জমি এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে পর তাহা ভোগদখল হেতু জমিদার বা তালুকদারগণের যে সকল কার্য্য চৌকিদারদিগকে করিতে হইত তাহা আর করিতে হইবে না।[৮৬] কিন্তু যে সকল গ্রামের বর্তমান চৌকিদারি আইন অনুসারে কোন পঞ্চায়েত নিযুক্ত হয় নাই সেই সকল গ্রামে চৌকিদারি চাকরাণ জমি সম্বন্ধে যাহার যেরূপ স্বত্ব পূর্বাবধি আছে ও চৌকিদারেরা পূর্বাবধি যেরূপ কার্য করিয়া আসিতেছে এবং যেরূপে নিযুক্ত বরখাস্ত হইয়া আসিতেছে তৎসমুদয় সেইরূপেই চলিতে থাকিবে।[৮৭]

চাকরাণ জমির মধ্যে বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ঘাটওয়ালি চাকরাণ প্রসিদ্ধ। মুসলমানদিগের আমলে উক্ত অঞ্চলে পাহাড়বাসীরা প্রায় তাহাদিগের নিকটস্থ উপত্যকা প্রদেশ লুণ্ঠন করতঃ দেশের শান্তিভঙ্গ করিত; উক্ত পাহাড় বাসীগণের উৎপাত নিবারণের জন্য তৎকালিন মুসলমান শাসনকর্তাগণ ঘাটওয়াল নিযুক্ত করেন। পাহাড় হইতে নামিবার ঘাট অর্থাৎ পথ সকল রক্ষা করা উক্ত ঘাটওয়ালদিগের কার্য ছিল। এবং সেই কার্য হেতু তাঁহাদিগকে নিস্করে কিম্বা কম খাজনায় কতক জমি ভোগ করিতে দেওয়া হইত। এই সকল জমিকে ঘাটওয়ালি জমি বলে। ঘাটওয়ালি জমি থানাদারি জমির ন্যায় বলিয়া

গবর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন না।[৮৮] দশশালা বন্দোবস্তের পূর্বে ঘাটওয়ালি তালুক মোকররী খাজনায় সৃষ্ট হইয়া থাকিলে বাকি রাজস্ব দায়ে নিলাম খরিদদার জমিদার এক্ষণে ঘাটওয়ালা কার্যের আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে সক্ষম নহেন এবং ঘাটওয়ালি সনন্দে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবে এমন কোন কথা লিখিত না থাকিলেও যদি উক্ত ঘাটওয়ালি তালুক কয়েক পুরুষ ধরিয়া ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে দেখা যায় তাহা হইলে তাহা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলের জন্য সৃষ্ট ধরা যাইবে।[৮৯]

ঘাটওয়ালরা যতদিন ঘাটওয়ালী কার্য করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক থাকিবে ততদিন তাঁহাদের কার্যের আবশ্যকতা থাকুক কি না থাকুক তাহাদের ঘাটওয়ালি তালু বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে না।[৯০] কিম্বা তাহাদিগের খাজনাও বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।[৯১] কিন্তু ঘাটওয়ান বরখাস্ত হইলে তাঁহার ঘাটওয়ালী তালুক বজায় থাকিবে না।[৯২] ঘাটওয়ালী জমির সম্বন্ধে আইন ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ কোলেসন ও ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ আইনে লিখিত আছে। ঘাটওয়ালী জমি নির্দিষ্ট কার্যের জন্য সৃষ্ট হওয়ায় তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমার বিচারকালে আদালত কোন বিশেষ ব্যক্তিগত বা পরিবার গত প্রথার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া উক্ত জমির সম্বন্ধে চুক্তি ও নিয়মাবলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।[৯৩]

যদি কোন প্রজা কোন বিশেষ কার্য করা হেতু কোন জমি ভোগদখল করিয়া আসিতে থাকে দেখা যায় তাহা হইলে পরে সেই প্রজা উক্ত কার্য করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে উক্ত জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারা যাইবে।[৯৪]

ঘাটওয়ালী বা অন্য প্রকারের চাকরাণ জমি সম্বন্ধে যে প্রকার স্বত্ব ও দায়িত্ব পূর্বাবধি প্রচলিত আছে বর্তমান খাজনা আইনের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না; বিশেষত উক্ত প্রকার জমির মধ্যে যে সকল জমি বর্তমান আইন জারি হইবার পূর্বে হস্তান্তর যোগ্য কিম্বা উইল ক্রমে দানের যোগ্য ছিল না তাহা এই আইনের কোন বিধান অনুসারে হস্তান্তর যোগ্য কিম্বা উইল ক্রমে দানের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।[৯৫]

তথ্যসূত্র

১. S.S. 26 and 63, Act viii of 1869.

২. S 12, Act viii, 1885.

৩. Krista Ballav Ghosh V. Krista Lall Sing I. L. R. 16 Calcutta 642.

৪. Chintamoni Dull V. Rash Behary Mandal IL. R. 19 Calcutta page 17.

৫. Dinabandhu Roy V. W.C. Benorjee, I.L.R. 19 Calcutta 774.

৬. SS. 13 and 14, Act viii, 1885.

৭. Faiz Rahaman v. Ram Sukh Bajpai I.L. R. 21 Calcutta, 169

৮. SS. 15 and 16.

৯. S. 18 Cl. (a).

১০. S. 183, See Illustration (1).

১১. Joy Krista Mookerjea v. Doorga Naran Nag, UW.R. 348, Joy Krista Mookerjea u. W.R. 153, Hurro Mohan Mokerjea v. Ranee Lalummonee Dassi 1W.R. 5; Chander Kumar Roy v. Kedarmani Daski 7 W.R. 247.

১২. Dwarka Nath Misser v. Harrish Chander I.L.R. 4 Calcutta 925; Unno Purna Dasi v. Uma Charan Dass 18 W.R. 65. See also 18 W.R. 507.

১৩. See notes under S. 26. The Law of Landlord and Tenant by Mr. Bek Karoo Lall Thakoor 7 W.R. 15.

১৪. S 73. Act viii 1885.

১৫. See notes under s. 73, The Tenancy Act by Messrs Rampini and Finucane.

১৬. S. 88, Actg viii 1885.

১৭. Gour Mohan Roy v. Aunund Mundol 22 W.R. 295, See also Ranee Lalun Monee v Sona Monee Debee.

১৮. Abhoy Charan Maji v. Shoshi Bhusan Bose I.L.R. 16 Calcutta 155.

১৯. Trithanund Thakur V. Mutty Lall Misser, I.L.R. 3 Calcutta 774.

২০. Kabil Sandar, V. Chunder Nath Nag Chowdhury I.L.R. 20 Calcutta 590.

২১. Bengal Administration Report, 1872-73, Character of Land Tenures page 79.

২২. See Minute of Dissent by Roy Krista Dass Pal Bahadur, Published in the Calcutta Gazette April 9, 1884, Part vi, 166, Subleting and Sub Ryots.

২৩. See Mr. R. C. Dutt's Report Published in the Calcutta Gazettee, Extra Supplement, October 15, 1884.

২৪. See Mr. H.J.S. Cotton's Report Published in the Calcutta Gazette, Extra Supplement, October 15, 1884.

২৫. See Preable, Reg. viii of 1819.

২৬. See 6 of Act viii of 1869. See also Krishore Chatterjea, V. Ram Charan Shah 9 W.R. 344. Haran Chunder Paul V. Mookta Sundari 10 W.R 113; 1B.L.R.A. C. 81. Jameer Gazee V Goneye Kandal 12 W.R. 110. Khosal Mohomed V. M. Joynooddeen.

২৭. S. 85 Act viii 1885.

২৮. Manindra Chandra Sarkar v. Maneeruddin Biswas 20 W.R. 230; Harish Chandra Roy Chowdhury V. Sreekalee Mookerjea 22 W.R. 274; Ranee Sarat Sundari Debia V. Mr. Charles Binny 25 W.R. 347.

২৯. Act X 1859, S.I

৩০. Act X. 1859, S.I

৩১. S.S. 112 and 115 Act X. 1859 Corresponding to SS 58 and 61 Act viii 1869.

৩২. S. 121, Act viii 1885.

৩৩. S. 108,

৩৪. Gokhul Saha V Jodu Nundun Roy, I.L.Ro. 17 Calcutta 721,

৩৫. The Bengal Tenancy Act by Messrs Finucane and Rampani, Pages 154 and 155.

৩৬. Narendrqa Nath Roy V. Srinath Sandel, I.L.R. 19 Calcutta 641.

৩৭. Pandit Sardar V. Meajan Mirdha I.L.R. 21 Calcutta 378.

৩৮. See notes under S. 182 Mr. Keder Nath Roy's Tenaney Act.

৩৯. Rani Chanddessori V. Gheena Pandey, 24 W.R. 152.

৪০. Pogose V. Rajoo Dhobi, 22 W.R. 511.

৪১. Mahar Ali Khan Pathan N. Ram Ruttun Sen 21 W.R. 400 Surnomoyee 9 W.R. 552. Kalee Mohan Chatterjea 11W.R.

৪২. See notes under S. 182, The Tenancy Act by Messrs. Finucame and Rampani

Prasanna K Chatterjea V. Jugunnath Bysak, 10 Calcutta Law Report 25

৪৩. Prosanna Kumari Devi V. Sheik Rutton Bepari, I.L.R. 3 Calcutta 696.

৪৪. Gobinda Chunder Sikdar, V. Aynuddin Sha Biswas, H.C.L.R. 281. See also Benimadhab Bannerjea V. Joy Krishna Kookerjea, 12 W.R. 495 Baraja Nath Kundu Chowdhury V. Stewart, 8 B.L.R. 51.

৪৫. Durga Prasad Misser V. Brindaban Sukul, 7B.L.R. 159.

৪৬. Mr. Cotton's Report on the Tenancy Bill, published in the Extra Supplement, Calcutta Gazettee Oct 15. 1884.

৪৭. Mr. Barlow's Report of Proceedings of a conference upon the Bengal Tenancy Act, published in the Calcutta Gazette, Extra Supplement, Oct. 15, 1884.

৪৮. Mr. Beam's Report, Extra Supplement, Calcutta Gazettee Oct 15, 1884.

৪৯. Mr. Alexander's Report, Extra Supplement, Calcutta Gazette, Oct 15, 1884.

৫০. Justice Field's Minute on the Tenancy Bill, published in the Extra Supplement Calcutta Gazette, Oct. 15, 1884.

৫১. Preambles, Regulations xix and xxxvii of 1793.

৫২. এইরূপ লাখেরাজ ভূমি উদ্দেশ্যে বিশেষে নানাস্থানে নানাপ্রকার দামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, বৈষ্ণবোত্তর, পীরোত্তর, আলতম্‌গা জায়গীর, আয়েমা ও মদদমাস প্রভৃতি।

৫৩. See Judgment of Justice Trover in the Full Bench Case of Sonatan Ghese V. Moului Abdul Farar Bengal Law Reports, Supplemental Volume. page 126.

৫৪. কটক ও পটাশপুর অঞ্চলে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখের পূর্ব পর্যন্ত দখল থাকা ধরিতে হইবে। See S. 3 cl 2, Reg xiv of 1825.

৫৫. S. icls i, 3 of Reg xxxviii of 1793.

৫৬. S. 3 cl. 1.

৫৭. S. 6

৫৮. S. 5 Reg xiii, 1825.

৫৯. S. 3cl5. Reg xiv, 1825.

৬০. S 3 cl. Rey xiv, 1825.

৬১. S. 3 c17.

৬২. S 2, Reg xix, 1793.

৬৩. S. 3 c11, Reg xix 1793.

৬৪. S. 3 c13

৬৫. S. 3cl 4.

৬৬. S. 6.

৬৭. S. 11.

৬৮. S. 10.

৬৯. S. 28. Act X of 1859.

৭০. Sonaton Ghose, V. Moulvi Abdool Farer, Bengal Law Reports, Sup. Vol. Full Bench. 109.

৭১. Mahomed Akil V. Asadunnissa, Bebee, Mutty Lall Sen Gwyal V. Deshkhar Roy, Full Bench, Bengal Law Reports, sup. vol. 774.

৭২. The Limitation Act (Act xv of 1877), Art 130.

৭৩. The Limitation Act (xv of 1877) Art 121.

৭৪. Murry Har Mookhopadhya V Madhab Chunder Baboo, 8 B.L.R. page 566. Partab Parbati Charan Mookerjea V. Rajkrishna Mookerjea, Full Bench B.L.R sup. vol. 162

৭৫. Rao Ram Shunker Rae V. Moulvee Syud Ahmod, S.D.A. (1848), 234, Rajkishore Rae V. Soomer Kundle, S D A (1850), 498

৭৬. Magnee Ram Chowdhury V Babu Gonesh Dutt Sing W R. (1864), 275.

৭৭. Assanulla V. Bassarat Ali Chowdhury, I.L.R. 10 Calcutta 920.

৭৮. Mussamat Faizhara Babu V Mussamat Azizunnissa Bibi, Full Bench, B.L.R. Sup vol 175.

৭৯. S 34. Reg viii 1793.

৮০. SS 48 to 52, Act vi, 1870 B C

৮১. S 57

৮২. S 57,

৮৩. S 67,

৮৪. Rajab Lelanund Sing Bahadur,

৮৫. The Goverment of Bengal.

৮৬. Moores I A I of

৮৭. Kooldeep Narain Sing V Mohadev Sing B L.R Sup vol F B Page 559, subsequently affirmed by the Privy Council (11B.L.R. 71)

৮৮. Thakoor Munoorunjan Sing V. Rajah Leelakund Sing Bahadoor, 13 B L R 124.

৮৯. Lilanund Sing V Thakur Munoorunjum Sing I L R. 3 Calcutta 259.

Kissory Chand Mittra
1822-1873
THE RYOT AND THE ZEMINDAR

THE Ryot represents the great mass of the population of this country. He constitutes the agricultural element of a country which is essentially agricultural. He symbolizes the spade and the plough. He supplies the sinews of war. He covers the length and breadth of the land with its staple food. He sows the paddy, which is the staff of life in Bengal. He supports the Village Chowkeydar, and pays the parbunny to the Burkundaz and Darogah on the occasion of the Doorgah Poojah. He pays the rent and abwab which enrich the Zemindar, the Putneedar and other Talookdars. He fills the coffers of the Mohajuns by returning, with cent. percent. interest, the money raised by him on the hypothecation of the crop. He cultivates the mulberry and the indigo, which enable the European adventurer to a mass fortunes, and return home after a few years of successful speculation and unsuccessful agitation for his indefeasible and inalienable birth-rights.

But a Ryot is a word of large signification, and includes persons of various grades, from the large Jotedar to the day-laborer, the substantial Mundal to the mere Burgadar, the pot-bellied Poramanic to the pauperized Chasa. He represents not only the class known in England as gentlemen farmers, who brew their own ale and make their own cheese, but the small farmers and yeomen of that country, the cottier of Ireland and the *metayer* of France. But, besides those who live wholly by the soil, there is an immense number of men who live partially and indirectly on it. These are of different castes and occupations. There are thousands and tens of thousands of Sircars and Mohurrirs, Jemadars and Burkundazes, Carpenters and Koomars, Kamars and Koloos, who, besides following their legitimate vocations, cultivate, by hired agency, portions of land in their native villages, which they have inherited from their fathers, or have themselves purchased by the savings of their industry. In fact every Mofussil man owns a jote or holding, varying from hundred biggahs to a few cottahs. The rent he pays for it also varies according invariably levied on the bheta and bhagut than on the out-field.

The bheta is the homestead of the ryot, and is frequently an index to his condition in life. When it consists of a single room with mat or mud walls, and a thatched roof, it indicates the poverty of the proprietor. It must be occupied by either a Burgadar, who tills the land of others with is

own implements, and enjoys a portion not exceeding one-half of the produce, or the mere day-laborer, who, having neither land nor implements, hires himself out to others. When, however, the bheta consists of three or four separate apartments with out offices, such as the cow-house, the golah or barn, and the dekhi shed, where rice is shifted or cleansed, it may be safely assumed that the occupant is a substantial Grihosto.

The bheta is surrounded by the bagan or garden, which the ryot cultivates, not with the honeysuckle and the sweet-briar, but the pumpkin and the brinjal, the plantain and the soopari. For both these lands he pays so high as twelve Rupees a biggah in the suburbs of Calcutta. Lands on which gunges or flourishing hats are situated, sometimes yield one, two, or even three hundred Rupees elsewhere. The rent for other land varies in different districts and pergunnahs from as low as eight annas a biggah to five Rupees. The dangah or high land, where mulberry and cold weather vegitables are cultivated, are assessed at a higher figure than the low land, which only grows paddy. The former, if rich and loamy, yields a rent of four Rupees, while the latter one Rupee 6 annas, a rate which presses very heavily, in as much as it is more than what the ryot can bear. In Pergunnah Luskurpore, in Rajshye, the established nirick is one Rupee, while it is nearly double in Pergunnah Muldul Ghaut.

But besides the rents, abwabs are levied on the ryot in most districts. These are illegal cesses, and press most heavily on him. In those districts where low assessment prevails, these are consolidated with, and in point of fact bear a large proportion to, the jumma. In Pergunnah Luskurpore these are as 14 annas to one Rupee. When a Zemindar has a marriage or shradh in his family, the Ryot is called upon to contribute his quota. Again, when a marriage is celebrated by a Ryot, he must pay marocha to the Zemindar. Though disallowed by the law, yet abwabs are sanctioned by immemorial usage. The Zemindar will continue to exact them and the Ryot to pay them, until the nearest Deputy-Magistrate or Deputy-Collector is authorized to punish these exactions summarily and finally. There must be no appeal. The new Rent Law calculated to remedy the evil, but we have strong doubts of its being fairly and fully carried out.

The number of those who live indirectly and partially on the land sinks into insignificance when compared with those who live solely by it. The former look upon their jote as a secondary affair, and as something which they can fall back upon in the rainy day, but the latter are wedded to the soil, and have no other resources. They must toil on from morning to noon and from noon to dewy eve. Their lot is one of unmitigated and unremitting toil. Destitute of all capital, save their labor, they cannot improve their jote. Utterly ignorant of their rights, they cannot protect themselves when these are invaded and trampled upon. True, that several salutary laws have been enacted from the time of Cornwallis to the

present, but he is too uneducated and poor to avail himself of them. In truth, he is often victimized through the instrumentality of those Courts of Justice which are intended to protect him.

In India land has always been considered as belonging to the Ryot. It has maintained by some that the Government is the absolute proprietor of the soil; while others have put forward the Zemindar as the proprietor. It is however the rent paid by the Ryot which establishes his right in the soil. "By the English Law", says Burton, "no subject can hold land in direct or allodial dominion." The proprietor must pay a homage to Government either by the performance of personal service, or the payment of a portion of the produce either in kind of in specie. The Indian Revenue system is essentially the European Fuedal system made easy. We hold that the right of occupancy and of alienation is the right of proprietorhship. If you do not all him the proprietor of the land who has inherited it from his father, and who can alienate it by mortgage or sale, we do not know who is. Such is the residnet or khoodkast ryot, his right of proprietorhsip is recognized both by the common and statute law of the country. The *Smriti* accurately defines it, and describes the mutual relation of the Rajah and the Ryot. It restrains the Rajah from taking more than a sixth part of the crops in ordinary times, and a fourth part in times of war and invasion.

The municipal system of Hindoostan has been so often described that we need not enter into it at large; suffice it to remind our readers that it was essentially democratic in its constitution. It was a society complete and perfect in itself. The organism of the system was enclosed, so to speak, within its structure and frame work. It had a quasi-independent character. It was an *imperium in imperio* Each gram or village contained within itself the elements of a republic, consisting of a corporation of Ryots owning all the land, and headed by an elected chief called the Grama Audikar. That officer was assisted by a Registrar called Gramma Lakhak. The municipality also consisted of professional persons representing all the agricultural and other crafts, namely, the Purohit or Priest, the Poet, the Goorumohashoy or School-master, the Koomar or Potter, the Kamar or Black-smith, the Chuttur or Carpenter, the Moochee or Cobbler, the Napit or Barber and Surgeon, the Dhobee or Washerman, the Aharee or Water-carrier, & c. Those village officers were supported by chakran land and jageers, or assignments of land held rent-free, besides fees paid by the Ryots. The fees were not defined, but differed in different districts. The Grama Audikar was nominated by the Ryots and appointed by the King. He was both an executive and judicial officer. He was the head of the police, and as such was vested with full powers to call upon the people to assist him in ferreting out thieves in cases of robberies & c. He also decided criminal and civil cases either in person or with the assistance of a punchyet. It will be perceived that every gram was a small government. A number of villages adjoining each other

comprised a district or pergunnah, presided over by an officer styled Des Audikar, assisted by a Registrar or Clerk called Des Lakhak. The Des Audikar was functioned to supervise the concerns of all the villages of the pergunnah-as the Grama Audikar managed those of his village. The Mahomedans found this system in its full vigor. They accepted it, and founded their revenue adminstration on it. That administration would have been inextricably confused and would have most probably broken down if they had disturbed it. They availed themseles of the great influence of the Grama Audikar and other village officers to collect the revenue and to reconcile the Ryot to his jote. They converted the Des Audikars into Zemindars, and made them responsible not only for the revenue but the peace of the district in their charge. This was not a change in the position and functions, but simply in the title of Des Audikar. Thus it will be seen that the Zemindar was not simply a middleman or tax-gatherer.

It is, however, a common but egregious mistake to suppose that the Zemindars were mere middlemen, and only functioned to collect rents from the Ryot. During the Hindu *regimé* the Des Audikars were vested with large police and judicial powers. They represented the people. They were essentially the Lord Lieutenants of their districts. Though they were nominated by the people, and their appointment was confirmed by the King, yet their office was generally hereditary. The Mahomedans, on taking possession of the country, confirmed their rights and privileges, and recognised the inheritable quality of the tenure of their office, as evidence by their never conferring, except under extraordinary circumtances, sunnuds on the outsiders, to the prejudice of their heirs. Though representatives of Government, yet they were the chiefs of the people. The Mahomedans found and confirmed them as such ny sunnuds. Those sunnuds did not create but only recognised existing rights. They were conferred only on the principal Zemindars, such as those of Nattore, Nuddea, Dinajppore, Burdwan, & c., who were virtually Viceroys within the limits of their respective jurisdictions. The great majority of the Zemindars, howerver, succeeded, according to the law and usages of the country, their names being only enrolled in the *nama jaree* book. The Mahomedans further conferred on them responsible and lucrative offices by sunnuds. They made them Schiladars or Viceroys, Foujdars or Superintendents of Police, Cazees or Judges, Amulgreers or Revenue Collectors, Cutwals or Police Inspectors.

Hence Zemindars were not mere contractors or collectors of revenue, but hereditary lords of their manors. The British Government recognised them as such after a series of investigations into the respective rights of the Ryots, Zemindars, and Rulers. In 1727, when the Court of Directores assumed the direct management of affairs, the then Governot General, Warren Hastings, and his colleagues, formed themselves into a Committee

for framing fiscal regulations, and a Board of Revenue was constituted for supervising the fiscal affairs of this country. The Governor-General appointed local European officers denominated 'Collectors', and vested them with authority to contract for the public revenue for five years, as a temporary arrangement. He also appointed a Committee, consisting of two Europeans and several intelligent and experienced Native revenue officers, for the purpose of collecting information on the rights and condition of the Ryots and Zemindar as a preliminary step to a fixed valuation—a permanent revenue settlement, having for its object the—

> fixing of the deeds by which the Ryots hold their lands and pay their rents, and limiting certain bounds and defences against the authority of the zemindar.

But the hereditary chiefship of the Zemindars was fully recognised by Warren Hastings, who had made himself thoroughly acquainted with the working of the institutions of the country. His object, as expressed by himself, was to fix the demands on the cultivators, and to secure to them the perpetual and undisturbed possession of their lands, and to guard them against arbitrary exactions. The periodical revenue settlements were at first effected with Zemindars for 1777, '78, '79 and 1780. The revenues were afterwards farmed out to them in consideration of a specific amount, the non-payment of which was visited with confiscation of their property. This arrangement resulted in the sale of several zemindaries. The evil attracted the notice of Parliament, and called forth the Act XXIV., Geo.III, cap. 25, 'charging the Company to inquire into the remedy it'. Meantime the most able and unscrupulous Governor-General, Warren Hastings, had left the country, and was succeeded by Sir John Macpherson. This was in 1784. In 1785 Mr. James Grant wrote a historical sketch of the revenues of Bengal, where he noticed a work which had been recently published by Mr. Francis, and entitled *Original Minutes of the Governor-General and Council 1776, with a plan for the settlement of the Revenue of Bengal,* and urged the necessity of instituting a full inquiry into the rights of Zemindars—an inquiry which had been deprecated by Mr. Francis, and apparently for no other reason thant that it had been proposed by Warren Hastings. He says :

> To define the rights and privileges of Zemindars of India, forming the only intermediate class of territorial subjects existing between the Prince and Peasantry, would be in truth to distinguish also those of the two latter descriptions of persons by marking the common boundaries of all in the chain of mutual dependence.

He also combated the idea that the Zemindars are the proprietors of the land, and maintained that the Sovereign was the sole virtual proprietor. In 1788 Mr. Shore, afterwards Lord Teignmouth, put forth his celebrated minute on the rights of the Zemindars and Talookdars. It gives an historical sketch of the administration of the Mahomedan revenue

system from the time of the illustrious Akbar to the conquest of this country by the British. He successfully controverted the opinion that the Sovereign was the proprietor of the soil, and conclusively proved the hereditable property of the Zemindars. At length the Marquis of Cornwallis effected the Permanent Settlement, which has been lauded by some as a constitution, as the *Magna Charta* of the country, and condemned by others as an abnegation of the rights of the Ryots. The abstract excellence of a scheme creating a landed aristocracy and lightening the assessment by fixing it, is unquestionable. The author of it recorded his opinion as follows :

> In raising a revenue to answer public exigencies, we outght to be careful to interfere as little as possible with those sources from which the wealth of the subject is derived. The attention of Government ought therefore to be directed to render assessment upon the land as little burdensome as possible. This is to be accomplished only by fixing it. The proprietor will thus have some inducement to improve his lands; and as his profits will increase in proportion to his exertions, he will gradually become better able to discharge the public revenue.
>
> By reserving the collection of the internal duties on commerce, Government may at all times appropriate to itself a share of the accumulating wealth of its subjects, without their being sensible of it. The burden will also be more equally distributed : at present the whole weight rests upon the landholders and the cultivators of the soil. In case of a foreign invasion it is a matter of the last importance, considering the means by which we keep possession of this country, that the proprietors of the lands should be attached to us from motives of self-interest. A landholder who is secured in the quiet enjoyment of a profitable estate can have no motive for wishing for a change. On the contrary, if the rents of his lands are raised in proportion to their improvement; if he is liable to be dispossessed, should be refuse to pay the increase required of him; or if threaterned with imprisonment, or confiscation of his property, on account of balance due to Government upon an assessment which his lands were unequal to pay, he will readily listen to any officers which are likely to bring about a change that cannot place him in a worse condition, but which hold out to him hopes of a better.

Holding these views, the Marquis of Cornwallis directed the Board of Revenue to effect a ten years' settlement in Bengal and Behar proper, and made a reference to the Court of Directors to the end that it might be rendered permanent. The reply of the Court, dated 29th August, 1792. and written with the concurrence of Pitt and Lord Melville, conveyed their approval of the measure. Those statesmen were closeted together for

several days before they came to a decision. The Governor-General in proposing, and the Court in sanctioning this measure, were animated by the most benevolent motives. They were far from unmindful of the rights of the Ryots, and would not for the world have been parties if it had had any tendency in their opinion to annual those rights. Their object was to protect the ryot from rack-renting, to stimulate the enterprise of prorietors, and promote the development of the resources of the country by limiting the assesment in perpetuity. Indeed, so early as 1781 the Court of Directors in their Despatch to the Governor-General, had urged upon his Lordship to afford every relief and ease to the Ryots and to the Zemindars, consistent with and conformable to the ancient institutions of the country. At length the measure was embodied in Regulation I. of 1793. a Regulation fraught with results of the last importance. The third Section contains the gist of the Regulation :

> The Marquis Cornwallis, Knight of the Most Noble Order of the Garter, Governor-General in Council, now notifies to all Zemindars independent Talookdars, and other actual proprietors of land, paying revenue to Government in the Provinces of Bengal, Behar and Orissa, that he has been empowered, by the Honorable Court of Directors for the affairs of the East India Company, to declare the jumma which has been or may be assessed upon their lands under the Regulation above mentioned fixed for ever.

It was follwed by Regulation VIII. of 1793 laying down the procedure for carrying out the settlement. and defining the rights of Istemrardars, Mookurrureedars, and other classes of tenure holders.

We believe that the Permanent Settlement, though it has erred in one important respect, *viz.* in converting the hereditable property of the Zemindars into absolute proprietorship, and in ignoring the proprietary rights of the khoodkast ryots or the real owners of the soil, has, in the whole, benefited the country. It is unquestionably an immense improvement on the other revenue settlements of the country, which may now be pronounced, more or less, as most miserable break-downs. We allude to the bhayachari or village partnership system in the Punjab, Scinde, and a part of Bombay, and the ryotwarry system under which the revenue of nearly the whole of the Madras and a portion of the Bombay Presidencies is collected. The bhayachari system sprang out of the desire of Government to perpetuate the old and effete frame-work of the social system. The land was surveyed and divided into portions called mehals. It was then farmed out to those who were in possession and occupation of it, and the rent was fixed for thirty years. Each coparcener of the holding being responsible for his share as well as that of a defaulting member of the brotherhood. The system leaves only in few cases a fair surplus over and above the net produce of the land.

The ryotwarry system is a form of holding direct from Government. It

is an annual tenancy to be held so long as the ryot pays the rate he is subject to, but under which he generally pays rent more than double what the ryot in the permanently settled provinces pays for richer lands. The taxation of the improvements that might be effected by the ryot in his holding was one of its most oppressive features. The excavation of tanks, the sinking of wells, and the cultivation of an orchard subjected him to additional taxes, but though happily these have been done away with, yet it continues to be a system of over-assessment. It is based on the principle of taxing one-half of the gross produce, and its evil effects are evidenced in the paucity of cultivation and the poverty of the cultivator. The annual preparation of the Jummabundee or rent-roll arms the myrmidons of the fiscal office with the enormous power of inquistorial interference with the domestic arrangements and concerns of the ryot, which is frequently and fearfully abused, and its possessors are restrained by no considerations of an enlightened on unentight ened self-interest. The difference between the permanent and the ryotwarry settlements is this, that while the former has upreared a barrier against those who have the power to apply the screw as often as they pleased, but whose interests after all are identified with those of their peasantry : the latter places the Ryot under the tender mercies of those myrmidons of the fiscal and police departments whose relative position, education and action far from affording any encouragement to industry or enterprise, are calculated to check and repress them. We understand that the Secretary of State for India has forwarded instructions to Sir Charles Trevelyan, the present most enlightened and impartial Governor of Madras, to modify and amend the ryotwarry system of that Presidency. We think the best modification and amendment of the ryotwarry system would be its abolition and the substitution of the Permanent Settlement with fresh provisions in favour of the khoodkast ryots. to be expressed clearly and in unmistakable language

The bhayachari system is as bad as the ryotwarry, the only difference being that, while the extortions practised on the ryot under the ryotwarry are confined to individuals, the bhayachari extends them to the cousinhood or the village circle. It is therefore not to be wondered at, that these systems have extinguished the nobility and gentry of the country, and reduced society to one dead level of poverty. Accordingly, when the mutinies broke out in the North-West Provinces, there were few to give their active aid in putting them down. In Bengal, where the Permanent Settlement has interposed between the Government and the Ryot, a class of men who, by their position, their wealth, their intelligence, and their independence, were well fitted to discern the disastrous consequences of the mutinies to their country, and the identity of their interests with those of their rulers, the rebels found the people and their Chiefs inclined neither to participate in nor sympathise with their crimes. In truth, a

landed aristocracy is a normal condition of India as well as of all other civilized countries. It is a natural lind in the chain connecting the sovereign with the mass of the people.

But the ties that bind the Zemindars with the Ryot should be strengthened. Everything that is calculated to sunder those ties will prove as dertrimental to the interests of the one as to those of the other. Whatever on the country tends to bring the Ryot and the Zemindar nearer and bind them closer will advance the material and moral well-being of both.

We are not of those who regard the Zemindars to be monsters in human shape, and the Ryots to be little innocents who are periodically and at kist times massacred and devoured by them. We believe both Zemindars and Ryots have their peculiar virtues and peculiar vices. But we would impress upon both the classes, and with all earnestness we are capable of the truth that their interests are essentially indentical. We are convinced that the more zealously the landholders help their peasantry to develop the resources of their talooks, the more profitable those talooks will become. We are convinced that the more earnestly the Zemindars seek to improve the social and mental condition of their Ryots, the more remunerative will be returns reaped by them, not only in the shape of increased pecuniary profits, but in the happiness and content of the Ryots, and in their indissoluble attachment to them.

The Indian Field, 1859 July 16

হৃষিকেশ সেন

বঙ্গে জমিদার সম্প্রদায়—রাজস্ব ও প্রজাস্বত্ব

(মোগল আমল)

মানুষ যেদিন যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে গৃহস্থ হবার ইচ্ছায় গৃহের ভিত্তি স্থাপন করলে সেইদিন সভ্যতার ভিত্তিও স্থাপিত হল। আহার্যের জন্য বনে বনে ফলমূলের বা পশুর অন্বেষণের পরিবর্তে কৃষিকার্য ও পশুপালন আরম্ভ হল। এই উদ্দেশ্যে নূতন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় যখন আর্যেরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমার বাইরের কোন সুদূর দেশ থেকে এসে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাদের সহচর অনুচরেরা বনাচ্ছাদিত নদীবহুল, তৃণশস্যপূর্ণ উর্বর ভূমির বন পরিষ্কার করে শস্যোৎপাদনের উপযোগী খেত প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। যে দেশের মধ্য দিয়ে সিন্ধু প্রবাহিত হয়েছে সেই দেশই এদের দৃষ্টিকে প্রথম আকর্ষণ করে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেখতে পাওয়া যায় ঋষি ঘৌরকন্ব সিন্ধুর স্তুতি করে বলেছেন, "সিন্ধু চিরযৌবন ও সুন্দর, তার উৎকৃষ্ট ঘোড়া, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে। তিনি উত্তমরূপে সজ্জিত হয়ে আছেন, তার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, তার তীরে সীলমা-তৃণ আছে। তিনি মধু প্রসবকারী পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত।" সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি বলেছেন "হে সিন্ধু, যখন তুমি অন্নশালী অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য করে ধাবিত হলে, তখন বরুণদেব তোমার যাবার নানা পথ করে দিলেন। শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদেকে নিয়ে যাও। পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে সমর্থ হও, আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ কর। অভীষ্ট বস্তু দান কর, আমাদেরকে তীক্ষ্ণতেজা কর, আমাদের উদর পূরণ কর।" এইরূপে আর্যেরা উর্বর ভূমিখণ্ড সকলকে অধিকৃত করে ক্রমে কৃষির বিস্তার করতে লাগলেন। বামদেব ঋষি ক্ষেত্রপতি শুনাসীর—সীতা দেবতার স্তব করে বলছেন "আমরা বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্র জয় করব. তিনি আমাদেরকে গরু ও ঘোড়ার পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করে আমাদেরকে সুখী করেন। হে ক্ষেত্রপতি, ধেনু যেমন দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধু দ্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃত তুল্য মাধুর্যোপেত ও প্রভূত জল দান কর। শস্য সমূহ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হ'ক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হ'ন। আমরা অহিংসিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করব। বলীবর্দসমূহ সুখে বহন করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হ'ক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর। হে সৌভাগ্যবতী সীতা, তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করছি, তুমি আমাদেকে সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁকে পরিচালিত করুন, তিনি জলবতী হ'য়ে বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুন।

ফসল সকল সুখে কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুখে গমন করুক। পর্জ্জন্য মধুর জলদ্বারা পৃথিবী সিক্ত করুন। হে শুনাসীর, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।"

এইরূপে সুজলা ভূমিতে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হ'তে লাগল। এই ক্ষেত্রে তাঁরা শস্য উৎপাদন করতেন এবং তারই নিকটে গোষ্ঠ করে পশুপালন করতেন, এবং গ্রাম স্থাপন করে বাস করতে লাগলেন। দেশটি নদীমাতৃক। স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে কৃষির জন্য জলের অভাব হত, সেইজন্য জলদেবতার এত স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়।

পল্লী ও পল্লীসমাজের উৎপত্তি, স্থিতি ও উন্নতি

এইরূপে বহুকাল গত হল। ক্রমে সিন্ধুতীর থেকে সরস্বতী তীর; সেখান থেকে দৃষদ্বতীতীর পর্যন্ত সমস্ত দেশগুলি তাদের অধিকৃত হল, কোন উপদ্রব রইল না। দস্যু তস্করেরা আর গোরু চুরি করে না, যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে না। বনে হরিণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মধ্যস্থ দেবনির্মিত এই দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত। তারপর, পূর্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমবান, দক্ষিণে বিন্ধ্য। এই বিস্তীর্ণ দেশে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং দেশের নাম হল আর্যাবর্ত। দ্বি-জাতীয়েরা এই দেশে বাস করলেন, আর শূদ্রেরা নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এখানে এবং অন্য দেশেও বাস করতে লাগলেন। নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করে আর্যদের সমাজ গঠিত হতে লাগল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সকল বিষয়েরই উন্নতি হতে লাগল। গুণ-কর্ম বিভাগের দ্বারা বর্ণভেদ হ'ল। কৃষক তৃতীয় শ্রেণিতে অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণে স্থান পেলেন।

এইরূপে পরস্পর সন্নিহিত কতকগুলি কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষক নিয়ে গ্রাম হল। তাতে ক্রমে ক্রমে সূত্রধর, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার প্রভৃতি শিল্পীও কারুকার এসে বাস করলেন। পরে এই সকল লোকের যাজন এবং পৌরোহিত্যের জন্য ব্রাহ্মণও এলেন। ক্রমে গ্রাম্যসমিতি গঠিত হল; সমিতির সদস্যেরা গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি; তারা আবার তাদের অধিপতি নির্বাচন করে নিতেন। গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ, শাসন, বিচার প্রভৃতি সমস্ত কাজই এই সমিতি দ্বারা নির্বাহিত হত। এক একটি পল্লীসমাজ ছিল এক একটি ক্ষুদ্র প্রজাসাধারণতন্ত্র রাজ্য। সকল কাজেই এরা সাবলম্বী; কোন কাজের জন্য বাইরের সাহায্য নেবার এঁদের আবশ্যক হত না। পুরোহিত, শিল্পী কারুকার সকলেই পল্লীসমাজের সামাজিক, সেবক ও ভৃত্য। তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দিয়ে। অনেককে জমিও দেওয়া হত। দেশে কত রাষ্ট্র বিপ্লব হয়েছে। কত রাজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পল্লীসমাজ যেমন ছিল বৈদেশিক আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত তেমনি ছিল। এখনও বহু পল্লীগ্রামে, যেখানে নাগরিক সভ্যতার প্রভাব পৌঁছায়নি, সামান্যরূপ পরিবর্তিত হয়ে এই প্রথাই প্রচলিত আছে। ইংরাজেরা এদেশে আসবার কিছু পরে এই সকল পল্লীসমাজকে যে ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন তার একটি বিবরণ এই—

"The village communities are little republics having nearly everything they want within themselves, and almost independent of foreign relations. They seem to last when nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down; revolution succeeds revolution; Hindu, Pathan, Mughal, Maratha,

Sikh, English, all are masters in turn; but the village communities remain the same. In times of trouble they arm and fortify themselves. An hostile army passes through the country; the village communities collect their call-le within their walls, and let the enemy pass unprovoked. If plunder and devastation be directed against themselves, and the force employed be irresestible, they flee to friendly villages at a distance; but when the storm has passed over, they return and resume their occupations. If a country remain for a series of years the scene of continued pillage and massacre so that the villages cannot be inhabited, the scattered villagers nevertheless return whenever the power of peaceable possession revives. A generation may pass away but the succeeding generation will return. The sons will take the places of their fathers; the same site for the village, the same positions for their houses, the same lands will be reoccupied by the decendants of those who were driven out when the village was depopulated : and it is not a trifling matter that will drive them out, for they will often maintain their post through times of disturbance and convulsion, and acquire strength sufficient to resist pillage and oppression with success. This union of the village communities, each one forming a little state in itself, has, I conceive, contributed more than any other cause to the preservation of the people of India, though all the revolutions and changes which they have suffered, and is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence."

আর একটি ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তান্ত এইরূপ—

"I have several times spoken of them (village communities) as organised and self acting. They infact include a nearly complete establishment of occupations and trades for enabling them to continue their collective life without assistance from any person or body external to them. Besides the Headman or council exercising quasi-judicial, quasi-legislative, power, they contain a village-police...they include several families of hereditary traders; the black smith, the harness-maker, the shoe-maker. The Brahman is also found for the performance of ceremonies, and even the dancing girl for attendance at festivities...But the person practising any one of these hereditary employments is really a servant of the community as well as one of its component members. He is sometimes paid by an allowance in grain. More generally by the allotment to his family of a piece of cultivated land in hereditary possession."

এই সময়ে যখন গ্রামগুলি সুসংস্থাপিত হয়েছে, তখন কৃষকের কৃষ্ট ভূমির কর নির্ধারিত হল। কর হল উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ বা অষ্টমাংশ। এর নাম রাজভাগ বা রাজস্ব। রাজ-নিয়োগ প্রাপ্ত গ্রামপতি, দশ গ্রামাধিপতি, বিংশতি গ্রামাধিপতি, শত গ্রামাধিপতি, সহস্র গ্রামাধিপতি এই রাজস্ব আদায় করতেন এবং এর পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রামপতি অন্ন পান ইন্ধনাদি এবং অন্যে কিছু ভূমি পেতেন। তার নাম কুলভূমি। কৃষক প্রদত্ত করে তাদের

কোন অংশ ছিল না। গ্রামপতি কোনরূপ অন্যায় কার্য না করেন তা দেখবার জন্য উপরিতন কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। অসাধুতা চিরকালই আছে, তখনও ছিল। যে সকল পাপবুদ্ধি রাজকর্মচারী কার্যার্থিদের কাছ থেকে কৌশল করে অর্থ গ্রহণ করত, রাজা তাদের সর্বস্ব নিয়ে তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দিতেন। কৃষকের গরু চরাবার জন্য গ্রামের চারিদিকে চারশ' হাত জমি এবং নগরের চারিদিকে এর তিনগুণ পরিমিত ভূমি রাখা হত। তখন রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী উপস্বত্ব ভোগী বা রাজস্বভোগী কেউ ছিল না। রাজস্ব যথারীতি যথাসময়ে আদায় হত। বাকী খাজনার মোকদ্দমা বা সার্টিফিকেট জারি ছিল না। যে যে বিষয় নিয়ে মোকদ্দমা হত তা এই ঋণগ্রহণ, গচ্ছিত ধন, অস্বামিক বস্তু বিক্রয়, পাঁচজনে মিলে বাণিজ্য কার্যানুষ্ঠান, দত্তবস্তুর পুনর্গ্রহণ, ভৃত্যকে বেতন না দেওয়া, প্রতিজ্ঞার উল্লঙ্ঘন, ক্রয় বিক্রয় জন্য অনুতাপ, স্বামী ও পশুপালের বিবাদ, সীমাবিবাদ, গালাগালি, মারামারি, চৌর্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি, পরস্ত্রীহরণ, স্ত্রীপুরুষের নিয়ম, পিতৃধন বিভাগ, পণপূর্বক পাশক্রীড়া বা পক্ষী মেষ প্রভৃতি প্রাণীর যুদ্ধ। এই আঠার রকম বিবাদের বিষয়। এই তালিকায় বাকি খাজনার কথা দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে বাকি খাজনার মোকদ্দমা তখনকার কালে ছিল না। এর মধ্যে আবার কৃষকগণ, বণিকগণ, পশুপালকগণ, কুসীদিগণ এবং শিল্পজীবিগণ নিজ নিজ দলের মধ্যেও বিচারস্থান (পঞ্চায়েত) নির্দিষ্ট করতে পারতেন। বাকি খাজনার মোকদ্দমা যেমন ছিল না, বাকি খাজনার সুদ ও তের্মান ছিল না। কিন্তু ঋণের আদান প্রদান ছিল এবং সুদও ছিল। তবে তা রাজবিধিকর্তৃক নির্ধারিত হত। বশিষ্টের ব্যবস্থা এই যে, বৃদ্ধিজীবী উত্তমর্ণ বিনা বন্ধকে প্রতিমাসে শতকরা আশীভাগের একভাগ সুদ নেবেন, অথবা উত্তমর্ণ সাধুদের ব্যবহার স্মরণ করে প্রতিমাসে শতকরা দুপন সুদ নেবেন। উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট মাসে মাসে সুদ না নিয়ে একবারে নিলে মূল ও সুদে দু'গুণের অধিক নিতে পারবেন না। চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ সুদের সুদ, কালবৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বিগুণের অধিক সুদ, কারিকাবৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় দোহন ও বাহনাদি দ্বারা বৃদ্ধি ও কারিকা বৃদ্ধি অর্থাৎ বিপৎসময়ে পীড়ন করে বৃদ্ধি এই চারপ্রকার বৃদ্ধি অশাস্ত্রীয়, তা নেবে না। তখনকার মহাজনের সহিত অন্য অন্য লোকের মত কৃষকেরও এই সম্বন্ধ ছিল।

গৃহস্থাশ্রমের প্রধান ব্যক্তিই কৃষক। বিহার ও আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশে কৃষকের নামান্তর গৃহস্থ। বণিক, শিল্পী, চাকরী উপজীবীকে গৃহস্থ বলে না। গুরু পুরোহিত হতে আরম্ভ করে পথের ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলেই এই গৃহস্থের বা কৃষকের দ্বারে অন্নের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। কৃষকও যথাসাধ্য অন্নদান করে সকলকে পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করে। পারস্পরিক সাহায্য হিসাবেও কৃষককে গ্রামের ধোবা, নাপিত, মালী, কর্মকার, কুম্ভকার, চর্মকার সকলকেই প্রতিপালন করতে হয়। শহরে এই সকল লোকের পরিশ্রমের মূল্য নগদ পয়সায় দেওয়া হয়। গ্রামে কৃষক নগদ পয়সার পরিবর্তে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের অংশ দিয়ে থাকে। পৌষ মাসে শস্য গৃহাগত হলে কর্মকার আসেন লাঙল গড়ে দেবার পারিশ্রমিক নিতে; প্রত্যেক লাঙলের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যই পারিশ্রমিক, ধোবা কৃষক—পরিবারের প্রত্যেকের কাপড় ধোবার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য পেয়ে থাকেন। তার প্রাপ্য নিতে তিনিও এই সময় উপস্থিত হন। নাপিত প্রত্যেকের ক্ষৌরকার্য

করবার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য পেয়ে থাকেন। তার প্রাপ্য জমিতে তিনিও এই সময় উপস্থিত হন। তাকেও এই সময় তার প্রাপ্য দিতে হয়। মালী বিবাহাদি উৎসবে ফুল যোগান, তারও একটা প্রাপ্য আছে এবং তা এই সময় দিতে হয়। এইরূপ সকলকেই তাদের প্রাপ্য দিতে হয়। এই আদান প্রদান উভয় পথেই পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। এই সমস্ত নিয়ে পল্লীসমাজ। পল্লীসমাজ বুঝতে হলে এই সমস্ত ভাল করে বুঝতে হবে। অন্য সকল আশ্রমীরা কেমন করে কৃষকের উপর নির্ভর করে তা এই চিরাগত আচার থেকে বুঝতে পারা যায়। সেইজন্য আশ্রমীদের মধ্যে সংহিতাকারগণ গৃহস্থাশ্রমীকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন, কারণ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি এই আশ্রমীদিগকে ভিক্ষা দানাদি দ্বারা গৃহস্থই পোষণ করেন।

কৃষক যে পল্লীসমাজের মেরুদণ্ড, তা পৌরাণিক যুগের ও তার পরবর্তী যুগের হিন্দু রাজারা সকলেই বুঝতেন এবং তা বোঝবার জন্য ধর্মশাস্ত্রে রাজাদের প্রতি নানা অনুশাসন, উপদেশ ও আদেশ আছে। ক্রমে প্রজা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে প্রজার দাসত্বই রাজার গৌরব হয়েছিল, প্রজা প্রদত্ত করগ্রাহী বলে কোন সম্মান ছিল না। রাজাকে বলা হত—

"গণদাসস্য তে গর্বঃ
ষড় ভাগেন ভৃত্যস্য কঃ।"

মুসলমানের আগমন—ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—ভূমিকর—আবওয়াব

হিন্দু আমলে কৃষককে কেন্দ্র করে পল্লীসমাজ এইরূপে গড়ে উঠেছিল; পৌরাণিকযুগে এবং তার পরেও ভারতবর্ষে বহু রাষ্ট্র ছিল। অনেক রাজাই সমগ্র ভারতবর্ষকে একচ্ছত্র করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে অনেকসময় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটত। বিজেতা রাজা বিজিত রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে, কখনও বা কিছু কর নিয়ে তার রাজ্যে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত রাখতেন। বিজিতের রাজ্য অধিকার করে নিতেন না। সুতরাং কৃষকের তাতে সামান্য সাময়িক অশান্তি ভিন্ন কোন সবিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। কৃষক রাজভাগ দিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা পিতামহ থেকে প্রাপ্ত ভূমি নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে ভোগ করত।

কিন্তু চিরকাল এ অবস্থা থাকল না, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষি-বাণিজ্য সমৃদ্ধি বিদেশীর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভারতবর্ষের সীমান্তে যে সকল মুসলমান দলপতি ছিলেন তারা ভারত বিজয় করতে এলেন। এবং একে একে ক্ষুদ্র রাজাদের সহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখনকার যুদ্ধ বিগ্রহ রাজায় রাজায় হত। প্রজার তাতে বড় একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকত না। যুধ্যমান রাজারা জানতেন প্রজাই তাদের সর্বস্ব। সুতরাং প্রজার উপর প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অত্যাচার করতেন না। কিন্তু মুসলমান রাজারা অন্য দিগ্বিজয়ী রাজাদের মত এখানে আসেন নি, দিগ্বিজয় করে তারা স্বদেশে ফিরে যাননি। হিন্দু রাজারা যেমন ক্ষুদ্রতর বিজিত রাজাকে বশ্যতা মাত্র স্বীকার করিয়ে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতেন, মুসলমান বিজেতারা তা করলেন না। তারা দেশজয় করে এই দেশেই বাস করে রাজত্ব করতে লাগলেন। কাজেই তাদের রাজোচিত ব্যয় এবং তাদের সৈন্য সামন্তের ব্যয় বিজিত হিন্দু রাজাকেই দিতে হল। বিজিত রাজা অবশ্য প্রজার নিকট প্রাপ্য তার নিজের অংশ

থেকে এই নূতন ব্যয়টা দিলেন না। কৃষককেই প্রধানত এই ব্যয়ভার বহন করতে হল। ভূমিকরের বৃদ্ধি প্রথম এইরূপেই আরম্ভ হয়। তারপর রাজার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অনুসারেই করের বৃদ্ধি হতে লাগল। এতে কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালী ছিল বলে বোধ হয় না।

মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে বিজিত দেশের লোককে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হত। প্রথম, 'শিল্পী' অর্থাৎ শান্তশিষ্ট। দ্বিতীয়, 'জিম্মী' অর্থাৎ বশীভূত কিন্তু 'অবিশ্বাসী' (অমুসলমান)। তৃতীয় 'হার্বী' অর্থাৎ মুসলমান বিদ্বেষী। দেশ জয়ের পর যদি দেশবাসীকে দেশে বাস করতেই দেওয়া হত, তা হলে তার মাথার উপর 'জিজিয়া' ও জমির উপর 'খিরাজ' বসান হত। এই কর দিলে জমি প্রজারই থাকত। এই করের মাত্রা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। আলাউদ্দীন খিলজী একদিন তার সভা কাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাজী সাহেব, হিন্দুদের কাছ থেকে কিরূপ বশ্যতা ও কিরূপ কর আদায় করা যেতে পারে?" শাস্ত্রজ্ঞ কাজী সাহেব উত্তর করলেন "ইমান হানিফ বলেন 'জিজিয়া' স্থাপন করা হয় মৃত্যুদণ্ডের বিকল্পে। সুতরাং যত সহ্য করতে পারে, 'অবিশ্বাসীদের' ওপর কর তত গুরুভারই হওয়া উচিত। এমনও আদেশ আছে যে 'খিরাজ' ও 'জিজিয়া' আদায়ের জন্য 'অবিশ্বাসী'র শেষ কপর্দক পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ দণ্ডটা যেন মৃত্যুদণ্ডের কাছাকাছি হয়।

'খিরাজ' শব্দের অর্থ শস্য উৎপাদন করার ব্যয় বাদে যা থাকে তাই খরচ-খরচা বাদে কৃষির নেটলাভ। পরে দেখা যাবে ম্যলথাসও খাজনার এই অর্থ করেছেন। 'খিরাজ' অনেক প্রকারের ছিল। তার মধ্যে এক প্রকারের নাম 'খিরাজ মুক্ সিমা' অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের অংশ, রাজপ্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ। এটি হিন্দু রাজার প্রাপ্য এক ষষ্ঠাংশের অতি নিকটবর্তী। শস্য সংগ্রহ করে তাকে প্রচলিত মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় করা হত। তখন এর নাম হত 'খিরাজ-মু-ওয়াজিফা' অথবা সংক্ষেপে 'ওয়াজিফা'। আলাউদ্দিনের সভা কাজীর পরামর্শ অনুসারে যদিও সমস্ত উৎপন্ন শস্যই 'খিরাজ' বলে নেওয়া যেতে পারত, তবুও আলাউদ্দীন অর্ধেক নিয়েই সন্তুষ্ট হতেন। ব্রিগ বলেন উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক ছিল আলাউদ্দীনের সময়ের 'খিরাজ'। কিন্তু আকবরের সময়েই ভূমি-কর নির্ধারণ প্রণালীবদ্ধ হয় এবং কর আদায়ের সুব্যবস্থা হয়। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে জরিপের দ্বারা বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। গুণানুসারে জমির শ্রেণি বিভাগ হয়—(১) 'পলেজ' অর্থাৎ যে জমিতে ক্রমাগত চাষ চলতে পারে, কখনও পতিত রাখতে হয় না। (২) 'ফিরাওটি' অর্থাৎ শস্য পর্যায়ের জন্য যে জমি মধ্যে মধ্যে পতিত রাখতে হয়। (৩) 'চিচর' অর্থাৎ বন্যাপ্লাবিত হওয়ায় বা অন্য কোন কারণে যে জমিকে তিন চার বৎসর পতিত রাখতে হয়। (৪) 'বনজর' অর্থাৎ যে পতিত জমিতে পাঁচ বৎসরের অধিককাল চাষ হয়নি। প্রথম তিন শ্রেণি আবার উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিনপ্রকারে বিভক্ত হত। এই সকল জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হত, রাজা তার এক তৃতীয়াংশ পেতেন। 'বনজর' বা পতিত জমির খাজনা প্রথম বৎসর উৎপন্ন শস্যের একসের বা দু'সের এইরূপে বেড়ে বেড়ে শেষে পূর্ণমাত্রায় দাঁড়াত। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জমিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শস্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হত এবং তার দাম কত, তারও ১৯ বছরের হিসাব করে একটা গড়পড়তা ঠিক করা হয়েছিল। প্রজা ইচ্ছানুসারে শস্যের অংশ বা তার বিনিময়ে তখনকার প্রচলিত মূল্য খাজনা স্বরূপ দিতে পারত। কিন্তু এর পরে দশ বৎসরের জন্য নগদ টাকার জমির খাজনা নির্ধারিত করা হয়েছিল। আকবরের রাজত্বের

১৫ থেকে ২৪ বৎসর পর্যন্ত যে রাজস্ব প্রকৃতপক্ষে আদায় হয়, সেই মোট আদায়ের এক-দশমাংশই পরবর্তী দশ বৎসরের করের হার স্বরূপ গৃহীত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে এর বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই বিবরণ থেকে দুটি বিষয় বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। প্রথমত, ভূমির অধিকারী ছিল কৃষক; দ্বিতীয়ত ঃ রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্তী উপস্বত্বভোগী আর কেউ ছিল না।

পূর্বেই বলা হয়েছে হিন্দু রাজাদের সময়ে রাজস্ব আদায় করবার জন্য রাজ কর্মচারী নিযুক্ত হত। স্থান ভেদে এই কর্মচারীকে গ্রামপতি, প্রধান, দেশমুখ প্রভৃতি নাম দেওয়া হত। কোন কোন স্থানে তাদেরকে চৌধুরীও বলা হত। পাঠানদের রাজত্বকালেও এদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়নি। পাঠান রাজত্বের শেষভাগে বাংলাদেশে বারোজন 'ভুঞা' ছিলেন। ইহাদিগকে 'বারভুঞা' বলত। 'ভুঞা' শব্দটা বোধ হয় 'ভৌমিক' শব্দের অপভ্রংশ। এই ভৌমিকেরা সাধারণত অর্ধ স্বাধীন রাজার মত থাকতেন। সুযোগ পেলে পূর্ণ স্বাধীনতাও গ্রহণ করতেন। এদের সৈন্য ছিল, দুর্গ ছিল, নদীবহুল স্থানে বা সমুদ্রতীরে রণতরীও ছিল। শান্তিরক্ষা এবং বিচারকার্যও এরা করতেন। এই ভৌমিকেরা রাজস্ব আদায়ের জন্য তালুকদার নিযুক্ত করেন। এইরূপে মোগল রাজত্বের শেষভাগে বাংলাদেশে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী ভূমধ্যকারীর সৃষ্টি হয়। মুসলমান সম্রাটগণ এক ভূমধ্যকারীর পরে অন্য ভূমধ্যকারীকে সনদ দেবার অধিকার আপনার হাতে রাখলেও কার্যত উত্তরাধিকার সূত্রেই ভূমধ্যকারত্ব প্রাপ্তি ঘটত। আকবরের বঙ্গ বিজয়ের কিছুকাল পরে ভৌমিকদের প্রভাব তিরোহিত হয়। কিন্তু তাদের সৃষ্ট তালুকদারগণের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

রাজা প্রজার মধ্যবর্তী এই তালুকদারের সৃষ্টি থেকে প্রজা যে প্রাচীনকালে রাজাকে ষড়ভাগ দিত। তারও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। প্রজাদত্ত রাজস্ব সমস্তই রাজাকে দিলে মধ্যবর্তী তালুকদারের কিছু লাভ হয় না। সুতরাং তালুকদার তার দায়িত্বের জন্য, তার পারিশ্রমিক প্রভৃতির জন্য কিছু অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। এই সময়ে আসল খাজনা কত ছিল এবং তালুকদারের অতিরিক্তই বা কত ছিল তা জানা যায় না। কিন্তু মুরশিদকুলি খাঁ এর একটা প্রণালী নিবদ্ধ করে দেন। তার সময়ে গমস্ত বাংলাদেশটা পরগণায় বিভক্ত করা হয়। এবং জমির গুণাগুণ অনুসারে খাজনার হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এই হার অনুসারে মুসলমান রাজ সরকার থেকে খাজনা আদায় করা হত। আর রাজ সরকারের ব্যয় প্রধানত এই রাজস্ব থেকেই নির্বাহিত হত। কিন্তু মুসলমান রাজত্বের অধঃপতন ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভ্যুত্থানের সময় এই ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে যায়। নানা কারণে তখনকার নবাবগণ কোম্পানিকে সন্তুষ্ট রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোম্পানির এই বহুমূল্য সন্তুষ্টি লাভ করতে অনেক অর্থের আবশ্যক হত। বলা বাহুল্য, প্রজার কাছ থেকেই এই অর্থ শোষণ করা হত। মুরশিদকুলি খাঁ এর কিছু পূর্বেই তার নিজের নির্ধারিত নিরিখের উপর নিজেই এক অতিরিক্ত কর স্থাপন করেন। এই অতিরিক্ত করের নাম 'আবওয়াব-মাসন-বিসী'। 'আবওয়াব' অর্থে অতিরিক্ত কর। নিজ সরকাবের খালসা সেরেস্তার কর্মচারীদের পার্বনী দেবার জন্য এর সৃষ্টি হয়। এক বারের আদেশ দ্বিতীয় বারের নজির হয়ে থাকে। সুজা খাঁ নবাবী ব্যয় নির্বাহের জন্য আর চার প্রকার 'আবওয়াব' আদায় করবার আদেশ দিলেন। সেগুলি এই—

(১) 'নজর-আনা মোকররী' অর্থাৎ স্থায়ী নজর-আনা।

(২) 'জার মাথট।'

(৩) 'মাথট ফিলখানা' অর্থাৎ হাতীশালার ব্যয় নির্বাহের জন্য কর।

(৪) 'আবওয়াব ফৌজদারী'।

'জার মাথটের মানেটা একটু কৌতূহলজনক। 'জার' মানে টাকা আর 'মাথট' কথাটা আরবী 'মৎ হেট' কথার অপভ্রংশ। এর অর্থ এই যে, শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গিয়ে শস্য নষ্ট করবে না, এই অনুগ্রহের জন্য ক্ষেতের মালিককে কিছু দিতে হত। পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন স্থানে একে 'নজর সওয়ারী' বলত, কোন কোন স্থানে 'নাল বন্দীও' বলত। বুৎপত্তিগত মানে এই হলেও যার ক্ষেতের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য যেত না তার কাছ থেকেও এটা আদায় করা হত। ক্রমে সকলের কাছ থেকেই আদায় হত। পুন্যাহের দিন জমিদার যে তার জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেন, তার চিহ্নস্বরূপ তাকে একটা 'খেলাত' দেবার প্রথা ছিল। সেই 'খেলাতে'র মূল্যটা এই থেকেই দেওয়া হত। আর মুর্শিদাবাদে কেল্লার সম্মুখে গঙ্গার উপর পোস্তাবন্দী করবার ব্যয়টাও এই থেকে দেওয়া হত। অন্য তিনটি 'আবওয়াবে'র ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

সুজা খাঁর পরে আলিবর্দি খাঁ 'চৌথ মারাঠা', 'আহুক' ও 'নজর-আনা মনসুরগঞ্জ' নামে আরও তিনটি 'আবওয়াবে'র সৃষ্টি করেন। আলিবর্দির প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদৌলা বাংলার মসনদে আরোহন করবার পূর্বে কিছুদিনের জন্য বিহারের শাসনকর্তা হয়েছিলেন। সেই সময় আলিবর্দি তার স্থল বিহারের জন্য একটি প্রমোদভবন এবং জল বিহারের জন্য একটি হ্রদ, এবং একটি বাজার তৈরি করে দেন। প্রমোদভবনের নাম মনসুর নদী, হ্রদের নাম হীরাঝিল এবং বাজারের নাম মনসুরগঞ্জ। এই সকলের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটা 'আবওয়াবের' আবশ্যক হয়। তারই নাম 'নজর আনা মনসুরগঞ্জ'। এর পরিমাণ ৫,০১, ৫৯৭ টাকা। দ্বিতীয়টির দ্বারা মুর্শিদাবাদের কেল্লা ও রাজবাড়ির চুন আনার খরচ দেওয়া হত। এই চুন শ্রীহট্ট থেকে আনা হত। এর পরিমাণ ১,৮৪,১৪০ টাকা। তৃতীয়টি বর্গির হাঙ্গামা নিবারণের জন্য। হাঙ্গামা হুজুত করবার কষ্ট স্বীকার না করে কিঞ্চিৎ নিয়ে বাংলাদেশে বর্গিরা আর না আসেন সেইজন্য এটা উপহার স্বরূপ তাদের দেওয়া হত। এই কিঞ্চিতের মূল্য ১৫,৩১,৮১৭ টাকা। তারপর মীরকাসেম আরও চারটি 'আবওয়াব' স্থাপন করেন।

(১) 'কেয়াফৎ হস্তবুদ'।

(২) 'কেয়াফৎ ফৌজ দারান'।

(৩) তৌজির জাগির দারান্'।

(৪) সেরফ সিক্কা'।

এছাড়া, বাণিজ্য শুল্কাদিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ১,১০,৩৬, ০৫৮ টাকা। বাংলার বসুমতী সর্বংসহা, বাংলার প্রজা এই বিবৃদ্ধ করভারটি সহ্য করে নিলে।

এই বৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার সুজা খাঁ ১ কোটি ৭ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দেন। এরপরে মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে একবার বৃদ্ধি হয়। মুরশিদকুলি খাঁর দেখলেন মধ্যবর্তী লোকের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ না

করিয়ে রাজকর্মচারী দ্বারা করালে সরকারের বেশি লাভ হতে পারে। সেইজন্য তিনি মধ্যবর্তী জমিদার সরিয়ে দিয়ে সরকারি কর্মচারী দ্বারাই রাজস্ব আদায় করবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু সে বন্দোবস্ত স্থায়ী হয়নি। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে সুজাউদ্দীন আবার রাজস্ব বৃদ্ধি করলেন। রাজস্বের পরিমাণ হল ১ কোটি ৪২ লক্ষের উপর। মীরকাসেমের সময় হয় শেষ বৃদ্ধি। তখন বর্ধিত রাজস্বের পরিমাণ হয় ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সুজা খাঁর সময়ে যে রাজস্ব ছিল তার দ্বিগুণ। নবাব সরকার এই বৃদ্ধি জমিদারের কাছ থেকে আদায় করতেন। জমিদার যে এটা আবার প্রজার কাছ থেকে আরও কিছু লাভের সহিত আদায় করে নিতেন তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। এর উপরে ছিল 'সিবাই' অর্থাৎ অতিরিক্ত। নবাব সরকারের স্থায়ী কর্মচারীরা প্রজার কাছ থেকে আদায় করে নিতে জমিদারকে ক্ষমতা দিতেন। এই প্রকার 'আবওয়াব' বা অতিরিক্ত কর যখন সংখ্যায় ও প্রকারে অনেক হয়ে উঠত তখন সেগুলিকে আসল জমার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হত এবং এই যোগফল হত 'মাল'। এই 'মাল' মাত্র আদায় করেই জমিদার ক্ষান্ত হতেন না। নবাব-সরকারের অনুকরণে তারা নিজের জন্যও অনেক 'আবওয়াব' আদায় করতেন। সরকারী 'আবওয়াব' থেকে পৃথক জমিকরের নিজ 'আবওয়াবের' একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এইরূপ—

(১) 'মাঙ্গন'—জমিদারের ঋণ পরিশোধের জন্য।

(২) 'নাজাই'—কোন প্রজা পলাতক হলে তার কাছে প্রাপ্য খাজনা অন্য অন্য প্রজার উপরহারাহারি করে আদায় করা হত। কারণ, জমিদার সকলের খাজনার ঠিকা নিয়েছেন, কারও খাজনা আদায় না হলে জমিদারকেই তা দিতে হত।

(৩) 'পার্বনী'—পর্বোপলক্ষে জমিদারের ব্যয় নির্বাহের জন্য।

(৪) 'পুলবন্দী'—জমিদারির মধ্যে জমিদারের ভ্রমণের সুবিধার জন্য পুল বাঁধা ব্যয়।

প্রজা যখন এই সকল 'আবওয়াবে'র গুরুভারে প্রপীড়িত এবং নবাব, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে অপরিশোধ্য ঋণ জালে জড়িত, তখন কোম্পানি বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানি পেলেন।

বাংলার কৃষকের কথা—হৃষিকেশ সেন।

বাঁকা (ছদ্মনাম)

বঙ্গে জমিদার সম্প্রদায়—রাজস্ব ও প্রজাস্বত্ব

(ইংরেজ আমল)

রাজস্ব শব্দের ধাত্বর্থ বহুবিস্তৃত হইলেও, রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ভূমির কর স্বরূপ যাহা গ্রহণ করেন সাধারণত তাহাকেই আমরা রাজস্ব বলি, এবং এস্থলে শব্দ সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইল।

ভূমি কাহাকে বলে, সকলেই জানেন। কিন্তু এই ভূমিতে কাহার স্বত্ব সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে, সমুদয় ভূমি রাজার; আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সমুদয় প্রজার। হিন্দু ও মুসলমানগণ দ্বিতীয় মতাবলম্বী। তাহারা বলেন, রাজা অন্যান্য বিষয়ের সহিত ভূমিরও রক্ষা করিয়া থাকেন তজ্জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের কোনও অংশ, কিংবা তাহার মূল্য পাইয়া থাকেন। প্রামাণিক হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি পরিশ্রম দ্বারা যে ভূমি আপন ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবে, ঐ ভূমি তাহার হইবে। অবশ্য, পতিত জমি সম্বন্ধেই ঐ কথা বলা হইয়াছে। যাহা হউক, ভূমির স্বামিত্ব লইয়া মতভেদ থাকিলেও, রাজা যে ব্যবহৃত ভূমির রাজস্ব পাইবার অধিকারী, সে বিষয়ে কেহই সন্দেহ করেন না।

হিন্দু ও মুসলমানদিগের সময়ে রাজস্ব স্বরূপ উৎপাদিত ফসলের অংশ গৃহীত হইত—নগদ মুদ্রা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। এই অংশও শস্যবিশেষে বিভিন্ন প্রকার হইবে। তোগ্‌লক্‌বংশীয় বাদশাহদিগের অধিকারকালে উহা সম্পূর্ণরূপে তৎকাল প্রচলিত আরবীয় প্রথার অনুরূপ করা হয়। তৎপরে শেরশাহ পুনরায় উহার পরিবর্তন ও উহাকে সময়ের ও সমাজের উপযোগী করিয়া রাজস্ব আদায়ের নূতন প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার অসাময়িক মৃত্যু বশত উহা সম্পূর্ণ ও সর্বত্র প্রচারিত হয় নাই। অবশেষে, স্বনামধন্য রাজা টোডরমল উৎপাদিত শস্যের অংশ গ্রহণের প্রথা রহিত করিয়া, নগদ মুদ্রা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। রাজা উৎপাদিত ফসলের তৃতীয়াংশ পাইবার অধিকারী, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মুদ্রার পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়; এবং গত ১৬ বৎসরের উৎপন্ন ফসলের মূল্য লইয়া হারাহারি এক বৎসরের পরিমাণ ধরা হয়। এইরূপে স্থিরীকৃত রাজস্ব দশ বৎসরের মধ্যে পরিবর্তিত হইত না। এই প্রথা বঙ্গদেশে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। তোডরমল্ল বিহারের কিয়দংশ ও বঙ্গদেশ ব্যতীত আকবরের সুবিস্তৃত রাজ্যের রীতিমত জরিপ ও তদন্তর উৎপাদিকাশক্তি এবং অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমুদয় ভূমি আট শ্রেণিতে বিভক্ত ও কর নির্ধারিত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের অধিকারবলে চাকলা, পরগণা তপ্পা কিংবা অন্য কোনওরূপে নির্ধারিত কেন্দ্রের রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত এক শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। তাহাদিগকে জমিদার (জমিন + দার, দার শব্দের অর্থ রাখ্‌নেওয়ালা, ভৃত্য) বলিত। রাজস্ব

আদায় ব্যতীত তাহাদিগকে স্ব স্ব এলাকা মধ্যে শান্তিরক্ষা, রসদ সরবরাহ ও অন্যান্য সামান্য সরকারি কার্য করিতে হইত। তাহাদের কোনও নির্দিষ্ট বেতন ছিল না; তাহারা নির্ধারিত কর বাদশাহের প্রতিনিধির হস্তে অর্পিত করিয়া উদ্বৃত্ত অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিতেন।

কালে, অন্যান্য চাকরির ন্যায় এই পদও কুলক্রমাগত হইয়া যায়; এবং আলোচনা ও অনুসন্ধিৎসার অভাবে সাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে জমিদারগণই ভূমির প্রকৃত অধিকারী—তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, যে কোনও জমি যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারেন—কৃষকদিগের উহাতে কোনও স্বত্ব বা অধিকার নাই। এইরূপেই নানাবিধ মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে, এই জমিদারগণ ঠিকাদার ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। অতঃপর আমরা এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগকে ঠিকাদার বলিয়া নির্দেশ করিব।

বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার ঠিকাদারি বন্দোবস্ত মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্তৃত্বাধীনে সম্পাদিত হইত; এবং রাজস্ব মুর্শিদাবাদের রাজকোষে প্রদান করিতে হইত। ফল কথা, রাজস্ব স্থিরীকরণ ও উহার আদায়, নবাব বাহাদুরের সর্বময় আয়ত্তাধীনে ছিল। যে পরিমাণ রাজস্ব স্থির করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইত তাহাকে "আসল জমা" বলিত; এবং আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণের ন্যায্য খরচ বাদে, উহার সমুদয় দিল্লি প্রেরণ করিতে হইত। নবাব মহোদয়ের অধিক টাকার আবশ্যক হইলেই, তিনি একটা না একটা বাহানা করিয়া, ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিতেন। ইহাকে আবওয়াব বলিত; এবং কালে উহা স্থায়ী হইয়া যাইত। তদপেক্ষা অধিক টাকার আবশ্যক হইলে, পুনরায় নূতন আবওয়াব বসান হইত; এবং উহাও স্থায়ী হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে, নবাবের কর্মচারীগণও স্ব স্ব উদরপূর্তির মানসে স্বতন্ত্র আবওয়াবের দাবি ছাড়িতেন না। এইরূপে, নবাব কাশিম-আলির সময়ে এই আবওয়াবের পরিমাণ বাৎসরিক এক কোটি টাকারও অধিক হইয়া ওঠে।

ইহা কখনও মনে করা যাইতে পারে না যে, ঐ টাকা ঠিকাদারেরা আপনাদের নিজস্ব হইতে দিতেন। তাহারাও প্রজাবর্গের উপর আবওয়াব বসাইয়া, অন্তত তাহার চতুর্গুণ, আদায় করিয়া লইতেন। এদিকে নিরীহ প্রজাবৃন্দ কোথায় যাইবে, কাহার নিকট বিচার প্রার্থী হইবে, তাহার কোন ঠিকানাই ছিল না। কোন প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে রাজস্বের নামে প্রজাবর্গের শোণিতের শেষ বিন্দু পর্যন্ত শোষিত হইত।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বাহাদুর বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার (রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখার মধ্যবর্তী স্থানকে উড়িষ্যা বলিত) দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলেন। তজ্জন্য তাহারা বাদশাহকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতেন। এতদিন পর্যন্ত নবাব, দিল্লির বাদশাহের দেওয়ান ও নাজিম উভয়ই ছিলেন। এখন হইতে তিনি কেবলমাত্র নাজিম রহিলেন এবং নিজামতের খরচ ও পদমর্যাদা রক্ষার জন্য কোম্পানির নিকট হইতে বাৎসরিক প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা পাইবেন, অবধারিত হয়। এই সময়ে মীরজাফরের পুত্র নজমদৌলা নবাব ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর সায়েফউদৌলা নবাব-নাজিম হইলে এই মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৪২ লক্ষ হইয়া যায়। অতঃপর মবারকদৌলার নিজামৎকালে ইহাকে ৩২ লক্ষ করা হয়। এবং কাল সহকারে উহা ১৬ লক্ষে পরিণত হয়। দিল্লির সিংহাসন ধ্বংস হইয়া যাইলেও নবাব মহোদয় ঐ টাকা ও নবাব-নাজিম উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ঐ উপাধি ও টাকা রহিত করিয়া তাহাকে 'মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর' ও 'আমীর

উল উমরা' এই উপাধিদ্বয় এবং বাৎসরিক দুই লক্ষ ত্রিশ সহস্র টাকা পেনসন দেওয়া হইয়াছে।

কোম্পানি বাহাদুর চারিবৎসর তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে দেওয়ানির কার্য সম্পাদন করিয়া কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তৎপরে সুশৃঙ্খলে রাজস্ব আদায় ও ভবিষ্যৎ কর নির্ধারণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলায় 'সুপারভাইজার'নাম দিয়া এক-একজন সিভিলিয়ন নিযুক্ত করিলেন। তাহাদিগকে প্রত্যেক ক্ষেত্রের অবস্থা, উৎপাদিত শস্য ও উৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রজাবর্গ কিরূপে মালগুজারী দিয়া থাকে এবং ঠিকাদারেরাই বা প্রজাগণের নিকট হইতে কি পরিমাণ কত প্রকারের আবওয়াব আদায় করিয়া থাকে এবং ঐ আবওয়াব সমুহের পরিমাণ ও প্রকারভেদ বৃদ্ধি হইতেছে কি না, ইত্যাদি বিষয়েরও যথাযথ সংবাদ লইয়া, মন্তব্য প্রদান করিতে হইত।

এই সময়ে ১১৭৬ সালে, দুর্ভিক্ষ হয়; এবং ইহাই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত। নবাব বাহাদুর মুখ তুলিয়া প্রজার দুঃখ দেখিলেন না। কোম্পানির কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ছিল, সুতরাং তাহারাও কিছু করিলেন না। এই দুর্ভিক্ষে বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় দ্বি-তৃতীয়াংশ ও বাংলার প্রায় অর্ধাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই সংবাদ ইংলন্ডে পৌছিলে ডিরেকটরগণ একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন; এবং ভবিষ্যতে এরূপ ভীষণ কাণ্ডের যাহাতে পুনরাবৃত্তি হইতে না পায়, তন্নিমিত্ত ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্নর ও তাহার নিজের বিবেকবুদ্ধির অনুসারে কার্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ ও পাটনা নগরে 'রেভিনিউ কাউন্সিল অব কন্ট্রোল' নামে এক-একটি রাজস্ব সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু কলিকাতার দূরবর্তী বলিয়া অনেক অসুবিধা ও অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় আর একটি রেভিনিউ কাউন্সিল স্থাপিত ও কোষাগার মুর্শিদাবাদ হইতে আনীত হয়, এবং সুপারভাইজারদিগের নাম 'কালেকটর' রাখা হয়। অতঃপর ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তিত করিয়া 'রেবিনিউ বোর্ড' রাখা হয় ও অপর দুইটি কাউন্সিল উঠাইয়া দেওয়া হয়।

দেওয়ানি প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও ২৪ পরগণা এই চারি জেলা কোম্পানির অধিকারে আসিয়াছিল এবং তাহারা স্বয়ং রাজস্ব আদায় করিতেন; অপরাপর স্থানের রাজস্ব পূর্ববৎ ঠিকাদার দ্বারা আদয় হইত। বাংলা ও উড়িষ্যাতে এক বৎসরের জন্য ও বিহারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য ঠিকা বন্দোবস্ত হইত। ইহা সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়াতে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে একেবারে পাঁচ-পাঁচ বৎসরের জন্য বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয়। ইহা দেখিয়া কতকগুলি অপরিণামদর্শী ও অসংযচিত্ত ব্যক্তি, অধিক টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া, ঠিকা গ্রহণ করে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, কোম্পানিও মুসলমানদিগের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন এবং তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা প্রজাগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু কার্যকালে উহার বিপরীত ফল হইল। কারণ ইংরেজরা প্রজার মঙ্গলার্থ সর্বদা উদগ্রীব থাকিতেন; এবং কিছুতেই অসাধুতার প্রশ্রয় দিতেন না। এইজন্য ঐ সমুদয় ঠিকাদারেরা যথাসময়ে স্ব স্ব দেয় প্রদান করিতে পারিল না—কেহ কেহ সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিল; অনেকেই বাসস্থান পরিত্যাগপূর্বক পলাইয়া গেল।

পাঁচসালা বন্দোবস্তের পরিণাম দেখিয়া পুনরায় বাৎসরিক বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয়। কিছুদিন পরে ডাইরেকটরেরা অনুমতি করিলেন যে, দেশের চিরন্তন প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ও পূর্ব কয়েক বৎসরের হিসাব লইয়া, রাজস্ব স্থিরতর (steady) এবং কতকগুলি স্থায়ী নিয়ম প্রবর্তনপূর্বক ঠিকাদারদিগের সহিত একেবারে দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশে আসিয়া সর্বপ্রথম কতকগুলি প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ কর্মচারীদিগকে উত্তর প্রদান করিতে অনুমতি করেন। বলিয়া দেন যে—(১) প্রত্যেক এস্টেটে কি পরিমাণ রাজস্ব ধার্য হইতে পারিবে; (২) কিরূপ ও কোন শ্রেণির ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করা উচিত; (৩) এবং যাহাতে প্রজাবর্গ প্রপীড়িত না হয়, অথচ ঠিকাদারেরা সহজে রাজস্ব আদায় করিতে সক্ষম হইবে—ইহা মনে রাখিয়া প্রশ্ন সমুদয়ের উত্তর দিতে হইবে।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্যর জন শোর নানা স্থানে পরিভ্রমণও অতি সংযত ও সমুচিত যত্ন সহকারে, অনুসন্ধান করিয়া ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে আপন মন্তব্য লিপি প্রদান করেন। ইহাতে শোর মহোদয় আপন বিদ্যা বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার এরূপ পরিচয় দিয়াছেন যে আজ পর্যন্ত উহা আদর্শ মন্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরমালার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে দশ-সালা বন্দোবস্ত হয়; এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ মনে করিয়াছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, জমিদারগণ আপন আপন স্বত্ব ও অধিকার স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া স্ব স্ব জমিদারির উন্নতিকল্পে বদ্ধ পরিকর হইবেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্য দেশের ভূমধ্যকারিগণের অনুরূপ হইয়া উঠিবেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না যে, ভারতবর্ষ ইংলন্ড নহে—ভারতবর্ষ কখনও ইংলন্ড হইয়া যাইবে না। দশসালা বন্দোবস্তের দ্বারা বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব প্রায় তিনি কোটি টাকা অবধারিত হইয়াছিল।

স্যর জন শোর দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। অধিক কি, তিনি উহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন—বলিয়াছিলেন যে, জমিদার ও প্রজাবর্গের সম্বন্ধ তাহাদের আপন আপন স্বত্ব ও অধিকার এবং প্রজাবর্গের নিকট হইতে জমিদারেরা কি পরিমাণে খাজনা পাইতে পারিবেন—এই সমুদয় যত দিন সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে স্থিরীকৃত না হইবে ততদিন জমিদারদিগের দেয় রাজস্বের পরিমাণ অপরিবর্তনীয় করিয়া দেওয়া উচিত হইবে না—করিয়া দিলেই কোম্পানি ও কৃষক সম্প্রদায় উভয়েই বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত হইবেন। পক্ষান্তরে লর্ড কর্নওয়ালিস সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম রেগুলেশনের মর্মানুসারে পাট্টা প্রদত্ত ও কবুলিয়ৎ গৃহীত হইলেই উত্তরকালে আর কোনও গোলযোগ উঠিবার আশঙ্কা থাকিবে না। বলা বাহুল্য যে, অনন্তর সংঘটিত ঘটনা পরম্পরা দ্বারা শোর মহাশয়ের আশঙ্কা অনর্থ হইয়া গিয়াছে এবং কেবলমাত্র প্রজার স্বার্থে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কল্পিত হইয়াছিল, কৃষক সম্প্রদায় তদ্দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হয় নাই। তাহারা জমিদারদিগের অধীনে যে কৃপাপাত্র ছিল, অনেক পরিমাণে সেই কৃপাপাত্র রহিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম রেগুলেশনের মর্মানুসারে কোম্পানি বাহাদুর জমিদারগণের নিকট হইতে যে কবুলিয়ৎ গ্রহণ করেন তাহারও নবম ধারাতে ইহাই রহিয়াছে যে, কোম্পানি প্রজার মঙ্গলার্থ যে সমুদয় আইন প্রচলিত করিয়াছেন, বা ভবিষ্যতে করিবেন, জমিদারদিগকে উহা সম্পূর্ণ মানিয়া চলিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারগণ ভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, সুতরাং ঐরূপ লিখাইয়া না লইলে ভবিষ্যতে তাহারা অন্য কোনও আইনে বাধ্য নাও হইতে পারিতেন। ঐ রেগুলেশন দ্বারা ইহাও অনুজ্ঞাত হয় যে, জমিদারগণ পাটওয়ারী নিযুক্ত করিয়া তহশীলি কাগজ রীতিমত রাখিবেন; তাহারা আর কোন আবওয়াব বসাইতে পারিবেন না; এবং ঐ সময় পর্যন্ত যে সমুদয় আব্ওয়ার প্রচলিত ছিল ঐ সমুদয়কে খাজনার অর্ন্তগত করিয়া, খাজনা ও জমির পরিমাণ, ক্ষেত্রের নিদর্শন ও শ্রেণিবিভাগ প্রভৃতি স্পষ্ট উল্লেখপূর্বক পাট্টা প্রদান ও কবুলিয়ৎ গ্রহণ করিবেন। এরূপ হইলে অনেক অসদাচরণ নিরাকৃত হইতে পারিত; কিন্তু কর্নওয়ালিসের এই সদিচ্ছা আকাশ কুসুমে পরিণত হয়। কারণ জমিদারেরা পাট্টা দিতেন না, কবুলিয়ৎ গ্রহণ করিতেন না; এবং রীতিমত কাগজপত্র রাখিতেন না। রাখিলেও ভবিষ্যৎ ক্ষতির আশঙ্কায় ঐ সমুদয় কাহাকেও দেখাইতেন না।

পূর্বে, কোম্পানি আপন বাকি আদায়ের জন্য, হয় ঠিকাদারদিগের অন্যান্য সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিতেন, না হয়, তাহাদিগকে বেদখল করিতেন, কিংবা কারাগারে নিক্ষেপ করিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ঐ সমুদয় রহিত হইয়া "সন-সেঁটল-ল" বা সূর্যাস্তের আইনজারী হয়। প্রথমাবস্থায় ইহারও ফল অতি শোচনীয় হয়, এবং বিংশতি বৎসরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জমিদার একেবারে পিষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যান। ইহাতে অন্যান্য জমিদারগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া, তাহাদের ব্যবহারের জন্য ঐরূপ কোনও সহজসাধ্য নিয়ম নাই বলিয়া, গোলযোগ উত্থাপিত করেন। ইহারই ফল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সুবিখ্যাত "হপ্তমের আইন" জারী হয়। এতদ্বারা জমিদারগণ স্বেচ্ছানুসারে প্রজাগণের ক্ষেত্রের ফসল, গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ক্রোক বিক্রয় এবং প্রজাগণকে কারাবদ্ধ পর্যন্ত করিতে পারিতেন। এই আইন দ্বাদশ বৎসর প্রচলিত থাকিয়া প্রজাগণকে একেবারে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত করিয়া দেয়। অতঃপর ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে "পঞ্চমের আইন" জারী হয়। এতদ্বারা জমিদারদিগের কারারুদ্ধ করিবার ক্ষমতা রহিত হইয়া যায়।

ইহাতেও আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে দুই আইন দ্বারা অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীতে লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত পাটওয়ারী প্রথা পুনঃপ্রচলিত করা হয়। ইহা দ্বারা প্রত্যেক পরগণায় এক একজন "কাননগো" ও প্রত্যেক গ্রামে এক-একজন পাটওয়ারী নিযুক্ত হয়। পাটওয়ারীরা কোম্পানির চাকর ছিলেন; কিন্তু বেতন দিতেন জমিদারেরা। নিয়ম ছিল যে, তাহারা প্রত্যেক প্রজার জমি ও জমার বিবরণ সুবিস্তৃত ভাবে লিখিয়া জমাবন্দি প্রভৃতি তহশীলের কাগজ রাখিবেন, এবং কাননগোগন ঐ সমুদয় রীতিমত পরীক্ষা করিবেন; পাট্টা কাবুলিয়ৎ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন; এবং ঐ সমুদয় যে যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন এবং স্বয়ং স্বাক্ষর করিবেন। কার্যকালে, পূর্বের ন্যায় ইহাও ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া,

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সমুদয় জমি জরিপ করিয়া প্রত্যেক প্রজার জমির পরিমাণ স্বত্বাধিকার ও খাজনা সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া কাগজ অর্থাৎ রেকর্ড অব রাইটস্ (Record of Rights) প্রস্তুতের অনুমতি হয়। কিন্তু পরবর্তী (৫০) পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহা হয় নাই।

এই সময়েও অনেক মহাল কোম্পানির "খাস" ছিল—অতি জঘন্য বলিয়া কেহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লন নাই। এতভিন্ন অনেক কুনীতিপরায়ণ ও মোৎফন্নি (ফন্দিবাজ) ব্যক্তি স্বত্ব প্রকাশপূর্বক অনেক জমি লাখেরাজ করিয়া লইয়াছিলেন। যাহারা স্ব স্ব স্বত্বের কোনও প্রমাণ দিতে পারিল না তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত হইল। ইহাকে সংক্ষেপতঃ 'জপ্তী' সম্পত্তি বলিত। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে এই সমুদয় "খাস" ও "জপ্তী" সম্পত্তি "রেকর্ড অব রাইটস" প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয় এবং ইহাতে বিংশতি বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়া যায়। এতদ্বারা তত্তৎ স্থানের প্রজাবর্গের প্রভূত উপকার হয়।

জরিপি কাগজে ও রেগুলেশন আইনে প্রজার শ্রেণিবিভাগ রহিয়াছে বটে, কিন্তু কোন প্রজার কিরূপ স্বত্বাধিকার হইবে, তাহার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের দশ আইন দ্বারা সর্বপ্রথম ঐ বিষয় বিশদ করিবার চেষ্টা হয়। ইহাতে প্রজাবর্গের দখলীস্বত্ব ও জমিদারগণের নিরিখ বৃদ্ধির ক্ষমতা স্বীকৃত হইলেও এতদ্বারা আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া, ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বিচারপতি পিকক ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ উহা সংশোধনের প্রস্তাব করেন। তজ্জন্য ১৮৬৯ সালের ৮ আইন কেবলমাত্র বঙ্গদেশে প্রচারিত এবং বাকি খাজনার মকদ্দমার বিচার দেওয়ানি আদালতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ছোটলাট টেম্পেল সাহেবের সময়ে পাবনা জেলার প্রজাগণ, জমিদারেরা কম মাপ দিতেছেন, জোর করিয়া বৃদ্ধি খাজনার চুক্তিপত্র লিখাইয়া লইতেছেন ইত্যাদি বলিয়া মহা গোলযোগ উঠাইল ও সকলে এক জোট বাঁধিয়া গেল। ইহা সপ্রমাণের জন্য ১৮৭৩ সালে এগ্রেরিয়ন ডিসপিউটস অ্যাক্ট অস্থায়ীভাবে পাস হয়। টেম্পেল মহোদয়ের ইচ্ছা ছিল যে, প্রজাগণ যাহাতে ইচ্ছামত স্ব স্ব জোতস্বত্ব বিক্রয় করিতে পারে, এবং বাকি মালগুজারীর জন্য জোতস্বত্ব নিলাম করা যায়, এবং দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা ও মধ্য স্বত্বাধিকারীদিগের স্বত্ব ও অধিকার সহজে নির্ণীত হইয়া যায়, এরূপ কতকগুলি বিধান উহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া, উহাকে স্থায়ীভাবে জারী করিবেন। কিন্তু উহা সম্পন্ন হইবার পূর্বেই ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে, তিনি অবসর গ্রহণ করেন ও এশলী ইডেন ছোটলাট হন। তিনি অভিজ্ঞ রাজস্ব কর্মচারী লইয়া বাংলা ও বিহারে এক-একটি কমিটি বা সভা স্থাপিত করিয়া তাহাদের হস্তে প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে আমূল অনুসন্ধান করিতে অনুমতি দেন। অতঃপর রেন্ট-ল-কমিশন নামে এক সভা স্থাপিত করিয়া তাহাদের হস্তে পূর্বোক্ত দুই কমিটির রিপোর্ট এক মন্তব্যের বিচারভার অর্পিত করেন। রেন্ট-ল-কমিশন আপনাদের মন্তব্য প্রদান করিলে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইলবার্ট সাহেব এক পাণ্ডুলিপি মন্ত্রীসভায় উপস্থিত করেন। উহা ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত হয়, এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আইনে পরিণত হয়, এবং ইহারই নাম "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন।"

প্রবাসী ১৩২৮ অগ্রহায়ণ

PEARY MOHUN MOOKERJEE
1840-1924

ON THE CONDITION OF THE BENGAL RYOT*

THE steady rise in the value of agricultural produce, the diffusion of the ideas of the comforts of civilized life and the solicitude evinced by the legislature for the welfare of the masses, would lead one to suppose that the condition of the Bengal ryots is progressively improving. Nothing could be, howeverm more distant, from the truth. Whether we look to their mode of living, to the means of communication from one place to another which they command, or to the resources on which they could fall back in years of calamity, we are struck at the almost entire absence of progress, while we look in vain for an easy and puntual payment of rent to their landlords, for a desire for agricultural improvements, or for an increasing demand for mental culture. It is true that this lamentable state of things is in several districts partly owing to the two cyclones that have swept over the country within the last few years, and to the revages of the epidemic fever by which the population os some of the most flourishing districts of Lower Bengal is perceptibly wasting away, but the distress to which the ryots have been reduced by these—what we may hope to call—ephemeral causes shows the want of that elasticity of resources which alone is an unerring sign of prosperity.

Those remarkable evidences of progress which are visible in places in the vicinity of Calcutta and in the principal civil stations, are the result of the increase of the wealth of those who, thanks to the spread of education, have been able to secure for themselves lucrative employments and successful careers in independent professions. In those villages brick-built houses have sprung up on every side, new roads have been constructed, tanks have been dug, gardens have been laid out, the clothing of the people has been bettered, and they have become alive to the necessity of those measures of sanitation the want of which has already cost them the lives of thousands of their countrymen. But the case of agricultural villages is quite different. In few of such villages does one meet with any marks of material progress. With the exception of strong-minded and persevering persons who raise themselves above all difficulties, a

Read on the 11th February 1870.

husbandman of the present day is the primitive being he has always been. With a piece of rag round his loins for his clothing, bare feet, a miserable hut to live in, and a daily fare of the coasest description, he lives a life which, however distributed it may be by other causes, is unruffled by ambition. If he gets his two meals and plain clothing, he is content with his lot and if he can spare a few rupees for purchasing jewellery for his wife and children, and a few rupees more for religious ceremonies, he will consider himself as happy as he could wish to be. Like his celestial brother of the east, he is the greatest enemy of social reform, and like him he never dreams of throwing off any of the trammels which time or superstition has spun around him. He will not sent his son to school for fear of being deprived of his manual assistance in the field; he will not drink the water of a good tank because he has been accustomed to use the water of the one nearer his house; he will not sow a crop of potatoes or sugarcane because his foreththers never did it; he will allow himself to be unmercifully fleeced by his hereditary priest to secure the hope of utter annihilation after death, but he will not listen to any proposal which would place within his reach a few of the conveniences or of the comforts of life. There are agricultural villages in which the existence of a school or of a dispensary, and the condition of the house, roads and tanks show a happier state of things, but it will be found that in almost all such cases the improvements have been made not by the ryots but by a rich trader, employer or landholder, who resides in the village or takes an interest in its welfare. The ryots themselves are too poor, too ignorant, too disunited among themselves, to effect any such improvement.

'Among the causes which have kept the ryots in a stationary condition and thrown obstacles in their way to prosperity which is not the least prominent is the infinite division of property which is continually taking place by the operation of the laws of inheritance. A holding consisting of say 20 biggahs, which was in the possession of a single ryot 10 years age, is now held by perhaps four persons, who individually enjoy only a fraction of the profits enjoyed by their ancestor, while from the fact of them having a joint interest in every inch of the land they hold, they are subject to all the inconveniences of a joint holding. It is easy to conceive how the dissent of a single member of the joint family is an effective check to all improvement of the soil, and how differences arising out of the division of labour and the distribution of profits not unfrequently give rise to disputes and litigation which prove ruinous to all. Occasionally the heirs of a deceased ryot make a partition of the paternal holding among themselves, but that does not save them from a division of the profits, or from those inconveniences and disputes which are incidental to a joint liability for rent. A zemindar is not bound to recognise, and does not ordinarily sanction, the division of a holding among the sons of a deceased ryot. It would be suicidal to his own interest if he did so. He used to excercise, however, a healthy influence, in lessening the evil

effects of these minute divisions and sub-divisions of property, by inducing the co-sharers to come to an arrangement to make over the holding in its integrity to one of them for a valuable consideration which enabled the rest of his co-sharers to purchase new holdings or to take to other business. But the rights which have been indiscriminately bestowed upon the ryots by the legislation of 1859, and the relations in which they have been placed with reference to the zemindars, have rendered the latter at present quite powerless to effect any such arrangements.

A second cause to which the ryots owe their present miserable condition is the manner in which the lands held by each ryot are situated. There is a hardly a ryot who has a compact holding of any dimensions. His lands are generally scattered in different places of the same field, and not unfrequently in different fields, and are interspersed with the lands of aymadars, lakhirajdars, and of other ryots. For two biggahs of land that a ryot holds in one corner of a field, he has two or three bigghas at the other extremity, and perhaps a third plot in another field, so that in a field consisting of 100 biggahs there are say 30 bigghas of land in a holding of 8 or 10 ryots with rights of occupancy, 20 bigghas in the possesson of 5 or 6 tenants-at-will, 30 bigghas of rent free lands in different plots, and 20 bigghas of *khamar* lands in the *khas* possession of the Zemindar. As far as we are aware, there are few fileds in Bengal in which this promiscuous intermixture of ryotty, *khamar, ayma,* and lakhiraj lands does not exist. The impediment which such a system places in the way of all agricultural improgements, and the loss of time and labour agricultural improvements, and the loss of time and labour which it entails on the ryots, are obvious. Attempts were made by landholders to bring about as much consolidation of each ryot's holding as could be conveniently done without infrining the rights of others, but the law by which possession for 12 years gives a ryot a right of occupancy has placed an impassable barrier in the way of any such improvement. Any measure which would secure to the ryots compactness of holdings and the consequent economy of time and labour would be a real born to the country, but it would be a hopeless task unless the rights of individuals be unhesitatingly sacrificed for the general good.

Another cause which strikes at the root of all progress is the division of most of the agricultural villages into hostile factions, either with reference to the landholders or with reference to some real or imaginary difference of opinion on questions of any other social institution. This gives rise to that love of litigation which the only too painfully characteristic of the agricultural population of Bengal. However trivial the injury or the provocation, it is sure to be followed by a suit or complaint in Court. Should the bullock of one ryot browse upon a few seedlings on his neighbour's land, the injured party immediately runs to the Magistrate's Cutcherry at distance of 12 or 15 miles, pays the stamp duty and mukhatar's fees, dances attendance in the court for a fortnight or

three weeks, and whether he win or loses, he has usually, on his return home, the mortification to see his crops injured by neglect or damaged by his enemy. To retaliate on the person whom he fancies to be the cause of the loss of his crops, becomes with him an agreeable study. He lodges false complaints in the Criminal Courts, and his feeling is thus created between the parties, who, brooding over real or fancied wrongs, take advantage of every opportunity that presents itself of injuring each other. To any one familiar with the ins and outs of agricultural life, instances of such scenes will recur as events of daily occurrence. All this trouble, expense and loss of time to the ryots were summarily adjudicated by the zemindar's gomastah and mandal of the village. No one will deny that the powers which they exercised were in certain cases abused, but it will be admitted that magistrates with hardly any knowledge of the characters of the disputing parties, and with no criterion to weigh the relative value of conflicting testimony, are more liable to be duped with false stories by the ryots than persons resident in the place could possibly be, and we have no hesitation in saying that on the whole the summary administration of justice by the gomastah and the mandal was a much better arrangement than what obtains at present.

The love of litigation has found a new vent by the working of the laws which at present regulate the relations between the landholder and the ryot. All the multifarious matters which the Zemindar and his ryots adjusted between themselves, must now be done with the intervention of the courts, and the parties interested must undergo all the expenses and trouble which such a procedure entails upon them. It is not therefore surprising that the mutual interest and dependence, which as a general rule formerly bound together the Zemindar and the ryot, have gradually disappeared, and that the antagonistic relations in which they have been placed by law have created a breach between them which is daily widening. If a zemindar wishes to protect his rights from being barred by limitation, he must sue for the enhancement of the rent or perhaps for the ejectment of a ryot. Even should the country be devastated by a wide-spread famine should it suffer from the violence of a destructive gale or from the effects of a dire epidemic, and although for two or three years there be a bad harvest, the zemindar must realise his dues to the last pie, or his claim for arrears will be barred for ever. Such a state of things was unknown before the passing of Act X of 1859. The records of the courts show that the number of enhancement suits that were then instituted in a district within a year bear an infinitesimal ratio to the number that are now instituted, while ejectment suits were rarely heard of. Before Act X of 1859 came into operation, jummabundis or settlements or rent were made with mutual consent and good-will, and after a general enhancement of rent at the *nirk* rate was made, the ryots were let alone for many a year, generally for one or two generations, before a fresh settlement was resorted to or even thought of. The landholders were driven to the present

unnatural and painful line of conduct, when they saw to their utter dismay and astonishment that neglect or forbearance for a few years would create in their tenantry rights which they never possessed, and which would make them co-partners with themselves by the fixity of their scattered and scanty holdings. It is unquestionable that there are villages in which the oppressions of an unscrupulous zemindar or the tyrannical acts of his agents have reduced the ryots to misery and driven them to desperation; but when we recollect that the interests of the zemindar are so intimately connected with the prosperity or adversity of the ryots, we can easily conceive that such cases were exceptions to the general rule. There are not wanting, on the other hand, mischievous ryots who, by persistent opposition in the realization of rents and by false criminal complaints, have exasperated the zemindars and driven them to the commission of illegal acts. In thousands of cases, however, even to the present day, the moderation of the zemindars and good sense of the ryots have avoided that mutual defiance of each other which is the fruit of the well-meaning but unfortunate legislation of 1859. In such villages settlements of rent are made and all petty disputes are disposed of without the intervention of Court, and the zemindar naturally takes an interest in the welfare of his ryots. The aspect of these villages, the cultivation of its waste lands and demand for the purchase of its ryotty lands, attest their growing prosperity.

We have enumerated above some of the principal causes, the operation of which has kept the Bengal peasantry in a stationary condition. Whether the education of the ryots would in the face of these obstacles to progress better their position, is a problem which remains to be solved. When we call to our minds, however, the evil consequences which have resulted to society by the smattering of instruction given to the sons of carpenters, potters and others of the artizan class, and the disinclination which they feel to practise the trades and occupations of their fathers, we have very little reasonable ground to anticipate that the mental training and the increased stock of knowledge imparted by education will be applied to the improvement of their condition as ryots, when the opportunity is open to them of bettering their social position by entering new walks of life, to which they will be entitled by their education. It is at least certain that while a majority of the person of the middle and upper classes remain uneducated, as they are at present, the education of the ryots would have a very limited effect on their condition. The poor ryots with their imperfect education will be ill-fitted to introduce any improvements without the guiding hand of those whom nature and fortune have vouchasafed the influence of example, and we would go even so far as to say that, although the ryots might remain as ignorant as ever, a diminution of the interference of the courts in matters which mutually concern the landholders and the ryots, and the education of the general body of the zemindars and the middleman, would effect a

more beneficial change in the condition of the ryots than could ever result from stringent laws and the sort of education which it is possible to give to the masses. Left to themselves, the ryots will appreciate the moderation and the good-will of those whose interest it is to seek their welfare, and the landholders will gradually learn to aspire to that power which derives its authority from the confidence and the affection of the people.

BABU PEARY CHAND MITTRA regretted he could not agree with the writer in his conclusion that it was not desirable to educate the ryot. It was well known and admitted that the Revenue Laws, the Courts of Justice and the Administration of the Police, were defective and calculated to perpetuate the degraded condition of the ryots. If he were not raised by education, how is his condition to be ameliorated? To assert that education should be confined to the high and middling classes and not be extenced to the mass, was purely selfish, as no class lived for the convenience of another but all lived for the benefit of each other. Babu Peary Chand Mittra alluded to the proposed measure for the education of the masses and observed that it was not for him to discuss at this meeting its being compatible or otherwise with the permanent settlement or the reasibility of the *modus operandi* or the special obligation of the zemindars to be taxed for his purpose—questions which would admit of considerable discussion and which it was not necessary to enter into at present; but he (Babu Peary Chand) felt convinced that the education of the masses could not be ignored—it was duty incumbent on us all, and one from which no one could withhold his support.

Mr. PHEAR thanked the author of the paper for his picture of the ryot's daily life. He (Mr. Phear) had at previous meeting of the Association given his own views of the condition of the cultivator in this part of Bengal, and it was some satisfaction to him now to find the correctness of them established by the high authority of Babu Peary Mohun Mookerjee. He did not, however, agree with the writer on two of the principal points of paper. The first had reference to the interference of the legislature between the so-called landlord and tenant. Whether or not the legislation which had been effected was the best possible, legislation of some sort was inevitable. As soon as the ryot obtained rights in the soil or became aware of possessing them, it was necessary to afford him access to courts of law for the assertion of those rights. No doubt, while he was merely the subject of the zemindar, or his interest in the land was a mere matter of contract with the zemindar, all differences between him and the zemindar might well enough be settled by private arrangements. But when it came about, as it had before 1859, that the ryot had acquired rights before the law, hostile to and in derogation of the landlord's full power of enjoyment, and had learned the value of them, then a Court of Justice was the only place in which the opposing and independent rights could be adjusted. The mistake almost universally made in the discussion of these

topics in this country was the confounding of the terms zemidar in England. The *landlord* (in the English meaning of the word) as between himself and the tenant is absolute owner of the land, and the tenant enjoys no rights of using the soil in any way except such as he derives by a contract with the landlord of more or less limited duration. Under this system there is but one master of the property, and it cannot be doubt that this is eminently conducive to its being well and productively managed. The authors of the permanent settlement appear to have entertained some notion of introducing the advantages of a like state of things here, but they certainly failed to create a basis for it. The zemindars have never taken the place of a true landlord and discharged its duties. It was probably impossible for them to do so. At any rate they cannot now avoid the consequence of their omission, which is that the occupier necessarily gets what they for any cause have so long abandoned. Precisely the same thing has taken place in Ireland. Although there the parties originally started exactly on the footing of the English landlord and tenant, yet in course of time the landowner has allowed the occupier to obtain a status as of right, which the home legislature is at the present moment engaged in defining.

The second point to which he referred was the opposition which the Babu exhibited to the education of the ryot. It was the old cry over again of the masters on all parts of the world and at all times, who dislike the idea of educating the dependent. There lurked a fallacy in the dread that men generally could be educated above their proper work. Of course individuals might be educated in such a way as to render association with their relatives and fellow-workers diatasteful to them. But he thought they might safely assume that there was no risk of educating the great mass of the people, namely, the ryots, into giving up the occupation by which they earned their livelihood, and the sooner they were educated into discontent with their degraded condition, the better would it be both for society and for themselves.

Transactions of the Bengal Social Science Association, Fourth session, 1870.

রমাপ্রসাদ চন্দ

১৮৭৩-১৯৪২

নবাবী আমলে বাঙ্গলার জমিদার

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ গৌড়েশ্বর দায়ুদ খাঁ'র নিধনের পর বাঙ্গলায় মোগল যুগের বা নবাবী আমলের সূত্রপাত, এবং দুই শত বৎসর পরে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে, কোম্পানি যখন সুবে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানের কর্তব্য সম্পাদনে (to start forth as Duan) বদ্ধপরিকর হইয়া ওয়ারেন হেস্টিংসকে গবর্ণর পদে বরণ করিয়া পাঠাইলেন তখন তাহার পরিসমাপ্তি। এই আমলে বাঙ্গলার জমিদার শ্রেণি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। দেশের ভাগ্যচক্র অনেক সময় জমিদারগণের ইঙ্গিতে আবর্তিত হইয়াছে। প্রজাসাধারণের ইহারা শুধু কর-সংগ্রাহক ছিলেন না। ভাগ্যবিধাতাও ছিলেন। নবাবী আমলের বাঙ্গালী সাধারণের ইতিহাস মোঘল বাদশাহগণের এবং সুবাদারগণের ইতিহাস অপেক্ষা জমিদারগণের ইতিহাসের সহিত অধিকতর বিজড়িত।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদের মোঘলদ্রোহী ঈশা খাঁ মসনদ আলি, কেদার রায়, মুকুন্দ রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভুঁইয়াগণের ইতিবৃত্ত বাঙ্গালী পাঠকসমাজে সুপরিচিত। বাদশাহ আকবরের রাজস্বসচিব রাজা তোডরমল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সুবে বাঙ্গলার বিভিন্ন সরকারের ও মহালের যে জমাবন্দি করেন তাহা তখন ভুঁইয়াগণের অধিকৃত ভাঁটি প্রদেশে অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে আসিতে পারে নাই, কাগজে পত্রে লেখামাত্রই ছিল। বাঙ্গলা প্রকৃত প্রস্তাবে বশীভূত হইয়াছিল বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময়ে, এবং বাঙ্গলার সমস্ত মহালের প্রকৃত জমাবন্দি সম্পন্ন হইয়াছিল ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে সাহজাদা সুজার সুবেদারির সময়ে। কিন্তু তাহার পরেও বাঙ্গলার জমিদারগণের যে বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবার অবসর ছিল, চিতুয়া ও বর্দা পরগণার জমিদার শোভা সিংহের ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ তাহার পরিচায়ক। এই বিদ্রোহের কাহিনিও পাঠকসমাজে সুপরিচিত। এই বিদ্রোহ কীরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমসময়ের চিঠিপত্রে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। সুতানুটিতে তখন কোম্পানির প্রধান কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং সুতানটি ও বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের কুঠি মান্দ্রাজের (Fort St. George) অধীন ছিল। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বরের পত্রে মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষ লণ্ডনের কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতেছেন—

"34. In Bengal your Honours affairs went on (notwithstanding the troubles at Surat) without any impediment from the Government. But their last Letter complains of the disturbance occasioned by the rebellion of a Raja..... The advice we have received is in the Letters. No by which it appears that the Rajas forces have taken Possession of Hughly fort and

the Choukeys upon the river to Muxadavad, so that the goods could not pass but by their leave. The Dutch assisted the Moors, and regained Hughly fort. But the master of the Vessell that came from Bengal saies that the Rajas men hath retaken it and there doth not yet appear an Army of the Kings to subdue them. So that how far they will proceed or how long continue masters of what they have is uncertain. That which respects your Honours affairs is the present security the of factory. The carrying on the Investment and fortifying of the Factory. The Agent and Council seem to have taken most prudent method for those purposes in maintaining a friendship with both parties in such a manner as that the Raja doth not suspect them, and yet the Nabob sends them thanks for their assistance." Wilson's *Old Fort William in Bengal (Indian Records Series)*. Vol. I., pp. 19-20)

"সুরাটে গোলমালসত্ত্বেও বাঙ্গলায় আপনাদের কারবার শাসনকর্তৃগণ হইতে কোন বাধা প্রাপ্ত হয় নাই।..... কিন্তু তাঁহাদের (সুতানটি কুঠির কর্তৃপক্ষের) শেষ চিঠিতে একজন রাজার বিদ্রোহজনিত গোলমালের উল্লেখ আছে। আমরা বাঙ্গলা হইতে আগত ... নং চিঠিতে [এই ঘটনার] বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, রাজার সৈন্যগণ হুগলি এবং তথা হইতে মুকসুসাবাদ পর্যন্ত নদীর তীরে যত চৌকি আছে সমস্ত দখল করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের অনুমতি ব্যতীত মাল [জলপথে] আনা নেওয়া যায় না। ডচ্‌গণ মুসলমানদিগকে [নবাবী ফৌজকে] সহায়তা করিয়াছিল এবং হুগলি দুর্গ পুনরাধিকার করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলা হইতে যে জাহাজ আসিয়াছিল তাহার অধ্যক্ষ বলেন, রাজার লোকেরা পুনরায় ঐ দুর্গ অধিকার করিয়াছে এবং উহাদিগকে দমন করিবার জন্য বাদশাহের তরফ হইতে কোন সেনা আসে নাই। অতএব বিদ্রোহীরা কতদূর অগ্রসর হইবে এবং যাহা তাহারা অধিকার করিয়াছে তাহা কতদিন অধিকারে রাখিবে তাহা স্থির করা কঠিন। কুঠির যাহাতে কোন প্রকারে বিপদ না ঘটে সেই দিকেই কেবল আপনাদের কর্মচারিগণের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কারবার চালান এবং কুঠিকে দুর্গে পরিণত করা [কর্তব্য]। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আপনাদের প্রধান কর্মচারী এবং পরামর্শসভা বিবেচনা পূর্বকই কার্য করিয়াছেন—উভয় পক্ষের সহিত এমনভাবে সদ্‌ভাব রাখিয়া চলিয়াছেন যে, রাজা তাহাদিগের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করেন না, পক্ষান্তরের রাজার সহিত বিরোধে সহায়তা করার জন্য নবাব তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"

১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব স্বীয় পৌত্র আজিমুশ্বানকে বাঙ্গলার নবাব নাজিম এবং মির্জা হাদিকে কারতলব খাঁ উপাধি দান করিয়া বাঙ্গালার দেওয়ান বা রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। মির্জা হাদি কারতলব খাঁ বাদশাহের নিকট হইতে পরে যথাক্রমে মুর্শিদকুলি খাঁ এবং জাফর খাঁ খেতাব প্রাপ্ত হয়েন, এবং দেওয়ানির সঙ্গে সঙ্গে সুবে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নবাব নাজিমের পদও লাভ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গলার জমিদারগণের যমস্বরূপ ছিলেন রাজস্ব আদায়ের জন্য। ইনি জমিদারগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন, এবং সুবার প্রত্যেক মহালের নূতন জরিপ জমাবন্দি করেন। তাহার অত্যাচারে অনেক প্রাচীন জমিদারি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চাকলা রাজসাহীর

জমিদার রাজা উদিৎনারায়ণ এবং পরগণা মামুদাবাদের জমিদার সীতারাম বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। নবাব এই সকল পুরাতন জমিদারি নাটোরের রামজীবনের হস্তে প্রদান করিয়া বিশাল রাজসাহী জমিদারির সৃষ্টি করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর অত্যাচার এবং অনাচারের মধ্যে এই অভিনব রাজসাহী জমিদারির সৃষ্টি একটি শুভানুষ্ঠান। প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণী ভবানীর কর্তৃত্বাধীনে এই জমিদারি দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিল।

রাজস্ব আদায় এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে মুর্শিদকুলি খাঁ নিতান্ত নিষ্ঠুর হইলেও সৈন্যসামন্ত পোষণ এবং প্রজাশাসন সম্বন্ধে বাঙ্গালার জমিদারগণের যে সকল অধিকার ছিল, তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনের ফলে জমিদারগণের প্রভাব প্রতিপত্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। 'রিয়াজুস্-সলাতীন' গ্রন্থে দেখা যায়, ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত আলিবর্দি খাঁর গিরিয়া ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজসাহীর জমিদার রামকান্তের লোকেরা আলিবর্দির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। আলিবর্দি খাঁ রাত্রিকালে যাইয়া নবাব সরফরাজ খাঁর শিবির হঠাৎ আক্রমণের প্রস্তাব করিলে রাজসাহীর জমিদারির লোকেরা তাহাকে পথ দেখাইয়া নবাবের শিবিরসন্নিধানে লইয়া যায়, এবং এই সূত্রে আলিবর্দি নবাবকে সহজে পরাজিত এবং নিহত করিতে সমর্থ হইয়া মুর্শিদাবাদের মদ্‌নদে আরোহণ করেন।[১]

বাঙ্গলায় কোম্পানির রাজত্বের ভিত্তিও জমিদারি। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি শাহজাদা আজিমুশ্বানের অনুগ্রহে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের উত্তরাধিকারিগণের নিকট ১৫০০৲ টাকা মূল্যে বায়নামা দ্বারা কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর, এই তিন মৌজা খরিদ করিয়া জমিদারিসূত্রে ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন।[২] পলাশির পুরস্কারস্বরূপ চব্বিশ পরগণার জমিদারি, এবং কাশিম আলি খাঁকে মসনদে বসাইয়া বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের জমিদারি-লাভ। কোম্পানি জমিদারি হইতে দেওয়ানি, এবং দেওয়ানি হইতে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোম্পানির দপ্তরের কাগজপত্রে, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙ্গলার জমিদারেরা কীরূপ প্রতাপশালী ছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের যে সকল কাগজ বা পত্র গভর্মন্টের দপ্তরে আছে, লঙ সাহেব তাহার কিয়দংশমাত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।[৩] এই সকল কাগজপত্রে দেখা যায়, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের এবং বীরভূমের রাজা কোম্পানির এবং নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। জুন মাসে বর্ধমান রাজের এবং কোম্পানির সিপাহিগণের মধ্যে একটি ছোট রকম যুদ্ধ হয়। তাহাতে কোম্পানির তরফের একজন সার্জন (sergeant) এবং ৫০ জন সিপাহি নিহত হয়, এবং লেফ্‌টেনেন্ট ব্রাউন আহত হয়েন। কোম্পানির কার্যবিবরণীতে নিবদ্ধ হিউ ওয়াট্‌স কর্তৃক হলওয়েলের বরাবরে লিখিত পত্রে এই যুদ্ধের এই প্রকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

"The day before yesterday they stopped Gocool Mojundor in his palanquin and threatened to confine him : this day Sook Lall, a jemadar, killed one of my sepoys, who was then unarmed in the town. I sent to enquire the reason, but could get no answer, therefore I sent a subadar with 30 sepoys to bring him to me, but to make no disturbance. Before

they reached his house 7 or 800 forces were gathered who presented their matchlocks as my sepoys were advancing ; at this intelligence I sent orders to the subadar to retire to the Raja's Cutcherry, and I detached Lieutenant Brown with about 200 men to his assistance with orders to avoid engaging if possible, but before Mr. Brown could speak to them they began firing ; this occasioned an action in which I am sorry to say we have been greatly worsted, the serjeant and about 50 sepoys killed upon the spot, Mr. Brown and some others slightly wounded. Since the return of our forces to their quarters, I have intelligence that the enemy were increased to 5,000 strong and premeditated an open rupture by seizing upon the treasure." (Long, 468).

এই গোলমাল আপোসে মিটাইয়া ফেলিবার জন্য কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ সামনার সাহেবকে বর্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। নবেম্বর মাসে নবাব জাফর আলি খাঁ (মীরজাফর) পদচ্যুত এবং তাহার জামাতা কাশিম আলি খাঁ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম, এই তিন জেলা প্রদান করিলেন। এই সময় বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ বীরভূমের রাজার, শাহজাদা সাহ আলমের এবং মারাঠাগণের সহিত মিলিত হইয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই ষড়যন্ত্রসম্পর্কীয় চিঠিপত্র বিশেষ কৌতূহলজনক। নভেম্বর মাসে সুলেমান বেগ লিখিতেছেন, বর্ধমানের রাজা ১৫০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা—

"Now I am informed that the Burdwan Rajah is entering men into his service ; that 15,000 peons, pikes and robbers and others are already in hay and others are daily entering. I am informed of this from people that are continually coming from that side." (504).

নবাব কাশিম আলি খাঁ নবেম্বর মাসে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিতেছেন, বর্ধমানের জমিদার এবং বীরভূমের রাজা একত্র হইয়া বিদ্রোহাচরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন। যথা—

"I am informed that the zemindar, of Burdwan has bad intentions, and has conferences with the Beerboom Rajah, and they have agreed to act in conjunction; I hope that you will send troops to Chckla Burdwan, Midnapur, Islamabad, to take possession of them and nothing can accrue from their bad intentions, and by God's grace I will speedily go myself and chastise the Beerboom Rajah. What more shall I write?" (506)

নবাব কাশিম খাঁ বর্ধমান রাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ডিসেম্বর মাসে লিখিত একখানি পত্রে তাহাকে গালি দিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। যথা—

"Today I am come to the Tewah Baug, and the day after tomorrow shall go to Rommurah, I desire you will not be backward in chastising the Burdwan Rajah, he is of a had caste. I beg you will be expeditious in sending your troops and the affair will soon be settled and the zemindar will be brought to subjection. If Major White goes to Beerboom road he will join Major York and return they act in conjunction and they will chastise Beerboom Rajah." (512).

ডিসেম্বর মাসে নবাব কাশিম আলি খাঁ আবার লিখিতেছেন—

"The Zemindar of Burdwan and others have wrote to the Shah Zeadat that when Hussein Ali Khan proceeds to Patna they will join the Mahrattas and take possession of Muxadabad, to which the Shah Zeadat has consented." (519).

কোম্পানির সেনার ক্ষিপ্রকারিতার গুণে বর্ধমান রাজের এবং তাহার সহযোগিগণের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল। মেজর ইয়র্ক কোম্পানির এবং নবাবের ফৌজ লইয়া বীরভূমের রাজধানী অধিকার করিয়া বীরভূম রাজকে পার্বত্য জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কাপ্তান মার্টিন হোয়াইট ২৯ ডিসেম্বর বর্ধমানের এবং সঙ্গতগেলার মধ্যে নদীর তীরের যুদ্ধে বর্ধমানের ফৌজ পরাজিত করিয়া বিপক্ষদলের মিলনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।[8]

সৈন্যসামন্ত-পোষণের সামর্থ অবশ্য খুব বড় বড় জমিদারগণেরই ছিল, কিন্তু ছোট বড় সকল প্রকার জমিদারই প্রজার একপ্রকার হর্তাকর্তাবিধাতা ছিলেন। প্রজার মধ্যে বিবাদবিসংবাদ উপস্থিত হইলে জমিদার বা তাহার কর্মচারী তাহার বিচার করিতেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বরের কৌন্সিলের কার্য বিবরণে, গভর্ণর ভেরেলস্ট (Vezrelst) সাহেবের এই মন্তব্য প্রদত্ত হইয়াছে—

Mr. Verelst remarks that it never was his intention that ryots from all parts of the province should, on every trivial complaints, apply to the cutcherry of Burdwan ; his orders regarding the pergunnah cutcherry related to such as were established for the collections of the revenues only, not those for the administration of justice. As it is an established custom in all parts of the country for the zemindar or head farmer of the lands to administer justice to their serveral districts in all cases that are not of very great importance. he left the same to them ; how this came to be brought into the cutcherry at Burdwan he knows not, but thinks it is a great grievance to the ryots, which ought to be immediately redressed by orders to the zemindars and farmers to attend to the complaints of their several ryots, or by appointing proper persons to that business as may be found most conducive to the ease, satisfaction and happiness of the ryots (956)."

বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম, এই তিন জেলা কোম্পানির হস্তগত হইলে ভেরেলস্ট এই তিন জেলার রাজস্বের বন্দোবস্তের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইব যখন দ্বিতীয় বার গভর্নর হইয়া আসেন, তখন ভেরেল্স্ট তাহার সহযোগী এবং বিশ্বাসভাজন পরামর্শদাতা ছিলেন, এবং লর্ড ক্লাইব পদত্যাগ করিলে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি ভেরেল্স্ট, তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জমিদার এবং ইজারাদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য ভেরেল্স্ট বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে কাছারি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রজারা সময় সময় জমিদারের কাছারিতে না যাইয়া কোম্পানির কাছারিতে নালিস রুজু করিত। তাই ভেরেল্স্ট এই মন্তব্যে বলিতেছেন, কোম্পানির কাছারি রাজস্ব আদায়ের জন্য স্থাপিত হইয়াছে, প্রজার মামলা মকদ্দমার বিচারের জন্য স্থাপিত হয় নাই। গুরুতর অভিযোগ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের

মীমাংসা এ দেশে বরাবর জমিদারেরাই করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এই চিরন্তন প্রথা রহিত করা কর্তব্য নহে, এবং এই প্রথা প্রচলিত থাকিলেই প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে। ভেরেল্‌স্টের মতে, কোম্পানির কাছারিতে নালিস করিতে আসা একটা খুব কষ্টের বিষয় (great grievance)। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে বা তৎপূর্বে প্রজাসাধারণের মধ্যে কি ভাবে মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত, এবং তাহা কষ্টকর কি সুখকর ছিল, এই বিষয়ের অভিজ্ঞতা-লাভে ভেরেল্‌স্টের যেমন সুযোগ ঘটিয়াছিল, অন্য কোনও কোম্পানির কর্মচারীর তেমন সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনাই ছিল না।

লর্ড ক্লাইব কোম্পানির নামে দেওয়ানি সনন্দ লাভ করিয়া সুবে বাঙ্গলায় সুবাদারের বা নবাবের নামে, অথচ কোম্পানির কর্তৃত্বাধীনে, যে দোতরফা শাসনরীতি (double government) প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দেশময় একটা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় জমিদারি বিচারকার্যেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার কথা। এই দোতরফা শাসনপ্রথার মূলোৎপাটনে আদিষ্ট হইয়া ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের বাঙ্গলার গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস জমিদারগণের রায়তের মামলা মকদ্দমার বিচারের অধিকার রহিত করিয়া মফস্বলের স্থানে স্থানে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্টের পত্রে মফস্বলে বিচার-রীতির এই ঘোর পরিবর্তনের এইরূপ কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"The Zemindars, Farmers, Shiedars, and other officers of the Revenue, assuming that Power for which no Provision is made by the Laws of the Land, but which, in whatever manner it is exercised, is preferable to a total Anarchy ; It will however be obvious, that the judicial Authority, lodged in the Hands of men who gain their livelihood by the Profits, on the collection of the Revenue, must unavoidably be converted to Sources of private Emolument ; and, in effect, the greatest oppressions of the Inhabitants owe their Origin in the necessary Evil." [৫]

এখানে হেস্টিংস ও তাহার সহযোগিগণ বলিতেছেন যে, যাহারা প্রজার খাজনা আদায় করিয়া জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের হাতে বিচারের ভার থাকিলে নিশ্চয়ই তাহারা সেই সূত্রে পয়সা উপার্জন করিতে চেষ্টা করে; এবং কার্যতঃ এই অপরিহার্য কুপ্রথার ফলে দেশের অধিবাসিগণের উপর গুরুতর অত্যাচার হয়। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর তারিখে উপস্থাপিত এক পত্রে[৬] (minute) কৌন্সিলের সদস্য ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস জমিদারগণের এই অধিকার কাড়িয়া লইবার জন্য হেস্টিংসের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন, এবং হেস্টিংসও তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। বাহুল্যভয়ে সেই উক্তি প্রত্যুক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল না। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত বচন-প্রমাণ হইতে দেখা যাইবে যে, নবাবী আমলে জনসাধারণের প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন জমিদারগণ। নবাবী আমলের বাঙ্গালির এবং বাঙ্গলার প্রকৃত ইতিহাস জমিদারগণের এবং জমিদারি-নিচয়ের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধ। নিম্নে নবাবী আমলের প্রধান কয়েকটি জমিদারির তালিকা প্রদত্ত হইল। গ্রান্ট-সঙ্কলিত বাঙ্গলার রাজস্বের বিবরণ হইতে প্রত্যেক জমিদারির আয়তনের পরিমাণ দেওয়া হইল।

	জমিদারির নাম			আয়তন (বর্গমাইল)
১।	রাজসাহী জমিদারি	...	...	১২,৯০৯
২।	বর্ধমান জমিদারি	...	...	৫,১৭৪
৩।	বীরভূম জমিদারি	...	...	৩,৪৫৮
৪।	দিনাজপুর জমিদারি	...	...	৩,৫১৯
৫।	কৃষ্ণনগর (নদীয়া) জমিদারি	...	...	৩,১৫১
৬।	পাচেট জমিদারি (রাজা)	...	...	২,৭৭৯
৭।	বিষ্ণুপুর জমিদারি (রাজা)	...	...	১,২৫৬
৮।	ইউসুফপুর বা যশোহর জমিদারি	...	...	১,৩৬৫[৭]

এই সকল জমিদারির পূর্ব অধিকারিবর্গের বংশধরগণ এখনও বর্তমান আছেন। এই সকল রাজবংশ ও জমিদারি নবাবী আমলের, এবং কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগে—যখন জমিদারিগুলি অটুট ছিল—তখনকার, এবং উহাদের অধঃপতনের ইতিহাসের উৎকৃষ্ট উপাদানেরও অভাব নাই। প্রত্যেক রাজবাড়িতেই বাদশাহী ফর্মান, সনন্দ ও পরোয়ানা আছে, এবং কোম্পানির বিভিন্ন কুঠির কাগজপত্রে, কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের ও বিভিন্ন জেলার কালেকটরির মহাফেজখানায় রক্ষিত পুরাতন কাগজপত্রে এই সকল জমিদারির ইতিহাসের প্রচুর উপাদান আছে। এই সকল মূল দলিল দস্তাবেজ যথাসম্ভব সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। বাঙ্গলার প্রাচীন রাজবংশনিচয়ের বংশধরগণ একত্র মিলিত হইয়া যদি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, তবে ইহা সহজে সুসিদ্ধ হইতে পারে।

সাহিত্য ২৬ বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ ১৩২৩

তথ্যসূত্র

১. Abdul Salam's translation of *Riyazu S-Salatin*, p. 315.

২. Wilson's *Old Fort William in Bengal* Vol. I., pp. 38-40.

৩. Long's *Selection form Unpublished Records of Government*, Vol I Calcutta, 1869.

৪. Long's *Selections*, p 558.

৫. Forrest's *Selections from the State Papers of the Governors-General of India. Warren Hastings*, Vol. II. p. 285.

৬. Forrest's *Selections from the Letters, Despatches, and other State Papers Preserved in the Foreign Department of the Government of India*, 1772-1785 (Calcutta, 1890) Vol. II, pp. 432-433, 454-456.

৭. Mr. J. Grant's *Analysis of the Finances of Bengal Appendix*, No. 4. *The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India, Company*, (Madras, 1883), Vol. I. pp. 318-321.

GRISH CHUNDER GHOSE

1829-1869

THE PERMANENT SETTLEMENT

PEOPLE are horrified at last at the way the permanent settlement of Bengal was concluded. The *Times of India* with that fierceness which characterises its lucubrations on settlement questions, had endeavoured to prove that Bombay pays more than three times the land revenue which is derived from Bengal. And yet Bombay is richer and happier and more prosperous than Bengal. Statistics is a dangerous weapon in the hands of a party disputant. Inheriting all Carlyle's dread and suspicion of that form of party warfare in which the principal arrangement consists of figure, we put in the impracticablility of bringing our selves to believe all the the *Times of India* so glibly says. There must be a loose stone somewhere in the arch which our Western contemporary has so sedulously and skilfully built up if it is the fact that the ryot in Bombay after paying a revenue or Rs. 440 the square mile—we have fractions and therefore omit them–is happier and more solvent than the Indian ryot whose zemindar pays to Government a revenue of Rs. 142 the square mile, and who probably pays as much more to the zemindar, or say 300 rupees. But the question which the *Times of India* has so opportunely raised deserves to be closely examined. We do not wish to examine it with a view to the subversion of the permanent settlement. But it would be interesting to enquire what is the proportion between the revenue which the zemindar brings into the Collector's treasury and the revenue which the ryot deposits in the zemindar's cutchery. We are sadly deficient in statistics to grapple with this important question. From the great price which zemindaries notoriously now command in the market we can safely infer, howerver, that the proportion must be extravagant one. This is a source of danger and not the permanent settlement. In India, fixity of tenure in land is the first step towards national and individual prosperity. The ligigation arising from an uncertain tenure is a more fruitful source of poverty and ruin than the payment of high rents. England's ways and means do not include a land revenue, yet what other country under the sun enjoys a more overflowing revenue? The Government must not cast longing eyes upon a source of income which belongs exclusively to the subject, which is the main support of his life, his dignity, his power as a member of society—from which the means of his benefactions is derived, without which he

would be a nomad toiling from day to day for a precarious living. But the mistake of Lord Cornwallis was to leave the ryot without a permanent settlement. The zemindar's permanent and inalienable right to the land could not have been satisfactorily proved to that nobleman when, as is well known, and the fact is frequently brought forward by the zemindar and his organs in the Press, the primary and immediate result of the permanent settlement was the dispersion of the old landed proprietors and their supersession by a class which had made money by service or commercial enterprise. The history of the Mogul rule is not barren of examples of one farmer of the Government revenue making way for another in such rapid succession as to leave little doubt upon the mind that the zemindar's vested right of the smallest possible value, whilst the partion of the ryot was firm and unassailable. The provisions indeed of the sale law by which the permanent settlement was accompained, in themselves contained evidence of the small consideration which the Government of Lord Cornwallis was disposed to extend to the theory that the land absolutely belonged to the zemindar. The settlement was the pure result of an emergency. The revenue was greatly in arrears. The Marhatta war was in vigorous progress. The State wanted money that should be regularly forthcoming without trouble of collection or uncertainty of realisation. A bargain was struck, hastily there can be no doubt—otherwise loopholes would not have been preserved in it for the benefit or the ryot in the time to come. The Government limited its demand and the zemindar who was industrious and enterprising was permitted to enrich himself by the reclamation of marshes and jungles. As the zemindars with whom his bargain was originally struck were merelly farmers of the Government revenue and not absolute proprietors of the soil, as is now ignorantly and inconsistently maintained, they of course failed to prosper by the liberal provisions of the settlement. They possessed no hoarded wealth, they did not possess even that influence and social position which would have enabled them to make use for a beneficent consideration of the hoarded wealth of others. Wanting therefore capital, they were thrown upon their former resources for the realisation of the Government revenue—and these failed them as before in promptly realising it. The result, as we have already said was, that the class was altogether swept away and superseded by another which possessed capital but did not think it beneficial to hold land as mere farmers of rent. The new proprietors went briskly to work as soon as they obtained a pure title; but many of them failed from want of experience and other causes. Others took up their places. so that three-fourths of a century completely altered the face of the realm The ryot is only little better than a serf now. The zemindar had become inordinately rich at the expense of the ryot. That fixity of tenure which a majority of ryots possessed when the permanent settlement was made and which had been secured to them by that settlement, has melted away through the action of

time as much as the force and fraued of the zemindar. A reign of terror was allowed to spread over the country in order that the Government revenue may be promptly recovered. The zemindar permitted to riot in powers and privileges made the ryots his bought slaves. Personal liberty, that most inestimable of boons under a civilised Government, was denied to the latter at the will of the former. The *huftum* and *punjam* laws left the ryot without the strength or the will to resist arbitrary demenads and when he presumed to resist, his hime was burnt down and his wife and daughters were dishonoured. It took sixty-six years exactly to remedy this dreadful state of things. Still the ryot is a helot. This long interval of oppression and rapine has deprived him of the credentials of his liberty. Every one is now an occupancy ryot, i.e. a being entitled only to his kennel and his bone. It certainly could not have been intended at the time of the permanent settlement that the zemindar should live upon the fat of the land and drive his ryots like plough oxen. The zemindar's means of wealth were pointed out to him; he had the jungle and the marshes which were excluded from assessment and which if he could bring into cultivation would have yielded him mines of wealth. The zemindar has brought these into cultivation and inherited the mines. The class that has done this does not oppress the ryot—it virtually has given a permanent settlement to the ryot. But there are zemindars who have not reclaimed jungle and marsh, but purchased their estates at extravagant prices which do not admit of capital being laid out in reclamation of jungle and marsh. The only resource of these last is rack-renting—and how terribly it is in the grain to develop this resource! We have no doubt if Government propose a permanent settlement in favour of the cooupancy ryot, the real aristrocracy of zemindars, those whose forefathers were zemindars, would offer no objection; for they in effect have established already a permanent settlement within their estates. The class of land jobbers and speculators only will raise a desperate contention, which the Government can perhaps afford to treat with contempt having and object before it so fundamental as the happiness and contentment of the people. And the rescued ryot saved from the billows of enhancement will gladly submit then to any taxes which the state may impose for the benefit and amelioration of the tax-payers.

The Bengalee, 1866 July 25.

যতীন্দ্রমোহন রায়

১৮৭৬—১৯৪৫

বাংলার স্বাধীন জমিদারদের পতন

১. বাংলার বিশেষত্ব

মুসলমান যুগে বঙ্গদেশে কয়েকটি কারণে নিজের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহার মধ্যে ভাষা ধর্ম ও জমিদার এই তিনটি প্রধান। বাংলার বাতাস ভেজা ও গরম, জমি অসংখ্য নদী খাল নালায় কাটা, গম ও বুট জন্মে না, লোকে উর্দু, এমনকি হিন্দি পর্যন্ত বলে না। সুতরাং উত্তর ভারতের ভদ্রশ্রেণির হিন্দু মুসলমান সকলেই বাঙ্গলায় কাজ করিতে নারাজ ছিলেন। তাহারা এই প্রদেশকে "রুটিপূর্ণ নরক" বলিতেন, রাজ কর্মচারীদের অনেক সময় শাস্তির জন্য এখানে পাঠান হইত এবং তাহারাও শীঘ্র বদলি হইবার জন্য বাদশাহের দরবারে সুপারিশ খুঁজিতেন। ভারত-বাহিরের ভদ্র মুসলমান এখানে পুরুষানুক্রমে বসতি করিতে চাহিতেন না। কয়েকজন মাত্র জমিদারি পাইয়া এখানে আবদ্ধ হইয়া যান।

সুতরাং উর্দুভাষী উত্তর ভারতীয় মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র বাংলায় স্থাপিত হইতে পারে নাই। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিতেন, তাহাই ভাবের আদান-প্রদানের, মানসিক আমোদ ও শিক্ষার, সামাজিক মিলনের, উপাদান ছিল। তাহার গানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উর্দু সাহিত্য, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যেও গড়িয়া উঠে নাই।

আর, বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের পর চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম অতি দ্রুত সমস্ত প্রদেশকে, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে এক করিল। শাক্তও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই দুই ধর্ম পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিত, ইচ্ছামত এক ভাই শাক্ত আর এক ভাই বৈষ্ণব হইতেন। কোটি কোটি বাঙালির হিন্দু, বৌদ্ধ তিন শতাব্দীতে (১২০০-১৫০০) মুসলমান হইয়াছিল; কিন্তু উপযুক্ত পুরোহিতের অভাবে এবং বাহিরের মুসলমান জগতের সহিত কম সংস্রব থাকায় তাহারা ইসলামের প্রাথমিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই। প্রথমত ঃ তাহারা আরবী ও ফারসী জানিত না বলিলেই হয়; তাহাদের পুরোহিতগণের দশাও প্রায় সেইমত কুরান ও হদিস্ পড়িবার ও ব্যাখ্যা করিবার মত জ্ঞান ছিল মাত্র। সুতরাং ঐ দুই গ্রন্থ ভিন্ন পশ্চিম ভারতের ও আরব পারস্যের বিরাট মুসলমান ধর্ম-সাহিত্য তাহাদের অপঠিত অজ্ঞাত ছিল। দ্বিতীয়ত ঃ নানা কারণে ইংরেজ যুগের পূর্বে বাংলা হইতে অতি কম যাত্রী মক্কায় যাইত এবং মক্কা হইতে কম শিক্ষক ও সাধু বঙ্গদেশে আসিতেন। পশ্চিম ভারত হইতে আরবে ইহার অনেক বেশি যাতায়াত ছিল। সুতরাং বাহিরের বৃহৎ মুসলমান জগত হইতে নূতন ভাবের স্রোত আসিয়া বঙ্গের মুসলমান সমাজের পুরাতন আবদ্ধ জলকে বিশুদ্ধ সতেজ করিতে পারিত না। যুগে যুগে ইসলামের অনেক সংস্কারক উঠিয়াছেন;

কালক্রমে যে-সব কুসংস্কার পাপ কদাচার, প্রেরিত পুরুষের ধর্মকে পরিবর্তিত ব্যধিগ্রস্ত করে, তাহারা তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া সেই প্রাথমিক যুগের পবিত্রতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য যুদ্ধ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে ওয়াহাবী ও ফরাজী সম্প্রদায় ভিন্ন, মুসলমান যুগে বঙ্গের ইসলামে যে কোন সংস্কার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে পাই না। সুতরাং বঙ্গীয় গ্রামবাসী ও সাধারণ মুসলমানগণ হিন্দুদের আমোদ আহ্লাদ গান কথকতা ব্রত প্রভৃতিতে যোগ দিত, পূজাপর্ব দেখিত; গ্রাম্য দেবী, ব্যাধি দেবীকে মানত করিত, মেলায়, প্রতিমা ভাসানে যাইত। এসব কাজ যে ইসলামের কঠোর পবিত্রতার বিরোধী একথা তাহারা জানিত না কখন কখন একজন তেজীয়ান মুল্লা বা গোঁড়া নবাব তাহাদিগকে ধর্ম ভ্রষ্ট বলিয়া ধমকাইতেন, কিন্তু তাহাদের উপদেশ কোটি কোটি লোকের জীবন পরিবর্তন করিতে পারিত না, তাহারা তাহা দুদিনে ভুলিয়া যাইত। [অবস্থাপন্ন বাঙালি মুসলমানগণ, এবং শহরবাসী কর্মচারীদের দোভাষী হইতে হইত তাহারা অন্তপুরে হাট-বাজারে বাংলা বলিতেন, আর কাছারিতে বৈঠকখানায় এবং সরকারি চিঠিতে ফারসী (বা উর্দু) ব্যবহার করিতেন—যেমন, উড়িষ্যায় দীর্ঘকালবাসী মুসলমানেরা ঘরে ওড়িয়া বলে।] এইরূপে বাংলাদেশে সামাজিক জীবন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রায় একমত ছিল, এবং ইহা পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিভিন্ন। সেই যুগে বাংলায় ধর্ম হিন্দু হইতে মুসলমানকে পৃথক করিতে পারে নাই, কিন্তু ভাষা ও সামাজিক রীতি বাঙালি হিন্দু-মুসলমানকে পশ্চিম-ভারতীয় হিন্দু—হিন্দু মুসলমান হইতে পৃথক রাখে। (আমি এখানে আমলাবর্গের কথা বলিতেছি না; মুঘলযুগে আমলারা প্রায় সব প্রদেশেই 'জাত ভাই' ছিল।)

২. বাংলার জমিদারদের গৌরব

তাহার পর, বাংলার জমিদারগণ অন্য প্রদেশের জমিদার হইতে অনেক অধিক ধন জন-ক্ষমতাশালী, প্রায় সামন্তরাজাদের মত স্বাধীন ছিলেন! পাঠান যুগে সুলতানদের এবং মুঘল যুগে বাদশাহী সুবাদারদের এত লোক বল ছিল না যে জমিদারদের সম্পূর্ণ বশ ও শক্তিহীন করেন। এই অসংখ্য নদীর ভাঙ্গন গড়নের দেশে জমির জরিপ ও সীমাচিহ্ন রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। উত্তর-ভারতীয় মুসলমান বিজেতাদের প্রধান বল ছিল শিক্ষিত সবল অশ্বারোহী; তাহা এই বন্যা বিল খালের দেশে কাজ করিতে পারিত না, ঘোড়া শীঘ্র মরিয়া যাইত। এইজন্য বাংলার পদাতিকগণের (পাইক) যুদ্ধে এত মূল্য ছিল। এই উর্বর দেশে ভূস্বামীর টাকার অভাব হয় না; জমিদারগণ সহজেই পাইক সংগ্রহ করিয়া নৌকা লইয়া, স্থলগামী মুঘল অশ্বারোহীকে বাধা দিতে পারিতেন। আর, পশ্চিম ভারতে যেমন সম্রাটের বন্ধু ও স্বজাতী মুসলমান জমিদার অনেক ছিলেন, স্থানীয় বিদ্রোহী জমিদারের দমনে সাহায্য করিতেন, বঙ্গদেশে সেরূপ লোক অত্যন্ত কম। দিল্লিশ্বরের পূর্বেকার বঙ্গীয় মুসলমান শাসকগণ অন্যদেশ হইতে বলিষ্ঠ সৈন্য খুব কম আনিতে পারিতেন, বাঙালির বা বাঙালিত্বপ্রাপ্ত আফগানের সাহায্যে লড়িতে হইত। সুতরাং বিদ্রোহী জমিদারের সৈন্য অপেক্ষা সুলতানের সৈন্যগণ জাতি বল ও শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছিল না, বঙ্গবিদ্রোহ দমন কঠিন সমস্যা ছিল। আর, বাঙ্গলাদেশ দিল্লি সাম্রাজ্যের অধীন হইবার পরেও যখনই কোন বাদশাহ মরিতেন এবং তাহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিত, অমনি বাংলার জমিদারগণ খাজনা বন্ধ করিতেন ও আশেপাশে লুঠ আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা

করিতেন; কারণ বঙ্গদেশ দিল্লি সাম্রাজ্যের এক সুদুর কোণে। এরূপ দূরবর্তী সীমান্ত প্রদেশে কেন্দ্রস্থ রাজশক্তির প্রভাব স্বভাবতই ক্ষীণ থাকে।

বাংলার জমিদারগণের প্রতিপত্তি ও স্বাধীনতার ইহাই স্থায়ী কারণ তাহার উপর, খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীব্যাপী পাঠান রাজশক্তির অবনতি ও পতন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের নানা বাধা-বিদ্রোহ ঠেলিয়া প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে বঙ্গে জমিদারগণ একেবারে প্রভুহীন স্ব স্ব কর্তা হইয়া উঠিয়া যথাসাধ্য রাজ্যবিস্তার করিবার মহা সুযোগ পান। এই সুযোগে প্রতাপাদিত্য ও বার ভুঁইয়াদের উত্থান।

আকবর বাংলা জয় করিলেন বটে, কিন্তু ইহা বশ করিতে তাহাকে বিশ বৎসর ধরিয়া শ্রম করিতে হয়। তাহার বঙ্গীয় সুবাদার ও সেনাপতি রাজা মানসিংহ বাংলার জলবায়ুকে ভয় করিতেন, রাজমহলে বাস করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বাংলায় প্রথম বিদ্রোহ দমন করিয়া জমিদারের নিকট হইতে নামেমাত্র বশ্যতা স্বীকার ও খাজনা লইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিলেন, একেবারে নষ্ট করিলেন না। তাহাদের শক্তিহীন দাসের মত করিতে হইলে অনেক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করা আবশ্যক হইত। সুতরাং বাংলার জমিদারগণ বাদশাহের বিপদের কারণ থাকিয়া গেল। তাহাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত পদানত ও ধোড়া সাপের মত নিস্তেজ করেন পরবর্তী সুবাদার ইসলাম খাঁ (১৬০৮-১৬১৩ খ্রিঃ)। ইহার বয়স অল্প, কিন্তু একদিকে যেমন অহঙ্কার অপরদিকে তেমনি তেজ, সাহস, দূরদর্শিতা এবং কর্মে আগ্রহ ও শ্রমশীলতা। তাহার বঙ্গশাসন এবং জমিদার ধ্বংসের সুদীর্ঘ ও সমসাময়িক বিবরণ তদীয় কর্মচারী সিতাব খাঁর (মির্জা সহন) রচিত ফারসী হস্তলিপি বহারিস্তানে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে প্রতাপাদিত্য ও উসমানের পতনের কাহিনি অগ্রে "প্রবাসী"তে প্রকাশ করিয়াছি। আজ পাবনার জমিদারগণ ও বিক্রমপুরের মুসা খাঁর যুদ্ধ ও পরাভব বর্ণনা করিব।

৩. প্রতাপাদিত্য

প্রথমে একটি কথা বলিয়া শেষ করি। ইতিহাস পড়িয়া আমার মনে হয় যে প্রতাপাদিত্যের বীর কীর্তিগুলি আকবরের রাজত্বে মানসিংহের সময়ে ঘটে। তখন তাহার যৌবনকাল শরীর ও মনের শক্তি অটুট, নৌবল অদম্য। কিন্তু প্রায় ২০ বৎসর পরে যখন ইসলাম খাঁ তাহাকে আক্রমণ করিলেন তখন প্রতাপ বৃদ্ধ, জীর্ণদেহ, হয়ত পারিবারিক শোকে ম্রিয়মান। তাহার আর পূর্বতেজ নাই, পুত্রগণের দ্বারা যুদ্ধ চালাইলেন, আর যখন তাহারা পরাজিত হইল, তখন প্রতাপ নিজে হতাশায় অবসন্ন মনে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। (১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত) রামরাম বসুর রচিত 'প্রতাপাদিত্য চরিতে' লেখা আছে যে এই আত্মসমর্পণের সময় ইসলাম খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি তোমার কর্তব্য, লড়াই কি কয়েদ?" রাজা কহিলেন, "না, আমরা আর লড়াই করিব না। আমার আসন্নকাল এই। অতএব আমি কয়েদ হইব।"

আমার বিশ্বাস যে এই নিরাশ উক্তি ও অবসাদ ঐতিহাসিক সত্য।

৪. ইসলাম খাঁর বঙ্গশাসন

২৬ এপ্রিল ১৬০৮ জাহাঙ্গীর ইসলাম খাঁকে বিহার হইতে বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

৫ জুন বঙ্গের নতুন দেওয়ান আবুল হসন্ আগ্রা হইতে রাজমহল পৌঁছিলেন। এখানে ইসলাম খাঁ অগ্রেই আসিয়াছিলেন।

১৩ জুন ইহতমাম্ খাঁ তোপ ও নওয়ারা লইয়া আগ্রা হইতে বঙ্গের দিকে রওনা হইলেন।

৭ ডিসেম্বর ইসলাম খাঁ সসৈন্যে নৌকাযোগে গঙ্গা বহিয়া রাজমহল হইতে নিম্নবঙ্গের দিকে রওনা হইলেন।

২ জানুয়ারী ১৬০৯, ইসলাম খাঁ মুর্শিদাবাদের গোয়াশ পরগণার ধারে গঙ্গা পার হইলেন, এবং নৌরঙ্গাবাদ সরকারে আলুইপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া প্রায় দুই মাস বাস করিলেন।

২ মার্চ, ইসলাম খাঁ আলাইপুর হইতে নাজিরপুরের দিকে [উত্তরে] কুচ আরম্ভ করিলেন।

৫ বা ৬ মার্চ, ইসলাম খাঁ ফতেপুর থামিলেন।

৩০ মার্চ, ইসলাম খাঁ ফতেপুর হইতে কুচ করিয়া রাণা টান্ডাপুরে পৌঁছিলেন।

২৬ এপ্রিল, বজ্রপুরে প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁর সহিত দেখা করিলেন।

৩০ এপ্রিল, ইসলাম খাঁ আত্রেয়ী নদীর ধারে শাহপুরে পৌঁছিলেন, এবং এখানে শিবির রাখিয়া নাজিরপুরে নয় দিনের জন্য গিয়া খেদা করিয়া ৩২টি হাতি ধরিলেন।

২ জুন, ইসলাম খাঁ শাহপুর হইতে নদীতে পুল বাঁধিয়া ঘোড়াঘাট পৌঁছিলেন।

১৫ অক্টোবর, ইসলাম খাঁ ঘোড়া ঘাট হইতে করতোয়া বহিয়া পূর্ববঙ্গের দিকে রওনা হইলেন। জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধ।

১৮ ডিসেম্বর, ইসলাম খাঁ পাবনা জেলার শাহজাদপুরে। পরে মুসা খাঁর সহিত যুদ্ধ।

জুন ১৬১০, ইসলাম খাঁ বার ভুঁইয়াকে পরাজয় করিয়া ঢাকায় প্রবেশ করিলেন।

মার্চ ১৬১১ মুসা খাঁর সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ। নভেম্বর, উস্‌মান বোকাইনগর হইতে শ্রীহট্টে তাড়িত হইলেন।

জানুয়ারি ১৬১২ প্রতাপাদিত্যের পতন।

২ মার্চ ১৬১২, উসমানের যুদ্ধে মৃত্যু।

১১ আগস্ট ১৬১৩ ভাওয়ালের জঙ্গলে ইসলাম খাঁর মৃত্যু।

৫. পাবনা জেলার জমিদারদের দমন

ইসলাম খাঁ রাজমহল পৌঁছিবার পূর্বে উস্‌মান ময়মনসিংহ হইতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পশ্চিম দিকে আসিয়া মুঘলদের আলপসিংহ থানা দখল করিয়া, থানাদার সুজাওল খাঁ নিয়াজাইকে হত্যা করেন। ইসলাম খাঁ তৎক্ষণাৎ অনেক সৈন্য ইনাত্রৎ খাঁকে ঐ থানা উদ্ধার করিতে পাঠাইলেন।

মুঘল তোপ ও নৌবিভাগের সেনাপতি ইহতমাম্ খাঁকে সোনাবাজু ভাটুরিয়া-বাজু কেলাবাড়ি প্রভৃতি পরগণা জায়গির দেওয়া হইল। ভাটুরিয়া-বাজুর অন্তর্গত চিলা জোয়ার নামক পরগণা হইতে তাহার শিকদার (অর্থাৎ তহসিলদার ও শাসনকর্তা) সৈয়দ হাবিব তাহাকে তেঁতুলিয়াতে লিখিয়া জানাইল যে তাহার সঙ্গী দিল্লির বাহাদুর ও লুৎফ আলিবেগ সোনাবাজুতে গিয়া চাটমহরে বাস করিয়া পরগণা শাসন করিতে লাগিয়াছিল এমন সময় মাসুম খাঁর পুত্র মির্জা মুমীন খাঁ, আলমের পুত্র দরিয়া খাঁ, ও খলশীর জমিদার মধু রায়

যাহারা এতদিন সোনাবাজু পরগণা ভোগ করিতেছিল একত্র হইয়া, ৪ হাজার অশ্বারোহী ৪ হাজার পদাতিক ও ২০০ কোসা নৌকো লইয়া আসিয়া ঐ দুইজনকে এক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া সব সৈন্য সহ হত্যা করিল। শুধু দুজন অনুচর আহত হইয়া চিলাজোয়ারে পালাইয়া আসিল। এইরূপে সোনাবাজু শত্রুর হস্তে পড়িল।

সুবাদারের অনুমতি লইয়া ইহতমাম খাঁ নিজ পুত্র মির্জা সহনকে এই যুদ্ধের নেতা করিয়া পাঠাইলেন। সহজ আলাইপুর হইতে দুই দিনের কুটে চিলা এবং তথা হইতে দুই দিনে চাটমহর পৌঁছিলেন। তাহার আগমন সংবাদে শত্রুরা আগেই চাটমহর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সহন তথায় থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া দুই দিনের কুচে আত্রেয়ী নদীর তীরে শাহপুর গ্রামে গেলেন, এবং সেখানে মাটির তিনটি দুর্গ গড়াইয়া তোপ দিয়া রক্ষা করিলেন। কিছু পরে ইসলাম খাঁর আজ্ঞায় তাহার নিকট হইতে একদল সৈন্য নাজিরপুর হইয়া একদন্তে পৌঁছিল, এবং সহনও শাহপুর হইতে তথায় আসিয়া যোগ দিলেন। কিন্তু সুবাদার তাহাদের যুদ্ধযাত্রা নিষেধ করিয়া নাজিরপুর গিয়া খেদা করিয়া হাতী ধরিতে বলিলেন। ৩২টি হাতি ধরা হইল।

তাহার পর সুবাদার ঘোড়াঘাটে গিয়া সৈন্যসহ খড়ের ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু করতোয়ার জল কম বলিয়া ইহতমাম খাঁ নৌকা লইয়া তথায় যাইতে পারিলেন না, তাহাকে নিজ জাগির কেলাবাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি আমরুল পরগণা অতিক্রম করিয়া ইব্রাহিমপুর এবং তথা হইতে উদিবুঢ়ায় (?) পৌঁছিলেন, সঙ্গে তিন শত বাদশাহী নৌকা। তাহার পর কেলাবাড়ি পরগণা দিয়া ঘোড়াঘাট আসিলেন।

এদিকে বর্ষার আগমনে ইসলাম খাঁর আজ্ঞায় তুকমাক খাঁ আলপসিংহ হইতে উঠিয়া নিজ জায়গির শাহজাদপুরে আসিলেন। এই শাহজাদপুরের জমিদার রাজা রায় তুকমাকের সঙ্গে দেখা করিযা নিজ পুত্র রাঘু (রঘু বা রাঘব) রায়কে খাঁর দরবারে রাখিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু বর্ষার মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া অনেক নৌকা লইয়া আসিয়া শাহজাদপুরের দুর্গ তিন দিনরাত্রি অবরোধ করিলেন, অবশেষে কিছু করিতে না পারিয়া রণভঙ্গ দিলেন। তখন তুকমাক খাঁ রাগিয়া রঘুরায়কে জোর করিয়া মুসলমান করিলেন, এবং নিজ খিদমৎগারের (ভৃত্যের) কাজ করিতে বাধ্য করিলেন। এ সংবাদে ইসলাম খাঁ অসন্তুষ্ট হইলেন।

চাঁদ প্রতাপ থানায় মুঘলপক্ষে মিরক বাহাদুর ছিলেন। কিন্তু ঐ চাঁদ প্রতাপের জমিদার নবুদ (? বিনোদ) রায়, সঙ্গে মির্জা মুমীন, দরিয়া খাঁ ও মধু রায়কে লইয়া, ঐ থানা ঘেরাও করিলেন এবং তাহা ব্যতিবস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তুকমাক খাঁ শাহজাদপুর হইতে সাহায্যে আসায় শত্রুরা পলাইয়া গেল।

এইরূপে ১৬০৯ সালের বর্ষাকাল নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। বর্ষার শেষে ১৫ অক্টোবর সুবাদার ও সৈন্যগণ ঘোড়াঘাট হইতে "ভাটী" অর্থাৎ ঢাকার দিকে করতোয়া বহিয়া রওনা হইলেন। তিন দিনের কুচে তিনি শিয়ালগড় পৌঁছিলেন এবং ইহতমাম খাঁ আত্রেয়ী নদী হইতে নৌকা লইয়া যোগ দিবেন এই আশায় এক সপ্তাহ এখানে রহিলেন। কুদিয়া খালের জল কম বলিয়া নৌকা আসিল না, তখন তিনি শাহজাদপুরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে মির্জা সহন অসীম পরিশ্রমে নৌকাগুলি ঠেলিয়া শিয়ালগড়ে

আসিলেন, এবং তথা হইতে ইহতমাম খাঁ সাতকুচে (নৌকায়) শাহজাদপুরে পৌঁছিলেন। এখানে সকলে ঈদ পর্ব যাপন করিলেন (১৮ ডিসেম্বর ১৬০৯) এখানে বাদশাহী নওয়ারার মহলা (review) হইল।

৬. কাটাসগড়ার মোহনায় যুদ্ধ

এখান হইতে ইসলাম খাঁ স্থলপথে 'বলিয়া'য় রওনা হইলেন, এবং তিন দিনে তথায় পৌঁছিয়া বেপারীদের নৌকায় পুল বাঁধিয়া নদী পার হইলেন। নদীর পেঁচের জন্য নওয়ারা আসিতে অনেক দিন লাগিল। সুবাদারের আজ্ঞাক্রমে ইহতমাম ও সহল খাল যোগিনীর ত্রি মোহানীতে গিয়া তিনটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া রহিলেন। ইসলাম খাঁ দুই কুচ কাটাসগড়ার মুখে পৌঁছিলেন, এবং তথায় ইহতমাম নৌকা সহ আসিয়া যোগ দিলেন। 'বলিয়া' হইতে একদল অগ্রগামী সৈন্য শেখ কমাল, তুকমাক্ খাঁ ও মিরক্ বাহাদুরের অধীনে ছয়দিনে ঢাকা পৌঁছিল, ইহাতে মুসা খাঁ ও অন্যান্য জমিদারগণ দুই দিকে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

কাটাসগড়ার মুখে ইহতমাম খাঁর নিকট পীর মুহম্মদ লোদী আফগান এবং তাহার ভ্রাতাগণ শত্রুপক্ষের এই সংবাদ আনিল : মুসা খাঁর আদেশমত তাহার তিন জন সহযোগী, মির্জা মুমীন, দরিয়া খাঁ এবং মধু রায়, যাত্রাপুরে ইচ্ছামতীর মোহনায় গড় করিয়া পাহারা দিতেছিল, এমন সময় দরিয়া খাঁর কোন পাপের জন্য মির্জা মুমীন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খুন করিল। ইহার ফলে মধু রায় সন্দেহ করিল যে মুমীন গোপনে মুঘলদের সঙ্গে যোগ দিযাছে, সুতরাং যাত্রাপুরের জমিদারদের নওয়ারায় একতা ও সাহস রহিল না। ইহতমাম এই সুযোগে নৌকাসহ যাত্রাপুর আক্রমণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু ইসলাম খাঁ তাহাতে সম্মত না হইয়া সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথের পরামর্শে এই রণনীতি অবলম্বন করিলেন—

মুঘলেরা প্রথমে কাটাসগড়া হইতে যাত্রাপুর পর্যন্ত সমস্ত নদীর তীর দেওয়াল ও তোপে সুরক্ষিত করিবে;-পরে তাহার আড়ালে আড়ালে বাদশাহী নওয়ারা নদী ভাটাইয়া গিয়া যাত্রাপুরের মোহনা দখল করিবার চেষ্টা করিবে।

এদিকে দরিয়া খাঁর হত্যা সংবাদ পাইয়া মুসা খাঁ শশব্যস্তে অনেক জমিদার এবং সাত শত নৌকা সহিত যাত্রাপুরে গেলেন এবং মুমীন ও মধু রায়কে সঙ্গে লইয়া ইচ্ছামতী হইতে বাহির হইয়া বাদশাহী শিবিরে তোপ চালাইতে লাগিলেন। নৌকাগুলি এই কয় শ্রেণির—কোসা, জলবা, ধুরা, সুন্দরা, বজরা এবং খেলনা।

রাত্রি হইলে মুসা খাঁর দলবল সরিয়া গিয়া পদ্মার বামতীরে অর্থাৎ যেদিকে বাদশাহী সৈন্যরা ছিল ডাকছাড়া নামক গ্রামে মাল্লাদের দ্বারা অতিদ্রুত একটি মাটির দুর্গ প্রস্তুত করাইল, তাহার দেওয়াল উঁচু, পরিখা গভীর, এবং মধ্যে অনেক তোপ।

পরদিন প্রাতে বাদশাহী সৈন্য নিজ নিজ স্থানে মাটি কাটিয়া গড়খাই ও দেওয়াল গড়িতে লাগিল। ইসলাম খাঁ খানায় বসিয়াছেন এমন সময়ে মুসা খাঁর তোপের গোলা আসিয়া সেখানে পড়িতে লাগিল; প্রথম গোলায় তাহার সমস্ত ভোজন পাত্রগুলি পড়িয়া গেল এবং বিশ ত্রিশজন চাকর মরিল, দ্বিতীয় গোলায় তাহার হাতির উপরের পতাকার বাহক হত হইল। মহা গোলমাল উঠিল, কিন্তু দুপুর পর্যন্ত এইরূপ তোপের যুদ্ধ চলিল। উঁচু পাড় হইতে দাগা বাদশাহী গোলায় শত্রু নওয়ারায় অনেক লোক (মধু রায়ের পুত্র

এবং বিনোদ রায়ের ভ্রাতা) মারা গেল এবং কয়েকখানি কোসা ডুবিয়া গেল। তখন জমিদারগণ অপর পারে ফিরিয়া গেল। ইসলাম খাঁ মাটির দুর্গ হইতে তাম্বুতে আসিলেন।

পরদিন প্রাতেও সেইমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুত্র ও ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য মধু রায় ও বিনোদ রায় নৌকায় এ পারে আসিয়া মাটিতে নামিয়া বাদশাহী সৈন্যদের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিলেন। একবার এ-পক্ষ অগ্রসর হয়, আবার ও পক্ষ। অবশেষে জমিদারদের সৈন্য পরাস্ত হইয়া পলাইল, অনেকে নৌকায় পৌছিবার আগে জলে ডুবিল, হাতিগুলি অনেক সৈন্য ও নৌকা পিষিয়া ধ্বংস করিল। বাদশাহী সৈন্য জয় ডঙ্কা বাজাইল।

ইতিমধ্যে ইসলাম খাঁ শেখ হবিবুল্লার অধীনে অপর একদল সৈন্য মজলিশ কুতবের জমিদারি ফতেহাবাদ (অর্থাৎ ফরিদপুর) আক্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা মাটিভাঙার মোহন দখল করিয়া ঐ জেলা লুটপাট করিয়া মজলিস কুতবকে ফতেহাবাদ দুর্গে ঘেরাও করিল। মুসা খাঁ ২০০ নৌকা পূর্ণ সৈন্য পাঠাইয়া কুতবকে সাহায্য করিলেন, কিন্তু এই সাহায্যকারী সৈন্যদল পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

৭. যাত্রাপুর ও ডাকছাড়া অধিকার

এখন প্রশ্ন হইল মুসা খাঁর দুর্গ কিরূপে আক্রমণ করা যায়। স্থলপথে সেখানে পৌছান অসম্ভব। সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ পরামর্শ দিলেন যে নদীর পাড়ে মুঘলদের সুদীর্ঘ গড়খাই এর (trench) মধ্যে একটি পুরান শুষ্ক নালা আছে, তাহার মোহনা উঁচু বালিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এই নালা কাটিলে বাদশাহী নৌকা ইহার ভিতরে গিয়া অতি সহজে ইচ্ছামতীতে ঢুকিতে পারে, তখন বিনা যুদ্ধে মুসা খাঁর দুর্গ ও যাত্রাপুর দখল হইবে।

বাদশাহী নওয়ারায় বার হাজার মাল্লা ছিল। সহন তাহাদের দশ হাজারকে লইয়া, স্বয়ং চার প্রহর দাঁড়াইয়া থাকিয়া ছয় প্রহরে নালার মুখের পর্বতপ্রমাণ চর কাটিয়া ফেলিলেন। মাল্লাদের উৎসাহ দিবার জন্য অনবরত পয়সা চাউল ভাঙ ও আফিম বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মুসা খাঁ ভয়ে আসিয়া ইসলাম খাঁর সাহিত সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন। কিন্তু তৃতীয় দিনে একটা ঝগড়া বাধিয়া গেল। ইসলাম খাঁর এক নর্তকীর স্বামী মুসা খাঁর চাকরি করিত, এবং তাহার কাছে মার খায়। নর্তকীর নালিশে ইসলাম খাঁ মুসা খাঁকে ধমকাইলেন, এবং তিনি অপমানে চলিয়া গিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ কারিলেন।

মুসা খাঁর দুর্গ আক্রমণের উপায় স্থির হইল। সুবাদারের আজ্ঞায় ঢাকা হইতে তুকমাক খাঁ কোদালিয়ার মোহনায় আসিয়া বসিল এবং মিরক বাহাদুর বিশখানা নৌকা লইয়া কুঠারুইয়ার মোহনায় পৌছিল। এদিকে ইসলাম খাঁ নিজে কাটাসগড়ার মোহনায় অপর পার হইতে আবদুল ওয়াহিদকে সঙ্গে লইয়া কুচ করিয়া একপ্রহর রাত্রি থাকিতে কুঠারুইয়ার মোহনায় পৌছিলেন, এবং মিরক বাহাদুরের নৌকা লইয়া সৈন্যদের ইচ্ছামতী নদী পার করাইতে লাগিলেন। অনেকে হাতির পিঠে নদী পার হইল। তাহার পর যাত্রাপুরের দুর্গের দিকে কুচ হইল। শত্রুরা নৌকাযোগে পদ্মার অপর তীরে পলাইয়া গেল।

তাহার পর সুবাদারের আজ্ঞায় আবদুল ওয়াহিদ ইচ্ছামতী পার হইয়া ডাকছাড়ার মোহনায় মুসা খাঁর দুর্গ একদিক হইতে অবরোধ করিল।

সাত দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া মির্জা সহন সেই শুষ্ক নালা কাটিয়া তাহাতে ইচ্ছামতীর জল আনিলেন। জ্যোতিষীরা বলিল যে ৯ জুন ১৬১০ রাত্রি দুই ঘড়ির সময় নৌকা লইয়া নালায় প্রবেশ করিবার শুভ মুহূর্ত। তাহাই করা হইল। শত্রুগণ নদীর মধ্যের নৌকা হইতে গোলা চালাইয়া বাধা দিতে চেষ্টা করিল; বাদশাহী নৌকা ঠেলিতে মল্লাদের খুব ভিড় হইয়াছিল, কাছেই তাহাদের অনেকে মারা পড়িল। কিন্তু রাত্রে সব নওয়ারা মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন মির্জা সহন শত্রুদুর্গ আক্রমণ করিবার ভার চাহিয়া লইলেন। পরদিন প্রাতে দুর্গের কাছে ছুটিয়া গেলেন। শত্রুগণ দুর্গ প্রাচীর এবং পদ্মার বক্ষ হইতে গোলাগুলি চালাইতে লাগিল। অনেক বাদশাহী সৈন্য মরিল; কিন্তু মির্জা সহন মাটির উপর তিন হাজার টাকার স্তূপ করিয়া তাহা হইতে মুঠো মুঠো টাকা নিজের আহত সৈন্য ও মৃত সৈন্যের আত্মীয়দের দিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহার সৈন্যগণ "আল্লাহু আকবর" এবং "ইয়া মুইন" ধ্বনি করিয়া মুখের সামনে ঢাল ও তরবাল ধরিয়া ছুটিল। তাহার পর আত্মরক্ষার জন্য দুর্গের বাহিরে অধিকৃত জমিতে গড়খাই (trench) খুঁড়িতে লাগিল। এখান হইতে আবার ছুটিয়া গিয়া বাকি জমির অর্ধেক অধিকার করিয়া দম লইবার জন্য ঢালের আড়ালে বসিয়া পড়িল। দুর্গ ও নদীবক্ষ হইতে তীর, বল্লম, গোলাগুলি বর্ষণ হইতে লাগিল।

তখন সহন হুকুম দিলেন যে রণনৌকার সামনে পুলের মত যে সব গাড়ি [গর্দুন = চাকা, রথ] রাখা ছিল তাহা আনিয়া নিজ সৈন্যদের পাশে খাড়া করা হউক এবং মাল্লারা ঘাসের আঁটি ও মাটির ঝুড়ি মাথায় করিয়া আনিয়া ঐ কাঠের গাড়ির পশ্চাতে দ্রুত দেওয়াল গড়িয়া তুলুক। তাহাই করা হইল। সৈন্যগণ পরে এই আশ্রয় হইতে ছুটিয়া বাহির হইল, কিন্তু অশেষ পরিশ্রমেও দুর্গ নিতে পারিল না, কারণ আর কোন সেনাপতিই সহনের সাহায্য করিলেন না, শত্রুর সমস্ত বল তাহার উপর পড়িল।

এদিকে পাঁচ হাজার মাল্লা প্রত্যেকর মাথায় ঘাসের আঁটি এবং আর পাঁচ হাজার মাটি ঝুড়ি লইয়া প্রস্তুত রাখা হইল। মুসা খাঁ নিজ দুর্গের চারিদিকে পরিখা খুঁড়িয়া তাহাতে চোখালো বাঁশ পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র সহনের মাল্লাগণ ছুটিয়া গিয়া ঘাস ও মাটি ফেলিয়া পরিখা পুরাইতে লাগিল। তৃতীয় ঘড়িতে এ কাজ শেষ হইল। তখন হাতি পাঠাইয়া দুর্গ আক্রমণ করা হইল। দুই ঘড়ি ধরিয়া মহাযুদ্ধ হইল, অনেক হাতি ও মাহুত তোপে আহত হইল; কিন্তু অবশেষে পঞ্চম ঘড়ির শেষে মির্জা সহন দুর্গে প্রবেশ করিলেন। "আল্লাহ আকবর" ও 'ইয়া মুইন' ধ্বনি উঠিল, ভেরী হু হু শব্দ করিল, ডঙ্কা গুড়ুম গুড়ুম করিয়া বাজিয়া উঠিল। শত্রুগণ অনেকে মরিল, বাকিরা পদ্মাপারে আশ্রয় হইল। তখন আর সব বাদশাহী সেনাপতি দুর্গে ঢুকিলেন। এই জয়লাভের পর ইসলাম খাঁ ঢাকার দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমে কুঠারুইয়াব মোহনায় থামিলেন; এখানে মুসা খাঁর ভ্রাতা ইলিয়াস খাঁ আসিয়া মুঘল পক্ষে যোগ দিলেন। পরদিন 'বলরা'য় কুচ হইল। ইসলাম খাঁ সৈন্য পাঠাইয়া

কেলাকুপাতে [নবাবগঞ্জের এক মাইল উত্তরে] শত্রু দুর্গ দখল করিলেন এবং নিজে তথায় পৌঁছিলেন। নওয়ারার এক অংশ শ্রীপুরে পাঠান হইল। এদিকে ময়মনসিংহ হইতে উসমান আসিয়া ঘোড়াঘাট অঞ্চল আক্রমণ করিতে না পারেন এজন্য ইফাতিখার খাঁ শেরপুর মুর্চায় নিযুক্ত রহিলেন।

কেলাকুপ হইতে ইসলাম খাঁ ঢাকায় পৌঁছিলেন। নওয়ারা পাথরঘাটার মোহনায় পৌঁছিয়া থামিল; পরে গোয়াধরী নালা দিয়া ঢাকা পৌঁছিল। সৈন্যগণ স্থলপথে আসিল।

ঢাকার কাছে দোলাই নদী দুই শাখাতে বিভক্ত হইয়াছিল, একটি খিজরপুরে যায়, অপরটি দুমরা খালে পড়ে। দুমরা খালের মোহনায় দুধারে বেগ মুরাদ খাঁর দুটি দুর্গ ছিল। তাহা ইহতমাম ও সহনের হাতে রাখা হইল।

৮. মুসা খাঁর সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ

পরাজিত মুসা খাঁ কাত্রাবু পৌঁছিয়া, আবার যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবার লখিয়া নদী তাহার আশ্রয়স্থান হইল। শ্রীপুর ও বিক্রমপুরে সামান্য দুটি চৌকি (ছোট থানা) রাখিয়া তিনি পদ্মার নালার এই দিকে রহিলেন, তাহার পশ্চাতে মির্জা মুমীন্, নালার অপর পারে আলাওল্ খাঁ; কদম রসুলে [নবাবগঞ্জের সামনে লখিয়ার অপর পারে] আবদুল্লা খাঁ, কাত্রাবুতে দায়ুদ খাঁ, দুমরা খালে মহমুদ খাঁ, এবং চূড়াতে বাহাদুর খাজী মোতায়েন হইল।

ইহাদের বিরুদ্ধে ইসলাম খাঁ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সহন ও শেখ কামাল খিজরপুর ও কুমারসর দখল করিবার আজ্ঞা পাইলেন। রওনা হইয়া প্রথম দিন সহন ও শেখ কমাল কুপার [ধাপার?] মোহনায় থামিলেন। রাত্রি চারি ঘড়ি থাকিতে সৈন্যগণ লখিয়ার পাড় দিয়া ছুটিয়া চলিল। প্রভাত হইলে সহন খিজিরপুরে এবং শেখ কমাল কুমারসরে পৌঁছিয়া গড় বানাইতে লাগিলেন। শত্রুরা নৌকায় আসিয়া তোপ চালাইয়া বাধা দিতে লাগিল। অনেক লোক মরিল, নৌকা ডুবিল, কিন্তু দিন শেষে সহনের দুর্গ সম্পূর্ণ হইল। একদিন পরে ইহতমাম খাঁকে খিজিরপুরে এবং সহনকে কত্রাবুর সম্মুখে (অর্থাৎ দায়ুদ খাঁর বিরুদ্ধে) পাঠান হইল। এইরূপে ১২ মার্চ ১৬১১, নওরোজ উপস্থিত হইল।

মির্জা সহন স্থির করিলেন যে হাতির পিঠে লখিয়া পার হইয়া কাত্রাবু দুর্গ আক্রমণ করিবেন। সেই রাত্রে দুই ঘড়ির সময় একজন বেপারির খেলনা নৌকা (= আধ কোসা) ধরা পড়িল। সে বলিল যে শত্রুপক্ষে জনরব উঠিয়াছে যে চূড়ায় বাহাদুর খাজী মুঘল সেনাপতি আব্দুল ওয়াহিদের সহিত সন্ধি করিয়াছে, এবং সে যেন বাদশাহী সৈন্যকে নদী (দোলাই) পার করিয়া না দিতে পারে এজন্য মুসা খাঁ সেই দিকটা সাবধানে পাহারা দিতেছেন। সহনের মহা সুবিধা হইল; তাহাকে বাধা দিবার শত্রু নাই।

সেই রাত্রেই এক প্রহর থাকিতে তিনি কয়েকখানি ছোট ডিঙিতে ১৪০ অশ্বারোহী ও ৩০০ বর্কান্দাজ পার করিয়া দিলেন, তাহাদের নেতা শাহবাজ খাঁ। তখনও দুই ঘড়ি রাত্রি ছিল। সহন, ঢালী পাইকদের (তরবালধারী পদাতিক) ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা দাঁড়াইয়া আমার মুখ দেখিতেছ। তোমাদের হাজার জনকে পার করিবার জন্য কোথায় নৌকা পাইব? যাও প্রত্যেকে একটি কলাগাছ লইয়া ভাসিয়া পার হও!" তাহাই করা

হইল। ইতিপূর্বে তিনি শাহবাজ খাঁকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে যখন তিনি হাতি লইয়া নদীতে সাঁতার দিবেন, খাঁ যেন তুরী বাজাইয়া দায়ুদ খাঁর দুর্গের দিকে ধাইয়া যায়, তাহা হইলে শত্রুগণ নদীবক্ষে সহনকে আক্রমণ করিতে অবসর পাইবে না। এখন এ পারে নিজ গড়খাইয়ে সেনাদের বলিলেন যে, শত্রু নৌকা নদীতে দেখা দিলে তাহারা যেন তোপ দাগিয়া তাড়াইয়া দেয়।

তাহার পর "বিসমিল্লা" বলিয়া নিজ বাছা বাছা বীর সৈন্য সহ কয়েকটি হাতিতে চড়িয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সাঁতরাইয়া পরপারের দিকে গেলেন। তখন শাহবাজ খাঁর দল দায়ুদ খাঁ দুর্গ আক্রমণ করিল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিবার পর মধ্যে প্রবেশ করিল। শত্রু পালাইল।

ইতিমধ্যে ইহতমাম খাঁ সমস্ত নওয়ারা লইয়া দোলাই নদী হইতে বাহির হইয়া লখিয়া ছাড়িয়া কদমরসুলের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদে রণশ্রান্ত সহন পুনর্বার নদী পার হইয়া দু-তিন শত অশ্বরোহী এবং অনেক পদাতিক বর্কন্দাজ ও তীরন্দাজ লইয়া শীঘ্র কদমরসুলে পিতার সঙ্গে যোগ দিলেন।

এখানে নদীতে ভীষণ জলযুদ্ধ বাধিল, কারণ বাদশাহী নওয়ারা বিনা আজ্ঞায় এবং সেনাপতিকে না লইয়া শত্রু নৌকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, এবং এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় শত্রু নওয়ারা দ্বারা খুব আক্রান্ত হইল। শত্রুদের দৃষ্টি অন্যদিকে লইয়া গিয়া বাদশাহী নৌকাকে বিশ্রাম দিবার জন্য মির্জা সহন হাতির পিঠে ছুটিয়া মুসা খাঁর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মুসা ও মুমীন নৌকাযোগে পলাইয়া গেল। তখন সহন কয়েকজন সৈন্য লইয়া পদব্রজে পন্দরের (বন্দর) নালা পার হইয়া অপর পাড়ের শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। আলাওল খাঁও নিজ দুর্গ খালি করিয়া পলাইল। পরে জোয়ার আসায় এই নালা জলে পূর্ণ হইল, সহনের ফিরিয়া আসায় বাধা পড়িল, তাহাকে শত্রু নওয়ারার সহিত কঠিন যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইল। অবশেষে শত্রু পরাজিত এবং শত্রু নওয়ারা ধৃত হইল।

মুসা খাঁ নিজ ভ্রাতৃগণ ও জমিদারগণ সহিত বকুলীয়াচর হইয়া নিজ রাজধানী সাজকামে আশ্রয় লইলেন।

৯. মুসা খাঁর শেষ চেষ্টা

মুসা খাঁ ইব্রাহিমপুরের চরে পলাইয়া গিয়া মির্জা মুমীনকে সাজকাম হইতে তাহার ধন দৌলত লইয়া এখানে আসিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। মুসা খাঁর প্রধান কর্মচারী হাজী শমসুদ্দীন বোঘদাদী ইসলাম খাঁর সহিত দেখা করিয়া পরিত্যক্ত সাজকাম নগর মুঘলদের হাতে সমর্পণ করিলেন।

কিন্তু মুসা খাঁর ভ্রাতা দায়ুদ খাঁ তখনও ফিরিঙ্গিদের পথ বন্ধ করিয়া বেশ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ফিরিঙ্গি জলদস্যুগণ রাত্রে দায়ুদ খাঁর বাড়ি আক্রমণ করিল এবং যেই দায়ুদ খাঁ বীরের মত মাচারে উপর হইতে নামিলেন, তাহারা তাহাকে না চিনিতে পারিয়া এবং গুলিতে মারিয়া ফেলিল, এবং মুসা খাঁর লোকজন আসিবার আগেই পলাইয়া গেল।

তখন মুসা খাঁ ভাবিলেন যে নদীতীরে দুর্গের পর দুর্গ গড়িয়া সহনের গড়ে পৌঁছিয়া তাহা আক্রমণ করিবেন। মানসিংহের শাসনকালে মগ-রাজা বঙ্গ আক্রমণ করিয়া নদীতীরে যে গড় করিয়াছিলেন তাহা পুরাতন ভগ্নদশায় ছিল। মুসা খাঁ নৌকাযোগে সেখানে

পৌঁছিয়া দেওয়াল তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু সহনের আক্রমণে পরাস্ত হইয়া ইব্রাহিমপুরে পালাইয়া আসিলেন।

কোদালিয়া মোহনার দুর্গে তুকমাক খাঁর স্থলে শেখ রুকন নিযুক্ত হইল। সে সর্বদা মদ খাইয়া বিভোর থাকিত। এক সপ্তাহ পরে এই সংবাদ পাইয়া মুসা খাঁ ঐ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সহন বন্দরের (পন্দর) নালা হইতে তাহার উপর তোপ চালাইলেন; বাদশাহী নওয়ারাও নদীবক্ষে আসিয়া মুসা খাঁর নৌকা আক্রমণ করিল। অনেকক্ষণ এবং বারবার যুদ্ধ করিয়া শত্রুরা অবশেষে পরাস্ত হইয়া পালাইল, অনেকে হত হইল, অনেকে জলে ডুবিয়া মরিল।

এইসব সংবাদে বাহাদুর ঘাজী আসিয়া ইসলাম খাঁর বশ্যতা স্বীকার করিল। মজলিস কুতবও অধীন হইল। বর্ষা আগমনে ইসলাম খাঁ বন্দরের নালা হইতে থানা তুলিয়া কুমারসরে আনিলেন। ...অবশেষে মুসা খাঁ নিজ জাত ভাই লইয়া ইসলাম খাঁর নিকট আসিয়া ধরা দিলেন, এবং ঢাকায় নজরবন্দি হইয়া রহিলেন, কারণ সুবাদার শীঘ্রই উসমানকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এমন সময় অপর শত্রুকে ছাড়িয়া দিলে বিপদ বাড়িবে।*

*প্রবাসীর পাঠকেরা যদি এই প্রবন্ধে উল্লিখিত নদী খাল ও গ্রামের স্থান নির্দেশ ও বর্ণনা করিয়া পাঠান তাহা সাদরে বিচার করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে আত্রেয়ী, ইচ্ছামতী, করতোয়া ও তিস্তা নদীর গতি ও তেজ এখন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। রেনেলের ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত বেঙ্গল এট্‌লাসেও ভিন্ন।

আলাইপুর—পদ্মার পূর্বতীরে, রামপুর বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত।

ফতেপুর—পদ্মার পূর্বতীরে রামপুর বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।

ঘোড়াঘাট—রংপুর জেলায় চাকলে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত, করতোয়ার তীরবর্তী। নিলফামারি হইতে প্রায় ১৬ মাইল পূর্বে।

শাহজাদপুর—পাবনা হইতে প্রায় ২৫ মাইল উত্তর পূর্বে।

বোকাইনগর—ময়মনসিংহ জেলায়। কিশোরগঞ্জের প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত।

আলাপসিংহ—ময়মনসিংহ জেলার একটি পরগণা, ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

সোনাবাজু—সরকার বাজুহার অন্তর্গত একটি পরগণা। ঢাকা হইতে প্রায় ২৫ মাইল পশ্চিমে সোনাবাজু নামে একটি স্থান আছে।

ভাতুরিয়াবাজু—তাহেরপুর সহ সমুদয় উত্তর রাজসাহী ভাতুরিয়া বাজুর অন্তর্গত ছিল। ভাতুরিয়া পরগণার উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদীদ্বয়, পূর্বে করতোয়া নদী, দক্ষিণে রাজসাহীর কিয়দংশ। আত্রেয়ী নদী ভাতুরিয়া পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

কেলাবাড়ি—করইবাড়ি? করইবাড়ি ময়মনসিংহ জেলার একটি পরগণা।

চিলাজোয়ার—ভাতুরিয়াবাজুর অন্তর্গত একটি পরগণা।

আমরুল—রাজসাহী জেলার একটি পরগণা। সরকার বরকাবাদের অন্তর্গত।

চন্দ্রপ্রতাপ—ঢাকা জেলার একটি পরগণা।

ভাটি—মেঘনাদ ও হুগলী নদী এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ পূর্বকালে ভাটি নামে পরিচিত ছিল। সাধারণত এই ভূভাগের দক্ষিণ এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানই ভাটি নামে প্রসিদ্ধ। মোসলমান ঐতিহাসিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মপুত্রের সহিত পদ্মার এবং লক্ষ্যার সহিত ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম পর্যন্ত স্থানকে ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহা ১৮ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এক্ষণে বাখরগঞ্জ ও খুলনার অন্তর্গত দক্ষিণবর্তী স্থানগুলিই ভাটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শিয়ালগড়—রেনেলের ম্যাপে জাফরগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে শিয়ালো নামক একটি স্থান দেখা যায়। নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুরের অনতিদূরে শিয়ালজলা নামক একটি গ্রাম আছে।

কুদিয়াখাল—শাহজাদপুরের প্রায় ৫ মাইল পূর্বে হুরা সাগরে মিলিত হইয়াছে। রেনেলের ম্যাপে কদি নামক স্থানের নিকটে একটি শাম্বা নদী অঙ্কিত আছে, উহা করতোয়া হইতে বাহির হইয়া ইচ্ছামতীতে পতিত হইয়াছে।

কাটাসগড়—কাত্রাসিন? ইচ্ছামতী নদীর তীরে, সাভার হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

যাত্রাপুর—ইচ্ছামতী নদীর তীরে, সাভার হইতে প্রায় ১৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস ১ম ৪৯৭ পৃঃ)।

ইচ্ছামতী নদী—সাহেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মদনগঞ্জের পূর্বদিকে পুনরায় ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। পূর্বে এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে হুরাসাগরের মোহনার বিপরীত দিকে নাথপুরের ফ্যাক্টরীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী যোগিনীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (ঢাকার ইতিহাসে ১ম ৪৮ পৃঃ)

ডাকছাড়া—যাত্রাপুর হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে ঢাকজেরা নামক একটি স্থান আছে।

ফতেহাবাদ—ফরিদপুর।

মাটিভাঙা—মাথাভাঙা? পদ্মার যে স্থান হইতে জলঙ্গী বাহির হইয়াছে, তাহার প্রায় ৫ ক্রোশ নিম্নদিয়া মাথাভাঙা নদী বর্হিগত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ পূর্ব মুখে পরে কিয়দ্দুর আসিয়া দক্ষিণ পশ্চিমবাহিনী হইয়া কৃষ্ণগঞ্জের তলদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। এই দুই স্রোতের একের নাম চূর্ণী, অপরের নাম ইচ্ছামতী।

বল্‌রা—ইচ্ছামতীর তীরে ঢাকা হইতে প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

কেলাকুপা—কলাকোপা? ইচ্ছামতীর তীরে, ঢাকা হইতে প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

দোলাইনদী—বালুনদী হইতে বর্হিগত হইয়া ঢাকা ফরিদাবাদের নিকট বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। (ঢাকার ইতিহাসে ১ম ৭৬ পৃঃ)।

শ্রীপুর—সোনারগাঁ হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্তী স্থান কালীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অধুনা পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

খিজিরপুর—নারায়ণগঞ্জের ১ মাইল উত্তর পূর্বদিকে, ঢাকা হইতে প্রায় ৯ মাইল অন্তরে, লক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস ১ম ৪৫৩ পৃঃ)

দুমরা—ডোমরা? ঢাকার উত্তর-পূর্বে বালু ও লক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলের প্রায় ৬ মাইল অন্তরে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস ১ম ৪৬৯)।

লক্ষ্যা নদী—এই নদীর উত্তরাংশ বানার বলিয়া পরিচিত। ইহা এগার সিন্ধু নামক স্থানের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে উৎপন্ন হইয়া নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। (ঢাকার ইতিহাসে ১ম ৪৪ পৃঃ)।

কদমরসুল—নারায়ণগঞ্জের অপর তীরে লক্ষ্যা নদীর পূর্বতটে নবীগঞ্জস্থিত কদমরসুল দুর্গ মোসলমানগণের একটি তীর্থস্থান। (ঢাকার ইতিহাস ১ম ৪২২ পৃঃ)।

কত্রাবু—কর্তাভু বা কত্রাপুর লক্ষ্যানদীর তীরে খিজিরপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত, অধুনা কাটারব নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে ঈশা খাঁর অস্ত্রাগার ছিল। (ঢাকার ইতিহাস ১ম-৪৪৮ পৃঃ)।

কুমারসর—কুমারসুন্দর? সহর সোনারগাঁয়ের অনতিদূরে অবস্থিত, রেনেলের ম্যাপে ইহা Coblenesser নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভেকুলিয়া চর—কাপাসিয়া থানার অন্তর্গত কালীগঞ্জের অনতিদূরে ভেকালিয়া নামক একটি স্থান আছে।

সাজকাম—সাজনগাঁ একডালার প্রায় ৭ মাইল উত্তরে বানার নদীর অনতিদূরে সাজনগাঁও নামক একটি স্থান আছে।

প্রবাসী ১৩২৯ ভাদ্র

HURISH CHUNDER MOOKERJI

১৮২৪—১৮৬১

LAND LAWS

1. THE NEW SALE LAW BILL[1]

It is difficult to convince the public that Mr. Grant's Bill for the amendment of the sale law is a project revolutionary in its character and one that affects the entire framework of Bengalee society. The country remains in blissful ignorance of the danger impending over it. "The permanent settlement can never be broken."--this forms an article of national belief; and dim notions of some change being contemplated in the constitution of middle tenures fall upon the national mind with scaree a feather's weight. The indifference with which the question has hitherto been terated by the class principally interested in it indicates a density of ignorance among the propertied classes of the Bengalee community truly lamentable. The fact that not one remonstrance against the threatened measure has yet proceeded from the interior of the country is a sign of fearful import. In the face of such a state of things the cry for popular instruction and the village school and moral tales in the vernacular appears a mockery. Here is a body of about half a million of the first men among a nation thirty millions strong, with fixed income of five crores of rupees, whose individual interests are at stake, whose social position is endangered, whose political existence is imperilled, but who are scarcely aware of the existence of any such project for the destruction. Talk of education for the ryots after this! It was stated sometime ago that Louis Napolen owed that majority of votes which placed him at the head of the French government to the circumstance that a large portion of the French peasantry believed that he was the Napoleon who conquered Europe. French ignorance is confined to the peasantry; Bengale igonorance is manifest in the highest classes of the population.

To do battle with a host of governors, councillors, legislators, officials, and editors thoroughly imbued with revolutionary ideas of property and its rights, we have in a whole twelve months, but one solitary pamphlet on the side of the country. The "Observations on the New Sale Law Bill," by a member of the British Indian Association would have settled accounts with all these gentlemen if there were a

public capable of judging facts and weighing arguments. But then, perhaps, the legislative attempt which has called forth the pamphlet would never have been made. The author of the pamphlet is a gentleman who holds extensive properties in two of the metropolitan districts. The easy inference has thence been deduced that the writer speaks only of the sentiments of the Zemindar class. We may add for the information of those who have drawn this inference that the author, as a Burdwan landholder, owns an interest in putnee properties not very inconsiderable, and if he were actuated only by class prejudices he could not be wholly devoid of sympathy with the holders of middle tenures. We adduce this fact less with a view of pointing out the real position of the writer than of exposing the fallacy of arguments based upon supposed personal interests. The weight of the argument in the pamphlet is to be estimated from the amount of knowledge brought to bear on the subject it discusses and the soundness of the conclusion it lays down. It is not to be denied that the writer of the pamphlet is singularly well-informed on the topic he writes upon. His conclusion remain to be tested. They are five in number :—

1st. That Mr. Grant's Bill is unconstitutional and involves a breach of the Permanent Settlement.

2nd. That the Bill without really giving any additional security to under-tenures will introduce the seeds of decay into the superior tenure which will ultimately prove fatal alike to it and to the inferior tenures.

3rd. That the measure is uncalled for by any real want of the community.

4th. That the Bill in its present form is calculated to increase, temptations to fraud, litigation, forgery and perjury to an incalculable extent.

5th. That it is pre-eminently calculated to reduce the present market value of zemindaries.

The first of these conclusions is supported by arguments such as these :—

1st. That it is unconsitutional and involves a breach of the Permanent Settlement. It is unconstitutional because the present attempt seeks by an *es-post facto* law to interfere with the existing arrangements between Zemindars and their under-tenure-holders made under the sanction of laws solemnly passed by former legislators and thereby to temporarily enhance the value of teh latter at the expense of the former. If existing arrangements, legally made by parties, with a full knowledge of advantages and disadvantages, regarding estates containing millions and millions of acres of land (being in fact the most valuable property in the country) in the course of the 60 or 70 years, be made a game for

legislative interference, and mutual arrangements set at nought, very little confidence henceforth will be placed in the immutability of contracts and in the sacredness of property,–which calamity alone no other advantages can compensate. The Permanent Settlement ratified by the British Government with the people of this country admitted in clear tems the right of Zemindars to make such arrangements of their lands as they may deem conducive to their benefit. The present Bill in as clear terms interferes with that right by enacting that under-tenures, created by zemindars with certain immunities and rights, shall have greater privileges given tham at the expense of the Zemindars. The plea of "The G. G. in Council will, whenever be may deem it proper, enact regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent Talukdars, Ryots and other cultivators, of the soil," as stated in Article 7 of the Permanent Settlement proclamation, will not avail, as the dependent Talukdars and others, for whom so much sympathy and affection are now assumed, voluntarily entered into those legal engagements with a full knowledge of all the circumstances in each case. This argument, it will be said, may hold good only as regards the past and not for the future. But why not the future? If Zemindars be not allowed to dispose of their lands to the best advantage, it is a curtailment of the right guaranteed to them.

The indirect consequence of the measure will be still more disastrous. It will lead to the breaking up of the Permanent Settlement. But the Lieutenant-Governor and some of the high officiers of Government maintain that, if the permanently settled Estates come into the hands of Government without a breach of faith, it is rather to be wished for than avoided; but will it be acting in good faith to enact a law knowing and foreseeing the precise effect of that law to be the wished for desideratum? Will it not on the contrary, be characterized by duplicity added to bad faith?

The author, we observe, has omitted one argument of this head often advanced in these columns. Perhaps from the superior knowledge of the class he addresses, our official legislators, he thinks the argument would rather puzzle than enlighten them. Or, more probably he thinks it is wise policy not to involve his reasonings, by quoting history and acts of parliament, in the contempt with which Indian official politicians hold those authorities. Nothing however can be plainer than that Pitt's India Act, in obedience to which the Permanent Settlement ws freamed, precludes for every the Indian legislature from tampering with any of its essential provisions.

The second conclusion is illustrated in the following manner :—

There are imprudent, indolent, stupid and needy individuals among

our own Zemindars, as there are inevery other class; their proportion witll increase when additional facilities for indulging in extravagance are– placed before them. The misfortunes and minority of proprietors and the dishonesty of servants will also go a great way to swell the ranks of this class. These people will, one way or other, be always tempted to create fictitious undertenures and sell them in another name. A few gentlement, and among them Captain Crauford,[2] have thought proper to connect the improvement of the country with the proposed innovation in the sale law, affecting as it does the entire landed system in Bengal. I give every credit to those gentlemen for sincerity, but I doubt very much if they have deeply considered the question in all its bearings. All their zeal and perseverance is directed to only one point, the stability of the undertenures, a very plausible object no doubt, but if they will take the trouble of weighing all the circumstances, they, if not all, most of them, I am sure, will be convinced that the proposed measure is eminently calculated to involve ultimately alike Zemindars and Putneedars in ruin and destruction. As I have stated above. Private competition in the sales will cease after a few ineffectual struggles to catch the shadow of estates sold. Government will become the only purchaser. It will find the extates so much shom of their real assets by fraud and the neglect or incompetence of its Mofussil officers that it will soon be compelled in self-defence to break through all etiquette either by the means of the proposed bill or by enancting other laws and competely smash the Tálookdary tenures.

Whatever be the purposes of the anthor of the Bill or the hallucinations under which Captain Crauford and the class he represents labour, the ultimate effect of the law will be, what the author of the pamphlet describes, a complete smash of Talookdary with Zemindary tenures. The gentlemen who have been so eager to supoort the projects had better ponder on the preceding observations, coming as they do from one eminently entitled to deference on such a topic, and supported as they are by the testimony of Mr. Hallidary himself. The latter gentleman finds fault with Mr. Gran's Bill because it is not one calculated to bring on the crash soon enough. He is impatient for the catastrophe that shall leave him master of the situation, i.e. Lieutenant-Governor of Bengal cleared of every class of its population but officials and peasant farmers.

Under the third head of objections is pointed out the progress that the country has made under the zemindary system. The history is well told, and we are sorry we cannot reproduce it in extenso. The cry of security for undert-tenures has been raised principally by the European Planters, The following is a capital hit as these gentlemen :

"The exportation of lac-dye, hemp. and a variety of other articles has

greatly increased but very little is due to European agriculturists for their production. The whole or nearly the whole is produced by natives. Talk of improving the country by letting a few thousand bighas of lands for khajoor plantations to an European? You may just as well talk of improving the country by a few thousand bighas of rice cultivation. Why, millions of bighas are now filled with khajoor trees by the ryots, and the cultivation will go on increasing as long as its produce remains remunerative. Let beet root or any other sugar get a preponderance of Eupore and the cultivation of that article will be diminished in this country. There is very little indigo made by Europeans in Hooghly, Burdwan, Midnapore, Cuttack, Patna, Rajsahie and some other districts. Are those districts less cultivated and the ryots less happy than in Jessore, Kishnagore, Pabna etc., the great indigo districts? On the contrary, it is well-known that on the whole the state of cultivation is higher and less waste land is to be found in the one, than in the other. I have entered into these particulars to show that for want of permanency in some classes of the underttenures the improvement of the country, as far as cultivation and increase of population are concerned, as not been as a stand, and that the improvements introduced by other classes, including even the Government itself, will not bear comparison with those of the Zemindars. The question then hinges upon the point, whether by destroying a welthy body of Zemindars, able and willing to improve the country for their own sake and with large and compact tracts of land at their disposal and substituting in their place a body of petty landholders, with a tendency to split their estates still more minutely, generally without capital, influence or other means necessary to carry out improvements on a large scale, you will retard or accelerate the improvements of the country. For the question is strictly confined to this narrow compass. It is not between European and Native Capitalists, for now both alike are permitted to purchase Zemindaries, Mocurrories, rent free lands &c."

The fourth objection rests on the incentive of fraud and litigation which the Bill affords. The author of the Bill himself is quoted in support of this objection, but Mr. Halliday's minute contains the most effective exposition of this head of the subject. We have quoted from it before, and need not do it again. The consequence is one of those which make themselves obvious to the plainest understanding.

We close these observations here for the present. The last head touched upon in the pamphlet is the direct unblusing injustice to Zamindars contemplated by the Bill. Some important considerations are advanced under the head. We reserve them for review in a future issue.[3]

II. THE SALE LAW AND THE ZEMINDARS[4]

The Friend of India has reviewed at length the petition of the Zemindars of Zilla 24 Pargunnahs against Mr. Grant's Bill.[5] The article written with our contemporary's usual ability shows the extreme weakness of the cause he undertakes to support against the Zemindars. It is, in the main, a confession of the revolutionary character of the measure. "There is no power on earth which can permanently prevent the movement of society or the change in the tenurc of land which is the concrete expression of that movement". This is but a genteel and scholarly paraphrase of the articie in the Christ's creed which affirms that "the land is the inheritance of them that dwell upon it." The Indian legislature, in spite of its composition, is, we believe, not yet prepared to legislate in the spirit of this maxim. Our contemporary, however, does no rest his defence of the Bill or rather his attack upon the Zemindars, solely upon Earnest Jones"[6] principle. He examines the petition in detail and answers *seriatim* the arguments advanced in it-with what success our readers will presently have an opportnity of judging.

"The Zemindars," says our contemporary, "oppose the Bill, basing their opposition upon two separate grounds. They argue first that it is a breach of faith, and secondly that it is not required." We admit this analysis of the arguments of the petiton as tolerably correct, though the latter part of the statement will require correction. The Zemindars contend that the Permanent Settlement made under the direct injunction of parliament and ratified by every grade of authority competent to ratify that compact between the people and the Government of Bengal will be destroyed by the operation of the law proposed by Mr. Grant, and therefore Mr. Grant's Bill is in breach of public faith. That a breach of faith is involved in this measure is not denied by our contemporary. His argument on this head is that the Permanent Settlement may be broken in many other ways than that opened by Mr. Grant's measure, and that it ought not, as in the long run it cannot, arrest social progress. This we submit, is no answer to the argument of the Zemindars. Let our contemporary deny the fact that the permanance of the settlement of 1793 was guaranteed by all the authorities competent to guarantee it, or the other fact that Mr. Grant's Bill interferes with the Permanent Settlement, and then will the Zemindars have been fully answered. It may be that the parliament and the Indian authorities of that date were so extremely deficient in political foresight as not to have perceived the incompatibility of the Zemindaree system with social progress. It may be that the exigencies of social progress demand that the settlement should be

immediately abrogated. But then the difficulty should be met by a revolution, not a legal enactment; a *coup d'etat,* not a measure wending its tedious passage through formalities at the pace of two stages in eighteen months.

The Zemindars and their critic in *Friend of India* are at issue on almost at the propositions which from the bases of the petition of the formers—propositions are at once characterized by the latter as "of the most astounding audacity." The Zemindars hold that Mr. Grant's law will diminish the value of their estates, and that to deminish that value by *ex post facto* legislation is an act of confiscation. The *Friend of India* denies that Mr. Grant's law will "deminish the sale price of an estate." Here is issue joined on a distinct matter of fact which the public, unskilled in the intricacies of the law of real property in Bengal, is fully competent to try. We contend that the Zemindrs are in the right. The *Friend of India* forgets that Mr. Grant's Bill offers "increased security". to under—tenures already existing as well as those hereafter to be created. Now the author of the Bill himself estimates the extent of middlemen's tenures author of the Bill already existing at three--fourths the entire surface of the province. Whatever in the shape of *salamee* or premium the Zemindars have received for the creation of these tenures,–for the alienation of a portion of their own estates in their zemindarees–must have been considerably less than the value of the fee simple into which the contingent interests of middlemen are proposed to be converted. Their estates, hitherto charged with annuities terminable at will, are to be further encumbered by those annuities being declared to be perpetual. And it is denied that Mr. Grant's Bill proposes confiscation! But this is not the only mode of confiscation which the Bill proposes. There would be at least some consolation in the fact that what the Zeminders lose the middlemen gain.' A simple transfer of value from one class of estates to another by dint of violent legislation does not *per se* diminish the national wealth. But all transfer of property effected against the principles of right and justice—whether it be by the picking of a pocket or the passing of a revolutionary law-are calculated to diminish the sum total of the national-wealth. If undertenures are allowed to survive the capital tenure, such would be the inevitable consequence. If half a dozen under—tenures are created upon the new condition, every state in Bengal will feel the effect of the measures. No purchaser of a zemindary estate, however unencumbered it may be, will feel certain that he is not purchasing a loss. The most efficient system of registration will not obviate this consequence. The history of the opration of the Irish Encumbered Estates

Act, a law which has done more to raise the value of landed property in Ireland than anything else in the history of the island, affords in this respect experience which our legislators cannot explain away.

Mr. Halliday, as our readers know, argues that when a Zemindar commits default in the payment of the revenue the contract between him and the State is at an end, and the latter is at liberty to resettle the estate anyhow it choses,–among limited partnerships or present propietors. The Lieutenant—Governor hopes by this quibble to effect a destruction of the permanent Settlement without incurring the reproach of a breach of faith. It is in answer to this quibble, and in anticipation of the amendment upon Mr. Grant's comparatively moderate proposals which Mr. Currie has been instructed to more, that the petition contends that default on the part of the Zemindar can not affect the character or tenure of his estate; and that Mr. Halliday's argument igonores the institutional charcter of the Premanent Settlement. We should think this answer as rather complete. The *Friend of India* however sees in it only such "cool audacity" as escape observation at first sight. And wherein does the audacity lie? In the assumption at "an estate having been settled after the zemindaree tenure can not pass into the hands of any but a Zemindar." The public, we believe, in spite of our contemporary's energetic teaching, fail to see anything evey audacious in this proposition. But, according to the Friend of India, it is equivalent to saying that "the property of a peer if sold must still be bouht by a peer." Our contemporary here allows himself to be carried away to a style of argument which hardly needs refutation. There is no analogy between the proposition laid down by the zemindars and the piece of absurdity with which it is parodied. The property of a Zemindar may be purchased by anybody who has never been a zemindar in his life. It is the purchae of the zemindaree which makers him a zemindar, not the being a zemindar which qualifies him to purchase a zemindaree. One of the twenty—four zemindars who singned the petition hat has roused our contemporary's fire, seven were of the family of the Mundals of Bowalee. These gentlemen, now standing in the front rank of Zemindars in the district, were, four generations ago, of the class which possess our contemporary's warmest sympathies. The petitioners speak of the institutional character of the 'settlement' and our contemporary thinks they mean by it "that there are always to be great landholders, that no social change is permissible, that, no new class can be permitted to rise to power." The Zemindars will wonder by what rule of interpretation this meaning came to be attached to their affirmation of a simple historical fact. That there ought to be great landholders in every state is a

proposition which the profoundest politicians of modern times have agreed to consider as true. That the existence of a class of great landholders bars progress in an assumption wholly unwarranted by histrory. England, it is generally believed, has progressed since the Conquest, and many even believe that that progress has been mainly the work of the great landholders who laid the foundation of their country and countrymen's prosperity by establishing civil liberty.

The Friend of India has "not patience to reply" to the argument of the petitioners "that the measure will be useless" for, if ture, why do the Zemindars attack the measure at all? Our contemporaryforgets that a measure may be very useless as regards its ostensible purpose, at the same time that it may do a largemeasure of mischief by serving less avowed purposes. The petitioners show that under-tenures do not practically stand in need of further protection, that the proposed law will not benefit large classes of under-tenures, that it will give birth for a time to a large number of ephemeral tenures whose permanence will not benefit large classes of under-tenures, that it will give birth for a time to a large number of ephemeral tenures whose permanence will not be securred by it, and that the existence of the class of undertenures which is to derive the benefit of the law is an unmitigated evil, while the injury which the law, is certain to cause to the community is the ultimate destruction of the permanent Settlement. We are unable to detect in this reasoning the failure of logic which our contemporary discovers. The Zemindars have nowhere affirmed tht the present law is absolutely good because it allows of middlement. They maintain that it is one of the evils and in the present temper of their legislators it is hopeless asking for a correction of the evil.

Lastly, the scheme of protection for the interests of under-tenures suggested by the Zemindars in derided by our contemporary as ulterly futile. The Zemindars propose that under-tenants suffering loss by the default of their Zemindar be declared to have a right of compensation from the latter. This means according to the *Friend of India* that "the planter whose works have been destroyed by a change in the ownership of the estate, is to sue a revenue defaulter whose pauperism is proved by his default, for compensation." The *Dacca News* took the same objection to the proposal. The whole question connected with the Sale Law is one of such difficulty and is affected by so many considerations that we are not surprised to find unfamiliarity with its chief bearings even in quarters the best informed. We have ceased to feel surprise at any degree of hallucination that may be displayed in the comprehension of the question since we learnt that the author of the Bill himself and the Clerk Assistant of the Legislative Council, the first real property lawyer in the country,

really believe that the Bill does not affect Permanent Settlement. As to the agrument under notice, we have only to point out to the *Friend of India* that a Zamindar in never so rich as when his estates have been sold for default in payment of revenue : that it is this circumstance which constitutes the grievance the Bill is intended to remedy; that the principle of compensation is not a new one to the law of under-tenures as a reference to Regulation VIII of 1819[7] will prove; and finally, that if the legislature declare the prior right of undert-tenants to satisfaction out of the sale proceeds of estates sold for default, no remedy is so effectual or so certain for the enforcement of the right than the one afforded by Regulation II of 1806 of the Bengal Code.

III. THE SALE LAW BILL

Does Mr. Grant's Bill affect the permanent settlement? There are those who believe that Mr. Grant in his Bill for the amendment of the Sale Law has successfully solved the problem which baffled the previous efforts of Indian statesman to combine with maintenance of the Permanent Settlement the security of all interests subordinate to that of the tenant-in-chief. A superficial veiw of the measure introduced by Mr. Grant is certainly calculated to confirm this opinion. There is the declaration that whether an estate be purchased by a private individual or by government, under-tenures duly registered are to remain untouched and entire. But a more careful examination of the project will show that its provisions are in the long run as incompatible with the maintenance of the Permanent Settlement as the less disguised project of the Bengal Government. The permission now for the first time legally given to government to purchase estates at public sales is, in our view, itself an infraction of Permanent Settlement. But apart from that, let our readers take the three following clauses of the Bill together, and judge for themselves whether the measure does not introduce into the landed system of this province as sure a principle of destruction.

XLVI. The entry in the permanent registry book shall be an effectual protection of the under-tenure so registered unless within sixty years from the date of registry, a decree by passed at the suit of Government by a Civil court, pronouncing the registration to have been obtained by fraud, to the injury of the Government revenue.[8]

XLVII. When an estate is put up for sale under this Act for the revovery of arrears of revenue due thereon, it there be no bid, or if the highest bid be insufficient to cover the said arrears and those subsequently accruing up to the date of sale, the Collector may purchase the estate on account of the Government in which case the Government shall acquire the property subject to the provisions of this Act.[9]

XLIX. The provisions of Regulation VII of 1822 and regulation IX of 1825 shall be in force in every state in any part of which a measurement survey, or local inquiry may be made under this act : and in every estate purchased on account of Government under Sec. XLVII of this Act.[10]

That estates will, in course of time, be found to have been so far deteriorated in value by the cereation of under-tenures in them that when brought to sale they will not fetch a price equal even to one quarters assessment is a contingency clearly perceived by the author of the Bill. The very fact of his having made a distinct provision to meet this contingency is equivalent to an admission that its occurrence is to be expected. Nor need the general reader be reminded of the innumerable ways which the fraudulent or the improvident Zemindar will be able to obtain the sanction of the Revenue Collector to the registration of under-tenures carved out on large premiums and small rents. If lessor and lessee agree to cheat, the actutest Collector, must fall in their trap. Now, it stands to reason that an estate so shorn of its profits will not long be retained on the hands of the Zemindar. He may manage the profitless concern for a year or two, but he will take an early opportunity of throwing it off his hands. Government purchases it-subject, as is fondly believed, to the encumbrances created and registered by its late owner. Government finds the purchase a loss. It avails itself of the means afforded by section 41 of the Bill to sue for the annulment of the under-tenures which encumber the estote. The results of these suits can hardly be doubtful. The under-tenures are, by very hypothesis, fraudulent and injurious to the public revenue. They can not stand scrutiny. They are smashed. Government steps in, armed with the powers of Regulation VII of 1822[11] and IX of 1825[12] and settles an estate on a number of cottier lease holders.

Nor is this the sole way in which the Bill attacks the zemindary system. An estate pruchased by Government becomes, *ipso facto,* subject to the provisions of Regulation VII of 1822 and IX of 1825. We have not yet met the man who pretends to fully understand these two regulations. One thing about them is, however, certain. They deprive and regular courts of justice of all powers of interference between the Government and its subject as respects the terms uon which the latter are allowed to hold their lands. The distribution of all rights connected with the soil is, by those regulations, made over, without check or control, to the revenue authorities. Without availing itself of the Civil Courts, Government will have means to destroy the under-tenuers. What, for instance, will prevent the Government, for interfering between the putnidar and his tenants so as to make the position of the former utterly unprofitable. We even doubt whether Government will not possesss the authority to pension off the putnidar in an estate purchased by it, just in the same manner as it has

pensioned to the Talookdars in the Upper provinces. In either case,–whether Government gets rid to the big under-tenures by an appeal to the Civil Courts or by an exercise of the arbitary powers with which the Regulations named vest it,–there will remain nothing but a cottier peasantry ruled by the Tehsildar and Collector.

The danger we have endeavoured to point out loses nothing of its magnitude by the circumstance that we have now at the head of the local Government a politician who views with implacable hatred the existing landed sysem of the country, who has formed the strongest resolution to replace it by the system which we have shown it is the tendency of the proposed measure to bring about and who with charcteristic frankness has avowed his intentions to work the law placed within his reach for the purpose with untiring energy. We will ask our readers to remember Mr. Halliday's words : "Every estate purchased by Government is a population redeemed and regenerated." We beg them to remember that the fault found by the lieutenant-Governor with Mr. Grant's Bill is that it will not destroy the zemindaree system soon enough. If, however, it be given to him by the legislation to proceed to his work of destruction with the means afforded by Mr. Grant's Bill, it may be assumed that those means will not be used with any want of vigour. Mr. Halliday, for instance, has not faith in the virtues of registration. We consider his observations on that head eminently sound and wholly unanswerable. Is it too much to believe that, holding such views on the question of registration and resolved to bring zemindaries to sale however they can be brought to it, he should instruct his Collectors to be not over`scrutinizing into the terms upon which under-tenures are created and tendered for registration? The security which Mr. Grant's Bill offers to the zemindaree body is delicate reed which the Lieutenant-Governor will break down with as much ease as good will.

We have entered into his argument because we believe there are still many thinking men with whom that fact that Mr. Grant's Bill is calculated to break the permanent settlement would be conclusive as to the injustice and impolicy of the measure.

V. THE RENT BILL[13]

That a very small quantity of wisdom suffices for the government of mankind is a truth that has passed into a proverb. Yet every fresh instance in which he truth is examplefied strikes us with surprise and fills us with regret. The Sale Law Bill was circulated amongst the Collectors of the Bengal land revenue with a view to draw forth their opinions upon a question with the merits of which they were expected to be specially acquainted. The repliers elicited displayed a lamentable amount of

ignorance upon the very elementary principles of Bengal land revenue law. The Rent Bill was submitted to the judges of the land with a similar object, and the result has been equally unsatisfactory. Of two Sudder judges and twenty three district judges who have favoured the public with their opinions upon this topic only one of the former had formed a correct estimate of the importance of the proposed measure, the rest all failing to realize the magnitude of the change contemplated by the Bill. Mr. Sconce alone says of the Bill that it "is the most important that ever was or that can be submitted for the consideration of the Legislature". It forms a curious feature in the replies that the great majority of the judges who report upon the measure devote all their remarks not upon the sections of the Bill which propose to determine the status of the ryot or his rights but upon unimportant points in the system of procedue laid down for the trial of rent cases. So much for the ancient argument that the course of training which the Collector's office affords to the Indian civilians but qualifies him for the discharge of judicial duties.

We do not know whether to count it fortunate or otherwise that Mr. Halliday's minute on the Rent Bill does not much exceed a page of foolscap Certain it is that intelligently as the Lieutenant-Governor of Bengal writers upon all question of domestic policy, he has been unable to seize the real points in the question attempted to be settled by Mr. Currie's Bill. The most important paragraph in Mr. Halliday's minute offers nothing better than the following :

"Mr. Raikes, Judge of the Suddar Court, observes that, by numerous precedents since the enactment of Section XXVI Act. I of 1845, it has been determined that an auction purchaser may eject or enhance at discretion the rents of all tenants, except those of the description specially protected by the section in question : whereas Sections II and IV of the present Bill extend that protection to other classes, and thus run counter to former legislation, and to rullings of the Courts founded thereon. I apprehended, however, that the object of that part of the Bill was no other than that of Act I of 1845, namely to declare and uphold the rights of Khoodkasht and Kudeemee Ryots, which Royts I take to be the class intended by the expressions 'Hereditary Ryots holding lands at fixed rates' and 'Resident Ryots and cultivators. Perhaps the opportunity should be taken to define what has always needed definition, namely, the term 'Khoodkasht and Kudimee Royts."

It is not a definition that the Khoodkasht Kudeemee ryot of Bengal wants. He is pretty well know for all that law gibberish has enshrouded him in. The dificulty of his position lies in the difficulty of proving his character as a khudkashi ryot while an absurd rule of evidence encumbers the code. By the law as at present administered, whenever a Zemindar

institutes a suit for the enhancement of rent, it is the ryot who is called upon to prove that the tenure he has inherited or purchased was a khoodkasht tenure held on a fair rent at the time of the Decennical Settlement. So the inevitable result is that the older the tenure grows the less secure it becomes, thus reversing all the purposes for which the law of prescription, the first law of property was instituted in human codes.

Mr. Sconce grapples with the question with greater force :

"I do not say, however that, in using an uniform definition, the difficulties which daily arise for adjustment and adjudication are effectually solved. It may not be doubtful that a khoodkasht ryot has a right of prescriptive occupancy, but a prescription grows and is consituted by the effluxion of time, and thus an occupancy which being immature and new, does not amount to a permanent right by long recognition becomes eventually prescriptive. Rights, like customs, may be imperceptible in their origin and progress, which nevertheless in time we do not hesitate to characterize and to perpetuate. The last sentence in section V of this Bill appears intended to create a right of prescriptive occupany in favour of a resident ryot with respect to land recently acquired by him. Possession and payment of rent for three years, supposing the tenant's right not to be otherwise limited by a written engagement, here create a right of occupancy. This provision it is sure, will be confined to land newly acquired by resident ryots. Land not beore held on a prescriptive tenure, becomes, after three years, included within the older land of the ryot and subject, I suppose, to the same condition of occupany and, it seems to me, as mere occupation for a limited period restricts the proprietor's right of ouster, a similar provision should be made in favour of other ryots by reason of prolonged occupancy.

"I believe that the experience of all of us shows that it is in vain to look for precisely marked distinctions between the old and recent occupancies of ryots. The term *huddeemee* which is merely old khoodkasht, appears to signify the occupancy of land which is peculiarly a ryot's own and for which others can bring no claim on an equal footing. But distinctions of a broad and general kind are sufficiently noticeable. On the one hand a khoodkasht ryot is known by a continued occupancy, by an occupancy continued at his own will, also by the silent sufferance of the Zemindar; and on the other a temporary occupancy is most usually marked by circumstances which are incompatible with a permanent right such as by recent and accidental acquisition by variable exception, or by lease for a limited period. I should prefer, therefore, to take twelve years' occupancy, recognized by the Zemindar (mainly by the receipt of rent but possible also by other circumstances) to constitute a right of prescriptive

occupancy; except that an occupancy renewable at the discretion of the Zemindar, may be inferred from the express terms of a written engagement, or from the general terms of a deed taken in connection with the circumstances under which the tenure originated or was continued. "Where there is not written engagement, twelve years' occupancy alone will be sufficient to guarantee a permanent right; but if there be a deed without an express condition to quit, the mere termination of the lease will not impart a limited occupancy unless that be inferable from the circumstances of the case."

This suggestion is applicable only to a case of ordinary suitors for enhancement of rent. To apply it to a case of the auction pruchaser would be to deal a blow to the permanent settlement that may prove eventually fatal. It is essential to the stability of that settlement that when an estate is encumbered so as to reduce its income below the Jumma it is assessed at to the public, its sale for the recovery of arrears should place it at once in the condition it was in at the date of settlement. To allow any class of ryots immunity from increase of rent on the ground solely of twelve years' occupancy without challenge would infringes this fundamental principle of our landed system and offer inducement to improvidence on the one hand and fraud on the other to revel at the cost of the nation's weal.

That part of Mr. Currie's Bill in which he endeavours to provide a remedy against the khoodkosht ryot being converted into a tenant at will—a conditions he is fast drifting towards—is obnoxious to precisely the same objection and some others too. To make residence the whole essential of khoodlhost tenancy is to injure irretrievably the grand bulwark of the permanent settlement. The attempt was ever before made to convert all chupper bund ryots into khoodkosht ryots, but the good sense of the legislature of the time baffled the project.

VI. THE PERMANENT STEELEMENT

Whatever the faults of the Permanent Settlement, it is the only system of landed tenure, it is clear, which is suited to India. Under it the people will progress and prosper-their civilization will take a visible shape, their sympathies for "the powers that be" will be strengthened and their aspirations after a nationality will be nursed and effectuated. It has proved to be the best source of strenth to Government and the most poweful bond which will unit Hindustan to Britain. This fact the sepoy revolt has demonstrated beyond dispute. Statesmen and politicians of the highest order acknowledge it. Sir John Malcolm has justly said that the happy effects of Lord Cornwallis most statesmanlike measure, in order to be believed in ought to be seen. "This system. observes that for famed

soldier-statesman," is not less caculated to improve the state of the country and the condition of the inhabitants than to fix upon the firmest basis the British Government in India by securing the attachment of their subjects and to give, from the obvious principles of justice and moderation on which it is founded, the most favourable impression of the English Governmnt to all the nations of India." It there event existed any doubts as to the truth of this remarks, although it bears the authority of a name which Englishmen are proud to honour, the insurrection, we repeat, has incontestably dissipated them. It is idle to contend at this time, when the event apprehended has been happily averted, that had it not been for th Permanent Settlement, the whole of the Bengal Presidency would have been now lost to England, and who knows but that the terrible effects of such a crash would most probably have been felt in the extremities of the Pubjab and the farthest comers of the Malabar and Corromandel coasts. We are not disposed to call the apprehension of the Sepoy outbreak developing itself into a general revolt "as a groundless panic"—for we know there are ample combustibles for such an explosion—and we therefore sincerely believe despite the verdict of the *Times*, that the mutiny at Dacca and Chittagong would have been a serious affair had not the people been trained under the instincts of feudal allegiance, and had not their lords, concious of a high and enormous responsibility to the state which recognised them as its strength and glory, significantly re-pudiated the rebel cause, and opposed a resistance none the less effectual because unostentations. If the rebellion is purely a demonstrative movement of the Hindustani race as *Index* expounds and which the Madras *Athenaeum* accepts, Behar must be allowed to contain a strong and large modicum of that national element of India. The temper of the people of that province is the most excitable, and their constitution being far more hardy and enduring than that of the men of the Lower Provinces, they are apt to burn their fingers in a hot flame more than any other natives of the country. But what held them fast when the opportunity came? Was it the roaring cannon, the bristling bayonet or the sharp sword? Certainly not : It was the social and moral influences of their feudal lords whose words were more potent than the temptations of country's wealth, of landless independence, of unrestrained indulgence and irresponsible plunder. The fact of their acquiescence to the rule of the feudalism had trained them up in a civilizetion under the influence of which they could have some conception of law and justice, gratitude and prudence, truth and error. The career of Kooar Sing rather then invalidating, confirms the justness of our observation. He was the only black sheep among the flock of the great landlords under the Permanent Settlement. He was a ruined man, with no

pledge to society except his fancied wrongs. He led his foot astray and none were so insensible as to follow in his footsteps. The zemindars of Behar remained firm in their position and only pitied his foolishness and stupidity.

But not only is official testimony, though reluctantly, made to declare for the continuance and extension of the Permanent Settlement. Non official politicians of great weight recognise its merits. Two of our best journals—best as they seldom put their pens otall not so bad as its enemies would have it. The *Dacca News* edited by a thorough-going planter, whose twenty—five years well conducted experience divides the sobriety of truth with the elasticity of humour, is a staunch advocate of the Zemindary system of landed tenure. The only other journal whose opinion on such subjects as the one now under consideration is always valuable is the Madras *Athenaum.* This pper has a superstitious attachement for the democratic measure of Sir Thomas Munro.[14] but the earnest voice with which it describes its evils unmistakably calls for the system which has preserved the peace and promoted the prosperity of Bengal under the most terrible convulsion which has ever fermented Hindoostan. If the opinions of the highest statesman and best politicians of the country almost unanimously certify the valuableness of the Bengal system of landed tenure, the course of Lord Canning's statesmanship is manifestly clear. His Lordship must bear in mind that his mission is two-fold. He should save the existing empire and should lay the foundations of a new one. The one work has fairly commenced, the other will task his utmost courage, sagacity and energy. There are many in England, who in a false sentiment of sympathy for the poor and labouring, inveigh against the establishment of Indian feudalism. They will cry against his Lordship for any attempt to adopt it; and perhaps, the religious class—but not the thinking portion, *vide* the *friend of India*—will join, in the cry. But the true statesman, the Man of God, should move with the finger of Providence. Absurd clamour should not silence his zeal. If the cultivation, gorwth, prosperity and happiness of a population, and the safety of an empire are his principal responsibilities be sould not neglect this opportunity. This is the fittest time for land reform. The old system has crumbled into pieces, but another of greater antiquity has been tested to be stronger and sounder far, and why not then at once adopt it and carry it out through the length and the breadth of the land.

তথ্যসূত্র :

1. Paused into law as Act XI of 1859. It is introduced into the Council by Mr. Grant, afterwards Sir John Peter Grant, Lieutenant-Governor of Bengal.
2. A planter who interested himself in improving the fixity of under-tenures before the introduction of the Bill and after it was introduced published articles on the Bill criticising its provisions about the security of under-tenures and suggesting that the provisions relating to the protection of tenures should be carried down to the lowest under-tenancies.
3. The Hindu Patriot, Mar. 5, 1857.
4. The Hindu Patriot, Mar. 12, 1857.
5. The Friend of India : March 5, 1857.
6. Chartist leader and poet 1819–1869.
7. Patni Taluk Relulation.
8. This is substantially embodies in sec. L of the Act.
9. Embodied in sec. LVII of the act.
10. Embodied on Sec. LX of the act.
11. A regulation for the settlement of land revenue inceded or conquered tracts.
12. A Regulation for extending the operation of Regulation VII of 1822.
13. *The Hindu Patriot* Nov. 14, 1857. The bill was intended to afford security to the tenure of ryots and improve their status. Among its most important provisions were the absolution of ryots from liability to be summoned by the Zemindar, the establishment of the illegality of exaction of abwabs and other imposts and the recognition of the right of resident ryots to hold land so long as they paid rent, without liability to eviction.
14. The system founded by Munrois the Ryotwari system still in vogue in Madras, by which settlements are made directly with ryots by the government. For its history and economic effects *Vide* R. C. Duts *Economic History of British India.*

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রতিবেদন

অমৃতবাজার পত্রিকা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

লর্ড কর্ণওয়ালিস বাধ্য হইয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে জমিদারদিগের তাহাদের জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের যত্ন হয়, প্রজার উপর অত্যাচার কমিয়া যায়, ও গবর্নমেণ্টের আয় এক প্রকার নিশ্চিত হইয়া দাঁড়ায়। এ বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালে শেষ হইয়া যায়। তাহার পর কত গবর্নর আসিয়াছেন গিয়াছেন—কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে কিন্তু এ বন্দোবস্তটি যেমন তেমনি রহিয়া গিয়াছে।

এরূপ বন্দোবস্তে প্রজাদিগের ক্ষতি জমিদারদিগের লাভ। যদি গবর্নমেণ্ট জমিদারি শ্রেণি উঠাইয়া দিয়া প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন, তবে করের বৃদ্ধি ও প্রজার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ও ভূমণ্ডলের অন্যান্য দেশের সঙ্গে একটু বিভেদ আছে। ঔষধ অসুস্থাবস্থার আহার। আমাদের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে গেলে ভয় হয় যে, পাছে যাহা আছে তাহাও যায়।

মনুষ্যে সচরাচর ধনোপার্জন, চাকুরী, কৃষিকার্য, বাণিজ্য ও কারখানা (কুঠি) এই কয়েক প্রকারে করিয়া থাকে। বড় বড় কি মধ্যম রকমের চাকুরি সমুদয় রাজপুরুষদের হাতে। বাঙ্গালীদের এরূপ চাকুরী হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহা দ্বারা তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া ধন সঞ্চয় করিতে পারে। দেশাভ্যন্তরস্থ বাণিজ্য বাদ দিলে সমুদয় বাণিজ্যই ইংরেজদের হাতে। কারখানাও ঐরূপ। আমাদের দেশের তন্তুবায়ের ব্যবসায়, ইংলণ্ডের যন্ত্রে, উৎসাহে, ও ধনে একেবারে নষ্ট হইবার জো হইয়াছে। অধিক কি এক্ষণে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত ইংলণ্ড হইতে আসিয়া থাকে। নীলকুঠি ত প্রায় সমুদয় ইংরেজদের। লবণ ইংলণ্ড হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে তবে আমাদের আহার হয়। অহিফেনের ব্যবসায় গবর্নমেণ্টের হাতে। যে অল্প পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হয়, তাহার মধ্যেও ইংরেজরা প্রবেশ করিতেছেন। বিশেষতঃ বাণিজ্য ও কারবার আমাদের এক কারণে নিতান্ত অসুবিধা। আমাদের খরিদ বিক্রয় কেবল এক ইংরেজের সঙ্গে। কাজেই আমাদের খরিদ বিক্রয়ের পাল্লাপাল্লি নাই। খরিদ বিক্রয়ের পাল্লাপাল্লি না থাকিলে ব্যবসায়ের লাভও নাই।

বাঙ্গালা দেশ খুব উর্বরা, এটা ঠিক। (কি কারণে তাহা এক্ষণে বলিতে চাহি না) যে কৃষি দ্বারা আমরা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি বই নয়। ধনোপার্জন করিতে পারি না।

এই ত আমাদের দেশের অবস্থা। আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহা ভূমিতে, ইংরেজদের সেইটা হইয়াছে চক্ষুশূল। তাহারা সতৃষ্ণ নয়নে ঐ দিকে তাকাইয়া থাকেন। গবর্নমেন্ট সকল দিকে হাত বাড়াইয়াছেন। এইটা বাকী আছে। সেই নিমিত্ত জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত লইয়া টানাটানি করিতেছেন।

যেরূপ অবস্থায় ঐ বন্দোবস্ত করা হয়, এক্ষণে তাহা সহসা লংঘন করিতে

গবর্নমেণ্টের সাহস হয় না। কাজেই একটা ফিকির চাই। এই নিমিত্ত সুচতুর গবর্নমেণ্ট "বিদ্যার নিমিত্ত কর" এই হুজুগ তুলিয়া দিয়াছেন। নড়াইলের চন্দ্রবাবু কি গোবরডাঙার সারদাপ্রসন্ন বাবুর ন্যায় উদারচরিত জমিদার বাঙ্গালায় বেশি নাই। সুতরাং জমিদারগণও দেশের লোকের প্রিয় নয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরবশ, এদের নিকট হইতে টাকা লইয়া বিদ্যার নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে, ইহা সাধারণতঃ সকলেরই মনঃপুত হইতে পারে। গবর্নমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া লইবার এই সুযোগটি অবলম্বন করিয়াছেন যদি এটা একবার সাব্যস্ত হইল যে, ঐ বন্দোবস্তের উপর কর বৃদ্ধি হইতে পারে গবর্নমেণ্ট ও জমিদারদিগের পাট্টা কবুলতি কিছুই নহে তবে এক্ষণে যেরূপ মুনাফার উপর শতকরা ২ টাকা ধরিতেছেন, ক্রমে ক্রমে উহা বৃদ্ধি করিবার আর বাধা থাকিবে না। তাহা হইলে প্রজার কিছুমাত্র লাভ হইল না কেবল জমিদারগণ উচ্ছিন্ন গেল ও গবর্নমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইল। গবর্নমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইলে যাহারা শাসন করেন তাহাদের বই আর আমাদের কি লাভ? এক্ষণে যে সাধারণে, বিদ্যা প্রচারের কথা ধরিয়াছে অর্থাৎ এই টাকা লইয়া বিদ্যার নিমিত্ত ব্যয় করিতেছেন, সে কেবল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাঙিবার সহজোপায় মাত্র।... আপাতত দেখিতেছি গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায় জমিদারদিগকে দৈন্য করা। আমরা ত দেশ সমেত লোক লক্ষ্মীছাড়া তবু যদিও জমিদারগণ আমাদের বড় প্রিয় নন, তবু ২।৪টি ধনী লোক দেশে থাকে এ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

২৩ জুলাই ১৮৬৮

জমিদারগণের উৎপত্তি

মনু বিধিবদ্ধ করেন যে, ভূমির উপস্বত্বের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজা পাইবেন, আর বক্রি প্রজা পাইবেন। তবে যাহারা এই কর সংগ্রহ করিতেন, তাহারা প্রজার অংশ হইতে আরো কিছু পাইতেন। তখন প্রজা ও রাজা এ উভয়ের কাহারো ভূমিতে উপস্বত্ব ছিল মাত্র, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের কর সংগ্রহ করা ব্যতীত ভূমিতে কিছুমাত্র অধিকার ছিল না। সুতরাং জমিদারগণ তখন সৃষ্ট হন নাই।

তাহার পরে দেখা যায় যে, আকবর কর আদায়ের জন্য নূতন একপ্রকার বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা পান। আমাদের দেশে পূর্বাবধি যে নিয়ম প্রচলিত ছিল আকবর তাহারি অনুবর্তী হইয়া তাহার মন্ত্রী, রাজা তোদায়মালের সাহায্যে সেরূপ আর এক প্রকার বন্দোবস্ত করেন, কিন্তু সেও প্রজাদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে। মনুর সময় রাজা যে ছয় ভাগের এক ভাগ লইতেন, আকবর তিন ভাগের এক ভাগ লওয়া স্থির করিলেন ও প্রজাদের সহিত এইরূপ দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিলেন। আর এই সমুদয় কর আদায়ের নিমিত্ত তিনি 'ক্রোরি' উপাধি দিয়া প্রত্যেকের আড়াই লক্ষ টাকার তহশিল দিয়া নায়েব নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং তখনও জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয় নাই। জমিদার শব্দটি তখন না ছিল এরূপ নয়, কিন্তু তখন জমিদার অর্থে যে কি বুঝাইত তাহা ঠিক নির্দেশ করিবার যো নাই। এসিয়াটিক রিসার্চেস, ১৫ বালমে ষ্টারলিং সাহেব বলেন যে, পাতসা আলমগিরির পূর্বে যাহাদের কিছু না কিছু স্বাধীনতা ছিল, তাহাদিগকে জমিদার বলা যাইত না। তাহার মতে তখনকার জমিদারেরা এক্ষণকার করদ রাজাদিগের মতই ছিলেন।

যখন ইংরেজরা বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছেন, তখন দেখিলেন যে জনকয়েক

ইজারদার বাঙ্গালাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়াছেন, তাহারা প্রজাদিগের নিকট নায়েব কি ইজারদারের ন্যায় কর আদায় করিয়া নবাবের নিকট প্রেরণ করিতেন। যত কর আদায় করিতেন তাহার শতকরা ৩০ টাকা তাহারা নিজে পাইতেন। তাহাদের আখ্যা ছিল রাজা ও কর আদায়ের নিমিত্ত যাহা যাহা চাই—এক্ষণে যেরূপ নায়েবদিগের আছে—কিয়ৎপরিমাণে সৈন্য প্রভৃতি রাখিবার বিধিও ছিল।

ইংরেজের সময়ের পূর্বে বরাবর এই নিয়ম ছিল যে বাপের কর্ম ছেলে পাইত, এইরূপ হয়ত একটি কর্ম পুরুষ পুরুষানুক্রমে পরপর একবংশীয় দ্বারাই নির্বাহিত হইত। এই সমুদয় ইজারদারেরা যে পর্যন্ত নিয়ম মত কর দিতেন, তত দিবস তাহারদের কোন জ্বালা ঝঞ্ঝাট ছিল না, আপনার ইজারার মধ্যে সর্বময় কর্তাও থাকিতে পারিতেন, তাহার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী তাহার সমুদয় বিষয় পাইতেন। কর দিতে ক্রটি করিলে নবাব ধরিয়া লইয়া কর আদায়ের নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্রণা দিতেন ও কখন ইজারা ছাড়াইয়া লইয়া অন্যকে দিতেন। নবাবেরা স্বেচ্ছাপূর্বক আর পুরাতন ইজারদারদিগকে তাহাদের ইজারা হইতে বঞ্চিত করিতেন না।

কিন্তু যখন ইংরেজরা দেশের কর্তা হইলেন, তখন দেখিলেন এই ইজারদারেরা বড় সুখে আছে। মুসলমান নবাবদিগের যে ঔদার্য ছিল তখন তাহাদের তাহা ছিল না। তাহারা একদল রাক্ষস আসিয়াছিলেন, যে প্রকারেই হউক উদর পূর্তি করিতে পারিলেই হইত। তাহারা দেখিলেন যে ইজারদারদিগকে বার্ষিক এত না দিলেও চলে, অতএব বৎসর বৎসর বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। যিনি অধিক দিতে পারিতেন তাহাকেই ইজারা দেওয়া হইত। এইরূপে পুরাতন ইজারদারেরা বহিষ্কৃত হইয়া অন্ন অন্ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, নূতন নূতন ইজারাদারেরা যথাসাধ্য প্রজা শোষণ করিতে লাগিল। এইরূপ ডাক বাড়িয়া বাড়িয়া শেষে এরূপ হইল যে প্রজাকুল একেবারে উচ্ছিন্ন গেল, ইজারদারেরা যত আদায় হইতে পারে তাহার অধিক ডাকিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, গবর্নমেন্টের খাজানা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল, আর দেশটি একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ঐ যে গল্পে আছে, এক হংসী সুবর্ণ ডিম্ব প্রসব করিত, কৃষক সমস্ত ডিম্ব এক দিন বাহির করিয়া লইবার আশায় যেরূপ বিপদে পড়ে, ইংরেজদেরও তাহাই হইল।

দেশের এইরূপ অবস্থা হইলে ১৭৮৬ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টর হইতে একখানি আদেশপত্র আইল, যে এরূপ বৎসর বৎসর বন্দোবস্ত করিলে ইজারদারদিগের প্রজার প্রতি মমতা হইবে না, ন্যায্য কি গবর্নমেন্টের প্রাপ্তি তাহাও জানা যাইবে না, অতএব পুরাতন যে ইজারদারেরা আছে তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হউক। লর্ড কর্ণওয়ালিস অনেক তর্কের পর এই বন্দোবস্ত করেন। প্রথম তর্ক হইল যে এক্ষণে কোনমতেই বন্দোবস্ত হইতে পারে না যেহেতু দেশের অবস্থা কি তাহা ভাল করিয়া জানা যায় নাই, এক্ষণে একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে পরে হায় হায় করিতে হইবে। সেই হায় হায় এক্ষণে লরেন্স বাহাদুর করিতেছেন। কিন্তু এ সমুদয় না শুনিয়া পিট, ডণ্ডার্স, প্রভৃতি সাহেবের পরামর্শানুসারে লর্ড কর্ণওয়ালিস পুরাতন ইজারদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপন ১৭৯৩ সালে ২২ মার্চ তারিখে প্রচার করেন। এই দিবস জমিদারদিগের সৃষ্টি।...

২৬ নভেম্বর ১৮৬৮

ইংরেজ জমিদার

আমরা বরাবর দুঃখ করিয়া থাকি যে চাকুরীর উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছিষ্টের উচ্ছষ্ট ব্যতীত আমরা আর কিছু পাই না, যদিও আমরা কখন বিদ্রোহী হই নাই, পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছি, আর যদিও এদেশটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের। আমরা ইহাও বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে বাণিজ্যও বিদেশীদের হাতে, তবে এখন আমাদের আছে কি না ভূমি। কৃষকেরা ভূমির উপস্বত্বে দিন যাপন করে আর জমিদারেরা লাভ পাইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জমিদারিগুলি যাহাতে বজায় থাকে এই আমাদের ইচ্ছা, এই নিমিত্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা প্রাণপণে জমিদারদিগের সমর্থন করিয়া থাকি। আমরা যাহাই হই, আমাদের আন্তরিক ভালবাসা প্রজাদিগের উপর কিন্তু তবু সময়ের ভাবগতি বুঝিয়া আমরা প্রজাদিগের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারি না। সর্বাগ্রে দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে পরে অধিবাসীদিগের উপর। আমাদিগের এই ধ্রুব বিশ্বাস যে যে দিবস জমিদারিগুলি গবর্নমেন্টের অধীনে হইবে সেই দিবস আমাদিগের অবশিষ্ট যে কিঞ্চিৎ বল, ও ক্ষমতা আছে তাহার লোপ পাইবে।

যখন মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল তখনও জমিদারিগুলি এতদ্দেশীয়দিগের হাতে ছিল, তাহার কারণ আর কিছু নয়, মুসলমানদিগের যত আয়ু শেষ হইয়া আসিতে লাগিল তত তাহারা ভোগ সুখানুরক্ত ও অলস হইতে লাগিল। জমিদারি প্রভৃতি রক্ষা করিবার যে কষ্ট উহার মধ্যে তাহারা যাইতে চাহিত না। ইহাতে জমিদারিগুলি হিন্দুদিগের হাতে থাকিয়া গেল ও যখন ইংরেজদিগের আগমন হইল তখন মুসলমানেরা উচ্ছিন্ন গেলেন হিন্দুরা যেমন তেমন থাকিলেন। যদি এই জমিদারি মুসলমানেরা লইত তবে কি আমাদের দুর্দিনের আর সীমা থাকিত? এক্ষণে মুসলমানদিগের যে অবস্থা তাহা অপেক্ষা আমাদের অবস্থা শত গুণ মন্দ হইত। জমিদারিগুলি আমাদের হাতে আছে বলিয়া নীল কুঠিয়ালেরা আমাদিগকে উচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই, আমাদের দেশে আইনের দ্বারা বিচার হয়, গবর্নমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হইয়া একটু সতর্ক হইয়া বলেন, স্থূল কথা আমাদের যে একটু জীবন আছে সে কেবল জমিদারিগুলির নিমিত্ত। এই সময় একটা দুঃখ হয়, জমিদারেরা যদি একটু ভাল হইতেন তবে আর আমাদের দুঃখ কি?

এই জমিদারির উপর গবর্নমেণ্টের যেরূপ লোভ, ইংরেজ সাধারণের সেরূপ লোভ হইবার সম্ভাবনা নাই। এদেশে জমিদারি লইলে এদেশে বাস করিতে হয়, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া এদেশে কেহ বসে করিতে চাহেন না। বিশেষতঃ বাণিজ্যে যেরূপ লাভ জমিদারিতে সেরূপ লাভ নাই, আর যে লাভই থাকুক ইংরেজেরা জমিদারি ক্রয় করিতে গেলে এতদ্দেশীয়েরা যে কারণেই হউক কিঞ্চিৎ অধিক পণ লইয়া থাকেন। ইংরেজদিগের জমিদারি লইবার উহা ছাড়াও অন্যান্য বাধা রহিয়াছে। ইংরেজেরা জমিদার হইলে প্রজাদিগকে বাধ্য করিতে পারেন না, ভৃত্যদিগকেও বাধ্য করিতে পারেন না, স্বয়ংও সকল বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর নানারকম দৌরাত্ম্য হয়। এগুলি এতদ্দেশীয় জমিদারের উপর হয় না। প্রধান বাধাই হইতেছে যে যে মূল্যে জমিদারি ক্রয় করিতে হয় তাহার ন্যায় লাভ হয় না। এই আমাদের বাঁচিবার পথ নতুবা এদেশ ইংরেজদিগের, ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের স্বাভাবিক টান তাহাদিগের দিকে, ধন তাহাদিগের অধিক, তাহারা জমিদারি লইবার নিমিত্ত একান্ত মনে টানাটানি করিলে আমরা রাখিতে পারিতাম না।

তবু কারবার করিবার নিমিত্ত ইংরেজদিগের জমিদারির দরকার হয়। নীলকরেরা দেখিলেন যে জমিদারি না লইলে প্রজার তাহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে সম্মত হয় না, এই নিমিত্ত কাজেই তাহাদের জমিদারি লইতে হইল। এ জমিদারিগুলি তাহারা লোকসানের ন্যায় গণ্য করিতেন। নীল প্রস্তুতই তাহাদের প্রধান কার্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহারা বিস্তর জমিদারি লইয়াছেন। কাছাড়, অযোধ্যা ও হিমালয়ে অনেক ইংরেজে বিস্তর ভূমি নিষ্কর রূপে ক্রয় করিয়াছেন। বাঙ্গালায় ইংরেজেরা যে সমুদয় জমিদারি অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিয়া এক্ষণে ভোগ করিতেছেন সে বিস্তর। এমন জেলা নাই যে সেখানে দুই একটি ইংরেজ জমীদার না আছে। ইংরেজদিগের সংখ্যা দেখিলে ও তাহাদিগের ধনোপার্জনের যে এদেশে নানা পথ আছে তাহা বিবেচনা করিতে গেলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে জমিদারিগুলি ইংরেজদিগের লইবার দরকার নাই বলিয়াই উহা আমাদের হাতে আছে। এদেশে কতটি ইংরেজ জমিদার আছেন ও তাহাদের কাহার কি জমিদারি প্রকাশ করিয়া নিম্নে একটি তালিকা দিতেছি, বোধ হয় পাঠকবর্গ বিরক্ত হইবেন না।...

জেলা	ইংরেজ জমিদার	ইংরেজ পত্তনিদার
২৪ পরগণা	৩৩	*
নদিয়া	২৯	১১
যশোহর	২৮	১৩
ঢাকা	২৭	*
ভাগলপুর	২৭	.৩
পূর্ণিয়া	১৪	*
পাটনা	১৩	*
পাবনা	৯	১২
ত্রিহুট	১১	*
মুরশিদাবাদ	৮	৯
চম্পারণ	৭	০
বাকরগঞ্জ	৭	১
মঙ্গীর	৬	০
বর্ধমান	৬	১৬
ময়মনসিংহ	৫ --	অজ্ঞাত
সাহাবাদ	৫	*
বীরভূম	৪	১
চাটিগাঁ	৪	*
রাজসাহী	৪	৩
সারণ	৪	*
বগুড়া	৩	*
মালদহ	৩	৩
মেদিনীপুর	৩	১
বাঁকুড়া	২	২
দিনাজপুর	২	১
বেহার	১	*

এই সকল ইংরেজেরা ১০৮৪৫০৯ টাকার জমিদারি ও ৬৭৯৮৮২ টাকায় পত্তনিদারী ক্রয় করিয়াছেন। গবর্নমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তি অনুসারে সাড়ে তিন কোটি টাকার কিঞ্চিৎ অধিক পান। এ হিসাবে এতদ্দেশীয়েরা যত জমিদারি ভোগ করেন তাহার ২০ ভাগের এক ভাগ ইংরেজেরা ভোগ করেন, এক্ষণে বিবেচনা করুন যে এতদ্দেশে ইংরেজের সংখ্যাই বা কত আর এতদ্দেশীয়দের সংখ্যাই বা কত। গবর্নমেণ্ট এদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন কি জানি না, এই জন্যে আমরা সতর্ক করিতেছি যে দেখিবেন বাঙ্গালী মারিতে যেন অবধ্য ইংরেজ না মারেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০

রথ্যাকর

আবার রথ্যাকর লইয়া গোল উপস্থিত। শুনিতে পাই, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট আমাদের লেফটেনাণ্ট গবর্নরকে এই নিমিত্ত এক কড়া চিঠি লিখিয়াছেন। হইল ভাল। এদিকে সংবাদপত্রে আমাদিগের আইজকালি যেরূপ গালির চোট, আবার তেমনি রথ্যাকর, বিদ্যাকর, স্কুল কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব। এ সমুদয় একেবারে করা ভাল হয় না। ক্রমে ক্রমে। যদি বিদ্যাকর স্থাপন করিবার মনস্ক থাকে তবে এখন গালি দেওয়া ক্ষান্ত থাকুক। থাকিয়া বরং মিঠা কথা বলিতে থাক, রথ্যাকর সম্বন্ধে বরং এরূপ প্রতিজ্ঞা করা হউক। বিদ্যাকর দিলে, আর রথ্যাকর লওয়া হইবে না তাহা হইলে সম্ভবতঃ জমিদারেরা এক্ষণে বিদ্যাকর দিতে সম্মত হইবে, তাহার পরে বরং আবার উহার উপর রথ্যাকর বসাইলেই হইবেক। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে? তাহাতে দোষ কি? রাজার ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গে দোষ নাই, তাহা থাকিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্ত্বে আবার রথ্যাকর, বিদ্যাকর কথা উল্লেখ হয় কেমন করিয়া? মহারাণীর ঘোষণার পরে আবার বিদ্যালয় উঠাইবার প্রস্তাব হয় কি প্রকারে?...

জমিদারদিগের এক ক্ষমতা সভা করা, বক্তৃতা করা, কাগজে লেখা তাহা হইয়া গিয়াছে—জমিদারদিগের বারুদ গোলা ফুরাইয়াছে এক্ষণে গবর্নমেণ্ট লইলেই হইল। কিন্তু গবর্নমেণ্টের এ কর্তব্য নয়। যে কার্যে দেশ সমেত লোকে বিরোধী তাহাতে জিদ করা না সে দেশটিকে অপমান করা। দেশ সমেত লোকে কেন বিরোধী হয়? জমিদারে টাকা দিবে তাহাতে প্রজার কি, সওদাগরের কি? আর মধ্যবিত্ত লোকের কি? বিশেষতঃ এই টাকা লইয়া তো সৎকার্যে ব্যয় হইবে? রাস্তা ত মহোপকারী জিনিষ?

রথ্যাকর স্থাপন করিলে যে গবর্নমেণ্টের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে তাহা বলিয়া সকলে এই করের বিরোধী তাহা নয়। গবর্নমেণ্ট টাকা লইয়া কি করেন তাহা দেশের লোকে জানিতে পায় না, আর জানিতে পারিলেও উহাতে কাহারো বাক্যব্যয় করিবার সাধ্য নাই। গবর্নমেণ্টের ভাণ্ডারে যে টাকাটি যাইবে তাহার সহিত দেশের লোকের সম্পর্ক ঐ পর্যন্ত। কাজেই টাকা চাহিলেই লোকের সন্দেহ হয়।

যত দিবস গবর্নমেণ্ট লোকের মত না লইয়া অর্থব্যয় করিতে থাকিবেন তত দিবস লোকে কোন করই ইচ্ছাপূর্বক দিবে না, লোকের ইচ্ছামত গবর্নমেণ্ট ব্যয় করুন, টাকায় অনটন হইলে লোকে যেরূপ করিয়াই হউক টাকা দিবেক। এখন ঘটা বেরিয়া ইনকাম ট্যাক্স দিতে লোকের মর্মান্তিক হইতেছে কিন্তু তখন লোকে সন্তান বিক্রয় করিয়া টাকা দিবে...

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট অত্যাচার করিলে আমাদের তখন একমাত্র উপায় পার্লিয়ামেন্ট, জমিদারি সংক্রান্ত ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের রাজনীতি বোঝা গিয়াছে অতএব এক্ষণে পার্লিয়ামেণ্টের মন নরম পক্ষে প্রাণপণ চেষ্টা কর্তব্য। আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য ইংলণ্ডে এক জন ইংরেজ ও এক জন এদদ্দেশীয় মুক্তিয়ার রাখা। তাহা জমিদারেরা মনে করিলে অনায়াসে করিতে পারেন।

১৭ মার্চ ১৮৭০

ভূমির কর বৃদ্ধি, না ইনকাম ট্যাক্স?

আমাদের কাছে কি প্রার্থনীয়, ভূমির করবৃদ্ধ না ইনকাম ট্যাক্স? গবর্নমেণ্ট কর বৃদ্ধি করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই পর্যন্ত গবর্নমেণ্টের আয় বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, ও গবর্নমেণ্ট সেই পরিমাণে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন। এখন বার্ষিক আয় বৃদ্ধি না হইয়া হঠাৎ কিঞ্চিৎ কমিয়া গিয়াছে। যে অহিফেনের বাক্স পূর্বে ১৬ শত টাকায় বিক্রয় হইত, এক্ষণে তাহা ১১৫০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। ব্যয় যেরূপ সেরূপ রহিয়া গিয়াছে। কাজেই কর বৃদ্ধি না করিলে কি প্রকারে চলে। অবশ্য ব্যয় কমাইলে চলে কিন্তু গবর্নমেণ্টের সেরূপ ইচ্ছাও নাই ক্ষমতাও নাই। গবর্নমেণ্টের ইংরেজ ভৃত্যগুলি এত বলবান যে তাহাদের লড়িতে সাহস হয় না, কিন্তু প্রকৃত কারণ এই। ব্যয় কমাইলে ইংরেজদিগের ক্ষতি আমাদের লাভ; আয় বৃদ্ধি করিলে আমাদের ক্ষতি ইংরেজদিগের লাভ। এরূপ অবস্থায় আমাদের গবর্নমেণ্টের কোন্ দিকে টান তাহা বোঝা যাইতে পারে।

রাজস্ব বৃদ্ধির আর উপায় না দেখিয়া গবর্নমেণ্ট ব্যাকুলিত হইয়াছেন। অহিফেনের দর কমাতে গবর্নমেণ্ট পাছে রাজস্ব কমে বলিয়া আরো ব্যাকুলিত হইয়াছেন। রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার আর কোন আশা নাই। শুল্ক কর্তৃক যে আয় বৃদ্ধি হইতেছে গবর্নমেণ্টের লোভ কি দরকার তাহা হইতে অনেক বেশি। লবণের আয় বৃদ্ধি আর হইবে না। এক্ষণ ইনকাম ট্যাক্স ও ভূমির কর যদি বৃদ্ধি করা যায়। ভূমির বন্দোবস্ত প্রায় সর্বত্রই হইয়াছে, সুতরাং ইহা দ্বারা যে আয় বৃদ্ধি হইবে তাহার ভরসা করা যায় না। তবে জমিদারদিগের সহিত যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে তাহা যদি ভঙ্গ করা যায় তবে চারি কোটি টাকা স্থানে গবর্নমেণ্ট উহার কর বৃদ্ধি করিয়া সম্ভবতঃ ছয় কোটি টাকা আয় করিতে পারেন। কিন্তু এক্ষণ কথা হইতেছে আমাদের দেশীয়গণ ইনকাম ট্যাক্স চান, না জমিদারদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাহাতে ভঙ্গ হয় তাহাই চান? ইনকাম ট্যাক্সের মূলগত প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। প্রজামাত্রেরই রাজ্য শাসনার্থে কিছু কিছু সাহায্য করা কর্তব্য। সুতরাং আয় অনুসারে যদি প্রজার নিকট হইতে কর লওয়া হয় তবে তাহাকে অন্যায় রাজনীতি বলা যায় না। যদি গবর্নমেণ্ট একটু যত্ন ও মনোযোগ দেখান তবে ইনকাম ট্যাক্স সংগ্রহ করিতে এখন যে সকল অত্যাচার হয় তাহা সহজেই নিবারণ হইতে পারে। যাহারা ট্যাক্স দিতে পারগ, যদি সুদ্ধ তাহাদের নিকট হইতেই কর লওয়া হয়, তবে কেনই বা অত্যাচার হইবে? যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যায় তবে দুর্বৃত্ত ইংরেজগণের অত্যাচার প্রতিরোধার্থে আমাদের যে এক দল স্বাধীন ধনী ব্যক্তি আছেন তাহাদিগকে হারাইতে হইবে। দেশ যতদূর নির্ধন হইতে হয় হইয়াছে। মোটা চাকুরীগুলি ইংরেজদের' হাতে, ব্যবসায় ইংরেজদের, বাণিজ্য ইংরেজদের ও অন্যান্য অর্থাগমের যতগুলি পথ আছে তাহাও সমুদয় ইংরেজরা

একচেটিয়া করিয়াছেন। যাহা কিছু আমাদের আছে সে কেবল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী জমিদারিগুলি। এমত অবস্থায় আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি যে, ইনকাম ট্যাক্স না ভূমির কর বৃদ্ধি প্রার্থনীয়?

৯ জুন ১৮৭০

জমিদারগণ

আপাতত ডিউক অব আর্গাইল যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, লর্ড কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তের অর্থ যদি তাহাই হয় তবে জমিদারগণের ইহার দ্বারা যে বিশেষ কোন উপকার হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। ইংলিশ গবর্নমেণ্ট কি অবস্থায় জমিদারগণের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া আবার বলিবার প্রয়োজন নাই। ফল এরূপ বন্দোবস্ত না করিলে গবর্নমেণ্টের এতদিন দেউলে হইতেন কিন্তু প্রজা সাধারণের পক্ষে এটি ভারি অনিষ্টকর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্ভবতঃ ৩ কি ৪ কোটি লোককে গ্রাসাচ্ছাদন হইতে বঞ্চিত করিয়া এক লক্ষেরও কম ব্যক্তির লক্ষ্মীভাগ্য বাড়াইতেছে, দরিদ্র ও অশিক্ষিত প্রজারা স্বার্থপর জমিদারগণের অধীনে না থাকিয়া গবর্নমেণ্টের অধীনে থাকিলে তাহারা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সুখী হইত এবং সেই সঙ্গে দেশের অর্থ সম্বন্ধে অনেক উন্নতি হইবারও সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এটি প্রজাতন্ত্র দেশ নয়। আমাদের রাজা স্বেচ্ছাচারী না হন সর্বেসর্বা এবং এই নিমিত্ত দেশের মধ্যে এমন একটি প্রবল শক্তির আবশ্যক যাহা প্রয়োজন মত রাজার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারে। আমাদের শোণিত কর্তৃক বর্ধিষ্ণু জমিদারগণ দ্বারা এই অভীষ্টটি সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপময় একদল স্বাধীন ভূম্যধিকারী প্রজা আছেন এবং সেখানে রাজনীতির যে সমুদয় হিতকর পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিরই প্রবর্তক ইহারা। জমিদারেরাও যে দেশের এইরূপ মঙ্গল করিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত অন্যায় নহে। কিছুদিন পূর্বে এই মঙ্গল প্রত্যাশা করিয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ইংলিশম্যান প্রভৃতি জমিদার শ্রেণির সপক্ষতা করিতেন, এক্ষণ যাহারা ইহাদের সপক্ষ, তাহাদের অনেকের মধ্যে এই প্রত্যাশাটি আছে। কিন্তু ইংলিশ গবর্নমেণ্ট ভারি প্রভুত্বপ্রিয়, রাজশাসনের উপর প্রজার কর্তৃত্ব তাহাদের নিকট হিতকর বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রার্থনীয় হইতে পারে না। জমিদারগণকে দমন করা সুতরাং এখনকার রাজনীতির প্রধান প্রকৃতি। ১০ আইন দ্বারা জমিদারেরা পূর্বাপেক্ষা অনেক খর্ব হইযাছেন, ইনকাম ট্যাক্স দ্বারা রাজস্ব ভিন্ন অন্য উপায়ে তাহাদিগের নিকট অর্থ লওয়া হইতেছে, এবং রথ্যা ও শিক্ষাকরও তাহাদের দিতে হইবে এইরূপ সাব্যস্ত হইল। আমরা জানি না, জমিদারগণের সঙ্গে আর অন্যান্য প্রজাগণের সঙ্গে এক্ষণে আর অধিক বিশেষ কি থাকিল। ফল রাজার সঙ্গে প্রজার যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে প্রয়োজন মত অর্থ চাহিলে রাজার নিষ্পীড়ন করা হয় না, তবে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদার রাজস্ব ভিন্ন অন্য কোন কর দিতে দায়ী কিনা সে বিষয়ে ভারি সন্দেহ আছে।

সে যা হউক, অনেকের বিশ্বাস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারেরা রাজস্ব সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের নিকট বিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় আমাদের গবর্নমেণ্ট অন্যত্র প্রজার সঙ্গে যে হারে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়াছেন এখানে

তাহা অপেক্ষা কম হারে বন্দোবস্ত করেন নাই। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ২৪ পরগণায় গবর্নমেণ্ট প্রতি বিঘায় চারি আনা দশ পাই, যশোহরে দুই আনা দশ পাই, নদীয়ায় দুই আনা আট পাই হিসাবে রাজস্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু সে বৎসর ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে ইজারার যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে প্রতি একরে ছয় আনা হারে রাজস্ব নির্ধারিত হয়। এক একর তিন বিঘা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, সুতরাং প্রেসিডেন্সি বিভাগের জমিদারেরা মধ্য প্রদেশের ইজারাগণ অপেক্ষা উচ্চতর হারে রাজস্ব দেন। রাইপুরে ষ্টিক সাহেব নাম করিয়া এক জন স্যর রিচার্ড টেম্পলের নিকট ফি বিঘা পাঁচ পয়সা হারে ১২।১৩ শত বিঘা ভূমি বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহাতে যে সেগুন গাছ ছিল, তাহাতেই উক্ত সাহেব জমিদারির যে মূল্য হইবে অন্যূন তাহার পাঁচ গুণ অর্থ পান। তাহার পর চ্যাপম্যান নামক আর এক জন সাহেবও এইরূপ আর একটি জমিদারির বন্দোবস্ত করেন। এক জন ফরাসির সঙ্গে ইহা অপেক্ষা কিছু উচ্চ হারে আর একটি বন্দোবস্ত হয়। এখানে একবার আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, ১৭৯৩ সাল আর এক্ষণ ভারতবর্ষের অবস্থায় কত তারতম্য হইয়াছে। ফল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূমির যেরূপ দুরবস্থা থাকে, সাহেবগণ গৃহীত জমিদারিগুলির অবস্থা তাহার তুল্য দুরবস্থাপন্ন ছিল। সাহেবদিগের নিজ ব্যয়ে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জমিদারি ফেলিয়া পলায়ন করেন। ১৭৯৩ সাল অপেক্ষা যে এক্ষণ এ দেশের সহস্ররূপে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহা সত্ত্বে এরূপ কম হারে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়াও যেখানে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহাতে প্রথম যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তখন যে বাঙ্গালার জমিদারগণের বিস্তর ক্ষতি দিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই।

ফল জমিদারগণের সম্ভবতঃ জমিদারির লভ্যের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির উপর জমিদারগণের লভ্য। কিন্তু এদেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তির যে ক্রমে হ্রাস হইতেছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যখন আকবর ভারতবর্ষের বাদশা ছিলেন তখন তিনি ক্রমাগত ১৯ বৎসর-পরীক্ষা করিয়া দেখেন কোন্ ভূমিতে কত শস্য উৎপন্ন হয়। এবং আইন আকবরিতে লেখা আছে তখন প্রতি বিঘায় ১৫ মণেরও অধিক ধান্য জন্মিত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গবর্নমেণ্ট শতাধিক পরীক্ষা দ্বারা দেখেন কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে জন্মে এবং ক্যাপটেন নর্থকোট সাহেবের রাজস্ব সংক্রান্ত গ্রন্থে দেখা যায় যে গবর্নমেণ্টের পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে প্রতি বিঘায় সেখানে ১৪ মণ করিয়া ধান্য উৎপন্ন হয় এবং বাঙ্গালা রেবিনিউ রিপোর্ট যাহাই বলুন এখানে প্রতি বিঘায় ৭ মণের অধিক ধান্য উৎপন্ন হয় না। পূর্বে কৃষকেরা জমি ৪।৫ বৎসর পতিত রাখিয়া তাহা আবাদ করিত সুতরাং শস্য প্রচুর হইত। কিন্তু এক্ষণ দেশের জনসংখ্যা ও কৃষিকার্যের বৃদ্ধি দ্বারা ভূমি আর পতিত থাকে না সুতরাং ভূমির উৎপন্ন ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিলে জমিদারগণের লভ্য বৃদ্ধি হইবে কিন্তু যদি প্রজারা নিজ ব্যয়ে এটি করে তবে সে উৎপন্নের উপর ১০ আইনানুসারে জমিদারের দাবি চলিবে না। জমিদারেরা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া যদি উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করেন তবে যে লাভ হইবে সেটি যেরূপ সকলে বিবেচনা করেন বিনা ব্যয়ে ও অনায়াসে জমিদারগণ উপভোগ করিবেন না।...

২৮ জুলাই ১৮৭০

আমাদের চাষীরা

আমরা পল্লীগ্রামে বাস করি। সুতরাং কৃষকেরা কি অবস্থায় দিনপাত করিয়া থাকে, তাহা আমাদের বিশেষ জানিবার সম্ভাবনা। পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন, যাহারা পরিশ্রমী, তাহারা কখন কষ্ট পায় না। কিন্তু চাষাদিগের অবস্থা দেখিলে, এই বাক্য সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদের কৃষকের ন্যায় ঘোর পরিশ্রমী জাতি পৃথিবীর মধ্যে দৃষ্ট হইবে না, আবার ইহাদের তুল্য দৈন্যও বুঝি জগতে নাই।... কৃষক মাত্রেই প্রায় অন্ন বস্ত্রহীন, গৃহহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ সময়ই পর্ণ কুটীরে বাস করিতে হয়, সকলের ঘরে আবার আবশ্যকীয় খড়ও নাই। পরিধেয় বস্ত্র একখানি ভিন্ন দুখানি কাহারও ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। প্রায় কৃষক মাত্রের অর্ধাশনে কি অনশনে দিনপাত করিতে হয়, অধিক কি ভোজনপাত্র ও জলপাত্র পর্য্যন্ত নাই। এই হৃদ্‌বিদারক অবস্থায় ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত ভূতানন্দী পরিশ্রম।... ক্যারোলিনার দাসগণের অবস্থা কি ইহা অপেক্ষা মন্দ।

পূর্বাপেক্ষা চাষিরা এক্ষণে কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। পূর্বে চাষীদের মজুরা তিন পয়সা কি চারি পয়সা ছিল, এক্ষণ উহা দ্বিগুণেরও বেশি হইয়াছে। পূর্বে জমি প্রায় পতিত থাকিত, এক্ষণ এমন একখানি জমি দেখা যায় না যাহা উঠিত না হইয়াছে। কিন্তু তেমনি আবার জিনিষ এক্ষণ ভয়ানক মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে আমরা ৫ মণ করিয়া ধান্য বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি, এক্ষণে ১।।০ মণ পাওয়াও সুকঠিন। সুতরাং চাষীরা যদি কিছু উন্নতি করিয়া থাকে, তবে সে অতি কম। কিন্তু চাষাদের এক্ষণ একটি ভয়ানক অসুবিধা হইয়াছে। চৈত্র মাসের শেষ কি বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে ইহাদের কর্মের সূত্রপাত হয়। পূর্বে আম কাঁটাল প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, এই সকল ভক্ষণ করিয়া ইহাদের কষ্টের অনেকটা লাঘব হইত, কিন্তু ১৮৫৯ সালের ২ জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে এত বৃক্ষাদি ভূমিসাৎ হয়, যে চতুর্থাংশ বৃক্ষও আছে কি না সন্দেহ। তাহার পর উপর্য্যুপরি কয়েকটি ঝড় হওয়ায় আম্র, কাঁটাল বৃক্ষ প্রভৃতি যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহার একরূপ উচ্ছিন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। চাষাদের জীবিকা নির্বাহের এই উপায়টি না থাকাতে তাহাদের কর্মের বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই হতভাগাদের দুর্দশার প্রথম কয়েকটি কারণ আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

প্রথম দৈব দুর্বিপাক। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে কৃষিকার্যের সুপ্রণালী নাই। কূপ কি খাল হইতে জল উঠাইয়া ভূমি সিঞ্চন করার রীতি আমাদের নাই। ভূমি হইতে জল বাহির করিয়া দিবার উপায়ও আমাদের চাষারা জানে না, সুতরাং দৈবের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। যদি বৃষ্টি অধিক হইল, শস্য ডুবিয়া গেল, অনাবৃষ্টি হইলে ফসল পুড়িয়া গেল। এক্ষণ প্রায় প্রতি বৎসরই এইরূপ ঘটিতেছে।...আবার আজ কয়েক বৎসর এ দেশে সংক্রামক জ্বর প্রভৃতি পীড়া প্রবেশ করিয়া অনেক চাষাকে একেবারে অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে, বিস্তর লোক প্রাণও হারাইয়াছে। ইহাতে কৃষিকার্যের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে। মাঝে মাঝে প্রবল ঝটিকা হওয়াতে ইহাদের দুর্দশার আর একটি কারণ বাড়িয়াছে।... এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে পর পর কয়েকটি ঝড় কর্তৃক তাহারা গৃহশূন্য হইল। কে জানে পুনঃ পুনঃ গৃহ সংস্কার করিতে গিয়া কত জন চির ঋণ পাশে আবদ্ধ হইয়াছে? ফল যতই অতিরিক্ত বিপদ আসিয়া উপস্থিত হউক, যদি অন্যান্য সুসভ্য দেশের ন্যায় সুশৃংখল কৃষি প্রণালী এদেশে প্রচলিত থাকে তবে সকল বিপদই অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারা যায়।...

দ্বিতীয়। জমিদারের অত্যাচার। সকল জমিদারই যে অত্যাচারী একথা আমরা স্বীকার করি না। ইহাদিগের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাহারা সমাজের আদর্শ স্বরূপ। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি কম। অধিকাংশ জমিদারগণই প্রজার উপর নিষ্পীড়ন করেন ও তাহাদের সর্বস্ব শোষণ করিয়া লন। কি কি উপায়ে জমিদারগণ প্রজার অর্থ দ্বারা আপনাদের উদর পূর্ণ করেন, তাহার কয়েকটি এখানে বলা যাইতেছে। প্রথম নিয়মিত খাজানা। ইহার আনুষঙ্গিক কষ্ট ও অর্থ ব্যয় আছে। যদি প্রজার খাজানা দিতে বিলম্ব হইল, তবে পেয়াদা নিযুক্ত করা হয়। পেয়াদা হতভাগ্য প্রজাকে কাছারির বাটীতে ধরিয়া আনিয়া যার পর নাই অপমান করে। তাহাকে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখে, প্রহার করিতে কখন কখন জুতান্ত পর্যন্ত করিয়া থাকে। তখন এই হতভাগাদের অবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। পেয়াদারা উহাদের নিকট হইতে চারি আনা কেহ বা আটা আনা করিয়া লইয়া থাকে। জমিদারেরা খাজানা ছাড়া জরিমানা স্বরূপ আরো কিছু প্রাপ্য হয়। দ্বিতীয় ভিক্ষা। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ কি পুত্র-কন্যা বিবাহ উপলক্ষে কি অন্য কোন বাবদে প্রজার নিকট হইতে প্রায়ই প্রতি বৎসর বিলক্ষণ কিছু লওয়াও হইয়া থাকে। তৃতীয় নজর। জমিদার মাঝে মাঝে জমিদারিতে গমন করেন এবং নজর স্বরূপ আচ্ছা দশ টাকা হাত মারিয়া আসেন। চতুর্থ জমিদারির মধ্যে স্কুল, ডিস্পেন্সারি, পুষ্করিণী, বাঁধ কি অন্য কোন কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জমিদারের বেশ লাভ আছে। ইহাতে যে ব্যয় হয় তাহার অতিরিক্ত প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হয়। জমিদারের অত্যাচারের এখানেই শেষ হইল না। বাকি খাজানা ও নিরিখ প্রভৃতির নালিশ আছে। প্রায় দুই তিন বৎসর অন্তর জমির খাজানা বৃদ্ধি করা হয়। যদি কৃষকেরা উহা দিতে অসম্মত হয় অমনি নিরিখের নালিশ রুজু করিয়া বসেন। এই ত গেল জমিদারের অত্যাচার, এতদ্ভিন্ন তাহার কর্মচারীদের অত্যাচার আছে। ইহারা হিসাব আনা, পার্বণী প্রভৃতি বার করিয়া বৎসরের মধ্যে চারি পাঁচ বার কিছু লইয়া থাকে। যদি প্রজারা দিতে না পারে তাহা হইলে খাজানার টাকা হইতে কাটিয়া লওয়া হয়। এইরূপ নানাপ্রকার অত্যাচারে কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। অনেকে সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য স্থানে উঠিয়া যায়।

তৃতীয় মহাজন। সাধারণতঃ মহাজনেরা যেরূপ অর্থগৃধ্নু ও কঠিন হৃদয়, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। কৃষক মাত্রেরই প্রায় প্রতি বৎসর মহাজনের আশ্রয় লইতে হয়, কারণ তাহাদের কাহারই মূলধন নাই। যে একবার মহাজনের নিকট ঋণে আবদ্ধ হইয়াছে, সে আর তাহা পুরুষ পুরুষানুক্রমেও শোধ করিতে পারে না, সুদের সুদ, তার সুদ এইরূপে অনন্ত কাল পর্যন্ত সুদ চলিতে থাকে। কর্জ কখন কখন টাকা পাওয়া যায়, কখন কখন শস্যও পাওয়া যায়। টাকা লওয়া হইলে সুদের স্থিরতা নাই। কৃষকের গরজ বুঝিয়া কেহ এক আনা, কেহ দুই আনা, কেহ চারি আনা পর্যন্ত সুদ লইয়া থাকেন। ধান্য কি অন্য শস্য দ্বারা যে কর্জ দেওয়া হয়, তাহাকে বাড়ী বলে। কৃষকের ঘরের ধান ফুরাইলে মহাজনের নিকট হইতে ধান লয় এবং নূতন ধান হইলে উহা প্রত্যর্পণ করে, মহাজনের সুদের স্বরূপ যত খুশি ধান দেন, তাহার দেড়া এবং কখন দুন লইয়া থাকেন, যদি খাতক ধান দিতে না পারে তবে উহার মূল্য স্থির করিয়া যত টাকা হয়, তত টাকা খত লিখিয়া লন। কৃষকের মহাজনের টাকা শোধ করিবাব একমাত্র উপায় শস্য বিক্রয় করিয়া। যে বার দৈব দুর্যোগে শস্য না জন্মে, সে বার কৃষকদিগের দুরবস্থার আর শেষ থাকে না। এদিকে জমিদারের উদর পূর্ণ করিতে হইবে, ওদিকে মহাজনকে ঠাণ্ডা করিতে হইবে, আবার নিজের পরিবারের

ভরণপোষণ করিতে হইবে, এই হতভাগাদিগের পরিবারও কম নয়। এতদ্ভিন্ন আরো খরচ আছে। নাপিতকে বার্ষিক দিতে হইবে, ধোপা কামার ছুতার ইহার সকলকেই কিছু কিছু করিয়া দিতে হইবে। এইরূপে কৃষকগণের ব্যয় আয় অপেক্ষা ঢের বেশি হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ কৃষকদিগের গরুই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। মহাজন যখন দেখিলেন, অন্য উপায়ে কর্জের টাকা আদায় হইল না, তখন ঐ গরু বিক্রয় করিয়া লন, কিন্তু দুর্ভাগা কৃষকের যে কি অবস্থা হইল, তাহার প্রতি একবার দৃকপাতও করেন না।

ফল কৃষকেরা জমিদার ও মহাজনের ক্রীতদাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত পরিশ্রম করিয়া ইহারা যাহা কিছু উপার্জন করে, তাহা সমুদয়ই প্রায় জমিদার ও মহাজনের উদরসাৎ হয়। বস্তুতঃ যাহারা সাধারণের এক হিতসাধক ও জীবনরক্ষক, তাহাদিগকে এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত করা কি মানবোচিত কর্ম? গবর্নমেন্ট ইহাদিগকে লেখাপড়া শিখিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছেন, কিন্তু তাহার পূর্বে ইহাদের অবস্থার উন্নতি করা কর্তব্য। যাহাদের অবস্থা কিছু ভাল, তাহারা আপন আপন সন্তানদিগকে গুরু পাঠশালা কি সাহায্যকৃত স্কুলে প্রেরণ করিয়া থাকে। অথবা উন্নত হইলে উহারা আপনারাই তাহা করিবে। তাহাদিগকে অন্নে বস্ত্রে সচ্ছল করুন, জমিদার ও মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত করুন, লর্ড কর্ণওয়ালিস যে স্বত্ব জমিদারদিগকে দিয়া গিয়াছেন, সেই স্বত্ব কৃষকদিগকে প্রদান করুন, যাহাতে তাহাদের কিছু মূলধন হয় তাহার চেষ্টা করুন, মহাজনের আশ্রয় লইতে হইলে যাহাতে অল্প সুদে টাকা পায় তাহার উপায় বিধান করুন, তখন জ্ঞান ও বিদ্যা উপার্জনের নিমিত্ত তাহারা আপনারাই লালায়িত হইবে। তখন তাহারা ব্যগ্র হইয়া নিজ নিজ সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

১ জুলাই ১৮৬৯

এদেশীয় দরিদ্র লোকের অবস্থা

ধান্য মৎস্য এবং গব্য বাঙ্গালীর জীবন আধার। আর এদেশে কি কুগ্রহ প্রবেশ করিয়াছে যে দিন দিন এই তিন নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইতেছে। আমরা পিতামহ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে. তাহারা দেখিয়াছেন এক টাকার ধান্য সারা দিন রাত্রি বহন করিয়া কেহ শেষ করিতে পারিত না। মৎস ও দুগ্ধ আমরা ২০ বৎসর পূর্বে অযচ্ছল দেখিয়াছি। কিন্তু সেই সোনার বাঙ্গালার এখন অবস্থা কি? লোকে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া বেড়াইতেছে। দুগ্ধ ঘৃত দেবদুর্লভ দ্রব্যের মধ্যে হইয়াছে এবং যাহারা ধনী তাহারাই কেবল মনের সাধে মৎস্য আহার করিতে পারেন।

চৈত্র হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত পল্লীগ্রামের লোকের অবস্থা প্রকৃত শোচনীয়। এমন একটি গ্রাম নাই যেখানে শতকে ২৫টি পরিবারের সচ্ছলপূর্বক আহার চলে, ৫০ ঘরের প্রায়ই দুবেলা আহার চলে না এং ২৫ ঘর লোক বোধ করি এ কয়েক মাস প্রকৃত কোন দিন উদর পূর্তি করিয়া চারিটি অন্ন পায় না। পল্লীগ্রামে যাহার কিছু সঙ্গতি আছে, তাহার বাড়ী এ কয়েক মাস মধ্যাহ্নে প্রত্যহ কাঙ্গালী বিদায় উপস্থিত হয়। লোকে ক্ষুধায় এমন কাতর হইয়া আইসে যে, অনেক সময় মুখের ভাত কেড়ে খেতে উদ্যত হয়। প্রকৃত তাহাদের অবস্থা দৃষ্টি করিলে বুক ফেটে যায়। অন্নাভাবে শরীর ক্লিষ্ট, পরিধান মলিন শতগ্রন্থীযুক্ত বস্ত্র, তৈল, অভাবে বিশেষ বিছানা না থাকায় মৃত্তিকায় শয়ন দ্বারা শরীর দিয়া

ভস্ম উঠিতেছে ও মাথার চুল সমুদয় জট হইয়াছে। মুখ মলিন, বিমর্ষ এবং এইরূপ প্রত্যেক গ্রামে ২০।৩০ জন মনুষ্য পাওয়া যায়। ইহারা সুন্দর বস্ত্র চায় না, সুকোমল শয্যা চায় না এবং আহার নিমিত্ত উপাদেয় দ্রব্য চায় না। ইহারা কেবল চারিটি নুন ও ভাত চায়, তাহাই পাইলে তাহারা স্বর্গসুখ লাভ করে। ইহার জন্য তাহারা দ্বারে দ্বারে অপমানিত, তিরস্কৃত, বিতাড়িত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। ফল এ সমুদয় লোক প্রায়ই সমাজের দরিদ্র শ্রেণির। ইহাদের দুরবস্থা বরাবর দেখা অভ্যাস আছে বলিয়া চক্ষে দেখা যায়। কিন্তু ভদ্রলোকের কষ্টের কথা মনে করিলে চক্ষের জল আইসে।

ভদ্রলোকের বৎসরে যাহা কিছু আয় হয়, এই সময় নিঃশেষ হইয়া যায়, শুধু সঞ্চিত ধন নিঃশেষ হয় না। পেটের দায়ে দুখানি একখানি করিয়া পরিবারস্থ স্ত্রীগণের অলংকার বাসন দোকানদারের করে নীত হয়। যে পর্যন্ত জল পানীয় ঘটীটি থাকে, সে পর্যন্ত তাহাদের আশা থাকে, মুখে একটু হাসি থাকে, শরীরে জীবনের চিহ্ন থাকে, কিন্তু ক্ষুধা কিছু মানে না, কিছুই বুঝে না। শেষে সম্পত্তির অবশিষ্ট পানীয় পাত্রটি, এমন কি নব প্রসূত বালকের হাতের রূপার বালা দুগাছা পর্যন্ত বাঁধা দিয়া যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা করে, শেষে আর কিছুই নাই তখন যিনি তাহাদিগকে দেখেছেন, দারিদ্র্য যে কি ভয়ানক শত্রু তাহা তিনি জানিয়াছেন, পাঠকগণ, আমরা যাহা বলিতেছি এ কবির বর্ণন না, বা আরব্য উপন্যাসও নহে। আমরা অহর্নিশি যাহা চক্ষে দেখিতেছি তাহাই লিখিতেছি। হয়ত বাঙ্গালার সকল গ্রামের অবস্থা এরূপ না হবে, যশোহরেরও সর্বত্র এরূপ দুর্দশা না হবে, জগদীশ্বর করেন নাই হয় যেন, কিন্তু আমরা যাহা লিখিতেছি তাহা যে অনেক ভদ্র গ্রামের অবস্থা সে বিষয় আমরা নিশ্চয় জানি। আমাদের দেশে যে দারিদ্র্য রাক্ষস প্রবেশ করিয়াছে এবং শত শত ভদ্র অভদ্র পরিবারের সুখশান্তি বিসর্জন দিতেছে, সে বিষয় যিনি যে কোন দশখানি পল্লীগ্রাম ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারই মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে।

এখন ইহার উপায় কি? গবর্নমেণ্ট প্রজার শান্তি রক্ষার জন্য অহরহ ব্যস্ত, তাহার বিদ্যাদান দিবার জন্য মহা ব্যস্ত এ সমুদয় জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এরা যে না খেতে পাইয়া মরে গেল? সেকালে ভদ্রলোকের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল এবং তাহাদের দানশীলতায় অনেকে জীবন ধারণ করিত, অনেকের পড়াই সদাব্রত ছিল, কিন্তু ইউরোপীয় বিদ্যাজ্যোতিতে এখন সে সমুদয় অন্তর্হিত হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট দরিদ্র লোকদিগের জীবন উপায় না করিলে ইহারা কাহার কাছে যায়। কিন্তু আমাদের রাজপুরুষগণের সকল বিষয় মনোযোগ আছে, কেবল প্রজার দুরবস্থা ব্যতীত। কোন গৃহে সিঁদ চুরি হইয়াছে শুনিলে তখনই রাজপুরুষগণের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া যায় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে অর্থব্যয় ও মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। আজকাল তাহাদের শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে কিছু মনোযোগ হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লোকে যে দ্বারে দ্বারে অন্ন অন্ন করিয়া বেড়াইতেছে সে বিষয় কেহ তল্লাসও লয় না। দুর্ভিক্ষতে উড়িষ্যায় সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হওয়ায় ইংলিশ গবর্নমেণ্ট ভারি লজ্জিত হন তাহাদের এবিষয়ে দেশ জুড়িয়া কলঙ্ক হয়। সেই অব্ধি আমরা শুনিয়াছিলাম যে, লোকে অন্নাভাবে আর কষ্ট না পায় তদ্বিষয়ে রাজপুরুষেরা মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু তবে লোকের এ দুরবস্থা কেন? দুর্ভিক্ষ ভীষণমূর্তি ধারণ না করিলে বুঝি ইহারা এ বিষয়ে প্রজার কষ্ট দূর করিবেন না। উড়িষ্যার মত মনুষ্য সমুদয় সহস্র সহস্র সংখ্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত না হইলে বুঝি রাজপুরুষগণ প্রজারা অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে মনে করেন না? ফল আমরা লর্ড মেওকে

বলি, তিনি যেন এ বিষয়ে আমাদের পূর্বেকার গবর্নর জেনারেলের মত তাচ্ছিল্য না দেখান। যখন উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে মনুষ্য সমুদয় হা অন্ন হা অন্ন করিয়া অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিতেছিল, ওদিকে সেই সময় আগ্রার দরবারে মহা ধুম। লর্ড মেওও কিছু আমোদ আহ্লাদ ভালবাসেন, তা বাসুন, কিন্তু আমরা আর কিছু চাই না, চারিটি উদর পূর্তি করিয়া অন্ন চাই, আর তিনি কটাক্ষপাত করিলে ইহার সুবিধা করিতে পারেন।

২৯ জুলাই ১৮৬৯

মহাজনের অত্যাচার

কিছুদিন গত হইল, এতদ্দেশে "সেবিংস ব্যাংক" হইবার প্রস্তাব হইতেছিল তখন আমরা বলি যে ওরূপ ব্যাংকের প্রয়োজন আমাদের তত হয় নাই। দরিদ্র ব্যক্তিগণকে টাকা ধার দিবার নিমিত্ত ব্যাংক করিবার প্রস্তাব আমরা করি, আমাদের দেশে সুদ অতিশয় বেশি, ইউরোপে, আমেরিকায় উচ্চতর সুদ শতকরা ।।০ আনা করিয়া, ।০ আনা করিয়াও পাওয়া যায়। এখানে সচরাচর টাকা লইতে গেলে ৩ টাকা ২ আনা সুদ দিতে হয়। পল্লীগ্রাম মাত্রেই প্রায় এই নিয়ম। নগরে আবার এরূপ নয়। সেখানে লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া সুদের তারতম্য হয়। শতকরা ১ টাকা সুদেও টাকা পাওয়া যায় আবার কখন শতকরা ৫০০ টাকাও সুদ দিতে হয়। এরূপ সুদ পশ্চিমাঞ্চলের শালওয়ালারা লইয়া থাকে। ইহারা শাল বিক্রয় করিতে আসিয়া সহরে সহরে একটি আড্ডা করিয়া এইরূপ সুদের টাকা কর্জ দিতে থাকে। আর একবার যাহারা তাহাদের টাকা স্পর্শ করেন, তাহাদের আর নিস্তার নাই।

কিন্তু সহরের বাবুদের বিষয় লইয়া অদ্য আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। দরিদ্র প্রজাদিগের সুসার সংগতি হওয়ায় একটি প্রধান কণ্টক মহাজনেরা। অজ্ঞ, অবিবেচক, অপব্যয়ী ও দরিদ্র প্রজারা ধার পাইলে আর সুদের দিকে তাকায় না। মহাজনেরা তাহাই বুঝিয়া ইচ্ছামত সুদ নিরূপণ করে। এ বৎসরের টাকা আগত বৎসরে যদি না দিতে পারে, তবে মহাজনেরা সমুদয় টাকার আর একখানা খত লয়। এক্ষণে সুদের সুদ চলিল। এইরূপে পিতার ধার পুত্রে পরিশোধ ও পিতার টাকা পুত্রে আদায় করে। প্রজার ধনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শস্যের বৃদ্ধি হয়, ও প্রজার দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে শস্যের হ্রাস হয়। এরূপ অবস্থায় মহাজনদিগের হস্ত হইতে প্রজাদিগের অব্যাহতি দেওয়ার কোন উপায় করা নিতান্ত কর্তব্য। মহাজনেরা যেরূপ সুদ ধরেন, সে পরিমাণে কখন আদায় হয় না। বরং যদি তাহারা বুঝিতে জানিতেন, তবে কম সুদের টাকা দিলে পরিণামে তাহাদেরি লাভ হইবার সম্ভাবনা।

যখন দেশে টাকা সস্তা হয় তখন সুদও সস্তা হয়। যে নগরে কি গ্রামে টাকা সস্তা, সেখানে সুদও সস্তা। অতএব কোন আইন কানুনের দ্বারা এ সুদ কমাইবার যো নাই, তবে যদি জেলায় জেলায় এক একটি ব্যাংক করা হয়, তবে প্রজাদিগের মহোপকার করা হয়, অথচ টাকাওয়ালাদিগের লাভ হয় কিন্তু এ ব্যবস্থা করে কে? অবশ্য গবর্নমেণ্ট নয়, গবর্নমেণ্ট নিজে টাকা পাইলে কর্জ করেন। আর সকল বিষয়ে গবর্নমেণ্টের কাছে প্রার্থনা করা উচিত নয়। আমাদের দেশের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত লোকের মনে এক্ষণে ব্যবসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে, তবে ইহারা অনেকে চাকুরে ও ইহাদের মূলধন কম বলিয়া টাকা ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হন, ইহারা জুটিয়া যদি পল্লীগ্রামে একটি ব্যাংক করেন, এবং সস্তা

সুদে টাকা দেন, তবে দেশের বিস্তর উপকার করিতে পারেন, তাহারাও বিস্তর লাভ করিতে পারেন।

১১ নভেম্বর ১৮৬৯

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অপলোপ

জনসমাজের এ সম্প্রদায়ী লোকগুলি দেশের পঞ্জর স্বরূপ, যত দেশের যত রূপ উন্নতি ও যত রূপ শুভকর্ম পরিবর্তন হইয়াছে, মধ্যবিত্তগণ প্রায়ই তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজা কি জমিদারগণ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া আত্মসম্ভূত বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হন। সুতরাং নিজ জীবনোপায় নিমিত্ত আত্মোৎকর্ষের প্রয়োজন করে না। জন্মাবধি অতি যত্নে ও সোহাগে লালিত হন এবং অর্থ সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়া একেবারে ভোগবিলাসে অবলিপ্ত হইয়া পড়েন, শিক্ষা ও অবস্থা নিবন্ধন চিরকাল স্বার্থ প্রতিই দৃষ্টিপাত করা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ দোষ হয়, কাজেই দেশ তাহাদের হস্তে অতি অল্প উপকার প্রত্যাশা করেন।

নিম্নশ্রেণীর লোকের অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত। তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি নানা কষ্টে লালিত হয় এবং যাবজ্জীবন অন্নচিন্তায় দিন অতিবাহিত করে। দরিদ্র পিতামাতা সন্তানের মানসিক কি অন্যবিধ উৎকর্ষ সম্পাদনার্থে অক্ষম হয়, তাহারা নিজেও সংসারে প্রবেশ করিয়া কেবল দারিদ্র্যের কঠোর যন্ত্রণার সঙ্গে পদে পদে সংগ্রাম করিয়া জীবন কাটায়। সুতরাং ইহাদের দেশের উপকার করিবার না থাকে অবস্থা না থাকে প্রবৃত্তি।

মধ্যবিত্ত লোকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে ইহাদের ধন্যাঢ্যগণের অবস্থার দোষের ভাগ থাকে না, অথচ গুণটি থাকে। ইহারা দরিদ্রগণের ন্যায় অন্নচিন্তায় দিবারাত্র জর্জরিত হন না, অথচ কর্মঠ হন, সুতরাং ইহারা যেরূপ আত্মোৎকর্ষের সুবিধা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, স্বীয় উন্নতির প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ইহারা সেইরূপ প্রবলভাবে অনুভব করেন। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোক সকল সময়েই সমাজে অধিক উপকারী রূপে পরিগণিত হন। এদেশের সৌভাগ্য অনেক অংশে এই শ্রেণির লোকের উপর নির্ভর করে। যদি কোন কালে এদেশে কোনরূপ সামাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব হয়, ইহাদের দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে। এখন দেশেতে যত রূপ শুভ সূচক কার্যের উদ্যোগ হইতেছে তাহা ইহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা ও পোষণ করা দেশহিতৈষী রাজার অতি কর্তব্য। কিন্তু এদেশে ক্রমে এই সমস্ত লোক অপলোপ প্রাপ্ত হইতেছেন।

মধ্যবিত্ত লোকের দুইটি জীবনোপায় ভূমিসম্পত্তি এবং চাকুরী এবং ইংরেজ শাসন প্রভাবে দুইটিই ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান করিতেছে।

মুসলমান রাজ্যকালীন প্রায় অধিকাংশ রাজকার্য এই সম্প্রদায়ী লোকে উপভোগ করিতেন। চাকুরী তাহাদের বৃত্তি স্বরূপ ছিল এবং পুরুষ পুরুষানুক্রমে তাহারা উহার স্বত্বাধিকারী থাকিতেন, সুতরাং পুরুষ পুরুষানুক্রমে অনেকের অবস্থা এ ভাবাপন্ন থাকিত। ইংরেজ রাজপুরুষগণ জাতিকুল বংশ মর্যাদা প্রতি তাদৃক দৃষ্টিপাত করেন না, লেখাপড়ায়

পারদর্শী হইলে যাকে তাকে যে কর্ম হউক না প্রায় নির্বিশেষে অর্পণ করেন, সুতরাং এক্ষণে অবস্থা অভেদে লোকে রাজকর্মে নিযুক্ত হইতেছেন এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ীর অন্নের অনেক প্রার্থী ও অংশী এক্ষণে উপস্থিত।

তাহাদের ভূসম্পত্তির প্রতিও এইরূপ অত্যাচার হইতেছে। মধ্যবিত্ত লোকগণ প্রায়ই গাঁতিদার। পূর্বে জমিদার প্রজার আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি ছিল, সুতরাং উভয় উভয়ের দুঃখ দরদ বুঝিতেন। জমিদারের অবস্থার তারতম্য হইলে প্রজা তাহাকে যথাসাধ্য অর্থদ্বারা সাহায্য করিতেন ও প্রজার অবস্থার ভালমন্দ হইলেও জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও তাহার দুরবস্থা বুঝিতেন। রাজপুরুষগণের ১০ আইনে জমিদার প্রজার এই শুভকর সম্বন্ধটির উচ্ছেদ করিয়াছে। অথচ পরস্পর পরস্পরকে অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা উভয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। জমিদারগণ প্রবল, সুতরাং প্রজাগণ এরূপ বন্দোবস্তের হিতকর ফলে উপভোগী না হইয়া প্রত্যুত এক্ষণ পদে পদে অনিষ্টকর ফলে জর্জরিত হইয়াছে। ১০ আইনের নিমিত্ত গাঁতিদারগণ একপ্রকার উচ্ছিন্ন গিয়াছেন এবং যাহারা বজায় আছেন, তাহারা জমিদারগণের সম্পূর্ণ কৃপার অধীন। মনে করিলে মুহূর্ত মধ্যে তাহারা গাঁতিদারগণকে সর্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। যশোর ও নদীয়ায় সৌভাগ্যশালী গাঁতিদার অতি কম আছেন। এমন কি অনেককে এক্ষণ অন্নকষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে হয়।

এদেশে পল্লীগ্রাম মাত্রেই দুই এক জন মধ্যবিত্ত লোকের বাস, এবং যিনি কখন ইতিমধ্যে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন ইহাদের কেমন ভগ্নদশা। প্রায় অনেকের গৃহ ইষ্টক নির্মিত, এমন কি অনেকের গৃহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, কিন্তু সকলই প্রায় ভগ্ন হইয়া পতিত হইতেছে। বক্ষ বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা বনাকীর্ণ হইতেছে। বাটীতে আর লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্ট হয় না, অপিচ অপরিষ্কার, বন, পূর্তিগন্ধ সম্বলিত প্রাসাদ, প্রভৃতি দারিদ্র্য দশার চিহ্ন লক্ষিত হয়। যাহাদের পিতামহগণ দান ধ্যানে দেশমান্য ও প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণের হয়ত দিনান্তে এক সন্ধ্যা আহার সংগ্রহ হওয়া কঠিন। অনেকেই দুর্দশান্বিত হইয়া কখন কখন ঘৃণাস্কর জীবিকা দ্বারা উদর পূর্তি করিতেছেন। অনেক সময় অবস্থা দৃষ্টে অনেকে তাহাদের নিজ পরিচয়ও বিশ্বাস করে না। ফল উভয় দিক হইতে মধ্যবিত্ত লোকদিগের শোণিত শোষণ করিয়া জমিদার ও দরিদ্র প্রজাগণ পুষ্টি বর্ধন করিতেছে এবং ক্রমে সমাজের এরূপ হিতকর সম্প্রদায়ী অন্তর্হিত হইতেছে।

ইংরেজের ন্যায় এদেশে ধনের সচ্ছলতা নাই এবং মহাজনের অপ্রতুল, নতুবা বোধ হয় এত শীঘ্র মধ্যবিত্ত লোকগুলির এরূপ দুর্দশা হইত না। ইহারা স্বভাবত বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী। বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধা পাইলেই ইহারা অনায়াসে সসম্ভ্রমে থাকিবার যত্ন পাইতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের রাজপুরুষগণের দৃষ্টি জমিদার ও দরিদ্র প্রজাদিগের প্রতিই আবদ্ধ। তাহারা ঈর্ষার সঙ্গে জমিদারগণের সচ্ছলতা ও দুঃখের সহিত দীন দুঃখী প্রজাগণের কষ্টের কথা চিন্তা ও তাহার প্রতিবিধানের যত্ন পান। মধ্যবিত্ত লোক যে একটি সম্প্রদায়ী আছে, তাহা তাহারা বোধ হয় জানেন না সেখানে তাহারা থাকিল কি মরিল সে বিষয় যে চিন্তা করিবেন, তাহার সম্ভাবনাই ত নাই। এমন কি যখন ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইল, তখন গাঁতিদারগণের স্বত্ব আইনে গণ্য হইল না, অথচ শতকে ৭৫ জন ভদ্রবংশজাত লোক এই শ্রেণির প্রজা এবং দেশের যত কিছু মঙ্গল সম্ভব, প্রায় সমুদয়ই ইহাদের উপর

নির্ভর করে। আমাদের প্রস্তাব ক্রমে বৃহৎ হইল বলিয়া আজ এখানে ক্ষান্ত দেওয়া গেল।

৯ ডিসেম্বর ১৮৬৯

প্রজার পক্ষে কে কথা বলে?

...সম্প্রতি হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক পল্লীগ্রামের উপজীবিকা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাবে এই স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগের আহার সম্বন্ধে কোন কষ্টই নাই এবং তাহারা সুখে আছে। তিনি এক জন ইংরেজ মহাপুরুষের বাক্যকে বেদমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই অলীক মত প্রচার করিয়াছেন। উক্ত ইংরেজ (ডাক্তার বেডফোর্ড) বলেন যে, পল্লীগ্রামের লোকেরা পরম সুখে ভোজন করে, তাহাদের কোন কষ্ট নাই। সেই পরম সুখ কিরূপ তাহাও তিনি বলিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবারের গড়ে পাঁচ জন করিয়া লোক ও ৫ টাকা করিয়া আয় ধরিলে দেখা যায় প্রতি পরিবার ৪ টাকায় অন্ন পান সম্পাদন করে ও এক টাকা প্রতি মাসে সঞ্চিত হয়। ডাক্তার পরম দয়াবান, আবার এক টাকা সঞ্চয়ও করিতে দিয়াছেন। আহার সম্বন্ধে এক তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি মৎস্য মাংস দুগ্ধ এবং অন্নব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া থাকে। ইহারা আবার কুলী। যদি ইহাদের প্রত্যেকের চারি আনা করিয়া রোজ ধরা যায় তাহা হইলে মাসিক ৭।।০ আয় হইয়া থাকে। যদি ঐ কুলীদিগের স্ত্রী পুত্র না থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তাহারা পরম সুখে ভোজন করে। কিন্তু যদি অন্য তিন চারিটি পরিজনের ভরণপোষণ করিতে হয়, তবে সাত টাকায় সুখে ভোজন হয় না। এক জন লোকের অন্নবস্ত্রে যেরূপ ব্যয় হইতে পারে, তাহা আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি ঃ

চাউল ৩০ সের	দেড় টাকা	লবণ তৈল	৪ আনা	কাপড় গড়ে	৩ আনা
ডাউল অন্তত	৪ আনা	মৎস্য	৪ আনা	ধোপা নাপিত	২ আনা
তরকারি	৴ ৪ আনা	কাষ্ঠ	৬ আনা	গৃহ গড়ে	২ আনা
					৩ টাকা ৪আনা

আমরা গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি যে অত্যন্ত দুঃখের অবস্থায় থাকিলেও মাসে তিন টাকার ন্যূনে কখনই চলে না। পল্লীগ্রামে এক জন ভৃত্য রাখিতে হইলে যদি মোট ফুরান করা যায়, সে বেতন ছাড়া আহারের জন্যে আড়াই ও অত্যন্ত কসাকসি করিলে দুই টাকার কমে স্বীকার করে না। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ৫ জন পরিবার সংযুক্ত পরিজন ১৫ টাকায় ন্যূনে কখনই সামান্য অবস্থায় চলে না। বেডফোর্ড ১৮৪৮ খ্রিঃ কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা অদ্যকার বাজারে হাস্যকর ব্যতীত কিছুই বোধ হয় না। দশ বৎসর পূর্বে আমরাই দেখিয়াছি, দ্রব্যাদির যেরূপ মূল্য ছিল এখন তাহার দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ হইয়াছে। সুতরাং তখন এক জন লোকের এক টাকায় চলিত বলিয়া এখন সে কথা যুক্তি মধ্যে আনা কর্তব্য নহে। আমরা পূর্বে যে তালিকা দিলাম তাহা দর্শনে বোধ হইবে যে কেবল প্রাণ রক্ষার জন্য মাসে ৩ টাকা ৪ আনা ব্যয় ব্যতীত চলে না। একত্র চারি পাঁচ জন থাকিলে কিছু ব্যয় অল্প হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতেও আট বা দশ টাকা নিশ্চয়ই লাগিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের ইতর জাতীয়েরা কেহ প্রতি মাসে ৪ টাকা, কচিৎ কেহ তাহার দ্বিগুণ আয় করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের এক এক জনের চারি পাঁচটি করিয়া পরিজন; তাহাতে তাহারা কখনই সুখে থাকে না।... তাহাদের সন্তানগণ প্রায় দশ

এগার বৎসর পর্যন্ত উলঙ্গ থাকে।... শয্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।... তোষক বা লেপ অথবা ভাল তুলার বালিশ বোধ হয় কোন কৃষকের বা ইতর জাতির নাই।... কৃষকেরা যে উপযুক্ত অন্নবস্ত্র পায় না তাহা কেহই অস্বীকার করিতে সাহস করিবে না, কিন্তু এই অনুপযোগী আহারের ফল বর্তমান সংক্রামক পীড়া কিনা তাহা চিকিৎসাতত্ত্ববিদগণ অনুসন্ধান করুন, আমরা ইহা দেখিতেছি যে অর্থাভাব প্রযুক্ত ইতর লোকেরা ঔষধ সেবন করিতে পায় না সুতরাং পীড়াও শান্তি হয় না। আমাদের সহযোগী যে প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া পল্লীগ্রামের প্রজাদিগকে সুখী বলিয়াছেন, যদি এক বার স্বয়ং নাগর্য্য আসন পরিত্যাগ করিয়া কোন পল্লীতে আসিয়া তত্ত্বাবধান করেন, আমাদের বাক্যের যাথার্থ তাহার হৃদ্বোধ হইবে।

৮ ডিসেম্বর ১৮৭০

বাঙ্গলার আভ্যন্তরিক বাণিজ্য

গঙ্গাপ্রদেশে বঙ্গদেশ সর্বাপেক্ষা উর্বরা। কিন্তু উহার সকল বিভাগে সকল রকম শস্য সমান রূপে উৎপন্ন হয় না বলিয়া আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্বে এখানে বিস্তর নদী ও উপনদী বহতা থাকায় এই বাণিজ্য সহজে সম্পন্ন হইত। এক্ষণে সমুদয় দেশ ভরিয়া মরা নদীর চিহ্ন দেখা যায়, এমন কি ৪।৫ গ্রাম অন্তেই দুটি একটি চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হয়। ফলে গঙ্গানদীর ডেল্টা ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছে। ভূমিভাগ সমুদ্র মুখ অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং বাঙ্গালার উপরিতন ভাগের নদীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। এই কারণ বশতঃ এদেশে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের বিস্তর বাধা ঘটিয়াছিল, এমন কি কোন এক অঞ্চলে ধান্য না হইলে, সে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের লক্ষণই উপস্থিত হইবার উপক্রম হইত। কিন্তু এইক্ষণ যে সকল ভাগে রেল হইয়াছে, সে সকল স্থানে এরূপ বিপত্তির সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। অধিকন্তু আভ্যন্তরিক বাণিজ্য সাধারণতঃ রেলওয়ে কর্তৃক যে অদ্ভুত উপকার প্রাপ্ত হয়, তাহাও হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যও রেলওয়ে হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সেই সাহায্য প্রকারান্তর ও পরোক্ষে হয় বলিয়া সে সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলা প্রয়োজন। জাতীয় অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, কোন দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে দুটি বিষয়ের সংযোগ প্রয়োজন— উপযুক্ত পরিমাণে কৃষিকার্য ও তদনুযায়ী বন্দর ও নগরের সংখ্যা, নগর ও বন্দর অভাবে কৃষিকার্য কেবল যৎসামান্য রূপ ফলিতে পারে। যদি কৃষকের ক্ষুধা নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহারা কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তি উপযোগী শস্য উৎপন্ন করে। কিন্তু যদি তাহাদের আয়ত্তে এরূপ সহর বন্দর থাকে, যেখানে শৈল্পিক ও অন্যান্য রূপ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়, তাহারা সহজেই সেই সকল দ্রব্য সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, সুতরাং পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে সমৎসুক হয়। ওদিকে আবার অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হইলে, শৈল্পিক ও অন্যান্য নাগরিক জিনিষপত্রাদির আধিক্য হয়। এইরূপ কৃষিকার্যে এবং শহর বাজারের জিনিস পত্রে উপযুক্ত অনুপাত থাকিলে দুয়েরই উন্নতি হয় এবং দেশের মোট অর্থের বৃদ্ধি হইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধে হয়। আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতির সঙ্গে তুলনা করিলে সহর বন্দরের সংখ্যা কম। উহা বৃদ্ধি করার কয়েকটি উপায় গবর্নমেণ্ট আড্ডা, রাস্তা, খাল ও রেলওয়ে স্থাপন করা; কিন্তু কেবল দেশের অর্থ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে

গবর্নমেণ্ট মহকুমা সৃষ্টি করিতে পারেন না। রাস্তা ও খাল প্রস্তুত করিলে এ অভাবটি অনেকাংশে পূর্ণ হইতে পারে। বাঙ্গালার রাস্তা ও খালের সংখ্যা অতি কম ইহাতে গবর্নমেণ্টের তত বেশি ব্যয় হইবে না। আমাদের দেশে বিস্তর বিল, বাঁওড়, মরা নদী আছে, সেই সকল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দিলে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের বিস্তর সাহায্য হয়। ইহাতে যদি গবর্নমেণ্টের কিছু কর বসাইতে হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।*

২০ আগষ্ট ১৮৬৮

ধানের ফসল

আমরা এই ১০ বৎসরের ধানের ফসল মনোযোগপূর্বক দেখিয়া একটি টের পাইয়াছি। আমন, আউশ দুই খাদ্যই এক বৎসর ভাল হয় না। যেবার আশু ধান্য ভাল সেবার আমন মন্দ। ইহার মানে কি? ঈশ্বর কি কৃপণ! আমাদের ঘরে অধিক ধান্য আইলে কি ঈশ্বর বেজার হন? তাহা নয়। আশু ধান্য অধিকন্তু রস পান্তা জমিতে হইয়া থাকে। আমন ধান্য এঁটেল জমিতে। অধিক রৌদ্র হইলে, সুতরাং আশু খাদ্যের তত ক্ষতি হয় না আমন ধান্যের সর্বনাশ হয়। আবার অধিক বৃষ্টি হইলে আমনের তত ক্ষতি হয় না। আশু ধান্যে হয় পোকা ধরে নতুবা মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়। আর তাহাও না হয় চারাগুলি হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায়। শ্রাবন মাসে বৃষ্টি না হইলে আশু ধান্যের তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমন ধান রোপণ করা যায় না, আর যাহার বৈশাখ মাসে বুনান হইয়া থাকে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়।

এক্ষণকার কালে দেশের কি ভাব হইয়াছে যে বৎসর বৎসর মন্বন্তরার ভয়। বৃষ্টি এরূপ অনিশ্চিত ও খামখেয়ালি যে স্রোতের ন্যায় পড়িবে নতুবা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সময় ইহার কিছু সতর্ক হওয়া উচিত কি না? আর কত দিন এরূপ সংশয় চিত্তে দিন যাপন করা যায়। এ সমুদয়ের উপায় গবর্নমেণ্ট কি বেশি করিবেন। দেশের লোকের করা উচিত। গবর্নমেণ্টের একটি কর্ম করা উচিত ও উহাতে তিনি প্রখর্য হইয়াছেন। খাল খনন করা, আর দেশের উপ্পর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নয়। আপাতত বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে যে জলসিঞ্চন কল আছে তাহাই এখানে প্রচলিত হইলে অনেক কাজে লাগে। যত দিন আর ভাল করা না পাওয়া যায় তত দিন ইহার দ্বারাই চলিবে। আর একটি উপায় আছে। ইহা জমিদারেরা তালুকদারেরা মহাজনেরা অনায়াসে মনে করিতে পারেন। গোধুমের চাষ প্রচলিত্ করা। সকল দেশে তণ্ডুলের স্থানে গোধুমের প্রচলন হইতেছে আর একদিন কাল আমরা যদিও একেবারে তণ্ডুল পরিত্যাগ না করি ইহা অপেক্ষা যে অধিক পরিমাণে গোধুম ব্যবহার করিব তাহার সন্দেহ নাই। গোধুমও এদেশে উত্তম হয়। এত উত্তম হয় যে চাষীরা বীজ পাইলে, আর গোরুর উৎপাত না থাকিলে অতি যত্নের সহিত ইহার ফসল করে। এক্ষণে আমাদের দুইটি ফসলের উপর নির্ভর অর্থাৎ আশু ও আমন ধান্য, গোধুম প্রচলিত হইলে তিনটি ফসল হইবে ও মন্বন্তরার ভয় অবশ্য নিহাইত পক্ষে ইহা অপেক্ষা কমিবেক। সুতরাং ধানের জমিতে গোধুম ভাল হয় না।

১৯ আগষ্ট ১৮৬৯

* এই প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭। ৯ জুন ১৮৭০ সংখ্যক 'পত্রিকায় পুনরায় প্রকাশিত হয়।'

সঞ্জীবনী

প্রজা ভূম্যধিকারী আইন

প্রজা ভূম্যধিকারীর বর্তমান সম্বন্ধ যে কোন ক্রমে সুখকর নহে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অসুখকর অবস্থা যাহাতে বিদূরিত হয়, সর্বপ্রথমে জমিদার পক্ষ হইতেই তাহার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রজার নিকট হইতে জমিদারেরা যাহাতে সহজে খাজানা আদায় করিতে পারেন, এইরূপ একটি আইন করিবার নিমিত্ত জমিদার সভা বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টকে প্রথমে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অনুরোধের বশবর্তী হইয়াই স্যর রিচার্ড টেম্পল প্রজা ভূম্যধিকারীদিগের বর্তমান সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৬ অব্দের আগস্ট মাসে তিনি এক আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করেন। প্রজাদিগকে কতকগুলি নূতন অধিকার দেওয়া এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ১৮৭৭ অব্দে তাহাকে বোম্বাইয়ের গবর্নর হইয়া হঠাৎ চলিয়া যাইতে হইল। স্যর অ্যাসলি ইডেন তাহার উত্তরাধিকারী হইলেন। স্যর অ্যাসলি জমিদারদিগের বন্ধু, তথাপি তিনি প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ সন্তোষজনক রূপে নির্ণয় করিবার আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে সমর্থ হইলেন না, তিনিও এ বিষয়ে একটী নূতন আইন করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন।

স্যর অ্যাসলির পরামর্শ মতে ১৮৭৯ অব্দের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট একটি বিশেষ কমিসন নিযুক্ত করিলেন। যেরূপ ভাবে আইন করিলে প্রজা ভূম্যধিকারীর গোলযোগ নিবারণ হইতে পারে, কমিসন সবিশেষ সমুদায় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া সেইরূপ একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবেন, কমিসনের উপর এইরূপ ভার দেওয়া হইল। কমিশন ১৮৮০ অব্দে তাহাদিগের রিপোর্ট গবর্নমেণ্টের নিকট প্রদান করেন। জমিদারেরা যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কমিসনের রিপোর্ট তাহার বিপরীত হইল। জমিদারেরা তাহাতে বিরক্ত হইলেন। তদবধি জমিদার পক্ষের লোকেরা বলিয়া আসিতেছেন, প্রজা ভূম্যধিকারীর বর্তমান সম্বন্ধ কোন অংশে অপ্রীতিকর নহে, তাহাদিগের উভয়ের সম্বন্ধ পুনর্নির্ধারণ করিবার জন্য কোন আবশ্যকতা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন এই কথা বলিতেছেন, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি জমিদারদিগের কাগজে এই কথা পুনঃপুনঃ উক্ত হইতেছে, বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং দ্বারভাঙার মহারাজা ব্যবস্থাপক সভায় এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাহাদিগের ধৃষ্টতা দেখিয়া অবাক হইতেছি। যাহারা আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্বে প্রজা হইতে খাজনা সহজে আদায় করিবার জন্য একটি নূতন আইন চাহিয়াছিলেন, তাহারাই আবার সেই আইনে আপনাদিগের স্বার্থহানি হইবার আশঙ্কা করিয়া তাহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। স্বার্থ যখন মানুষকে অন্ধ করে, তখন সত্যনিষ্ঠার প্রতি তত দৃষ্টি থাকে না। সুতরাং জমিদার পক্ষের কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ আশ্চর্য হইতেছি না। ভেকের রাজ্য প্রাপ্তির আশা যেরূপ পূর্ণ হইয়াছিল, জমিদারদিগের খাজনা সহজে আদায় করিবার আশাও সেইভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের বিরক্ত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহারা প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ করিবেন ইহা প্রত্যাশা করা গিয়াছিল, তথাপি জমিদার পক্ষের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একথা বলা আবশ্যক যে, তাহারা প্রস্তাবিত আইনের অনাবশ্যকতা

প্রদর্শনে যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা সুবুদ্ধি সম্মত কার্য্য হইতেছে না।

১৮৭১ হইতে ১৮৭৬ অব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা গবর্নমেন্টের শাসন কার্যের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এমন সকল ঘটনায় পরিপূর্ণ যে তাহা পাঠ করিলে প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ কোন অংশে সন্তোষকর একথা বলা যাইতে পারে না। তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর কলহ অত্যাচারের বহু ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। হিন্দু পেট্রিয়টের স্তম্ভ উদ্ঘাটন করিলে দেখা যাইবে, এখনও প্রজা জমিদারের মধ্যে পরস্পর কলহ চলিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে কোন পক্ষ দোষী যে বিচার এস্থলে কবা নিষ্প্রয়োজন। প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ যে সন্তোষকর নহে, কেবল তাহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। রেন্ট কমিসনেরা বহু অনুসন্ধানের পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রজাদিগকে কতকগুলি নূতন স্বত্ব প্রদান না করিলে এই অপ্রীতিকর অবস্থা কখনই দূর হইবে না, দুর্ভিক্ষ কমিসনের সভ্যগণও স্বতন্ত্র ভাবে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ক্রমান্বয়ে তিনজন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর, রেন্ট কমিসন, দুর্ভিক্ষ কমিসন ও দেশের অধিকাংশ লোকে যে মতের সমর্থন করিতেছেন, কয়েকজন জমিদার ও তাহাদিগের কতিপয় প্রতিপালিত লোকে সেই মতের প্রতিবাদ করিতেছেন। এই প্রতিবাদের যে অধিক মূল্য নাই ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য আর্থিক প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। জমিদার পক্ষের দ্বিতীয় প্রধান আপত্তি এই,—বোধ হয় ইহাই তাহাদিগের মূল আপত্তি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা ভূমির সম্বন্ধে প্রজাবর্গকে কোন নূতন অধিকার দেওয়া গবর্নমেন্টের ক্ষমতা নাই। উক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারেরাই ভূমির সর্বময় কর্তা হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমিদারদিগের এরূপ অধিকার নাই। ১৭৯৩ অব্দের ১ আইনের অষ্টম ধারায় ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, অধীনস্থ তালুকদার প্রজা ও কৃষক শ্রেণির হিতের জন্য গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে আইন করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা করিবার পক্ষে গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ অধিকার রহিল। কোর্ট অব ডিরেকটার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুমতি দান করিবার অব্যবহিত পূর্বেই ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, উপরি উক্ত অধিকার তাঁহাদিগের নিজ হস্তে জাত থাকিবে। ১৭৯৩ অব্দের ২২মার্চ তারিখে গবর্নমেণ্ট যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহাতেও স্পষ্ট লিখিত ছিল যে, গবর্নমেন্টের এই অধিকার পূর্বে আপনার হস্তে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলেও প্রজার মঙ্গল কামনায় গবর্নমেণ্ট কিছু করিতে পারিতেন না, একথা বলা যায় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কেবল জমিদার ও গবর্নমেন্টের মধ্যে চুক্তি হইয়াছিল, প্রজাকুলের সেই চুক্তির সহিত কোন সংস্রব ছিল না। গবর্নমেণ্ট জমিদারের সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ভূমি সম্বন্ধে প্রজার কোন স্বত্বের হানি হইতে পারে না। এক ব্যক্তির চুক্তি দ্বারা অপরের ন্যায্য স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, এরূপ চুক্তির নিয়ম কোন দেশে প্রচলিত নাই। এরূপ চুক্তি কখনও সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

১৭৯৩ অব্দের ১ আইনে গবর্নমেণ্ট জমিদারদিগকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, জমিদারেরা একমাত্র সেই অধিকারের বলে কখনই আপনাদিগের সৌভাগ্য এতদূর বৃদ্ধি করিতে পারিতে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বিশ বৎসর গত না হইতেই ১৮১২ অব্দে প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের সুবিধার নিমিত্ত গবর্নমেণ্ট এক আইন করিতে বাধ্য হন। এই আইনে বাকি খাজনার জন্য প্রজাদিগকে কয়েদ করিবার অধিকার জমিদারদিগের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

এই আইন প্রচলিত হইবার পর প্রজার উপর যে বিষম অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা গবর্নমেন্টের পুরাতন কাগজপত্র দৃষ্টে অবিসম্বাদিত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে আমরা নিশ্চয়

বলিতে পারি, প্রজাদিগের অনেক গুরুতর অধিকার ধ্বংস করিতে পারিতেন না। ১৭৯৩ অব্দের ১ আইনের পর গবর্নমেণ্ট যদি জমিদারদিগের সুবিধার জন্য অন্য আইন করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রজাদিগের সুবিধার জন্য কোন আইন করিতে অধিকারী হইবেন না কেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারেরা আপনাদিগের মঙ্গলের জন্য যদি অন্য কোন আইনের প্রার্থী না হইতেন, তাহা হইলেও তাহারা একবার বর্তমান আপত্তি উপস্থিত করিতে পারিতেন। জমিদারেরা যদি ইচ্ছা করেন যে, তাহারা কেবল ১৭৯৩ অব্দের ১ আইনের উপর নির্ভর করিবেন, তৎপরে যে সকল আইন প্রচলিত হইয়া তাহাদিগের অধিকার দৃঢ় ও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে তাহার ফলভোগী হইবেন না, আমাদিগের বোধ হয় প্রজাদিগের তাহাতে কোন আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে, প্রজা ভূম্যধিকারীর অনেক বিষয়ে স্বত্ব এরূপ অমীমাংসিত ও অনিশ্চিত রহিয়াছে যে, গবর্নমেণ্টের মধ্যবর্তিতা ব্যতীত সে গোলযোগ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন জমিদারদিগকেই অগ্রে গবর্নমেণ্টের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে হইবে।

এমনকি, এখনও প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ যেরূপ অনিশ্চিত ও অসন্তোষের অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট যদি বর্তমান মধ্যবর্তিতা পরিত্যাগ করেন, এবং তাহাদিগের উভয় পক্ষকেই বলেন যে, তাহাদিগের পরস্পরের স্বত্ব পরস্পরে নির্ণয় করুন, তাহা হইলেও জমিদারদিগের যত ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, প্রজার ক্ষতি তত হইবে না। প্রজার সংখ্যার তুলনায় জমিদারের সংখ্যা কত? প্রজাশক্তির তুলনায় জমিদারের শক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং বর্তমান বিরোধের মীমাংসা যাহাতে হইতে পারে, জমিদারদিগের তৎপক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করা সঙ্গত নহে, তাহাতে তাহাদিগের স্বার্থের অনেক হানি হইতে পারে। এই বিবাদ ভঞ্জন না হইলে কোন পক্ষেরই প্রকৃত মঙ্গল নাই; এই বিষয় সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই বলক্ষয় ও অমঙ্গল হইবে। প্রজা জমিদার উভয়ের মঙ্গলের জন্যই আমরা বলিতেছি, তাহাদিগের পরস্পরের স্বত্ব সুনিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। প্রস্তাবিত আইন এই স্বত্ব মীমাংসার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে তাহার প্রতিকূলতা করা অবৈধ।

প্রস্তাবিত আইনের সমালোচনা আমরা বারান্তরে প্রবেশ করিব।

২ বৈশাখ ১২৯০

বাঙ্গালার জমিদার-প্রতিনিধি

বাঙ্গলার জমিদার পক্ষের প্রধান রথী বাবু কৃষ্ণদাস পালের ব্যবস্থাপক সভায় প্রজা ভূম্যধিকারী আইন সম্বন্ধীয় বক্তৃতার কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা আবশ্যক। কৃষ্ণদাস বাবুর গৌরবপক্ষে ইহা বলা আবশ্যক যে, জমিদারদিগের স্বপক্ষে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তিনি তাহা বলিতে কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। যে সকল কথা গোপন রাখিলে মক্কেলদিগের পক্ষ সবল দৃষ্ট হইতে পারে, সাবধানতার সহিত তিনি তাহা গোপন রাখিয়াছেন। যে সকল কথার উত্তর চলে না, তিনি কোন স্থলেই তাহার উত্তর দানে প্রয়াসী হয়েন নাই। প্রতিপক্ষীয়েরা যে সকল যুক্তি পূর্বে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, পুনরায় সেই সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, জমিদারেরা এমন পরিপক্ক উকিল আর একটী পাইতেন না।

বঙ্গদেশের জমিদার প্রজা উভয়ের হিতার্থে প্রচলিত আইনের কোন পরিবর্তন হওয়া যে আবশ্যক নহে, বাবু কৃষ্ণদাস পাল একথা বলিতে সাহস করেন নাই। কেননা তাহা

হইলে পূর্বে যাহা স্বীকার করিয়াছেন এক্ষণে তাহা অস্বীকার করিতে হইত। তিনি বলিয়াছেন, উভয় পক্ষের হিতার্থেই প্রচলিত আইনের পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। তবে উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে যে সকল পরিবর্তন প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত নহে, তদ্দ্বারা জমিদারের স্বার্থ নাশ হইবে। কৃষ্ণদাসবাবু উভয় পক্ষেরই হিতার্থী হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্যকালে প্রজার হিতার্থে একটি কথাও বলেন নাই। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে যে সকল পরিবর্তন প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা প্রজার হিতকর হইলেও জমিদারের অনিষ্টকর বলিয়া তিনি ন্যায়ানুরোধে তাহা সমর্থন করিতে পারে নাই। কিন্তু জমিদারের অহিত না হইয়া প্রজাহিত হয় এমন কোন উপায় তিনি প্রদর্শন করিলেন না কেন? তিনি কি বলিতে চাহেন, যাহাতে প্রজার হিত হইবে, তাহাতে জমিদারের নিশ্চয়ই অনিষ্ট হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে জমিদার ও প্রজা উভয়ের মঙ্গলের জন্য প্রচলিত আইনের পরিবর্তন আবশ্যক, একথা তিনি কিরূপে বলিলেন? ইহার একমাত্র সিদ্ধান্ত এক হইতে পারে যে, যাহাতে প্রজার মঙ্গল তাহাতে জমিদারের অমঙ্গল, সুতরাং প্রজার মঙ্গলার্থ জমিদারের অমঙ্গল সাধন করা কর্তব্য নহে। কিন্তু যাহাতে জমিদারের মঙ্গল তাহাতে প্রজারও মঙ্গল, সুতরাং জমিদারের মঙ্গল সাধন করা অবশ্য কর্তব্য। পাল মহাশয় বলিয়াছেন—"জমিদারেরা যাহাতে সহজে খাজনা আদায় করিতে পারেন, তজ্জন্য একটি আইন করিতে গভর্নমেন্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সুতরাং গবর্নমেন্টের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কর্তব্য। কিন্তু গবর্নমেন্ট এই কর্তব্য রক্ষা না করিয়া প্রচলিত আইনের বিশেষ পরিবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জমিদারেরা এই অন্যায় পরিবর্তনের প্রতিবাদ করিতেছেন। এদেশের কোন স্থানের প্রজারাই এরূপ পরিবর্তনের আর আবশ্যকতা জ্ঞাপন করে নাই।"

পাল মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা কি সম্পূর্ণ সত্য? অগ্রে দেখা যাউক, তিনি যাহার কর্ণধার, সেই জমিদার সভা এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। ১৮৭৬ অব্দের ২১ জানুয়ারি দখলি স্বত্ববান প্রজাদিগের করের হার নির্ধারণ সম্বন্ধে গবর্নমেন্ট জমিদার সভার মত জানিবার জন্য এক পত্র লেখেন। তদুত্তরে উক্ত সভার সম্পাদক সভার পক্ষ হইতে ১০ মার্চ যে পত্র লেখেন তাহাতে স্বীকার করিয়াছেন যে, এখন এ সম্বন্ধে যে অনিশ্চিত বিধান রহিয়াছে তাহার পরিবর্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক; তাহা হইলে প্রজা ও জমিদার পক্ষেরই মঙ্গল হইবে।

গবর্নমেন্ট জমিদার সভার কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—"প্রচলিত আইনের যে বিশেষ পরিবর্তন জমিদারদিগের হিতার্থেই আবশ্যক, তৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের তখন কোন সংশয় ছিল না।" প্রচলিত আইনের যে বিশেষ পরিবর্তন আবশ্যক তাহা কেবল কলিকাতাস্থ জমিদার সভা স্বীকার করেন নাই, পূর্ব বাঙ্গলার জমিদারেরাও উহা স্বীকার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন রাজশাহী সভা এবং অপর অনেকগুলি সভা সেই কথায় সায় দিয়াছেন।

আশ্চর্যের কথা এই, এই সকল প্রমান বিদ্যমান থাকিতেও বাবু কৃষ্ণদাস পাল বলিয়াছেন, জমিদারেরা প্রচলিত আইনের বিশেষ পরিবর্তন প্রার্থনা করেন নাই। রাউস সাহেব বহুকাল "বাঙ্গালার চারি প্রধান জমিদার" নাম দিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি সেই কীট নিষ্কুঞ্চিত গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়া আপনার পাণ্ডিত্য জ্ঞাপন করিলেন। অথচ তাঁহার হৃদয়-বন্ধু সার অ্যাসলি ইডেন যে প্রজা ভূম্যধিকারীদিগের স্বত্ব সম্বন্ধীয় বিবাদের

একটি বিশদ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন—জমিদার সভার নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারা এখন যাহা বলিতেছেন পূর্বে তাহা বলেন নাই,—তাহা খণ্ডন করিবার কোন প্রয়াস পাইলেন না। ইহা কি সমদর্শী দেশ হিতৈষীর কার্য?

আমাদিগের প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং প্রজারা প্রচলিত আইনের পরিবর্তন ইচ্ছা করিয়াছে কিনা, তাহার বিশেষ আলোচনা এস্থলে করিবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণদাস বাবু যে সভার কর্ণধার সেই সভারই কেবল একটি কথা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব। ১৮৭৬ অব্দের ১৫ ডিসেম্বর জমিদার সভা গবর্নমেণ্টের নিকট যে আবেদন করেন তাহাতে লিখিত আছে,—"এই ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর যে মোকদ্দমা চলিতেছে এবং উভয় পক্ষের মনের গতি যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা অতিশয় লজ্জাকর। সুতরাং এই লজ্জাকর অবস্থা দূর করিয়া ভূস্বামী ও প্রজাবর্গের সম্বন্ধ ন্যায় সঙ্গত ভাবে ও সন্তোষকর রূপে সংস্থাপন করা অপেক্ষা গবর্নমেণ্টের পক্ষে গুরুতর কার্য আর কিছু হইতে পারে না।" আমরা কৃষ্ণদাস বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই "উভয়" পক্ষ কে? এক পক্ষ কি প্রজা নহে? তিনি ১৮৭৬ অব্দের শেষ ভাগে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কি অসত্য? আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, তাহার কোন্ কথা সত্য এবং কোন্ কথা অসত্য। এ বিষয় সমস্যার তিনি স্বয়ং মীমাংসা করিয়া দিলেই ভাল হয়।

১৬ বৈশাখ ১২৯০

প্রজা প্রতিনিধি সভা

আমরা আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, প্রজা প্রতিনিধি সভার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া অনেক স্থান হইতে অনেক প্রজা হিতৈষী ব্যক্তি আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। ইহা আশার কথা বটে, কিন্তু কার্য আরম্ভ করিতে হইলে আরও অনেক লোকের সাহায্য এবং পরামর্শ প্রয়োজন হইবে। আমাদিগের বিজ্ঞ সহযোগী সাধারণী সম্পাদক আমাদিগের উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার অভিপ্রায় বোধহয় এই যে ভারত সভাকেই প্রকৃত প্রজা প্রতিনিধি সভা করিয়া তুলিতে পারিলে ভাল হয়। তাহা হইলে যে ভাল হয় তৎ সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা এই, ভারতসভা সংগঠন কালে তাহার অন্যতম মূল অভিপ্রায় যাহাই থাকুক না কেন। ইহা বর্তমানে যে সকল সভ্য লইয়া সংগঠিত হইয়াছে। তাহাতে ইহা প্রকৃত রূপে প্রজার প্রতিনিধি সভা হইতে পারে না।

৩ আষাঢ় ১২৯০

প্রজার মুখপানে একবার চাও

বাঙ্গালা ও বেহারের জমিদার এবার জাগিয়া উঠিয়াছেন। খাজনার আইন দ্বারা কেবল জমিদারের নয়, কিন্তু জমিদার ও প্রজা উভয়ের সর্বনাশ হইবে জমিদারগণ সভা করিয়া এই তার সুর ধরিয়াছেন। জমিদারের টাকা আছে, জমিদারের অর্থের দাম আছে, সুতরাং চারিদিকে চীৎকার উঠিয়াছে। এ আইন কেহ কখনও চায় নাই, তবে কেন এ বিড়ম্বনা আনিতেছে। জমিদারের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে—জমিদার আর নিশ্চিন্ত থাকিতে

পারিলেন না। আগামী শীত ঋতুতে খাজনার আইন বিধিবদ্ধ হইবে---সময়ের দিন নিকট, আর কেন রণক্ষেত্রে অসি হস্তে অগ্রসর হও। জমিদার তো সাজিল, দন্তনাদ করিল, কিন্তু ঐ যে আহার থাকিতেও অনাহারী, ঘর থাকিতে পথের ভিখারি, আজন্মান্ধ নিরিহ গরিব প্রজা তাহারা ইহার কিছুই জানিল না। যাহাদের প্রজাবন্ধু বলিয়া গর্ব তাহারাও এ সময়ে তাহাদিগকে দুটো কথা বুঝহৈতে চেষ্টা করিল না। যদি প্রজার বধির কর্ণে জমিদারের তূর্য্য নিনাদ পশিত, তবে আজ বাঙ্গালা বেহার কাঁপাইয়া প্রজার আর্তনাদ রাজসিংহাসন কম্পিত করিত—ছয় কোটি প্রজার বিলাপ ধ্বনিতে জমিদারের ক্ষীণ স্বর ডুবিয়া যাইত। সে সুখ স্বপ্ন ভাবিয়া ফল নাই। প্রজার চক্ষের জল মুছাইতে এমন রাজা সর্বত্র মিলে না—যদি বিধাতার কৃপায় ভারতের রাজা প্রজার দুঃখ মোচন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে বাধা দেওয়া মহা অপরাধ। প্রজার কল্যাণ করিতে গিয়া যদি রাজা ভ্রম ক্রমে দুই একটি অপকার করিয়া বসেন, তাহা সহিতে পারি, কিন্তু একদিনও তাহাদের দুঃখ কাহিনি শুনিয়া উদাসীন থাকেন ইহা আর সহে না। ছয় কোটি লোক মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করিবে, আর অল্প সংখ্যক জমিদার তাহাদের ক্লেশ রাশির উপর আপনাদের বিলাসভবন নির্মাণ করিবে, ইহা বিধাতার নিয়মবিরুদ্ধ,—শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক এ অসাম্য তিরোহিত হইবে। বর্তমান সঙ্কট সময়ে খাজনার আইন এখন বন্ধ রাখিতে পরামর্শ দিতেছেন—দেশের জমিদার যদি এখন অপদার্থ হইয়া থাকেন যে, জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন করিয়া ইংরেজের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত, তবে আমরা বলি এখন দেশবৈরী জমিদারদিগকে উপেক্ষা করাই সঙ্গত। ইংলণ্ডে লর্ড রিপণের রাজনীতির যেরূপ প্রবল সমর্থন হইতেছে, তাহাতে সহস্র জমিদার সহস্র ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়াও লর্ড রিপণের শুভকার্যের বাধা দিতে পারিবে না। আর জমিদারদিগকে গবর্নমেণ্টের কোনও ভয় করিবার কারণ নাই। কেহ বলিতেছেন খাজনার আইনের পাণ্ডুলিপির যথোচিত রূপে সমালোচনা হয় নাই, অতএব তাড়াতাড়ি এ আইন ব্যবস্থাপক সভায় লইয়া আন্দোলন হইতেছে। জমিদার প্রজা সকলেই বিল লইয়া আন্দোলন করিয়াছে, বিলের উপর শত আবেদন ও শত মন্তব্য গবর্নমেণ্টের নিকট পহুঁছিয়াছে। দেশের রাজনৈতিক সভাগুলি আপন আপন মত গবর্নমেন্ট ভাবিলেন, ভারত গবর্নমেন্ট ভাবিলেন, এত হইল ইহার পর যদি কেহ বলেন, তাড়াতাড়ি বিল পাস হওয়া ভাল নয়, আগামী শীত ঋতুতে বিল উপস্থিত হইলে লর্ড রিপণ নিন্দাভাজন হইবেন, তাহা হইলে সে কথার প্রতি আমরা কোন আস্থা প্রদর্শন করিতে পারি না। যাহারা বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহারা এখন ব্যবস্থাপক সভার সরকারী সভ্য, তাহারা প্রজার অবস্থা বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই সকল অকর্মণ্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া যাহারা বিলের গতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহারা এই কথা স্মরণ রাখিবেন বর্তমান ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় ভারতের কল্যাণ প্রয়াসী সভা শীঘ্র হওয়ার সম্ভাবনা নাই---যদি লর্ড রিপণের গবর্নমেণ্ট চলিয়া যায় তবে এমন সুসময় আর হইবে না, প্রজার দুঃখ শীঘ্র ঘুচিবে না। লর্ড রিপণ দুঃখীর বন্ধু, তিনিই বঙ্গীয় প্রজার জন্য আইন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। প্রজার মুখপানে দেশের কেহ চাহিল না, গবর্নমেণ্ট তাহাদের দুঃখ দূর করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, কেহ তাহার বিরোধী হইও না।

২৭ শ্রাবণ ১২৯০

সংবাদ প্রভাকর

সম্পাদকীয়

এই বঙ্গদেশের ভূম্যাদি স্বভাবতঃ অতি উর্বরা, অল্প পরিশ্রম করিলেই তাহাতে প্রচুররূপে শস্য ও ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কি চমৎকার উপজীবিকা নির্বাহ করণের এতাদৃশ সদুপায় সত্ত্বেও কৃষকদিগের দুঃখ মোচন হয় না, তাহারা ছিন্ন বসন পরিধান ও পর্ণ কুটীরে অবস্থান করে, বহু ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত দিনান্তে উদরান্ন নির্বাহ করিতে পারে না, কৃষকমণ্ডলীর এই দুরবস্থার কারণ অবধানে আমরা একপ্রকার অক্ষম হইয়াছি, কেহ কেহ ভূম্যধিকারিগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, কারণ জমিদারেরা ভূমির নির্ণীত জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও তাহারা হাল বকেয়া হিসাবে আদায় করেন দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নির্দোষ প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার হপ্তম বা পঞ্চম আইন জারী করেন না, গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত রাজস্ব সংগ্রহকারক কালেক্টর সাহেবেরা কিস্তির নির্দিষ্ট দিবসে সূর্যাস্ত সময়ের মধ্যে যে প্রকার কঠিন নিয়মে রাজস্বের টাকা আদায় করেন জমিদারেরা যদ্যপি সেই প্রকার ক্লেশকর নিয়মের অনুগামী হইয়া খাজানা আদায় করিতেন তবে প্রজাদিগের চালে খড় গাছটিও থাকিত না, এই বিষয়োপলক্ষে আমারদিগের দৈনিক সহযোগী ইংলিশম্যান সম্পাদক মহাশয় অনেক উত্তম যুক্তি লিখিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে "যদিও কোন কোন জমিদার খাজানার জন্য কোন প্রজার প্রতি অন্যায় আচরণ করেন তথাচ বিশিষ্টরূপ বিচারে সেই দোষ গবর্নমেন্ট প্রতিই অর্পিত হইতে পারে, কারণ রাজপুরুষেরা নিলাম করণের যে এক ভয়ানক নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোন মতেই জমিদারের রক্ষা নাই, ঐ নিলামের দিন যত নিকটস্থ হইতে থাকে ততই জমিদারেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অসীম চিন্তা সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন, অনেকে ১২ টাকার দর সুদ এবং দশ টাকার দর ডিস্কৌন্ট দিয়া টাকা কর্জ করত নিলাম নিবারণ করেন, ইহাতে কত ধনাঢ্য জমিদার একেবারে নিঃস্ব হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না, অতএব গবর্নমেন্টের রাজস্ব বিষয়ক চলিত নিয়মকে বঙ্গদেশীয় কৃষক ও জমিদারগণের দুরবস্থার কারণ বলিতে হইবেক।"

পরন্ত ঐ সিদ্ধান্তও একপ্রকার যুক্তিমূলক বটে, কাবণ সকল দেশেই এপ্রকার নিয়ম আছে যে ভূপতিরা সময়ে সময়ে প্রজাদিগের অবস্থা বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, এবং যাহাতে তাহারদিগের দুঃখ নিবারণ হইয়া স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় এমন সদুপায় সকল নির্ধারণ করেন, ফলতঃ আমারদিগের রাজপুরুষেরা এই রুচির নিয়ম একেবারে অবহেলন করিয়া বসিয়াছেন, প্রজারা কিরূপে অবস্থান করিতেছে তাহার প্রতি তাহারদিগের কিছুই দৃষ্টি নাই, কোন বৎসর শস্য হউক বা না হুক তাহারা নিয়মিত রাজস্বের একটি পয়সাও পরিত্যাগ করেন না, এতদ্ভিন্ন ইজারদার পত্তনিয়াদার ও দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি বহু লোক কৃষকের পরিশ্রমার্জিত বস্তুর অংশ গ্রহণপূর্বক আপনাপন উপার্জনে তৎপর থাকাতে কৃষকের অবস্থা অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে, কোন দয়াবান মনুষ্য যদ্যপি মফঃস্বলে

কৃষকের বাটীতে প্রবেশপূর্বক তাহার অবস্থা সন্দর্শন করেন তবে তাহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া নয়নযুগে কেবল আক্ষেপ বারি নির্গত হইতে থাকে এবং তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক এমত ক্লেশসূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, হা পরমেশ্বর! যাঁহারদিগের অধীনস্থ প্রজামণ্ডলীর ঈদৃশ দুরবস্থা তাহারদিগের সুসভ্য ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতে কি লজ্জাবোধ হয় না? যে পর্যন্ত কৃষকদিগের অবস্থার পরিবর্তন না হইবেক সে পর্যন্ত ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট বিজ্ঞ সমাজে কদাচ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবেন না।

সংবাদ প্রভাকর, ২৮.৫.১২৫৯

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৫.৫.১২৬৪। ২০.৮.১৮৫৭

মেং রবিন্সন সাহেব এই ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ে লেখনী সঞ্চালনপূর্বক বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের দুরবস্থার বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে তাহা অতি মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়াছি, তিনি একটি অক্ষরও মিথ্যা লেখেন নাই, বোধ হয় প্রদেশ মধ্যে অবস্থানপূর্বক কৃষকের পর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহার বিপন্নদশা ও পরিবারের অবস্থা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহা না হইলে এরূপ স্বরূপবর্ণনা কিপ্রকারে লিখিবেন? আমরা পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থে তাঁহার লেখার কিয়দংশ নিম্নভাবে অনুবাদ করিলাম।

"বঙ্গদেশীয় কৃষক সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মোটা অন্ন আহার করে, তাহার কঠোরোপর্জিত অল্প আয়ের গ্রাহক বিস্তর, একারণ তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা দূরে থাকুক সে অধিক সূদে কর্জ লইয়া মহাজনের নিকটে নিয়ত বদ্ধ রহিয়াছে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রচুর শস্য ফলাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু কি পরিতাপ! কৃষকের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ তুল্য কঠিনান্তঃকরণও করুণায় আর্দ্র হইয়া যায়, তাহার মাসিক ব্যয় ১।।০ টাকা অথবা ৩ টাকার অধিক নহে, বার্ষিক ব্যয় একশত টাকায় অধিক হয়, একশত কৃষকের মধ্যে এমত অবস্থান্বিত পাঁচ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কৃষকের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি আপনার উপার্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, একারণ তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সম্পূর্ণ পরিশ্রম করিয়া তাহাকে সাহায্য করে, এবং অসিদ্ধান্ন ও সামান্য শাকাদি ভোজনেই সংতৃপ্ত থাকে, যে দিবসে মৎস পায় সে দিবস আনন্দের সীমা থাকে না, কটি দেশে ছিন্ন বস্ত্রমাত্র অবলম্বন ও দর্মামাদুরি এবং তৃণের বালিশই তাহারদিগের কোমল শয্যা হইয়াছে, সম্পত্তির মধ্যে কাষ্ঠের হল ও লৌহফলাকা, এবং এক অথবা দুইটা বলদ, তাহা অবলম্বন করিয়াই কৃষক বর্ষাকালের অবিশ্রান্ত জলধারা মস্তকে ধারণপূর্বক প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত এবং মধ্যাহ্ন হইতে প্রদোষ কালাতীত করিয়া নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া থাকে, আমার এই লেখাকে কেহ অতিরিক্ত বর্ণনা বিবেচনা করিবেন না, এমত দুঃখি কৃষক বিস্তর আছে, যাহারা সময় বিশেষে দিনান্তে আহারপ্রাপ্ত হয় না, বিশেষতঃ কৃষকের অন্তঃকরণ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকাতে সে কোনক্রমেই অবস্থার পরিবর্তন করণে সমর্থ হয় না, সে মূর্খতার নিবিড়ান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া উত্তেজনা প্ররোচনা ও ভর্ৎসনা প্রহারাদি সহ্য করিতেছে।"

মেং রবিন্সন সাহেব বঙ্গদেশীয় কৃষকের দুরবস্থা এতদ্রূপে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে

জমিদারদিগের প্রতিই সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন "জমিদারেরাই এই সকল দুঃখের মূল হইয়াছেন, গবর্নমেন্ট জমিদারি বিশেষের যেরূপ রাজস্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে গবর্নমেন্ট ভূমির উৎপন্নের অর্ধাংশেও গ্রহণ করেন না, কারণ যে সমস্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার সন্তানগণের ভূম্যধিকার কোর্ট অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ গবর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আছে তদ্বারা এই বিষয় বিলক্ষণরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব গবর্নমেন্ট যখন ভূমির উৎপন্নের অর্ধাংশভোগি হইলেন অপরার্ধাংশ সত্ত্বে কৃষককুল কি কারণে এত কষ্ট সহ্য করে, তাহা কোথায় যায়, কে বণ্টন করিয়া লয়? তদনুসন্ধান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে" মেং রবিন্সন সাহেব যদ্যপি নিরপেক্ষচিত্তে বিবেচনায় আলোচনা করেন, তবে অবশ্য জানিতে পারেন যে গবর্নমেন্টের রাজস্বসম্বন্ধীয় অপরিচ্ছিন্ন নিয়মই কৃষকের সকল দুঃখের মূল হইয়াছে, কারণ আমারদিগের রাজপুরুষেরা এদেশে রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিয়া ৩০ বৎসর পর্যন্ত ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত বিবিধ প্রকার নিয়ম নিবন্ধন করিয়াছিলেন, ফলতঃ কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, পরিশেষে রাজনীতি নিপুণ মহাত্মা লার্ড কর্নওয়ালিস সাহেব এদেশে আগমন করিয়া ইংরাজি ১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশের ভূমির রাজস্ব "দশশালাবন্দোবস্ত" নামে যে সুবিখ্যাত নিয়মপত্র নির্দিষ্ট করিয়াছেন, বিলাতের কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের অভিমত ক্রমে তাহাই চিরস্থায়ী হইয়াছে, গবর্নমেন্ট একপ্রকার সপথপূর্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কোন কালে ঐ নিয়মের রূপান্তর করিবেন না, এই নিয়ম বলেই গবর্নমেন্টের রাজস্বের ন্যূনাতিরেক বিবেচনায় জমিদারি সকলের মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ধনাঢ্যব্যক্তিগণ মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ যেমন কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য ভূমি সম্পত্তি, সেইরূপ জমিদারি মনুষ্য অর্থ দিয়া যে কোন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তত্ত্বাবতেই আত্মলাভের প্রত্যাশা করেন, অতএব বহু ধনদ্বারা অর্জিত জমিদারি হইতে ভূম্যধিকারিরা লভ্য-প্রত্যাশা করিবেন ইহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না, বিশেষতঃ জমিদারীসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই তাহারদিগকে রাজনিয়মের অধীন হইতে হয়, নিয়ম অতিক্রমপূর্বক কোন কার্যই করিতে পারেন না, যদ্যপি কেহ করেন, তবে বিচারস্থলে তাহা প্রতিপন্ন হইলে তাহাকে অবশ্য দণ্ডভোগ করিতে হয়।

অপিচ, মেং রবিন্সন সাহেব এইস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যদ্যপি জমিদারেরা কৃষকের নিদারুণ দুঃখের মূলীভূত কারণ না হইলেন তবে তদ্দোষ কাহার প্রতি অর্পিত হইবেক? এতদুত্তরে আমারদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে গবর্নমেন্টের নিয়মের বিশৃঙ্খলতা ও কৃষকদিগের মূর্খতা দোষই তাহারদিগের সমূহ ক্লেশের কারণ হইয়াছে, জমিদার পত্তনিয়াদার তালুকদার দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগিত সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা সহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্তৃত্ব করে, গবর্নমেন্ট যদাপি কৃষকের দুর্দশা সমস্ত সন্দর্শন পুবক যদ্যপি রাজনিয়মাদির সংশোধন করেন, তবে কৃষকের দুঃখ অনেক মোচন হইতে পারে।

সংবাদ প্রভাকর, ১৮.৫.১২৫৯

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

জমিদার

দেশীয় জমিদারগণ পূর্বের ন্যায় অত্যাচার করেন না, একথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু মফঃস্বলে এখনও যে প্রকার অত্যাচার লক্ষিত হয়, তাহা অল্প নহে। জমিদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভূস্বামীর ন্যায় ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, শিক্ষিত ও সভ্য জমিদারদিগের জমিদারিতে অত্যাচার হয় না, একথা কেহ বলিতে পারিবেন না। তাহারা স্বয়ং অত্যাচার করিতে না পারেন, অধীনস্থ নায়েব প্রভৃতি আমলাগণ প্রজার ঘাড় ভাঙিয়া রক্তপান করিবার একটি মহারাক্ষস। যাহারা জমিদারদিগের কাছারিতে, সর্বদা যাতায়াত করেন তাহারা বলেন এখন্য সর্দার দিয়া প্রজা ধরিয়া আনা হয়, জুতা লাঠি প্রহার করা হয়। জরিমানা করা হয়, পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দেওয়া কখন কখন প্রচার মা বোন, স্ত্রী প্রভৃতিকে কাছারিতে ধরিয়া আনিতে আদেশ করা হয়, এদিকে চাঁদা মাথত প্রভৃতি আবওয়াব আদায় করিতেও ত্রুটি নাই। প্রধান কর্মচারীদিগের আত্মীয়গণ বেকার থাকিলেই জরিপ আরম্ভ, তাহাদিগের কার্যোদ্ধার হইলেই জরিপ শেষ হইল। অনেক নির্বোধ জমিদার আমলাগণের এই কৌশল বুঝিতে পারেন না, তাহারা অনুরোধ করিলেই, জরিপ করিতে আদেশ করেন। আমিনগণ বিশেষ প্রণামী পাইলে বিশ কাঠায় বিঘা নতুবা পনরো কাঠায় বিঘা গণনা করেন। কোন্ প্রজার এতবড় মাথা ইহার প্রতিবাদ করিবে। বস্তুতঃ এক একটি জমিদারি নায়েবাদির আত্মীয় প্রতিপালনের বেগুন খেত। নিরন্ন দুঃখী প্রজার ব্যথায় ব্যথিত এমন কে আছে, যে তাহাদিগের মুখপানে চায়। গর্বনমেন্ট কোন কোন কর প্রজার ঘাড়ে চাপাইবেন, সেই সুযোগ দেখিতেছেন, সুতরাং প্রজাদিগের অরণ্যেরোদন করা হইতেছে, প্রজার ক্রোড়ে কত জমি আছে, একবার জরিপ করিলেই জানা যাইতে পাবে, চাঁদে চাঁদে জরিপ করিয়া, প্রজা উচ্ছিন্ন করা ইংলিশ গবর্নমেন্টের ন্যায় প্রজা হিতৈষী রাজা যদি দেখিয়াও না দেখেন তবে রামানুজ ভারতের অভিসম্পাতের ফল প্রজারা ভোগ করিতেছে একথা অবনত মস্তকে আমাদিগের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা গ্রামবার্তার জন্মাবধি বলিয়া আসিতেছি, গবর্নমেন্টের সহিত জমিদারদিগের যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তদ্রূপ জমিদারদিগের সহিত প্রজাদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সর্বতোভাবে কর্তব্য, তাহা হইলে সকল গোলযোগ একেবারে শেষ হইবে। এত শান্তিরক্ষক বিচারক আবশ্যক হইবে না, জমিদার প্রজার প্রতি এবং প্রজা জমিদারের প্রতি শত্রুতা ত্যাগ করিবে। এই নিয়ম যতদিন প্রবর্তিত না হইবে তাবৎ গবর্নমেন্ট যত প্রকার আইন কেন না করুন, কিছুতেই প্রজার দুঃখ দূর করিতে পারিবেন না। আমরা জমিদারদিগের অত্যাচার ঘটিত যে সকল প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি পাঠকগণের অবগতির জন্য তৎ সমুদায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিব। সম্প্রতি শোনদহ নামক পল্লী হইতে যে একখান ক্ষুদ্র পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, আমাদিগের অদ্যতন সমুদায় আক্ষেপের প্রমাণ স্বরূপ তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন : "সংপাদক মহাশয়! চাঁদে চাঁদে জরিপ জমাবন্দীর ব্যয় দিতে দিতে আমরা মারা গেলাম। একবারে জরিপ জমাবন্দী করিতে জমিদারদিগের অভিরুচি হয় না কেন?

বৎসরে বৎসরে আমিন পাঠাইয়া, জরিপ করার ফল কি? আমাদিগের বোধ হয় কেবল আত্মীয় প্রতিপালন প্রজার প্রতি জমিদারদিগের যত বেদনা এই সকল ঘটনা সৃষ্টি করিয়াও কি আমাদের গবর্নমেন্ট তাহা বুঝিতে পারেন না। অথবা তুলসীপত্রের ইতর বিশেষ নাই। কটকিদার তালুকদার জমিদার ও রাজা সকলেই সমান। প্রজা মরুক বাঁচুক চোষণ করাই তাহাদিগের কার্য।"

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ১৮৭২ জুন

ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি

রাজা নানা প্রকার করভার প্রজার স্কন্ধে অর্পণ করিতেছেন, অথচ তাহাদিগের আয়ের পথ বিস্তার করিয়া দিতেছেন না। এ অবস্থায়ও যদি তাহারা চোর, ডাকাইত, দুষ্ট লোক জমিদার কর্তৃক পীড়িত না হয়, তাহা হইলেও এত অধিক ক্লেশ বোধ করে না, চোরে প্রজার সর্বনাশ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ডাকাইতেরা যথাসর্বস্ব লুঠ করতে ক্রটি করিতেছে না, দুষ্ট লোকেরাও অনর্থক প্রজাদিগের কষ্ট দিয়া থাকে, এবং জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতিও স্বেচ্ছানুসারে চাঁদা, মাথট, সেলামী, ভিক্ষা ও নানা প্রকারে বাজে জমা বাহির করিয়া প্রজার নিকট হইতেই আদায় করিতেছেন। প্রজারা এ সকল কোথা হইতে দিবে। কেহই তাহা বিবেচনা করিতেছেন না। মফঃস্বলের অবস্থা দেখিলে বোধহয় প্রজারা সাধু হইয়াও চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছে। যাহার ইচ্ছা সেই ইহাদিগকে অর্থের নিমিত্ত তাড়না করে। সকলে মিলিয়া প্রজার রক্ত শোষণ করিলে, তাহারা কেন না দুর্বল হইয়া পড়িবে? অতএব আমরা কর্তৃপক্ষীয়দিগকে বলিতেছি যাহাতে প্রজারা আইন বিরুদ্ধ উপকর (বাজে জমা) প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় তাহার সদুপায় করুন।

এই শীতকালেই নগরস্থ বিচারপতিগণ গ্রামে ও পল্লী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। কোন্ স্থানের প্রজার কিরূপ অবস্থা ও কোন স্থানের প্রজারা প্রতি বৎসর কত প্রকার উপকর প্রদান করে, তাহার কি কোন অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? অনুসন্ধান করিলে এতদিন অবশ্যই উপকরের অত্যাচার নিবারিত হইত। আমরা অদ্য যে দুই এক স্থানের উল্লেখ করিতেছি সেই সেই প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত শান্তি রক্ষক পুরুষেরা গোপনানুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাইবেন গ্রামবার্তা অকারণ ক্রন্দন করিয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করিতেছেন না।

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত প্রদেশে কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদার আছেন, তাহারা নানা প্রকারে উপকর আদায় করিয়া প্রজাদিগকে সর্বদা জর্জরীভূত করেন। তৎপ্রদেশের নীলকুঠির সাহেবেরা যে যে প্রকারের উপকর আদায় করিয়া প্রজাদিগকে উৎসন্ন করেন, ইহারাও ক্রমে সেইরূপ উপকর আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা কুষ্টিয়ার অ্যাসিস্টেন্ট মেং জনসন সাহেবের ন্যায়পরতায় ও সদ্বিচারে সাহসী হইয়া বলিতেছি তিনি চাপড়া ও সাওতা প্রভৃতি গ্রামের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিবেন। এবং তত্রত্য ভদ্রলোকদিগকে শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেই তৎপ্রদেশের কত প্রকার উপকর আদায় হয় তাহার সবিশেষ জানিতে পারিবেন। সমুদয় গুপ্তলীলা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

পাবনা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট মেং টুইডি সাহেবকেও বলিতেছি তিনিও আপন অধিকারস্থ ভূস্বামীদিগের ব্যবহারের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন এবং চাটমোহর বিভাগের

সমুদায় গ্রামগুলি একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন, তাহা হইলেই আমাদিগের আক্ষেপের কারণ কতক অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ভূসম্পত্তির সহিত যাহাদিগের কোন সংস্রব নাই, এরূপ ভদ্রলোকদিগকে শপথ করাইয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে জানিতে পারিবেন, তৎপ্রদেশে আইন বিরুদ্ধ কত প্রকার বাজে জমা প্রতি বৎসর আদায় হইয়া থাকে।"

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ১৮৬৯ ডিসেম্বর

অত্যাচারিত প্রজা

সকলে না হন, মফঃস্বলের কতকগুলি ছোট বড় জমিদার সাপের পা দেখিয়াছেন। আমরা অদ্য ঐ বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া, পল্লীবাসী সম্বাদদাতা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এস্থলে অবিকল প্রকাশ করিলাম। "সম্পাদক মহাশয়। শুনিয়াছিলাম, "ছোট সাপের বড় বিষ" এই গৌরী নদীর পশ্চিম পারে ভালুকা স্টেশনের অধীন, আজইল গ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্য দেখিয়া শুনিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। ২/৩ মাসের মধ্যে প্রজার প্রতি মারপিট, বাড়ি, লুট, ধান্য কর্তন ও পাউণ্ডে দেওয়া গোরু কাড়িয়া লওয়া প্রভৃতি ৩/৪টি নালিশ প্রজা কর্তৃক কুষ্ঠিয়াতে রুজু হয়। কিন্তু নালিশের পর ফরিয়াদি আর কুষ্ঠিয়াতে যাইতে পারে না। অথবা যাইয়া মোকদ্দমা রাজিনামা দেয়। পুলিসের উপর তদারকের ভার আইনে, পুলিস প্রমাণ বা ফরিয়াদিকে হাজির পান না। কারণ কি? তা বলা বাহুল্য। শুনিলাম যে লাঠি, শড়কিও নাকি চলে থাকে। এবং তাহার কয়েকখানা পুলিসের রিপোর্টের সহিত হুজুরেও প্রেরিত হইয়াছে।'

জানিলাম দুর্বলের সহায় নাই। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক "অন্যায় কর" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশের জমিদারেরা প্রজার নিকট নিয়মিত খাজনার অতিরিক্ত যে সকল শুল্ক গ্রহণ করেন, প্রজারা তাহা প্রদান করিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে না এবং তাহা আদায় করিবার সময় ভূম্যধিকারিগণও বল প্রয়োগ করেন না। কিন্তু যদি, "প্রজারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে না, (অর্থাৎ তাহার যো নাই), সুতরাং জমিদারদিগের তাদৃশ বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।" ইহা ঐ প্রবন্ধের মর্ম হয়, তবে অস্পষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।

প্রজারা সন্তোষপূর্বক উপকর প্রদান করে, কি জমিদারগণ বুকে পাথর দিয়া আদায় করেন; সহযোগী রাজধানীতে থাকিয়া তাহা কিরূপ জানিবেন? একবার গ্রাম ও পল্লীতে আসিয়া দেখুন, এক একজন জমিদার ঐ করের নিমিত্ত কি প্রকার পীড়ন করেন। পল্লীবাসী, দুর্বল প্রজার সহায় সম্পত্তি নাই, নালিশ করিতে পারে না, অগত্য অত্যাচারিত হইয়াও অত্যাচারীর পায়ে পড়ে। ইহাই যদি তাহাদিগের সন্তোষের চিহ্ন হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। হা ররিশবাবু! এই কি তোমার সেই পেট্রিয়ট?

আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, রামানুজ ভারত প্রজাদিগকে যে অভিসম্পাত করেন, তাহার ফল তাহাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। কেহ হিত করিলেও তাহাদিগকে অদৃষ্ট দোষে বিপরীত হয়িা উঠিবে। তাহা যদি না হইবে তবে আমাদিগের শাসনকর্তা যে ক্যাম্বেল সাহেব দরিদ্র বান্ধব বলিয়া পরিচিত, তিনি কেন বার্ষিক রির্পোটে এ কথা

লিখিবেন যে "যকন প্রজারা নিজে জমিদারের সঙ্গে মীমাংসা করিয়া থাকে, তখন গবর্নমেন্টের আর হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই।"

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ১৮৭৩ ফেব্রুয়ারি

জমিদার প্রজা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

নীলকরেরা পূর্বে এদেশে প্রবল ছিলেন। তাহারা এদেশীয় জমিদারদিগের জমিদারি হস্তগত করিতে কোথায় প্রলোভন, কোথায় ছল ও কোথায় বল প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন। নাই। জমিদার, নীলকরকে জমিদারি ইজারা দিলে, যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইবে, প্রজা, এই ভয়ে অত্যাচার সহ্য করিয়াও জমিদারের অনুগত হইয়াছিল, এবং প্রজা নীলকরের বশীভূত হইলে, জমিদারি রক্ষা করা সুকঠিন, অনেক জমিদার সেই ভয়ে প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে ভীত হইতেন, উভয়েরই উক্ত ভয় এক্ষণে বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং অনেক জমিদার যেমন প্রজা শোষণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, প্রজাও তদ্রূপ জমিদারের অত্যাচার অসহ্য মনে করিতেছে। এই কারণে পূর্বাপেক্ষা জমিদার ও প্রজা-ঘটিত বিবাদ প্রতি দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত অনুসন্ধান করিলে, জমিদার ও প্রজা-ঘটিত মোকদ্দমাই অধিক দৃষ্ট হয়। এই বিবাদ ভঞ্জনের একমাত্র উপায়, জমিদারের সহিত প্রজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। গবর্নমেন্ট যতদিন এই প্রকার বন্দোবস্ত করিতে উদাসীন থাকিবেন, ততদিন এই বিবাদ বিদূরিত হইবে না। বরং প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। প্রজার সহিত জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে, এখন যত আদালতের আবশ্যক হইতেছে, তখন তাহার অর্ধেক থাকিলেও স্বচ্ছন্দে কার্য চলিবে। প্রজারা, অবসর পাইয়া আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই করিতে যত্নশীল হইবে। কৃষিকার্যের উন্নতি নিমিত্ত, সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না। লাভ দেখিলে প্রজাগণ আপনারাই তাহার উন্নতি করিবে। উদর পূর্ণ থাকিলেই লোকের নানা বিদ্যালোচনা করিতে ইচ্ছা হয়, তখন প্রজা আপনার শিক্ষার উপায় আপনিই করিবে। তন্নিমিত্ত গবর্নমেন্টকে কষ্ট পাইতে হইবে না। জমিদারেরাও শান্ত প্রকৃতি হইয়া দেশ হিতকর কার্যে স্বতঃই অনুরক্ত হইবেন। এবং অন্যোপায়ে অর্থের সচ্ছলতা করিতে যত্ন করিবেন। প্রজার প্রতি তাহাদিগের স্নেহ স্থাপিত হইবে। প্রজাও জমিদারগণকে আন্তরিক ভক্তি করিবে। বিবাদ বিসম্বাদ উঠিয়া যাইবে, দেশে নূতন নূতন অর্থাগমের পথ আবিষ্কৃত হইবে। যাহাতে এত মঙ্গলের সম্ভাবনা, গবর্নমেন্ট, সেই কার্য করিতে যে কি নিমিত্ত শৈথিল্য করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ১৮৭৩ মার্চ

প্রজার সহিত জমিদারের বন্দোবস্ত

আমাদিগের লেঃ গবর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পেল সাহেব জমিদার ও প্রজায় আর বিবাদ না হয়, তজ্জন্য আন্তরিক যত্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে এখনও তাহা নিশ্চিত হয় নাই। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা যে প্রকার সূক্ষ্মবুদ্ধি নীতিজ্ঞ জমিদারদিগের আধার, তাহাতে যে লেঃ গবর্নরের চক্ষুতে ধুলি নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা অমুলক সন্দেহ নহে।

বিশেষতঃ তিনি গত ২৫ মে দিবসীয় মিনিটের মধ্যে "ভূমির উৎপন্ন ফসলের কোন এক নির্দিষ্ট অংশ জমিদার ও অবশিষ্টাংশ প্রজার হইবে" এইরূপ যে কিঞ্চিৎ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রজারই সর্বনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সোমপ্রকাশ পত্রের সম্পাদক ঐ অভিপ্রায়ের যে প্রকার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদিগের মনোগত ভাব স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকন্তু আমরা এই কথা বলিতেছি, লেঃ গবর্নর বাহাদুর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অতি সূক্ষ্ম বিষয় সমুদায় আলোচনা করিয়া একটি স্থূল বিষয়ের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। সেই স্থূল বিষয়টি এই যে, বাজারদর ও ভূমির উৎপন্ন প্রতি বৎসর ঠিক থাকে না। এবং অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি ও বন্যাধৌতাদি নানা প্রকার দৈবাপদে শষ্য নষ্ট হইলে জমিদারেরা ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকেন না যেরূপে হউক প্রজার নিকটে কর আদায় করিয়াই থাকেন। এরূপাবস্থায় প্রজার ক্রোড়ে লাভের অংশ কিছু অধিক না থাকিলে, তাহারা কোথা হইতে উক্ত ক্ষতি পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে? যখন লাভ হইবে, তখন জমিদারেরা কর বৃদ্ধি করিবেন, যখন ক্ষতি হইবে, তখন তাহার নিমিত্ত দায়ী হইবেন না, অর্থাৎ বৃদ্ধিকৃত কর ন্যূন করিয়া দিবেন না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে? বস্তুতঃ কর যত সহজে বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা ন্যূন করা তত সহজ নহে। এরূপাবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যতীত প্রজা জমিদারের বিবাদ কখন নির্মূল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রজার সহিত জমিদারেরা যাহাতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হন, লেঃ গবর্নর তাহারই উপায় উদ্ভাবন করুন। এবং প্রজারা গৃহীত ভূমি এস্তাফা দিয়া যাহাতে জমিদারের ক্ষতি করিতে না পারে এবং যদি করে তবে উক্ত জমির স্বত্ব বিক্রয় দ্বারা জমিদারের ক্ষতি পূরণ না হইলে, প্রজার অন্য প্রকার সম্পাত্তি দ্বারা সেই ক্ষতি পূর্ণ হইবে, ইত্যাদি নিয়ম স্থাপন করুন। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না। ফলতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যতীত যাহা কেন না হউক, তাহাতে প্রজার হিত অপেক্ষা অহিতেরই সম্পূর্ণ সূত্রপাত হইয়া থাকিবে, মফঃস্বলের অবস্থা আলোচনা করিলে, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ১৮৭৬ জুলাই

HINDOO PATRIOT

THE ZEMINDAR AND THE RYOT

As far as Bengal is concerned the great social question of the day is involved in the relation of the landlord to his tenant. That relation is one from which scracely a hundreadth part of the population of the country is free. Its extent, its influence over individual happiness and the national character, and the degree in which it modifies the action of all our social and political institutions are admitted by all to be surprisingly great. Yet on none of the subjects of high national interest which are presented to the Indian speculator does exist such an amount of error and prejudice. The most absurd and the most opposite nations as to the history, character and effects of this relation are freely held and promulgated by men of errors and prejudices merely speculative in their character were they innocuous in practical respects, they might have been safely left to die away by efflux of time in the conclusion of opinions. But unfortunately, they are not so. Legislation and judicature, the business and the courtesies of life are all largely modified by their prevalence. The owners and the occupiers of the a soil remain alike mistaken as to their real interests and their just responsibilites; a feeling incompatible with social well-being is kept alive : and the general consequence is that of a fabric torn and defaced by the feuds of its inmaters, each solicitors only for the preservation of the part inhabited by himself and intent upon the destruction of the rest. It is a fact, which we readily admit, that in this conflict the occupiers of land, comprising by for the largest portion of the population, are the greatest sufferers, but it is a law of providence that the oppressor cannot oppress long without losing much that it is truely valuable in him and to him, and the body of Bengal Zemindars have not escaped the visitations of this law. Even however, as respects their admitted facts errors of considerable importance prevail. No discrimination is made between the sort of oppression practised by Zemindars generally the latter are subject at the hands of the other two nececrous classes of their oppressors, between the motives, which actuate the one class and those by which the others are impelled,—between conduct necessitated by the exigencies of one's position and the want on disregard of the rights and feelings of weak and helpless men. Yet who will deny that there are distinctions essentially necessary to be observed in a consideration of the mutual relations of Zemindars and ryots? The reputation of there errors can hardly be accomplished in a single

newspaper article. We will, however, endeavour to point the attention of our readers to some obvious features in the existing relation between the Zemindar and the ryot which inspire us with hopes that a satisfactory adjustment of it is not impossible.

The principal causes to which the oppression practised by Zemindars upon their tenants may be traced are the ignorance, amounting in the case of the latter to unconsciousness, of the precise nature of the change wrought in their respective positions by the permanent settlement and by the laws subsidiary to that measure, and the abuse of the social influence of the Zemindary class. The first of these causes strikes the attention of the observer on the first sight of our social fabric. The Zemindar naturally inclined to interpret the terms of the settlement in his own favour, has been led to conclude that, as absolute proprietor of the social, which he is in so many words declared by the law of the settlement to be, he is entitled to charge his tenants the highest rent for the use of its natural powers that he can obtain for them in a market of intense composition. He has indeed a suspicion that the terms of the settlement impose some limits upon his rights, but as these limits have never been ascertained and as practically in the administration of the law they are not respected or observed,—as, in fact, it is almost always in his power to exact the highest market value for the restraints of those limits and is always inclined to inforce what he conceives to be his right. He himself is under a stern engagement to the state to be ready with his quota of texation on certain days on pain of being ruined if he fails, and he expects the same punctuality on the part of his ryot. On the other hand, the Bengal tenant firmly believes with the English chartist that the land is the property of him who dwells upon it and makes it yield its produce to man. He has heard that it was no object of the authors of the permanent settlement to alter either the tenure of his occupancy or the terms on which he is to maintain it. He does not understand why he should ever be called upon to pay more rent than his forefathers did, or why he should be called to pay full rent for a bad harvest or any rent for a year of draught or innundation. He admits to a certain extent the claim of his Zemindar to call upon him for aids and benevolences the latter term, by a strange coincidence, representing the Bengallee word used on these occasions as fully as it did the English exaction of what name in the Zemindar is pressed by the demands of the government or by the necessities of the position he has in sustain, but he cannot be reconciled to the belief that his rents are liable to revision, however moderate or fair, or the land he occupies to survey and measurement. There are sources of misunderstanding which have contributed largely to embitter the relation between the bengal Zemindar and his ryot.

By far the largest point of desputes between Zemindars and ryots will be found on examination to have originated in a misunderstanding of this nature.

Another cause of Zemindary oppression is (if we may use the phrase) social partisanship. Both amongst Hindoo and Mahomedans, men even of conditions below the middle ranks of life exercise their right of visiting with the deepest marks of social condemnation those who have grossly violated the rules of morality on the usages of society. The loss of caste or of the other privileges of social communication which are the usual consequences of these visitation of the social law are not to be borne with impunity. Efforts are made to regain the last position and the persecuted individual generally succeeds in securing the sympathies of some, though they be a minority, of his neighbours. A party is formed and its first object is to enlist on its side the influence of the party on the Zemindar. This influence is not always bad to be purchased, but it not unfrequently is. It is however never central. On the one or the other side it is always to be found, constituting by far the largest portion of the strength of the patronized. The consequences it is easy to conceive. Those thus brought into antagonism to the Zemindar suffer cruelty. We have the evidence of one of the most intelligent landholders in the country the author of the pamphlet on the Affray Bill which we reviewed some weeks ago,—that there are very few villages in the country—which are not thus divided into factions and in which therefore some of the ryots are not always at mortal feud with their landholder.

But neither misunderstandings on the subject of legal rights nor the acrimony of social disputes would have eventuated in the adoption by Zemindars of such conduct as they sometimes manifest towards their tenants, if public opinion—if the class opinion in which the body of Zemindars are educated—had been sound on these matters. Such oppression as if practised in any country would have drawn forth a manifestation of public resentment sufficient to make the rest of the oppressor's life miserable meets with scarcely any social condemnation in Bengal. The oppressive landholder in Bengal loses no caste, he loses no society in which he loves to move, he loses no consideration in the eyes of the public and, we may add, in that of government,—and if he be but liberal in a particular manner, his oppressive conduct aids to raise him in general estimation. We can at present afford no room for an analysis of the causes of this unsound state of public opinion in this respect, but the fact of its existence is patent. That this is the most lamentable feature in the relation now subsisting between the Bengal landholders and their ryots will be readily admitted by all. The civilized world does not present an instance

of legal institutions having been brought to such perfection as to be able to completely protect the weak against the strong in all cases and against every form of oppression to such perfection even as to be able to protect the poor man from ruin if a rich man with a strong will wishes to effect it. The legal sanction is of itself too feeble a bond to hold society together. It is the social sanction, the dread of public and class opinion, that detes men from the commission of the greater number of offences. Where this sanction is weak the civil power is powerless to protect. No English landholders of the feudal ages forfeited his position by committing the grossest outrages upon the personal and property rights (such as they were) of his tenants. Even so late as the middle of the last century, a scotch landholder depopulated whole walks without incurring any considerable degree of social reproach. The sole remnant of this feeling is now to be found in the British landholder occasionally compelling his tenants to vote at parliamentary elections for his nominee; and though at present no Bengallee Zemindar incurs social degradation or exclusion when he burns the house of a tenant who refuses to eat with his out-caste neighbour or opposes a general increase to the rents of his village, the time will soon come when such conduct will be viewed in the same light that the present race of English landholder view the deeds of their ancestors of the fourteenth century.

6 Septemper 1985

সোমপ্রকাশ

বঙ্গদেশীয় প্রজাগণের এত দুরবস্থা কেন?

১৮৪১ সালের ১২ আইন, ১৮৪৫ সালের ১ আইন ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইন এই দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। এ প্রকার অসঙ্গত বিধি বিধান করিয়া কৃষকদিগের বল হ্রাস করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত কার্য হয় নাই। প্রত্যুত এতদ্দারা নিতান্ত অদূরদর্শিতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। কারণ পূর্বতন জমিদারগণের কৃত নিয়ম অন্যথা না হইলে পাছে নিলামের সময় মূল্য অল্প হইয়া গভর্ণমেন্টের প্রাপ্য রাজস্বের বিঘ্ন হয়, এই উদ্দেশ্যেই এই আইনগুলি করা হইয়াছে। ন্যায়পথগামী হইয়া স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই আশঙ্কা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। যে সকল প্রদেশে লর্ড কর্নওয়ালিসের কৃত দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইয়াছে, তথায় এরূপ ভয়ের কোন কারণ দেখা যায় না বিশেষত শেষোক্ত আইনের বিধানানুসারে পত্তনির পাট্টা প্রভৃতি রেজিস্ট্রারি করা হইলে নিলামের দ্বারা তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে দরিদ্র জোতদারদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাট্টা (যাহা স্থির থাকিলে রাজস্বের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি সম্ভবে না) বাতিল হয় কেন? ইহা কি রাজার অদূরদর্শিতা, স্বার্থপরতা ও রাজনিয়মের অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে না? ইহাকেই পিটরের অপহরণ করিয়া পালকে দেওয়া বলে। যদি বল, পত্তনিদার প্রভৃতি পণ দিয়া পত্তনি লইয়াছে, তাহাদিগের পাট্টা বাতিল করিতে হইলে অন্যায় হয়; এ স্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উত্থিত হয়, প্রজারা মকরারি বা মেয়াদী পাট্টা গ্রহণ করিবার সময় জমিদারকে নজর ও সেলামি বলিয়া কি প্রচুর অর্থ দেয় না? একথা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, সহায়হীন, নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ, নিরীহ, কৃষিজীবী প্রজা এক বিঘা পরিমিত ভূমির পাট্টা লইবার ব্যয়ের সহিত গড় করিলে প্রজার দত্ত অর্থ কি অধিক বলিয়া পরিগণিত হয় না? যদি তাহা হয়, তবে রাজনিয়ম তাহাদিগের সাহায্য দানে কৃপণতা করেন কেন? অপর জমিদারেরা নিজ পাট্টায় স্বাক্ষর করেন না। এই একটি অনর্থকারিণী রীতি প্রচলিত থাকাতে প্রজাগণের অনল্প ক্ষতি হইতেছে। কার্যকালে সচরাচর তাহারা বলিয়া থাকেন, নায়েব বা গোমস্তাকে পাট্টা দিবার ক্ষমতা দেন নাই। এরূপ স্থলে তাহা প্রমাণ করা প্রজার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। আত্মাকে বিপদ হইতে রক্ষা করা সম্পত্তি অর্জনের ফল, কিন্তু কৃষকদিগের মকরারি বা মেয়াদি পাট্টা হস্তান্তর করণের নিয়ম না থাকাতে তাহাদিগের সম্বন্ধে সম্পত্তি অর্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। রাজনিয়ম দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে প্রজার প্রাপ্ত পাট্টা কি তাহার স্বত্ব সূচক দলিল নহে? সে যদি সেই পাট্টা বন্ধক রাখিয়া অথবা হস্তান্তর করিয়া বিপদকালে উদ্ধার হইতে না পারিল এবং রাজ নিয়ম যদি তদ্বিষয়ে সহকারী না হইল, তাহাদিগের ইষ্ট পথ কি একপ্রকারে রুদ্ধ করা হইল না?

এইরূপই এক শতাব্দী গত হইলে পর কর্তৃপক্ষ নয়ন উন্মীলন করিয়া কৃষকদিগের উপরে কিঞ্চিৎ কৃপা দৃষ্টি করিলেন, তাহাতেই ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইল। ঐ আইনের ৪।১৫।১৫ এবং ১৬ ধারায় অপেক্ষাকৃত জোতস্বত্ব রক্ষার উপায় করা হইল। কিন্তু বিচার প্রণালীর দোষে প্রজার পর্যন্ত জোতদারিনিবন্ধন কিছু উপকারলাভ হইয়াছে,

এরূপ বোধ হইতেছে না কারণ জোতস্বত্বের প্রমাণার্থ জমিদারের প্রদত্ত দাখিলা ভিন্ন প্রজাদিগের অন্য কোন দলিল নাই। ঐ দলিলে জমির চৌহদ্দী পরিমাণে অথবা প্রকার ভেদ লিখিত না থাকাতে প্রমাণ স্থলে আদালত তাহা মূল বলিয়া গ্রাহ্য করা দূরে থাকুক অন্তর্গত দলিল বলিয়াও গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে, জমিদার অনায়াসে এই বলিয়া জোত ছাড়াইয়া লইতে পারেন। প্রজা যে দাখিলা দাখিল করিয়াছে, উহা বিরোধী ভূমির নহে। অতএব ১০ আইনের ঐ সকল ধারায় জোতস্বত্বের যেরূপ উপায় করা হইয়াছে। সেইরূপ জমাজমি ও বৎসরের সীমা স্বরূপ ও মিয়াদ নিরূপণ করিয়া দাখিলা দিবার রীতি প্রবর্তিত করিয়া দিলে যথার্থ উপকার দর্শিত। ফলত নীলপ্রধান প্রদেশে এই জোতস্বত্ব লইয়া যেরূপ বিবাদের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, জোতস্বত্ব রক্ষার যেরূপ উপায় করা আবশ্যক, ঐ আইনে সে উৎকৃষ্ট উপায় করা হয় নাই। নিয়োগ প্রণালীরও বিলক্ষণ দোষ আছে। জমিদারির হস্তান্তর হইবার রীতি প্রজার সর্বনাশের আর একটি প্রধান কারণ। ইহার মধ্যে যে কত অত্যাচার, প্রজাপীড়ন গুপ্তভাবে আছে, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠাধিকারের রীতি এদেশে প্রচলিত না থাকাতে বৃহদায়তন জমিদারি অচিরকাল মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়, তন্মুলক প্রজার সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। বোধ করি, কোন ন্যায় পথাবলম্বী ধার্মিক জমিদারের অধীনে জোতদারগণ জোতদারী করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছে, এমন কোন দুর্বৃত্ত অত্যাচারী উত্তরাধিকারী হইল, সে অনায়াসে এককালে প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দ বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়তঃ ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান মতে পত্তনি দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা প্রজাগণের অধিকতর অনিষ্টের কারণ। সুচতুর জমিদারগণ স্বীয় অধিকারস্থ জমিদারি জরিপ ও নিরিখ ধার্য করিয়া পত্তনি দিবার ঘোষণা করিয়া দেন, নিলামের ডাকের ন্যায় উহার ডাক বাড়িতে থাকে যে ব্যক্তি অধিক পণও জমা দিতে সম্মত হয়, তাহার সহিত পত্তনি বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। পত্তনিদার মহলে উপস্থিত হইয়া খাজনা আদায় করিবার পূর্বে এই কথা প্রচার করিয়া দেয় যে যে প্রজা টাকার সিকি বৃদ্ধি স্বীকার না করিবে তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইবে না। এই নিমিত্তই প্রজার ভূমিতে জমিদারের জরিপের রজ্জুপাতকে হৃদয়শল্য জ্ঞান করে। তাহাও রাজনিয়মের দোষ। এক শতাব্দীকাল মধ্যে রাজপুরুষেরা নূতন নূতন আইনের এত সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ; কিন্তু এ পর্যন্ত ভূমি জরিপের সাধারণ একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল না। ভূম্যধিকারিগণের যদৃচ্ছা ক্রমে ঐ গুরুতর কার্য নির্বাহ হইয়া আসিতেছে। কোন স্থানে বা শিকলের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ভূমি মাপিবার রসি স্থির না থাকাতে সচরাচর, দেখিতে পাওয়া যায়, পত্তনিদারের লোকেরা ১৮ কোঠায় বিঘা হয়; এমত রসি লইয়া মাপ আরম্ভ করে, এবং ১০ বিঘার বন্দকে জরিপ মুখে ১২ বিঘা করিয়া তুলে, তখন প্রজারা মাঞ্চেস্টারের মজুরদিগের ন্যায় নিতান্ত নিরুপায় হইা পত্তনিদারের দুরাকাঙ্খা পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকার দর পত্তনিদার, ছেপত্তনিদার, ইজারাদার, ছেইজারদারের হস্তে নিত্য নূতন যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় ইহাতে কি প্রজাদিগের সুখ সৌভাগ্যের প্রত্যাশা আছে?

সোমপ্রকাশ ১২৭০ ভাদ্র ১৪

বঙ্গদেশীয় প্রজাগণের এত দুরবস্থা কেন?

যে দেশে ইংরাজজাতি এত দীর্ঘকাল একাধিপত্য করিতেছেন, তথায় ভূমির প্রকৃত কর এ পর্যন্ত ধার্য হইল না। ইহা কি কৃষিজীবি প্রজাগণের সামান্য আক্ষেপের বিষয়। রেবিনিউ ইতিবৃত্ত নাই বলিয়া কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত হইয়া রাশি রাশি অর্থব্যয় পূর্বক সরবিয়ারি কার্য সমাধা করাইলেন। তৎকালে সুযোগ সত্ত্বেও প্রকৃত নিরিখের নির্ণয় করা হইল না। শীঘ্র হইবে এরূপ কোন লক্ষণও লক্ষিত হইতেছে না। সম্প্রতি ঈশ্বর ঘোষ ও হিল সঙ্ঘটিত নিরিখের যে মকদ্দমার হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা কি রাজনিয়মের সদোষতা সপ্রমাণ করিতেছে না? তদ্দারা কি জোতদার প্রজাগণকে দৈনিক মজুরের স্থলভিষিক্ত করা হয় নাই? যখন ভূমির প্রকৃত অধিকারী জোতদারকে রাজনিয়মে মজুর করিয়া তুলিল, তখন তাহাদিগকে হতভাগ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার বিধান হইয়াছে, প্রজার পরিশ্রম ও সাহায্য ব্যতিরেকে যে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইবে, তাহার কর বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, কিন্তু প্রজার সাহায্য ব্যতিরেকে যে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইবে, তাহার কর বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, কিন্তু প্রজার সাহায্য ও ব্যয় ব্যতীত জমিদারের সাহায্য ও ব্যয়ে ভূমির উর্বরতা শক্তি বর্ধিত হইতেছে, বঙ্গদেশে এরূপ ভূমির বা জমিদার নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ১৮১২ সালের ৫ আইনের পরগণার প্রচলিত নিরিখ অনুসারে ভূমির কর ধার্য হইবার ব্যবস্থা ছিল তদ্দারা যে কত প্রজা এককালে উৎসন্ন হইয়াছিল, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামসমষ্টির নাম এক পরগণা, ঐ পরগণার মধ্যে উত্তম মধ্যম অধম এই ত্রিবিধ ভূমি আছে। তদনুসারে নিরিখ স্থির করিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিরিখ হওয়াই সঙ্গত হয়। কিন্তু তাহা না হইয়া এক পরগণার অন্তঃপাতী ভূমি বলিয়া একবিধ নিরিখ অনুসারে একাল পর্যন্ত করধার্য হইয়া আসিতেছে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারা দ্বারা উহার প্রতীকার করা হইয়াছে, বটে, কিন্তু ব্যবস্থাপকদিগের কিঞ্চিৎ বিবেচনায় ত্রুটিতে উহা সম্যক ফলোপধায়ী হয় নাই। ঐ ধারায় আছে, পার্শ্বস্থ ভূমির নিরিখ অনুসারে নিরিখ ধার্য হইবে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ ব্যবস্থাটি সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। পাশাপাশি ভূমিরও স্বরূপগত বৈশাদৃশ্য অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। অতএব সেই সেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বিবেচনা করিয়া নিরিখ ধার্য করিবার ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল, তাহা হইলে প্রজার মঙ্গল হইত। ভূমির প্রকৃত কর ধার্য করিয়া দেওয়া রাজার কর্তব্য কর্ম। তাহা না হওয়াতেই কৃষিকার্যের হ্রাস, শস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত এবং প্রজার কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের দ্বারা প্রজারা যে পরিমাণে উপকৃত হয়, ৬২ সালের ৬ আইন দ্বারা তদধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শেষোক্ত আইনে ব্যবস্থা হইয়াছে প্রজার দেয় রাজস্ব যথাকালে আদায় না হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা সুদ দিতে হইবেক। শতকরা ২৫ টাকা সুদ দিবার নিয়ম যে কোন রাজার অধিকারে কখন ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যবনাধিকারবলে এদেশের প্রজাদিগকে অনেক প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের উপরে অনেক প্রকার অত্যাচার হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই যবনেরাও নিঃস্ব দরিদ্র কৃষিজীবি প্রজাগণের নিকট হইতে অসঙ্গত সুদ গ্রহণ করেন নাই।

যদি বল, জমিদারগণ গভর্ণমেন্টে দেয় রাজস্ব প্রজার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা নিয়মিত সময়ে না পাইলে জমিদারগণকে ঋণ করিয়া দিতে হয়. না দিলে তখন আর প্রজার অনুরোধে তাহাদিগের জমিদারি নিলামে চড়িতে বাকি থাকে না, সুতরাং মহাজনের সুদ দিবার জন্য তাহাদিগকে প্রজার নিকট সুদ লইতে হয়, জমিদারদিগকে সুদ দিয়া কর্জ করিতে হয় যথার্থ বটে, কিন্তু তাহারা শতকরা ২৫ টাকা সুদে কর্জ করেন না, অথচ এত অধিক সুদ গ্রহণ করেন কেন? ফলত সুদের নিয়ম উর্ধসংখ্য দশ টাকা অবধারিত হইলেই পর্যাপ্ত হইত। শতকরা ২৫ টাকা অবধারিত করিয়া দেওয়াতে দরিদ্র প্রজাগণ সুদের দায়ে বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রজাদিগের এইমাত্র বিপদ নয় এতদ্ভিন্ন মহাজনের অত্যাচাররূপ আর একটি মহাবিপদ আছে। মহাজন এই শব্দটি শুনিতে মধুর বটে, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গবাসী প্রজার অদৃষ্টে ইহা বিষময় ফল প্রসব করে। কোথায় সহায় ও সম্বলহীন প্রজারা মহাজনের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক সমুদায় দায় হইতে রক্ষা পাইবে, তাহা না হইয়া মহাজনই তাহাদিগের সর্বনাশের কারণ হইয়া উঠিয়াছে একথা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, সামান্য এক জন গ্রাম্য মহাজন অতি অল্প অর্থ লইয়া অচিরকাল মধ্যে প্রজার সর্বনাশ করিয়া অতুল ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠেন। প্রজা পীড়নকল্পে ইহারা নীলকরের সহোদর। প্রজাদিগের অনেকেই নিরীহ ও সরল স্বভাব। তাহারা যে ক্রমে মহাজনরূপ বিষম বিকারে আচ্ছন্ন হইতেছে তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না ক্রমে নীলের দাদনের ন্যায় মহাজনের সুদ বৃদ্ধি পাইয়া এত অধিক হইয়া উঠে যে ঐ হতভাগ্যদল কখনই ঐ ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। মহাজনেরা তাহাদের শ্রমোপার্জিত শস্য স্বেচ্ছাক্রমে বিক্রয় করিয়া লয়, তাহারা দ্বিরুক্তি করিতে শক্ত হয় না। মহাজনেরা সুদ, সুদের সুদ, ধরতা, বাঁটা, হিসাবানী, পার্বণী প্রভৃতি বাবদে অল্প দিনের মধ্যে ঋণজালে প্রজাকে এমনি বদ্ধ করিয়া ফেলে যে, তাহার আর উদ্ধারের উপায় থাকে না, অর্থপিশাচ মহাজনেরা কেবল যে অর্থ ব্যবহার দ্বারা অর্জনস্পৃহার চরিতার্থতা সম্পাদন করে এরূপ নয়, তাহাদের ধান্যাদির বাড়ি দিবার একটি ভয়ানক ব্যবসায় আছে। এই বাড়ি দুই প্রকার, দেড়া ও দুনা। নিরন্ন প্রজারা উদরান্নের মহাজনের নিকট যে ধান্যাদি লয়, বর্ষের মধ্যে তাহা পরিশোধ করিলে এক মণে দেড় মণ এবং বীজের জন্য যে কোন শস্য গ্রহণ করে, তাহা এক মণে দুই মণ দিতে হয়। ইহার মধ্যে আদান প্রদান কালে মাপেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কয়ালি, মুটিদারি, চৌকিদারি এবং গোলা শুক্তি প্রভৃতি অনেক বাবও ইহার অন্তর্বর্তী আছে। বোধ কর, আষাঢ় মাসে একজন প্রজা বীজ ধানের জন্য বিংশতি মণ ধান্য বাড়ি লইল। সেই সময়ে টাকায় দুই মণ ধান্য বিক্রয় হইতে ছিল, তাহার পর নয় মাস কাল গত না হইতেই পৌষ মাসে (এ মাসে প্রায় টাকায় এক মণ ধান্য বিক্রয় হইয়া থাকে) প্রজা বিশ মণের স্থানে চল্লিশ মণ এবং বাব সাহেবও আর দশ মণ ধান্য না দিয়া নিস্তার পায় না। ইহাকে কি শতকরা শতকরায় অধিক সুদ বলা যায় না? অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে রাজনিয়ম দ্বারা এই কুৎসিৎ রীতি অনুমোদিত হইয়াছে। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারায় শতকরা এক টাকা হারে সুদ গ্রহণের নিয়ম হয়, পশ্চাৎ ১৮৫৫ সালের ১০ আইন এবং ১৮৭১ সালের ২৩ আইনের ১০ ধারায় তাহার অন্যথা হইয়া এই নিয়ম হয় যে, উত্তমর্ণ

আপনার ইচ্ছামত সুদ লইতে পারিবেন। তাহাতে পূর্বাপেক্ষা প্রজার কষ্ট শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। সত্য বটে, মহাজন না থাকিলে সহায় সম্বলহীন কৃষিজীবি প্রজার যথাকালে কৃষি কর্ম সম্পাদন করা কঠিন হইত; তাহা বলিয়া কি এত অত্যাচার ন্যায়সঙ্গত হয়? সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, জমিদার বাকী খাজনার নিমিত্ত দরিদ্র প্রজার ফলোন্মুখ শস্য নিলাম করাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমত সময় মহাজন টাকা দিয়া তাহার রক্ষা করে। কিন্তু পরিণামে তাহা ব্যাঘ্র মুখ হইতে ছাগল রক্ষা করিয়া নিজে ভক্ষণ করিবার ন্যায় হইয়া পড়ে। প্রস্তাবের উপসংহারকালে কর্তৃপক্ষকে আমাদিগের অনুরোধ এই তাহারা উভয় দলের লাভালাভ ও উপকার অপকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উভয়ের রক্ষার্থ উৎকৃষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন।

সোমপ্রকাশ ১২৭১ আশ্বিন ৪

লান্ডহোলডার্স সভার প্রশ্ন ও তাহার উত্তর

গত জুলাই মাসে লান্ডহোলডার্স সভা যাবতীয় নীলকরের নিকটে এক সরকুলর পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "পর্যায়ক্রমজাত শস্যের মত নীলবপন করিলে ভূমির অনিষ্ট হয় কিনা?' কয়েকজন নীলকর তদুত্তরে বলিয়াছেন দুই বৎসর ধান্য দিয়া তাহার পর বৎসর অন্য শস্য উৎপাদন করিয়া প্রজারা চতুর্থ বর্ষে ভূমি ফেলিয়া রাখে, কিন্তু ফেলিয়া না রাখিয়া যদি নীল করা হয়, ভূমির কোন অনিষ্ট হয় না। লান্ডহোলডার্স সভা এইরূপে উত্তর সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, নীলে ভূমির উর্বরতা শক্তির হ্রাস হয় না। তাহাদিগের কৃত এই সিদ্ধান্তটি "খায় ভাত উগারে পিঠে" বলিয়া যে একটি মহার্থ সামান্য প্রসিদ্ধ কথা আছে, তাহার স্বরূপ হইয়াছে। এক বিষয়ে বিবাদ চলিয়াছে, অন্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে। নীলবপন করিয়া প্রজাদিগের শ্রমানুরূপ পুরস্কার লাভ হয় না। এই নিমিত্ত তাহারা নীলের কৃষিকার্যে বিমুখ। ইহারই কোন উপায় বিধান ও মীমাংসা আবশ্যক। কিন্তু ল্যান্ডহোলডার্স সভা সেদিক দিয়া যাইতেছেন না। একবিধ প্রশ্নের অপরবিধ উত্তর অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই। কোন কোন নীলকর নীলের প্রতি প্রজারা অনুরক্ত ইহা জানাইবার নিমিত্ত বলেন "নীলবপন ও করবৃদ্ধি এ উভয়ের মধ্যে প্রজারা নীলবপনই মনোনীত করে।"

নীলকরেরা যেরূপ মনে করেন, ইহার তাৎপর্য সেরূপ নহে। ইহার তাৎপর্য এই, নীলবপন ও করবৃদ্ধি উভয়ই প্রজার অভিমত ও বিদ্বিষ্ট, তাহার মধ্যে করবৃদ্ধি অধিকতর বিদ্বেষের বিষয়; তাহারা বরং নীলবপন ঘটিত অনিষ্ট স্বীকার করিতে পারে তথাপি করবৃদ্ধি স্বীকার করিতে পারে না। জেমস হিল সাহেব গর্বপূর্বক বলিয়াছেন "আমার প্রজারা পাঁচ বৎসরকাল যে অবস্থায় ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক দরিদ্র হইয়াছে, তাহারা ও তাহাদিগের পরিবারগণ তাহার এই কারণ নির্দেশ করে, পূর্বে নীলকুঠি হইতে তাহারা যে টাকা পাইত, তাহা আর পায় না, তাহাতেই এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে।" পাঁচ বৎসরকাল তাহারা যে মকদ্দমায় মকদ্দমায় উৎসন্ন হইয়াছে, পরিশেষে সর বার্ণেস, পিককের আজ্ঞানুসারে হিল সাহেব পাঁচ আনা খাজনা স্থলে এক টাকা কর লইতেছেন, তন্মূলক

প্রজার যে কষ্ট হিল সাহেবের প্রিয় প্রজারা ও হিল সাহেব স্বয়ং তাহার নির্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। নীলের দাদন পৈতৃক রোগের ন্যায় সে পুত্র পৌত্রাদিকে আক্রমণ করে, বোধ হয় একথাটিও প্রজাদিগের সহিত হিল সাহেবের মনে হয় নাই।

এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, বুনা ধান্যক্ষেত্রে যে বলপূর্বক নীলবপন করা হয়, তাহা নীলকরেরা অস্বীকার করেন কি না? কেবল একজন নীলকর বাক্যে আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। বডারি কুটির টি. ই. ওমান সাহেব বলিয়াছেন নীলকরেরা পূর্বে যে টাকায় ছয় বাণ্ডিল নীল লইতেন, তাহা লইলে কোনক্রমে নীলের কৃষিকার্য চলিবে না। যাহারা চারি বাণ্ডিল লইয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারেন তাহাদিগের নীলবপন বন্ধ করিয়া প্রজাকে কনট্রাক্ট হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। ওমান সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, যাবতীয় ব্যয় বাদে ইক্ষুক্ষেত্রের প্রতি বিঘায় ২৫ অবধি ৫০ টাকা পর্যন্ত লাভ থাকে। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, নীলে তাহা কখন হয় কি না? নীলে যদি তাহা না হয়, প্রজারা লাভের অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া অলাভ বাণিজ্যে যাইবে কেন? ওমান সাহেব আর যে কয়টি ন্যায়োপেত কথা কহিয়াছেন, তাহারও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি বলেন "নীলকর হউক আর প্রজা হউক যাহারা আইন বিরুদ্ধ কাজ করিবে, গভর্ণমেন্ট তাহাদিগের দণ্ড করুন এবং এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে সাবধান করিয়া দিন, তাহারা অবচ্ছেদা-বচ্ছেদে যাবতীয় নীলকরের প্রতি দোষারোপ না করেন।" গভর্ণমেন্ট অপরাধীর অনুসন্ধান করিয়া দণ্ড করেন, আমরাও সর্বদা এই অনুরোধ করিয়া থাকি। তদ্বিষয়ে গভর্নমেন্টের তাদৃশ যত্ন নাই বলিয়া আমরা সর্বদা ক্ষোভও প্রকাশ করিয়া থাকি। এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের বিষয়ে তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, সমাচার সম্পাদকদিগের এরূপ অভিপ্রেত নয় যে তাহারা ভদ্র নীলকরদিগেরও দুর্নাম করেন। তবে যে তাহারা সাধারণেও কোন কোন দোষের উল্লেখ করেন, তাহার তাৎপর্য এই, নীলকরদিগের অধিকাংশ সেই দোষে দূষিত, ইহা প্রমাণ করিয়া দেওয়াই তাহাদিগের অভিপ্রেত। তাহারা বলেন করবৃদ্ধি না করিয়া কয়েক বিঘা নীল করাইয়া লইলে প্রজাদিগের ইষ্ট বিনা অনিষ্ট নাই। কিন্তু তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার লাভ সম্ভাবনা কি? গুরুতর অনিষ্টের ভয়ে সামান্য অনিষ্ট স্বীকার কর্তব্য বলিয়া যে নীতি আছে, ইহা তাহার উদাহরণস্থল নহে। নীলকরেরা প্রজার শোণিত পান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইবেন ইহা কি কখন সঙ্গত হইতে পারে? সমুদায় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু নীলের...। ইহা কি স্বাধীন বাণিজ্যের বিরুদ্ধ নহে? নীলকরেরা চারি বাণ্ডিল স্থলে ছয় বাণ্ডিল লইতেছেন, ইহা কি অত্যাচার নহে? তবে তাহারা এক করবৃদ্ধির কথা বলেন। সে বিষয়ে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই তাহারা ধর্মত বলুন দেখি, প্রজারা কি বার্ণেস পিককের অনিষ্ট মূল আজ্ঞানুসারী করদানে সমর্থ কি না? লাভ না হইলে প্রজারা কেন নীলবপন করিবে? পূর্বে যাহা হউক কিঞ্চিৎ দাদন দেওয়া হইত, এক্ষণে নীলকরেরা বিনামূল্যে নীল লইবার চেষ্টায় আছেন। লাণ্ড হোলডার্স সভা যেরূপ বলুন তাহাদিগের যে এই চেষ্টা তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। লেপ্টেনন্ট গভর্নর সভার পত্রের উত্তর স্বরূপ যথার্থ বলিয়াছেন নীল পর্যায় শস্য কিনা সে কথা হইতেছেন না। প্রজারা যে মূল্য পায়, তাহা পর্যাপ্ত কিনা তাহাই বিবেচ্য হইতেছে। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন নীলকরেরা করবৃদ্ধির ভয় প্রদর্শন করিয়া

অদ্যাপি নীলবপন করাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন না, এই উপায় কখন বাণিজ্য সম্বন্ধে লাভকর হইতে পারে না। সেক্রেটারি ইডেন সাহেব বলেন "৪ জুনে আমি যে প্রত্যুত্তর দি তাহাতে লেপ্টেনন্ট গভর্নর যদিও স্বীকার করেন, পর্যায়জ শস্য লাভকর বটে কিন্তু নীলকরের সহিত কৃষকদিগের যে বিবাদ আছে, নীলের পর্যায়োৎপাদন দ্বারা তন্নিবারণ সম্ভাবনা নাই।"... তিনি বলিয়াছেন বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের কিসে লাভ ও ক্ষতি হয় তাহারা তাহা বুঝিতে পারে। গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ অনিষ্ট ও অত্যাচারের মূল হইবে।" লেপ্টেনন্ট গভর্নর তৎপরে বলিয়াছেন নীল যদি লাভকর হয়, এবং প্রজা ও নীলকর উভয়ে তাহা জানেন তবে নীলকরেরা সহজে নীল হইতে পারে না কেন? যদি তাহাতে লাভ হইত তাহা হইলে অর্থোপার্জন স্পৃহাপরতন্ত্র হইয়া প্রজারা অবশ্য নীলবপন করিত। লেপ্টেনন্ট গভর্নর পরিশেষে বলেন "এক্ষণে করবৃদ্ধির স্বত্ত্ব এক প্রকার স্থির হইয়াছে এবং নূতন রেজিস্টারি আইনে জাল বন্ধ হইতেছে। অতএব এরূপ আশা করা যাইতে পারে, নীলকরেরা আদালতের আশ্রয় না লইয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে যথার্থ ও ন্যায়সিদ্ধ কর লইবেন, তাহা হইলে নীল ও করের স্বতন্ত্র হিসাব ও প্রভেদ থাকা যে উচিত তাহা হইবে।" লেপ্টেনন্ট গভর্নর বৃথা আশা করিয়াছেন। পূর্বতন মুসলমানেরা যেরূপ পরাজিত জাতিকে এক হস্তে কোরাণ আর অপর হস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া বলিত, নীলকরেরাও সেইরূপ প্রজাদিগকে বলিতে থাকিবেন "বিনামূল্যে নীলবপন কর, নচেৎ সর বর্ণেস পিককের লাঠি পড়িবে।" এত কাণ্ড হইল, তথাপি তাহারা নীল ও ভূমি করের হিসাব পৃথক করিলেন না। তাহারা এখনও ভয় প্রদর্শন করিয়া নীলবপন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। লেপ্টেনন্ট গভর্নর কখন ভাবিবেন না যে নীলকরেরা বিনামূল্যে নীল বপন ত্যাগ করিবেন। উল্লিখিত পত্রগুলি দ্বারা তাহারা গভর্নমেন্টকে কেবল স্বীকার করাইয়া লইলেন যে তাহারা প্রজাদিগের পক্ষ। এই সুবিধাটি তাহাদিগের পক্ষে ঘটিয়া রহিয়াছে।

উপসংহারকালে আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি সে সমস্ত প্রজা এক্ষণে কর বৃদ্ধির ভয়ে নীলবপন করিতেছে তাহারা সকলেই অসন্তুষ্ট, সকলেই বলিতেছে প্রধানতম বিচারালয় তাহাদিগের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। অতএব সুযোগ পাইলেই তাহারা নীলবপন ত্যাগ করিবে। বলপূর্বক কাজ কিছু দিন চলিতে পারে। বিডন সাহেবের রাজত্বকালে কোন গোল না হইতে পারে। কিন্তু যখন অত্যাচার স্পষ্ট রহিল, তখন বিবাদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিল। নিপীড়িত কৃষকেরা সুযোগ পাইলে পুনর্বার মস্তকোত্তলন করিবে সন্দেহ নাই। স্বার্থান্ধ নীলকরেরা সেই অনিষ্ট দূরবর্তী ভাবিয়া আপাতত সুস্থচিত্ত হইতে পারেন, কিন্তু যে গভর্নমেন্ট দীর্ঘকাল স্থায়িতার আশা করেন, তাহারা ইহা তুচ্ছ করিতে পারেন না। এই বিবাদের মূলোৎপাটন করা অতি আবশ্যক। আমরা সহস্রবার ইহা বলিয়াছি, এবং পুনরুক্তির ভয় না করিয়া আবার বলিতেছি কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই একমাত্র উপায়।

সোমপ্রকাশ ১২৭১ অগ্রহায়ণ ২৮

দুরাত্মা জমিদারদিগের হস্ত রোধ করিবার একটি উপায় করা আবশ্যক

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অশ্বশালার বানর হইয়াছে। যেখানে যত দৌরাত্ম্য হউক, ঘোড়ার আপদ বালাইয়ের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্কন্ধে পতিত হয়। কত লোক কত প্রকার আক্রোশ প্রকাশ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অসৎ জমিদারেরা অসাধুতা করিতেছে, প্রজার উপরে অত্যাচার করিতেছে, তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ কি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি অত্যাচার করিবার উপদেশ দেয়? প্রজার কল্যাণ উদ্দেশ করিয়াই এ বন্দোবস্ত করা হয়। এতদ্বারা লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রশস্তহৃদয়তারই পরিচয় হইয়াছে। যদি কেহ বলেন, লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে এ আপদ ঘটিত না, এটি অকিঞ্চিৎকর বাক্য। জগদীশ্বর সৃষ্টি রক্ষার্থই প্রজননশক্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু যদি কেহ অত্যাচার করিয়া অপরের সেই শক্তির বিনাশ সম্পাদন করে, ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ ন্যায়ানুগত হয় না। অত্যাচারকারী জমিদারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের উপায় বিধান কি সাধ্যায়ত্ত নয়? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করা সে উপায় হইতে পারে না। অনেকে ইংরাজদিগের বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া অনেক ব্যয় ও অনেক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এখন যদি উহার অন্যথা হয়, কেবল যে ইংরাজদিগের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ ঘটিবে এরূপ নয়, অনেকে অনেক প্রকার আপদে পতিত হইবেন। সে সমস্ত আপদের কথা চিন্তা করিলে অন্তঃকরণ একান্ত আকুলিত হয়। তন্নিমিত্ত আমরা অনেকদিন অবধি এই প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, জমিদারদিগকে মধ্যে রাখিয়া এরূপ একটি বন্দোবস্ত করা উচিত যে জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে এক পয়সা অধিক লইতে না পারেন।

ইচ্ছা করিয়া পত্তন দরপত্তন প্রভৃতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। অনেকবার এই সোমপ্রকাশে এগুলি রহিত করিবার এক বিধি-বিধানের অনুরোধ করা হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

প্রজার মঙ্গল সাধন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্তার অভিপ্রেত ছিল বটে, তদনুরূপ সুবিধান কিছুই হয় নাই। তবে ১৮৫৯ অব্দের ১০ ও ১৮৬৯ অব্দের ৮ আইনের দ্বারা যে কিছু সুব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হইবার অনেক বিঘ্ন রহিয়াছে। যে হেতু ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমা নির্ণয়ার্থ জমিদার প্রভৃতির প্রদত্ত পাটওয়ারি জমাওয়াশীল প্রভৃতি কাগজে প্রজাগণের জমা লিখিত ছিল। ঐ কাগজের দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বের জমা প্রমাণ করা সুসাধ্য হইত। কোন কোন জেলার প্রজাগণের দুর্ভাগ্যবশত সে কাগজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাজপুরুষগণের কাগজ নষ্ট করা একটি রোগ হইয়াছে। কেবল প্রজাগণের অশেষবিধ ক্ষতি ক্লেশ হয়। ইহাতে কাগজ নষ্ট করিবার বিধির প্রণেতা রাজপুরুষগণ প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন এবং ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কেবল জমিদার তালুকদার প্রভৃতির প্রকৃত উপকার দর্শিয়াছে। তাহারা নির্বিঘ্নে প্রচুর লাভ করিতেছেন। অধীনস্ত প্রজাপুঞ্জের যথাসর্বস্ব শোষণ করিয়া ক্রমে তাহাদিগের লোভের বৃদ্ধি হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির প্রজারা কি পরিমাণে ও কি নিয়মে কর দিবে, তাহার একটি সুবিধান হইলে ভূম্যধিকারিগণের দৌরাত্ম্য হইতে নিঃস্ব প্রজারা পরিত্রাণ পাইতে পারে। ফলত জমিদারগণের হস্তবুদের কাগজ দর্শন করিয়া যেমন চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত ও জমা ধার্য হইয়াছিল, তদনুরূপ কোন একটা উপায়ের দ্বারা নিম্ন শ্রেণির প্রজাগণের একটি স্থায়ী জমা নির্ণয়ের বিধান হইলে জমির প্রতি প্রজার মমতা জন্মে। ভূমির উন্নত অবস্থা দেখিলে এক্ষণে জমিদার পত্তনিদার প্রভৃতি নানা কৌশল দ্বারা প্রজাগণের কর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, এই শঙ্কাবশত প্রজারা কোন কারণে কখন দায়গ্রস্ত হইলে ঐ সকল জমা বন্ধক বা কোনরূপে হস্তান্তর করিয়া তদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না। এই জন্য প্রজারা ভূমির অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত অধিক পরিশ্রম করেন না।

বঙ্গদেশে আর একটি পাকা জুয়াচুরির সৃষ্টি ও তাহা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকানেক ভূম্যধিকারী পত্তনি বন্দোবস্ত করিবার ঘোষণা করিয়া দেন। দুর্বৃত্ত ও প্রজাঘাতক ধানবানেরা যাইয়া ডাক শুরু করেন অর্থাৎ কেহ বলেন, যত সেলামি দিব তাহার শকতরা ။০ আনা হিসাবে সুদ ও ။০ আট আনা হিসাবে সরঞ্জামী হস্তবুদ জমা হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই জমা ধার্য করিয়া আমাকে দেন। কেহ বলেন, আমি সুদ সরঞ্জামী কিছুই চাই না। মফস্বল যত হস্তবুদ আছে তাহাই জমা ধার্য ও তৎপরিমাণে কি তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে যত টাকা হয় সেলামি দিব এবং ঐ হস্তবুদ মফস্বলে যাচাই করিতে চাহি না; এইরূপ কথা ও ডাক হইতে হইতে যতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা করিয়া সেই সেলামিই গ্রহণে বিশেষ লাভ হয়, এরূপে পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া রীতিমত তাহার লেখাপড়া করিয়া লইয়া পত্তনিদারের হস্ত খড়্গ দিয়া বিদায় করা হয়। পত্তনিদার মফস্বলে আসিয়া দেখেন, জমিদারের প্রদত্ত হস্তবুদে অনেক মিথ্যা আছে। কি করেন, তথায় ঐ মিথ্যা হস্তবুদ এবং নিজের সরঞ্জামী ও অন্য অন্য খরচ ও সেলামি টাকার সুদ প্রভৃতি বাদে আপনার লাভ করিয়া লওয়ার জন্য প্রজাদের মস্তকে খড়্গাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হন। আমাদিগের রাজপুরুষেরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া ১০ ও ১৫ বৎসরের মধ্যে যে সকল পত্তনি, দরপত্তনী তালুকের সৃষ্টি হইয়াছে. তাহার পাট্টা ও কবুলতি ও মফস্বলের হস্তবুদ তলব ও তদন্ত করিয়া দেখিলেই ঐ সকল জুয়াচুরি অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

কোনস্থানের একজন নির্দয় জমিদার চতুরতা করিয়া মফস্বলের প্রজার প্রকৃত হস্তবুদ অপেক্ষা অধিক জমা ধার্য করিয়া স্বীয় জমিদারি পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া প্রচুর সেলামি গ্রহণ করেন। ভদ্রলোক পত্তনিদার শেষে অধিক করভার বহনে অসমর্থ হওয়াতে ১৮১৯ অব্দের ৮ আইন অনুসারে ঐ পত্তনি নিলাম করা হয়; কিন্তু লোকসানী মহল জানিয়া অন্য অন্য ধনবান জমিদার (যাহারা প্রজাপীড়নে অপটু) তাহারা কেহই ক্রয় করিতে অগ্রসর হয না। কেবল একজন সঙ্গতিশালী প্রজাপীড়ক জমিদার মহাশয় উল্লিখিত লোকসানের বৃত্তান্ত উত্তমরূপে জ্ঞাত থাকিয়াও উহা ক্রয় করিয়া এক্ষণে ঐ নাজাই জমা ও সরজামী ও অন্য অন্য খরচা ও পণের টাকার সুদ ও পত্তনিদারের লভ্য এই কয়টির সংগ্রহার্থ প্রথমতঃ প্রজাগণের নিকট তাহারদের জমার উপরে ফি টাকায় তিন চারি আনা হিসাবে আবুআব চাহেন। ইহা না দেওয়াতে ন্যায্য কর গ্রহণে অসম্মত হইয়া ঐ সকল প্রজার অন্য অন্য নিষ্কর ইত্যাদি ভূমি স্বীয় পত্তনির ভূমি বলিয়া জরিপ করিতে সচেষ্ট ও সুদ সহিত অবশিষ্ট করের দাওয়া এবং অন্য অন্য প্রকার মকদ্দমা প্রজাগণের বিরুদ্ধে উপস্থিত করিতেছেন। ইচ্ছা এই যে, তাহাদিগকে নানা প্রকার খরচা ইত্যাদিতে বিব্রত করিয়া স্বীয় অভিষ্ট সাধন

করিবেন। ভাল, সম্পাদক মহাশয়! নিরীহ দুস্থ প্রজারা উপরিউক্ত মত বর্ধিত জমায় পত্তনি বন্দোবস্ত করিতে পত্তনিদাতা বা গ্রহীতাকে অনুরোধ করে নাই এবং ঐ লোকসানী পত্তনি মহল ক্রয় করিতেও দিব্য দেয় নাই। তবে কি অপরাধে তাহারা এক্ষণে ঐ ক্ষতিপূরণ ও লাভ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে? পত্তনির নিলাম ক্রেতা তাহার অতিপূরণ ও লাভ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। পত্তনির নিলাম ক্রেতা তাহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করুন, যদি তাহা না হয় এবং লোকসান দিতে না পারেন, তবে ক্রয়স্বত্ব পরিত্যাগ করুন। নিরীহ প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া স্বীয় উদর পূরণ করা কর্তব্য হয় না।

অন্যায় বল প্রকাশ ও জরিপ এবং কর গ্রহণ ইত্যাদি অত্যাচার নিবারণ ও ন্যায্য কর গ্রহণে অসম্মত হইলে সুদ খরচায় অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত রাজপুরুষগণ হইতে বিবিধ প্রকার আইন হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই আইন অনুসারে প্রবল জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকে অর্থাৎ মকদ্দমাদির ব্যয় করিয়া উঠে, এমন সঙ্গতিসম্পন্ন ও সাহসী প্রজা প্রায় কোন দেশে নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া অবধি এ পর্যন্ত ঐ প্রদেশে ভূমি জরিপ বা প্রজার কর বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু জমিদারকে ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে যে মালিকানী সরঞ্জামী দেওয়া হয়, জমিদার তদপেক্ষা প্রচুর লভ্য ভোগ করিতেছেন। তাহার উক্ত অবধারিত সদর জমা ও মালিকানী সরঞ্জামীর অন্যথা হয় নাই, ভূমির বা প্রজার উন্নতির নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতেও হয় নাই, তবে এক্ষণে প্রজার কর কি জন্য বৃদ্ধি হইবে? ঐ বন্দোবস্তের পর জমিদার কোন কোন প্রজার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সত্য তাহাও স্বীয় বিবেচনানুসারে লাভ হয়, এরূপ করিয়া বন্দোবস্ত ও কর গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু তাহার ইচ্ছা ও সম্মতি প্রজারা জমিদারকে জোর করিয়া ঐ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে ও কর দিতে পারে নাই। যখন জমিদারের প্রচুর লভ্য থাকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাহার অধীন পত্তনিদারের স্বীয় লভ্যের নিমিত্ত প্রজার উপরে কর বৃদ্ধি করা কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। জমিদার একাল পর্যন্ত সে প্রজার নিকট যে পরিমাণে কর গ্রহণে লাভ করিয়াছেন, পত্তনিদারের সে প্রজার নিকট অধিক কর লওয়ার প্রত্যাশা করা অন্যায়। পত্তনিদার পরিশেষে না জানিয়া শুনিয়া যদি বিষপান করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত নির্দোষ প্রজারা কি ফাঁকে যাইবে, আমরা যন্ত্রণা ভোগ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, রাজপুরুষেরা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া এই সমস্ত অত্যাচারের নিবারণ করুন।

সোমপ্রকাশ ১২৭৮ মাঘ ৯

রায়তদিগের সভা

আমরা সমাচারপত্র পাঠে জানিলাম, কৃষ্ণগঞ্জে রায়তদিগের একটা মহতী সভা হইয়া গিয়াছে। রেন্ট বিল নামে জমিদারি করসংক্রান্ত আইনের উপস্থিত পাণ্ডুলেখ্যটি যাহাতে বিধিবদ্ধ হয়, গভর্নমেন্টে সেই প্রার্থনা করা হইবে, সভায় এই স্থির হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি, করসংক্রান্ত উল্লিখিত আইনটি হিন্দু ও মুসলমানের উপাসনার দিক ও ভোজনপাত্র কদলীপত্র হইয়া উঠিয়াছে। সতিনীর বাটি বলিলেও হয়। হিন্দুরা পূর্বদিকে আপনাদিগের উপাসনাকার্যের প্রশস্ত দিক বলিয়া স্থির করিলেন, মুসলমানেরা অমনি তাহার বিপরীত পশ্চিম দিক অবলম্বন করিলেন। দেব দিবাকরের তীব্র করজালে যে

মুখমণ্ডল দগ্ধ হইবে, সে বিবেচনা করিলেন না। হিন্দুর বিপরীত আচরণ করা চাই বলিয়া তাহাও শ্রেয়োজ্ঞান হইল। হিন্দুরা কদলীপত্রের মসৃণ ও চিক্কন পৃষ্ঠে ভোজন করেন, মুসলমানের তাহার বিপরীত করা চাই, অতএব তাহারা কদলীপত্রের বন্ধুর ও অপরিষ্কৃত পৃষ্ঠটি ভোজনার্থ শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন। এক সতীন ঈর্ষাপরবশ হইয়া অপর সতীনের বাটিতে অতি অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করিল। অপবিত্র দ্রব্য সংযোগে সপত্নীর বাটিটি নষ্ট হইবে, এই তাহার লক্ষ্য; অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণে যে আপনার অনিষ্ট ঘটিবে, সে বিচার নাই।

কলিকাতায়, বাঁকিপুরে ও অন্য স্থানে জমিদারেরা সভা করিয়া রেন্ট বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন, রাইয়তদিগের তাহার বিপরীত করা চাই, অতএব তাহার অনুমোদন করিয়া যাহাতে তাহা বিধিবদ্ধ হয়, রাইয়তদিগের সভা সেই চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। আমরা দুঃখিতচিত্তে দেখিতেছি, উভয় পক্ষ কেবল বিবাদমগ্ন হইয়াছেন, কোন পক্ষই আপনাদিগের ইষ্টানিষ্ট দর্শন করিতেছেন না। রেন্ট বিলটি এখন যে আকারে আছে, উহা যদি ঐ আকারে বিধিবদ্ধ হয়, উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট হইবে। অতএব উভয় পক্ষের একপরামর্শী হইয়া করা উচিত, উভয়ে যদি উভয়ের স্বার্থরক্ষা করিয়া এক পরামর্শী হইয়া কার্য করেন, উভয়েরই মঙ্গল হইতে পারে।

আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, জমিদারদিগের আর ভদ্র নাই। প্রজারা এখনই ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে ক্রমে যে উহারা উপরি পদ আক্রমণ করিবে, তাহার উপক্রম দেখা যাইতেছে। মহাকবি কালিদাসের একটি মহার্ঘ কাব্য আছে ঃ

নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।

শকট চক্রের নিম্নস্থ অংশ গমন কালে যেমন উপরে উঠে এবং উপরিস্থ অংশ নিম্নে আইসে, সেই রূপে মানুষের দশা বিপর্যয় ঘটিতেছে।

জমিদারেরা এত দিন প্রজাদিগকে রসাতলে দিয়াছিলেন, যা ইচ্ছে তাই করিয়াছেন, তাহাদিগকে যার পর নাই কষ্ট দিয়াছেন, এখন তাহাদের সময় উপস্থিত। জমিদারেরা নিজ দেশে ও তাহাদের মূর্খ কর্মচারির দোষে ক্রমে অপদস্থ হইতেছেন। এখন সেই পূর্বের মত পৌষ মাসের রাত্রিতে পুষ্করিণীতে স্নান করাইয়া পাখার বাতাস দেওয়া ও রস খাওয়ান এবং জৈষ্ঠ্যমাসের দারুণ গ্রীষ্মে চুনের গুদামে বন্ধ করা নাই বটে, কিন্তু এখনও জমিদারের মূর্খ কর্মচারিরা আইনবিরুদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠানে বিমুখ নহে। আমরা কয়েকদিন শুনিতেছি, একজন জমিদারের গোমস্তা বলপূর্বক প্রজার ধান্য কাটিয়াছিল বলিয়া হাজতে গিয়াছে। এ মূর্খতা কেন? গভর্নমেন্ট যেমন প্রজার হিতসাধন চেষ্টা পাইতেছেন, তেমনি জমিদারের সুবিধা করিয়া দিবার বিষয়েও অনিচ্ছুক নহেন। যে প্রজা দুষ্টতা করিবে, জমিদার জানিতে পারেন, সময়ে আদালতে জানাইয়া অনায়াসে তাহার শস্য ক্রোক করিয়া আপনার টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। এমন সুগম পথ থাকিতেও বেআইনী কাজ করিয়া কেবল আপনাদিগের মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হয় এই মাত্র। সমাচার পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম, বাবু নফরচন্দ্র পালের লোকে প্রজাকে বন্ধন পূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, জাইন্ট মাজিস্ট্রেট স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া নফর বাবুর লোকের কারাদণ্ড দিয়াছেন। যখন রাজপ্রতিনিধিদিগের জমিদারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন তাহাদিগের সাবধান হইয়া চলা উচিত। প্রজারাও এই সময়ে রাজপ্রশ্রয় পাইয়া বজ্জাতি আরম্ভ করিয়াছে। আমরা একবার শুনিয়াছিলাম, আমাদের এ অঞ্চলের একজন জমিদার কয়েকজন প্রজাকে ডাকাইয়াছিলেন। তাহার লোকে প্রজাদিগকে বন্ধন বা প্রহার করে নাই, তাহার লোকে

প্রজাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছিল এই মাত্র। কিন্তু প্রজারা এমনি দুষ্ট, যে তাহারা বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারির কাছে গিয়া এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল যে জমিদারের লোকে তাহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কোন কোন প্রজা বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া দড়ি আনিয়াছিল, সেই দড়ি বাহির করিয়া আপনা আপনি দুই একজনকে বাঁধিয়া ফেলিল নফর বাবুর প্রজাদিগের সে ঘটনা ঘটন সম্ভাবিত নয়।

নফর বাবুর কথায় জমিদারদিগের আর একটি মহৎ দোষের কথা আমাদিগের মনে পড়িয়া গেল, তাহার উল্লেখ না করিয়া নীরব হইতে পারিলাম না। অনেক যশোলিপ্সু ক্ষুদ্রাশয় জমিদার আছেন, তাহারা বাহিরে মহাদান করিয়া বাহাদুরি করেন কিন্তু তাহাদের দানের টাকা প্রজার শোণিত শোষণ করিয়া আদায় করা হয়। নফর বাবু কেবল ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু অনেকে অন্তসলিলে বহিয়া থাকেন। আমাদিগের রাজপুরুষেরা দান দেখিয়াই ভুলিয়া যান, কিন্তু ভিতরে যে কি কাণ্ড হয়, তাহা বুঝিতে পারেন না। তাহারা নিশ্চয় জানিবেন, ব্যবসায়ের উপরে কর করিলে যেমন দরিদ্র ক্রেতাদিগকে তাহার ভার বহন করিতে হয়, জমিদারেরা যে দান করেন, তাহার অধিকাংশের অর্থভার দরিদ্র প্রজাদিগকে বহন করিতে হয়। জমিদারের লোকেরা জলৌকার ন্যায় প্রজার নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করেন। এটিও জমিদারদিগের নিন্দা ও অপদস্থ হইবার একটি প্রধান কারণ হইয়াছে।

সকল জমিদারেই যে ঐ নিন্দনীয় নিকৃষ্ট কর্ম করেন, আমরা এই কথা বলিতেছি না, রাজপুরুষেরা যেন এ সিদ্ধান্ত না করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ও পাইকপাড়ার রাজা প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান জমিদার আছেন, তাহাদের জমিদারিতে পীড়ন নাই, অথচ তাহাদের দানশোভায় দেশ সুশোভিত হইয়াছে।

উপসংহারে আমরা জমিদার ও প্রজা উভয় পক্ষকেই অনুরোধ করিতেছি, তাহারা পরস্পর বিরোধীভাব পরিত্যাগ করিয়া ঐকমত্যে আপনাদিগের চিরবিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া লউন। এমন সুসময় আর পাইবেন না। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে আছেন। তিনি বঙ্গদেশে অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি বঙ্গদেশের যেমন বিশেষজ্ঞ, রাজপুরুষদলে এমন লোক অতি অল্প আছেন। তিনি কোন পক্ষে পক্ষপাতী নন। উভয় দলের মঙ্গল হয়, তাহার এই ইচ্ছা। এ সময়ে যদি উভয় দলে পরস্পর-বিরোধ করিয়া আপনাদের অনিষ্ট জ্ঞাপনা করেন, তাহাতে ইডেন সাহেব দোষী হইবেন না।

সোমপ্রকাশ ১২৮৭ পৌষ ২৭

জমিদারদিগের সভা

১৭ নভেম্বর কলিকাতা টাউন হলে জমিদারদিগের একটা সভা হইয়া গিয়াছে, এদেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক জমিদার তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল. এল. ডি. আই. ই. সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি উৎসাহদায়িনী অতি সুন্দর একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। খাজনা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্যর বিষয়ে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদিগের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। অধিকাংশ কর্মচারী ঐ পাণ্ডুলেখ্যর বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন। গভর্নর জেনারেলের নিকটে এবং ভারতবর্ষীয় স্টেট সেক্রেটারির নিকটে আবেদন করা সভায় স্থির করা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি,

জমিদারেরা কিছু ভীত হইয়াছেন। ভীত হইবারও কথা বটে, তাহাদিগের চিরকেলে স্বত্ব ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। এই পাণ্ডুলেখ্যটি যদি বিধিবদ্ধ হয়, প্রজারা জমিদার ও জমিদারেরা প্রজা হইয়া উঠিবে। কে জমিদার কে প্রজা চিনিয়া উঠা ভার হইবে। কিন্তু আমরা শঙ্কার তত কারণ দেখিতেছি না। ইলবার্ট বিল ও রেন্টবিল দুটি উপস্থিত। ভারতবর্ষীয় গভর্নমেন্ট একটি ছাড়িয়া আর একটি বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। ইলবার্ট বিল যদি বিধিবদ্ধ না করেন, তাহা হইলে রেন্টবিলও বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। ইলবার্ট বিলও বিধিবদ্ধ করিবার বিষয়ে যেরূপ সৎ ও প্রবল হেতু আছে রেন্টবিল সম্বন্ধে সেরূপ নাই। এদেশীয়েরা উপযুক্ত হইয়াছেন। তাহারা এদেশীয়দিগের দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয়বিধ মকদ্দমার উত্তমরূপ বিচার করিতেছেন এবং ইউরোপীয়দিগের দেওয়ানি মকদ্দমারও সুবিচার করিতেছেন। তাহাদিগের বিচার করিবার ক্ষমতার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহারা আইনের সূক্ষ্মতত্ত্বও বুঝিতে পারেন। এমন উপযুক্ত বিচারপতির হস্তে যদি ইউরোপীয়ের ফৌজদারি মকদ্দমার বিচারভার দেওয়া না হয়, তাহার পর অন্যায় ও পক্ষপাত আর নাই। না দিবার যুক্তি কি? এদেশীয়েরা যদি অযোগ্য হইতেন তাহা হইলে সঙ্গত যুক্তি থাকিত, অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কিরূপে গুরুতর বিচারভার সমর্পণ করা যাইবে। যদি সে যুক্তি না রহিল, তবে আর যুক্তি কি? এদেশীয়েরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। এ যুক্তি সভ্য জাতির নিকটে কোনরূপে আদৃত হয় না। গোশেন সাহেবের লর্ড রিপনের পর ভারতবর্ষের গভর্নর জেনেরল হইবার কথা হইতেছে। তিনি জাতিতে ইহুদি, ধর্মেও ইহুদি ধর্মাবলম্বী। তিনি যদি কেবল এক যোগ্যতাবলে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনেরল হইতে পারেন, তাহার জাতি ও ধর্ম যদি প্রতিবন্ধকতাচরণ না করে, যোগ্য ভারতবাসীর জাতি ও ধর্ম প্রতিবন্ধক হইবে কেন? যদি বল পরাজিত জাতি ভারতবর্ষীয়েরা জেতৃ-জাতীয় ইংরাজদিগের বিচারকার্যে অধিকারী নয় এ যুক্তিরও সভ্য সমাজে আদর নাই। রোমকেরা যখন অতিশয় সভ্য হয়, তখন পরাজিত জাতীয়েরা জেতৃজাতীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া সমুদায় রাজকার্য নির্বাহ করিয়াছিল। ভারতেশ্বরী নিজ উদার ঘোষণাতেও স্পষ্ট বলিয়াছেন। অতএব এখন যদি ইলবার্ট বিল বিধিবদ্ধ না করা হয়, তাহা হইলে যে কেবল পক্ষপাত হইবে তাহা নহে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষও ঘটিয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে, রেন্টবিল যদি বিধিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে পক্ষপাত দোষ ঘটিবে। যাহার যে ভূমিতে কোন পুরুষে স্বত্ব নাই, তাহাতে তাহার স্বত্ব জন্মাইয়া দেওয়া হইবে। অতএব রেন্টবিল বিধিবদ্ধ করিলে কেবল পক্ষপাত নয়, যারপর নাই অন্যায় করা হইবে। অতএব আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ভারতবর্ষীয় গভর্নমেন্ট যদি ইলবার্ট বিল বিধিবদ্ধ না করেন, রেন্টবিলও বিধিবদ্ধ করা ন্যায়ানুগত হইবে না। এ অবস্থায় ইহাকে বিধিবদ্ধ করিতে গেলে, আমরা উপরে যে পক্ষপাত ও অন্যায় হইবার কথা বলিয়াছি, তাহাই ঘটিয়া উঠিবে। গভর্নমেন্ট মনে করিতেছেন, রেন্টবিল বিধিবদ্ধ করিলে প্রজারা সুখস্বচ্ছন্দায়াসী হইবে। বাস্তবিক সে ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষকদিগের এখন যে অবস্থা আছে তাহার কিছু সচ্ছল হইলে তাহারা অধিকতর বিলাসী ও অব্যবহিত হইয়া উঠিবে। বৃথা ব্যয়ে মত্ত হইবে। যদি তাহাদিগকে হস্তান্তর করিবার যোগ্য দখলীস্বত্ব দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা সেই স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া পৌত্র, পুত্র পৌত্রাদির বিবাহে ঘটা করিবে, তাহা হইলে তাহাদিগের যে অবস্থা মন্দ, সেই অবস্থাই থাকিবে। বস্তুত বলপূর্বক প্রজার নূতন স্বত্ব ঘটাইয়া দিলে

তাহাদিগের বিশেষ উপকার হইবে না। জমিদারের অনিষ্ট করা হইবে, এবং প্রজার ও জমিদারে শত্রুতা বৃদ্ধি হইয়া বিবাদের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। আমাদিগের শেষ বক্তব্য এই, জমিদারেরা যেরূপ উদ্যোগ করিতেছেন সেইরূপ করুন, যেরূপ আন্দোলন করিতেছেন, যেরূপ তারস্বরে চিৎকার করিয়া আত্মমনোভাব রাজগোচর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ করুন, নিরীহ ভালোমানুষটি হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে আমাদিগের রাজপুরুষগণের নিকটে নিস্তার থাকে না। যিনি চুপ করিয়া রহিলেন, আমাদিগের রাজপুরুষেরা তাহাকে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, তাহার কোন দুঃখ ও বিজ্ঞাপয়িতব্য নাই। অতএব জমিদারদিগের কর্তব্য জমিদারেরা করুন, কিন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে ইলবার্ট বিল যে আকারে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত করিয়া যদি বিধিবদ্ধ করা হয়, রেন্টবিল অপরিবর্তিতভাবে বর্তমান আকারে যে বিধিবদ্ধ হইবে, তাহা সম্ভাবিত নয়। যাহা হউক, জমিদারেরা যেন আন্দোলন কার্যে কোন ক্রমে বিরত না হন। বালকদিগের রোদন যেমন বল, আমাদিগের রাজপুরুষগণের নিকটে আন্দোলন তেমনি নিরুপায়ের বল।

সোমপ্রকাশ ১২৯০ অগ্রহায়ণ ১১

ধূমকেতু

বঙ্গের ভূস্বামিগণ
(প্রথম প্রস্তাব)

প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকের কঠোর পরীক্ষায় ধ্বংস কিংবা বিনাশ শব্দ এইক্ষণ ভ্রমাত্মক কিংবা অর্থশূন্য বলিয়া প্রমাণিত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। কেন না, সকল বস্তুরই রূপান্তর প্রাপ্তি অথবা অন্যরূপ পরিবর্ত আছে,--কাহারও ধ্বংস কিংবা বিনাশ নাই। কিন্তু নিত্যক্রিয়াশীলা পরিবর্ত-প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্ত নাই কেবল সত্যের। উহাই একমাত্র অবিকৃত বস্তু এবং এই জন্যই জ্ঞান প্রসূতি চিন্তা শুধু সত্যকে নির্ধারণ করিবার জন্যই সতত ব্যাপৃত রহে। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য-সাহিত্য, সকলই এই চিরসুন্দর সত্যের উদ্দেশ্য সৃষ্ট এবং এই জন্যই মানবজাতির প্রাণারাধ্য। কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি বুঝিব? কার না ইতিহাস আছে। যদিও এই জড়-জগতের যাবতীয় পদার্থেরই উত্থাপন-পতন বিষয়ে জল-বুদবুদের সঙ্গে উপমা হইয়া থাকে, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে এই মানব জাতি-শাসিত বিস্তীর্ণ ধরায় ঐ উপেক্ষিত জল-বুদবুদ হইতে আরম্ভ করিয়া, কিছুই ইতিহাসশূন্য নহে। চেতন, অচেতন কিংবা উদ্ভিদ, যে কোন পদার্থই হউক না কেন, যাহাই দোষ গুণের আধিক্যে, অবস্থাবিশেষে দুঃখ কিংবা সুখের কারণ হইয়াছে, তাহারই নাম মনুষ্য-জাতির ইতিহাসে, কোথাও বা বিভীষিকার শোণিতাক্ষরে, কোথাও স্মৃতির উপাস্যরূপে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। কোন জাতির, কি বিশেষ স্বত্বে স্বত্ববাণ তজ্জাতীয় কোন শ্রেণির বিষয় একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইলেই, উহার উৎপত্তি এবং প্রাথমিক অবস্থা হইতে বর্তমান পরিণতির মূলে, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসগত কোন বিশেষ অংশের রহস্য প্রকটিত রহিয়াছে, অতি সংক্ষেপে হইলেও, তাহার উল্লেখ আবশ্যক। সূক্ষ্ম আণবিক পরীক্ষা দ্বারা সাম্যের অখণ্ড প্রভাব প্রমাণিত করিতে পারিলেও, কার্যত সাম্যের বৈষম্যই আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে পতিত হইয়া থাকে। মানবজাতির অতি প্রাথমিক অবস্থা হইতেই, আমরা নিম্নোলিখিত দুইটি শ্রেণির পরিচয় পাইয়া থাকি। একটি প্রভূত্বের আসনে উপবিষ্ট; অন্যটি প্রভু-শক্তিদ্বারা পরিচালিত। জনসাধারণ হইতে দৈহিক কিংবা তদপেক্ষা বহু গুণে উচ্চতর মানসিক শক্তির স্ফুরণজনিত আকর্ষণ প্রভাবের বিশেষত্বই জাতিবিশেষের করধৃত বজ্র সৃষ্টি হওয়ার কারণ; এবং সেই বজ্রই কোথাও দ্রষ্টব্যে সিংহাসনারূঢ় সম্রাট, কোথাও বা চন্দ্রাতাপের প্রান্তবর্তী সচিব এবং কোথাও বা সৈন্যদলবেষ্টিত সেনাপতি। যাহারা রাজ্যেশ্বর, কিংবা অধিকার এবং প্রভুত্বের বিস্তার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলেই, রাজ-শীঘ্রই অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ, তাহাদের সম্পর্কেও এই একই কথা। এই প্রভু পদের মহিমা এতই বেশি যে, প্রথমে ইহা শক্তি দ্বারা অর্জিত হইলেও, উত্তরাধিকারিগণশক্তির অভাবেও পূর্বস্মৃতির গৌরব সাহায্যে কিছুকাল তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন। এই পদের সৎ কিংবা অসৎ ব্যবহারের সহিত বহুলোকের সুখ দুঃখের অতিঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে বলিয়াই, ইহা এত দায়িত্বপূর্ণ, এবং দায়িত্বপূর্ণ বলিয়াই, ইহার এত গৌরব

এবং গুরুত্ব। যিনি যে পরিমাণ তৎপরতার সহিত কঠিন ও কর্তব্যব্রত পালন করিয়া, এই প্রভুশক্তির পরিচালন করেন, তাহার নাম সেই পরিমাণে ভক্তির শ্রদ্ধার সহিত ইতিহাসে সংপৃক্ত থাকে। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ রাজাকে দেবতার অংশ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, এবং বস্তুতপক্ষেও যাহাতে আত্মসুখ অপেক্ষা আত্মত্যাগের মহিমাই অধিকতররূপে প্রকটিত হয়, তাহার সম্বন্ধে এরূপ স্তুতির ভাষা প্রয়োগ করা অসঙ্গত বলিয়া হয় না। আলোকের প্রকৃতি ও পরিণতি তত্ত্ব বুঝিতে হইতে যেমন পাঠ্য,—সূর্যের জগদুজ্জ্বল রশ্মি, তেমনই পরীক্ষার বস্তু সম্মুখ সামান্য একটি খদ্যোত।--কীট, এ উভয়ই যে প্রকৃতির সর্বব্যাপী সাম্যতত্ত্বে পরস্পর সন্নিহিত, ইহা যে না বুঝিল, তাহাকে বুঝাইবার জন্য বৃথা পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করি না। যাহারা বুঝিলেন তাহাদিগকে বলিব আসুন আমরা সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি অথবা সূর্যস্বরূপ সম্রাট ও মহাসম্রাটদিগের কথা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গীয় সমাজরূপ উদ্যানের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সাংসারিক শক্তির প্রতিনিধি অথবা খদ্যোতস্বরূপ স্বদেশীয় ভূস্বামীদিগের কথা লইয়া একটু আলোচনা করি।

ভারতবর্ষে ভূস্বামী বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ দেশেই বিদ্যমান। কারণ, ১৭৯৩ সালে, ২২ মার্চ, লর্ড কর্নওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনা করেন, তাহা একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতের আর কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, সংসার অসার কিংবা আত্মপরভেদ-ভ্রমান্ধতার পরিচায়ক বলিয়া জানিলেও, এই মর্তভূমির কর্মক্ষেত্রে বিধাতৃশক্তি দ্বারা নিয়মিত বৃত্তি সমূহের সাধারণ এবং স্বাভাবিক অনুশাসনে চিরস্থায়িরূপে, আপনার কি আপন জনের বলিয়া না জানিলে, কোন পদার্থের প্রতি তত মমতা জন্মে না। সুতরাং, তাহার উৎকর্ষ বিধানেও কাহার প্রাণ অগ্রসর হয় না। যে আত্মত্যাগের এত মহিমা ও গৌরব, তাহার কল্পনাও আত্মস্বত্ব নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে জন্মিতে পারে না। রহস্য এই যে, ইহা, বিস্তার এবং গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আত্ম-পর-ভেদ যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম করুক না কেন, প্রায় সকল স্থলেই, আত্মত্যাগের মূলে অহং নামের সার্থকতারূপ অতি সূক্ষ্ম থাকিয়া যায়। এই অপরিহার্য স্বার্থ, মানবজাতির গৌরবহানিকর নহে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে, সাময়িক স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে ভয়ঙ্কর পীড়ন ব্যবসায় অনেকটা দমিত হইয়া আসে, এবং বঙ্গে পুরুষানুক্রমে প্রজা ভূম্যধিকারীর মধ্যে একটি দৃঢ় এবং দুশ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ সিংহের শাসন সংরক্ষণে দেবীসিংহের দুর্বিসহ অত্যাচার, ক্ষুদ্র সংস্করণে কোন কোন স্থানে এখন পর্যন্ত নানারূপে প্রচ্ছন্নভাবে অভিনীত হইলেও, তাহা প্রমিত করিবার জন্য চেষ্টা যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে। বঙ্গদেশে ভূম্যধিকারিগণের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় নহে। তাহারা অসংখ্য প্রজার করগ্রাহী এবং অনেকস্থলে প্রজাদের হর্তা, কর্তা, বিধাতা। তাহার ইচ্ছা করিলে, প্রজাদিগকে নানারূপেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখী কিংবা আপদগ্রস্ত করিতে পারেন। স্থূলদৃষ্টিতে কেবল প্রজাদের সঙ্গেই, ভূম্যধিকারিগণের এইরূপ গুরুতর সম্পর্ক দৃষ্ট হইলেও বস্তুতপক্ষে, তাহাদের সঙ্গে দেশের প্রায় সর্বশ্রেণির লোকেরই শুভাশুভের অতি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে।

বর্তমান যুগে, সাংসারিক উন্নতি কি মানসিক উন্নতি, যাহাই হউক না কেন, সকলই অর্থসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশীয় ভূস্বামীদিগের মধ্যে কেহ সাধারণত ধনী, কেহ

সমৃদ্ধ, কেহ বা ধনকুবের এবং ইহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্তবংশ হইতে উদ্ভূত, তাহাদের প্রায় সকলেই দাতার প্রাণরূপ উচ্চসম্পদে সম্ভ্রান্ত। এমত অবস্থায় যাহাদের অর্থাভাবে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ আছে, তাহাদের অনেকেই যে এই ভূস্বামীদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাদের হস্তে এইরূপে নিঃস্ব প্রজার শুভাশুভ, দেশের মঙ্গল ইত্যাদি ঘোরতর দায়িত্বপূর্ণ কর্মের ভার ন্যস্ত আছে, তাহাদের যে নানাপ্রকারে কতদূর যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভূস্বামীবর্গের মধ্যে অপাত্রে ভার ন্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত এখন বিরল নয়। তাহাদিগের ভিতরও আবার দুইটি শ্রেণি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। একটি, জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট কিংবা হার্বার্ট স্পেনসার অচেতন বস্তুর যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, সেই সংজ্ঞাভুক্ত। অন্যটিতে, তৃপ্তিহীন, সীমাহীন প্রভুত্ব ও ভোগ-লালসা-জনিত অন্ধ উন্মত্ততা সর্বদা বিদ্যমান। ইহারা আপনাদের 'প্রদাহি-সুখের' নিমিত্ত জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত সুখ দুঃখ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এবং যাহারা শক্তিশালী, তাহাদিগকে নীচজনোচিত সেবায় তুষ্ট রাখিয়া, গরিব পীড়ন আরম্ভ করিয়া দেন। অবশেষে গরিব প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া, নিজে যশের খেতাবী অর্জন করেন। সভ্যজগতে এইরূপ পীড়নের কথা। অন্য দিকে রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির সমুদ্র শোষণ করিলেও তাহাদের তৃপ্তি হয় না। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, শুকদেবের নিঃস্বার্থপরতা, দধীচির পরার্থ-প্রীতি, কিংবা দার-ত্যাগী দেবব্রতের জিতেন্দ্রিয়তা লইয়া সংসারে অতি অল্প লোকই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পৃথ্বীচারী সাধারণ কীট, আমাদের অঙ্গে ধূলি, মাটি সর্বদা লাগিয়াই রহিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের কর্তব্য কিংবা এবম্বিধ সুখ এবং সখের মাত্রা নাই? প্রাকৃতিক নিয়মপালন, সমাজের মঙ্গলসাধন এবং সর্বপ্রকার কর্তব্যের মিশ্রণ—আত্মার উন্নতি সাধন রূপ মহাকর্তব্য কি সাধ্যমত আমাদের পালন করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়? যে মাদকতা, এই সকল কর্তব্যের প্রতি উপেক্ষা জন্মায়, এবং সর্বজন নিন্দনীয় অতিগর্হিত কর্মকেও নিজের গৌরব বলিয়া মনে করায়, তাহা সর্বথা নিন্দনীয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, যাহারা এই সমস্ত কর্তব্য পালনে উদাসীন, তাহারা প্রকৃতির সর্বমঙ্গল নিয়মে, কিছুতেই পৃথিবীতে বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে না। জগতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দান করিবে। উপযুক্তরূপ শিক্ষা সম্পদেও, এই শেষোক্ত শ্রেণির ভূস্বামীগণ দরিদ্র। শিক্ষার মাহাত্ম্য এই যে, ইহা রুচি মার্জিত করে, মন উন্নত করে, এবং প্রকৃতিগত দোষাসূহের মূলশক্তি উৎপাটিত করিতে, অনেক সময় অসমর্থ হইলেও, এমন স্নিগ্ধ আবরণে উহাদিগকে আবরিয়া রাখে যে, প্রায়শ তাহা জনসাধারণের পীড়াদায়ক হয় না। শিক্ষার সাহায্যে যে প্রতিভা কতদূর উর্ধে উঠিতে পারে, তাহা কাঁচ হইলেও কাঞ্চনবৎ শোভা পায়। যে ব্যাপার শ্রবণ করিলে, কর্ণে অঙ্গুলি দেওয়া কিংবা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করার ব্যবস্থা, তাহা শিক্ষাদ্বারা স্ফূর্তিপ্রাপ্ত প্রতিভা সাহায্য অভিজ্ঞান শকুন্তল কিংবা স্থানান্তরে রোমিও জুলিয়েট। উভয়েই কাব্যজগতে প্রেমের অতুল চিত্র এবং এখনও দেখিতে পাইয়া, আত্মায় অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিতেছে। শেষোক্ত শ্রেণির ভূস্বামীগণের এক দিকে যেমন শিক্ষা অভাব, অন্য দিকে সৎসঙ্গও তাহাদের পক্ষে দুর্লভ। কতগুলি মাক্ষিকপ্রকৃতি অশিক্ষিত নীচ স্তাবকের দলে তাহার সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকে। আকস্মিক বিশেষ কোন দৈবী কিংবা

প্রবলা বাহ্যশক্তির সাহায্য ব্যতীত, ঐ কুশিক্ষা এবং অসৎসংসর্গের বিষময় ফল তাহাদের বংশপরম্পরা চলিতে থাকে।

পাঠক! এখন একবার এই ভূস্বামী সম্পর্কে সুদূর ইংলন্ডের সহিত আপনাদের দেশের তুলনা কর। বিলাতে এই শ্রেণির লোকদের মধ্যে প্রায় সকলেই কি পরিমাণে সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন এবং সংসারক্ষেত্রে কর্মবীর, তাহা আমাদের দেশে সহজে অনুমিত হইবার নহে। জীবনব্যাপি অধ্যয়ন-স্পৃহা, বহুদেশ ভ্রমণ, পাঠ্যাবস্থা হইতে রাজনীতির আলোচনা, বাল্যকাল হইতে স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জনের সংকল্প এবং তাহাদের স্বজাতি সুলভ কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদি গুণে তাহারা দেশের অগ্রহণ্য এবং যে কোন গুরু কর্মের ভার গ্রহণে সমর্থ। এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। ভারতে, ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুদয় কাল হইতে এ পর্যায় ইংলন্ডের কোন সম্রাট কি মহিষী আমাদের দেশ আসন সংরক্ষণ করিতে আসেন নাই। এই বিপুল ভারতসাম্রাজ্যের কোটি কোটি প্রজার সুখ দুঃখের দায়িত্বপূর্ণ বোঝা বহন করিতে, উপযুক্ত ব্যক্তি, বিলাতের ভূস্বামী শ্রেণি হইতেই প্রায় নির্বাচিত হইতেছেন। তাহারাই আমাদের দেশের হর্তা, কর্তা, বিধাতৃরূপে বড় লাটের পদ প্রতিষ্ঠিত হন। তাহারা যে কি পরিমাণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান কর্মঠ এবং কি পরিমাণই বা সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহা শিক্ষিত লোকের ভিতর অনেকেই জানেন। বিলাতে পার্লিয়ামেন্টে, হাউস অব লর্ডস-এ (House of Lords) যত জন লর্ড সভ্য আছেন, তাহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি আমাদের দেশ শাসনে সমর্থ। আর আমাদের দেশের ভূস্বামীদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক আছেন, যাহারা নিজেদের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির শাসন-সংরক্ষণে কিংবা সুবন্দোবস্তেও অসমর্থ। পক্ষান্তরে, যাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, এমন সদাশয় বুদ্ধিমান, কর্মঠ ব্যক্তিরও, ইহাদের সঙ্গে মিশিবার পথে অনেক বিঘ্ন আছে। সুতরাং, বহিস্থ ব্যক্তিদের সৎসঙ্গও সহজে ইহাদিগকে টানিয়া উর্ধে উঠাইতে পারে না। পৃথিবীতে আমরা হৃদয়ের সকল দিক দিয়া সকলের সঙ্গে মিশিতে পারি না। এমন কি, যাহাতে জীবন-সঙ্গিনী সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সঙ্গেও নয়। মনে কর, তুমি অতবড় পণ্ডিত, কিন্তু পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া, তুমি তোমার স্বল্পশিক্ষিতা স্ত্রীর সহিত মিশিতে পার না। কিন্তু চরিত্রের নির্মলতা, গভীর স্নেহ ও ভালবাসা ইত্যাদিতে তোমার ক্ষুদ্রতা অনুভব কর, এবং তাহার প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত হও। তাই বলিতেছি যে, মনুষ্যের ভিতরে এমন কোন বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে এই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মনুষ্য-জগতে কাহারও না কাহারও প্রাণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায়, যেখানে মূর্খতা এবং মুখোচিত অভিমান ও ক্রোধের মণিকাঞ্চন সম্মিলন হয়, সেখানে খ্রীষ্টের মহাপ্রাণতাও ব্যর্থ হইয়া থাকে।

এবারের উপসংহারে আমার বক্তব্য এই, যে শক্তি ও সম্পদ, ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায়, যত্ন কিংবা ভাগ্যগুণে, তোমার হস্তে গড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার একমাত্র ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব মানুষের সুখশান্তির ভার গ্রহণ। সে দায়িত্ব যদি তুমি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হও, কি তাহাতে অপারগতা দেখাও, এবং পক্ষান্তরে তোমার যতটুকু শক্তি লইয়া যাহাকে স্পর্শ কর, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে চিৎকার করিয়া উঠে, যে পথে দিয়া যাও, সেখানেই যদি হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে, তাহা হইলে, ইউরোপের কমিউনিস্ট দলের সাম্যবাদে তোমার আপত্তি থাকিবে কেন? প্রভুপদের প্রকৃত মহিমা যে সেবকতায়, তাহা

যদি তুমি না বুঝিতে পারিলে, এবং তোমার ন্যায়সঙ্গত কোন সুখের বিন্দুমাত্র ত্যাগ না করিয়াও, সাধারণের যে সকল সুখশান্তি বিধান করিতে পার, তাহার প্রতি উদাসীন রহিলে, তবে তোমার এই বাহ্যিক নট-লীলার এই বিসদৃশ বিড়ম্বনায় আর প্রয়োজন কি?

সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে, এ দেশীয় ভূস্বামীদিগের সকলেই এই শ্রেণির অন্তর্নিবিষ্ট নহেন। তাহাদিগের মধ্যে, কেহ কেহ, শুধু সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রাদি কলাবিদ্যায় নিপুণ, মার্জিতরুচি সুরসিক সৌখিন, এমন নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে, সর্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয় ভূম্যধিকারী আছেন। তাহারা যেমন সুশিক্ষিত তেমনই ধার্মিক, যেমন অমায়িক তেমনই উদার। ভোগ-বিলাসের অতুল সম্পদ চারিদিকে বিকীর্ণ অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে, তাহারা, সেই সম্পদরাশির মধ্যে, বিলাসকুঞ্জের কুসুমাসনে নিত্য সমাসীন রহিয়াছে দয়া, ধর্ম ও অনাসক্তিতে রাজর্ষিকল্প। তাহারা সর্বাংশে কর্তব্যপরায়ণ। তাহারা একহস্তে বজ্রমুষ্টিতে আপনার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করেন; আর এক হস্ত, দয়ার অশ্রুতে আর্দ্র করিয়া, উহাদ্বারা দীনদুঃখীর নয়নজল পুছাইয়া দেন। তাহাদের পরোপকার ব্রতে শঙ্খ ঘণ্টা, ঢাক ঢোল বাজাইবার প্রয়োজন থাকে না। তাহাদিগের আশ্রিত বাৎসল্যে আসাসোটার চমক খেলে না। অথচ, তাহারা চরিত্র গৌরবে চারিদিকের প্রীত মুগ্ধ আনন্দ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া উঠেন। প্রজাবর্গ তাহাদের চিরপদানত; কিন্তু ভয়ে নহে, —ভক্তিতে। আশ্রিতনিচয় সেবকের ন্যায় সতত অনুগত; কিন্তু লোভে বা ক্ষোভে নহে—আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধায়। প্রজাবর্গ, তাহাকে আপদে বিপদে অভয় ও আশ্রয়দাতা রক্ষক, আমোদ উৎসবে, সুখশান্তিবিধাতা অভিভাবক, এবং সর্বত্রই পিতা মাতায় স্থলবর্তীজ্ঞানে, প্রাণের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে। কোন কোন স্থানে ঈদৃশ পুণ্যপ্রকৃতি ভাগ্যবান ভূস্বামী সম্পর্কে প্রজার মধ্যে এই বিশ্বাস ও ধারণা বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হইয়া আছে যে, ভূস্বামীর নামে মানস করিলে, অফলন্ত গাছে ফল ধরে, বন্ধ্যা গাভী বৎসবতী হয়! এবারকার এই প্রবেন্ধর উপসংহারে, এই শ্রেণির পার্থিব ভূদেবস্বরূপ এ দেশে যে দুই এক জন ভূম্যধিকারী আছেন, তাহাদিগকে উদ্দেশ্যে করপুটে প্রণাম করিতেছি। তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুন; এবং একে এক সহস্র হইয়া, এ দেশীয় ভূস্বামী সম্প্রদায়কে কৃতার্থ করুন! তাহাদের সংখ্যা যদিও বড় কম, তথাপি তাহারা যদি, তাহাদেব আদর্শ যাহাতে অন্য ভূস্বামীদিগের মনের উপর কার্য করিতে পারে, তদর্থ স্বতঃ পরতঃ একটুকু যত্নবান থাকেন, আত্মবিষয় সংরক্ষণের ন্যায় ইহাও যদি তাহাদিগের অবশ্য করণীয় নিত্যকর্তব্য মধ্যে গণিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অচিরেই আমাদিগের মধ্যে প্রীতিকর পরিবর্তন বা যুগান্তর না ঘটিয়া করিবে না।

শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ"

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

ঐ যে বাসন্ত প্রভাতের মৃদু মলয়-সমীরণ গাছের কচি পাতাটি কাঁপাইয়া, আধনিমীলিত ফুলের কুঁড়িটিকে দোলাইয়া, পুষ্প-গন্ধ-ভার-বহনে ক্ষণে ক্ষণে অসমর্থ

হইতেছে; উহারে প্রকৃত অধিকারী কে? কিংবা ঐ যে শরৎকালের মেঘ-নির্মুক্ত চাঁদ, ঝোপে ঝোপে, বীচিমালায় চিক দিতেছে, এবং রজনী গভীর হইলে, সুষুপ্ত অর্ধ পৃথিবীকে প্রেম-সেক-স্নিগ্ধ ঘুম-ঘোর-মাখন-জ্যোৎস্না-আবরণের আবৃত করিয়া নিজেও তন্দ্রালস-নয়নে চাহিয়া রহিতেছে, উহার কুহক-শক্তি-সম্পন্ন বিমল রজতচ্ছটারই বা প্রকৃত মালিক দখিলকার কে? তরুণ-উষার মুখে ঐ যে প্রাতঃসূর্য-কিরণ বৃক্ষ লতিকায় হাসি মাখাইয়া দিতেছে, নীহারাশ্রুভাবে অবনত নলিনীকে আবার প্রফুল্ল করিতেছে উহাই বা কাহার একমাত্র উপভোগ্য? জ্ঞানের অভ্যুদয়ে, মানবশিশু, যখন প্রশ্ন আকুল চিত্তে এই অধিকার সমস্যা পূরণের নিমিত্ত দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অনন্ত কাল পূর্বেই, জগদাবরণ-ভূতা জগদ্ধাত্রীরূপিণী সর্বমঙ্গলা প্রকৃতি, স্বতই তাহার অনন্তকোটি সন্তানের প্রাকৃতিকসম্পদ অধিকারের নিরপেক্ষ ব্যবস্থা, শত শত অনুশাসন দ্বারা, আমাদের নিকট অপরিহার্য, নিত্য ও সত্য দেদীপ্যমান করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা দ্বারা তর্কের প্রশ্ন মীমাংসিত না হইয়া থাকিলেও, প্রাণের প্রশ্ন—চিত্তের সমস্যা সহজেই পূরণ হইতে পারে। জল বায়ু, আলো উত্তাপ ইত্যাদি যে কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, একথা বুদ্ধিস্থ করিতে প্রায় কোন ব্যক্তিরই সময়ক্ষেপ করিতে হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, অনন্তকোটি জীব জন্তুর আবাস ভূমি, শস্যশ্যামলা, জীব-ধাত্রী ধরিত্রী মাতৃস্নেহে প্রাণী মাত্রেই ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতেছে, এই ধরিত্রীর অঙ্গাবরণ,—মৃত্তিকার উপর প্রকৃত অধিকার কার? ধনীর কথায় যেমন ধনের কথা হয়, গুণীর কথায় যেমন গুণের কথা উঠে, সেইরূপ ভূম্যধিকারীর কথায় আপনা হইতেই ভূম্যধিকারের অর্থাৎ ভূমিতে অধিকারের কথা আইসে। ইদানীং Jhon Stuart Mill* প্রভৃতি মহামনস্বীদিগের যত্নে Political Economy অর্থাৎ আধিরাজিক অর্থ বিজ্ঞান নামে যে আশ্চর্য দার্শনিক তত্ত্ব প্রায় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। তাহার অন্যতম মুখ্য প্রশ্ন এই—ভূমিতে প্রকৃত অধিকার কার? ভূমিতে প্রকৃত অধিকারী কে? লোক-ভয়ঙ্কর ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবও মনুষ্য জাতির নিকট এই প্রশ্ন লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই একই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই অসংখ্য মনুষ্যের রুধির ধারায় অবনীর অঙ্গ আর্দ্র করিয়াছিল।

পাঠক, দয়া করিয়া মনে রাখিবেন যে, আমরা বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীদিগের ইতিহাস লেখক অথবা তাহাদিগের সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করিতে উপবিষ্ট হই নাই। বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীদিগের মঙ্গল হইলে আমাদের দেশের মঙ্গল, একথা আমরা ইতিপূর্বেই নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা মনে করিয়াছি যে, ধারাবাহিক শৃঙ্খলা থাকুক আর না থাকুক, বঙ্গের ভূম্যধিকারী সম্বন্ধে যে সকল মঙ্গল্য কথা স্বভাবত পাঁচ জনের মনে উঠে, আমরা সেগুলি লইয়াই একটু আলোচনা করিব। যাহারা (Communism) অর্থাৎ সাধারণ স্বত্ববাদে সবিশেষ প্রবিষ্ট, তাহারা জানেন যে, (Communist) অর্থাৎ সাধারণস্বত্ববাদীদিগের মতে আকাশের আলো ও বায়ুতে যেমন পৃথিবাসী সকলেরই সমান

* ইংরেজী শব্দের বাঙলা অনুবাদে সিদ্ধহস্ত বলিয়া যিনি সর্বত্র সম্মানিত, বর্তমান বঙ্গের সেই অদ্বিতীয় শাব্দিক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর Political Economy এই ইংরেজি পদের "আধিরাজিক অর্থবিজ্ঞান" এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

অধিকার, পৃথিবীর মৃত্তিকা অথবা ভূমিতেও মনুষ্য মাত্রেরই তেমন সমান অধিকার। বনের শৃগাল ও বন্য জীবের যে অধিকার আছে, মনুষ্যের তাহা নাই, এ কথা কে বলিবে? আমরা (Communism) অর্থাৎ সাধারণস্বত্ববাদের সকল কথা বুঝিও না, যাহা একটু বুঝি, তাহারও সকল কথায় সায় দিতে পারি না। Mill রীতিমত (Communism) অর্থাৎ সাধারণ স্বত্ববাদী না হইলেও, তিনি এবং তদনুবর্তী অসংখ্য জ্ঞান-গুরুর মত এই যে, কৃষিজীবী প্রজাই প্রকৃত ভূম্যধিকারী; কারণ, সে ভূমিকে দোহন করিয়া সাধারণের অন্ন যোগায়। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, যাহারা নিজে খাটিয়া ও ভূমিকে খাটাইয়া জনসাধারণের গৃহে ধন-ধান্যে পূর্ণ করে, তাহারাই ভূমির প্রকৃত অধিকারী।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের বহু চেষ্টার ফলে যে সকল জটিল প্রশ্ন এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে সুমীমাংসিত হয় নাই, তন্মধ্যে ভূম্যধিকার প্রশ্ন একটি। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, বিবেক যখন বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, ন্যায্যরূপে ভূম্যধিকার ন্যস্ত করিতে উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিবে, তখন শ্রাবণ-ধারায় আপাদমস্তক সিক্ত, চৈত্র রৌদ্রে দগ্ধ, নিরভিমান পরিশ্রমী কৃষককেই উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে মনোনীত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমাদের দেশে আমরা যাহাদিগকে জমিদার অথবা ভূম্যধিকারী বলিয়া থাকি, কোন কর্মের নিমিত্ত, ন্যায় সঙ্গতরূপে, তাহারা এই প্রভুত্ব কিংবা ভূম্যধিকার পাইতে অধিকারী? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার উত্তরস্বরূপে প্রজারূপী ভূম্যধিকারীকে রক্ষণাবেক্ষণ ও যাহাতে তাহারা সুখে শান্তিতে বর্ধিত হইয়া আপন কর্মে প্রফুল্ল মনে নিযুক্ত থাকিতে পারে, তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা ইত্যাদি সাধুকর্ম ব্যতীত, অন্য কোনই কপোলকল্পিত, বে-আইনি, ধর্ম-বহির্ভূত অধিকারের কথা, বিবেক কি যুক্তিসঙ্গতরূপে নির্দেশ করিতে পারি না। পাঠক, এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ, যে কর্তব্যের উপর তাহাদের ভূম্যধিকার নির্ভর করে, এবং যে কর্তব্য পালন না করিলে, তাহাদের (ভূস্বামীদিগের) অধিকার অনেক পরিমাণে অত্যাচারীর ক্ষমতা কিংবা অধিকারের ন্যায় নিতান্ত অসাধুজনোচিত হইয়া পড়ে, তাহা পালনে কয়জনে মনোযোগী হইতেছেন?

আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, জমিদার তালুকদার ইত্যাদি নামেই বুঝি কিছু মহিমা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জমিদার, তালুকদার, প্রজা ইত্যাদি শব্দে কোনরূপ মহত্ব, মাধুরী কিংবা স্বত্ব বা অধিকার নাই। সুতরাং, যাহারা এই সকল শব্দমাত্র অবলম্বন করিয়া, সংসূচিত মনকল্পিত অধিকারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, একে আর হইতে চাহেন, তাহারা মূর্খ। আমাদের দেশে কৃষিজীবীদিগকে প্রজা কিংবা রাইয়ত বলে। পঞ্জাবে কৃষিজীবির নামই জমিদার। কেননা, জমি তাহার করায়ত্ত। জমির উপর তাহারই real gold অর্থাৎ প্রকৃত অধিকার। তালুকদার বলিলে, আমাদের এ দেশে কৃষিজীবী হইতে উন্নত অথচ জমিদার হইতে অনেক নিম্নস্থিত মধ্যবর্তী একশ্রেণির লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু যে সকল লোকেরা ধনে মানে, কিংবা ভূম্যধিকারের গৌরব পরিমাণে, এদেশের জমিদারদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করেন না, অযোধ্যা প্রদেশে তাহাদের নামই তালুকদার। সুতরাং, এ স্থলে কবিগুরু শেক্সপিয়রের সেই চির প্রসিদ্ধ কথা প্রযুক্ত হইতেছে,—'What is in a name' অর্থাৎ শুধু নামের ভিতর কি মহিমা আছে?

প্রজা শব্দ এখন আর শুধু কৃষিজীবিদের প্রতি ধর্মত ও আইনের বিধানতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, আমরা তাহাদের রাজা নই। যদিও দেশের দুর্ভাগ্যবশত রাজা বলিলে এইক্ষণ মুদি, পসারি, স্কুল ইন্সপেক্টর, পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং আদালতের উকিল, অনেককেই বুঝাইতে পারে, তথাপি সত্যের অনুরোধে ধ্রুব সত্যরূপে বলিতে হইতেছে যে, প্রকৃত রাজা একজন অথবা একটা শক্তি; এবং সেই রাজার অধিকারে প্রজা ও ভূম্যধিকারী উভয়েই সমান প্রজা। সাধারণত আমাদের দেশে, অনেক স্থলে ক্ষমতার যেরূপ অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইংরেজ গভর্নমেন্টের ন্যায় সাধারণের স্বত্বরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর, শাসন কর্মে উদার এবং রাজ্য পরিচালন প্রণালীতে দৃঢ় গভর্নমেন্ট যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে দুর্বল, বহুবিষয়ে পরপ্রত্যাশী বঙ্গদেশের কত অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহিতে হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

দেশের লোকে যাহাকে নিরন্তর মহারাজা এই চতুরক্ষর মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকে, অথবা মহারাজাধিরাজ বলিয়া স্তুতির পুষ্পচন্দন যোগায়, তিনিও ব্যবস্থা বিজ্ঞানের চক্ষে যেমন প্রজা, রাধু চঙ্গ, কিংবা রামাই পাতরও ঠিক তেমনই প্রজা। সমাজের ও সর্বসাধারণের স্বীকৃত স্বত্বের উপর সামান্য অত্যাচার করিলে, উভয়েরই কণ্ঠনালী কনস্টেবলের চন্দন লেপ শূন্য কর্কশ মুষ্টির চণ্ডশক্তিতে পরিগৃহীত হইতে পারে। এ কথা আমাদের কল্পনার কথা নহে। পুরীর রাজার ইতিহাসই এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পুরীর পুরাতন রাজা প্রতাপ রুদ্র এক সময়ে উড়িষ্যা প্রদেশের প্রকৃত অধীশ্বর অথবা রাজা ছিলেন। তাহার বংশধরদের মধ্যে এক মহাপুরুষ, অল্পদিন হইল, সাধারণ প্রজার উপর অত্যাচারের অপরাধে, প্রথমে কনস্টেবলের দ্বারা নিপীড়িত, তাহার পর বিচালালয়ে নিগৃহীত, পরিশেষে বিচারের ব্যবস্থা অনুসারে নির্বাসিত হইয়াছেন। এ সকল ঘটনা চক্ষে দেখিয়া এবং ইতিহাসের জ্বলদক্ষর উপদেশ বাক্য কানে শুনিয়া এবং আধিরাজিক অর্থ বিজ্ঞান শাস্ত্রের তত্ত্বকথা বিষয়ে সর্বদা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও, যখন আমরা প্রজারূপী প্রকৃত ভূম্যধিকারীকে ভূম্যধিকারী বলিয়া মনুষ্যোচিত সম্মান দানে অগ্রসর হই না; এবং যাহাদের অনুগ্রহে অহোরাত্র অন্নবস্ত্রে প্রতিপালিত হইতেছি, তাহাদের আর্তনাদে কর্ণপাত করি না; পরন্তু, কুটুম্ব, সহচর, অনুচর, বেতনভুগী সামান্য দরোয়ান পর্যন্ত, যাহারই একটু অত্যাচারের স্পৃহা আছে, অথবা নীচজনোচিত স্বার্থসাধনে অত্যাচারে সবিশেষ অনুরাগ আছে, তাহাকেও অক্লেশে এবং সহজচিত্তে প্রকৃতিপালিত মাঠের কৃষকের অঙ্গে তাহার লালাসিক্ত তীব্র দন্ত বসাইতে দেই, তখনই বুঝিয়াছি যে, আমরা শুধুই নামমাত্র ভূম্যধিকারী। ভূমি সম্ভূত অর্থ এবং অর্থসম্ভূত সুখটুকুর জন্যই আমরা লালায়িত, প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সুখ দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিরহিত। আমরা, এই নিমিত্ত ভূম্যধিকার-সম্পৃক্ত মহামহিমান্বিত পুরুষদিগকেও, যারপরনাই কাতরকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, এখনও সাবধান হউন, সতর্ক হউন, দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও তাহার ন্যায্য স্বত্ব ও ন্যায়সুলভ সুখ শান্তিতে অক্ষত ও অক্ষুন্ন রহিতে দিউন।

আপনি মহারাজাধিরাজ, অথবা মাথা হইতেও উন্নত, মহামহিম, মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন

মহারাজ, অতএব এ কার্যে আপনারই দৃষ্টান্ত দেখান কর্তব্য। আপনারা যদি বড় ছোট সমস্ত ভূম্যধিকারীকে আপনাদের উদার দৃষ্টান্তে আকর্ষণ করিয়া, ভূম্যধিকার প্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবির স্বত্ব ও সম্মান রক্ষায় এবং মঙ্গলসাধনে না অগ্রসর হন, তাহা হইলে, প্রকৃতি এক সময়ে আপনাদিগের সর্ববিধ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে। প্রকৃতির প্রতিশোধ অপরিহার্য, অপ্রতিহত ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। প্রকৃতি যখন পদাহতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় প্রতিশোধ লইবার জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। উহার কঙ্কাল মুষ্টি তখন কুপিত শক্তির লৌহমুষ্টি হইতেও অধিকতর প্রভাবে অত্যাচারীর কণ্ঠকে করায়ত্ত করিয়া লয় এবং মনুষ্য স্বপ্নেও যে কার্যফলের যেরূপ ব্যবস্থা চিন্তা করে নাই, প্রকৃতি তাহা প্রদান করিয়া দেশ ও সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করে। পাঠক, এখন কি তোমার সেই গীতা উক্ত শ্লোকের কথা মনে জাগরিত হয় না?—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" তাই আবার বলিতেছি, ধর্মপ্রিয়তার জন্য না হইলেও অন্তত স্বার্থপরতার জন্যও লোকরঞ্জক হও। তাহা না হইলে, ফ্রান্সের অমিত-ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রজারক্তপুষ্ট, সাধারণের সুখ-দুঃখে উদাসীন, ভোগবিলাসী চতুর্দশ লুই কিংবা সঞ্চিতপাপের প্রায়শ্চিত্ত ঋণী অমায়িক, সাধুপ্রকৃতি ষোড়শ লুইও মুক্তি পায় নাই—ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র যে তুমি, তুমিও পাইবে না।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

ধূমকেতু ১৩১০ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক

ঢাকাপ্রকাশ

জমিদারি শাসন

মহাত্মা লর্ড কর্নওয়ালিশ মহোদয় এতদ্দেশীয় জমিদারদিগকে যেরূপ স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এদেশের জমিদারি শাসনের উপর সবিশেষ মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। জমিদারির শাসন উৎকৃষ্ট হইলে যেমন সাধারণ প্রজামণ্ডলীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির সম্ভাবনা অপকৃষ্ট হইলে আবার সেই পরিমাণে অবনতি হইতে পারে। ইহা নিশ্চয়, যে পর্যন্ত না এদেশের জমিদারদিগের শাসন প্রণালীর যথোচিত উৎকর্ষ হইবে, সে পর্যন্ত প্রজাহিতৈষী গভর্নমেন্ট শত চেষ্টা করিলেও সকল লোকের সর্বপ্রকার উৎকর্ষ সম্পাদিত হইবে না। কিন্তু কবে যে এতদ্দেশের হতভাগ্য জমিদারশ্রেণি বাসনানুরূপ আত্মোৎকর্ষ লাভ করিয়া স্বস্ব জমিদারির সুশাসন পরিসমর্থ হইবেন, তাহা কল্পনা দ্বারাও নির্দেশ করা যায় না। আজি কালি অধিকাংশ জমিদারি যেরূপ জঘন্য প্রণালীতে শাসিত হইতেছে, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনোমধ্যে কেবল অসুখ এবং নিরাশভাবই প্রবলতর হইয়া উঠে। কোনরূপেই প্রত্যাশা হয় না, কোন কালে উহা যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করিবে।

সাধারণত এতদ্দেশীয় অধিকাংশ জমিদার যথোচিত বিজ্ঞতা ও বিদ্বত্ত্বাদি গুণগ্রামের অভাবপ্রযুক্ত স্বয়ং জমিদারির শাসন সংরক্ষণ অপারগ। অনেকে অনর্থকর বিলাসপ্রিয়তা কি অলসতাপ্রযুক্ত ধর্মাধর্ম জ্ঞানহীন পাপ মূর্তি ধূর্ত আমলাদিগের উপর জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ভারার্পণ পূর্বক নিজে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকেন। ইহাই যে জমিদারির শাসন বিশৃঙ্খলা ও অপকর্ষের প্রধান কারণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সত্য বটে জমিদার শত বিজ্ঞ অভিজ্ঞ এবং কর্মক্ষম হইলেও স্বয়ং যাবতীয় কার্য ভারবহন করিতে পারেন না, কর্মচারীদিগের উপর অনেক কার্যের ভারার্পণ করিতে হয়; কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, জমিদার নিজে বিজ্ঞ ও কার্যদক্ষ হইলে এবং সুসাধু বিজ্ঞ কিছু কর্মচারীদিগের দ্বারা কার্য সম্পাদন করাইয়া লইলে, যে প্রকার পরিপাটিরূপে জমিদারির সুশাসন ও উৎকর্ষ হইতে পারে, নিজে নিশ্চিন্তবৎ বসিয়া থাকিয়া স্বার্থৈক তৎপর ধূর্ত আমলাদিগের হস্তে সকল কার্য ক্ষমতা সমর্পণ করিলে কখনই তদ্রূপ হইতে পারে না। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই আমাদিগের দেশের অধিকাংশ জমিদার সরকারের শেষোক্ত রূপ অবস্থা এই নিমিত্তই সাধারণত জমিদারদিগের প্রচুর আয় সত্ত্বেও দিন দিন অধিকতা হীনদশা এবং জমিদারের শাসনাধীন প্রজাবর্গের যৎপরোনাস্তি দুরবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে।

কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ প্রায় সকল জমিদার সরকারেই কয়েকটি আমলা সদর মোকামে (জমিদারের নিজ বাড়িতে) এবং অপর কয়েকজন মফস্বলে নিযুক্ত থাকেন। দেওয়ান, পেস্কার, জমানবিশ, সুমারণবিশ প্রভৃতি আখ্যাধারী কর্মচারিগণ সদর মোকামে অবস্থান করেন। সচরাচর ইহাদিগকে দুই তিন চারি পাঁচ কি উর্ধ হইলে দশ টাকা করিয়া মাসিকবেতন দেওয়া হইয়া থাকে। দশ টাকার অধিক বেতনের জমিদারি কর্মচারী বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ যে সকল লোক জমিদার সরকার স্পর্শ করিয়া

থাকে তাহাদিগের প্রায় কাহারো মাসিক ২৫/৩০ টাকার ন্যূন আয় লক্ষিত হয় না। যে সকল কর্মচারীর [অস্পষ্ট] তিন টাকা মাত্র মাসিক বেতন তাহাদিগের ও বাড়িতে যাইয়া দেখ, বৎসরে চারি শত টাকার অধিক বৈ অল্প ব্যয় হয় না। অথচ তাহার ঐ দুই তিন টাকা বেতনের চাকর ভিন্ন অন্য পুঁজি নাই। ...

সদর মোকামের কর্মচারীদিগের এক একজনের উপর বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট কার্যভার অর্পিত থাকে বটে, কিন্তু প্রধান প্রধান ঘটনা উপলক্ষে কার্যবাহুল্য হইলে আর সে শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে না। তখন যাহাকে সম্মুখে পাওয়া যায়, তাহাকেই উপস্থিত কার্যসম্পাদনে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে বা জমিদার সরকারের এইরূপ গোলযোগ আমলাদিগের পয়সা চুরির একটি প্রধান সময়। প্রধান প্রধান ক্রিয়া কর্ম এবং বড় বড় মামলা মকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রায়ই জমিদার সরকারে এইরূপ হুলুস্থুলু পড়িয়া যায়। প্রধান প্রধান ক্রিয়াকর্ম কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন বটে, কিন্তু মামলা মকদ্দমা ইচ্ছা করিলে আমলাই উপস্থিত করিয়া লইতে পারেন এবং সচরাচর শুদ্ধ কেবল নিজের লাভের নিমিত্ত অকারণে এইরূপ অনেক মামলা মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াও থাকেন। স্বয়ং জমিদারকে অযথোচিত রূপে প্ররোচিত করিয়া, জমিদারের দায়াদবর্গকে কুপরামর্শ দান বা গুপ্ত রূপে সহায়তা করিয়া এবং সীমাবর্তী শত্রু জমিদার তালুকদার প্রভৃতির নিরর্থক ক্রোধোদ্দীপন কিংবা গূঢ়রূপে তাহাদিগের সহিত যোগস্থাপন করিয়া আমলাগণ এরূপ ভয়ানক ভয়ানক বিবাদবিসংবাদ ও মামলা মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, তাহার নিগূঢ় [অস্পষ্ট] শুনিলে সকলেরই শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। ফলত জমিদার-সরকার যত বিবাদ বিসংবাদ, দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং মামলা মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার অধিকাংশই স্বার্থপরায়ণ ধূর্ত আমলাদিগের দুশ্চেষ্টার ফল, তদ্বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। বিবাদ বিসংবাদ দাঙ্গা হাঙ্গাম এবং মামলা মকদ্দমা উপস্থিত হইলেই জমিদার সরকার হইতে অনেকগুলি টাকা বাহির হইবে, সেই টাকাগুলি আমলাদিগেরই হস্তদ্বারা ব্যয়িত হইবে, তাহাতে আর না হউক অন্তত শতকরা ২০ টাকা হিসাবে তাহাদিগের নিজের হস্তে থাকিয়া যাইবে, এই অভিসন্ধিতেই যে আমলাদিগের দ্বারা জমিদার সরকারের উল্লিখিত রূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে, একথা বলা বাহুল্য। আফিসের উৎকোচগ্রাহী আমলা প্রভৃতির সহিত জমিদারের আমলাদিগের বিলক্ষণ গূঢ় যোগ আছে। তাহাদিগের নামে সামান্য সামান্য মকদ্দমারও "তদ্বির খরচ" লিখিয়া জমিদারের আমলারা যে সকল টাকা বাহির করেন তাহারাও প্রায় অর্ধাংশ তাহাদিগের আত্মোদরসাৎ হইয়া থাকে।

জমিদারসরকারের সদর মোকামের আমলাদিগের প্রায় সকলেরই বাৎসরিক "পরবি" নির্দিষ্ট আছে। মফস্বলের কর্মচারীরা বৎসর দুই ঐ সকল পরবি যোগাইয়া থাকে। যে কর্মচারী পরবি দিতে অসমর্থ হয়, তাহার কর্মে স্থিরতর থাকা সুকঠিন। বিভিন্ন সময়ে সময়ে দায়ে ঠেকাইয়াও মফস্বলের কর্মচারীদিগের নিকট হইতে সদরমোকামের আমলারা অর্থদোহন করিয়া থাকেন। তাহারা যখন নিকাশ দিতে আইসে, কি কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া সদরে আনীত হয়, তখন নানাবাচ করিয়া তাহাদিগ হইতে অপরিমিত অর্থগ্রহণ করা হয়। মফস্বলের কর্মচারীরাও এই নিমিত্ত তাহাদিগকে উৎকোচ দেয় যে,

সদরে আমলারা সহায় থাকিলে তাহাদিগের কোন বিপদেই ঠেকা পড়িতে হইবে না। বাস্তবিকও পূর্বে যাহাদিগকে ঘোরতর অপরাধী বলিয়া জানিতে পাওয়া যায়, সদর মোকামের আমলাদিগের সহায়তা গুণে তাহারাও সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া যায়। এই প্রকার উপায় ভিন্ন সদরের আমলাদিগের আরো কয়েকটি লাভের অঙ্ক আছে। তাহাদিগের নিজ নিজ নৈমিত্তিক ক্রিয়া উপস্থিত হইলে মফস্বলের যাবতীয় কর্মচারীদিগের উপরই চাঁদা ধরা হইয়া থাকে। সেরূপ চাঁদাও কাহারো না প্রদান করিয়া নিস্তার নাই। পাঠকগণ এক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, জমিদার সরকারের দুই চারি টাকা বেতনের আমলারাও কি প্রকারে প্রচুর আয়বান হইয়া থাকে।

মফস্বলের জমিদার কর্মচারীদিগেরও বেতন, মুটেমজুরের বেতন অপেক্ষা বড় অধিক নয়, কিন্তু আয়ে লম্বালম্বা বেতনের কর্মচারীদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন লক্ষিত হইবে না। প্রধান প্রধান জমিদারিতে জমিদারের এক একটি কাছারি সংস্থাপিত আছে। সাধারণত ৮/১০ টাকা বেতনের এক একজন নায়েব সেই সেই কাছারীর সর্বময় কর্তা। তাহার অধীনতায় দুই তিনজন মহরের ও কয়েকজন পাইক নিযুক্ত থাকে। পরন্তু ঐ জমিদারির এলাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গোমস্তা পাটোয়ারী বা তহসিলদারেরাও ঐ নায়েবেরই শাসনাধীন থাকিয়া তাহার নিকট টাকা প্রদান পূর্বক রীতিমত নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া থাকে। জমিদারের নায়েব হইতে বিদ্যা বুদ্ধির যত আবশ্যকতা থাকুক না থাকুক, শরীরটি স্থূল, ভুড়িটি মোটা, রবটি উচ্চ এবং শঠতা ধূর্ততা ও নিষ্ঠুরতাদি থাকা নিতান্তই আবশ্যক। এই সকলগুণোপেত না হইলে নায়েবী কার্যে প্রায় কেহ মনোনীত হইতে পারে না। প্রজার নামে দশ আইন কি জমিদারির সীমাদিঘটিত মামলা-মকদ্দমা উপস্থিত হইলে নায়েবকেই তাহার তদ্বির করিতে হয়। এজন্য প্রায়ই জমিদারেরা ঐ সকল নায়েবদিগকে এক এক খানি মোক্তারনামা প্রদান করিয়া থাকেন সেই সকল মোক্তারনামায় কোন সত্ত্বেরই প্রায় অনুল্লেখ থাকে না। একতঃ ঐরূপ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক নায়েবী কার্যে নিয়োজিত হয়, তাহাতে আবার আমমোক্তারনামা দ্বারা তাহাকে সকল বিষয়ে অধিকার দেওয়া থাকে, এক্ষণ পাঠকগণ সহজেই বিবেচনা করিতে পারেন মফস্বলের নায়েবদিগের দ্বারা কি অনর্থ না ঘটিতে পারে। ফলত অধিকাংশ নায়েব মফস্বল লুণ্ঠন করিয়া আত্মোদারপূরণ করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আনুষঙ্গি হাট ঘাট বন্ধ করিবার নিমিত্ত অধীনস্থ কর্মচারি প্রভৃতিকেও এক প্রকার লাল, করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং তদ্বিষয়ে আর কোনরূপ উচ্চবাচ্যই হয় না।

মফস্বলের জমিদার কর্মচারীরা কি কি বাবদে অর্থ দোহন করিয়া থাকে, অনেকে অবগত না থাকিতে পারেন, এজন্য অতি সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। মামলা মকদ্দমা পড়িলে অতিরিক্ত আমমোক্তারনামার বলে প্রজাদিগকে কৃত্রিম কায়েমী ইত্যাদি স্বত্ব প্রদান করিয়া, অনেক বাজে জমা জমিদার সরকারের জমা না দিয়া, অথবা নিজ নিজ উৎকোচের হার বিবেচনায় স্থল বিশেষে অত্যল্প বাজে জমা নির্ধারণ কি একবারেই বাজে জমা না করিয়া যে খাজনা ইত্যাদি আয় হইয়াছে তাহা বাকিয়াতে রাখিয়া, এবং নিরর্থক কাহারো কাহারো নাম জমাখরচে হাওলাত লিখিয়া নিজেরা তাহার

তছরূপ করিয়া থাকে। পাছে নিকাশকালে ধরা পড়িতে হয়, এজন্য অন্যান্যকেও কিছু কিছু টাকা দিয়া মুখ বন্ধ করা হয়। মফস্বলের প্রজারা নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া সদরে অভিযোগ করিতে আসিলে প্রায় তাহা শূন্য হয় না, মফস্বলের কর্মচারীদিগকেই তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে ভার দেওয়া হয় মফস্বলের কর্মচারীদিগের প্রতিকূলে নালিশ করিতে প্রজারা সহজেই সাহস পায় না। একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া নালিশ করিলেও সদর মোকামের আমলাদিগের সহিত মফস্বল কর্মচারীদিগের পূর্বোক্তরূপ গূঢ় যোগ নিবন্ধন প্রজার পক্ষে কিছু সুবিধা হইতে পারে না। লাভের মধ্যে এই হয়, যাহাদিগের অধীনতায় সর্বদা বাস করিতে হইবে, সেই মফস্বল কর্মচারীদিগের সহিত ঘোরতর শত্রুতা জন্মাইতে হয়। তন্নিমিত্ত শারীরিক ও আর্থিক দণ্ড দিয়াও একবারে উদ্ধার পাওয়ার উপায় থাকে না। এক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখুন এদেশের জমিদারির শাসন প্রণালী কেমন অপকৃষ্ট এবং সাধারণ জমিদার ও তাহাদিগের প্রজাগণের কেমন শোচনীয় অবস্থা।

আমরা প্রস্তাব উপসংহার এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ জমিদার মহাশয়দিগের নিকট বিনীতভাবে এই প্রস্তাব করি, তাহারা স্বয়ং বিজ্ঞ অভিজ্ঞ এবং জমিদারি শাসনে সুপটু হইয়া যাবতীয় বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ভার নিজেরা বহন করিতে সযত্ন হউন। যাহারা দুর্ভাগ্য ক্রমে এতদ্বিষয়ে নিতান্তই অক্ষম, তাহারা উচ্চ দুই বেতনে এক এক জন সুশিক্ষিত বিশ্বাসী ও কর্মঠ ব্যক্তিকে নিজে প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত করুন। অধীনস্থ কর্মচারীদিগেরও পদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তত্তৎ পদে ভাল ভাল লোক নিয়োজিত করিয়া দিউন। এরূপ করিতে গেলে, আপাতত বিলক্ষণ ব্যয় বাহুল্য স্বীকার করিতে হইবে সত্য, বাস্তবিক তাহাতে তাহাদিগের অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে, আনুষঙ্গিক জমিদারির শাসন ও উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর হইবে সন্দেহ নাই।

ঢাকাপ্রকাশ, ৩ কার্তিক, ১২৭৬; ১৩ নভেম্বর, ১৮৬৯

জমিদার ও প্রজা

পূর্বকালে যাহারা রাজা নামে আখ্যাত ছিলেন, মুসলমান সাম্রাজ্যের শেষ যোগে তাহারাই জমিদার আখ্যাপ্রাপ্ত হন, অদ্যাপি এই উপাধিই তাহাদের পরিচায়ক হইতেছে। এই জমিদারদিগকে পূর্বে প্রজারা পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, দেবতার ন্যায় পূজা করিত, যমের ন্যায় ভয় করিত। জমিদারেরা মাটি পোড়াইয়া খায় বলিয়া জমিদারের সুখে তাহারা উল্লসিত হইত, জমিদারের দুঃখে তাহারা মর্মপীড়িত হইত। জমিদার ভিন্ন আর তাহারা অন্য কাহাকে জানিত না—মানিত না। জমিদারই তাহাদের সমাজনেতা ছিল, আদালত ফৌজদারি ছিল, সর্বেসর্বা হর্তাকর্তা প্রভু ছিল। কি সামাজিক বাদ বিসম্বাদ, কি স্বত্বঘটিত মামলা, মোকদ্দমা কি চুরি ডাকাইতি, কি মারামারি কাটাকাটি সকল বিষয়েই তাহারা জমিদারের শাসন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিত, জমিদারের বিচারে সন্তুষ্ট থাকিত। জমিদাররাও আবার প্রজাদিগকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতেন, প্রজার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, বিপদে বিপদ জ্ঞান করিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় আর্থিক সাহায্য করিয়া, জলাভাবে পুষ্করিণী খনন করিয়া প্রজার প্রীতি আকর্ষণ করিতেন, স্বার্থের বশীভূত হইয়া স্বীয়

উদরপূর্তির জন্য প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতেন না, অথবা করভারে তাহাদিগকে প্রপীড়িত করিতেন না। তখন উভয়ের মধ্যে স্বর্গীয় ভাব ছিল। এখন আর জমিদার প্রজার মধ্যে সে নৈকট্য সম্বন্ধ নাই, সে প্রীতির ভাব নাই। জমিদার প্রজা এখন দা কাটারী সম্বন্ধ পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। জমিদার প্রজার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেন, প্রজাও জমিদারকে বিষ নয়নে চাহিয়া দেখেন। সুবিধা পাইলে কেহ কাহাকে ছাড়েন না—একে অন্যের শোণিতে তর্পন করেন। এই যে সে দিন মেঘনা নদীতে গজারিয়ার চৈতন্য মল্লিক ধীবরগণ কর্তৃক নৃশংসরূপে হত হইয়াছে, ভবের চরের প্রজাগণ তাহাদের নায়েবকে পশুবৎ হত্যা করিয়াছে; মানিকগঞ্জের প্রজা বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে; ইহা কি জমিদার প্রজাগণের পরস্পর বিদ্বেষবহ্নির স্ফুলিঙ্গ নহে? গভর্নমেন্ট যে ত্রিপুরা চাঁদপুরে ও বাখরগঞ্জ পিরোজপুরে পুলিশ শান্তিরক্ষক রাখিতে অনুমতি দিয়াছেন ইহাও কি জমিদার প্রজার পরস্পরের মনোমালিন্যের কারণ নহে? ফলত জমিদার প্রজার মধ্যে ভয়ানক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি।

এখন জিজ্ঞাসা এই—জমিদার প্রজার মধ্যে কেন এই বিদ্বেষভাব সঞ্চারিত হইল। কোন অন্তর্শক্তি এই সুখদৃশ্য সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিল। কে ইহার জন্য দোষী এবং দায়ী? ইহা বিচার করিতে গেলেও ইংরাজ গভর্নমেন্টের এবং তাহার আইন কানুনের উপর আমাদের চক্ষু নিপতিত হয়, গভর্নমেন্টের প্রতি আমাদের দোষারোপ করিতে হয়; কারণ ইংরেজ আমাদের রাজা, রাজা ব্যতীত আমরা আর কাহাকে দোষ দিব এবং কাহাকেই বা ঐজন্য দায়ী বলিব।

রাজা যদি অর্থশোষণ নীতি গ্রহণ করেন, জমিদারকেও বাধ্য হইয়া সেই নীতির অনুসরণ করিতে হয়। রাজা জমিদারের উপর টেক্স বসাইলে, জমিদার তাহা প্রজার নিকট আদায় করিয়া থাকেন, ইহা শাসননীতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম এবং যে দেশের জমিদার প্রজা আছে, সে দেশবাসীরাই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আবার যদি আইনে এরূপ বলে যে, জমিদারের প্রজার নিকট ন্যায্য খাজনা ব্যতীত এক পয়সাও আদায় করিবার অধিকার নাই, তবেই প্রজারা দুর্দান্ত ও অনিবার্য হইয়া উঠে। এই কারণে কি অন্য কোন কারণেই হউক, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, আজি কয়েক বৎসর যাবৎ জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে বিদ্বেষ অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল; নূতন ৮ আইন তন্মধ্যে ঘৃতাহুতি দিয়াছে। যেই নূতন ৮ আইন জারি হইয়াছে, অমনি সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। চৌকিদারি আইন জারি হইবার পর যেমন পঞ্চায়েতগণ মনে ভাবিয়াছিল, তাহারাই এক প্রকার হাকিম হইল প্রজাগণের মনেও এখন সেইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহারাই জমিদার হইল। জমিদার তাহাদিগের জমাবৃদ্ধি করিতে পারিবে না, জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না আর ক্যা পড়োয়া। জমিদার আবার মনে ভাবিতেছেন, চেক দাখিলায় তাহারা যে জমা লিখিয়া দিবেন বাজে জমা চাঁদা ইত্যাদি দূরে থাকুক তদতিরিক্ত আর পয়সাও যখন তাহার প্রজার নিকট আদায় করিতে পারিবে না, তখন এখন হইতে চেক দাখিলায় বৃদ্ধিজমা লিখিয়া লওয়ার যোগাড় করিতেছেন; প্রজারা তাহাতে সম্মত হইতেছে না। খাজনার আইনজারি হওয়ার পরই এ অঞ্চলে প্রজাদিগের একটু হুজুগ উঠিয়াছিল যে, গভর্নমেন্ট ৬ আনা নিরেখ ধার্য করিয়াছেন জমিদার তাহার বেশি খাজনা নিতে পারিবে না। এই হুজুগে জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে ভারি গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল শেষে অত্রত্য কালেক্টর

সাহেব একটি বিজ্ঞাপন দিয়া সেই গণ্ডগোল নিবারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু খাজনার আইন যেরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কি জমিদার কি প্রজা কাহারও মঙ্গল নাই। ইহাতে উভয়ের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধার পরিমাণ অধিক সুতরাং খাজনার আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন ব্যতীত যে তাহাদিগের মধ্যে সহজে প্রীতি সঞ্চার হয়, সম্ভব করি না। তবেই বলিতে বাধ্য হইলাম, নূতন খাজনার আইনই এই অনর্থের মূল, এবং এই আইন প্রণেতাদিগকে দোষ না দিয়া আর কাহাকে দোষ দিব। অবশ্যই খাজনার আইনের মহিমায় জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে বিরোধী হইয়া বাকি কর ও অন্যান্য বাবতে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং কোর্ট ফি স্ট্যাম্প ইত্যাদি বিক্রি হইয়া গভর্নমেন্টের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যে নীতি দেশের প্রাণ জমিদার ও প্রজার সর্বস্বান্ত করে, দেশকে মরুভূমি করিয়া ফেলে, আমরা সে নীতির কোন মতেই সমর্থন বা অনুমোদন করিতে পারি না, বরং তাহার আন্তরিক বিরোধী। তাই গভর্নমেন্টের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে, খাজনার পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া শীঘ্র এই প্রজ্বলিত হুতাশন নির্বাপিত করুন। জমিদার ও প্রজার মধ্যে আবার সদভাব সঞ্চরি হউক। দেশে শান্তি বিরাজ করুক।

উপসংহারে জমিদার ও প্রজাদিগের নিকট আমাদের নিবেদন এই কেন তাহারা একে অন্যের অনিষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, নিজেরা নিজেরা মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরেন। তাহারা কি বুঝেন না যে, মামলা মোকদ্দমাতে তাহাদের নিজেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। তাহারা একটুকু চেষ্টা করিলেই পূর্বের স্বর্গীয় ভাব পুনরায় করিতে পারেন। ন্যায়ের মত সদ্বিচার আর দ্বিতীয় নাই, ন্যায়ের চেয়ে আর উচ্চ আদালত নাই, এই ধ্রুব সত্যটি যদি তাহারা মনে রাখিয়া কাজ করেন তাহা হইলেই তো সব গোল মিটে।

ঢাকাপ্রকাশ, ৮ অগস্ট, ১৮৮৬

গভর্নমেন্ট ও জমিদার

প্রজার খাজানা মনিঅর্ডার দ্বারা দাখিল করার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে; অমনি চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে। যাহারা জমিদারের অনুগ্রহে প্রতিপালিত, জমিদারগণ যাহাদিগকে হিতৈষি বলিয়া মনে করেন, তাহারাও সেই জয়ধ্বনিতে যোগ দিয়াছে। জমিদারগণ এই বেলা তাহাদের সুহৃদবর্গকে চিনিয়া রাখুন। কিন্তু চিনিবেন কি? চিনিলে, তাহাদের ক্ষমতাগুলি কখনই দিন দিন অপহৃত হইত না। কথা আছে, দশের মুখে জয় দশের মুখে ক্ষয়, চারিদিক হইতে তাহাদের ক্ষয়ের প্রার্থনা হইতেছে। কাজেই গভর্নমেন্টও দেশের প্রার্থনা শুনিতেছেন, জমিদারের স্বত্ব স্বামিত্ব আধিপত্যগুলি বাঁটিয়া দশজনকে বিতরণ করিতেছেন; পূর্বে যাহারা এক একটি রাজার ন্যায় সাধারণ চক্ষে পরিলক্ষিত হইতেন, তাহারা দশজনের সমানে ব্যবহৃত হইতেছেন। একদা যাহারা তাহাদের সামান্য ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইত, তাহারা সমানে তো সমানে স্থল বিশেষে তাহাদের উপর প্রভুত্ব চালাইতেছে, হয়ত তাহার উপর দশ কথাই শুনাইয়া দিতেছে। ইহা কি তাহাদের কষ্টজনক নহে? খুব কষ্টজনক। সময় সময় এ কষ্ট তাহাদের প্রাণান্তকর হইয়া থাকে। কিন্তু এই কষ্টের কারণ তাহারা নিজে। তাহারা যদি পূর্ব হইতে সাবধান হইয়া চলিতে জানিতেন;

পরিণামের ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া কর্তব্য পথ ঠিক রাখিতেন, বিশ্বাস ও অনুগ্রহের পাত্রাপাত্র বুঝিয়া উপযুক্ত পাত্রে বিশ্বাস ও আগ্রহ অনুগ্রহ বিতরণ করত অপাত্রকে শুকাইয়া মারিতেন, তবে কখনই তাহারা দিন দিন হতমান হইতেন না।

জমিদারগণই পূর্বে এদেশের রাজা ছিলেন। যেকালে এই ভারতবর্ষ হইতে লক্ষাধিক রাজা লুটিয়া যুধিষ্ঠিরকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেন, সে কালের কথা বলিতেছি না। এই সে দিন যে রাণী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির সহায়তায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারাও জমিদার, সেই জমিদারগণেব সকলেরই পূর্বে রাজ ক্ষমতা ছিল; সেই ক্ষমতা গভর্নমেন্ট একটু একটু করিয়া নিয়া এমন করিয়াছেন যে, এখন প্রজার নিকট ন্যায্য খাজানা ন্যায়ানুসারে আদায় করিতে জমিদারকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। কেন সর্বস্বান্ত হইতে হয় সে হিসাবটা পরে দিতেছি। কথা এই যে জমিদারগণ তাহার কিছুই ভাবেন না, ভাবিলে নিজেদের ভাবনা গভর্নমেন্টকে একটু ভাবাইলে অনায়াসে তাহাদের স্বত্ব সামিত্ব রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহারা কিছুই চেষ্টা করেন না। তাহাদের পরিণামের উপর কি যে একটি শেল খাড়া হইয়াছে, তাহার পরিচয় গতবার দিয়াছি। তথাপি তাহাদের সাড়া শব্দ নাই; কাজেই আমরা বলিতেছি—জমিদারগণ নিদ্রিত।

মোকদ্দমা করিয়া খাজানা আদায় করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা যাহারা মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হন, তাহারাই জানেন। যদি উভয় পক্ষে রীতিমত মোকদ্দমা চলে, তাহা হইলে তিন কোর্টে মোকদ্দমা, ডিক্রীজারি, ক্রোক নিলাম, ইত্যাদি ৪/৫ বৎসর পর্যন্ত ব্যয় বিধান দৌড়াদৌড়ি করিয়া তবে যদি টাকা আদায় হয়। কিন্তু সে আদায় একরূপ? এক উকিলের বায়ানাতেই ধর প্রথম কোর্টে ২্ দ্বিতীয় কোর্টে ১০্ হাইকোর্টে ৫০্ ডিক্রি জারিতে আর ২, এই চারিস্থানে উকিলের মহুরিগণ ৮্ এক উকিলের পাছেই এতগুলি; তদুপরি কতবারে যে কতবাজে খরচ হয়, এক একটি মোকদ্দমার খরচ যোগাইয়া যে কত লোক সর্বস্বান্ত হয় তাহা কেনা অবগত আছে? অথচ সে খরচ কিছু পাইবার উপায় নাই; বিচারকগণ মুলতবি খরচ বলিয়া যে টাকাটা গ্রহণ করেন, তাহা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এরূপ ব্যয় তাহার একটি মোকদ্দমার ব্যয়ে সর্বনাশ হইতে পারে। সেরূপ সহস্র সহস্র প্রজার নামে মোকদ্দমা করিয়াও কি কখন খাজানা আদায় হয়? অনেকে মনে করেন, মোকদ্দমায় প্রজার ও তো সর্বনাশ হইতে পারে। সে সেই ভয়ে খাজনা দিবে। জমিদারকে মোকদ্দমা করিতে হইবে না। এরূপ যুক্তি সকল স্থানে অমূলক না হইলেও অধিকাংশ স্থলেই সমূলক নহে। এক গ্রামের পাঁচ শত প্রজা জোট করিয়া খাজনা বন্ধ করিল। এই পাঁচশত প্রজার নামে যদি মোকদ্দমা করিতে হয়, তবে পঞ্চাশ হাজার টাকা অনিয়মিত ও আর পঁচিশ হাজার টাকা আইনানুযায়ী মোট ৭৫ হাজার টাকার আবশ্যক। ৫ হাজার টাকা খাজানার জন্য মোকদ্দমায় ৭৫ হাজার টাকা যদি আদায়ের সম্ভাবনাও থাকে, তথাপি কয়েকজন জমিদারে এত টাকা ব্যয় করিয়া মোকদ্দমা করিতে সমর্থ হয়?

পক্ষান্তরে প্রত্যেক প্রজার ঐ হারে ন্যায্য দেনা ৬্ ও বাজে খরচও ধর ৫০্ মোট ৫৬্ প্রজা এক বৎসরে এক খানি ক্ষেতের পাট বেচিয়াই চালাইতে পারে। যে প্রজা উহা চালাইতে পারে না, তাহার সর্বস্বান্ত পরিণামে হইলেও পূর্বে তাহা বুঝিতে পারে না, এবং জোটের প্রজা একজন মোকদ্দমার খরচ যোগাইতে না পারিলে অন্যেরা তাহা চালাইয়া লয়, সুতরাং মোকদ্দমার জন্য প্রজারা ভীত নহে। অতএব যদি মোকদ্দমা করা ভিন্ন

জমিদারের খাজানা আদায়ের পথ না থাকে, তবে যে সকল জমিদার প্রচুর অর্থশালী নহেন, তাহাদের কোন ক্রমেই খাজনা আদায়ের উপায় নাই।

খাজানা বিষয়ক আইনে জমিদার পক্ষের আবদারে এইরূপ একটি ধারা সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল যে, "খাজনার নালিস হইলে প্রজা তাহার যে দেনা স্বীকার করে তাহা দাখিল না করিলে সে মোকদ্দমার জবাব দিতে পারিবে না।" আইন কর্তারা মনে করেন, যখন এই ধারাটি আছে, তখন মোকদ্দমার নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ভূস্বামীর খাজানা বাকি থাকে না। কিন্তু উহা ভুল। ভূস্বামী দশ টাকা প্রাপ্য খাজানার জন্য নালিস করিলেন, প্রজা মাত্র দশ পয়সা দাখিল হওয়াতেই প্রজাকে মোকদ্দমা চালাইতে দিলেন। শেষে বিচারে কিন্তু প্রজার দশ টাকাই দেনা সাব্যস্ত হইল। এরূপ প্রতারণা অথবা মিথ্যা চালান জন্য প্রজার কোন দণ্ডের আশঙ্কা না থাকাতেই প্রজা নির্ভয়ে আইন কর্তাদিগের ব্যর্থ করিয়া জমিদারকে মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত করে। আইনে, জমিদার পক্ষ হইতে ভ্রমক্রমে কিছু বেশি আদায় হইলে যত বেশি আদায়, প্রজার জন্য তাহার দ্বিগুন টাকা ও গভর্নমেন্টের জন্য ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায়ের বিধান আছে, কিন্তু প্রজা যে নিজের দেনা অল্প বলিয়া জমিদারকে ক্ষতিগ্রস্ত ও আদালতকে প্রতারিত করিল, সেজন্য তাহার কোনই ক্ষতিপূরণ কি দণ্ড দিতে হইবে না। ও রূপ দণ্ডের ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত আবশ্যক নহে কি?

প্রজা সহজে খাজানা না দিলে জমিদার তাহা আদায় করিতে পারেন, এমন কোন সহজ উপায় গভর্নমেন্ট জমিদারের রাখেন না। খাজানা আদায়ের সহজ উপায় না থাকাতে জমিদার পাইক সরদার লাঠিছোটা পরিচালনা দ্বারা প্রজাকে ভীত রাখিতে বাধ্য হন। যতদিন গভর্নমেন্ট খাজনা আদায়ের সহজ ব্যবস্থা না করিবেন, ততদিনই জমিদারকে বাধ্য হইয়া প্রজার উপর অত্যাচার করিতে হইবে। সবল জমিদারগণ তাহা করিয়া থাকিলে যাহারা চিৎকার করে, একবার প্রজা দ্বারা সর্বস্বান্ত সহস্র দুর্বল জমিদারের প্রতি কি তাহাদের দৃষ্টি করা কর্তব্য নহে? এই যে বাঙ্গালার মধ্য শ্রেণির ভদ্রলোকেরা দিন দিন হতমান হৃতসর্বস্ব হইয়া পড়িতেছে, তদ্দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টিপাত হয় না কি? গভর্নমেন্ট কেবলই প্রজা ভূস্বামীর পর পর বিরোধ জনক আইন করিয়া ভূস্বামীদিগের স্বত্ব স্বামিত্ব নাশ করিতেছেন কেন যে তিনি এরূপ একদিক টান বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা যাহাদের কথা গভর্নমেন্ট শুনিতে পান না, সেই সর্ব সাধারণের বলিলেও আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সেই সর্ব সাধারণের মধ্যে দীর্ঘকাল সেই কথা আন্দোলন করিতে দেওয়া গভর্নমেন্টের কর্তব্য নহে বলিয়াই আমরা গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করি, তিনি ভূস্বামীদিগের ন্যায্য প্রাপ্যগুলি যাহাতে সহজে আদায় হয়, তাহার বিধি ব্যবস্থা করুন। গভর্নমেন্টের খাজানার জন্যে যে সূর্যাস্তের নিয়মে জমিদারের স্বত্ব নিলাম হইতে পারে, সেইরূপ নিয়মে প্রজার স্বত্ব নিলাম করিলে তো জমিদারের খাজানা সহজে আদায় হয়। ১৮১৯ সনের ৮ আইনানুসারে পত্তনির খাজানার জন্য নিলামে যদি গোলযোগ না হয়, তবে সেই নিয়মে রায়তি স্বত্ব নিলাম হইলে ক্ষতি কি? প্রজা সাধারণতঃ দরিদ্র এই জন্য যদি তাহাদিগকে কিছু অনুগ্রহ করা কর্তব্য বোধ হয়, তবে বরং ত্রৈমাসিক কিস্তিব বাকি জন্য নিলাম না করিয়া এক বৎসর কি দু দুই বৎসরের বাতির জন্য নিলামের ব্যবস্থা হউক না কেন? জানিলাম, পূর্বে প্রজা খাজানা দেওয়া অথবা যাচনা করা সত্ত্বেও জমিদার তাহা উসুল না দিয়া প্রজার অনিষ্ট করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন যদি ডাকে অথবা আদালতের সাহায্যে খাজানা দাখিল করিতে প্রজা সমর্থ হইয়াছে, তবে তাহা দুই বৎসর সময় পাইয়াও

দাখিল না করিলে প্রজার স্বত্ব নিলাম হইবে না কেন? আমরা অবিলম্বে এইরূপ বিধি প্রবর্তন জন্য গভর্নমেন্টের নিকট প্রার্থনা করি।

ঢাকাপ্রকাশ ২৫ মে, ১৮৯০

২.

জমিদার শব্দটি শুনিয়াই অনেকে আইরিস ও সভ্যতাভামিনী অন্যান্য দেশের জমিদারদিগকে স্মরণ করেন। এবং সেই সভ্যতাভিমানী দেশের বংশধর লুসন, ওয়াটসন প্রভৃতি অ্যাংলোইন্ডিয়ান নীলকর জমিদারদিগকেও স্মরণ করিয়া থাকেন। তাই জমিদার শব্দটিই তাহাদের নিকটে—অর্থাৎ যাহারা সেই সভ্য জমিদারদিগের কীর্তি কাহিনি নিয়ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট নিতান্ত ভয়ানক জীব বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের সেই বোধ শক্তির মহিমাতেই উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে অর্থাৎ এদেশীয় জমিদারদিগের ঘাড়ে অত্যাচারের বোঝা চাপাইয়া থাকেন। আর এদেশীয় গভর্নমেন্ট যে সিবিলিয়ানগণ দ্বারা পরিচালিত গবর্নমেন্টও এদেশীয় জমিদারকে প্রবল প্রতাপ বলিয়াই মনে করেন।

কিন্তু তাহারা ভাবে না, এদেশীয় জমিদার মাত্রের ক্ষমতা পাশ্চাত্য জমিদারের সদৃশ কি না? পাশ্চাত্য জমিদারগণ, রাজ্যের এক একটি পরিচালক এদেশীগণ পরিচালিত। পাশ্চাত্য জমিদারিতে শরিক সরাকতি নাই; এক বাপের পাঁচ বেটা থাকিলেও এক বড় বেটাই বাপের সম্পত্তির অধিকারী। সুতরাং সে দেশে জমিদারে বিরোধ করিয়া প্রজাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন জন্য তোষামোদ করিতে হয় না, এদেশে তাহার বিপরীত। এমন স্থলে যাহারা উভয় দেশের তুলনা করে, তাহারাই নিতান্ত ভ্রান্ত। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও এই পর্যন্ত বলিতেছি, এদেশে ইংরেজ বংশধর লুসন, ওয়াটসন যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, এদেশীয় জমিদার হইতে অনুষ্ঠিত তদ্রূপ কোন অত্যাচার সংবাদ এ পর্যন্ত শুনা যায় নাই। অতএব যাহারা ২/১টি লুসনের জন্য বহু লক্ষ এদেশীয় জমিদারের সর্বনাশ চেষ্টা পান, তাহারা কতদূর ভ্রান্ত তাহাও কি বলিতে হইবে।

বঙ্গদেশে জমিদার শব্দটিকে যাহারা প্রবল পরাক্রান্ত মনে করে, তাহাদের মত ভ্রান্ত বোধ হয় দুনিয়ায় নাই। এই ঢাকা জিলায় প্রায় বার হাজার মহাল, কিন্তু এখানে প্রবল জমিদার কয়টি? এক নবাব ও এক রাজাকে প্রবল বলিতে পারি কিন্তু তাহাদের অধিকার ঐ বার হাজারের মধ্যে কয়শত? নবাব সাহেবের জমিদারি সুবিস্তৃত হইলেও অত্যাচারের উপযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন নহে। রাজা শ্যামাশঙ্করের জমিদারি ঢাকায় অতি সামান্য। এইরূপ বড় বলিয়া যাহাদের নাম আছে, তাহাদের অধিকাংশই ভিন্ন জেলার জমিদার।

পক্ষান্তরে জিজ্ঞাসা ঐ বার হাজার মহালের মালিক কাহারা? কেহ অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন, এই বার হাজারের মালিক অন্যূন পঁচিশ হাজার বুনিয়াদি ভদ্র সন্তান অথবা ভদ্র বংশীয়া বিধবা। এখন বিবেচ্য যে, এইরূপ সমর্থ কিনা? এবং ইহাদের অধীনে এমন প্রজা থাকা সম্ভব কিনা, যে সকল প্রজা ঐ সকল জমিদারের উপর অত্যাচার করিতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, এই প্রবন্ধ লেখকেরই পৈতৃক জমিদারির কোন কোন প্রজার এমন অভ্যুদয় হইয়াছে, যাহাদের রাজা, রায় বাহাদুর উপাধি পর্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা রায় বাহাদুরদিগের ন্যায় সম্পত্তিশালী প্রজা অথবা মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট খাজানার দায়ী রাইয়ত আরও বিস্তর আছেন। লেখকের ন্যায় অধিকাংশ জমিদারেরই ঐরূপ প্রজা অথবা

খাজানার দায়ী থাকিবার সম্ভাবনা। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, ঐরূপ জমিদারগণ প্রবল, কি প্রজাগণই প্রবল? যখন অধিকাংশ জমিদারের অবস্থা এইরূপ, তখন জমিদারকে প্রবল মনে করিয়া যত আইন কানুন, সমস্ত তাহার প্রতিকূলে অথবা প্রজার অনুকূলে করিবার উদ্দেশ্য কি? দশ পাঁচ জন বড় জমিদারের জন্য লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণির অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদিগকে প্রপীড়িত বা উৎসন্ন করা ন্যায়সঙ্গত?

আর একটি ভ্রম পরিলক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মনে মনে করেন, বড় একটি জমিদারের অপকার হইলেও বহুপ্রজার উপকার বাঞ্ছনীয়। একের অপকার করিয়া অধিকের উপকার অবশ্য কর্তব্য। একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই একের অহিতে দশজনের হিত হইবে কিনা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। যে প্রবল, সে হারিতে হারিতেও দুর্বলকে হারাইতে পারে। একথা প্রজার পক্ষেও যেমন খাটে, জমিদারের পক্ষেও তেমনই খাটে। অতএব যেখানে জমিদার প্রবল, সেখানে জমিদারের প্রতিকূলে যতই আইন হউন না কেন, প্রজা নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে। মনে করুন, মাগুরার প্রজারা কোন আইনানুসারেই লুসনের নীল প্রস্তুত করিতে বাধ্য নহে, সমস্ত আইন জমিদার পক্ষীয় লুসনের প্রতিকূল কিন্তু কাজে হইতেছে কি? প্রত্যেক বর্ষেই কি প্রজারা লুসনের নীল প্রস্তুত করিয়া দেয় নাই। যদি প্রজারা ডাকে খাজনা দিতে পারিত, তবেই তাহারা লুসনের সে অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইত?

তাহা হইলে বড় জোর না হয় খাজানা পাওয়ার দাবিতে যে কয় নম্বর মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা হইয়া অন্য নানারূপে প্রজাদিগকে লুসন জব্দ করিতেন। বরদাকান্ত সরকারের ন্যায় একজন সম্পন্ন ব্যক্তি লুসনের প্রজা না হইয়াও যদি জব্দ হইতে পারিতেন, তবে দুর্বল প্রজাদিগকে জব্দ করা যাইবে না কেন? কিন্তু মনে রাখিবেন, এরূপ অত্যাচার প্রজার সহিত জমিদারের নহে, দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার। প্রজার আইনে এ অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে না।

জমিদারের নায্য পাওনা আদায়ের সুবিধা না করিয়া প্রজার সুবিধার জন্য বিধি ব্যবস্থা করাতে দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধ পাইতেছে। ন্যায্য পাওনা ন্যায়ানুসারে পাওয়া সহজ না হইলেই অন্যায়ের আশ্রয় লইতে হয়। ন্যায্য পাওনা এক পয়সার জন্য লোকে লাখ টাকা খরচ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য লোক টাকার জন্য কয়জনে এক পয়সা খরচ করিতে যায়? প্রজা সহজে খাজানা দেয়, তজ্জন্য গভর্নমেন্ট কোনই ব্যবস্থা করেন নাই। আদালত করিয়া খাজানা আদায়ে কিরূপ ব্যয়ের আবশ্যক, এবং সে ব্যয় চালাইয়া খাজানা আদায় করা সকলের সাধ্যয়ত্ত কিনা, তাহা গতবার কতকটা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং যখন সে সুবিধা নাই ন্যায্য প্রাপ্য আদায় হয় না, তখন জমিদারকে বাধ্য হইয়া অন্যায় অত্যাচার করিতে হইবে। নালিস করিয়া সর্বস্বান্ত হওয়া অপেক্ষা জোর জুলুম করা শ্লাঘ্য বোধ হইবে। প্রবল প্রজার সহিত মোকদ্দমা না করিয়া যে দুর্বল প্রজা মোকদ্দমা চালাইতে অসমর্থ তাহাকে মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত করিয়া অন্য প্রজাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হইবে। দয়া, ধর্ম, পুণ্য, প্রতিষ্ঠায় জলাঞ্জলি দিয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষার পথ করা হইবে। এরূপ নানা অত্যাচারের বীজ বপন করা কোন পক্ষের অনুমোদিত, এবং কোন পক্ষের কতদূর লাভালাভজনক তাহা আগামীতে বিবেচনা করা যাইবে।

ঢাকাপ্রকাশ ৯ জুন, ১৮৯০

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

ROMESH CHUNDER DUTT

১৮৪৮—১৯০৯

AN APOLOGY FOR THE PUBNA RIOTERS

There are some niticeable features in the late rising ryots in Pubna which have escaped the notice of most of our contemporaries, and which therefore we do not consider it out of place to point out in this article.

It is a matter of regreat, though not perhaps of surpize, that most of the leading newspapers of the Bengali community should have taken and entirely one-sided view of the question, and passed unmitigated censure on the acts of the ryots of Pubna. For a few weeks we had nothing but exaggerated accounts of the doings of the rioters. Fugitive zemindars crowding to Calcutta, or suffering zemindars writing from Pubna, did not fail to influence the press eith *exparte* representations, and fear lent additional coloring to an already over-colored picture; until we found robbery, murder and rape represented as an every day occurence. It has now been satisfactorily ascertained however that acts of violence were remarkably few, and were mostly prepetrated by certain *badmashes* who got hold of the opportunity to carry out their evil intentions. Making allowance for all these facts, however, it will not still be denied, that the ryots were guilty of some irregularities and some acts of violence;—and none regrets such acts more than ourselves, because they tend to wean from their perpetrators the sympathy which is pre-eminently their due;—because a just Government has not failed to visit such acts with speedy chastisement.

And yet those who condemn too severely such acts should remember that a rising like that or Pubna seldom concludes without some acts of violence, without some relation as it were of the tyranny which was its cause. The force of the rebound is porportionate to the pressure which caused the rebound, and the reaction seldom concludes without injury to some body. History tells us unheard of imperial tyranny and cruelties being expiated in the blood of nations, in a revolution which in its moment of blind force shook an entire continent to its foundations; and though such instances have been rare, yet there is not one recorded instance of rising from presure where the law of nature has not been verified,—where the rebound was not attended with violence, or crimes if you will call it, of some sort or other. We are not therefore prepared to heap indiscriminate censure on the ryots of Pubna for yielding, in their

moment of power, to the temptation which no class of people when similarly circumstanced have been able to resist.

But they
Who in oppression's darkness caved had dwelt,
They were not eagles nourished with the day;
What marvel then, at times, if they mistook their prey?

The rising of the people *an masse* in an entire district is certainly a singular phenomenon among a peasantry so mild as that of Bengal. We have had risings of chiefs, risings of sects, risings of fanatics, risings of insurgents in this country; but of risings of a purely agricultural character we have had but few instances in olden times. And yet within the last 10 or 15 years we have had two instances of this sort, *viz.* the Indigo disturbance of Nuddea and the late rent disturbance of Pubna. Perhaps it will not be a bootless task to enquire into the causes of these risings under the British Government. At the risk of being put down as paradoxical and perverse in our opinions, we shall venture to assert, that we see in them a good sign of the times—that we find in them some evidence that the moral of a civilized mode of administration has not been entirely lost on the millions of Bengal. The British Government with its correct principles of equality, and its resolute curbing of oppression wherever and whenever found, has already freed the peasantry of Bengal from that galling servitude of thought and action in which they remained enchained for centuries and which rendered action on their part impossible; it has already inspired them with confidence, and given them a degree of assurance which they never knew before. For centuries together the peasantry remained in complete servitude under the zemindars of Bengal. Those who are familiar with the details of administration in Bengal in the last days of Muhammadan rule unanimously admit that the zemindars of those days were the supreme rulers of the people under them; they were indeed little feudatory chiefs bound only to pay revenue to the subadar. Their internal adminstration was never interfered with, and when they chose to be oppressive, against their oppression there was no redress. Under such circumtances it was not a matter of surprize to find the peasantry devoid of all energy—of all hope of resistance. At a time when resistance was certain to prove futile, action became impossible, combination was folly, silent servitude was natural, and grew into a fixed habit. We confess we are pleased to find evidences that the millions of Bengal are at last awakening from this lethargy, and that retaining the peaceful habits of their forefathers, they are yet in the present day capable of action in cases of emergency. And we believe we are stating a simple truth when we say, that the development of healthy feature in the character of the Bengal ryot is entirely due to the policy of the British Government in Bengal which recognizes no class of oppressors under its shadow.

The advocates of the zemindars ascribe this change to the self-same cause, but entirely misrepresent or fail to understand its character. They

agree with us in saying that open resistance on the part of the ryots did not exist before, but while we view with complaisance the development of this feature in the ryot's character, they regret it as a mark of hostility between the zemindar and the ryot which has been fostered by the British Government. Who taught the ryot, they ask, to rush to the civil court on the least disagreement with his zemindar? Who taught him to have his master the gomasta or the naed in the criminal court for the pettiest act of oppression? It is the British Government with its Penal Code, and its Act X. of 1859. Before these enactments there was no hostility between the zemindar and the ryot; everything (in their words) was calm and still.

Perhaps it was so; but it was the stillness of the desert and the calm of death! There was no open hostility, because hostility was action and action was impossible. Servitude, silent, unmurmuring, voiceless, servitude was ther order of the day,—and the order was well kept. Oppression called forth no resistance, tyranny evoked no groan! The guilt, the crime of the British Government has been in affording the ryot a means of publishing perhaps of opposing gross oppression,—and this has offended our zemindars, our press our so-called public opinion!

But we ask the candid opinions of our traders whether an attempt towards equalizing two classes, with occasional ruptures, is not in every way preferable to the permanent and silent servitude of one class under another. We hope we shall not he mistaken. We have already said we sincerely regreat the circumtances which have led to the rising, what we mean to add is that, when such circumtances exist, it is better that they should come to light through such outbreaks than that they should be silently put up with. The attempt therefore of every well-wisher of the country should be not to make such rising impossible by bringing about the repeal of the Penal Code the Act X. of 1859, but to remove those cause and circumstances which make such rising necessary. What were those causes and circumtances? Happily this question has been answered officially and there can therefore be no two opinions on the subject. "The real origin of the dispute", says Mr. Nolan, the Magistrate of Serajgunj in Pubna, "is to be found in the frequent enhancement of rents and illigal exactions in Esafshahi Parganah." Mr. Taylor, the Magistrate of the district, says,—"There can be no doubt that at the time of the Nattore Raja the rates were very low, and the ryots now assert that since then no legal enhancement of rate has been made. The zemindars have, however, /57/ collected *abwabs*, and this has been going on for so many years, that is it now scarcely clear what portion of the collections is rent, and what illegal cesses. It may be that the zemindars have all along intended some of their cesses to be in reality an enhancement of rent, and that their accounts and the receipts granted to the ryots shew this to be the case. The ryots however maintain that they have never consented to pay such excess as rent, but simply as temporary *abwabs*, which so long as they were on good terms with their *maliks* they have paid without objection.

The late inquiries with respect to the illegal exactions by zemindars, the expected extension of the Road Cess Act to this district, have shewn the zemindars the necessity of obtaining written engagements from their under tenants. The Banerjeas did manage to persuade many of their ryots to grant *kabulyats,* the terms of which were most unfavourable to the ryots, as they appear subsequently to have discovered; and but for this discovery I have no doubt that the other zemindars would have followed the example of the Banerjeas. The ryots seeing or rather being shewn their danger by others, commenced about May last to form themselves into a league to resist the demands of the zemindars."

Have we not been told ever since 1793, over and over again, that *abwabs* are illegal, and that zemindars imposing cesses on the ryots should be severely punished? The late revelations made in Orissa, the transactions in Pubna, all shew that such regulations and acts have been treated by zemindars as waste paperm and that cesses and *abwabs* are triumphantly imposed and exacted my zemindars all over the country. And indeed they have a nice purpose to answer. According to Act X of 1859, the rent payable by permanent ryots cannot be increased on any ground, and that payable by occupancy ryots can only be increased on certain stated grounds. To zemindars desirous of increasing rent, such clauses are no doubt exceedingly inconvenient, and the only way open is the cesses and the *abwabs.* Ryots do not particularly mind such payments so long as they /58/ are not made permanent, and are gradually induced to make such payments; until after a lapse of certain number of years the zemindars turn round and assert that such cesses were meant to be nothing more of less than enhancement of rents. Ingenious trick! Worthy instruments in the hands of worthy zemindars to ensure and delude ignorant and helpless ryots!

But we do not require official reports to inform us that illegal cesses and enhancement of rent were the cause of the Pubna disturbance Those who are familiarly acquainted with the habits and feelings of the Bengal ryot culd scarcely be at a loss as to what the causes were. Abuse him, beat him, and the ryot will not complain; strike him and he will bend; but increase his rent and he will break. The blessings of the British rule have availed him but little; the luxuris of a civilized life he does not aspire to, of wealth he has none, education he seeks not. He has one and but one thing to compensate for all these wants, his land and his annual crops. His most dearly cherished hope points to nothing higher than to a good harvest; his greatest fear is leat his produce is decreased or his rent increased. Is it a matter of wonder then that he shold be passionately fond of his little bit of land,—that he should jealously guard his interests in the land? When the zemindar wants to increase his share of the produce of that land, the ryot will bear no more,—the last straw breaks the camel's back. it is this class of oppressions that he feels most cruelly and reflects upon most bitterly. It is this therefore that every well-wisher of the

country should attempt to put a stop to, in order to render impossible future disagreements between zemindars and ryots.

How is this to be done? We have already answered this question elsewhere.* Act X. of 1859 allows increase of rent with regard to considerably over half the ryots of Bengal, *viz* those who have no right of occupancy. This we submit should /59/ now be awarded by special legislation. Increase of rent should be totally disallowed with regard to all ryots except on very strong grounds, and a sort of permanent settlement should be created between ryots and zemindars. This we submit will be a noble recognition of the rights of the Bengal peasantry, which have unfortunately been so long and so shamefully ignored by the British Government; and this, we further submit, is the only possible measure which may be calculated to prevent future disputes between zemindars and ryots, and to do away with that mass of litigation about the rights of enhancement of rent which is at the present moment pestering our civil courts, demoralizing the people, and cating into the vitals of the nation. In order more clearly to express our intentions we shall draw out a few sections of the Act which we submit should be enacted :

WHEREAS it is expedient for the protection and welfare of the cultivators of the soil of Bengal to extend to all classes of ryots the benefit secured to a certain class of them by Sec. XVII. of Act X. of 1859, it is hereby enacted as follows—

1. No ryot shall be liable to an enhancement of the rent previously paid by him except on some one of the following grounds, namely—

(1) That the rate of rent paid by such ryot is below the prevailing rate payable for land of a similar description and with similar advantages in the places adjacent.

(2) That the value of the produce or the productive powers of the land have been increased otherwise than by the agency or at the expense of the ryot.

(3) That the quantity of land held by the ryot has been proved by measurement to be greater than the quantity for which rent has been previously paid by him.

II. Any partly desirous of increasing the rent of land on any of the above mentioned grounds shall apply to a civil court and prove that such grounds exist. No enhancement or rent shall be legal except through the verdict of the civil court. /60/

III. Whenever land is let to a cultivating ryot, or to a tenant of any denomination, the party so letting shall grant a pottah containing the following particulars.

(1) The amount of annual rent.

(2) The instalments in which the same is to be paid.

* In our article on the Bengal Zemindar and Ryot which appeared in the August number of the Bengal Magazine. [vol. 2 no. 13, 1873]

(3) And any special conditions of the lease.

(4) If the rent is payable is kind, the proportion of preduce to be delivered, and the time and manner of delivery.

IV. The party granting a pottah shall register the same.

V. The production of a pottah so registered shall be conclusive evidence on the question of previous rates of rent unless when fraud, coerion or forgery is proved; or unless when the enquiry refers to an enhancement of rent which is said to have taken place previously to the granting of the pottah.

PENALTIES

VI. Whoever enahances rent except through the verdict of a civil court shall be punished with fine which may extend to 1,000 rupees.

VIII. Whoever withholds pottah for a period of four months after the land has been let, shall, except when sufficient cause is shewn for the omission, be punished with fine which may extend to 100 rupees.

VIII. Whoever refrains from registering a pottah for a period of four months after it has been granted, shall, unless sufficient cause is shewn for the omission, be punished with fine which may extend to 100 rupees.

MISCELLANEOUS

IX. The provisions of the Act shall not apply to cases in which land is let at a specially low rent, or without rent, with the object of bringing waste land under cultivation, or with some similar object.

X. Cases under this Act shall not be cognizable except by a magistrate vested with last class powers, or placed in charged of a subdivision. /61/

ARYCFYDAE

The Bengal Magazine, vol. II, no. 14, September 1873.

পরিশিষ্ট ২

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা

এই বঙ্গদেশের বর্ত্তমানাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন কোন কোন অংশে ইহার উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ নানা বিষয়ে ইহার দুর্গতিও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে এদেশের অবস্থা যে নানা বিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সংশয় উপস্থিত হইবারই সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে এদেশের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে নানা জাতীয় শোভা ও সৌন্দর্য্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক প্রকার উন্নতির ভাবও নয়ন গোচর হয়। এক্ষণে এদেশে নানাপ্রকার সুরম্য অট্টালিকারও অভাব নাই, দূরপ্রসারিত সুপ্রশস্ত রাজপথেরও অপ্রতুল নাই এবং হস্তী, অশ্ব ও শকটাদি বহু প্রকার যানবাহনেরও অল্পতা নাই, এ দেশের যে সমস্ত প্রশস্ত ভূমি ইতি পূর্ব্বে ঘোরারণ্যে আবৃত ছিল, এক্ষণে সেই সমস্ত ভূমিতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জনপদ স্থাপিত হইয়াছে। যে স্থানে অরণ্যবাসী হিংস্র পশুদিগের আশঙ্কায় বা জ্ঞানহীন অসভ্য লোকের দৌরাত্ম্য ভয়ে দিবাভাগেও লোক গতায়াত করিতে শঙ্কিত হইত, এক্ষণে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে সেই সকল স্থানে রজনীযোগেও নিঃশঙ্কে ও নির্ব্বিঘ্নে মনুষ্যকুলের বসবাস হইতেছে। এক্ষণে কেবল এদেশের প্রধান প্রধান নগর ও প্রধান প্রধান গ্রামেতেই যে জ্ঞানবিদ্যার প্রচার হইয়াছে এমন নহে, অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামস্থ লোকের সন্তানগণেরাও জ্ঞানস্বরূপ নির্ম্মল সূর্য্যের জোতিঃ প্রাপ্ত হইতেছে। পুরা কালে বঙ্গদেশের যে সমস্ত নদীতে দীর্ঘকালের মধ্যেও সামান্যা একখানি তরণী দৃষ্ট হইত না, অধুনা সেই সকল নদীকে অনবরত নৌকাশ্রেণী দ্বারা শোভিত দেখা যায় এবং সেই সকল নদীর মধ্যে কোন কোন নদীতে অসামান্য শিল্পজ্ঞান সম্পন্ন বাষ্পীয় পোতেরপতাকাও উড্ডীয়মান হয়। পূর্ব্বকালীন বঙ্গবাসী বন্য মনুষ্যেরা যে সমস্ত দূর দেশের নাম মাত্র শ্রবণ করে নাই এবং দুস্তর সাগর পরিবেষ্টিত যে সমস্ত দ্বীপ স্বপ্নেও অবলোকন করে নাই, এক্ষণে সেই সকল দেশের ও সেই সমস্ত দ্বীপের মনুষ্য আসিয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সেই সমস্ত দ্বীপোৎপন্ন, দুর্লভ দ্রব্য সকল বিক্রায়ার্থ বঙ্গবাসী লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইতেছে, বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান বিপণিতে বিদেশীয় বিচিত্র প্রকার লোমজ ও পট্টজ বহুমূল্য বস্ত্রাদিরও কোন অভাব নাই এবং নানাজাতীয় কাচময় ও দারুময় সুচারু গৃহসজ্জাদি প্রাপ্ত হওয়াও কঠিন নহে। পূর্ব্বকালীন প্রধান প্রধান রাজাদিগের রাজসভায় যে সমস্ত শিল্পজাত পদার্থ সন্দর্শন করা সাধ্য হইত না, এক্ষণে এতদ্দেশের সামান্য ধনবানের ভবনেও ততোধিক উৎকৃষ্ট পদার্থ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সমধিক সৌভাগ্যের সময় তাহার যদ্রূপ শোভাবৃদ্ধি না হইয়াছিল, এক্ষণে বঙ্গভূমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। যে বাষ্পীয় রথের লৌহবর্ত্ম এতদ্দেশীয় পূর্ব্বকালীন লোকে মনেতেও কল্পনা করে নাই, এক্ষণে বঙ্গদেশবাসী আপামর সাধারণ লোকে সেই রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে এবং যে অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ পূর্ব্বকালীন লোকে সন্দর্শন করিলে বোধ হয় দেবকীর্ত্তি বলিয়া মনে করিত, এক্ষণে বঙ্গভূমির নানাস্থানে সেই তাড়িত তার সঞ্চালিত হইয়া রহিয়াছে। যে বাষ্পীয় যন্ত্র

সাংসারিক দুঃখ হরণের এক প্রধান উপায়, যে যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে সংসারের কার্য্যোপযোগী বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং যে মুদ্রাযন্ত্র সাধারণরূপে বিদ্যাপ্রচারের একমাত্র উপায়, যাহার সহায়তা ক্রমে একদিবসের মধ্যে সহস্র সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সহস্র স্থানে প্রচারিত হইতে পারে, এক্ষণে বঙ্গদেশে উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্র ও মুদ্রা যন্ত্রেরও বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে। এক্ষণে আর এতদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহকে পূর্ব্বের ন্যায় কেবল তন্তুবায় হস্ত কৃত উৎকট শ্রমসাধ্য বস্ত্রের প্রতি নির্ভর করিতে হয় না এবং বিজাতীয় কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সঙ্কীর্ণ তালপত্রে বর্ণ বিন্যাস করিয়া গ্রন্থাদি প্রচার করিতেও হয় না। এক্ষণে এদেশে বাষ্পীয় যন্ত্রোৎপন্ন বিচিত্র প্রকার কাগজেরও অভাব নাই এবং স্থানে স্থানে মুদ্রাযন্ত্রেরও অপ্রতুল নাই, ইচ্ছা করিলে গ্রন্থকর্ত্তা এক দিবসের মধ্যে স্বপ্রণীত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া নানাস্থানে প্রচার করিতে পারেন। এক্ষণে এদেশে যেমন নানাবিধ সুখভোগের উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়েও শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ত্ত গ্রন্থের অর্থ অবগত হওয়া লোকের পক্ষে অতিশয় কঠিন ছিল এবং যে সমস্ত তত্ত্ব দুই এক ব্যক্তি অসাধারণ মনুষ্যের হৃদয়ে নিহিত ছিল এবং যে সকল তত্ত্বজ্ঞানের কথা অতীত বয়স্ক প্রবীণ পণ্ডিতদিগের রসনাগ্র হইতেই নিঃসৃত হইত, এক্ষণে এদেশের নানা স্থানে নানা লোকের নিকট হইতে সেই সকল জ্ঞানতত্ত্বের কথা শ্রবণ করা যায়। এক্ষণে এদেশীয় কোন প্রসিদ্ধ নগর কি প্রসিদ্ধ গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া যখন তরুণ বয়স্ক বালকগণের সহিত আলাপ করা যায়, তখন প্রায় তাহার মধ্যে অনেকেরই নিকট হইতে সুগভীর জ্ঞান তত্ত্বের কথা শুনিয়া সুখী হওয়া যায় এবং নব্য সম্প্রদায়ী বালকবৃন্দের মধ্যে প্রায় অনেককেই কোন না কোন প্রকার জ্ঞানোপার্জ্জনে তৎপর দেখা যায়। এইরূপ বহু প্রকার বাহ্য শোভা ও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপাতত অনেকেরই মনে হইতে পারে যে অধুনা বঙ্গভূমি বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছে। কিন্তু যিনি তথ্যানুসন্ধান তৎপর হইয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তিনি দেখিবেন, যে অধুনা বঙ্গভূমিকে যেমন কতিপয় বাহ্যশোভায় শোভিত দেখাইতেছে, সেইরূপ অন্যান্য সহস্র প্রকার আন্তরিক দুঃখে উহার কলেবর ক্লিষ্ট হইয়াছে। তিনি যেমন এক দিকে উহার কিঞ্চিৎ উন্নতির লক্ষণ দেখিবেন, তেমনি আর দিকে সহস্র প্রকার দুর্গতির চিহ্নও দেখিতে পাইবেন। তিনি দেখিবেন যে উহার এক চক্ষে যেমন ঈষৎ আহ্লাদের ভাব অনুভূত হইতেছে, তেমনি উহার অন্তরস্থ শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইযা অপর চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে এবং উহা আপনার অবশ্যম্ভাবী নিপতন নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ন বদনে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, প্রকৃতরূপে উহার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক উহার অবস্থা দিনে দিনে বরং অবসন্ন হইয়া আসিতেছে এবং উহা অন্তরে অন্তরে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জরাগ্রস্থ জীর্ণ শরীরকে উৎকৃষ্ট ভূষণে সুসজ্জিত করিলে তাহার যাদৃশ শোভা প্রকাশ পায়, বর্ত্তমান বাহ্য শোভা দ্বারা বঙ্গদেশেরও তাদৃশ অবস্থা হইয়াছে। যকন বঙ্গদেশবাসী অধিকাংশ মনুষ্যের শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে এবং ক্রমে বৈষয়িক অবস্থা তদনুরূপ হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে, যখন বঙ্গরাজ্যের প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী ও প্রতিপরিবারের নিকট হইতেই অনবরত দুঃখ দাবানলের অসহ্য যন্ত্রণার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করা যায় এবং যখন বঙ্গরাজ্যবাসী দুর্ব্বল মনুষ্যেরা দেশান্তরীয় প্রবল ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনবরত প্রপীড়িত হইতেছে, তখন এককালে চক্ষুকর্ণ রুদ্ধ না করিলে আর কোনক্রমে এক্ষণে বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণরূপে উন্নত দশাগ্রস্ত বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হইতে পারে না। সন্তানগণের অসঙ্গত ক্লেশ

সন্দর্শন করিয়া বঙ্গভূমির বিষণ্ন বদন ক্রমে মলিন হইতেছে এবং তাহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তাহার চিরপালিত পুত্রবর্গের যন্ত্রণা সত্ত্বে তাহাকে সহস্র প্রকার অলঙ্কারে ভূষিত করিলে কখনই তাহার মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন প্রকাশ পাইবে না। বঙ্গরাজ্য চিরদিন যাহারদিগের বাসস্থল, এবং বঙ্গদেশের বক্ষস্থলোৎপন্ন শস্যাদি উপভোগ করিয়া যাহারা পুরুষানুক্রমে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা যে এক্ষণে কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছে এবং দিন দিন যে তাহাদিগের কি দশা উপস্থিত হইতেছে স্থির চিত্তে একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বঙ্গভূমির সমস্ত শুভাশুভ পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। বঙ্গরাজ্যবাসী দুঃখী জনগণের এক একটি ক্লেশের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই সকরুণ ব্যক্তির হৃদয় করুণারসে অবশ্যই আর্দ্র হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বঙ্গবাসী লোকের দুঃখরাশি বর্ণন করিয়া শেষ ক'শ অসাধ্য। যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে কি বৈষয়িক সুখ, কি মানসিক শান্তি, কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতা বর্ত্তমান বঙ্গবাসী লোক ইহার কোন সুখেই প্রকৃতরূপে সুখী নহে। যাহারা কেবল কলিকাতাস্থ ও কতিপয় অন্য নগরস্থ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের শুভাশুভের বিষয় আলোচনা করে, যাহারা কেবল নগর মধ্যে সর্ব্বদা কতিপয় সধন লোকের সহিত একত্রিত হইয়া কথোপকথন করে, এবং যে সমস্ত লোক আধুনিক নব্যসম্প্রদায়ীদিগকে ইংরেজদিগের বেশ ভূষা ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া মহানন্দে আনন্দিত হয়, হাহারাই বলে যে অধুনা বঙ্গদেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত লোক বঙ্গদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত পল্লীগ্রামস্থ মনুষ্যের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখে এবং যাহারা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নানাপ্রকার দুঃখের বার্ত্তা শ্রবণ করে, তাহারা আর কখনই বলিতে পারে না যে এক্ষণে বঙ্গরাজ্যের বিশেষ দুর্দ্দশা ভিন কোন অংশে ইহার উন্নতি হইয়াছে। যদি চিরাধীনত্বকে সম্পদ বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হয়, যদি অনসনাবস্থায় দিন যাপন করাকে উন্নতির লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হয়, এবং যদি মুমূর্ষু অবস্থাকে সম্পদের সময় বলিয়া মনে করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বঙ্গবাসী লোককেও সুখী ও সম্পদশালী বলিয়াও মনে করিতে পারা যায়।

অধুনা কলিকাতা প্রভৃতি কোন কোন প্রকাশ্য স্থনস্থ কতিপয় ব্যক্তি যেমন উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করিয়া উত্তমোত্তম উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া এবং সুচারু পরিচ্ছদ ধারণ ও সুন্দর যান বাহনে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখী হইয়াছে, সেইরূপ পল্লীগ্রামের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদনাভাবে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কোন সামান্য জলাশয়ের মধ্যে কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তু প্রবিষ্ট হইলে তত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীবর্গের যেমন অবস্থা হইয়া থাকে বঙ্গদেশবাসী দুর্ব্বল মনুষ্যদিগেরও এক্ষণে তদ্রূপ দশা উপস্থিত হইয়াছে। এদেশীয় মনুষ্য স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, ইহারা কোন উৎকট শ্রমসাধ্য কর্ম্ম শম্পাদন করিয়া জীবিকা লাভ করিতে কোনমতেই সক্ষম নহে, কিন্তু জগদীশ্বর ইহাদিগকে সমধিক শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমিতে স্থাপন করাতে উহারা স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, ইহারা আপনাদিগের জন্মভূমির উৎপাদিকা শক্তিগুণে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিলেই প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হইত। এদেশীয় লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের নিতান্ত প্রয়োজন ও যদ্দ্বারা ইহারা একপ্রকার সুখেতে কাল হরণ করিতে পারে, প্রায় সে সমস্ত দ্রব্যই ইহারা আপন দেশ হইতে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। কিনতু এক্ষণে উহাদিগের সে সুখে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, উহারা আর এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় অন্ন

শ্রম দ্বারা দিনপাত করিতে সক্ষম হয় না, উহারা এক্ষণে সাধ্যাতীত উৎকট পরিশ্রম স্বীকার না করিলে আর কোন মতে জীবন যাপন করিতে পারে না। বঙ্গদেশ মধ্যে অধুনা যে সমস্ত জাতির সমাগম হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমির আধিপত্য লাভ করিতে যাহাদিগের লোভ জন্মিয়াছে, তাহারা সকলেই এদেশীয় লোক অপেক্ষা প্রবল ও পরাক্রমশালী সুতরাং তাহাদিগের সহিত সমকক্ষতা করিয়া ইহাদিগের জীবন ধারণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় যে সবল ব্যক্তি যে দ্রব্য আক্রমণ করে, দুর্ব্বল লোকে কোন মতেই তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না এবং সবল পক্ষ যে স্থলে বাস করে, দুর্ব্বল লোকে কোন মতেই তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না এবং সবল পক্ষ যে স্থলে বাস করে, দুর্ব্বল পক্ষ কদাপি সে স্থানে অবস্থান করিতে পারে না, দুর্ব্বল পক্ষ প্রবলের সহিত কালক্ষেপ করিলে অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। দুর্ব্বল বঙ্গবাসী লোক যে সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিত এবং যে সমস্ত দ্রব্য উপভোগ করিয়া সুখী হইত, ইংরাজ প্রভৃতি নানাবিধ সবল মনুষ্যদিগের এক্ষণে সেই সকল দ্রব্যে লোভ জন্মিয়াছে। এবং তাহারাই আপনাদিগের অর্থ সমর্থ ও বুদ্ধি কৌশল দ্বারা এক্ষণে সেই সকল দ্রব্য অধিকার করিয়া লইতেছে, সুতরাং দুর্ব্বল বঙ্গবাসী লোকের আর সে সমস্ত দ্রব্যাদি ভোগ করিয়া সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন ভূমির মধ্যে যে বৃক্ষ সমধিক রস আহরণ করিতে পারে, সেই বৃক্ষই ক্রমে সতেজ হয় এবং শক্তিহীন নিস্তেজ তরু রসাভাবে আপনা হইতেই দিনে দিনে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ সংসার মধ্যে যে জাতি স্বকীয় বলবীর্য্য দ্বারা সমধিক বিত্তলাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহারাই ক্রমে উন্নত হইতে থাকে এবং দুর্ব্বল ও তেজবিহীন জাতি আপনার জীবিকা লাভে অসমর্থ হইয়া অল্পে অল্পে ধ্বংস হয়। এক্ষণে যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা সমধিক অর্থাগম হইতে পারে, প্রায় তাহার অধিকাংশই এদেশীয় লোকের পক্ষে অবলম্বন করা অসাধ্য ও অনায়ত্ত। হইয়া যেমন কোন বিস্তীর্ণ বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে অপটু এবং উৎকৃষ্ট শিল্প কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক ধন উপার্জ্জন করিতে অক্ষম, সেই রূপ কোন উৎকৃষ্ট রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেও অসমর্থ। রাজকীয় কর্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত পদে অধিক বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে, কর্ত্তপক্ষীয় রাজপুরুষেরা প্রায় সে সমস্ত পদ স্বজাতীয় ব্যক্তিকেই সমর্পণ করিয়া থাকেন। যদিও বর্ত্তমান রাজনিয়মের এপ্রকার অভিপ্রায় নহে যে কোন ব্যক্তি কোন পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলে তাহার জাতি বা বর্ণমর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া তাহাকে তৎপদে অভিষিক্ত করিতে কোন মতে প্রতিবন্ধকতা করা হয়, তথাপি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এদেশের প্রধান পক্ষীয় রাজপুরুষেরা স্বজাতি সত্ত্বে আর পারত পক্ষে কোন উচ্চপদে অন্য জাতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হবেন না, তাঁহারা যদি স্বজাতি দ্বারা কোন কর্ম্ম নিকৃষ্ট কল্পেও করিতেও ইচ্ছা করেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এক ব্যক্তি ইংরাজ যে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সাদরে সহস্র মুদ্রার অধিক মাসিক বেতন প্রাপ্ত হয়, এদেশীয় লোকে সেই কার্য্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করিয়া ১০০/১৫০ টাকার অধিক বেতন পায় না। অতএব এদেশীয় লোকে সুচারু রূপে রাজ নিয়ম পরিচিত হউন বা এক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণে কর্ম্মক্ষম ও বিষয়দক্ষ হউন, তাঁহাদিগকে চিরদিনই অধঃশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া এইরূপে অল্পবেতনে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, তাঁহারা এক্ষণেও যেমন স্বল্প মূল্যে স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে ব্যগ্র হইতেছেন, বোধ করি পরিণামেও তাঁহাদিগকে তদ্রূপ হইতে হইবেক। ইংরাজ জাতি প্রথমতঃ এদেশ অধিকার করিয়া এদেশীয় কোন কোন প্রধান লোককে যে সমস্ত কর্ম্ম কার্য্যের ভারার্পণ

করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে যে প্রকার মর্য্যাদা ও সম্মান করিয়াছিলেন, পরিণামে যে আর কোন ব্যক্তিকে সে প্রকার কর্ম্মের ভার অর্পণ করিবেন বা সেরূপ আদব করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা বোধ হয় না। বঙ্গবাসী লোকে যে আর ইংরাজদিগের নিকট হইতে কোনকালে রাজা রাজবল্লভ, রাজা নবকৃষ্ণ ও দেওয়না গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন প্রধান লোকদিগের মত সম্ভ্রম পূর্ব্বক রাজ্যের প্রধান পদ প্রাপ্ত হইবেন তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। ইংরাজেরা যে কারণে এদেশীয় পূর্ব্বতন প্রধান মনুষ্যদিগের সমাদর করিতেন এবং যে কারণে তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিতেন বোধ করি এক্ষণে সে কারণের অভাব হইয়া থাকিবেক।

এইরূপ নানা কারণে বঙ্গদেশের মধ্যে বিজাতীয় অন্নাভাব হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় অধিকাংশ মনুষ্যকে সতত অন্নের নিমিত্তই চিন্তিত দেখা যায়। অন্নাভাবে অধিকাংশ পল্লীগ্রামস্থ লোকের যে দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার শব্দ নাই। অন্নাভাবে কত শত ভদ্রসন্তান ক্লিষ্ট কলেবর হইয়া যৎসামান্য বিষয় কার্য্যের প্রার্থনায় বিজাতীয় শারীরিক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছে, কেহ উপযুক্ত সহায় সম্পত্তির অভাবে কোন স্থানে কর্ম্মকার্য্য প্রাপ্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ নিরাস হইয়া মহা মনঃপীড়ায় উৎকট রোগে আক্রান্ত হইতেছে এবং অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবগণকে শোকার্ণবে মগ্ন করিয়া যাইতেছে এবং কেহ বা অত্যল্প বেতনে কোন নিষ্ঠুর প্রভুর নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া মহা মনঃপীড়ায় চিরদিন যওপন করিতেছে। এ দেশের মধ্যে কত স্থানে অন্নাভাবে কত পরিবার অনশনে দিন যাপন করিতেছে। অন্নাভাব জন্য কেহ আর বৃত্তি অবলম্বন বিষয়েও সদসৎ বিবেচনা করিতে সক্ষম নহে, যাহার যাহাতে প্রবৃত্তি নাই সে ব্যক্তিও তাহা অবলম্বন করিতে স্বীকার করিতেছে এবং যে ব্যক্তির যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার সামর্থ্য নাই, সেও তাহাতে আবৃত হইয়া অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীরকে নষ্ট করিতেছে। অধুনা বঙ্গদেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে লোকের মান মর্য্যাদা ও সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হওয়া দুরে থাকুক ইহাদিগের প্রাণ রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়াছে বঙ্গ সমাজে দিন দিন যত ইংরাজ জাতির আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি প্রবিষ্ট হইতেছে, ততই আরও দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারা ইংরাজ প্রভৃতি সভ্য জাতিরনিকট হইতে যত নানা প্রকার অভিনব সভ্যতার শিক্ষা পাইতেছে, ততই নানা প্রকারে ইহাদিগের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারা আর সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, সামান্য প্রকার বেশভূষায় তুষ্ট হয় না এবং সামান্য রূপ গৃহাদিতে বাস করিয়াও সুখী হয় না, অথচ অতি সামান্য অবস্থায় কাল যাপন করিয়া জীবন ধারণ করিবারও ইহাদিগের কোন সাধ্য নাই। জল শূন্য মরুদেশীয় লোকের জল তৃষ্ণা অধিক হইলে যে প্রকার অবস্থা হয়, এক্ষণে এদেশীয় লোকেরও অবিকল তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে। এক্ষণে এদেশে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের কিঞ্চিৎ বিস্তার হইয়াছে বটে এবং তদ্দ্বারা দেশের দুরবস্থা দূর হওয়াও সম্ভব, তদ্দ্বারা পরিণামে কিরূপ ফল দর্শে বলা যায় না। কিন্তু অধুনা বঙ্গদেশীয় লোকে যে প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছে এবং এক্ষণে বঙ্গদেশ মধ্যে যে প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে করিয়া এদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের দুঃখ দূর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা কৃষি ও বণিক লোকেরই উন্নতি হওয়া সম্ভব, কিন্তু এ বঙ্গদেশে উক্ত দুই প্রকার লোকের অপেক্ষা বেতনভুক কর্ম্মচারি লোকের সংখ্যাই অধিক। এদেশীয় অধিকাংশ মনুষ্যই নির্দ্দিষ্ট বেতনে শ্রম করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে। বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা

যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে এদেশে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেরূপ বেতনভূক পরিশ্রমী লোকের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। অতএব এখানে বাণিজ্যের বিস্তার হওয়াতে যেমন এখানকার কতিপয় বণিকের ও কৃষকের কিঞ্চিৎ সুখ হইয়াছে, তেমনি বাণিজ্য দ্বারা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে সহস্র লোকের ক্লেশও বৃদ্ধি হইয়াছে বিশেষত এদেশের বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য দ্বারা এদেশীয় বণিক ও কৃষিলোকেরও বিশেষ উপকার দর্শিতেছে না, দেশান্তরীয় অন্যান্য জাতিতেই এ দেশোৎপন্ন প্রচুর দ্রব্যাদি লইয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য কার্য্য করিয়া থাকে এবং দেশান্তরীয় লোকেই এদেশীয় অধিকাংশ ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করে। এক্ষণে প্রায় সমুদায় বঙ্গদেশেতেই নীলকর সাহেবদিগের কুঠী দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত সাহেবরাই এদেশের অধিকাংশ ভূমিতে নীল উৎপন্ন করিয়া তাহার উপস্বত্বভোগী হয়েন, যে গ্রাম বা যে অঞ্চলের নিকটে কোন নীলকর সাহেবের অধিষ্ঠান হয় তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ অধিকাংশ ভূমিই নীলক্ষেত্রে পরিপূরিত হইতে থাকে। সাহেবদিগের শাসনভয়ে কৃষকদিগকে আপনাদিগের ধান্যাদি প্রয়োজনীয় শস্যের ভূমিতেও নীল বীজ বপন করিতে হয় এবং সাহেবেরা স্বীয় বলেও অনেক দুর্ব্বল লোকের চিরনতন ভূমি গ্রহণ করিয়া তাহাতে নীল বীজ বপন করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের মধ্যে নীল কার্য্যের বিস্তার হওয়াতে এদেশীয় কৃষকলোকের সুখবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক তাহাদিগের যন্ত্রণার আর অবধি নাই। দুর্দ্দান্ত নীলকর সাহেবদিগের অসঙ্গত দৌরাত্ম্যে পল্লীগ্রামস্থ দুঃখি কৃষকেরা যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা প্রস্তাবান্তরে বর্ণন না করিলে এস্থলে সম্যক্ প্রকাশ করা কোনক্রমেই সাধ্য হয় না। সম্প্রতি ধান্যাদি অন্যান্য শস্যের ভূমিও ইংরাজ সাহেবেরা গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক সাহেব সুন্দরবন আবাদ ও অন্যান্য জেলার শস্যশালী ধান্যের ভূমি লইয়া নিজ যোতে ধান্য উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে স্থলে সধন ও সবল ইংরাজ জাতি হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে স্থল হইতে এদেশীয় দুর্ব্বল লোকদিগকে আপনা হইতে অন্তরিত হইতে হইতেছে। এইরূপ ননা কারণে বঙ্গদেশের মধ্যে বিজাতীয় অন্নাভাব হওয়াতে যে এখানকার লোকের বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আর কোন বাহুল্য প্রমাণ প্রদর্শন করিবার আবশ্যক করে না। যিনি মনোযোগপূর্ব্বক একবার এদেশীয় সাধারণ লোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তিনিই তাহা অবগত হইতে পারেন।

অন্নাভাবে অধুনাতন বঙ্গদেসীয় লোক যেমন বিজাতীয় বৈষয়িক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সেইরূপ অপরাপর নানা অত্যাচারে এদেশীয় লোকের শারীরিক দুর্দ্দশাও উপস্থিত হইয়াছে।

অপরাপর যে সমস্ত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হেতু শরীর নষ্ট হইতে পারে, বঙ্গদেশের মধ্যে তাহার কিছুরই অভাব নাই; তদ্ভিন্ন উৎকট পরিশ্রম দ্বারা অধুনাতন বহুসংখ্যক বঙ্গীয় ব্যক্তির শরীর নষ্ট হইতেছে। যে প্রকার পরিশ্রম করিলে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল লোকের শরীর সুস্থ থাকিতে পারে এক্ষণকার বাঙ্গালিদিগকে তাহার দ্বিগুণ কি তিনগুণ পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। কি বিষয়ী লোক, কি বিদ্যা ব্যবসায়ী ছাত্র ও শিক্ষকাদি অন্যান্য মনুষ্য অনেকেই সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া ক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। যে সময় ও যে পরিমাণে পরিশ্রম করিলে এদেশীয় লোকের শরীরের প্রতি কোন বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না এদেশীয় বিষয়ী লোকের মধ্যে অনেকে সে নিয়মে ও সে পরিমাণে কার্য্য কর্ম্ম করিতে পায় ন। বঙ্গদেশ স্বভাবতঃ উষ্ণস্থান, এখানে উষ্ণ সময়ে ক্রমাগত পরিশ্রম করিলে কখনই শরীর সুস্থ থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু এদেশীয়

অধিকাংশ লোককেই সেই উষ্ণ সময়েতেই পরিশ্রম করিতে হয়। ইংরাজ জাতি আপনাদিগের প্রকৃতি অনুসারে প্রাতঃকালে আহার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বিষয় কার্য্য সম্পাদন করিবার পদ্ধতি করিয়াছেন, সুতরাং এদেশীয় বিষয় কর্ম্মী লোকদিগকেও সেই পদ্ধতি অনুসারে চলিতে হইতেছে। বিশষতঃ যে সমস্ত লোকে ইংরাজ বণিকদিগের বাণিজ্য কার্য্য সংক্রান্ত বিষয় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিজাতীয় পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাগিগের মধ্যে অনেকে প্রায় চারি প্রহরেরও অধিককাল কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার মধ্যে অনেকেই শীঘ্র রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহা কে না স্বীকার করিবেন? যে শীতপ্রধান দেশীয় সবল ইংরাজ জাতি যে নিয়মে ও যে পরিমাণে পরিশ্রম করিয়া শরীর ধারণ করিতে পারে, এদেশীয় দুর্ব্বল মনুষ্য কখনওই সে নিয়মে শ্রম করিলে সুস্থ থাকিতে পারে না। কলিকাতাস্থ অধিকাংশ মনুষ্য উল্লিখিত নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, এইজন্য তাহাদিগের মধ্যে অনেককে প্রায় কোন না কোন প্রকার উৎকট ও চির রোগে আক্রান্ত দেখা যায়।

এদেশীয় লোকের শারীরিক সুস্থতা নষ্ট হইবার আর একটি প্রবল কারণ দৃষ্ট হইতেছে। যে সকল স্থানের জল বায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর সমধিক অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলে সে সকল স্থানে শরীর রক্ষা করা কোন মতেই সাধ্য হয় না, ইংরাজ জাতি আপনাদিগের অর্থবলে সেই সকল স্থানে স্বচ্ছন্দে শরীর ধারণ করেন, কিন্তু এদেশীয় লোকের সে প্রকার স্থানে আর কোনরূপেই সুস্থ থাকিবার উপায় নাই। যে সকল রাজধানী বা জেলার জল বায়ু নিতান্ত কদর্য্য প্রধান পক্ষীয় ইংরাজ রাজপুরুষেরা সে সকল স্থানে অনায়াসে সুস্থ থাকেন, কিন্তু তথাকার অল্প বেতনভুক এদেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে সততই অসুস্থ দেখা যায়। অন্নাভাব প্রযুক্ত ইহারা কোন কদর্য্য স্থানে বিষয় কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেও পারে না এবং সে সকল স্থানে বাস করিয়াও সুস্থ থাকিতে সক্ষম হয় না। অর্থ লোভে ব্যাকুলিত হইয়া বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কত শত মনুষ্য ঐরূপ কদর্য্য স্থানে গমন করিয়া ও অপরিমিত এবং অনিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিয়া আপনার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন। আপনাদিগের শারীরিক প্রকৃতির ও দেশের অবস্থার বিপরীত নিয়মে কার্য্য করিয়া এবং সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া অধুনা বঙ্গদেশীয় লোকে প্রায় দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকে অত্যল্প বয়সেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। বাঙ্গালির মধ্যে সুস্থকায় সবল লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না এবং প্রায় নব্যসম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘায়ু ভোগ করিতে দেকা যায় না। অধুনাতন বঙ্গবাসী লোকের আয়ু প্রায় ৫০/৬০ বৎসর অতিক্রম করিয়া গমন করে না, উহার মধ্যেই অনেকের পতন হয় এবং এক্ষণকার লোকে অতি সত্বরেই জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে। ত্রিংশৎ বৎসর গত হইলেই অধিকাংশ ব্যক্তির বার্দ্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। ইয়ুরোপীয় অশীতি বর্ষের প্রাচীন ব্যক্তি যত পরিশ্রম ও যত কার্য্য করিতে পারে, এদেশীয় ত্রিংশৎ বর্ষীয় যুবা পুরুষও সে প্রকার শ্রম করিতে পারে না, প্রায় ত্রিংশৎ বৎসরের পরেই এদেশীয় লোকের শারীরিক বলের হ্রাসতা হইতে আরম্ভ হয় এবং চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেই শরীরের মাংস লোলিত হইতে থাকে এবং কেশ পক্ক ও দন্ত স্খলিত হয় ও চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্য জন্মে। এদেশে যেমন শীতান্তে বসন্তের উদয় হইতে না হইতেই গ্রীষ্মের আবির্ভব হয়, সেইরূপ বাল্য গতে যৌবন প্রকাশ পাইতে না পাইতেই বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, এক্ষণকার বঙ্গদেশীয় লোকের সহস্র ব্যক্তির মধ্যে ৫ জনকেও দীর্ঘায়ু বা দীর্ঘ যৌবন ভোগ করিতে দেখা যায় না। অতি শ্রম জন্য সত্বরেই উহাদিগের আয়ুঃ শেষ ও যৌবনের অন্ত

হয়। একে ত বঙ্গদেশীয় লোক স্বভাবতঃ নির্বীর্য্য তাহাতে আবার অর্থের হানি ও বলের হানি হওয়াতে দিন দিন আরো বীর্য্যহীন হইয়া আসিতেছে, যে স্থলে অর্থবল ও দৈহিক বলের অভাব হয়, সে স্থলে আপনা হইতেই মানসিক বীর্য্যের অভাব হইয়া উঠে। অধুনাতন বঙ্গদেশীয় লোকের নির্বীর্য্যতার একটি মাত্র উদাহরণ শুনিলেই অবাক হইতে হয়। বীর্য্যাভাবে ইহারা আর কোনো বিষয়েতেই প্রতিপক্ষতা করিতে সাহসী হয় না, রাজা ইহাদিগের প্রতি যদি কোন নিতান্ত অন্যায় নিয়ম প্রচার করেন, তাহা হইলেও ইহারা তাহাতে কোন প্রতিবাদ করে না এবং অপর কোন প্রবল লোকও যদি ইহাদিগের প্রতি গুরুতর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও ইহারা কোন প্রতিক্রিয়া করিতে পারে না। বীর্য্যাভাবে কেহ আপনার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে, কেহ যশমান ত্যাগ করিতেছে এবং আপনার ধন সম্পত্তিও পরিত্যাগ করিতেছে। বঙ্গদেশীয় অধুনাতন লোকদিগকে যে প্রকার নির্বীর্য্য দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে ১০ জন লোক একত্রিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে, সমুদায় বঙ্গদেশ লুটিয়া লইতে পারে। ইয়ুরোপীয় অপরাপর বীর্য্যবন্ত লোকের কথা দূরে থাকুক দশ ব্যক্তি সামান্য লোক একত্রিত হইলেও সমুদায় বঙ্গদেশকে পরাভূত করিতে পারে। কোন সম্বাদপত্র প্রকাশক ব্যক্ত করেন, যে চারি ব্যক্তি বন্য সান্তাল একত্রিত হইয়া কোন গ্রামে প্রবেশ করাতে তথাকার সমুদায় লোক সে গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে।

যে দেশীয় মনুষ্যের অবস্থা এমন নয় ও শারীরিক প্রকৃতি এমন দুর্ব্বল সে দেশের সম্ভাবিত উন্নতি বর্দ্ধন হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হয়? যাহারা অন্নইচন্তায় সতত ব্যাকুলিত, তাহারা কি আর কোন রূপ মহত্ত্বের বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া বা কোন অসাধারণ কার্য্য সাধন করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে? সে প্রকার লোক দ্বারা কোনরূপ মহৎ কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। এ বঙ্গভূমি এক্ষণে যেরূপ বাহ্য শোভায় শোভিত হইয়াছযদি ইহা অপেক্ষা আর শত গুণেও শোভিত হয় তথাপি যে পর্য্যন্ত এদেশীয় লোকের শারীরিক ও বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি না হইবে সে পর্য্যন্ত এদেশীয় লোকের শারীরিক ও বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি না হইবে সে পর্য্যন্ত কোন মতেই ইহার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। দেশীয় লোকের অবস্থার উন্নতি না হইলে কখনই সে দেশের উন্নতি বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। পরপুত্র যদিজ্ঞ মাতার ক্রোড় হইতে তাহার স্নেহাস্পদ সন্তানকে অন্তরিত করিয়া বলপূর্ব্বক আপনি সেই ক্রোড় অধিকার করে, তাহা হইলে কি কখন সে জননীর মনে আহ্লাদের উদয় হয়? না কখন সে জননী প্রসন্ন মুখে হাস্য করিতে পারে। বঙ্গভূমি যেমন কোন কোন অংশে এক্ষণে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে কিঞ্চিৎ শোভিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে সেইরূপ উহার দুরবস্থাগ্রস্থ সন্তানগণের বহুবিধ দুঃখাগ্নি মিশ্রিত দীর্ঘ নিশ্বাসে উহা মুহুর্মুহুঃ দগ্ধ হইতেছে। যিনি স্নেহপূর্ব্বক এক্ষণে এই পরাধীন বঙ্গ রাজ্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তিনি দেখিবেন যে উহার সন্তানের দুঃখ হেতু উহার নয়ন হইতে অনবরত শোকাশ্রু বিনির্গত হইতেছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৭৭৮ শক।১৫৬ সংখ্যা

লেখক পরিচিতি

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮২০—১৮৮৬

উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের অন্যতম অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত মানুষ। সংস্কৃত ও ফারসি ভাষাসহ জার্মান ও অন্যান্য বিদেশী ভাষাও তিনি জানতেন। লেখক জীবনের সূচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হওয়ার পর তাঁর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এমন একখানি জ্ঞানগর্ভ পত্রিকা আজও প্রকাশিত হয়নি। বারো বছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তারপর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। বহু সাধারণ গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতা। তিনি ছিলেন চিন্তাবিদ, কুসংস্কার ও কদাচারের বিরোধী। যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার ছিলেন কঠোর নীতিপরায়ণ, বিনয়ী। তাঁর স্বাদেশিকতার কোন তুলনা ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০—১৮৯১

বাঙালিকে যাঁরা আত্মপরিচয়ে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাঁহাদের একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সময়ে সমগ্র বাংলার যে জীবনধারা আমরা অনুভব করি, তার অন্তিমকালে তা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই সময়কালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনির্বাণ জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালিয়ে ছিলেন বিদ্যাসাগর। সামাজিক ব্যাধি আরোগ্য করতে এক তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন স্বার্থান্বেষী হিন্দু সমাজপতিদের সঙ্গে। জাতির দুরারোগ্য ব্যাধি নির্মূল করতে তাঁর উদ্যম বাঙালিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করে। সমগ্র বাংলায় শিক্ষা প্রসারে ও নারী সচেতনা বৃদ্ধিতে তাঁর উদ্যোগ ছিল অতুলনীয়। মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরকে আজও আমরা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারিনি। শতাব্দী শেষের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিমূলে ছিল বিদ্যাসাগরের শিক্ষার বীজবপণ। যার অঙ্কুরউদ্‌গম হয়ে সবল বলিষ্ঠ মেরুদণ্ডযুক্ত বাঙালি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল।

জন্ম : মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৬৭ বঙ্গাব্দ—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় "বাঙ্গালার ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী) নবাবী আমল" এবং "মধ্যযুগে বাঙ্গালা" দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। "মধ্যযুগে বাঙ্গালা" প্রথম বেরোয় ১৯২৩ সালে। মধ্যযুগে বাঙালির সামাজিক জীবনের অসাধারণ ছবি ধরা আছে এই গ্রন্থে। কালীপ্রসন্নের জন্ম

বর্ধমানের দুর্গা গ্রামে। পড়াশোনা কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। জঙ্গিপুর স্কুল ও কৃষ্ণনাথ কলেজে বি. এ. পাশ করার পর কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। সমকালীন পত্রপত্রিকায় ইতিহাস সংক্রান্ত বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যা আজও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

জন্ম : বর্ধমানে দুর্গা গ্রামে।

কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮২২—১৮৭৩

সেকালের শিক্ষিত ও ,বিশিষ্ট বাঙালিদের অন্যতম ছিলেন কিশোরীচাঁদ। ইয়ংবেঙ্গলের পুরোধা কিশোরীচাঁদ ছিলেন ডাফস্কুলের অবৈতনিক শিক্ষক, এশিয়াটিক সোসাইটির সহসম্পাদক। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য কাজে জড়িত। ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। ক্যালকাটা রিভিউ, বেঙ্গল স্পেকটেটর, বেঙ্গল ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান ও বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮২৯—১৮৬৯

এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের প্রথম যুগের সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র। প্রথমে ছিলেন মিলিটারি পে-পরীক্ষক অফিসের রেজিস্টার। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের সমর্থক গিরিশচন্দ্র সেকালের পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। বেথুন সোসাইটির সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ। বাগ্মী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাস ১৮৭০--১৯২৫

স্বদেশপ্রেমিক আইনজীবী চিত্তরঞ্জনও যে একজন প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন, সেকথা অনেকের অজানা। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হিসাবে ফিরে এসে আইনব্যবসা শুরু করলেও, বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক মামলায় অংশগ্রহণ করে খ্যাতিলাভ করেন। ভারতের এই শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার আইন ব্যবসা ত্যাগ করে স্বদেশ সেবায় যোগ দেন। তিনি সন্ন্যাসীসুলভ অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। দেশের মানুষ তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। দেশবন্ধু কংগ্রেস দল ত্যাগ করে স্বরাজ্যদল গঠন করেন। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র। মৃত্যুর আগে নিজ বসতবাটী জনসাধারণকে দান করেন। পরে সেখানে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' গড়ে ওঠে। নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি ছিলেন 'নারায়ণ' মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মৃত্যু হয় দার্জিলিংয়ে।

জন্ম : কলকাতায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮১৪—১৮৮৩

ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন বাংলা, ইংরাজি এবং ফারসি ভাষায় সমান দক্ষতাসম্পন্ন। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থগারিক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, পশু-ক্লেশ নিবারণী সভার সভ্য, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোক্তা ও সম্পাদক, জাস্টিস অফ পীস, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক প্যারীচাঁদ সমকালীন ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত পত্রপত্রিকায় বহু মূল্যবান নিবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়েছিল টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে। এই গ্রন্থে কথ্যভাষা ব্যবহার করে যুগান্তর সৃষ্টি করেন। পাদ্রী লঙ সমাজচিত্র ও বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত প্যারীচাঁদকে বলতেন 'ডিকেন্স অফ বেঙ্গল'। প্যারীচাঁদ আরও কয়েকখানি বই লিখেছিলেন।

জন্ম : কলকাতায়।

প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮—১৯৪৬

বাংলাভাষায় 'বীরবল' ছদ্মনামে ছিলেন সুপরিচিত। 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯১৪ সালে। চলতি ভাষাকে লেখ্যরূপ দেওয়ায় 'সবুজপত্রে'র লেখকগোষ্ঠী বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী ছিলেন পাবনা জেলার জমিদার পরিবারের সন্তান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষায় প্রথম স্থান অধিকারী বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এলেও দীর্ঘদিন ঐ পেশায় ছিলেন না। অধ্যাপনা করতেন আইন কলেজে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরাদেবীকে বিবাহ করেন। দুজনেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র। সংস্কৃতে রসিক হিসাবে ছিলেন সুপরিচিত। প্রবন্ধকার ও গ্রন্থকার প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। বিখ্যাত গ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ', 'চার-ইয়ারি কথা' এবং 'নীললোহিত'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' পুরস্কার লাভ করেন।

জন্ম : বাংলাদেশের যশোহরে।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৪০—১৯২৪

উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বংশ মুখার্জি পরিবারের সন্তান। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। জমিদারি ও রাজস্ব বিষয়ে ছিলেন অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম কৃতী পুরুষ ছিলেন প্যারীমোহন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮—১৮৯৪

'গীতা', 'আনন্দমঠ' আর 'বন্দেমাতরম' বাঙালির জীবনকে কীভাবে বদলে দিয়েছিল জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনায় তা সহজেই উপলব্ধি সম্ভব। বাঙালি

যুবককে বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করার মানসিক দৃঢ়তা এনে দিয়েছিল 'বন্দেমাতরম'। বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়লে তাঁর স্বদেশ চিন্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ঘিরে যে বিশাল সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, পরবর্তীকালে বাঙালি সংস্কৃতির দিগন্তকে তা নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় বাংলার গ্রাম, শহর জেগে উঠেছিল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে।

জন্ম : ২৪ পরগণার কাঁঠারপাড়ায়।

যতীন্দ্রমোহন রায় ১৮৭৬—১৯৪৫

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী। সেকালের বিখ্যাত প্রায় সব পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। 'ঢাকার ইতিহাস' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

রমাপ্রসাদ চন্দ ১৮৭৩—১৯৪২

ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অক্ষয়কুমার মৈত্রের ও শরৎচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় রাজশাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' (১৯১০) প্রতিষ্ঠা। ভারতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস চর্চার সূচনা করেন। ডাফ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর কিছুকাল গৃহশিক্ষকতা করেন। তারপর হিন্দুস্কুল এবং পরে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯১৭ সালে যোগ দেন ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি বিভাগে। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হন। তারই আগ্রহে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রবর্তন হলে, তিনি প্রথম প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে যোগ দেন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের সুপারিনটেনডেন্ট পদে। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন ১৯৩২ সালে। ১৯৩৪ সালে লন্ডনে আয়োজিত ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ সায়েন্সের অ্যানথ্রোপলজি অ্যান্ড এন্থোলজি অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইংরেজিতে বই লিখলেও বাংলা ভাষায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার বেশির ভাগই অগ্রন্থিত।

জন্ম : বাংলাদেশের ঢাকা জেলার শ্রীধরখোলায়।

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮—১৯০৯

ব্যারিস্টার, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮৩ সালে প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৭ সালে ঐ পদ ত্যাগ ক'রে ১৮৯৮ সালে দাদাভাই নৌরজি ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের লখ্নউ অধিবেশনে সভাপতি, ১৯০৭ সালে সুরাটে ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের প্রথম সভাপতি ও আজীবন সদস্য ছিলেন। তাঁর স্মরণীয় অবদান ব্রিটিশ সরকারের ভারত শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন।

জন্ম : কলকাতায়।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ১৮৯০—১৯৬৮

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ। এম. এ. পাশ করে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশবিদেশে। আমন্ত্রিত হয়ে বিদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর লেখা বহু গ্রন্থ আজও মূল্যবান বিবেচিত হয়ে থাকে।

জন্ম : মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী ১৮৬১—১৯২০

উনিশ শতকের কৃতী মহিলাদের অন্যতম ছিলেন শরৎকুমারী। দশ বছর বয়সে তার বিবাহ হয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। দুজনেই ছিলেন নারী জাগরণের অক্লান্ত কর্মী এবং নারী শিক্ষা প্রসারে আগ্রহী। শরৎকুমারী লাহোরে পিতার কাছে থাকাকালীন স্থানীয় বঙ্গ বিদ্যালয়ে ও লাহোর ইউরোপিয়ান স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র। 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শরৎকুমারীর স্বাক্ষর বিহীন অসংখ্য লেখা বেরিয়েছে সমকালীন পত্রপত্রিকায়।

জন্ম : চব্বিশপরগণার চাণক (ব্যারাকপুর) গ্রামে।

শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৪৭—১৯১৯

অসাধারণ মানুষ ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ মানুষটি ১৮৭৭ সালে যে সংগঠন গড়ে তোলেন, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সমাজ সংস্কার, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উদ্যোগ। এক্ষেত্রে সহযোগী ছিলেন আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের দুজনের সহযোগিতায় ১৮৭৯ সালে 'সিটি স্কুল' স্থাপন করেন। ভারতবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোহিত ছিলেন শিবনাথ। তিনি ছিলেন নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে। শিবনাথের 'যুগান্তর' উপন্যাসের অনুসরণে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় 'যুগান্তর' পত্রিকা। তাঁর 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' আজও উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের অন্যতম আকর গ্রন্থ।

জন্ম : চব্বিশপরগণার মজিলপুর।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৮৭৬—১৯৬২

বিরল প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যসেবায় সমকালে তিনি ছিলেন বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। শিক্ষালাভ কলকাতার হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। সাহিত্য, দাসী, সুহৃদ, উৎসাহ, মুকুল, ভারতী, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। সন্ধ্যা, প্রতিবাদী, যুগান্তর, ক্যালকাটা রিভিউ, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট, ইন্ডিয়ান রিভিউ, হিন্দুস্থান রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা পরিচালনা করেন ১৯০৯ সালে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বসুমতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ লণ্ডনের ইনস্টিটিউট অফ জার্নালিস্ট-এর সদস্য ছিলেন। সাংবাদিকতার কাজে বিদেশেও যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন কিছুকাল।

জন্ম : বাংলাদেশের যশোহরের চৌগাছায়।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮২৪—১৮৬১

উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাংবাদিক ও সমাজসেবক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কর্মজীবন শুরু মিলিটারি অডিটর জেনারেল অফিসে। ইংরেজি ভাষায় ছিল অসাধারণ জ্ঞান। ইতিহাস, রাজনীতি ও আইন বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ মানুষ ছিল সংখ্যায় কম। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার কর্তৃত্ব ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বাংলার কৃষক সমাজের ওপর নীলকর অত্যাচারের ভয়াবহ কাহিনি দিনের পর দিন তুলে ধরেন হিন্দু পেট্রিয়টের পাতায়। তাঁর লেখনীর প্রভাবেই নীলচাষ বিষয়ে সরকারি নীতির পরিবর্তন ঘটে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেন। ভবানীপুরে তাঁর বাড়ি ছিল নীলচাষীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। আকস্মিকভাবে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

ও

ক

খ

গ

চ

ছ

জ

ড

ঢ

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

স

হ